SAHEB BIBI GOLAM
(King, Queen & Knave)
A classic novel of twentieth century
by Bimal Mitra

Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market,
Calcutta-700 007, India

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৫৩

পরিবেশক
উজ্জ্বল বুক স্টোরস
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ
রঞ্জন দত্ত

লেসার টাইপসেটিং
শাইনিং লেসার গ্রাফিক্স
৩৫৭/বি, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক
প্রিন্টিং সেন্টার
১, ছিদাম মুদি লেন,
কলিকাতা-৬

ISBN-81-7334-055-2

নিবেদন

বহুদিন পর আজ নিজেকে 'মুক্ত' লাগছে। প্রকাশক-লেখকের দীর্ঘদিনের একটা আকাঙ্ক্ষিত কাজ আজ সম্পন্ন হতে চলেছে।

মূলত এই 'উপহার সংস্করণে'র ব্যাপারটা প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর আগেকার পরিকল্পনা। শুধু পাঠকদের 'উপহার' দেওয়ার জন্যেই এত কম দাম রাখা হয়েছে। কম দাম দেওয়ার অর্থ এই নয় যে যেমন-তেমনভাবে ছেপে দেওয়া। যতটা ভালভাবে পরিপাটি করে সাজানো যায়, ততটাই চেষ্টা করা হয়েছে।

আজ উনি (বিমল মিত্র) দেখে যেতে পারলে আমি আরো আনন্দিত হতাম। ধন্যবাদ জানকীনাথ সিংহ রায়কে যিনিই প্রথম পাঠক-দরবারে উপন্যাসটি পুস্তকাকারে এনেছিলেন।

—আভা মিত্র

পরিচিতি

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাস অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার পটভূমিতে সৃষ্ট জমিদার ও বাবু-কালচারের দৃশ্যাবলী ও ঘটনা-বিশ্লেষণের চাতুর্যে, চমৎকারিত্বে মন রাঙিয়ে তুলে রীতিমতো প্রবল উদ্দীপনা জাগাতো। তখন থেকেই উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশনার বাসনা ক্রমশঃই বলবতী হয়ে ওঠে। যথাসময়ে একদিন সুযোগ এসে গেল। ১৯৫৩ সালে 'সাহেব বিবি গোলামের' প্রথম প্রকাশ। এই বই প্রকাশনায় যাঁরা আমাকে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণে আসে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ এবং প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র, সে সব তো আজকের কথা নয়। কয়েক দশক পিছনে পড়ে আছে, 'নিউ ক্যাথে'র সেই নানা রঙের দিনগুলি। মনের অলসমনে অতীত এসে থমকে দাঁড়াতেই সেই মধুময় দিনগুলির স্মৃতি ভিড় করে—সঙ্গে বিমল মিত্র এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্র হিরণ্যমণি, বৈদূর্যমণি, পটেশ্বরী বৌঠান, আর ভূতনাথ।

সত্যিই কি ভোলা যায় তাঁদের, ভোলা যায় বিমল মিত্র ও 'সাহেব বিবি গোলাম'কে?

জানকীনাথ সিংহরায়

Bimal Mitra

Bimal Mitra seeks to delineate the changes that had overtaken the people of Bengal during the last two hundred years through the loss of independence in the occupation by the British, the decline of the Bengali gentry, the vicissitudes of the freedom movement, the two World Wars, the great Bengal Famine of 1943, the regaining of independence through the partition of Bengal and the process of the decimation of the Bengali middle class that has continued since then. He has drawn a realistic picture of the helplessness of the Bengalis in the face of continued oppression and exploitation. Since the Bengalis alone have not been oppressed and exploitated in the post-independent India and since most of the citizens of India have been posed, to some extent at last, to oppression and exploitation like the Bengalis, Mitra's realistic account of the suffering of the Bengalis has struck a sympathetic chord in the hearts of the people in other States of the Indian Union, and his books have gained such a wide popularity all over the country among all linguistic groups, whether in the northern or in the southern part of the country.

A theme that recurs in the writings of Bimal Mitra—whether it be his classic quintet—*Begum Mary Biswas, Saheb Bibi Golam, Kari Diye Kinlam* (I buy with cowries), *Ekak Dashak Shatak* and *Pati Param Guru* (The lord capitalist is the only lord) or his other novels—is the fate of the good man in modern Indian society.

Bimal Mitra always finds the good man to suffer in West Bengal. The situation is not far different in other States in the Indian Union. Contrary to expectation, Mitra is not mellowing down as he is growing old; he is becoming angrier and angrier. In one of his latter-day novels *Ami*—meaning I, he makes a frontal attack on the contemporary corrupt political practices and the process of the enrichment of the politicians and the bureaucrats. In his other recent novel he exposes the corruption and demoralisation in the academic world; in *Raja Badal,* which has already been translated into English, he shows how a teacher genuinely competent and eager to teach is harassed not only by the members of the managing committee but also by the fellow-teachers. In his masterly short stories he has dealt with almost all aspects of the contemporary lower Bengali middle class life with a fidelity that is rare to come by. The fact that Bimal Mitra is above fifty and is a highly successful writer in the sense that his books sell well and fetch him a lot of money makes it all the more remarkable that he should be so critical of the contemporary order.

In his refusal to trade in sex Bimal Mitra is almost a writer of protest. In his bulky novels there have been many occasions when he could have easily introduce raw sex without much complaint from the readers. He is essentially concerned with the enrichment of human values and not with pornography.

Subhas Chandra Sarkar

Excerpt from 'The decline and fall of Bengali Literature' by Subhas Chandra Sarkar, Deputy Editor, **Commerce**, **published** in 'Point of View', an anti-news weekly, New Delhi, special number, 23rd February 1967.

এই লেখকের লেখা সেরা কয়েকটি বই

উপন্যাস

এই নরদেহ ১/২
পতি পরম গুরু ১/২
বিশ্বরূপ দর্শন
চারপ্রহর
বিবাহিতা
যোগাযোগ শুভ
হে নূতন
সরস্বতীয়া
টাকার মুকুট
সুখের অসুখ
সাহেব বিবি গোলাম
এর নাম সংসার
প্রথম অঙ্ক শেষ দৃশ্য
মনের আয়নায়
ছুঁই
রাজরাণী হও
গুলমোহর
মনে রইলো
রাণীসাহেবা

ছোট-বড় সবার জন্য

টক-ঝাল-মিষ্টি
লাল-নীল-হলদে
কিশোর অমনিবাস

এই লেখকের সব বই 'উজ্জ্বল বুক স্টোরস'
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ এ পাবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ, আমার নাম জাল করে প্রায় তিন শতাধিক গল্প-উপন্যাস আছে। ও নামে অনেক ব্যক্তি থাকতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় কোন লেখক নেই। আমার লেখা প্রত্যেকটি বইয়েই এই 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' এবং প্রথম পাতায় মুদ্রিত স্বাক্ষর আছে। যাঁরা কিনবেন, এটা যেন দেখে নিতে ভুলবেন না।

লেখকের মুখবন্ধ

আজ থেকে তেরো বছর আগে 'সাহেব বিবি গোলাম' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকায় এই 'সাহেব বিবি গোলাম' গ্রন্থ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সম্বলিত নিন্দের ঝড় বয়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে কুৎসা-কটূক্তি থেকেও আমি সেদিন রেহাই পাইনি। বাঙলা সাহিত্যের গবেষকদের কাছে অবশ্য সে সংবাদ অজ্ঞাত নয়। আমার সাহিত্য-জীবনের সেই দুর্যোগের দিনে অনেকবার অনেক প্ররোচনা সত্ত্বেও এই অমূল্য প্রবন্ধটি আমার আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবেও যে আমি ব্যবহার করিনি—কিম্বা আমার গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হিসেবেও এটিকে ব্যবহার করে এর অমর্যাদা করিনি, তার একমাত্র কারণ স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবীর উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ঔদার্যে, মাধুর্যে, মনুষ্যত্বে, সরলতায়, আন্তরিকতায় আদর্শস্থানীয়া। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় দূরের কথা, চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিল না। সেই একবার মাত্র ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কখনও পত্র-ব্যবহার করিনি। সেদিন সমস্ত বাংলাদেশের তাবৎ পত্র-পত্রিকা যখন আমার নিন্দা-কুৎসায় মুখর তখন তিনি যেভাবে এই গ্রন্থকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তারপর আর আমার কোনও পাওনা বাকি ছিল না। তাই সেদিন তাঁর প্রবন্ধকে অস্ত্র হিসেবে কিম্বা বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর অমর্যাদা করতে আমার বিবেকে বেধেছিল।

শেষ পর্যন্ত কোনও দুর্জ্ঞেয় কারণে এই প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পথে অনেক বাধা আসে। অগত্যা সম্পাদকের কাছ থেকে প্রবন্ধটি সংগ্রহ করে আমি নিজের কাছে এনে রাখি। আজ সেই অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর নতুন সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি আমার অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর অপ্রকাশিত রচনা

(স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর এই অপ্রকাশিত রচনাটির একটি পূর্ব-ইতিহাস আছে। আমার এক তরুণ পাঠক-বন্ধু প্রাণগোপাল পাল একদিন ডাক-যোগে দৈনিক সংবাদপত্র যুগান্তরের একটি পৃষ্ঠা আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। 'যুগান্তর' পত্রিকাটি ১৯৫৭ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখের। পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একটি সংবাদ আমার লেখা 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাস সংশ্লিষ্ট বলে ওই তরুণ বন্ধুটির এই অকৃপণ উদারতা। সংবাদটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করি ঃ—

"......চুরাশী বছর বয়সেও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে দেখা যায় আসরে আসরে এবং আজও বাড়ীতে বসে তিনি গানের দলকে তৈরী করছেন হাজারো বার সুরের পুনরাবৃত্তি করে করে। মহিলা সমিতি 'আলাপনী'র কাজ তো আছেই। তার মুখপত্র নতুন প্রকাশিত 'ঘরোয়া'র তদ্বির, প্রদর্শনীর জন্য শিল্প-সামগ্রীর সংগ্রহ, তার খুদে খুদে হিসেবনিকেশ—তা সত্ত্বেও ক'দিন আগে যেমনি এল আহ্বান, অমনি হাতে তুলে নিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কাজ। গত ২৯শে ডিসেম্বর সান্ধ্য-বিনোদনপর্বে চীনভবনে 'সাহিত্যিকা'র তরফ থেকে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর তিরাশী পেরিয়ে চুরাশী বছরে উপনীত হওয়া উপলক্ষে শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে মাল্যচন্দনে যথারীতি ইন্দিরা দেবীকে বরণ করা হলে পর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রেরিত একটি শুভেচ্ছার বাণী পাঠ করে শোনান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয়। কয়েকটি সুমধুর গান ও সুলিখিত কবিতা গীত ও পঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক মহল থেকেও স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের একটি অপ্রকাশিত গদ্য রচনা এবং ইন্দিরা দেবীর সদ্য-রচিত অপ্রকাশিত রচনার প্রথম শ্রুতি-আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়েছিল সকল সভার দু'দফা পাঠপ্রসঙ্গে। ইন্দিরা দেবীর লেখাটি ছিল শ্রীবিমল মিত্র রচিত 'সাহেব বিবি গোলাম' বইখানির সমালোচনা। আন্তরিক উদ্দীপনায় চিন্তার প্রাখর্যে অপূর্ব সরসতায় মন্ত্রমুগ্ধ

করে রেখেছিল তাঁর প্রতিটি কথা সমগ্র সভাকে। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় উঠে বললেন—"আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে ক'জন এ লেখা লিখতে পারবেন জানি না......"

এই বিবরণটি পড়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে আমার ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র লেখবার লোভ হয়। তিনি আমার সেই ছোট পত্র পেয়ে একটি চমৎকার চিঠি লেখেন আমাকে। চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি ঃ

"কল্যাণবরেষু—

তোমার 'সাহেব বিবি গোলাম' বইটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল বলে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে (এবং কতকটা অনুরুদ্ধও বটে) তার একটি সমালোচনা লিখি। সেটি এখানকার সকলের প্রশংসা লাভ করেছে ও সেইজন্যেই তাঁরা আমার গত জন্মদিনে পাঠ করেন।

আমার বরাবরই ইচ্ছা ছিল, এবং সেটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই প্রশংসিত প্রশংসা-প্রবন্ধটি লেখকের চোখে পড়ে, যাকে উদ্দেশ্য করে সেটি লেখা। কারণ মহাকবি বর্ণিত 'করুণা'র ন্যায় প্রশংসাও যে করে এবং যে পায় উভয়কেই আনন্দ দান করে।

তাই তুমি নিজে থেকেই এ বিষয়টি উত্থাপন করেছ দেখে সুখী হয়েছি। এবং জানবার জন্য লিখছি যে, যতদূর জানি প্রবন্ধটি বর্তমানে 'দেশ' সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের কাছে আছে (45, S. R. Das Rd.)। আমার নাম করে তাঁকে বললে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সেটি দেখতে দেবেন, এবং তুমিও পড়ে খুশী হবে আশা করি। সেটি প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁদের কী অভিপ্রায় আমি ঠিক জানিনে।

আঃ
শ্রী ইন্দিরা দেবী
২৯.১.৫৭

সাহেব বিবি গোলাম
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

এতদিন 'সাহেব বিবি গোলাম' বইখানিতে মশগুল ছিলেম। শেষ হয়ে গিয়ে খালি খালি লাগছে। যেন বহুদিনের বন্ধু-বিচ্ছেদ হল, সঙ্গহারা হয়ে পড়লাম। সেই সঙ্গসুখ আরও কিছুদিন টেনে রাখবার জন্যে ইচ্ছে হল বইখানির একটা সমালোচনা লিখি, তবু তো সেই সব লোক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব।

লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে যদিও আমি খুব গল্প-ভক্ত, তবুও বাংলা গল্পের বই খুব কম পড়ি, বিশেষতঃ আজকাল। খবরের কাগজই আমাদের বেদ, কোরাণ, বাইবেল। দিনান্তে একবার সে নিত্যকৃত্য সমাপন করতেই হয়, তা একঘেয়েই লাগুক আর ঝিমুনিই পাক। তারপর যদি কখনো ছেলেপিলের পড়ার টেবিলে ইংরিজি কোন পুরনো টিক্‌টিকির বই পড়ে থাকতে দেখি তো গোপনে নেশাখোরের মত সেটা সংগ্রহ করে রাত ১২টা ১টা পর্যন্ত উপভোগ করি। এহেন লোকের হাতে কি সূত্রে 'সাহেব বিবি গোলামে'র মত মস্ত মোটা একটা বাংলা বই এসে পড়ল, তা ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে প্রথম ক'পাতা পড়েই নেশা ধরেছিল, তারপরে কে একজন বিনা বাক্যব্যয়ে বইটি পড়তে নিয়ে গেল এবং মলাট ছেঁড়া অবস্থায় ফেরত দিলে। তারপর থেকে যে ধরেছি, শেষ করে তবে ছেড়েছি ; খবরের কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঘড়ির প্রতিযোগিতা, কিছুতেই আটকাতে পারেনি। দুঃখের বিষয় সব জিনিসেরই শেষ আছে।

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে "মলাট সমালোচনা" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। আমিও মহাজনের পন্থানুসরণপূর্বক মলাট থেকে সমালোচনা শুরু করছি। আমার একটি ইঁচড়ে-পাকা নাতি মনে করেন সমালোচনা মানেই বিরুদ্ধ আলোচনা। যদিও আমি তাঁর মতে সায় দিইনে, তবে মনে করি যে বিরুদ্ধ সমালোচনা

যা আছে (কিছু তো থাকবেই) তা আগেভাগে সেরে ফেলাই ভাল। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ।

মলাটের ছবিগুলির মধ্যে সাহেবের (অর্থাৎ বাবুর) প্রতিকৃতিটি ভাল হয়েছে, অর্থাৎ বাবরিকাটা চুল, সাফ রঙ ও হাতে ফরাসীর বর্ণনার সঙ্গে মিলেছে। কিন্তু বিবির (বা বউয়ের) ছবিটি আমার মনঃপূত হয়নি। অবশ্য যে সৌন্দর্য লেখনীতে ফোটে, এ পর্যন্ত তুলিতে কেউ তা ফোটাতে পারেনি। শকুন্তলা বা পার্বতীর ছবি কি কেউ কালিদাসের কবিতার সমতুল্য আঁকতে পেরেছেন? তবু ছোট বউয়ের সুন্দর সূক্ষ্ম সরল রূপবর্ণনার তুলনায় ছবিটি নিতান্ত নিরেশ হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু গোলামেই আমার সবচেয়ে বেশি আপত্তি। আমাদের তো স্মৃতি পৌনে শতাব্দী পর্যন্ত পিছিয়ে যায়, কিন্তু কোন বড়বাবুর বা বড় সাহেবের চাকর বা খানসামার এ রকম বেশ দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। হয়ত হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মাথায় এ রকম পাগড়ী ও পরনে এ রকম মালকোঁচা মারা ধুতি থাকতে পারে, কিন্তু গোঁফজোড়া সত্ত্বেও চেহারাটা নেহাৎ অর্বাচীন। ওকে দেখলে কি চোর-ডাকাত ভয় পাবে?

যা হোক মলাট ছেড়ে এখন দেউড়িতে ঢোকা যাক, না'হলে কোনদিনই গৃহপ্রবেশ হবে না। বোধ হয় বইয়ের মুখপাতটা প্রথম থেকেই আমার ভালো লেগেছিল, তার কারণ জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি ভবনের সঙ্গে বড়-বাড়ির চেহারার অনেকটা মিল পেয়েছিলুম। কি ভাগ্যি ঐ বাইরের মিল ছাড়া আর বেশি দূর এগোয় নি। ঐ রকম বাড়ির ভিতরে যাবার পথে রেলিঙ ঘেরা সরু বারান্দা, তার উপর থেকে ঝুঁকে দেখলে নিচে রান্নাঘরের রোয়াকে বসে দাসীরা বাটনা বাটছে, কুটনো কুটছে ও নর্দমা দিয়ে মশলা ধোওয়া রঙীন জল গড়িয়ে যাচ্ছে—এ দৃশ্য আমি জোড়াসাঁকোয় ৬নং-য়েও দেখেছি, ৫নং-য়েও দেখেছি। তফাতের মধ্যে ঠাকুর বংশ বৈষ্ণব ছিলেন বলে "কুটনো কোটা" না বলে আমরা "তরকারী বানানো" বলতুম। তারপরে নানা মহলের ভিতর দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকতে বেঁকতে, ঘুরতে ঘুরতে অন্দর মহলে পৌঁছনো যেত। ওদিকে বার বাড়ির দরাজ উঠান, তার এক পাশে পুজোর দালান, দেউড়ির একদিকে তোষাখানা, আর একদিকে খাজাঞ্চিখানা, দোতলায় (?) বৈঠকখানা, সবই মিলে যায়। কিন্তু এসব তুলনামূলক বর্ণনা এখানে অবান্তর। সেকালের বনেদী বড়মানুষের সব বাড়িই বোধহয় মোটামুটি এক ছাঁচে ঢালা ছিল।

প্রথমেই বলেছি দোষের পালা আগে সেরে নেব। এতগুলি চরিত্রের মধ্যে প্রধান যিনি নায়ক—অর্থাৎ ভূতনাথ চক্রবর্তী—তাঁর চরিত্র কি বেশ ভালোরকম ফুটেছে? তাঁর বাইরের চেহারা অন্ততঃ আমার কাছে তেমন পরিস্ফুট বলে ত মনে হয় না। যখন মাঝে মাঝেই শুনতে পাই তাঁর কেমন "ভয় করতে লাগল", তখন সত্য কথা বলতে গেলে তাঁর প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হয়। তবে পাড়াগেঁয়ে মানুষ প্রথম প্রথম কলকাতার মত অত বড় শহরের অত বড় লোকদের কাণ্ডকারখানা দেখে একটু ভড়কে যাওয়া আশ্চর্য নয় বলে প্রথম দিককার অসহায় মনোভাব মার্জনীয়। বিশেষতঃ তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল ব্রজরাখাল যখন অত শীঘ্র তাঁকে একলা ফেলে সরে পড়লেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি কি ভূতনাথের একটু অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল? সেই বয়সের সখীদের কথা তো ক্রমাগত ঘুরে ফিরে মনে আসে দেখতে পাই। আর কলকাতার দুই দিকে দুই সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে তো বেশ হাবুডুবু খেয়েছিলেন। তবে কখনো তাদের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন নি, বা সুযোগ পেয়েও অশোভন ব্যবহার করেন নি, তা স্বীকার করতেই হবে। বরং সকল সময়ে তাদের উপকারই করবার চেষ্টা করেছেন। আর শেষ কাণ্ডে সংসারের সমস্ত বাঞ্ছিত সুখ—যাকে সংক্ষেপে কামিনীকাঞ্চন বলা যেতে পারে—করতলন্যস্ত আমলকীবৎ পেয়ে কি রকম অবলীলাক্রমে কেমন অনায়াসে কলমের এক আঁচড়ে পরিত্যাগ করলেন, তা ভাবলে বাস্তবিক তাঁকে মহাপুরুষই বলতে ইচ্ছে হয়। তাঁর একটু কবিপ্রকৃতি, ভিতরে একটু সাধুপ্রকৃতিও ছিল ; পরিণামে শেযোক্তেরই জয়লাভ হল। এই সকল গুণের সংমিশ্রণে তাঁর স্বভাবটি খুব স্পষ্ট না হোক, শেষ পর্যন্ত আকর্ষণীয়ই হয়ে উঠেছে। জবার চেহারাও স্পষ্ট নয়। শারীরিক সৌন্দর্য ত নয়ই, যদিও কানে শুনে আসছি যে সুন্দর। আর মানসিক ছবিও ভাল ফোটে নি। কেবল গোছাল ও কর্মক্ষম এই পর্যন্ত বোঝা যায়। তাই জন্যই কি সুপবিত্রর মত অক্ষম অসহায় মানুষের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুকম্পা অনুভব করেছিল?

এস্থলেও বলা যেতে পারে যে, ও বেচারা যেরকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই সমাজের আওতায় মানুষ হয়েছিল তাতে স্বভাবের মধ্যে বিপরীত টান থাকা আশ্চর্য নয়। বাইরের সাজসজ্জায় বিনুনী ঝোলানো ও লম্বা হাতার জামার বর্ণনা দিয়ে কতকটা ঐক্য আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটা তো দেখছি ব্রাহ্মসমাজের ফ্যাশন বলে আজও গণ্য, অন্ততঃ রঙ্গমঞ্চে। যদিও আমার হাসি পায়, যখন ভাবি যে সুবিনয়বাবু যে শাখার ব্রাহ্ম, নিদেন তার শীর্যস্থানীয় মহিলাদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি হাতকাটা জামা পরতে। তবে বুককাটা পছন্দ করতেন না বটে।

সুবিনয়বাবু সদব্রাহ্ম ও সদাশয় সরল প্রকৃতির মানুষ। তবে তাঁর উপদেশগুলি ভূতনাথ মনে মনে যতই শ্রদ্ধা করুক না কেন, এই বইয়ের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যখন তখন তুলে না দিলেও চলত। কারণ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস এমন অজানা জিনিস নয়, আর বইখানি এমনিই যথেষ্ট বড় হয়েছে। তাঁর আচরণেই তো তাঁর ধর্ম প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আবার পরিচিত আত্মীয়বন্ধু ও পূর্বপুরুষের এই সূত্রে নামোল্লেখ দেখে খুব ভালোই লাগে ও যেন ঘরোয়া মনে হয়। বিশেষতঃ জবার গানগুলির প্রত্যেকটি চেনাশোনা এবং এই এক জিনিসে অন্ততঃ তার বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে এমন কিপটে হল কেন? সুবিনয়বাবুরও টাকার অভাব ছিল না। না সেটা কেবল ঠাকুরের চুরিবিদ্যে?

আবার বড় বাড়িতে ফিরে আসা যাক। বনমালী সরকার লেনের বাড়িটি ভূতনাথের মত আমাদের মনকে টানে। তবে এখানেও কতকগুলি সমস্যা সমাধান করতে পারিনি। বদরিকাবাবুর মত এমন একটা আস্ত পাগল ওঁরা কেন এতদিন ঘরে রেখে পুষেছিলেন এবং তিনিই বা কেন পাগলা গারদের বাইরে রইলেন, তা বুঝলুম না। তাঁর শেষ পরিণামও যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি বীভৎস ছাড়া আর কি বলব।

তারপরে বৃন্দাবনের সঙ্গে চুনীদাসীর কি সম্বন্ধ? সেটাও বলি বলি করে শেষ পর্যন্ত খুলে বলা হল না। যার যা ইচ্ছে মনে করে নাও। ছোটবাবুই বা হঠাৎ বাড়িতে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে আবার বেরুতে আরম্ভ করলেন কেন, তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। যদিও তার উপরেই গল্পের পরিসমাপ্তি নির্ভর করছে।

আর একটা আপত্তি তুলেই অভিযোগের পালা সাঙ্গ করব। ভিন্ন রুচির্হিলোকঃ শুধু নয়, সমাজও বটে। যে কালে যে সমাজে যে রীতিনীতি প্রচলিত মোটামুটি সেইটেই লোকে মেনে নেয়, তার ভালমন্দ বিচারের জন্যে বেশি কেউ মাথা ঘামায় না। এক সমাজ-সংস্কারক ছাড়া। সাহিত্যিক সমাজ-সংস্কারক নন, শিল্পী মাত্র। এবং শিল্পীকে ছবি আঁকতে গিয়ে আলোর সঙ্গে ছায়াপাতও করতে হয়। কিন্তু এস্থলে ছায়ার কালো পোঁছ কি একটু বেশি গাঢ় করে লেপে দেওয়া হয়নি? কয়েক বৎসর আগে মিস মেয়ো আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে বই প্রকাশ করেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই নালিশ ছিল যে, কেবল হাসপাতাল ও নর্দমা ঘেঁটে তথ্য সংকলন করলে সব দেশেই ঐরকম দুর্গন্ধময় দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব দেখানো যেতে পারে। তাই এক-একবার মনে হয় যে এক তিনতলার মানুষপ্রমাণ উচ্চ ঝিলমিল ঘেরা শুদ্ধান্তঃপুরের নিচে থেকে ধরে বাকি বাড়িটা অমন নরককুণ্ড বলে না দেখালে কি যথাযথ ছবি আঁকা যেত না? অবশ্য "সুকুমারমতি বালক বালিকা" (যাদের আগে বলত) তাদের হাতে এ বই পড়বার কথা নয়। কিন্তু যে চলচ্চিত্র 'for adults only' বলে সরবে ঘোষিত হয়, সেইগুলি দেখবার জন্যই কি উক্ত শ্রেণীর মন বেশি ছোঁ ছোঁ করে না? মাইকেলের' মতে যথা গুণহীন সন্তানের প্রতিই জননীর স্নেহ হয় সমধিক? প্রায় শতাবধি বৎসর আগে শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের বই নাকি বালিশের তলায় রেখে রাত্রে লুকিয়ে পড়তে হয় চতুর্দশ বর্ষীয় বালকেরও। কিন্তু এখন তো পঞ্চদশীর হাতে ভারতচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের বই প্রকাশ্যভাবে ঘুরলেও মা-বাবা কোন আপত্তি করেন না দেখতে পাই। আজকাল আবার একটা মতবাদ হয়েছে শুনতে পাই যে সংসারের ভালমন্দ সব কথা ছেলেমেয়েদের অল্পবয়সেই জানিয়ে দেওয়া ভাল, যাতে পরে নিজেরাই বুঝেসুঝে নীর থেকে ক্ষীর গ্রহণ করতে পারে। একজন ষোড়শী তো আমাকে স্পষ্টই বললে যে—"সব জানা ভাল, না করলেই হল"। তথাস্তু। আমায় সৌভাগ্যবশতঃ যখন ছেলেপিলে মানুষ করতে হয়নি,

তখন "ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা লো"। আবার যখন শুনি তখন হাসি পায় যে Victorian Age-এ মেয়েদের পায়ের উল্লেখ পর্যন্ত করা এত অশালীন ছিল যে, একজন ইংরেজ রমণীর (সেদিন কোথায় পড়েছিলুম ভুলে যাচ্ছি) কোন্ আগ্নেয়গিরির গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার উপক্রম হওয়ায় এক পুরুষ সঙ্গী পা ধরে টেনে তাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছিল বলে তার এত লজ্জা ও ধিক্কারবোধ হয়েছিল যে বলবার নয়। ভাবটা বোধ হয় "এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই দোটানার পাল্লা থেকে বোধ হয় সামাজিক জীব কোনদিনই রেহাই পাবে না।

যাক গে, মরুক তো এসব অপ্রিয় কথা। এখন প্রাণ খুলে প্রশংসা করবার মুক্ত শীরতাক্ষেত্রে পৌঁছতে পারলেই বাঁচি। আঃ কি আরাম!

প্রথমেই চোখে পড়ে বইখানির পশ্চাদ্‌পট কি বৃহৎ, কি বিশাল, কত লোকের মিছিল নিয়ে তার নাড়াচাড়া আনাগোনা। অথচ এমন নিপুণভাবে সাজানো যে, কেউ কারো ঘাড়ে পড়ছে না, যেন নানা রঙের পশমে বোনা একখানি সুন্দর কাশ্মীরী শাল, যার প্রতি সূতা সমগ্রের নক্সাটি ফুটিয়ে তুলছে। আমি অনেক সময় বলি যে, কলকাতা শহর একাই সমস্ত ভারতবর্ষের একটি সংক্ষিপ্তসার, তাতে সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের নমুনাই দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি এই বইখানিও যেন সেকালের কলকাতার একটি বিশেষ সময়ের বৃহদায়তন ছবি—যখন পুরাকালের সনাতন হিন্দু সমাজের উপর য়ুরোপীয় সাহিত্য, সমাজ ও ভাবধারার প্রভাবের ঝাপটা এসে পড়ে, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সব কিছুকেই বিপর্যস্ত করে তুলতে আরম্ভ করেছে।

দেশ, কাল ও পাত্র—এই তিন নিয়েই তো ইতিহাস ও ভূগোল। এখানে সমস্ত কলকাতাটাই দেশ। তার গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে বাড়বাড়ন্ত অবস্থা পর্যন্ত এমন ধারাবাহিক ইতিহাস ভিতরে দেওয়া আছে যে ছাত্ররা পড়ে পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে পারে। সেই কিপ্‌লিং-এর কবিতাটুকুর পুনর্দর্শন পেয়ে কি সুন্দর লাগে, যেন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখা হওয়া। Chance-directed, chance-erected। কিপলিং খুব বড় কবি না হতে পারেন, কিন্তু শব্দচয়ন যুৎসই হয়েছে। তাঁর "If" কবিতাটি কি একালের কেউ পড়েছে? আমার বড় ভগ্নীপতি শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আমাকে কতকাল আগে পড়তে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখনো মস্তিষ্কের ও বাক্সের কোণ খুঁজলে তার দু'চার ছত্র হাতড়ে পাওয়া যেতে পারে। অতি প্রতিভাবান কবির পক্ষে নিজেদের প্রায় সমকক্ষ একজনের কবিতা-ঝুমঝুমি বাজাতে মন্দ লাগে না, ভাল থিয়েটারের মানসিক দ্বন্দ্বের পর সার্কাসের শারীরিক কসরৎ দেখে যেমন মুখ বদলায়।

কলকাতার ইঁটপাটকেল রেখাচিত্রের পরে আসে শহরবাসীর রক্তেমাংসে গড়া তৎকালীন সমাজের ছবি। কেউ কেউ বলেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বই থেকে অনেক অংশ নকল করা হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন এই এক জন্মের মধ্যে ত্রিকালজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়, তখন সেকালের লোকের বই পড়া ছাড়া সেকাল সম্বন্ধে ধারণা আর কি উপায়ে করা যেতে পারে বল? বরং লেখককে বাহাদুরি দিতে হয় যে অতগুলি বই পড়ে, তার সারমর্ম আত্মসাৎ করে এত বিভিন্ন সমাজ, সামাজিক আন্দোলন ও বিচিত্র ঘটনা এবং ব্যক্তি-পরম্পরার একটা পরিচ্ছন্ন চলচ্চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। যার মধ্যে থেকে পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ স্বামী, ভগ্নী নিবেদিতা, অনুশীলন সমিতি ও গুপ্তহত্যা এবং সন্ত্রাসবাদ কোনটাই বাদ পড়েনি। কত বড় মাথা, কত দরদী হৃদয়, কত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং কত সিদ্ধ হস্তের সমাবেশে এই মনিকাঞ্চন যোগ হতে পারে তাই ভাবি। দেশটা তাহলে কলকাতা, কালটা ধরো অনুমান ১৮৫০-১৯২০। তারপরে পাত্র। সেইটেই আসল। কারণ যতই বল—সবার উপরে মানুষ সত্য। এই বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌পটের উপর নায়কের জীবনের আলেখ্য আঁকা। নায়কের এবং তার অন্তরঙ্গ গুটিকয়েক মানুষের।

জড় জগতের চেয়ে এই জীব জগতের ছবি আঁকতেই লেখকের বেশি কৃতিত্ব দেখতে পাই। যদি শুধু কল্পনাচক্ষেই তাদের দেখে থাকেন, তবে এমন বাস্তবের রূপ তাদের দিলেন কি করে, যাতে পাঠকেরও মনে হয় যেন তাদের চোখে দেখছেন, কানে শুনছেন, মনে জানছেন? যদি ঐ

বনমালী সরকার লেনের বড় বাড়িতে বাস না করে থাকেন, তবে তাঁর প্রতিনিধি ভূতনাথ কেমন করে তার প্রত্যেক অলিগুলির মায় সিঁড়ির তলায় কবরের খবর পর্যন্ত জানে? প্রতি দিনে রাতে একই জিনিস এবং একই সময় প্রত্যেক চাকর মনিবকে একই কর্মে (বা দুষ্কর্মে!) রত দেখে? যদি দাসু মেথর বলে কেউ না-ই থাকবে তবে সব কাজে তার ছেলেরা এসে দাঁড়াবে কেন, এবং দূর থেকে বাঁশি বাজাবে কেন?—যদি ছোট বউয়ের ঘরে সে না-ই গিয়ে থাকে—যে বংশের বধূরা এমন সুন্দরী এবং এমন সুরক্ষিতা—তবে কেমন করে সে আলমারীর প্রত্যেক পুতুলের এবং খাট বিছানার এমন খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে পারে ; কেমন করে সে জানে ছোট বউয়ের আলতা-ঘেরা পায়ের আঙ্গুলগুলি টোপাকুলের মত টুসটুসে। যা দেখে আর এক কবি বলেছেন।—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।।"

আর কত বলব? কর্তাবাবুদের নামেরই বা কি বাহার—বৈদূর্যমণি, হিরণ্যমণি, কৌস্তুভমণি। যেন নামের মধ্যে থেকেই আভিজাত্যের হীরকদ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাইরে চিকণ-চাকণ, ভিতরে খ্যাড়। এক এক সময় মনে হয় Salvation Army থেকে লেখকের স্বর্ণপদক পাওয়া উচিত—অমিত মদ্যপানের ভয়াবহ পরিণাম চিত্রণের সাফল্যের জন্য।

মণিদের ঠাকুরদাদার নাম ছিল নাকি ভূমিপতি, কিন্তু বাবার নাম সূর্যমণি ঠিক আছে। তবে এই বংশের ধারা শেষ হয়েছে চূড়ামণিতে—যিনি কালো চাপকান পরে রোজ আদালতে যান, আর ফেরার পথে বউবাজারের ট্রামে বসে বড়বাড়ি দেখতে দেখতে সেকালের কথা মনে মনে আলোচনা করেন। সেই স্বর্ণ মন্দিরের চূড়া ধূলায় ধূলিসাৎ হয়েছে। হায় হায়! কোথায় সেই মেজকাকীর পুতুলের বিয়েতে ফ্রান্স থেকে গয়না আসা, কোথায় ছোটবাবুর দুধের মত সাদা জুড়ি ঘোড়া, ব্রিজ সিংয়ের "হুঁশিয়ার হো" হাঁকে টগবগ করতে করতে ফটকের বাইরে সন্ধ্যায় বেরিয়ে যাওয়া আর ভোরে বাড়ি ফেরা, কোথায় হাটখোলার ছেনি দত্তের সঙ্গে মেজবাবুর পায়রা ওড়ানোর খেলা আর কোথায় নিচের বৈঠকখানা ঘরে নিজের গানের মেলা—"চামেলি ফুলি চম্পার" সঙ্গে ভূতনাথের তবলার ঠেকা এবং মাঝে মাঝে পর্দার আড়ালে গিয়ে মুখ পুঁছে ফিরে আসা। ঐ করেই তো সব গেল—জুড়িগাড়ি, বড়গাড়ি, বউদের গয়নাগাঁটি, সুখচরের জমিদারী, চাকরবাকর সব। নিজের বিয়েতেই শেষ জাঁকজমক। তারপর থেকেই তো শ্বশুরের আধিপত্য, বাড়ি বন্ধক রেখে কয়লার খনি কেনা ও ফেল মারা, স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন। কেবল রইল বংশী, আর তার বোন চিন্তা, আগে বলেছি তিনতলার নিচ থেকে ফল্গুনদীর মত পাপের স্রোত বয়ে চলেছে। কিন্তু তার মধ্যে বংশীর প্রভুভক্তি পাঁকে পদ্মের মত ফুটে রয়েছে। একবার ছোটবাবু এত শীঘ্র ফিরবেন না জেনে সে ঠিক সময়ে তাঁকে নামাবার জন্য গাড়ির কাছে যেতে পারেনি বলে তিনি কোচমানের কাছ থেকে শঙ্কর মাছের চাবুক চেয়ে নিয়ে তাকে শপাশপ মেরে ক্ষতবিক্ষত করে তোলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে কেমন সহজে মেনে নিলে যে তার দোষের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে এবং তারপর থেকে ছোটবাবু সেই যে শয্যা নিলেন, সকল সময় কি সরলভাবে তাঁর কুশল প্রশ্ন এবং আন্তরিকভাবে তাঁর সেবাযত্ন করেছে, যতদিন না হিমকলেবর ছুঁয়ে বুঝতে পারলে যে তিনি সকল সেবার অতীত হয়ে গেছেন। আর একটিমাত্র বোন চিন্তার জন্য কত ভাবনা, তার ম্যালেরিয়া জ্বর সারাবার জন্য কত চিকিৎসা পথ্য। অবশ্য খরচটা সব ছোট বউমার কিন্তু যত্নটা তো তার। চিন্তার নামে ভূতনাথের কাছে নালিশও কি স্নেহের সঙ্গে করত। না, বংশীটা এ অমানুষের দলের মধ্যে একটা মানুষের মত মানুষ, তা স্বীকার করতেই হবে। আর ছোট বউমা? একদিকে যেমন বংশীর ঐ প্রভুর প্রতি প্রভুভক্তি, অপরদিকে তেমনি তার ঐ পতির প্রতি প্রভুভক্তি। তিনি অর্ধেক কেঁদে প্রথম আলাপেই ভূতনাথকে বলেছিলেন—এ এক অবাক দেশ ভাই—আজব দেশ—আজব দেশ। স্বামী যেমনই হোক না কেন, তাকে সেবা করাই স্ত্রীলোকের পরমধর্ম, জন্ম জন্ম যেন ঐ স্বামীই পায় বলে কি কষ্টই না সে করতে প্রস্তুত। স্বামীর পাদোদক এনে না দিলে ছোট বউমার উপোস ভাঙা হবে না, তা সে সারাদিন দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকুক, আর স্বামী যে

অবস্থায় যেখানেই পড়ে থাকুক, বা লাথি মেরে জলের বাটিই উল্টে ফেলুক। যে গুণী বংশী তাই সে অবস্থায়ও পাদোদক পাওয়া যায়। শুধু ছোট বউমাই বা কেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসের গঙ্গোত্রী থেকে যে প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীকুলের মিছিল চোখের সামনে দিয়ে নেমে চলে আসছেন—সেই গান্ধারী, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, সীতা, সতী, পার্বতী, বেহুলা থেকে আরম্ভ করে লক্ষহীরা পর্যন্ত—কে না স্বামীর জন্য অসাধ্য সাধন করেছেন, এবং কার স্বামী না তাকে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন? বেহুলা যখন ছ'মাস ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি কি করে তোমাকে ঘরে নেব! কিমাশ্চর্যমাতঃপরম্। সাধে কি বলি যে অবাক দেশ! আশেপাশে অনেক সময় ছেলেপিলের বাড়িতে যে শুনি, "এক চড় মারব"—ইচ্ছে করে সেই কথাটা কাজে প্রয়োগ করতে। আরে বাপু, তোর হাঁটুর হাড়টা বোয়াল মাছের পেটের ভিতর থেকে বের না করলে তুই থাকতিস কোথায়? আর রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনার্থে গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত এমন দগ্ধালেন যে সে শেষে "হে ধরণী দ্বিধা হও" বলে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে আদর্শ স্বামীর হাত থেকে রক্ষা পেলে।

জানি না একালের ছেলেরা দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত শিল্পী রাজা রবি বর্মার আঁকা ছবি দেখেছে কিনা। আমাদের ছেলেবেলায় বোম্বাই অঞ্চলে তাঁর খুব নাম ও চল ছিল। অনেকগুলি পৌরাণিক ছবির মধ্যে একটা ছিল সীতার পাতাল প্রবেশ। সিংহাসন করে ধরণী জননী যখন সীতাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখন গহ্বরের ধারে বসে রামচন্দ্রের হতভম্ব মুখের ভাব শিল্পী মন্দ ফুটিয়ে তোলেননি। স্ত্রীলোকেরও যে সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে, সেটা বোধ হয় তা এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হল। কুছ পরোয় নেই সোনার সীতা আছে। আমি রবি বর্মার মূল ছবির অনেকগুলি ফোটো এনে কলাভবনে দান করেছিলুম ; এখনো বোধ হয় সেখানেই রক্ষিত রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ছোট বউ তো নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ—লজ্জাসরম—সব স্বামীর জন্য বিসর্জন দিলে, তার বদলে কি পেলে, তা সে-ই জানে। সবশেষে লাভ হল রাস্তার মাঝখানে গুণ্ডাদের হাতে অপমানিত হয়ে অপঘাত মৃত্যু! জানি না তখন তার মান-অপমান জ্ঞান কিছু অবশিষ্ট ছিল কিনা। আর কে তাঁর বিচারক হয়ে ঐ গুণ্ডা লেলিয়ে দিলেন? না তাঁর মেজ ভাসুর। যিনি বরানগরের বাগানে লীলা খেলাচ্ছলে গোপিনীদের বস্ত্রহরণ অভিনয় করেন। কিন্তু বাবুরা যা খুশি করুন, বিবিদের ঠিক থাকা চাই। এই হচ্ছে আবহমান কাল বাঙলা দেশের সামাজিক আদবকায়দা কানুন। তাই ত একালের ইংরেজী শিক্ষিত ভারতললনা অগত্যা নিখিল ভারত নারী সম্মেলনে সমবেত হয়ে পুরুষদের সঙ্গে সাম্য স্বাধীনতা দাবী করছে। মুসলমান নারীকুলও শারিয়াতের বিধিলিপি সত্ত্বেও অন্তঃপুরে চৌঘুড়ি হাঁকানো পছন্দ করতেন না। ইংরাজী শিক্ষাই হয়েছে কাল। যবনিকা পতনের পূর্ব দৃশ্যে কবরের ভিতর এক অপরিচিত কঙ্কাল, তার গায়ে গোটের একটু সোনাদানা চিকচিক করছে।

আবার ঘুরে ফিরে শেষ না বলে থাকতে পারছিনে যে, লেখকের বাহাদুরি আছে। কত তান বিস্তার করে দুন চৌদুন করে আবার ঠিক সমে এনে ফেলেছেন। কিংবা বিলাতী অর্কেস্ট্রার উপমা দিতে গেলে বলা যায় যে কতরকম যন্ত্র কতরকম বিভিন্ন সুরতালে বেজে যাচ্ছে, অথচ তাঁর বেটনের ইঙ্গিতে এক অখণ্ড সঙ্গীতে পরিণত হয়ে শ্রোতার কানে অমৃত বর্ষণ করছে। বহু পরে যে ঘটনা ঘটবে, তার জন্য কেমন আগে থাকতে মনকে প্রস্তুত করতে হয়। যেমন পরে যে-গুণ্ডার হাতে মার খাবে, সে রকম চোরাই লোককে ভূতনাথ কতদিন থেকে দেখতে পেয়েছে অলিগলিতে গোপনে তাকে অনুসরণ করছে। আর যেদিন জানবাজারে খুনোখুনি হবার দরুণ ছোটবাবু অসময়ে দৈবাৎ বাড়ি ফিরলেন, সেদিন কি সামান্য সূত্রে ছোটবউ আর ভূতনাথও বিস্মৃত পান-সুপুরীর তল্লাস করতে ঠিক সেই সময়ে বরানগর যাবার পথ থেকে ফিরে এলেন। সামান্য হলেও কি সুন্দর, কি স্বাভাবিক, সর্বোপরি কি সত্য। একজন পাঠক আমাকে বলেছিলেন যে, অত বড় লেখকের পক্ষে জবার সঙ্গে ভূতনাথের কলকাতায় মিলন সংঘটন করাটা লিপিকুশলতার দিক থেকে ভাল হয়নি—যেন জোর করে টেনে বুনে গল্পের খেই মেলানো। কিন্তু পূর্বেই বলেছি কলকাতাটা যেন এক পৃথিবী বিশেষ, তার মধ্যে যে কোন দু'জন লোকের পরস্পরের সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হওয়া এমন কিছু বিচিত্র

নয়। আর তার জন্য যে পূর্ব কাহিনীটুকু উদ্ধার করেছেন, সেটি কি মিষ্টি, কি অপ্রত্যাশিত, কি সম্পূর্ণ অভিনব। তার জন্যই সাতখুন মাপ হওয়া উচিত। ভেবে দেখো, একটি নবীন সুকোমল কাঁচা কচি দুমাসের খুকি হাত-পা ছুঁড়ছে পিঁড়েয় শুয়ে, আর আত্মীয়-স্বজন পুরোহিত চারিদিকে ঘিরে বসে গম্ভীরভাবে একটু অপেক্ষাকৃত বড় মাতব্বর খোকার সঙ্গে মন্ত্র পড়ে তার বিয়ে দিচ্ছেন—যে শুভ বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রমতে জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী। ধ্রুবতারার মত স্থায়ী এবং অবিনশ্বর। যদিও ভূতনাথ একটি মাত্র মিথ্যা কথার ফুৎকারে সে পুণ্য অনুষ্ঠানকে উড়িয়ে দিয়েছিল। তবে পরজন্মে যাই হোক, ইহজন্মেই নিশ্চয় এই পাপের জন্য তাকে পুন্নাম নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। সাধে কি বলি আজব দেশ! এরকম ঘটনা মাত্র এ দেশেই সম্ভব। যাকে ওস্তাদি ভাষায় বলে—তুমহারি কাম।

এরপর আর কি বলার আছে? এক "আমার কথাটি ফুরাল" ছাড়া? কেউ কেউ বলে ভূতনাথ নাকি এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু থাকলেও তাকে বইয়ের পাতা থেকে টেন বের করে এই বুড়ো বয়সে ভূত দেখে পিলে চমকাতে চাইনে। থাকুক সে 'সাহেব বিবি গোলামের' লেখকের উর্বর মাথায়, আর তাঁর অগণ্য পাঠকের মনের খাতায়, অন্যান্য অসংখ্য অমন নায়ক-নায়িকার চরিত্র চিত্রাবলীর সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে। শুনতে পাই 'সাহেব বিবি গোলামের' ফিল্মও নাকি ভাল হয়েছে। কপালে থাকে তো কোনদিন দেখব, ঠকব না আশা করি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার মনে হয়, এই বইয়ের জন্য লেখকের নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত, কিংবা তার অনুরূপ স্বদেশী কিছু।

শান্তিনিকেতন
১.৭.৫৬

পূর্বাভাস

ওদিকে বউবাজার স্ট্রীট আর এদিকে সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ। মাঝখানের সর্পিল গলিটা এতদিন দুটো বড় রাস্তার যোগসূত্র হিসেবে কাজ চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু আর বুঝি চললো না। বনমালী সরকার লেন বুঝি এবার বাতিল হয়ে গেল রাতারাতি। এতদিনকার গলি। ওই গলিরই পশ্চিমদিকে তখন বনমালী সরকারের পূর্বপুরুষ রাজত্ব করে গিয়েছিলেন সূতানুটী আর গোবিন্দপুরের সময় থেকে। কথায় ছিল, 'উমিচাঁদের দাড়ি আর বনমালী সরকারের বাড়ি'। দুটোরই বোধহয় ছিল সমান জাঁকজমক আর বাহার। সে-যুগে সদ্‌গোপ বনমালী সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে পাটনায় দেওয়ানী পেয়েছিলেন। আর কলকাতায় পেয়েছিলেন কোম্পানীর অধীনে ব্যবসা করবার অধিকার। সে-সব অনেক যুগ আগের কথা। সেকালের কুমোরটুলিতে তিনি লাটসাহেবের অনুকরণে এক বাড়ি করেন। তাঁর দেখাদেখি সেকালের আর এক বড়লোক মথুর সেন বাড়ি করেন নিমতলায়। কিন্তু বনমালী সরকারের বাড়ির কাছে সে-বাড়ির তুলনাই হতো না যেন। তারপর কোথায় গেল সেই কুমোরটুলির বাড়ি—কোথায় গেল বনমালী সরকার নিজে, আর কোথায় গেল মথুর সেন! সত্যিই তো ভাবলে অবাক হতে হয়। কোথায় গেল সেই আরমানী বণিকরা, যারা করতো সূতা আর নুটীর ব্যবসা! আর কোথায় গেল জব চার্নকের উত্তরাধিকারী ইংরেজরা—যারা কালিকট থেকে পর্তুগীজদের ভয়ে পালিয়ে এসে সূতানুটীতে আশ্রয় নিলে—আর পরে কালিকটের অনুকরণে সূতানুটীর নামকরণ করলে ক্যালকাটা। আজ শুধু কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজপত্রে পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে সূতানুটীকে খুঁজে বার করতে হয়। তবু যে বনমালী সরকার ওই এঁদোপড়া গলির মধ্যে এতদিন দম আটকে বেঁচেছিলেন তা কেবল কলকাতা কর্পোরেশনের গাফিলতির কল্যাণে। এবার তাও গেল। এবার গোবিন্দরাম, উমিচাঁদ, হুজরি মল, নকু ধর, জগৎ শেঠ আর মথুর সেনের সঙ্গে বনমালী সরকারও একেবারে ইতিহাসের পাতায় তলিয়ে গেল। আধখানা আগেই গিয়েছিল সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ তৈরির সময়ে, এবার বাকি আধখানাও শেষ।

ভার পড়েছে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ওপর। গলির মুখে ছিল হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালাদের মেটে টিনের দোতলা। হোলির এক মাস আগে থেকে খচ্‌মচ্‌ খচ্‌মচ্‌ শব্দে খঞ্জনী বাজিয়ে 'রামা হো' গান চলতো। তারপর সোজা পুব মুখো চলে যাও। খানিকদূর গিয়ে বাঁয়ে বেঁকে আবার ডাইনে বেঁকতে হবে। সদ্‌গোপ বনমালী সরকারের প্যাঁচোয়া বুদ্ধির মতো, তাঁর নামের গলিটাও বড় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মিশেছে গিয়ে বউবাজার স্ট্রীটে। গলিটাতে ঢুকে হঠাৎ মনে হবে বুঝি সামনের বাড়ির দেয়ালটা পর্যন্ত ওর দৈর্ঘ্য। কিন্তু বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে অনেক মজা মিলবে। নিচু নিচু বাড়িগুলোর রাস্তার ধারের ঘরগুলোতে জমজমাট দোকান-পত্তর। বাঁকের মুখে বেণী স্বর্ণকারের সোনা রূপোর দোকান। তারপর পাশের একতলা বাড়ির রোয়াকের ওপর 'ইণ্ডিয়া টেলারিং হল্‌'। কিছুদূর গিয়ে বাঁ হাতি তিন রঙা ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ আঁকা সাইনবোর্ড। প্রভাসবাবুর 'পবিত্র খদ্দর ভাণ্ডার'। তারপরেও আছে গুরুপদ দে'র 'স্বদেশী-বাজার'। যখন স্বদেশী জিনিস কিনতে খদ্দেরের ভিড় হয় তার জেরটা গিয়ে ঠেকে পাশের বাড়ির 'সবুজ-সংঘে'র দরজা পর্যন্ত। এক একদিন 'সবুজ সংঘ' হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে আলোতে আর জাঁকজমকে। একটা উপলক্ষ তাঁদের হলেই হলো। সেদিন পাড়ার লোকের ঘুমোবার কথা নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি 'সবুজ সংঘে'র জয় ঘোষণা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও ঘটনা ঘটে না। লোকে আপিসে যায় না, বাজার করে না, ঘুমোয় না, খায় না—শুধু সবুজ সংঘ আর সবুজ সংঘ। কিন্তু তারপরেই আছে জ্যোতিষার্ণব শ্রীমৎ অনন্ত ভট্টাচার্যের 'শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম' যেখানে এই কলিকালের ভেজালের যুগেও একটি খাঁটি নবগ্রহ কবচ মাত্র ১৩/১০য় পাওয়া যায়—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ—ত্রিকালদর্শী রাজজ্যোতিষীর প্রস্তুত বশীকরণ, বগলামুখী আর ধনদা কবচের প্রচার ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়,

সিঙ্গাপুরের মতো দূর-দূর দেশে। বনমালী সরকার লেন-এর 'শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম'-এর আরো গুণাবলী সাইনবোর্ডে লাল, নীল আর হলদে কালিতে সবিস্তারে লেখা আছে। তারপরের টিনের বাড়িটার সামনের চালার নিচে বাঞ্ছার তেলেভাজার দোকান। আশেপাশের চার-পাঁচটা পাড়ায় বাঞ্ছার তেলেভাজার নাম আছে। তিন পুরুষের দোকান। বাঞ্ছা এখন নেই। বাঞ্ছার ছেলে অধর। অধরের ছেলে অক্রুর এখন দোকানে বসে। অক্রুর কারিগর ভালো। বেসনটাকে মাটির গামলায় রেখে বাঁ হাতে একটু সোডা নিয়ে বেসনটা এমন ফেনিয়ে নেয় যে, কড়ার গরম তেলে ফেলে দিলে প্রকাণ্ড ফোস্কার মতো নিটোল হয়ে ফুলে ফুলে ওঠে বেগুনিগুলো। হাতকাটা কেলো এসে সকাল থেকে বসে থাকে। তখন ঝাঁপ খোলেনি অক্রুর। শীতকালের সকালবেলা চারদিকে গোল হয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেররা—আর অক্রুর ঝাঁঝরি খুন্তিটা দিয়ে বেগুনিগুলো ভেজে ভেজে তোলে চুবড়িতে। সময় সময় চুবড়িতে তোলবারও অবসর দেয় না কেউ। জিভ পুড়ে ফোস্কা পড়বার অবস্থা। তেমনি চলে দুপুর বারোটা পর্যন্ত। এমনি করে আরো হরেক রকমের দোকান বাঁদিকে রেখে বনমালী সরকার লেন এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়েছে বউবাজার স্ট্রীটে। দোকানপত্তর যা কিছু সব বাঁদিকে, কিন্তু অত বড় গলিটার ডানদিকটায় প্রায় সমস্তটা জুড়ে কেবল একখানা বাড়ি। নিচু নিচু ছোট ছোট পায়রার খোপের মতন ঘরগুলো। ভাড়াটের চাপাচাপিতে কালনেমির লঙ্কা ভাগের মতন আর তিল ধরাবার জায়গা নেই ওতে। লোকে বলতো 'বড়বাড়ি'। তা এদিককার মধ্যে সে-যুগে ও-পাড়ায় অতবড় বাড়ি আর ছিল কই! বালির পলেস্তারার ওপর রঙ চড়িয়ে চড়িয়ে যতদিন চালানো গিয়েছিল ততদিন চলেছে। তারপর রাস্তার দিকের চার-পাঁচখানা ঘর নিয়ে কংগ্রেসের 'ন্যাশন্যাল স্কুল' হয়েছিল ইদানীং। আর একটা ঘরে তাঁত বসেছিল অনেক আগে থাকতে। সমস্ত দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেটাঘড়িতে ঢং ঢং আওয়াজ হতো। টিফিনের সময় লেবেনচুষ আর জিভে-গজার ফেরিওয়ালারা ঠুন ঠুন করে বাজনা বাজিয়ে ছেলেদের আকর্ষণ করতো। কোনও দিন হয়তো এক ভাড়াটের ছোট বৈঠকখানার মধ্যে সন্ধ্যেবেলা গানের আসর বসে। তানপুরার একটানা শব্দের সঙ্গে বাঁয়া তবলায় কাহার্‌বা তালের রেলা চলেছে। 'পিয়া আওয়াত নেহি'র সঙ্গে মিঠে তবলার তেহাই পাড়া মাত করে দেয়। কোনও কোনদিন 'মিঞা কি মল্লারের' সঙ্গে মিষ্টি হাতের মধ্যমানের ঠেকায় আকৃষ্ট হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে রসিক লোকেরা। জানালা দিয়ে উঁকি মারে। এককালের মালিকরাই আজ ঘটনাক্রমে অবস্থার ফেরে ভাড়াটে হয়ে পড়েছে। তবু বড়বাড়ির ভেতরে ঢুকতে কারো সাহস হয় না। ছোট ফ্রকপরা একটা মেয়ে হয়তো টপ্‌ করে এক দৌড়ে অক্রুরের দোকান থেকে এক ঠোঙা তেলেভাজা কিনে আবার ঢুকে পড়ে কোঠরের মধ্যে। দোতলার ওপর থেকে হঠাৎ তরকারির খোসা ঝুপ করে পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়ে হয়তো কোনও লোকের মাথায়। লোকটা ওপর দিকে বেকুবের মতো চোখ তুলে চায়, কিন্তু কে কোথায়! এ-বাড়ির রান্নাঘর থেকে আসে কুচো চিংড়ি আর পেঁয়াজের ঠাট্টা আর হয়তো পাশের রান্নাঘর থেকেই আসছে মাংসে গরম-মশলার বিজয়ঘোষণা। একটা দরজার সামনে এসে থামলো ট্যাক্সি—মেয়েরা যাবে সিনেমায়। আবার হয়তো তখনই পাশের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি—মেয়েরা যাবে হাসপাতালের প্রসূতিসদনে। জন্ম-মৃত্যু-সঙ্গমের লীলাবিলাস কবে ষাট-সত্তর-আশী-একশ' বছর আগে এ-পাড়ায় বাড়িগুলোতে প্রথম শুরু হয়েছিল আভিজাত্যের খরস্রোতে, আজ এই ক'টি বছরের মধ্যে তা যেন বইতে শুরু করেছে নিতান্ত মধ্যবিত্ত খাতে।

হোক মধ্যবিত্ত! না থাক সেই সেকালের জুড়ি, চৌঘুড়ি, ল্যাণ্ডো, ল্যাণ্ডোলেট, ফিটন আর ব্রুহাম! নাই বা রইলো ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কি, তসর-কাপড় পরা ঝি, কিম্বা সোনালি-রুপালি কোমরবন্ধ্ পরা দারোয়ান, সরকার, হরকরা, চোব্‌দার, হুঁকোবরদার, আর খানসামা। নাই বা চড়লাম চল্লিশ দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী। ছিল চিংড়ি মাছ, পেঁয়াজ, পুঁইশাক, মাথার ওপর একটা ছাদ আর সূতিকা-রুগী বউ। এবার তাও যে গেল। এবারে দাঁড়াবো কোথায়?

নোটিশ দিয়েছে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যথাসময়ে।

জোর আলোচনা চলে বাঞ্ছার তেলেভাজার দোকানে। 'ইণ্ডিয়া টেলারিং হল্'-এ। গুরুপদ দে'র 'স্বদেশী বাজারে'র সামনে, প্রভাসবাবুর 'পবিত্র খদ্দর ভাণ্ডারে'র ভেতরে বাইরে। আর 'সবুজ সংঘে'র আড্ডায়। আরো আলোচনা চলে ত্রিকালদর্শী শ্রীমৎ অনন্তহরি ভট্টাচার্যের 'শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রমে'। জ্যোতিষার্ণব বলেন—আগামী মাসে কর্কট রাশিতে রাহুর প্রবেশ—বড় সমস্যার ব্যাপার—দেশের কপালে রাজ-রোষ। অনেক আলোচনা চলে বড়বাড়িতে। এর থেকে ভূমিকম্প ছিল ভালো। ছিল ১৭৩৮ সনের মতো আশ্বিনে ঝড়। যেবার চল্লিশ ফুট জল উঠেছিল গঙ্গাতে। তাও কি একবার! বড়বাড়িতে যারা বুড়ো, তারা জানে সে-সব দিনের কথা। তোমরা তখন জন্মাওনি ভাই। আর আমিই কি জন্মিয়েছি, না জন্মেছে আমার ঠাকুর্দা। এ কি আজকের দেশ? কত শতাব্দী আগের কথা। গঙ্গা তো তখন পদ্মায় গিয়ে মেশেনি। নদীয়া আর ত্রিবেণী হয়ে সাগরে গিয়ে মিশতো। ওই যে দেখছো চেতলার পাশ দিয়ে এক ফালি সরু নর্দমা, ওইটেই ছিল আদিগঙ্গা, ওকেই বলতো লোকে বুড়িগঙ্গা। তারপর যেদিন কুশী এসে মিশলো গঙ্গার সঙ্গে, স্রোত গেল সরে। ভগীরথের সেই গঙ্গাকে তোমরা বলো হুগলী নদী আর আমরা বলি ভাগীরথী। তখন হুগলীর নামই বা কে শুনেছে, আর কলকাতার নামই বা শুনেছে কে! প্লিনি সাহেবের আমল থেকে লোকে তো শুধু সপ্তগ্রামের পাশের নদীকেই বলতো দেবী সুরেশ্বরী গঙ্গে! তারপর উত্থান আর পতনের অমোঘ নিয়মে যেদিন সাতগাঁর পতন হলো, উঠলো হুগলী, সেদিন পর্তুগীজদের কল্যাণে ভাগবীরথ হলো গিয়ে হুগলী নদী।

গল্প বলতে বলতে বুড়োরা হাঁপায়। বলে—পড়োনি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য়—

> 'আজব শহর কলকাতা,
> রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
> হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারী ঐক্যতা,
> যত বক-বিড়ালী ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা—'

চূড়ামণি চৌধুরী আলিপুরের উকীল। বলেন—আরে কিপলিং সাহেবই তো লিখে গিয়েছে—

> **Thus from the midday halt of Charnock**
> **Grew a city.....**
> **Chance-directed chance-erected laid and**
> **Built**
> **On the silt**
> **Palace, byre, hovel, poverty and pride**
> **Side by side....**

বড়বাড়ির নতুন মালিকরা সেই সব দিনের কাহিনী জানে না। গড়গড়ায় তামাক খেতো নাকি ওয়ারেন হেস্টিংস আমাদের মতন। বড় বড় লোকদের নেমন্তন্নের চিঠিতে লেখা থাকতো 'মহাশয় অনুগ্রহ করে আপনার হুঁকোবরদারকে ছাড়া আর কোনও চাকর সঙ্গে আনবার প্রয়োজন নেই।' আর সেই জব চার্নক। বৈঠকখানার মস্ত বড় বটগাছটার নিচে বসে হুঁকো খেতো, আড্ডা জমাতো এবং সন্ধ্যে হলেই চোর-ডাকাতের ভয়ে চলে যেতো ব্যারাকপুরে। বিয়েই করে ফেললে এক বামুনের মেয়েকে। ডিহি কলকাতা, গোবিন্দপুর আর সুতানুটীতে বাস করবার জন্যে নেমন্তন্ন করে বসলো সকলকে। একদিন এল পর্তুগীজরা। এখন তাদের দেখতে পাবে মুরগীহাটাতে। আধা-ইংরেজ, আধা-পর্তুগীজ। নাম দিয়েছিল ফিরিঙ্গী। ওরাই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগের কেরানী। তারাই শেষে হলো ইংরেজদের চাপরাশী, খানসামা আর ওদের মেয়েরা হলো মেমসাহেবদের আয়া। আর এল আরমানীরা। তাদের কেউ কেউ খোরাসান, কান্দাহার, আর কাবুল হয়ে দিল্লী এসেছিল। কেউ এসেছিল গুজরাট, সুরাট, বেনারস, বেহার হয়ে। তারপর চুঁচুড়াতে থাকলো কতকাল। শেষে এল কলকাতায়। ওদের সঙ্গে এল গ্রীক, এল ইহুদী, এল হিন্দু-মুসলমান—সবাই।

এমনি করে প্রতিষ্ঠা হলো কলকাতার। সে-সব ১৬৯০ সালের কথা।

পাঠান আর মোগল আমল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। লোকে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলে ইন্দ্রপ্রস্থ আর দিল্লী কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। তার বদলে এখানে এই সুন্দরবনের জলো হাওয়ার মাটিতে গজিয়ে উঠেছে আর এক আরব্য উপন্যাস। ভেল্কি বাজি যেন। কলকাতার একটি কথায় রাজ্য ওঠে, রাজ্য পড়ে। জীবনে উন্নতি করতে গেলে এখানে আসতে হয়। রোগে ভুগতে গেলে এখানে আসতে হয়। পাপে ডুবতে গেলে এখানে আসতে হয়। মহারাজা হতে চাইলে এখানে আসতে হয়। ভিখিরী হতে চাইলে এখানে আসতে হয়। তাই এলেন রায় রায়ান রাজবল্লভ বাহাদুর সুতানুটীতে। মহারাজ নন্দকুমারের ছেলে রায় রায়ান রাজা গুরুদাস এলেন। এলেন দেওয়ান রামচরণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর দেওয়ান কান্তবাবু, এলেন হুইলারের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর, এলেন কলকাতার দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র, উর্মিচাঁদ—

আর এলেন বনমালী সরকার। এই যাঁর নামের রাস্তায় বসে তোমাদের গল্প বলছি—

চূড়ামণি চৌধুরীর মক্কেল হয় না। কালো কোটটার ওপর অনেক কালি পড়েছে। সময়ের আর বয়সের। হাতে কালি লেগে গেলেই কালো কোটে মুছে ফেলেন। বাইরে থেকে বে-মালুম। কোর্টে যান। আর পূর্বপুরুষের পোকায় কাটা পুরনো বইগুলো ঘাঁটেন। তোমরা তো মহা আরামে আছো ভাই। খাচ্ছ, দাচ্ছ, সিনেমায় যাচ্ছ। সেকালে সাহস ছিল কারো মাথা উঁচু করে চৌরঙ্গীর রাস্তায় হাঁটবার? বুটের ঠোক্কর খেয়ে বেঁচে যদি যাও তো বাপের ভাগ্যি। সেকালে দেখেছি সাহেব যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। হাতে বেতের ছড়ি। দু'পাশের নেটিভদের মারতে মারতে চলেছে। যেন সব ছাগল, গরু, ভেড়া। আর গোরা দেখলে আমরা তো সাতাশ হাত দূরে পালিয়ে গিয়েছি। ওদের তো আর বিচার নেই। আর নেটিভরাও মানুষ নয় তা বলে। রেলের থার্ড ক্লাশে পাইখানা ছিল না ভাই। নাগপুর থেকে আসানসোল এসেছি—পেট টিপে ধরে। কিচ্ছু খাইনি—জল পর্যন্ত নয়—পাছে...

তা হোক, তবু ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নোটিশ দিতে বাধা নেই। বড়বাড়ির ছোট ছোট মালিকরা নোটিশ নিয়ে সই দিলেন।

নোটিশের পেছন পেছন এল চেন, কম্পাস, শাবল, ছেনি, হাতুড়ি, কোদাল, গাঁইতি, ডিনামাইট—লোকলস্কর, কুলিকাবারি। আর এল ভূতনাথ। ওভারসিয়ার ভূতনাথ। ভূতনাথ চক্রবর্তী। নিবাস—নদীয়া। গ্রাম—ফতেপুর, পোস্ট আপিস—গাজনা।

দুপুরবেলা ধুলোর পাহাড় ওড়ে। টিনের চালাগুলো ভাঙতে সময় লাগবার কথা নয়। এদিকে ভুজাওয়ালাদের টিনের দোতলা বাড়িটা থেকে শুরু করে 'সবুজ সংঘে'র ঘরটা পর্যন্ত ভাঙা হয়ে গিয়েছে। শীতকাল। দল বেঁধে কুলির দল লম্বা দড়ির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সুর করে চিৎকার করে—

—সামাল জোয়ান—

—হেঁইও—

—সাবাস জোয়ান—

—হেঁইও—

—পুরী গরম—

—হেঁইও—

গরম পুরী ওরা খায় না কিন্তু। দুপুরবেলা এক ঘণ্টা খাবার সময়। সেই সময় ছাতু কাঁচালঙ্কা আর ভেলীগুড় পেটের ভেতর পোরে। বউবাজার স্ট্রীটের ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ এখানে ক্ষীণ হয়ে আসে—আর এদিকে সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউতে তখন দুপুরের ক্লান্তি নেমেছে। মাঝখানে 'শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম'-এর অশত্থ গাছটার তলায় একটু গড়িয়ে নেয় ওরা। বনমালী সরকার লেন-এর সর্পিল গতি সরল হয়ে গিয়েছে। ভাঙা বাড়ির সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে বেহারী কুলিরা জানতেও পারে না—কোন্ শাবলের আঘাতে জীবনের কোন্ পর্দার কোন্ সুর মূর্ছিত হয়ে

উঠলো। এক একটা ইট নয় তো যেন এক একটা কঙ্কাল। ইতিহাসের এক একটা পাতা ভাঙা ইটের সঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়—আর তারপর উত্তরে হাওয়ায় আকাশে উঠে লাল করে দেয়।

চূড়ামণি চৌধুরী কোর্ট-ফেরত বাড়ি যেতে যেতে তখন ফিরে চেয়ে দেখেন। মনে হয় আকাশটা যেন লাল হয়ে গিয়েছে। আশে পাশে ট্রামে লোক বসে আছে—মুখে কিছু বলেন না। বাড়িতে এসে ইতিহাসটা খুলে বসেন। কোথায়, কবে নবাব সিরাজদ্দৌলা শহর পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। আবার দেখতে দেখতে নতুন করে গড়ে উঠলো কলকাতা। পোড়া কলকাতা যেন আজ আবার পুড়ছে—নতুন করে গড়ে ওঠবার জন্যে। ভালোই হলো। বহু বিষ জমে উঠেছিল ওখানে। খোলা হাওয়া ঢুকতো না ঘরগুলোতে। পুরুষানুক্রমে বড়বাড়ির অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে সরিকের সঙ্গে সরিকের আর পাশাপাশি বাস করা চলতো না। বড়কর্তাদের সে-আমলের একটা রূপোর বাসন নিয়ে মামলা হয়ে গেল সেদিন। তবু আজকালকার ছেলেরা সে-সব দিন তো দেখেনি। চূড়ামণি চৌধুরীও তখন খুব ছোট। মেজ-কাকীমা'র পুতুলের বিয়েতে মুক্তোর গয়না এসেছিল ফ্রান্স থেকে। আর মেজকর্তার পায়রা নিয়ে মোকর্দমা লাগলো ঠন্‌ঠনের দত্তদের সঙ্গে। সে কী মামলা! সে মামলা চললো তিন বছর ধরে। কজ্জনবাঈ সেকালের অত বড় বাঈজী। গান গাইতে এসেছিল দোলের দিন। ধর্মদাসবাবু ডুগি-তবলা বাজিয়েছিলেন। বড়দের দোলের উৎসবে ছোটদের ঢোকবার অধিকার ছিল না তখন। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেন দপ্তরখানার ভেতর-দরজার ফাঁক দিয়ে। সে কী নাচ। সেই কজ্জনবাঈ এসেছিল আর একবার দশ বছর পরে। তখন সে চেহারা আর নেই। মেজ-কাকীর কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে গেল। অনেক বলা-কওয়াতে একটা গান গাইলে। সে গানটা সে দশ বছর আগে একবার গেয়েছিল।

বাজু বন্ধ্ খুলু খুলু যায়—

ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো বড় মিঠে লেগেছিল সেদিন। বুড়ীর গলায় যেন তখনও যাদু মেশানো। ঠুংরীতে ওস্তাদ ছিল কজ্জনবাঈ। আজকালকার ছেলেরা শোনেনি সে সব গান।

কোর্টে আসা-যাওয়ার পথে ট্রামের জানলা দিয়ে বাড়িখানা আর একবার দেখেন। এদিককার সব ভাঙা হয়ে গিয়েছে। বড়বাড়িটা এখনও ছোঁয়নি ওরা। এদিকটা শেষ করে ধরবে ওদিকটা। চূড়ামণি চৌধুরীর মনে হয় যেন এখনও কিছু বাকি আছে। চোখ বুজলেই যেন দেখতে পান সব। পাল্কি এসে দাঁড়ালো দেউড়িতে। মেজ-কাকীমার পেয়ারের ঝি গিরি এসে দাঁড়িয়েছে তসরের থান পরে। সদর গেটে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে ব্রিজ সিং। হটো সব, হটো সব। পাল্কি বেরুচ্ছে। বড় ছোট সব যোগে মেজ-কাকীমা'র গঙ্গাস্নান চাই। তারপরেই মনে হয় ভালোই হয়েছে। সেই বড়বাড়িতে একটা চাকরও রইলো না তোষাখানাতে। মধুসূদন ছিল বড়কর্তার খাস চাকর। চাকরদের সর্দার। সে-ও একদিন দেশে গেল পুজোর সময়, আর ফিরলো না।

যখন চোখ খোলেন চূড়ামণি চৌধুরী, তখন ট্রাম হাতীবাগানের কাছ দিয়ে হু-হু করে চলেছে। পাতলা হয়ে গিয়েছে ভিড়। কালো কোটের পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন আর ভাবেন, বাড়িতে গিয়েই কটন সায়েবের হিস্ট্রিটা পড়তে হবে। আর বাস্টীডের বইটা। সার ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে ম্যাডাম গ্র্যাণ্ডের প্রণয়কাহিনী। কী রাজত্বই করে গিয়েছে বেটারা। সাত সমুদ্র থেকে জব চার্নক আর ছ'জন সহকারী আর সঙ্গে মাত্র তিরিশজন সৈন্য। আকবর বাদশা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি এত বড় সাম্রাজ্যের কথা।

বেহারী মজুররা পেতলের থালা ধুয়ে মুছে আবার ইট ভাঙতে শুরু করে। দুম-দাম করে পড়ে ইট। চুন-সুরকীর গুঁড়ো আকাশে উড়ে চলে। চোখ-মুখ ধুলোয় ধুলো হয়ে যায়। তবু ঠিকেদারের লোক হুঁশিয়ার নজর রাখে। কাজে কেউ ফাঁকি দেবে না। সায়েব কোম্পানী শহর বানিয়েছে, রাস্তা বানিয়েছে। বড় বড় তালাও কেটেছে। জলের কল বসিয়েছে। মাথায় বিজলী বাতি আর পাখা দিয়েছে। সব দিয়েছে সায়েব কোম্পানী।

বনমালী সরকারের গলি ভেঙে দেশের কোনও ভালো করবে নিশ্চয়ই সায়েবরা। কে জানে!

—সেলাম হুজুর—বলে সরে দাঁড়ালো বৈজু।

—সেলাম হুজুর—গাঁইতি থামিয়ে দুখমোচনও সেলাম জানায়। দু'পাশে পদে পদে সেলাম নিতে নিতে চলতে লাগলো ভূতনাথ। ভূতনাথ চক্রবর্তী। একবারে সোজা এসে দাঁড়ালো বড় বাড়ির সামনের সদর গেটে।

কুলির সর্দার চরিত্র মণ্ডল সামনে এসে নিচু হয়ে সেলাম করলে।

এতক্ষণে ভূতনাথও মাথা নোয়ালো। বললে—দাগ শেষ করেছো চরিত্র?

চরিত্র মণ্ডল মাথা নাড়লে—আজ বড় দাগ দিতে হবে হুজুর, কাল আরো চল্লিশজন কুলি লাগাচ্ছি, এদিকটা তো দিলাম শেষ করে, সন্ধ্যে নাগাদ সব সমান করে তবেই কুলিরা ছুটি পাবে হুজুর।

ভূতনাথ চারদিকটা চেয়ে দেখলে একবার। অনেকদিন আগেই সব বিলুপ্তপ্রায় হতে চলেছিল। এবার যেটুকু আছে, তা-ও নিঃশেষ করে দিতে হবে। কোথায় বুঝি কোন অভিশাপ কবে এ-বংশের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছিল শনির মতো নিঃশব্দে, আজ তা নিশ্চিহ্ন হলো।

চরিত্র মণ্ডল আবার কথা বললে—কাল তা হলে ওই দাগটা ধরবো তো হুজুর?

একদিন এই বাড়ির আশ্রয়ে এসেই নিজেকে ধন্য মনে করেছিল ভূতনাথ। সারা কলকাতায় সেদিন এই বাড়ি আর এই বাড়িরই আর একজন মানুষকে কেবল নিজের বলে মনে হয়েছিল। অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!

চরিত্র মণ্ডল আবার বললে—কাল তা হলে কোথায় হাত লাগাবো হুজুর?

হঠাৎ ভূতনাথ বললে—না না, মদ টদ আমি খাইনে—

বলেই চমকে উঠেছে। চরিত্র মণ্ডলও কম চমকায়নি। ওভারসিয়ারবাবুর দিকে হঠাৎ ভালো করে তাকিয়ে দেখলে সে।

কিন্তু এক নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়েছে ভূতনাথ। এরই মধ্যে কি তার ভীমরতি ধরলো নাকি? সামলে নিয়ে ভূতনাথ বললে—কী বলছিলে যেন চরিত্র?

—আজ্ঞে দাগের কথা বলছিলাম, বলছিলাম এদিকটা তো শেষ করে দিলাম, কাল কোত্থেকে শুরু করবো তাহলে হুজুর?

ঈশ্বরের কী অভিপ্রায় কে জানে! যদি সেই অভিপ্রায়ই হয়, সে তো বড় নিষ্ঠুর কিন্তু। একদা নিজের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থলকে নিজের হাতেই আবার একদিন ভাঙবার আদেশ দিতে হবে, কে জানতো! একদিন এই বড়বাড়িতে প্রবেশ করবার অনুমতির অভাবে এইখানে এই রাস্তার ওপর হাঁ করে পাঁচ ছ'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। ব্রিজ সিং ওইখানে লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ডান হাতে সঙ্গীন উঁচু-করা বন্দুক। আর বুকের ওপর মালার মতন বন্দুকের গুলীভরা বেল্ট। সেদিন এমন সাহস ছিল না যে, ওইখানে ব্রিজ সিং-এর সামনে দিয়ে ভেতরে যায় ভূতনাথ।

কোথায় সে গেট! কোথায়ই বা সে ব্রিজ সিং! ব্রিজ সিং ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচাতো—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—হো—

ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেট যখন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রাস্তায় বেরুতো, তখন সাড়া পড়ে যেতো এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়। কড়ির মতো সাদা জুড়ি ঘোড়া টগ্‌বগ্ করতে করতে গেট পেরিয়ে ছুটে আসতো রাস্তায়। আর রাস্তায় চলতে চলতে লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখতো ঘোড়া দুটোকে।

গাড়িটা যখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে, তখন ব্রিজ সিং আবার সেই আগেকার মতো কাঠের পুতুল সেজে সঙ্গীন খাড়া করে দাঁড়িয়ে থেমে থাকতো।

সে-সব অনেক দিনের কথা। তারপর কত শীত, কত বসন্ত এল। কত পরিবর্তন হলো কলকাতার। কত ভাঙা, কত গড়া। ভূতনাথের সব মনে পড়ে।

এখনও দাঁড়ালে যেন দেখা যাবে ব্রজরাখাল রোজকার মতন আপিস থেকে বাড়ি ফিরছে।

সেই গলাবন্ধ আলপাকার কোট। সামনে ধুতির কোঁচাটা উল্টে পেট-কোমরে গোঁজা। মুখে গালের ভেতর পান গোঁজা। হাতে পানের বোঁটায় চুন। রোগা লম্বা শক্ত সমর্থ মানুষটি।

ব্রজরাখাল বলতো—না, না, এ কাজটা ভালো করোনি ভূতনাথ, আমরা হলাম গিয়ে গোলাম—ওদের গোলাম—আর বাবুরা হলো সায়েব—সায়েব-বিবির সঙ্গে কি গোলামদের মেলে—কাজটা ভালো করোনি বড়কুটুম।

চরিত্র মণ্ডল সামনে এল আবার। বললে—তা হলে আজ আমরা আসি হুজুর।

তার মানে! ওভারসিয়ার ভূতনাথ চোখ ফিরিয়ে দেখলে চারদিকে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। শীতকালের বেলা দেখতে দেখত যায়। বললে—তা হলে ওই কথাই রইলো, এই দাগেই হাত দেবে কাল সকাল বেলা।

চরিত্র মণ্ডল সেলাম করে চলে গেল। সঙ্গে দু'চারজন যারা অবশিষ্ট ছিল সবাই সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এর দিকে পা বাড়ালো। একটা কুকুর হঠাৎ কোথা থেকে ভূতনাথের পায়ের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। ধুলোয় ধুলো সারা গা। সমস্ত দুপুর বোধ হয় বসে বসে রোদ পুইয়েছে। এবার হয়তো ইটের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নেবে রাতটুকুর জন্যে। কেমন যেন মায়া হলো ভূতনাথের। যারা মালিক, যারা ভাড়াটে, তারা কবে নোটিশ পেয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। কিন্তু কুকুরটা বোধ হয় বাস্তুভিটের মায়া ছাড়তে পারছে না। ও-পাড়ায় গিয়ে, ওই হিঁদারাম বাঁড়ুয্যের গলিটা পর্যন্ত গেলেই চপ কাটলেটের এঁটো টুকরো খেয়ে আসতে পারে। বউবাজারের পাঁঠার দোকানের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেও দু'চারটে টেংরি মেলে। তবে কীসের মায়া ওর? বাস্তুভিটের? কুকুর একটা, তার আবার বাস্তুভিটে, তার আবার মায়া!

—দূর, দূর, দূর হ'—ভূতনাথ কুকুরটার দিকে একটা লাথি ছুঁড়লে।

মেজকর্তার অত সখের পায়রা সব। তা-ই বলে রইলো না একটা। এক-একটা পায়রা ময়ূরের মতন পেখম তুলে আছে তো তুলেই আছে। হাতে ধরলেও পেখম উঁচু করে ছড়িয়ে থাকতো। কী সব বাহার পায়রার! তা-ই বলে একটা রইলো না।

—দূর, দূর, দূর হ'—

ক্রমে অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে এল। দূরে বউবাজারের ট্রাম লাইন-এর ঘড় ঘড় আওয়াজ আরো কর্কশ হয়ে আসে। রাস্তায় রাস্তায় আলো দেখা যায়। বনমালী সরকার লেন-এ আর আলো জ্বলবে না এবার থেকে। লোক চলবে না। ইতিহাস থেকে বনমালী সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।

বনমালী সরকারের সঙ্গে এই বড়বাড়ির ইতিহাসও তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কথাটা ভাবতেই ভূতনাথ কেমন যেন অবশ হয়ে এল। তারপর একবার আশেপাশে চেয়ে নিয়ে টুক্ করে ঢুকে পড়লো সদর দরজা দিয়ে। কেউ কোথাও নেই, কে আর দেখতে আসছে তাকে! কিন্তু দেখতে পেলে হয়তো তাকে পাগলই ভাববে। ভূতনাথ পাশের ঘড়িঘরটার নিচে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে সোজা চলতে লাগলো।

মনে আছে তখন এই ঘড়িঘরের ঘণ্টার ওপর নির্ভর করেই সমস্ত বাড়িখানা চলতো।

সকাল ছ'টায় বাজতো একটা ঘণ্টা। ব্রজরাখাল উঠতো তারও আগে। তারই মধ্যে তখন তার মুখ ধোওয়া, প্রাতঃকৃত্য, সমস্ত শেষ হয়েছে। পাথর বাটিতে ভেজানো খানিকটা ছোলা আর আদা-নুন নিয়ে কচ্ কচ্ করে চিবোচ্ছে।

—ওঠো হে বড়কুটুম, ওঠো, ওঠো—ব্রজরাখাল ঘন ঘন তাগাদা দেয়।

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে বসতে দু'চার মিনিট দেরিই হয় ভূতনাথের। তখনও একতলার আস্তাবল থেকে ঘোড়া ডলাই-মালাই-এর শব্দ আসে। ছপ্-ছপ্—ছপ্-ছপ্-হিস্স্—হিস্স্—ক্লপ্-ক্লপ্—! ওধারে দারোয়ান ব্রিজ সিং আর নাথু সিং-এর ঘরে তখন হুম্ম্ হুম্ম্ করে ডনবৈঠকের আওয়াজ হচ্ছে। সিমেন্টের দাগরাজি করা সামনের উঠোনের ওপর দাসু জমাদারের খ্যাংরা ঝাঁটার খর-খর শব্দ আসছে। বোঝা যায় সকাল হলো। আর চোখ বুজে থাকা

যায় না। ভূতনাথ দেউড়ি পেরিয়ে আরো সামনে এগিয়ে গেল।

বাঁদিকের এই ঘরটার ওপরে থাকতো ইব্রাহিম। ইব্রাহিমের গালপাট্টা দাড়ির কথা এখনও মনে পড়ে ভূতনাথের। একটা কাঠের চিরুণী নিয়ে ছাদের নিচু বারান্দাটায় বসে ইয়াসিন সহিস ইব্রাহিমের লম্বা বাবড়ি চুল আঁচড়ে চলেছে তো আঁচড়েই চলেছে। কিছুতেই আর ইব্রাহিমের মনঃপূত হয় না। ইব্রাহিম কাঠের কেদারাটায় বসে এক মনে বাঁ হাতের কাঠের আর্শিতে মাথা কাত করে নিজের চুলের বাহারই দেখছে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—তারপর হঠাৎ এক সময় ফট্ করে উঠে দাঁড়াতো। অর্থাৎ চুলটা বাগানো তার পছন্দ হয়েছে। এবার সে নিজের হাতে চিরুণী নিয়ে বাগাবে পাঠানী দাড়িটা... এমনি করে চলতো সকাল সাতটা পর্যন্ত।

ভূতনাথ এগিয়ে চললো পায়ে পায়ে। ইতিহাসের সিংহদ্বার যেন আস্তে আস্তে খুলছে ওভারসিয়ার ভূতনাথের চোখের সামনে। সন্ধ্যে হয়ে এল। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-একশ'-দেড়শ' বছর পেছনে যেন ভূতনাথ চলে গিয়েছে। কালের নাটমঞ্চ যেন ক্রমশঃ ঘুরতে লাগলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদকুলি খাঁ'র কানুনগোর শেষ বংশধর বদরিকাবাবু যেন সামনের একতলার বৈঠকখানা-ঘরের শেতলপাটি ঢাকা নিচু তক্তপোশটার ওপর হঠাৎ উঠে বসেছেন।

সাধারণত সমস্ত দিন ওইভাবে ওই তক্তপোশটার ওপরই চিত হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে শুয়ে থাকেন বদরিকাবাবু। তাঁর ভয়েও ও-ঘর কেউ মাড়ায় না। তবু কাউকে দেখতে পেলেই হলো। ডাকেন। কাছে বসান। ট্যাঁকে একটা ছোট্ট ঘড়ি। বলেন—বাড়ি কোথায় হে ছোকরা?

—বাপের নাম কী?

—গাঁ? কোন্ জেলা?

—বিঘে প্রতি ধান হয় কত?

—দুধ ক' সের করে পাও?

এমনি অবান্তর অসংখ্য প্রশ্ন। ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়েন সবাইকে। গ্রীষ্মকালে খালি গা। একটা চাদর কাঁধে। আর শীতকালে একটা তুলোর জামা। প্রথমটা কেউ সন্দেহ করে না। সরল সাধাসিধে মানুষ। তারপর যখন শুরু করেন গল্প—সে-গল্প আর শেষ হতে চাইবে না। মুর্শিদকুলি খাঁর থেকে শুরু করে লর্ড ক্লাইভ—হালসীবাগান, কাশিমবাজার আর... ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস... নন্দকুমার—

সব শুনতে গেলে আর ধৈর্য থাকে না কারো। তারপর যখন রাত ন'টা বাজে, তোপ পড়ে কেল্লায়, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসেন বদরিকাবাবু। হাই তোলেন লম্বা একটা। তারপর দুটি আঙুলে তুড়ি দিয়ে একবার চিৎকার করে ওঠেন—ব্যোম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী। তারপর ট্যাঁকঘড়িটা বার করে মিলিয়ে নেন সময়টা।

বাঁ ধারে বদরিকাবাবুর বৈঠকখানা আর ডানদিকে খাজাঞ্চীখানা। খাজাঞ্চীখানা মানে বিধু সরকারের ঘর। সামনে একটা ছালু কাঠের বাক্স নিয়ে বসে থাকে বিধু সরকার। চশমাটা ঝুলছে [illegible]াকের ওপর। মাদুরের ওপর উবু হয়ে বসে চাবি দিয়ে খোলেন বাক্সটা। ভারি নিষ্ঠা বিধু [illegible]কারের ওই ক্যাশবাক্সটি আর ওই চাবির গোছাটির ওপর। প্রতিদিন ঠনঠনে কালীবাড়ির ফুল [illegible] তেল সিঁদুর আসে তার জন্যে। বিধু সরকার নিজের হাতে চাবির ফুটোটার তলায় ত্রিশূল [illegible] দেয় একটা। আর একটা ত্রিশূল আঁকে পশ্চিমের দেয়ালে আঁটা লোহার সিন্দুকটার চাবির [illegible]ার নিচে।

সামনে বরফওয়ালা মেঝের ওপর ঠায় বসে আছে পাওনা টাকার তাগাদায়। সেদিকে বিধু [illegible]কারের নজর দেবার কথা নয়।

ত্রিশূল আঁকার পর বিধু সরকার ক্যাশবাক্স খুলবে। খুলে ফুলটি রাখবে তলায়। তারপর বার করবে ছোট একটি ধুনুচি। বিধু সরকারের নিজস্ব ধুনুচি। একটি ছোট কৌটো থেকে বেরুবে ধুনো, বেরুবে কাঠ কয়লা আর একটি দেশলাই। দেশলাইটি জ্বালিয়ে আগুন ধরাবে ধুনোয়। তারপর ঘন ঘন পাখার হাওয়া করতে করতে যখন গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরুবে, ধোঁয়ায় চোখ-নাক-মুখ

অন্ধকার হয়ে আসবে বিধু সরকারের, তখন সেই মজার কাণ্ডটি করে বসবে। আগুন সমেত ধুনুচিটি বাক্সের মধ্যে বসিয়ে বাক্সের ডালাটি ঝপাৎ করে বন্ধ করে দেবে। নিচু হয়ে বাক্সে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নমস্কার করবে বিধু সরকার। তারপর মাথা তুলে বাক্স খুলে ধুনুচি বার করে আবার ডালা বন্ধ করবে। তখন কাজ আরম্ভ করার পালা। সামনের দিকে চেয়ে বলবে—এবার বলো তোমার কথা।

বিধু সরকারের মতো খাজাঞ্চীর কাজে এমন নিষ্ঠা ভূতনাথ আর কারও দেখেনি।

দু'পাশে দুটি ঘর, মধ্যেখান দিয়ে বড়বাড়িতে ঢোকবার রাস্তা। রাস্তার ওপাশেই বারমহলের উঠোন। উঠোনের দক্ষিণমুখো পুজোর দালান। সেই পুজোর দালানটা এখনও যেন তেমনি আছে। আশেপাশের আর সবই গিয়েছে বদলে। শ্বেতপাথরের সিঁড়ির টালিগুলো সবই প্রায় ভাঙা। বোধ হয় এখনও পুজোটা চলছিল। ওটা বন্ধ হয়নি।

একবার নবমী পুজোর দিন একটা কাণ্ড হয়েছিল। শোনা গল্প। এই বাড়িতে এখানেই ঘটেছিল।

পূজো-টুজো সব শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। রাঙাঠাকমা তসরের কাপড় পরে পুরুতমশাই-এর জন্যে নৈবেদ্যর থালাগুলো সাজিয়ে গুনে গুনে তুলছে। ওধারে উঠোনে রান্নাবাড়িতে, গোলাবাড়িতে, আস্তাবলবাড়িতে যে-যেখানে ছিল সবাই ছুটে এসেছে। প্রসাদ পাবে। ভেতরে অন্দরমহলের জন্যে বারকোষ ভর্তি প্রসাদ গেল ঠিকে লোকদের মাথায় মাথায়। ওদিকে ভিস্তিখানা, তোষাখানা, বাবুর্চিখানা, নহবতখানা, দপ্তরখানা, গাড়িখানা, কাছারিখানা সমস্ত জায়গায় যারা কাজের জন্যে আসতে পারেনি, আটকে গিয়েছে—তাদের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দরদালান, দেউড়ি, নাচঘর, স্কুলঘর, সব জায়গায় সবাই প্রসাদ খাচ্ছে। হঠাৎ এদিকে এক কাণ্ড হলো।

—খাবো না আমি—

—কেন খাবিনে?

—পুজো হয়নি—

—সেকি—কে তুই?

—আমি হাবু—

—কোথাকার হাবু? কা'দের হাবু? বাড়ি কোথায় তোর?

আশেপাশে ভিড় জমে গেল। সবাই জিজ্ঞেস করে—কী হলো? কে ও? কা'দের ছেলে? কিন্তু চেহারা দেখেই তো চিনতে পারা উচিত। পাগলই বটে! পাগলা হাবু। বাপের জন্মে কেউ মনে করতে পারলে না যে, দেখেছে ওকে কোথাও। আধময়লা কাপড়, খালি গা, এক পা ধুলো, চুল একমাথা। উদাস দৃষ্টি। খেলো না তো বয়ে গেল। সেধো না ওকে। কলাপাতা আসন পেতে রূপোর গেলাস দিয়ে আসুন বসুন করতে হবে নাকি! দাও তাড়িয়ে। হাঁকিয়ে দাও দুর করে।

মেজকর্তা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। মেজকর্তা শুধু নামে—আসলে কিন্তু মেজকর্তাই মালিক। সারা গায়ে গরদের উড়ুনি, পরনে গরদের থান। কপালে চন্দনের ফোঁটা। ভারিক্কী মানুষ। নিখুঁত করে দাড়ি কামানো—শুধু তীক্ষ্ণ একজোড়া গোঁফ মুখের দু'পাশে সোজা ছুঁচলো হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। গায়ে আতরের গন্ধ কিন্তু আতরের গন্ধকে ছাপিয়েও আর একটা তীব্র গন্ধ আসছে গা থেকে। যারা অভিজ্ঞ তারা জানে ওটা ভারি দামী গন্ধ। দামী আতরের গন্ধের চেয়েও দামী। মেজকর্তাকে দেখে সবাই সরে দাঁড়ালো। এসে বললেন—কই দেখি—

দেখবার মতো চেহারা নয় তার। ভয় নেই। জড়োসড়ো হওয়া নেই। মেজকর্তাকে দেখে নমস্কার করাও নেই। শুধু একদিকে আপন মনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

একবার জিজ্ঞেস করলেন—প্রসাদ খাবিনে কেন রে?

—আজ্ঞে পুজো হয়নি—

—পুজো হয়নি মানে?

—পিতিমের পাণ পিতিষ্ঠে হয়নি—

মেজকর্তা হাসলেন না। কিন্তু হাসলেন রূপলাল ভট্টাচার্য। পাশে তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পায়ে খড়ম। পরনে কোসার থান। গায়ে নামাবলী। মাথায় লম্বা শিখায় গাঁদা ফুল। বললেন—পাগলের কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই বাবাজী—তুমি এসো।

কিন্তু মেজকর্তা সহজে ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—না ঠাকুরমশাই, আমার বাড়িতে বসে অতিথি নবমীর দিন অভুক্ত থাকবে—এটা ঠিক নয়।

রূপলাল ঠাকুর কেমন যেন চিন্তিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন—প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি তুই-বুঝলি কিসে?

পাগলা হাবু বললে—মা তো নৈবিদ্যি খায়নি।

রূপলাল ঠাকুর এবার বিরক্ত হলেন।

আশেপাশের ভিড়ের মধ্যে যেন একটা কৌতুক সঞ্চার হয়েছে।

রূপলাল ঠাকুর এবার জিজ্ঞেস করলেন—প্রাণ প্রতিষ্ঠা তা হলে কীসে হবে?

—আমি পিতিষ্ঠে করবো।

—বামুনের ছেলে তুই?

—আজ্ঞে মায়ের কাছে আবার বামুন শুদ্দর কী—মা যে জগদম্বা জগজ্জননী!

পাগলা হাবুর কথায় যেন সবাই এবার চমকে গেল। নেহাৎ বাজে কথা নয় তো। মেজকর্তা কেমন যেন মজা পাচ্ছেন মনে হলো। তিনি যেন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি মৌজে আছেন। আজ কেমন যেন মিষ্টি হাসি হাসছেন—তা কর তুই প্রাণ প্রতিষ্ঠা—বলছে যখন, তখন করুক ও।

রূপলাল ঠাকুর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বৃথা। মেজকর্তার ওপর কথা বলা চলে না।

ততক্ষণ খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বারমহল ঝেঁটিয়ে এসে জুটেছে পুজোর দালানে। কেউ বলে ছদ্মবেশী সাধু বটে। পাগলাটার সঙ্গে কথা বলবার লোভও হচ্ছে। রান্নাবাড়ি থেকে ঠাকুরবা এসেছে রান্না ফেলে। শুধু মেজকর্তার ভয়ে কেউ বেশি এগোতে সাহস পায় না। দাসু মেথর আজ ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। নিজে পরেছে চীনা-সিল্কের গলাবন্ধ কোট—আর বউ ছেলে-মেয়েদেরও গায়ে নতুন জামা-কাপড়-শাড়ি।

পাগলা হাবুকে নিয়ে যাওয়া হলো পুজোমণ্ডপে। পুজোর দালানের ভেতর। সবাই বললে—কর প্রাণ প্রতিষ্ঠে—কর তুই।

—কলার বাশ্না দাও—

—কলার বাশ্না কী হবে?

—আগে দাওই না, দেখোই না, কী করি—

এল গাদা গাদা কলার বাশ্না দক্ষিণের বাগান থেকে। মেজকর্তার হুকুম। দেখাই যাক না মজা। পুজোর বাড়িতে মজা করতে আর মজা দেখতেই তো আসা। ভিড় করে সবাই দাঁড়ালো শ্বেত মার্বেল পাথরের সিঁড়ির ওপর। ঝুঁকে দেখছে সামনে পাগলা হাবুর দিকে।

পাগলা হাবু কিন্তু নির্বিকার। ধারালো কাটারি দিয়ে কলার বাশ্নাগুলো ছোট ছোট করে কাটলে। তারপর এক কাণ্ড! সেই এক-একটা বাশ্না নেয় আর কী মন্ত্র পড়ে, আর জোরে জোরে ছুঁড়ে মারে প্রতিমার গায়ে, মুখে, পায়ে, সর্বাঙ্গে।

রূপলাল ঠাকুর বাধা দিতে যাচ্ছিলো হা হা করে। কিন্তু মেজকর্তার দিকে চেয়ে আর সাহস হলো না। মেজকর্তা তখন এক দৃষ্টে পাগলা হাবুর দিকে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন।

পাগলা ততক্ষণ মেরেই চলেছে। সে কী জোর তার গায়ে। হঠাৎ সবাই অবাক হয়ে দেখলে আঘাতের চোটে দুর্গার প্রতিমার শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে। এক-একটা বাশ্না ছুঁড়ে মারে পাগলা, আর ঠাকুরের গায়ে গিয়ে সেটা লাগতেই রক্ত ঝরে পড়ে সেখান থেকে। সমস্ত লোক হতভম্ব।

শেষে এক সময় পাগলা থামলো। মেজকর্তার দিকে চেয়ে বললে—হয়েছে, এবার মায়ের পাণ পিতিষ্ঠে হয়েছে, এবার পেসাদ খাবো, দাও।

সে কী ভিড়! তবু সেই ভিড়ের মধ্যেই প্রসাদ আনতে পাঠানো হলো। দেখতে দেখতে খবর রটে গিয়েছে এ-বাড়ি ও-বাড়ি, এ-পাড়া সে-পাড়া। হাটখোলার দত্তবাড়ি, পোস্তার রাজবাড়ি, ঠন্ঠনের দত্তবাড়ি, শোভাবাজারের রাজবাড়ি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, মল্লিকবাড়ি, সব জায়গা থেকে লোকের পর লোক আসতে লাগলো।

এদিকে ভেতর বাড়ি থেকে প্রসাদ আনানো হয়েছে। ভালো করে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হবে, মেজকর্তার হুকুম। কিন্তু পাগলা হাবু উধাও।

খোঁজ খোঁজ—কোথায় গেল? দশজন লোক দশদিকে খুঁজতে গেল। কোথাও নেই সে। পাগলা হাবু সেই যে গেল আর কেউ দেখেনি তাকে কোনোদিন। তখনও লোকের পর লোক আসছে। সবাই দেখতে চায় পাগলা হাবুকে। প্রতিমার শরীরে তখনও রক্ত লেগে আছে। টাটকা রক্ত। সেই ভিড়, সেই লোকারণ্য চললো সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ধরে—

পুরনো বড়বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ভূতনাথ অতীতের আবর্তে ডুবে গিয়েছিল যেন। হঠাৎ এক সময় বংশী এসে ডাকতেই ভূতনাথের চটকা ভাঙলো।

—শালাবাবু—

—আমাকে ডাকছিস বংশী? ভূতনাথ ফিরে তাকালো।

—ছোটমা আপনাকে একবার ডাকছে যে—

আজ আর সে-বয়েস নেই ভূতনাথের। এখন অনেক বয়েস হয়েছে। কিন্তু তবু এই নির্জন শ্মশানপুরীতে দাঁড়িয়ে, সেদিনকার ছোটবৌঠানের ডাক যেন অমান্য করতে পারলো না সে। আজ সে-বাড়ি আর সে-রকম নেই। পার্টিশনের ওপর পার্টিশন হয়ে হয়ে অতীতের স্মৃতিসৌধের সিং-দরজা প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। তবু ছোটবৌঠানের ডাক শুনে কেমন করেই-বা ভূতনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

—তুই চল বংশী, আমি এখুনি আসছি—ভূতনাথ উঠলো বারমহল পেরিয়ে অন্দর মহল। অন্দরমহলে ঢুকতেই যেন সেই গিরির সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা। গিরি মেজগিন্নীর পান সাজতে এসেছে। পান নিতে এসে ঝগড়া বাধিয়েছে সদুর সঙ্গে। সদু হলো সৌদামিনী।

সৌদামিনীর গলা খুব। বলে—আ ভগমান, কপাল পুড়েছে বলেই তো পরের বাড়িতে গতর খাটাতে এইচি—

—গতরের খোঁটা দিসনি সদু, তোর গতরে পোকা পড়বে—সেই পোকাশুদ্ধ গতর আবার নিমতলার ঘাটে নিয়ে গিয়ে মুদ্দোফরাসরা পুড়োবে একদিন, দেখিস তখন—

—হ্যাঁলা গিরি—গতরের খোঁটা আমি দিলুম না তুই দিলি—যারাই গতরখাকী তারাই জন্ম জন্ম গতরের খোঁটা দিক—

—কী, এত বড় আস্পদ্দা—আমাকে গতরখাকী বলিস—বলচি গিয়ে মেজমা'র কাছে—বলে দুম্ দুম্ করে কাঠের সিঁড়ির ওপর উঠতে গিয়ে সামনে ভূতনাথকে দেখেই যেন থমকে দাঁড়ালো গিরি—তারপর জিভ কেটে এক গলা ঘোমটা দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা করে দিলে।

সেই নির্জন সিঁড়ি। সেই নিরিবিলি অন্দরমহল। কোথায় গেল সেই যদুর মা। সিঁড়ির ওপাশে রান্নাবাড়ির লাগোয়া ছোট্ট ঘরখানাতে বসে কেবল বাটনা বেটেই চলেছে। হলুদ আর ধনে বাটনার জল গড়িয়ে পড়ছে রোয়াক বেয়ে নর্দমার ভেতর। কখন সূর্য ডুবতো, কখন উঠতো, কখন বসন্ত আসতো, শীত আসতো আবার চলেও যেতো, খোঁজও রাখতো না বুড়ী। যখন কাজ নেই, দুপুরবেলা, তখন হয়তো ডাল বাছতে বসেছে। সোনামুগের ডাল, খেসারি, মসুর, ছোলা—আরো কতরকমের ডাল সব। কখনও কথা ছিল না মুখে। শুধু জানতো কাজ। কাজের ফুটো দিয়ে কোন

ফাঁকে তার জীবনটুকু নিঃশেষ হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে—কেউ খবর রাখেনি। সিঁড়ি দিয়ে ভূতনাথ উঠতে যাবে, হঠাৎ আবার পেছনে ডাক।

—শালাবাবু, ও শালাবাবু—

ভূতনাথ পেছনে ফিরে তাকালো। শশী ডাকছে—শালাবাবু, শিগগির আসুন—

—কেন?

—ছুটুকবাবু ডাকছে—গোঁসাইজী আসেনি—আসর আরম্ভ হচ্ছে না—

ছুটুকবাবুর আসরে তবল্‌চী বুঝি অনুপস্থিত। ছুটুকবাবু বসবে তানপুরা নিয়ে। ওদিকে কানা ধীরু ইমনের খেয়াল ধরেছে আর গোঁসাইজী তবলা। সমের মাথায় এসে সে কী হা-হা-হা-হা চিৎকার। ঘর বুঝি ফেটে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত চলবে আসর। এক-একদিন মাংস হবে। মুরগীর ঝোল আর পরটা। আর পর্দার আড়ালে এক-একবার এক-একজন উঠে যাবে আর মুখ মুছতে মুছতে ফিরে আসবে।

ছুটুকবাবুর মখমলের পাঞ্জাবি তখন ঘামে ভিজে গিয়েছে। কপালে দর দর করে ঘাম ঝরছে। গলার সরু সোনার চেনটা চিক্ চিক্ করছে ইলেকট্রিক আলোয়। তালে তালে মাথা দুলবে ছুটুকবাবুর। বলবে—কুছ পরোয়া নেই—শালাবাবু, তুমি এবার থেকে তবলার ভারটা নাও—গোঁসাই-এর বড় গ্যাদা হয়েছে—শশী, কাল গোঁসাই এলে তুই জুতো মেরে তাড়াবি—বুঝলি—এবার দেখাচ্ছি গোঁসাই-এর গ্যাদা।

কিন্তু ব্রজরাখালের কথাটা ভূতনাথের আবার মনে পড়ে—ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম কেন বড়কুটুম, বাবুরা হলো সায়েবের জাত, আর আমরা হলুম ওদের গোলাম—গোলামদের সঙ্গে কি সায়েব-বিবির মেলে... খুব সাবধান বড়কুটুম—খুব...

ভূতনাথ শেষ পর্যন্ত বললে—ছুটুকবাবুকে গিয়ে বল শশী ছোটমা আমাকে ডেকেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো ভূতনাথ। দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা। ডানদিকে রেলিং। চক্-মিলানো মহল। চারদিকেই ঘেরা রেলিং—রেলিং-এর ওপর ঝুঁকলে নিচে একতলার চৌবাচ্চা আর উঠোন দেখা যায়। রান্নাবাড়ি থেকে রান্না করে সেজখুড়ী একতলার রান্নার ভাঁড়ারে ভাত, ডাল, তরকারি এনে সাজিয়ে রাখে। এখানে দাঁড়ালে আরো দেখা যায় যদুর মা শিল-নোড়া নিয়ে দিনের পর দিন হলুদ বেটেই চলেছে। আর তার পাশের জানালা দিয়ে দেখা যায় আনাজ ঘরের এক টুকরো মেঝে—সেইখানে হয়তো সৌদামিনী ঝি তারকেশ্বরের বিরাট একটা বঁটি পেতে আলু, বেগুন, কুমড়ো কুটছে। চারদিকে কাঁচা আনাজের পাহাড় আর তার মধ্যে সদু একটা বঁটি নিয়ে ব্যস্ত। কিম্বা হয়তো পান সাজছে। খিলি তৈরি করছে। কিম্বা বিকেলবেলা প্রদীপের সলতে পাকাতে বসেছে। জানালার ওই ধারটিতে ছিল সদুর বসবার জায়গা। হাতে কাজ চলছে আর মুখও চলছে তার। কার সঙ্গে যে কথা বলছে কে জানে। যেন আপন মনেই বকে চলে—আ মরণ, চোখ গেল তো ত্রিভুবন গেল—ভোলার বাপ তাই বলতো—ফুলবউ, চোখ, কান থাকতে থাকতে ত্রিভুবন জেনে নাও—তা সে ভোলার বাপও নেই, ভোলাও নেই—আমি মরতে পরের ভিটেয় পিদিম জ্বালছি—আর আমার সোয়ামীর ভিটে আজ ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

যদুর মা'র কানে যায় সব। তবু সে কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কিন্তু হঠাৎ গিরির কানে যেতেই বলে—কার সঙ্গে বক্ বক্ করছিস লা সদু—

এবার হঠাৎ চুপ হয়ে যায় সৌদামিনী।

ভূতনাথ রেলিং ধরে ধরে এগোতে লাগলো। ভাঙা রেলিং-এর ফাঁকগুলো যেন উপোসী জন্তুর মতো হাঁ করে আছে। এর পর ডাইনে বেঁকে, বাঁদিকে ঘুরে—এ-গলি সে-গলি পার হয়ে উত্তরদিকে তিন-চারটে ধাপ উঠলে পড়বে বউদের মহল। আকাশ-সমান উঁচু কাঠের ঝিলিমিলি দিয়ে ঢাকা। আর তার সামনে দক্ষিণমুখো সার-সার বউদের ঘর। ছোটবৌঠানের ঘর একেবারে শেষে। ডানদিকে প্রথমেই বড় বউ-এর ঘর। তিনি বিধবা। কোথা থেকে যে এ-বাড়ির সব বউরা এসেছিল! মেম-সায়েবদের মতো গায়ের রং। ফরসা দুধে-আলতার ছোপ। বড় বউ-এর বয়েস

হয়েছে, তবু চেহারায় বয়েস ধরবার উপায় নেই। পরণে সাদা ধবধবে থান।

ভূতনাথকে দেখে সিন্ধু সরে দাঁড়ালো। বড় বউ-এর ঝি সিন্ধু।

ভেতর থেকে গলার আওয়াজ এল—ওখানে কে রে সিন্ধু?

ভূতনাথ শুনতে পেলে সিন্ধু বলছে—মাস্টারবাবুর শালা।

তারপরেই মেজগিন্নীর ঘর। পর্দাটা তোলা। ভূতনাথের নজরে পড়লো এক পলক। মেজগিন্নী মেঝের ওপর বসে তাকিয়া হেলান দিয়ে গিরির সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলছেন। চোখ সরিয়ে নিয়ে ভূতনাথ একেবারে শেষ ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

পায়ের আওয়াজ পেতেই কে দরজা খুলে দিলে যেন। কত বছর আগের ঘটনা। তবু অতীতের মায়াঞ্জন যেন আজও চোখে লেগে আছে স্পষ্ট। ভূতনাথ যেন আজ স্মৃতির পাখীর পিঠে চড়ে বর্তমানের লোকালয় ছেড়ে অতীতের অরণ্যে ফিরে গিয়েছে।

ছোটবৌঠান দরজা খুলে ডাকলে—কে ভূতনাথ—আয়।

হঠাৎ দুটো হাত ধরে ফেলেছে পটেশ্বরী বৌঠান। বললে—একটা কাজ তোকে করতে হবে ভাই—বলে ছোটবৌঠান তার কালো কালো চোখ দুটো তুলে সোজা তাকালো ভূতনাথের মুখের দিকে। সেইজন্যেই তোকে ডাকা।

—কী কাজ বলো না?

—এই নে টাকা—বলে ভূতনাথের হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিলো টাকাটা।

—কী আনবো এতে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—মদ! গলাটা নিচু করে ছোটবৌঠান বললে।

সত্যি চমকে উঠেছে ভূতনাথ। মদ? কানে ঠিক শুনেছে তো সে?

—হ্যাঁ, মদ—

—এতো রাত্তিরে—

—হ্যাঁ, যেখান থেকে পারিস, যেমন করে পারিস—খুব ভালো মদ, খুব দামী। কিন্তু এতেও যেন স্বস্তি পেলে না ছোটবৌঠান। হঠাৎ কান থেকে হীরের কানফুলটা খুলে ভূতনাথের মুঠোর মধ্যে পুরে দিলে জোর করে। বললে—ও টাকাতে যদি না কুলোয় তো এটাও রেখে দে ভাই—

—এ কী করলে, এ কী করলে তুমি বৌঠান—চিৎকার করে উঠলো ভূতনাথ। চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে গিরি, মেজগিন্নী, সিন্ধু আর বড়বউ। কী হলো? কী হলো রে ছোটবউ?

হঠাৎ যেন নিজের চিৎকারে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ। ছোটবৌঠান নয়, ভূতনাথই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো যেন। বুড়ো বয়সে এ কী করলে সে! কেউ তো কোথাও নেই। সে তো আজ একলাই দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা বাড়িটার মাথায়। সে তো ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ওভারসিয়ার ভূতনাথ; ভূতনাথ চক্রবর্তী। নিবাস—নদীয়া, গ্রাম—ফতেপুর, পোস্টাপিস—গাজনা। কোনও ভুল নেই। হীরের কানফুল আর টাকাটা আর একবার দেখবার জন্যে হাতের মুঠো খুলতেই ভূতনাথের নজরে পড়লো—কই কিছু তো নেই, শুধু সাইকেলের চাবিটা রয়েছে মুঠোর মধ্যে। হঠাৎ কেমন যেন ভয় হতে লাগলো ভূতনাথের। এ অভিশপ্ত বাড়ি। ভালোই হয়েছে যে এ ধ্বংস হচ্ছে। এই এত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো তার। কেউ কোথাও নেই। বিষাক্ত বাড়ির আবহাওয়া ছেড়ে সে যতো শিগ্‌গীর বেরিয়ে যেতে পারে ততই মঙ্গল। কালই চরিত্র মণ্ডল এখানে এসে গাঁইতি বসাবে। বনমালী সরকার লেন-এর স্মৃতির সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের ইতিহাসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে একেবারে। তাই যাক। তাই যাক। তাই ভালো।

অন্দরমহল, রান্নাবাড়ি, বারবাড়ি, বৈঠকখানা, দপ্তরখানা, দেউরী সব পেরিয়ে ভূতনাথ একেবারে সাইকেলটা নিয়ে উঠতে যাবে—এমন সময় কাপড় ধরে কে যেন টানলে! ভয়ার্ত একটা চিৎকার করতে যাচ্ছিলো ভূতনাথ। কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখতেই একটা লাথি ছুঁড়লো।

—দূর—দূর হ—বেরো—

সেই কুকুরটা!

অনেকদিন আগে আর এক দিন এমনি করে এ-বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় যে বাধা দিয়েছিল সে ছোটবৌঠান। আর আজ বাধা দিলে এই কুকুরটা।

সাইকেল চড়ে অন্ধকার বনমালী সরকার লেন দিয়ে চলতে চলতে ভূতনাথের মনে হলো তার সমস্ত অতীতটা যেন ওই কুকুরের মতো তাকে আজ কেবল পেছু টান দিতে চেষ্টা করছে। ওই কুকুরটার মতোই তার অতীত কালো, বিকলাঙ্গ, মৃতপ্রায় আর অস্পষ্ট।

ভূতনাথের সাইকেলের চাকার ঘূর্ণায়িত তরঙ্গে ক্রমে ক্রমে উদ্বেলিত হতে লাগলো তার বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী-মুখর অতীত।

কাহিনী

ফতেপুর গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ পথ হেঁটে তবে মাজদিয়া ইস্টিশান। সেই ইস্টিশানে ট্রেন ধরে একদিন এসেছিল ভূতনাথ এই কলকাতায়।

শেয়ালদা ইস্টিশানের চেহারা, লোকজন, চিৎকার আর বাইরের দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গেল ভূতনাথ। কোথায় এসে পড়েছে সে। কুলিদের টানাটানি বাঁচিয়ে কোনওরকমে বাইরে এসে দাঁড়ালো। দুটো টাকা ছিল পকেটে—সে দুটো পুরে নিলো ট্যাকে। ব্রজরাখাল বলেছিল—খুব সাবধান, পকেটে টাকাকড়ি থাকলে আর দেখতে হবে না—কলকাতা শহর—তোমার ফতেপুর নয়, যে...

কলকাতা শহর যে ফতেপুর নয় তা ভূতনাথ জানতো। মল্লিকদের তারাপদ সেবার বারোয়ারি পার্টির যাত্রার নাটকের বই কিনতে এসেছিল কলকাতায়। 'হরিশচন্দ্র' পালার বই। তার কাছেই শোনা। বললে—ওই যে দেখছো মিত্তিরদের টিপ্‌-চালতে গাছ—ওই টিপ্‌-চালতে গাছের হাজার-ডবল উঁচু সব বাড়ি, বুঝলে কাকা—সেই উঁচু বাড়ির মাথায় দেখি না মেয়েমানুষরা দিব্যি আরামে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছে—

ভূষণকাকার বয়স হয়েছে। প্রচুর টাকার মালিক। তবু কলকাতায় যায়নি কখনও। যাবার প্রয়োজনও হয়নি। কাকা বললে—মাথায় ঘোমটা-টোমটা কিছুই নেই?

তারাপদ বললে—ঘোমটা দেবে কেন শুনি—কোন্ দুঃখে—ভালো করে কি ছাই দেখতে পাচ্ছে কেউ তাদের—আমি রাস্তা থেকে দেখছি ঠিক যেন য়্যাট্রুক কড়ে আঙুলের মতো—

ভূষণকাকা বললে—হ্যাঁ রে, শুনেছি নাকি কলকাতায় আজকাল বিয়ে-অলা মেয়েরা সিঁদুর পরে না—ঘোমটা খুলে সোয়ামীর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে হাওয়া খেতে যায়—শ্বশুর-ভাসুরের সামনে সোয়ামীর সঙ্গে কথা বলে?

—মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা কাকা—তারাপদ মাথা নাড়তে লাগলো।—তা হতেই পারে না—আমি যে নিজের চোখে সমস্ত দেখে এলাম কাকা—ধরো না কেন সকালবেলা নামলাম তো ট্রেন থেকে—আর সন্ধেবেলা আবার ট্রেন ধরলাম—তা কলকাতার কিছু দেখতে তো আর বাকি রাখিনি কাকা—রানাঘাট থেকে পাঁউরুটি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম—আর মাজদে'র রসগোল্লা—পেটটি পুরে তাই খেয়ে নিয়ে সব খুঁটে খুঁটে দেখলাম—ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ি দেখলাম—কী জোরে যায় যে কাকা—সামনে আসতে দেখলে বুকটা দুর-দুর করে ওঠে।

—কেন, বুক দুর দুর করে কেন? জিজ্ঞেস করেছিল ভূতনাথ।

জবাব দিয়েছিল ভূষণকাকা। বলেছিল—তুই থাম তো ভূতো—বোকার মতো কথা বলিস নে—লোকে হাসবে।

ভূতনাথ সত্যি সত্যি আর কথা বলেনি। চুপচাপ শুনে গিয়েছিল।

তারাপদ বলেছিল—আমার একবার ইচ্ছে করে কাকা ভূতোকে দিই ছেড়ে গিয়ে কলকাতার রাস্তায়—ও ঠিক হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলবে—দেখো—

ভূষণকাকাও যেন বিজ্ঞের মতো জবাব দিয়েছিল—তা তো বটেই—এ কি আর ছিন্নাথপুরের গাজনের মেলা যে, রাত হয়ে গেলে ভাবনা নেই—কেষ্ট ময়রার দোকানের মাচায় দুটো চিঁড়ে মুড়কি চিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

মল্লিকদের বাড়ির তারাপদর কথায় সে ছোটবেলা থেকেই কলকাতার নাম শুনে যেন রোমাঞ্চ হতো ভূতনাথের। একদিন মিত্তিরদের টিপ্‌-চালতে গাছটার মগডালে গিয়ে উঠেছিল ভূতনাথ। এর হাজার-ডবল উঁচু। সে যে কতখানি—তা অনুমান করা শক্ত। তবু অনেক—অনেক দূরে চেয়ে চেয়ে দেখেছে সে। সোজা পশ্চিমদিকে চাইলে শুধু দেখা যায় কেবল গাছ আর গাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঠ। তারপর আকাশ। শুধু আকাশ আর আকাশ। আকাশময় চারিদিক। সন্ধ্যেবেলা বাদুড়গুলো ওদিক থেকে ফল-পাকড় খেতে একটার পর একটা উড়ে আসে। ওই শহরের দিক

থেকে। মাজদে' স্টেশনের চেয়েও অনেক দূরে—কত শহর—ফতেপুরের মতো কত গ্রাম পেরিয়ে তবে কলকাতা। সেখানে ঘোড়ার ট্রামগাড়ি চলে খুব জোরে—সামনে আসতে দেখলে বুক দুর দুর করে। (কেন করে তা বলা যায় না) মিত্তিরদের টিপ্-চালতে গাছের হাজার ডবল উঁচু সব বাড়ি। তার মাথায় লোকগুলো দেখায় এতটুকু কড়ে আঙুলের মতো।

এমনি ভাবতে ভাবতে গাছ থেকে একসময় নেমে পড়ে ভূতনাথ। এর পর আর একদিনের ঘটনা। তখন অনেক বড় হয়েছে ভূতনাথ। ইস্কুলে এসে ভর্তি হলো গঞ্জের হাসপাতালের বড় ডাক্তারের ছেলে ননী। ভারি ফুটফুটে ছেলেটা। যেমন ফরসা, তেমনি কালো কালো চোখ, বড় বড় চুল। পরে অনেকবার ভূতনাথ ভেবেছে ননী যেন ছেলে নয়। অনেক ভাব হবার পরেও ননীর হাতে আচমকা হাত ঠেকে গেলে কেমন যেন শিউরে উঠতো ভূতনাথ। ইস্কুল থেকে মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে বাড়ি আসার পথে ননীর কথাই সারা রাস্তাটা ভাবতো। এক এক সময় মনে হতো, ননী তার বোন হলে যেন বেশ হতো। তাহলে দু'জনে এক বাড়িতে থাকতো, শুতো এক বিছানায়। অনেক ছুটির দিন ভূতনাথ হেঁটে হেঁটে একা চলে গিয়েছে ইস্কুলের কাছে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে হাসপাতালের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। ননীকে যদি একবার এক ফাঁকে দেখতে পাওয়া যায়! আবার লজ্জাও হতো। যদি ননী তাকে সত্যি সত্যিই দেখে ফেলে! যদি ননী জিজ্ঞেস করে—কী রে ভূতনাথ, তুই এখানে কেন—তখন কী জবাব দেবে সে?

ননীকে তো বলা যায় না যে, তাকে দেখতেই তার আসা। ভুল করে নিজের একটা বই কতদিন ননীর বই-এর মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে। তবু যদি সেই অছিলায় স্কুলের পরেও তার সঙ্গে আবার কথা বলার সুযোগ হয়। সেই ননী কতদিনই বা ছিল তাদের স্কুলে। তবু কত গল্প হতো। কত জায়গায় তার বাবা বদলি হয়েছে। কত স্কুলের গল্প—কত ছেলের গল্প।

সেই ননী একদিন চলে গেল। চলে গেল চিরকালের স্বপ্নের দেশ—কলকাতায়। যাবার আগের দিন কেমন যেন মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথের। ননীর বাবা বদলি হয়ে কলকাতায় যাবে—ননীর তাই আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু ভূতনাথ অনেক সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করেছিল—তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না ননী?

—কেন? কষ্ট হবে কেন?

কলকাতায় যাওয়াতে কষ্ট হওয়ার যে কী আছে তা ননীর মাথায় আসেনি। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয়েছিল তার নিজের যেমন কষ্ট হচ্ছে—ননীরও তেমন হলেই যেন ভালো হতো। কেন যে ননীর মনে কষ্ট হওয়া উচিত—তা ভূতনাথ লজ্জায় ব্যাখ্যা করে আর বলতে পারেনি। ভূতনাথের সে-দুঃখ সেদিন বুঝতে পারেনি ননী। না পারবারই কথা। কত দেশ সে দেখেছে। কত বড় লোক তারা। কত ভূতনাথ তার জীবনে আসবে যাবে। মনে আছে ননীরা কলকাতায় চলে যাবার দিন খাঁটরোর বিলের ধারে শাঁড়া গাছটার তলায় বসে হাউ-হাউ করে কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল সে।

কিন্তু একদিন ননীর চিঠি এলো। খাস কলকাতা থেকে। জীবনে সেই তার প্রথম চিঠি পাওয়া। সেদিন সে-চিঠি পড়ে যে আনন্দ ভূতনাথ পেয়েছিল—তা আর কোনদিন কোনও চিঠি পড়ে পায়নি। চিঠিখানা সে কতবার পড়েছে। বালিশের তলায় রেখে ঘুমিয়েছে দিনের পর দিন। চিঠিখানা জামার তলায় বুকের ওপর রেখেছে। যেন ননীর হাতটার স্পর্শ আছে ওই একটুকরো কাগজে। অথচ কী-ই বা লিখেছে ননী। বলতে গেলে কিছুই নয়। ননী লিখেছিল—

'প্রিয় ভূতনাথ,

আমরা গত শনিবার দিন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা বেশ বড় দেশ—কী চমৎকার দেশ বলিতে পারিব না। এখানে আসিয়া অবধি বাবার সঙ্গে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বড় বড় বাড়ি আর বড় বড় রাস্তা। খুব আনন্দ করিতেছি, তোমাদের কথা মনে পড়ে। তুমি কেমন আছো জানাইও। উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও—'

সেই চিঠির উত্তর দিতেই ভূতনাথের দশখানা খাতার কাগজ নষ্ট হয়ে গেল। তবু সেদিন ননীর

চিঠির উত্তর আর কিছুতেই পছন্দ হয়নি তার। কত কথা ভূতনাথ লেখে—আবার কেটে দেয়। বড় লজ্জা করে। কলকাতা থেকে ননীর চিঠি আসাটাই সেদিন মনে হয়েছিল জীবনের চরম স্মরণীয় ঘটনা। সেই ননীর চিঠির উত্তর পাঠাতে হবে কলকাতায়! এ যেমন বিস্ময়কর তেমনই অবিশ্বাস্য যে। শেষ পর্যন্ত ভূতনাথ কোনওরকমে পাঠিয়েছিল চিঠি। কিন্তু তার উত্তর আসেনি আর এ-জীবনে। সেদিনকার মতো ননী হারিয়েই গিয়েছিল ভূতনাথের জীবন থেকে একেবারে। কিন্তু কলকাতার স্বপ্ন ভূতনাথের মন থেকে কোনোদিন মুছতে পারেনি কেউ!

এর পর আর এক ঘটনা ঘটলো। ভূতনাথের বয়েস তখন বারো কি তেরো আর রাধার এগারো। রাধার বিয়ে হবে। রাধাকে দেখতে এল কলকাতা থেকে। সে যে কী রোমাঞ্চ! রাধার রোমাঞ্চ হলো কিনা ভূতনাথ জানতে পারেনি সেদিন। কিন্তু যদি হয়েই থাকে তো তার হাজার গুণ রোমাঞ্চ হয়েছিল ভূতনাথের। রাধা! সেই রাধা! তার শ্বশুরবাড়ি হবে কলকাতায়! কী যে হিংসে হয়েছিল ভূতনাথের মনে। রাগও হয়েছিল খুব। রাগে রাধার সঙ্গে ভূতনাথ ক'দিন দেখাও করেনি, কথাও বলেনি।

কোঁচানো চাদর আর বার্নিশ করা পাম্পসু পায়ে কয়েকজন ভদ্রলোক একদিন এল ফতেপুরে। একটা রাত থাকলোও তারা। খেলও খুব। নন্দ জ্যাঠার গাছের ডাব, পুকুরের মাছ, গাওয়া ঘি, ছিন্নাথপুরের কেষ্ট ময়রার কাঁচাগোল্লা আর কাটারিভোগ চালের ভাত খাওয়ালেন।

রাধাকে পছন্দও করে গেল তারা। মাজদিয়া ইস্টিশান থেকে পাল্কি চড়ে একদিন ব্রজরাখাল এল বর হয়ে। ব্রজরাখাল কলকাতা থেকে বিয়ে করতে এসেছে। বর দেখে রাধার পছন্দ হলো কিনা কে জানে, কিন্তু ভূতনাথের হলো না। বরের গোঁফ নেই এ কী রকম বর! ফতেপুরে যত বর এসেছে—সব বরের গোঁফ ছিল। রাধার সই হরিদাসীর বরেরও গোঁফ ছিল আর ভূষণকাকার মেয়ে জ্ঞানদার বর এখনও আসে—তারও গোঁফ। কিন্তু সেদিন সেই অল্প বয়সে ভূতনাথের মনে হয়েছিল রাধার বরের গোঁফ থাকলেই যেন মানাতো! এখন অবশ্য ভাবলেই হাসি পায়। যা হোক, সেদিন ব্রজরাখালের গোঁফ না থাকায় যে ক্ষোভ হয়েছিল ভূতনাথের, তা পুষিয়ে গিয়েছিল রাধার কলকাতার শ্বশুরবাড়ি হওয়ার সৌভাগ্যে।

বাসরে অনেক রাত পর্যন্ত ভূতনাথ বসেছিল বরের পাশে। কত লোক কতরকম প্রশ্ন করছে—একে একে সব উত্তর দিচ্ছে ব্রজরাখাল। রাঙাকাকী ভূতনাথকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল—একে দেখছো তো—এ তোমার বড় সম্বন্ধী—সম্পর্কে গুরুজন—

মল্লিকদের আন্না বলেছিল—তা গুরুজন যদি তো এখেনে আমাদের সঙ্গে বসে কেন বাপু—বাইরে যাও না তুমি ভূতোদাদা।

সবাই হেসে উঠেছিল।

লজ্জায় ভূতনাথও আর বেশিক্ষণ বসতে পারেনি সেখানে। আস্তে আস্তে এক ফাঁকে উঠে চলে আসতে হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল—ব্রজরাখালের সঙ্গে আলাপ করে, কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করে—কলকাতার বড় হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীকে চেনে কিনা জেনে নেয়—ইত্যাদি ইত্যাদি কত কথা মনের ভেতরে গুঞ্জন করছিল, কিন্তু কিছুই হলো না। পরের দিন যতক্ষণ ব্রজরাখাল ছিল বাড়িতে, তার সামনে যেতেও লজ্জা হলো তার।

সকালবেলা, মনে আছে, কুয়োতলার পাশে আতাগাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ শুনতে পেলে রাধা জ্যাঠাইমাকে বলছে—মা, ভূতোদাদা বলেছিল ও আমার সঙ্গে যাবে।

—কোথায়?—অবাক হয়ে গিয়েছে জ্যাঠাইমা।

—আমার সঙ্গে।

—তোর শ্বশুরবাড়িতে? কেন?

—তা জানিনে—ভূতোদাদা বলছিল।

—পাগল—বলে হেসে উঠেছিল জ্যাঠাইমা। ছি ছি—কী ভাবলো জ্যাঠাইমা। রাধা যে সে-কথা জ্যাঠাইমাকে বলবে কে জানতো? কী বোকা মেয়ে!

কিন্তু পরে শুনতে পেলে ভূতনাথ। রাধার শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় নয়। কলকাতা থেকে অনেক দূরে গ্রামের মধ্যে। কামারপুকুরে। কোথায় কামারপুকুর কে জানে। রাধা সেইখানে থাকে। আর ব্রজরাখাল কলকাতার আপিসে চাকরি করে। শনিবার-শনিবার শুধু বাড়ি যায়।

রাধা যখন প্রথম বাপের বাড়ি এল—সে রাধাকে আর যেন চেনাই যায় না।

রাধা হেসে উঠলো হো হো করে—ওমা, ভূতোদা আমার দিকে কেমন হাঁ করে চাইছে দেখো—

ভূতনাথ কিন্তু অন্য জিনিস দেখছিল। রাধা এই ক'দিনে এতো মোটা-সোটা হলো কী করে! আরো ফরসা হয়েছে যেন। ভালো ভালো জামা-কাপড় পরেছে। আরো গয়না হয়েছে।

রাধা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল—না বাপু, তুমি আমার পানে অমন করে চেয়ো না ভূতোদা—ভয় করে আমার—

ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছিল—কেন, ভয় কিসের—

—বারে নজর লাগে না বুঝি, আমার নতুন বিয়ে হয়েছে নজর লাগা বুঝি ভালো—

—আহা। তাই নাকি আবার লাগে।

—আর আমি যদি নজর দেই—তোমার কেমন লাগে শুনি?

—দে না, যতো পারিস নজর দে—কিসে নজর দিবি দে—বলে ভূতনাথ রাধার দিকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাধা কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলে। ভূতনাথের নজর দেবার মতো কিছু আছে কিনা হয়তো তাই দেখলে। তারপর বললে—এখন তো দেবো না, তোমার বউ আসুক তখন দেবো—

সে অবকাশ রাধা পায়নি। পরের বার রাধা এল।

ভূতনাথ চেহারা দেখে অবাক—এ তোর কী চেহারা হয়েছে রে রাধা?

রাধা বললে—তোমারও তো চেহারা খারাপ দেখছি ভূতোদা—

—আমার হোক—কিন্তু তোর কেন হবে?

রাধা এবার যেন একটু গম্ভীর-গম্ভীর। কিছু কথা বললে না। মুখ নিচু করে রইল।

ভূতনাথ বললে—সেবার আমি নজর দিয়েছিলাম বলে, নারে—

—দূর, তা কেন—বলে রাধা চুপ করলো। আর কিছু বললে না। শেষে মল্লিকদের আন্নার কাছে শুনতে পেলে ভূতনাথ। আন্না বললে—জানো ভূতোদা—রাধাদি'র ছেলে হবে—

সেদিন খবরটা শুনে ভূতনাথ যে কেন অমন চমকে উঠেছিল কে জানে। কিন্তু চমকানো শেষ হলো ভূতনাথের, যেদিন পেটে ছেলে নিয়ে রাধা মারা গেল। কেমন করে যে কী হলো সব আজ মনে নেই। তবু মনে আছে, খবর পেয়ে ব্রজরাখাল এসেছিল শেষ দেখা দেখতে। গম্ভীর মানুষ ব্রজরাখাল! বেশি কাঁদেনি। রাধার গায়ের গয়না-টয়নাও কিছু নিলে না। নন্দজ্যাঠার একমাত্র মেয়ে তার শোকটাও সমান গম্ভীর। তবু বারবার পীড়াপীড়ি করলে।

ব্রজরাখাল বললে—মানুষটাই যখন চলে গেল—তখন আর মিছিমিছি ওসব...

নন্দজ্যাঠা কিন্তু এদিকে শক্ত মানুষ। বললে—তুমি আবার বিয়ে করো বাবা—আমি বলছি—

সেইবারই ব্রজরাখালের সঙ্গে প্রথম যা হোক দু'-একটা কথা বললে ভূতনাথ।

ব্রজরাখাল বললে—কলকাতা? তা আমি তো কলকাতাতেই থাকি আমার বাসায়—দেখাবো তোমায় কলকাতা। সে আর বেশি কথা কি—কলকাতা দেখতে তোমার এতো সাধ?

ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে ভূতনাথ। ঠিক হলো—ভূতনাথ চিঠি লিখলেই সব ব্যবস্থা করবে ব্রজরাখাল। তারপর যতোদিন ইচ্ছে তার বাসায় থাকো আর দেখে বেড়াও কলকাতা শহর।

ব্রজরাখাল পরদিনই চলে গিয়েছিল কলকাতায়। আর আসেনি।

তারপরেই এল ভূতনাথের পরীক্ষা। মহকুমা থেকে একদিন এন্ট্রান্স পরীক্ষাও দিয়ে এল। কোথা দিয়ে দিন আর রাত কাটতে লাগলো কে জানে। আর তারপরেই বিধবা পিসী পড়লো অসুখে। পিসী ছিল মা'র মতন। ভারি কঠিন অসুখ। কয়েক মাস চললো পিসীকে নিয়ে।

পিসী প্রায়ই বলতো—ভূতো মানুষ হবার পর যেন মরি—এই কামনাই করো মা তোমরা।

লোকে বলতো—তুমি নিজের পরকাল তিথি-ধম্মো নিয়ে থাকো না কেন—ছেলে হয়ে জন্মেছে, যেমন করে হোক ওর উপায় ও করে নেবেই—

পিসী বলতো—পেটেই ধরিনি—নইলে বাপ-মা কী জিনিস ও জানে না তো—আমি চোখ বুজলে ওকে দেখবার কেউ নেই যে—

পাড়ার বউদের সঙ্গে গল্প করতো পিসী আর ভূতনাথ শুনতো পাশে বসে।—বউ-এর ছেলে হয় আর মরে যায়—শেষে বামুনগাছির পঞ্চানন্দের থানে মানত করলাম আমি—সেই পঞ্চানন্দের দোর ধরেই তো হলো এই ছেলে। ওর বাপ সতীশ বললে—নাম রাখো 'অতুল'—আমি বললাম—শিবের দোর ধরে যখন বেঁচেছে—নাম থাক ভূতনাথ। তা ভূতনাথ তো ভূতনাথই আমার—আমার ভোলানাথ—বই পড়ছে তো বই-ই পড়ছে—ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছেই—খেতে ভুলে যায় এমন ছেলে কখনো দেখেছো মা তোমরা—ওকে নিয়ে আমি কী করি বলো তো মা।

সেই পিসীমাও একদিন মারা গেল।

পিসীমা'র শ্বশুরবাড়ি থেকে বিধবার নামে পাঁচ টাকা করে মাসোহারা আসতো—তা গেল বন্ধ হয়ে তখন আর করবার কিছু নেই। ভূতনাথ বারোয়ারিতলায় গিয়ে আড্ডা জমালো। আড্ডাও বলতে পারো আবার যাত্রার মহড়াও বলতে পারো।

'নল-দময়ন্তী' পালায় একবার ভূতনাথ প্রতিহারীর পার্ট করলে যাত্রার আসরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু বড় ভয় করতে লাগলো তার। কাঁপতে লাগলো পা দুটো। কেমন গলাটা শুকিয়ে আসতে লাগলো। গ্লাস-গ্লাস জল খেলে খুব।

ভূষণকাকা বললে, ও তারাপদ, ভূতোকে কেন পার্ট দিলে শুধু শুধু—কোনও কম্মের নয়—লেখাপড়া শিখলে কী হবে—মাথায় যে গোবর পোরা।

কিন্তু ভূতোর তবলা শুনে সবাই অবাক। রসিক মাস্টার বললে—ডুগি-তবলায় খাসা হাত তো ছোকরার—

দিনকতক তবলা নিয়েই পড়লো ভূতনাথ। বহুদূর থেকে শোনা যায় ভূতনাথের তবলার চাঁটি। অন্ধকার রাত্রে ঘরে বসে সাধনা করে ভূতনাথ। বোল মুখস্থ করে—তা গে না ধিন, না গে ধিন—

আবার কখনো—

তা ধিন

তা তা ধিন

ধিন ত্রে-কেটে ত্রে-কেটে তাক্—

ধিন্...

কিন্তু তবলাও ঠিক শান্তি দিতে পারলে না ভূতনাথকে। পিসীমা'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে হঠাৎ তার জীবনের একটা পরিচ্ছেদের একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। মন হলো একান্ত নিরাশ্রয় সে। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি—এমনি করে পরের অন্নদাস হওয়ার অগৌরব যেন তার ঘাড়ে ভূত হয়ে চেপে বসলো সেদিন প্রথম আর প্রখর হয়ে। ভূতনাথ একদিন বাঁয়া তবলা জোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এল বারোয়ারিতলায়। আর ও-মুখো হলো না।

খুব ছোটবেলায় ভূতনাথ একটা বেজি পুষেছিল। বুনো বেজি। বেশ পোষ মেনেছিল। কিন্তু সংসারে যারা পোষ মানে তারাই বুঝি কষ্ট পায় বেশি। ভূতনাথেরই অত্যাচারে মারা গেল একদিন সেই বেজিটা। সেই বেজির মৃত্যু প্রথম আর শেষ পিসীমা। দুই প্রান্তের দুই চরম শোকের মধ্যে ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীর বিচ্ছেদ আর রাধার মৃত্যু—সমস্ত মিলিয়ে ভালোমানুষ ভূতনাথ কেমন যেন মনে মনে স্তিমিত হয়ে এল।

এমন সময় এল ব্রজরাখালের চিঠি। রাধার স্বামী ব্রজরাখাল। ব্রজরাখাল ভূতনাথের চিঠি পেয়েছে অনেক পরে। ব্রজরাখাল যে ঠিকানা দিয়েছিল ভূতনাথকে, সে-ঠিকানা বদলে গিয়েছে। তাই চিঠি পেতে অত দেরি।

পরীক্ষায় পাশ করেছে জেনে ব্রজরাখাল খুশী হয়েছে। লিখেছে—চাকরি চেষ্টা করলে হতে পারে। কিন্তু এখনি কিছু বলা যায় না। তবে কলকাতায় কিছুদিন থাকতে হবে—ঘোরাঘুরি করতে হবে। শেষে লিখেছে—চলিয়া আইস—যেমন যেমন নির্দেশ দিলাম ওইভাবে আসিবে। বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত আমি করিব। এ কলিকাতা শহর—ট্রেনে ও রাস্তায় খুব সাবধানে আসিবে। জুয়াচোরেরা নতুন মানুষ জানিলে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিসীমা'র পেতলের ঘটিটা আর রুপোর গোট ছড়াটা হরগয়লানীর কাছে বন্ধক রেখে বাড়ির দরজায় তালা চাবি লাগিয়ে ভূতনাথ রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছে পায়ে হেঁটে। তারপর সকালবেলা এই কলকাতা। রেলের টিকিট কিনে, বাকি দুটো টাকা রয়েছে। টাকা দুটো সাবধানে ট্যাঁকে পুরে নিয়ে ভূতনাথ শেয়ালদা' স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

১৬৯০ সালের জব চার্নকের কলকাতা নয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু হয়নি তখন। বড়বাড়ির লাইব্রেরী ঘরে সে কলকাতার ছবি দেখেছে ভূতনাথ। করফিল্ড সাহেবের ছবির বইতে চৌরঙ্গীর সেই ছবি। ১৭৮৭ সালের চৌরঙ্গী। এঁদোপড়া পুকুর চারদিকে। ছই-ঢাকা গরুর গাড়ি চলেছে চৌরঙ্গী দিয়ে। লোক চলেছে উটের পিঠে চড়ে। তারই পাশাপাশি আবার সঙ্গীন উঁচু করে সেপাইরা প্যারেড করতে করতে যাচ্ছে। এখন ভাবলে হাসি পায়।

অথচ যে-দিন ভূতনাথ শেয়ালদা' স্টেশনে এসে প্রথম ট্রেন থেকে নেমেছিল—সে শেয়ালদা'র সঙ্গেও আজকের শেয়ালদা'র কোনো মিল নেই। মনে আছে—ভূতনাথ স্টেশন থেকে বাইরে এসে বৈঠকখানা বাজারের সামনের ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো কোথায় কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়। ব্রজরাখাল বলে দিয়েছিল—সোজা পশ্চিম দিকে যেতে। পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়েই চলতে লাগলো ভূতনাথ।

কিন্তু ঠিক পথেই চলেছে কিনা কে জানে। এতো লোক একসঙ্গে কখনও দেখেনি সে। ঘোড়ার গাড়ির কী বাহার! ঘোড়াগুলোর মাথার দু'পাশে কানের দিকে ছোট ছোট ঝালর লাগানো। কারো কারো গলায় ঠুংঠুঙি বাজছে তালে তালে। হৈ হৈ করতে করতে ছুটেছে। একটি গাড়ি যেমন-ইচ্ছে একবার রাস্তার ডাইনে, একবার বাঁয়ে হাঁকিয়ে চলেছে। সামনে কে একজন পড়েছিল চাবুক দিয়ে বেদম মেরে পলকের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

বুক কাঁপতে লাগলো ভূতনাথের। তাকেও যদি মারে কেউ। সরে এসে দাঁড়ালো রাস্তার ধারে গা ঘেঁষে। দুটো ঘোড়ার গাড়ি টেক্কা দিতে দিতে চলেছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়োয়ান দুটো চিৎকার করছে—উ—উ—উ—উ—

এক-একবার মনে হয় বুঝি ধাক্কা লাগলো ট্রামগাড়ির সঙ্গে। কিন্তু লাগলো না। উ—উ—উ—উ—করে গাড়োয়ান দুটো দাঁড়িয়ে উঠে চালাচ্ছে গাড়ি। কে আগে যাবে—

একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ হুড়মুড় করে পড়লো ভূতনাথ। যতো রাজ্যের জঞ্জালের পাহাড় জমে ছিল রাস্তার ওপর। একগাদা ময়লার ওপর পড়ে আবার উঠে দাঁড়ালো। সবাই দেখছে তার দিকে। ভূতনাথ মাথা নিচু করলো। সবাই হয় তো ভাবছে—নতুন কলকাতায় এসেছে। ভারি লজ্জা হলো। সকলের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে পাশের গলির মধ্যে ঢুকলো সে। একটা খাবারের দোকানের সামনে গরম জিলিপী ভাজছে একটা লোক। ভূতনাথ খানিকক্ষণ দেখলে [illegible] দোকানদার বললে—কী দেখছো গা ছেলে—?

ভূতনাথ [illegible]কটার দিকে চেয়ে দেখলে। আদুড় গা। বড় উনুনের ওপর বিরাট একটা কড়া চাপিয়েছে। [illegible] মালার তলার ফুটো দিয়ে মশলা ছাড়ছে হাতটা ঘুরিয়ে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে, আর [illegible] জিলিপীগুলো ভেসে উঠছে গরম ঘিয়ের ওপর।

লোকটা [illegible] বললে—হাঁ করে কী দেখছো গা ছেলে?

—[illegible] ভাজা দেখছি তোমার—বললে ভূতনাথ।

—দেখো না অমন জিলিপীর দিকে—যারা খাবে তাদের পেট কামড়াবে যে—সরে যাও ভাই—পয়সা আছে পকেটে?

—পয়সায় ক'টা করে? জিজ্ঞেস করলে ভূতনাথ। ক্ষিধেও পেয়েছে বেশ। খেলে হয়। এক পয়সার নিলে। চারটে করে পয়সায়। তা হোক এ তো আর ফতেপুর নয়। কলকাতা মাগ্‌গি-গণ্ডার দেশ। বললে—আর এক পয়সার দাও তো।

খেতে খেতে ভাব হলো। ফতেপুরের পাশের গ্রাম মামারাকপুরে ভগ্নীর শ্বশুরবাড়ি। লোকটা আসলে ভালো। ময়রার ছেলে। জাত-ব্যবসা ধরেছে। বললে—আমিও ভাই একদিন তোমার মতন নতুন এসেছিলুম কলকাতায়—তারপর এই ধরেছি—কে দেবে চাকরি বলো না, লেখাপড়া তো শিখিনি কিছু, তোমার মতো লেখাপড়া শিখলে দশ-বারো টাকার চাকরি একটা জুটিয়ে নিতুম ঠিক—পাঁচ টাকায় মাস চালাতুম আর পাঁচ টাকা পাঠাতুম দেশে।

পেট ভরে এক গ্লাস জল খেলে ভূতনাথ।

লোকটা বললে—বনমালী সরকার লেন? বড়বাড়িতে যাবে—তাহলে এখান থেকে বড় রাস্তা ধরে নাক-বরাবর সোজা চলে যাও—তারপর বাঁ দিকে গিয়ে আবার ডান দিকে প্রথম যে-রাস্তা পড়বে...

রাস্তার নির্দেশ পেয়ে উঠলো ভূতনাথ। বললে—তোমার নামটা?

—প্রকাশ—আর তোমার?

—ভূতনাথ চক্রবর্তী—বামুনগাছির পঞ্চানন্দের দোর ধরে হয়েছি কিনা তাই পিসী ওই নাম রেখেছিল—পরে দেখা করবো—

সমস্ত কলকাতার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা আশ্রয় পেয়ে গেল ভূতনাথ। ব্রজরাখালের ঠিকানা যদি খুঁজে না-ই পাওয়া যায় আজ, এখানে এই প্রকাশ ময়রার কাছে এসেই ওঠা যাবে। মামারাকপুরে ওর ভগ্নীর বিয়ে হয়েছে—আত্মীয়ই বলা চলে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ভূতনাথ। ভগবান সহায় থাকলে নরকে গিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কথাটা ভূষণকাকার। সে-কথার সত্যতার প্রমাণ আজ যেন হাতে-হাতে পাওয়া গেল এই কলকাতায় এসে।

রাস্তায় চলতে-চলতে একবার মনে হলো—এখন যদি হঠাৎ ননীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এত বড় কলকাতা শহরে খুঁজে পাওয়া অবশ্য মুশকিল। তা আজ না হোক—কাল হোক, পরশু হোক একদিন দেখা হবেই। ননীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

বউবাজার স্ট্রীট দিয়ে বনমালী সরকার লেন-এ ঢুকতেই প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। বেশ ছায়া হয়েছে চারদিকে। এইখান দিয়েই ঢুকতে হবে গলির ভেতরে।

একটা বেঁটে কালোপানা লোক গাছতলায় বসেছিল। ডাকলে—আসো বাবু আসো—

ভূতনাথকে বাবু বলে ডাকা এই বুঝি প্রথম। মনে হলো—তার হাব-ভাব দেখে বুঝতে পেরেছে নাকি যে গ্রাম থেকে আজ নতুন এসেছে ভূতনাথ?

—তোমার বাসনা সিদ্ধ হবে বাবু, সিদ্ধ হবে—বলতে বলতে এক কাণ্ড করে বসলো লোকটা। বলা নেই কওয়া নেই কড়ে আঙুলে সিঁদুরের ফোঁটা নিয়ে লাগিয়ে দিল ভূতনাথের কপালে। বললে—সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ে কিছু প্রণামী দাও বাবু—যাত্রা শুভ হবে—মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে—

ভূতনাত এতক্ষণে ভালো করে দেখলে। বটগাছটার তলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে ইঁটের বেদী বাঁধানো। তারই ওপর নানা জানা-অজানা দেব-দেবীর মূর্তি ছড়ানো। শুধু সিদ্ধিদাতা গণেশ নয়। কালী, শিব, দুর্গা, মনসা, জগদ্ধাত্রী—পুতুলের মতো মাপের সব দেবতামণ্ডলী। ফুল, বেলপাতা, সিদুঁর আর অসংখ্য আধলা আর পয়সা ছড়ানো চারপাশে।

লোকটা আবার বলতে লাগলে—কপালে রাজটীকা আছে বাবু—অনেক পয়সা হবে—অনেক সুখ হবে। বাবুর তিনটা বিয়্যাহ হবে—

গড় গড় করে লোকটা অনেক সুসংবাদ শুনিয়ে গেল। হাসি পেলো ভূতনাথের। তিনটে

বিয়ে! মরেছি, চাকরি-বাকরি নেই, খাওয়াবো কি! ভূতনাথ পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল। বেলা হয়ে আসছে। স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

—প্রণামী দাও বাবু, প্রণামী—গণেশের ফোঁটা নিলে প্রণামী দিলে না—মহাপাতক হবে—দেবতার শাপ লাগবে—

বোধ হয় রেগে গেল পূজারী বামুন। ট্যাঁক থেকে একটা আধলা বার করে দিলে ঠাকুরের পায়ে, তারপর গড় হয়ে প্রণাম করলে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে। দেবতা সন্তুষ্ট হলেন কিনা কে জানে কিন্তু পূজারী বামুনের মুখ প্রসন্ন হলো।

হাতে একটা ফুল দিয়ে পূজারী বললে—বলো—নমামি—

হাত জোড় করে ভূতনাথ বললে—নমামি—

—সর্বসিদ্ধিদাতাঃ

—সর্বসিদ্ধিদাতাঃ

—বিনায়কং

—বিনায়কং

আরো কী কী বলেছিল, মনে নেই। লম্বা সংস্কৃত শ্লোক। ছাড়া পেয়ে ভূতনাথ গলির দিকে চলতে চলতে বাড়ির নম্বরগুলো দেখতে লাগলো। পকেট থেকে ব্রজরাখালের চিঠিটা আর একবার বার করলে ভূতনাথ। পাঁচ নম্বর—বনমালী সরকার লেন। এক নম্বর, দু'নম্বর করে—পাঁচ নম্বর বাড়িটা দেখেই চমকে গেল ভূতনাথ। এত বড় বাড়ি! এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সমস্তটা ঘুরে দেখে নিলে একবার। এ-বাড়ির নম্বর যে পাঁচ, সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু সন্দেহ হলো। এই ব্রজরাখালের বাড়ি! এখানে থাকে নাকি ব্রজরাখাল?

সামনে লোহার গেট খোলা। কিন্তু বিরাট এক যমদূতের মতো চেহারার দারোয়ান বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বুকে মালার মতো গুলীগুলো সাজানো।

সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে চেয়ে দেখতে ভয় হলো। বলা নেই কওয়া নেই—অমনি ভেতরে গিয়ে ঢুকলেই হলো নাকি। বাড়িটার উল্টো দিকে অনেকগুলো বাড়ি। একটা বাড়ির সামনে ছোট এক ফালি সিমেন্ট বাঁধানো রোয়াক। বসলো সেখানে ভূতনাথ। সেই সকাল থেকে হাঁটছে। পা দুটো বুঝি ব্যথা করে না! দেয়ালে পিঠ দিয়ে হেলান দিলে একটু। বনমালী সরকার লেন খুব বড় রাস্তা নয়। ট্রাম নেই এ-রাস্তায়। তবু লোকজন চলাচল আছে খুব। আস্তে আস্তে দুপুর গড়িয়ে এল। রাস্তাটা যেন একটু নিরিবিলি হয়ে আসছে। ভূতনাথের সমস্ত শরীরটা যেন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। একবার মনে হলো ফিরে যায় সেই জিলিপীর দোকানে—প্রকাশ ময়রার কাছে। একটা রাত তো থাকা যাবে তবু সেখানে। তারপর কাল তাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই চলবে। প্রকাশ লোকটা ভালো। ভগ্নিপতির দেশের লোক শুনে জিলিপীর দাম নেয়নি।

একটা ঘড়-ঘড় শব্দে ঘুম ভাঙলো ভূতনাথের। কখন সেই কঠিন রোয়াকের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই। সামনে দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে নজরে পড়লো। ঘোড়ায় টানছে গাড়িটা। চ্যাপটা চেহারার গাড়ি। কিন্তু পেছনের একটা অসংখ্যা ফুটোওয়ালা নল দিয়ে ঝির-ঝির করে জল পড়ছে। ধুলোর ওপর জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। ধুলো ওড়া বন্ধ হবে। কিন্তু খোয়ার রাস্তার ওপর গাড়ির লোহার চাকা লাগতে কী বিকট শব্দই না হচ্ছে।

উঠলো ভূতনাথ। সেই প্রকাশের জিলিপীর দোকানেই ফিরে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। বামুনের ওপর ভারি ভক্তি প্রকাশের। প্রকাশ শুধু চাল আর জল দিয়ে হাঁড়ি চাপিয়ে দেবে উনুনে, আর ভাত হলে নামিয়ে নেবে ভূতনাথ। ময়রার এঁটো বামুনকে খাইয়ে মহাপাতক হবে নাকি সে। যে-রাস্তা দিয়ে এসেছিল ভূতনাথ আবার সেই রাস্তা দিয়েই চলতে হয়।

—এ কী বড়কুটুম না?

চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে ভূতনাথ আশে-পাশে সামনে-পেছনে চেয়ে দেখলে। চেনা মুখ

কেউ নেই। কে তবে ডাকলে তাকে? কিন্তু সামনের গোঁফ-দাড়িওয়ালা লোকটাই যে ব্রজরাখাল একথা কে বলবে!

ব্রজরাখাল বললে—কখন এলে?

—সকাল বেলা। বললে ভূতনাথ।

—আচ্ছা মুশকিল তো, সেই সকাল থেকে এই বিকেল পর্যন্ত রাস্তায় কাটিয়েছো নাকি? কী কাণ্ড দেখোদিকিনি—একটা চিঠি দিতে হয় তো আসবার আগে—কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধ হয়—সারাদিন হরিমটর—কপালে কী—?

ভূতনাথ কপালে হাত দিয়ে মুছতেই হাতের পাতায় সিঁদুর লেগে গেল। বললে—গণেশের ফোঁটা—

—ওই নরহরি দিয়েছে বুঝি—হুঁ—দেখোদিকিনি, ঠিক টের পেয়েছে, তুমি নতুন এসেছো গাঁ থেকে—চলো—এখন আমার সঙ্গে। যদি দেখা না হতো—টানতে টানতে নিয়ে এল ব্রজরাখাল বাড়ির ভেতর।

দারোয়ান ব্রিজ সিং আপত্তি করলে না। ব্রজরাখাল ভূতনাথকে নিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকলো। বিরাট বাড়ি। কোথায় কোন দিকে কে থাকে, কোথায় রান্না হয়, কে কোথায় খায়! অসংখ্য লোক ঘোরাফেরা করছে। কেন করছে কেউ বলতে পারে না।

ব্রজরাখাল সোজা চললো সামনে। আসল বড়বাড়িটা ডানদিকে রেখে, পেছনের পূব-পশ্চিম বরাবর লম্বা বাড়িটার নিচে এসে দাঁড়ালো। একতলায় সার-সার তিনটে পাল্কি। তারপর ঘোড়ার গাড়ি। তার ওপাশে কয়েকটা ঘোড়া। মুখের দু'পাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শক্ত ইঁটের ওপর ঘন ঘন পা ঠুকছে। তারই পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ব্রজরাখালের পেছনে ভূতনাথ চললো।

ওপরে ডানদিকে সার-সার ঘর। চাকর-বাকর ঘোরা-ফেরা করছে। মেঝের ওপর ময়লা বিছানা গোটানো পড়ে রয়েছে পর পর। নাথু সিং তখন নিজের ঘরে লেঙট্ পরে পেতলের থালায় একতাল আটা মাখছে।

সব পার হয়ে পূবদিকের একেবারে শেষ ঘরটায় এসে দরজার তালা খুললো ব্রজরাখাল। ঘরে ঢুকে বললে—এই হলো আমার ঘর—আর এর পাশের ঘরটাও তোমায় দেখাই চলো—বলে পাশের আর একটা ঘর খুললে।—এটাও আমারই, কিন্তু আমার আর কে আছে বলো—খালিই পড়ে থাকে—যতো রাজ্যের জঞ্জাল জমে আছে—তুমিই না হয় এ ঘরটায় থেকো—

তারপর বললে—বিছানা-টিছানা তো কিছু আনোনি দেখছি—তাতে কিছু অসুবিধে হবে না, কিন্তু তুমি হলে আবার বড়কুটুম কিনা, একটু খাতির-যত্ন না করলে নিন্দে হবে—কী বলো—

ব্রজরাখাল নিজের তোষক বিছানা পেতে দিলে ভূতনাথের জন্যে। বললে—আমার জন্যে তুমি ভেবো না, আমি সন্নিসী মানুষ—আমার ও-সব কিছু লাগে না—

সত্যিই ব্রজরাখাল সন্ন্যাসী মানুষ। আপিসের ধুতি আলপাকার কোট খুলে একটা গেরুয়া রং-এর ছোট ফতুয়া পরলে। আর গেরুয়া ধুতি—কাছা কোঁচাহীন। ভূতনাথের এতক্ষণে নজরে পড়লো দেয়ালের গায়ে একটা মস্ত বড় সাধুর ছবি। ফুলের মালা ঝুলছে ছবির গায়ে। নিচে কুলুঙ্গীর ওপর কয়েকটা বই—অনেকটা গীতার মতন চেহারা। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ও কার ছবি ব্রজরাখাল?

—প্রণাম করো ওঁকে—বলে ব্রজরাখাল নিজেই আগে সভক্তি প্রণাম করলে। তারপর মাথা তুলে বললে—আমার গুরুদেব—পরমহংসদেব—এখন দেহরক্ষা করেছেন—

খানিক থেমে বললে—সারাদিনটা তো উপোস—আজ রাত্রে কী খাবে বলো তো বড়কুটুম—আমি তো মাছ মাংস খাইনে—অড়র ডাল ভাতে দিয়ে দেবো'খন আর গাওয়া ঘি আছে, ব্রিজ সিং-এর দেশ থেকে আনা—সঙ্গে একটু আলুর দম করি, কী বলো?

ভূতনাথের মনে আছে সেই বিকেলবেলা ব্রজরাখাল নিজের হাতে উনুনে আগুন দিয়ে ভাত চড়িয়ে দিলে। তারপর এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না সেরে খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ে বললে—এইবার শুয়ে পড়ো আরাম করে—আমি ততক্ষণ ছেলেদের পড়িয়ে আসি—

ব্রজরাখাল ধুতি চাদর পরে ছেলে পড়াতে গেল। ভূতনাথ নিজের বিছানায় শুয়ে আবোল-তাবোল নানা কথা ভাবতে লাগলো। সেদিনকার সেই ব্রজরাখাল—বর-বেশী ব্রজরাখাল—এ হঠাৎ এমন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে যেন। মাছ-মাংস খায় না। কোন্ সাধুর শিষ্য? কোথাকার পরমহংসদেব? কে তিনি? কেনই বা এই চাকরি করছে সে? কার জন্যে? ঘুমের মধ্যে কত রকম শব্দ কানে আসতে লাগলো। একতলায় ঘোড়াগুলো শক্ত সিমেন্টের মেঝের ওপর পা ঠুকছে। গেটের ঘড়িঘরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। আশেপাশের ঘর থেকে চাকর-বাকরদের হাঁক-ডাক শোনা যায়। কোথা থেকে যেন কালোয়াতী গানের সুর ভেসে আসছে। ইমনকল্যাণের খেয়াল। সঙ্গে তবলা। রাত বাড়তে লাগলো। রাধার কথা মনে পড়লো। এ-সংসার তো তারই। কপালে নেই তার। হয় তো রাধা মরে গিয়েছে বলেই ব্রজরাখালের এই বৈরাগ্য।... ননীর সঙ্গে দেখা করলে হয় একবার। খুব চমকে যাবে। ননী কোন কলেজে ভর্তি হয়েছে কে জানে। প্রকাশ ময়রা জিলিপী ভাজতে জানে বটে। জিলিপী করা কি যার-তার কাজ। অমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে—কিন্তু গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে বটে প্রকাশের। এই বাজারে দুটো পয়সা কে ছাড়ে অমন!... অনেক রাতে ঘুমের মধ্যে মনে হলো যেন গেট খোলার শব্দ হলো। ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ—একটা গাড়ি যেন এসে দাঁড়ালো নিচের একতলায়। লোকজনের কথাবার্তা। চাকরদের ছুটোছুটি।

কেমন যেন ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। নতুন জায়গা, নতুন বিছানা। তন্দ্রার মধ্যে যেন কেমন একটা অসহ্য অস্বস্তিতে বিছানা ছেড়ে উঠলো। যেন গলা শুকিয়ে এসেছে। ডাকবে নাকি ব্রজরাখালকে? বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ঘরের ভেতর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। মনে পড়ে গেল ফতেপুরের কথা। কাল এই সময় সে ছিল ফতেপুরে আর আজ এই কলকাতায়। ফতেপুরের আকাশেও এমনি চাঁদের আলো এখন। গাঙের ধারে কুঁচগাছের ঝোপে জঙ্গলে আচমকা ছাতার পাখির ঝাপ্টানির শব্দ হচ্ছে। মাঝরাত থাকতেই হর গয়লানীর মেয়ে বিন্দী উঠেছে মল্লিকদের বাগানে আম কুড়াতে। মালোপাড়ায় বেহুলার ভাসান গানের ঢোলের আওয়াজ অস্পষ্ট ভেসে আসছে। মুক্ত দেশ—কত বিচিত্র মানুষ—এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের মিল নেই—কিন্তু আকাশ একটা—যে আকাশ কলকাতার মাথায়—সে আকাশ ফতেপুরের মাথাতে—সে আকাশ সর্বত্র। একশ' বছর আগেও এই আকাশ ছিল—একশ' বছর পরেও থাকবে—

ভূষণকাকা বলতো—তুই থাম তো ভূতো—যতো সব বিদঘুটে বিদঘুটে ভাবনা—

মল্লিকদের তারাপদ বলতো—ও বোধ হয় বড় হয়ে কবিয়াল হবে কাকা—মধু কামারের মতো পালা-যাত্রার গান বাঁধবে—

কবিয়াল ভূতনাথ হয়নি। হয়েছে শেষ পর্যন্ত ওভারশিয়ার। কিন্তু সে-সব কথা যাক, সেই মাঝরাত্রে ভূতনাথ ডাকতে লাগলো—ব্রজরাখাল—ও ব্রজরাখাল—ও শব্দটা কিসের? উত্তর নেই। মাঝখানের দরজাটা ভেজানো ছিল। সেটা খুলতেই ভূতনাথ অবাক হয়ে দেখলে ঘরের মাঝখানে যোগাসনে বসে আছে ব্রজরাখাল। আবছা আলো-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না—কিন্তু মনে হলো ব্রজরাখাল যেন তন্ময় হয়ে আছে কোন্ দুশ্চর তপস্যায়। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সামনের দেওয়ালে সেই সাধুর ছবিটা ঝুলছে। শিরদাঁড়া সোজা—চোখ দুটিও বোজা—শরীরে প্রাণস্পন্দনের লেশমাত্রও নেই বুঝি। ভূতনাথ আবার ডাকলে—ব্রজরাখাল—

এবারও উত্তর নেই। ভূতনাথের মনে হলো ব্রজরাখাল এখন যেন আর সামান্য ব্রজরাখাল নয়, মথুরায় গিয়ে রাজা হয়ে বসেছে—রাধার নাগালের বাইরে—। ফতেপুরের নন্দজ্যাঠার এগারো বছর বয়সের সেই নগণ্য মেয়ে রাধা!

সকালবেলা ব্রজরাখালের ডাকেই ঘুম ভাঙলো। কিন্তু ব্রজরাখাল ততক্ষণে স্নান করে তৈরি। বললে—ওঠো হে বড়কুটুম—এত দেরি করলে চলবে না, এখানে ঘড়ি ধরে সব কাজ হয়—এ কলকাতা—এ তোমার গিয়ে ফতেপুর নয়—

কত রাত্রে যে ব্রজরাখাল শুলো, কখন ঘুমালো আর কখনই বা উঠলো কে জানে! ভূতনাথ উঠে দেখলে ব্রজরাখাল ততক্ষণে রান্নাঘরে গিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। সকালবেলা বাড়িটার চারদিকে চেয়ে দেখলে এক পলক। দক্ষিণ দিকে জানালা দিয়ে দেখা যায় মস্ত বড় বাগান। মাঝখানে একটা পুকুর। ব্রজরাখাল এল হঠাৎ। বললে—এটা খেয়ে নাও দিকিনি বড়কুটুম।

এক কাঁসি ফ্যানে-ভাত। ব্রজরাখাল বললে—খেয়ে দেখো খাঁটি ঘি দিয়েছি—তোমাদের ফতেপুরের ঘিয়ের চেয়ে ভালো—

ব্রজরাখালের ব্যবহারে ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। কোথাকার কে নন্দজ্যাঠা—তার মেয়ে রাধা—সেও তো আর বেঁচে নেই—কী-ই বা সম্পর্ক—অথচ এমন করে আপন করে নিতে পারে পরকে! ভূতনাথ বললে—তুমি খাবে না?

—আমার ভাত ওদিকে তৈরি—এখনি ন'টার ঘণ্টা পড়বে—আমিও আপিসে বেরুবো—হাঁটতে হাঁটতে আপিসে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবো ঠিক—তারপর ফিরতে যার নাম সেই—

খানিকটা পরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে তৈরি হয়ে পড়লো ব্রজরাখাল। সেই ধুতির কোঁচাটা কোমরে গুঁজে আলপাকার কোটটা চড়ালে গায়ে। তারপর যাবার আগে বললে—এইটে রাখো তো বড়কুটুম—এই পুরিয়াটা—

—কী এটা—ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—হোমিওপ্যাথিক ওষুধের পুরিয়া, যদি কেউ এসে ওষুধ চায়, বলে—মাস্টারবাবু কোনও ওষুধ রেখে গিয়েছে—তা দেবে এইটে। আমি বলেছি কিনা বংশীকে যে, আমার সম্বন্ধীর কাছে রেখে যাবো—

ভূতনাথের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে ব্রজরাখাল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—চেয়ে দেখছো কি—ডাক্তারিও জানি—তোমার বোনকেই শুধু যা বাঁচাতে পারলাম না—আমার রুগীদের মধ্যে ওই একজনই যা মরে গিয়েছে—নইলে এ পাড়ায় আমার খুব নামডাক হে—বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরে এল খানিক পরে। বললে—একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—যদি রাস্তায় বেরোও তো বেশি দূর যেও না—নতুন মানুষ, হারিয়ে যাবে—আর একটা কথা, তুমি ভেবো না, তোমার চাকরিরও একটা চেষ্টা করছি—তবে বাজার বড় খারাপ কিনা—

ব্রজরাখাল চলে গেল। এ যেন একেবারে অন্য মানুষ। কখন সে ভাত রাঁধলে নিজের হাতে, কখন খেলে—আবার আপিসেও চলে গেল—ন'টার ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। কাজের মানুষ বটে। ঘর ছেড়ে আর একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো ভূতনাথ। কত বড় বাড়ি। এখানে দাঁড়ালে বাড়ির বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। বড়বাড়িটার ভিতরে যে কোনও মানুষ বাস করে বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। শুধু বাইরেই যা তোড়জোড়—নড়াচড়া—হাঁকডাক। চারদিকে চেয়ে দেখতেই বেলা বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে রান্নাবাড়ির দিকে গেল। পাশেই সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে স্নান করবার জায়গা। নতুন জলে স্নান করা উচিত নয়। মুখহাত পা ধুয়ে ওপরে রান্নাঘরে ঢুকলো। খাবার ঢেকে রেখেছে ব্রজরাখাল। এক হাতে অনেক রান্না করেছে বটে। ডাল, ঝোল, ভাত।

সবে থালা বাটি গেলাস সাজিয়ে বসেছে খেতে—এমন সময় দরজার পাশে কে উঁকি দিলে।

—কে? ভূতনাথ দরজার দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করলে। লোকটা কিন্তু সামনে এল না। আড়াল থেকে বললে—আপনি খান আগে—আমি আসবো'খন পরে—

লোকটা সত্যি সত্যিই পরে এল। ভূতনাথ ততক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসন-কোসন মেজে রান্নাঘর ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে। এসে বললে—আপনি মাস্টারবাবুর শালা—

রোগা ক্ষয়া-ক্ষয়া চেহারা। তেল-চক্চকে তেড়ি-কাটা মাথা। আধ-ময়লা ধুতিটা কোঁচা করে কোমরে গোঁজা। বললে—আমি বংশী—

ভূতনাথ ওষুধের পুরিয়াটা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—অসুখ কার—

—আজ্ঞে চিন্তা'র।

—চিন্তা কে?

—ছোটমা'র ঝি—

—কী অসুখ?

—ম্যালেরিয়া—কবিরাজমশাই তো বলেন ম্যালেরিয়া—দেশে গিয়ে অসুখ বাঁধিয়ে এনেছে, আমার বোন হয় সে, এই ছোটবেলা থেকে কলকাতায় আছে কিনা, দেশে গাঁয়ের জল আর সহ্য হয় না পেটে, আমার বিয়েতে সেবার গেল দেশে, বললুম অতো করে—পুকুর ঘাটে জল ঘাঁটিসনে চিন্তা, তা কি শুনবে—ছোটমা'র আদর পেয়ে পেয়ে কথার বড় অবাধ্যি হয়ে উঠেছে আজ্ঞে—এখন এক গেলাস জল খেতে গেলে ছোটমা'কে নিজে গড়িয়ে খেতে হয়।

তারপর চলে যেতে গিয়ে থামলো বংশী। বললে—ছোটমা বলে বটে যে বংশী তোর নিজের মায়ের পেটের বোন, তুই বউবাজারের শশী ডাক্তারকে দেখা। আমি বলি—থাক। মাস্টারবাবু কি ছোট ডাক্তার—বড়বাড়ির সমস্ত লোক ভালো হয়ে যাচ্ছে ওর ওষুধ খেয়ে—তা আজ্ঞে ছোটমা'র দেখুন কি জ্বালা, এই সাবু আনো মিছরি আনো—ফলফুলুরি আনো—হ্যান্ আনো—ত্যান্ আনো—তা খরচার বেলায় তো সেই ছোটমা—

বংশী গলা নিচু করলো এবার। বললে—এ বাড়ির সবার যে আজ্ঞে হিংসে আমাদের দু'জনের ওপর—কেউ তো ভালো চোখে দেখে না কিনা—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিসের হিংসে—হিংসে কেন?

—ওই যে মধুসূদনকে দেখছেন—

—কে মধুসূদন? ভূতনাথ মধুসূদন কেন কাউকেই এখনও দেখেনি।

বংশী বললে—তোষাখানায় একদিন যাবে—ওই মধুসূদনই তোষাখানার সর্দার কিনা—আমাদের পাশের গাঁয়ে বাড়ি হুজুর—বললে বিশ্বেস করবেন না, আমার আপন পিসীর সম্পর্কে ভাসুর হয় আজ্ঞে—আর তার এই কাণ্ড—বুঝুন—

—কী কাণ্ড—

—সে অনেক কথা হুজুর—অনেক কথা—বলে বসলো বংশী। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গলা আরো নিচু করলো।

বংশীর অনেক অভিযোগ। এত বড় বাড়ি—কত পুরুষ আগে থেকে বংশপরম্পরায় কত দাস-দাসী, কত লোকজন আসা-যাওয়া করছে। কত বংশের ভরণ-পোষণ জীবিকানির্বাহ নির্ভর করেছে এই চৌধুরী-পরিবারের দান-ধ্যান ধর্মানুষ্ঠানের সূত্রে। গ্রাম-কে-গ্রাম ঝেঁটিয়ে এসেছে চাকরির চেষ্টায় এখানে। উঠেছে এসে এই চৌধুরী-বাড়িতে। ওই মধুসূদন এখন তোষাখানার সর্দার। ওর কোন্ পূর্ব-পুরুষ কবে কী সূত্রে এসে আশ্রয় পেয়েছিল কর্তাদের আমলে। তারপর সংসারের আয়তন বেড়েছে, আয়োজন বেড়েছে, আয় বেড়েছে, ধনে জনে প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে চৌধুরী বংশের প্রসার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়, স্বজন, পরিজন, বন্ধুবান্ধব, পরিষদ, মোসাহেব, দাস-দাসী—তাদের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন্ সুদূর বালেশ্বর, কটক, বারিপাদা জেলা থেকে মধুসূদনের পূর্বপুরুষের আত্মীয়-পরিজন গ্রামবাসীরা এসে জুটেছিল এখানে। এসে ভার নিয়েছিল এক-একটা কাজের। ভিস্তিখানা, তোষাখানা, রান্নাবাড়ি, কাছারিবাড়ি, বৈঠকখানা, সেরেস্তা অলঙ্কৃত করেছে। পূজোয়, পার্বণে, উৎসবে, আনন্দে যোগ দিয়েছে পরিবারের একজনের মতো। দেশে গিয়েছে, বিবাহ করেছে—আবার ফিরেও এসেছে, দেশে টাকা পাঠিয়ে

দিয়েছে মাসে মাসে। এ-সংসারে তাদের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য, এ-সংসারও তেমনি তাদের জীবিকার পক্ষে অনিবার্য। এ-পরিবারের কেউ-ই পর নয়। সাধারণ পর্ব উপলক্ষে, দোল-দুর্গোৎসবে তারা নতুন কাপড় পেয়েছে, পার্বণী পেয়েছে। শুধু তারা কেন, একটা কুকুর-বেড়ালেরও ন্যায্য অধিকার আছে এ-বাড়ির ওপর। এখানে কেউ অনাত্মীয় নয়—সবাই আপন—সবাই অনস্বীকার্য।

কিন্তু সেদিন বদলে গিয়েছে। বংশী গলা নিচু করে বলে—কিন্তু সেদিন বদলে গিয়েছে হুজুর—এখন এক-একজন চাকরি পাবে আর মধুসূদনকে পাঁচ টাকা করে বাদ দিতে হবে—আর চাকরি যতদিন না হবে, ততদিন বছরে তাদের কাছে এক টাকা করে বাব্ আদায় করবে—এই যে আমার বিয়ে হলো না—ওকে দিতে হলো ওর দস্তুরী—বিয়ের দস্তুরী আজ্ঞে দশ টাকা—এই ধরুন যদি আমার সঙ্গে যদুর মা'র ঝগড়া হয় আর ও যদি মিটিয়ে দেয়—ওর আদায় হবে চার আনা, আমি দেবো দু'আনা, আর যদুর মা দেবে দু'আনা—আমার যদি ছেলে হয় আজ্ঞে তো ওকে দিতে হবে সোয়া শ' পান আর পৌনে পাঁচ গণ্ডা সুপুরী—এই হলো নেয়ম—তা এত বড় পিশেচ আজ্ঞে ওই মধুসূদন—আমার যদ্দিন চাকরি হয়নি, তদ্দিন আমার মাইনে হবার পর থেকে এক টাকা করে কেটে নিয়েছে। তা মাস্টারবাবুর কাছে শুনেছি আপনি এখানে থাকবেন এখন—চাকরি করবেন এখানে—অনেক সব দুঃখের কথা বলবো আপনাকে—আমি পুরুষ মানুষ, আমার জন্যে ভাবিনে আজ্ঞে—নিজে গতরে খেটে দেনা-পত্তর শোধ করে দেবো একদিন—কিন্তু ওই চিন্তার জন্যেই তো ভাবনা।

ভূতনাথ বললে—কেন?

—আজ্ঞে গরিবের ঘরে জন্মেছে, না খাটলে চলবে কেন, কে তোকে বসে বসে খাওয়াবে—সোয়ামী থাকলে সেও খাটিয়ে নিতো, শুধু শুধু খেতে দিতো না, তা সোয়ামীকে তো খেয়েছে, এখন ছোটমা-ই ভরসা—তা ছোটমা-ই বা ক'দিক দেখবে।

ভূতনাথ বললে—তোমার ছোটমা বুঝি চিন্তাকে খুব ভালবাসেন?

—ভালোবাসলে হবে কি শালাবাবু, তার যে নিজেরই শতেক জ্বালা।

—কিসের জ্বালা?

—সে-সব অনেক কথা, পরে বলবো আপনাকে—তা ছোটমা ভালোবাসেই বলেই তো মধুসূদন দেখতে পারে না আমাদের। শুধু মধুসূদন কেন, মধুসূদনের দলের কেউ দেখতে পারে না, ও গিরিই বলুন, সিন্ধুই বলুন, সদুই বলুন, রাঙাঠাকুমাই বলুন—কেউ না, এমনকি বেণীও নয়।

—বেণী কে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—আজ্ঞে বেণী হলো মেজবাবুর চাকর—অথচ দেখুন সবাই এক জেলার লোক আমরা—বেণী তো আমার গাঁয়ের লোকই বটে।

আশ্চর্য! ভূতনাথও আশ্চর্য হয়ে গেল।

—রাঙাঠাকুমাকে আপনি দেখেননি আজ্ঞে।

—কে রাঙাঠাকুমা?

—ভাঁড়ারে থাকে, ভাঁড়ার দেখে-শোনে, ওই মধুসূদনের সম্পর্কে রাঙাঠাকমা হয় বলে—এ বাড়ির আমরাও সবাই রাঙাঠাকমা বলি—তা সেই রাঙাঠাকমাকে গিয়ে কাল বললাম আজ্ঞে—পোঁটাক সাবু দাও আর মিছ্রী আধপো—। শুনে নানান কথা—কে খাবে, কেন খাবে, হ্যান ত্যান। আমি বললাম ছোটমার হুকুম। তখন বলে—ছোটবৌমা নিজের ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালে না, তোকে দিয়ে কেন বললে রে বংশী? আমি বললাম—চিন্তার যে অসুখ, সে কি নড়তে পারে। তখন বললে—ছোটবৌমাকে গিয়ে বলগে—একটা চিরকুট নিখে দিক—আমি গিয়ে বললাম সব ছোটমাকে। ছোটমা বললে—কাজ নেই বংশী—পয়সা নিয়ে দোকান থেকে কিনে আনগে, ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। বলে টাকা দিলে আমাকে।—অথচ দেখুন আজ্ঞে—

বংশী আবার বলতে লাগলো—অথচ দেখুন, এই যে গিরি, মেজমা'র পেয়ারের ঝি, তার একাদশীতে ফল, পুন্যিমেতে পাকা ফলার—সব যোগান দেবে রাঙাঠাকমা। ছোটমা ভালো মানুষ,

তা সংসারে ভালো মানুষ হওয়াও খারাপ শালাবাবু।

বংশীর কথার হয় তো শেষ নেই। কিন্তু যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার উঠলো সে। বললে—যাই আবার ছোটবাবু হয় তো ঘুম থেকে উঠবে এখনি—উঠে যদি ওপরে যায় তো মুশকিল।

ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। বললে—এখন? এই বেলা বারোটার সময়?

বংশী বললে—তা ছোটবাবুর এক-একদিন ঘুম থেকে উঠতে দুপুর দুটোও বেজে যায়—তারপর তখন উঠে ভাত খাবেন সেই বিকেল পাঁচটায়। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললে—যাই আমি, অনেকক্ষণ বসলাম, আজকে বিকেলবেলা আবার বার-বাড়িতে রাক্ষস দেখতে যাবো—যাবেন নাকি দেখতে? ডাকবো'খন আপনাকে—

—রাক্ষস? ভূতনাথ যেন ভুল শুনেছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নর-রাক্ষস আর কি—একটা জ্যান্ত পাঁঠা খাবে, কালকে সরকারবাবু নিজে হাতীবাগানের বাজার থেকে পাঁঠা কিনে এনেছে—ওই যে দেখুন না, জানলা দিয়ে—পুকুরের পাড়ে খোঁটায় বাঁধা রয়েছে, চরে চরে ঘাস খাচ্ছে তা কচি বেশ, এখনও শিং গজায়নি— কালো রং—

ভূতনাথের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে বংশী বললে—এ আপনার গিয়ে সব মেজকত্তার সখ, ভারি সৌখিন মানুষ আপনার এই মেজকত্তা—সেদিন সুখচর থেকে একজন লোক এসে বাজি রেখে দশ সের রসগোল্লা খেয়ে গেল—বাজি ছিল খেতে পারলে মেজকত্তা নগদ পাঁচ টাকা দেবে—ভৈরববাবুও খেতে বসেছিল—তিন সের খেয়েই হেঁচকি তুলতে লাগলো—তা সে নগদ পাঁচটা টাকাও নিলে, দশ সের রসগোল্লাও খেলে, আবার মেজকত্তা খুশি হয়ে একটা গরদের উড়ুনি দিলেন তাকে।

একলা ঘরে বসে বসে ভূতনাথের সময় আর কাটে না। একবার মনে হলো—রাস্তায় বেরোয়। কিন্তু অচেনা জায়গা, কোথায় গিয়ে শেষে চিনে চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না। আসুক ব্রজরাখাল। প্রথম দিন তার সঙ্গে বেরুবে।

জানালা দিয়ে আবার চেয়ে দেখলে দক্ষিণ দিকে। পুকুরের পাড়ে পাঁঠাটা বাঁধা রয়েছে। আপন মনে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। বাগানে একজন মালী গাছের গোড়াগুলো খুঁড়ে দিচ্ছে। কোণের মেথরপাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলা করছে রাস্তার ওপর। আর তারপর বুঝি ধোপাদের ঘর। দড়িতে সার সার অসংখ্য শাড়ি কাপড় জামা শুকোচ্ছে।

ঘরের দেয়ালের তাকে হঠাৎ ভূতনাথের নজর পড়লো—পুরনো কাগজপত্রের জঞ্জালের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে এক জোড়া বাঁয়া তবলা। কার জিনিস কে জানে। ব্রজরাখালের এ দিকেও সখ আছে নাকি? সর্বাঙ্গে ধুলো মাখা। বোধ হয় বহুদিন কেউ হাতে দেয়নি। মনে পড়লো ভূতনাথের—সেই ফতেপুরের বারোয়ারিতলার যাত্রাদলের কথা। একদিন এই নিয়ে কত মাথাই না ঘামিয়েছে। সাত মাত্রার যৎ, আবার আট মাত্রার যৎ! বিলম্বিত লয়ের কাওয়ালি আর একতালা। দুন, চৌদুন, তেহাই। রসিক মাস্টার বলেছিল—ডুগি তবলায় খাসা হাত তো ছোকরার।

কেমন যেন ইচ্ছে হলো ভূতনাথের তবলা বাজাতে। কিন্তু ভয় হলো যদি কেউ আপত্তি করে। কোথায় পরের বাড়িতে থাকা। ব্রজরাখালের নিজেব বাড়ি তো আর নয়। তবলাটায় হাত বুলিয়ে সামনের তর্জনীটা দিয়ে দু'-একটা টোকা মেরে আবার রেখে দিলে। ঘাটিগুলো বাঁধা নেই। কেমন যেন মরা আওয়াজ বেরুলো। সামনের রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালার ডাক কানে আসে—বাসন চাই—পেতল কাঁসার বাসন—

কাঁসি ঘণ্টা বাজিয়ে কাঁসার বাসন বেচতে চলেছে। সামনের আস্তাবলবাড়ির কার্নিসের ওপর একটা চিল চুপ করে বসে ছিল, এবার হঠাৎ অকারণে চিঃ হিঃ ইঃ শব্দ করে তীর বেগে উড়ে

পালালো। আর একজন ফেরিওয়ালা কী একটা অদ্ভুত চিৎকার করতে করতে চলেছে। প্রথমটা কিছু বোঝা যায় না, অনেকক্ষণ শোনার পর বোঝা গেল। বলছে—ক্‌য়ো—র—ঘ—টি তো লা-আ—আ—

ভূতনাথের আজও মনে আছে সে-কলকাতার সেই প্রথম দিনের দুপুরটা যেমন রোমাঞ্চময় লেগেছিল, জীবনে আর কোনও দিন তেমন লাগেনি। সেই তার স্বপ্নে-দেখা কলকাতার সঙ্গে চোখের সামনের কলকাতাকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল সে। শুধু বাড়ি—আর বাড়ি। এত বড় বড় বাড়ি। মল্লিকদের তারাপদ'র দেখা কলকাতার সঙ্গে কি তা মিলেছে? পিসীমা যদি বেঁচে থাকতো তো ভয়ে হয়তো তার ঘুমই হতো না। তার ভূতনাথ এত বড় কলকাতায় কোথায় হয় হারিয়ে যাবে, হয়ত তো গাড়ি চাপা পড়বে—সেই ভয়।

বিকেল হতে তো অনেক দেরি আছে। ভূতনাথ ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরুলো। ব্রিজ সিং বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলো গেট-এ। কিছু বললে না।

খোয়ার রাস্তা। এবড়ো-খেবড়ো। বনমালী সরকার লেন-এ তখনও পিচ বাঁধানো হয়নি। দুপুরের নির্জন রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে মোড়ের মাথায় আসতেই মনে পড়লো সেই নরহরির কথা। বুড়ো অশথ গাছটার তলায় চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। কেউ নেই কোথাও। দেব-দেবীরা সব সাজানো পড়ে আছে। ফুল-বেলপাতা শুকিয়ে আমসী হয়ে গিয়েছে। নৈবিদ্যির চাল দু-একটা ছড়ানো এদিক ওদিক। কিন্তু নরহরি নেই। এবার হঠাৎ যেন ভক্তিভরে ভূতনাথ—কোন্ দেবতাকে লক্ষ্য করে কে জানে—প্রণাম করলে। বেদীর কাছে গিয়ে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলে। ফতেপুরের বারোয়ারিতলার মঙ্গলচণ্ডীর কাছে যেমন প্রণাম করে কামনা করতো ভূতনাথ, তেমনি মনে মনে প্রার্থনা করলে—মঙ্গল করো মা, মঙ্গল করো। ভূতনাথের আর কোনও প্রার্থনা মনে এল না। কার মঙ্গল, কী মঙ্গল, সে প্রশ্ন নয়। সমস্ত মঙ্গল হোক্। তার নিজের মঙ্গল, ব্রজরাখালের মঙ্গল—তারপর, ভূষণকাকা—ননী, রাধার আত্মার মঙ্গল। বিশ্ব-সংসারে সকলের—সকলের মঙ্গল। ওই বংশী, ওর বোন চিন্তা, ওর ছোটমা, ছোটবাবু, মধুসূদন—সকলের মঙ্গল।

বড় রাস্তার ওপর যেতে ভয় হলো ভূতনাথের। টগ্‌বগ্ করে সেই কালকের মতো ট্রামগাড়ি চলেছে। ঘোড়ার গাড়িওয়ালার ঘোড়াকে ছিপটি মারতে মারতে চলেছে হু হু করে। মুখে এক অদ্ভুত শব্দ করছে—উ-উ-উ-উ—। আবার কেউ বলছে—টি-টি-টি-টি—

একটু ও-পাশে একটা বাড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলো। ছেলেদের স্কুল। ভূতনাথ পড়ল। বেঙ্গল সেমিনারি। স্কুলের সামনে গোটাকতক কাবুলিওয়ালা অদ্ভুত ভেলভেটের হাতকাটা জামা আর ঢিলে-ঢালা সাদা পাঞ্জাবী পরে বসে আছে। বসে বসে ফল বেচছে। একটা কাপড়ের ওপর আঙুর—বেদানা—বাদাম—ছড়ানো।

গঞ্জের স্কুলের কথা মনে পড়লো। সে ছিল প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা ঘর। এমন দোতলা পাকা দালান নয়। সামনের দিকে এগিয়ে গেল ভূতনাথ। তাদের ফার্স্ট ক্লাশে সংস্কৃত বই ছিল হিতোপদেশ। পড়াতেন শরৎ পণ্ডিত। লম্বা করে নস্যি নিতেন। সর্বদাই বোয়াল মাছের মতো গোল-গোল লাল চোখ। টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো তাঁর। ভূতনাথ ভারি ভয় করতো তাঁকে। ধাতুরূপ মুখস্থ বলতে না পারলে মাথায় গাঁট্টা মারতে মারতে ঢিপ করে কিল বসিয়ে দিতেন পিঠে। রাগ হলে চিৎকার করে বলতেন—এই গর্দভ—

শরৎ পণ্ডিতের অস্ত্র ছিল শুধু হাতের গাঁট্টা।

অঙ্কের মাস্টার হরনাথবাবুর অস্ত্র ছিল খাকের কলম। দুই আঙুলের মধ্যে খাকের কলমটি দিয়ে জোরে এমন টিপে ধরতেন যে, মনে হতো বুঝি বিছে কামড়িয়েছে।

আর হেডমাস্টার অবনীবাবুর বেত। দারোয়ান সত্যনারায়ণ ছিল বেতের ভাঁড়ারি। বড়, মাঝারি, ছোট, নানা মাপের বেত সাজানো থাকতো লম্বা লম্বা বাঁশের নলের মধ্যে। চিৎকার করে অবনীবাবু ডাকতেন—আমার কেন্—

কেন্ মানে বেত।

অবনীবাবু বাঙলা ভাষায় বেত বলতেন না। শাস্তির গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে বোধ হয় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ যেন বেতের আঘাত কম, আর কেন্-এর আঘাত প্রচণ্ড। সত্যনারায়ণের কাছ থেকে ধারে জিভে-গজা খেয়ে ধার শোধ না করলে—ছোট বেত।

পঞ্চাননের ভাগ্যে তিন রকম বেতই জুটতো।

সেই পঞ্চানন! ভূতনাথের এতদিন পরে আবার পঞ্চাননকে মনে পড়লো। একদিন হঠাৎ পুলিশে ধরে নিয়ে গেল সেই পঞ্চাননকে। ম্যাজিস্ট্রেটের বাগান থেকে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। বিচারে জেল হয়ে গেল পঞ্চাননের তিন মাস। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে পঞ্চানন আর গ্রামে আসেনি। কোথায় যে উধাও হয়ে গেল কেউ জানতে পারলে না।

স্কুলের সামনে থেকেই কেমন একটা হৈ-চৈ গণ্ডগোল শোনা গেল। ওদিক থেকে ছেলেরা চিৎকার করছে—আর এদিক থেকে কাবুলিওয়ালারাও চিৎকার করে। কী বিকট ভাষা এদের! গোটাকতক শব্দ কেবল—কিছু মানে বোঝা যায় না। ওদিক থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো ছেলেরা—আর এরা কিছু না পেয়ে বড় বড় বেদানা ছুঁড়তে লাগলো ছেলেদের লক্ষ্য করে।

রাস্তাময় বেদানা ডালিম আঙুর নাশপাতির ছড়াছড়ি। ভিড় জমে গেল চারদিকে। চার-পাঁচটা কাবুলিওয়ালা যেন পাগলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো। হাতের লম্বা লাঠিগুলো নিয়ে ঘোরাতে লাগলো। দমাদম জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে গেল বেঙ্গল সেমিনারির। স্কুলের নাম লেখা সাইন বোর্ডখানা টেনে নামিয়ে ভেঙে দিলে।

ভূতনাথের কেমন অবাক লাগলো—কেন হঠাৎ এই মারামারি। অথচ একটু আগেও তো কোনো কিছু ছিল না। ছেলেরা ফল কিনছিল ওদের কাছে।

—কী হলো মশাই—কী হলো?

যে যা পারলে দুটো চারটে বেদানা কুড়িয়ে পকেটে পুরলে।

একজন বললে—ছেলেদেরও দোষ।

কেন?

—ওরা ওদের বেইমান বলেছে।

—বেইমান! বেইমান বলা এত বড় অপরাধ! হট্টগোলের মধ্যে থেকে ভূতনাথ বেরিয়ে এল। কয়েকটা লাল চামড়ার সাহেব পুলিশ ততক্ষণে এসে পড়েছে। ভয়ে যে যেদিকে পারলে দৌড় দিলে। এখনি হয় তো লাঠি মারবে। ওরা ভয়ানক মারে। গোরাদের ক্ষমতা কি কম? এসেই চার-পাঁচটা কাবুলিওয়ালাকে ধরে ফেললে। তারপর দমাদম লাথি মারতে লাগলো স্কুলের বন্ধ দরজার ওপর। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া ট্রাম লোকচলাচল বন্ধ হয়ে গেল। হৈ হৈ কাণ্ড!

আবার বনমালী সরকার লেন-এর মধ্যে ঢুকে পড়লো ভূতনাথ। বুকটা তখনও তার দুরদুর করে কাঁপছে। বেইমান কথাটার মানে কী?

মনে আছে বহুদিন আগে পঞ্চানন একবার হেডমাস্টার অবনীবাবুর কাছে খুব মার খেয়েছিল। দুই হাতের পাতায় তখনও লাল দাগ আছে। রাস্তায় এসে ভূতনাথকে বলেছিল—এই বইগুলো একটু ধর তো—বোধহয় জ্বর আসছে আমার।

পঞ্চাননের কপালে হাত দিয়ে ভূতনাথ চমকে উঠেছিল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে যেন। জ্বরের ঝোঁকে সেই রাস্তার মধ্যেই শুয়ে পড়েছিল পঞ্চানন।

মনে আছে সেই জ্বরের ঘোরেই পঞ্চানন বলেছিল—শালা হেডমাস্টারটা বেইমান।

ভূতনাথ সেদিন মানে বোঝেনি পঞ্চাননের কথাটার। বেঙ্গল সেমিনারির ছেলেদের বেইমান বলায় কাবুলিওয়ালাদের রাগের কারণটাও ভূতনাথ বুঝতে পারেনি সেদিন। কিন্তু মানে বুঝতে পেরেছিল অনেকদিন পরে, যেদিন ছোটবৌঠান বলেছিল—ভূতনাথ তুই এত বড় বেইমান—

হেডমাস্টারের বেইমানি বোঝবার বয়েস তখন হয়নি ভূতনাথের। কাবুলিওয়ালাদের বেইমানির অর্থও খুঁজে পাওয়া যায়নি সেদিন। কিন্তু ভূতনাথ যে কেমন করে বেইমান হল সে প্রশ্ন... কিন্তু

ছোটবৌঠান তো তখন অপ্রকৃতিস্থ। তাকে অবশ্য ক্ষমা করেছিল ভূতনাথ। ছোটবৌঠানকে চিনেছিল বলেই তো ভূতনাথ পরে তাকে ক্ষমা করতে পেরেছিল!

সেদিন আপিস থেকে ব্রজরাখাল ফিরলো একটা মস্ত বড় বাণ্ডিল নিয়ে। বললে—তোমার ও জামা-কাপড়ে চলবে না বড়কুটুম—ভদ্রলোকের কাছে চাকরি করতে গেলে একটু ভদ্র হয়ে যেতে তো হবে—

একেবারে তৈরি কামিজ নিয়ে এসেছে। ধুতিও একজোড়া। লাট্টুমার্কা রেলিব ধুতি। যেমন মিহি তেমনি খাপি।

—আর এই নাও জুতো—এ তো ফতেপুরের রাস্তা নয়। এখানে খোয়ার রাস্তা, খালি পায়ে চললে পা ছিঁড়ে যাবে একেবারে।

ভূতনাথ জুতো জোড়া পায়ে দিলে। ব্রজরাখাল নিজের হাতে ফিতে বেঁধে দিলে। বললে—পছন্দ হয়েছে তো? টেরিটি বাজারের খাস চিনে-বাড়ির জুতো।

সেই বিকেলবেলা ভূতনাথকে জুতো জামা কাপড় পরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিক থেকে দেখলে ব্রজরাখাল। তারপর বললে—এইবার সব ছেড়ে রাখো, পরশু আমার ছুটি আছে আপিসের, ওইদিন আবার পরতে হবে।

—কেন?

ব্রজরাখাল উত্তর দিলে না। কিন্তু খেতে বসে কথাটা বললে ব্রজরাখাল। বললে চাকরি তো কখনও করোনি বড়কুটুম—চাকরির শতেক জ্বালা—এক-একবার ভাবি ছেড়ে দেবো—আমার কিসের দায়? না আছে বাপ-মা, না-আছে বউ-ছেলে,—কিন্তু ঠাকুর বলতেন—

ভূতনাথ মুখে ভাত পুরে বললে—কোন্ ঠাকুর?

—আমার ঠাকুর—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—গেঁয়ো ভূত, নাম শোনোনি তুমি—দেখবে, বলে রাখছি তোমাকে—ওই ঠাকুরের ছবিই একদিন দেশের ঘরে ঘরে থাকবে—আমার চোখ খুলিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর। তোমার বোন যখন মারা গেল বড়কুটুম, সে বড় কষ্টের মধ্যে কাটাতে লাগলাম—সে যে কী কষ্ট কী বলবো। বড় ভালোবাসতাম রাধাকে—বলে ভাত খেতে খেতে হো হো করে হেসে উঠলো ব্রজরাখাল।

ব্রজরাখাল হাসলো না কেঁদে উঠলো দেখবার জন্যে ভূতনাথ ব্রজরাখালের মুখের দিকে তাকালে। কিন্তু ব্রজরাখাল কোনো দিকেই যেন চেয়ে নেই।

আবার বলতে লাগলো ব্রজরাখাল—তোমার বোন আমায় একদিন কী বলেছিল জানো—

ভূতনাথ বললে—কী?

—এই অসুখ হবার কিছুদিন আগে, আমি শনিবার দিন বাড়ি গিয়েছি। রাধা বললে—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। বললাম—কী কথা বলো। রাধা বললে—আমার ভূতোদাদার বড় ইচ্ছে কলকাতা দেখবার। আমায় কতবার বলেছে—তুমি চাকরি করো কলকাতায়, ওকে একবার কলকাতা দেখাতে পারো না? বললাম—পারি। পারি তো বললাম, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই ও মারা গেল। আমার মনের অবস্থা তখন তো বুঝতে পারছো—ফতেপুর থেকে ফিরে লম্বা ছুটি নিয়ে দিনরাত কেবল দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকতাম। বেশ ভালো লাগতো। মনে হলো দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে আর সংসারে ফিরে যাবো না—কিন্তু ফিরে এলাম ভাই,—ঠাকুরই আমায় ফিরিয়ে দিলেন—কেমন করে দিলেন সেই কথা বলি—

সেদিন সব ভক্তরা বসে আছি। নরেন আছে, লাটু আছে—গিরিশও ছিল বোধ হয়। আমি বললাম—ঠাকুর, আমি আর সংসারে ফিরে যাবো না।

ঠাকুর জানতেন সব। রাধার মারা যাওয়ার খবর শুনে খুব কেঁদেছিলেন। জানতেন আমার কেউ নেই সংসারে—সংসারে কারো ওপর কোনো দায়িত্ব নেই। কার জন্যেই বা চাকরি করছি, কার

জন্যেই বা টাকাকড়ি—একটা পেট, সে-জন্যে ভাবিনে। ঠাকুর শুনলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, একটা গল্প শোন। বললেন—দেখ, নারদ মুনির ভারি অহঙ্কার ছিল যে, ত্রিভুবনে তাঁর মতন ভক্ত আর কেউ নেই। বিষ্ণু শুনে বললেন—তোমার চেয়েও একজন বড় ভক্ত আমার আছে হে—সে এক চাষী, যাও তাকে গিয়ে দেখে এসো নারদ। নারদ গেলেন দেখতে। গরীব চাষা। সারাদিন ক্ষেতে-খামারে কাজ করে—ফুরসৎ নেই মরবার। কেবল সকালে ঘুম থেকে উঠে আর রাত্রে শুতে যাবার আগে দু'বার মাত্র হরির নাম করে। নারদ কিছু বুঝতে পারলেন না। এলেন বিষ্ণুর কাছে। বললেন—দেখে এলাম তোমার ভক্তকে—কী এমন ভক্তি যে এত বড়াই করছো! বিষ্ণু তাকে একটা বাটিতে টইটম্বুর তেল দিয়ে বললেন—যাও নারদ, এই বাটিটা নিয়ে একবার সারা শহরটা ঘুরে এসো—কিন্তু সাবধান, তেল যেন একফোঁটাও না পড়ে। নারদ চললেন। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলেন আবার বাটিভর্তি তেল নিয়ে। তেল এক ফোঁটাও পড়েনি। বিষ্ণু জিজ্ঞেস করলেন—নারদ, আমার কথা ক'বার স্মরণ করেছো তুমি বলো তো? নারদ বললেন—প্রভু, আপনার নাম স্মরণ করবার সময় পেলাম কই। আমি তো সারাক্ষণ তেল নিয়েই ব্যস্ত। তখন বিষ্ণু নারদকে বুঝিয়ে দিলেন—সেই সামান্য চাষার ভক্তি কেন নারদের চেয়েও বড়। সেই চাষা হাজার কাজের মধ্যেও দু'বার তো অন্তত হরিকে স্মরণ করে—

ঠাকুর এমনি কথায় কথায় কেবল গল্প বলতেন। গল্প শুনে চুপ করে রইলাম। তখনও যেন বিশ্বাস হলো না। ঠাকুর বুঝলেন। বুঝে হাসলেন এবার। বললেন—ওই গিরীশকে জিজ্ঞেস করে দেখ—ওকে বলেছিলাম যখন প্রথম ও এসেছিল—শুধু দিনের মধ্যে দু'বার নাম জপ্ করতে, একবার খাবার আগে, আর একবার শোবার আগে। ও শেষ পর্যন্ত পেরেছে। তুই-ই বা পারবি না কেন? তার বেশি তোকে কিছু করতে হবে না। মা তোর কাছে আর কিছু চায় না রে বোকা ছেলে। তারপর হাসি থামিয়ে নরেনের দিকে চেয়ে বললেন—ওরে দেখ, ব্রজরাখালের বিশ্বাস হচ্ছে না। ওরে এ-সংসারে যত মত তত পথ যে,—কোন মতটাই নিখুঁত নয়। তা ভেবে তোর কী দরকার? তুই যা করছিস করে যা—সংসারের সমস্ত জীবের মধ্যে শিবকে পাবি। আর যদি না-ই পাস তাতেই বা কী। মা তো তোর মনের কথা জানে রে। এই দেখ না, সবাই ভাবে তার হাতঘড়িটাই ঠিক সময় দেয়, কিন্তু কোনও ঘড়ির সঙ্গে কোনও ঘড়ির তো মিল নেই—অথচ আসলে সঠিক সময়টা যে কী তা কেউ জানে না—তা নাই বা জানলো, তাতে কারো কোনও কাজের ক্ষতি হচ্ছে?

গল্প করতে করতে কখন যে খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে কারোর খেয়াল ছিল না। ভূতনাথ একমনে ব্রজরাখালের কথা শুনছিল। হঠাৎ চমক ভেঙে ব্রজরাখাল বললে—যা হোক—রাধার কাছে সেই কথা দিয়েছিলুম তার ভূতোদাদাকে কলকাতা দেখাবো। তা এতোদিন মনে ছিল না, তোমার চিঠি পেয়ে মনে পড়লো।

রাত্রে ভূতনাথ বললে—ও বাঁয়া তবলা কার ব্রজরাখাল?

ব্রজরাখাল বিছানা পাততে পাততে বললে—ও আমারই, এককালে আমিই বাজাতাম—তারপর, এখন বাজাই খোল, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সামনে খোল বাজিয়ে আর তবলা ভালো লাগে না।

শোবার আগে ব্রজরাখাল বললে—ঠাকুরকেই দেখলে না বড়কুটুম, কলকাতার আর কী দেখলে তবে... তা হলে পরশুদিন যাওয়া মনে রেখো, আবার ভুলে যেও না যেন—আমার ছুটি আছে সেদিন।

—কোথায়? ভূতনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—এরই মধ্যে ভুলে বসে আছো, তোমার চাকরি হে—মাইনে এখন পাবে সাত টাকা করে, আর একবেলা ওখানেই খাবে। বেশ নিষ্ঠাবান ধার্মিক লোক সুবিনয়বাবু। নববিধান-সভার ব্রাহ্ম ওঁরা—

—সে কী ব্রজরাখাল?

—সে তুমি বুঝবে না এখন—ব্রজরাখাল পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে।

পাশের ঘরে শুয়ে অনেকক্ষণ ভূতনাথের ঘুম এল না। সেই কালকের মতো ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ, অনেক চাকরের গোলমাল। তারপর রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই তন্দ্রার মধ্যে কালোয়াতি গানের সঙ্গে তবলার ঠেকা। অনেক রাত্রে লোহার গেট খোলার ঘড় ঘড় শব্দ। আর তারপর... তারপরের কথা আর ভূতনাথের মনে থাকবার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত চাকরি হলো ভূতনাথের। সাত টাকা মাইনে আর এক বেলা খাওয়া। তা সাত টাকাই কি কম?

ব্রজরাখাল বললে—সাত টাকাই কি কম? আমি তো এল.এ. পাশ করে দশ টাকায় ঢুকেছিলাম। তুমি লেখাপড়া-জানা ছেলে, বিদ্যে রয়েছে পেটে—দেখবে, ও সাত টাকাই শেষে সতেরো টাকায় গিয়ে দাঁড়াতে দেরি হবে না। তুমি কিছু দ্বিধা করো না তা বলে।

দ্বিধা নাকি ভূতনাথের আছে। দ্বিধা কিসের? ব্রজরাখালের বিনা ভাড়ার ঘরে থাকা আর এক বেলা খাওয়া, আবার সাত টাকা নগদ মাস গেলে। জলখাবার, জামাকাপড় নিয়ে মাসে তিন টাকাই খরচ হোক—তারপর চার টাকা করে জমাও! কত বাবুয়ানি করবে করো না!

ব্রজরাখালের কেনা নতুন জামা-কাপড় জুতো পরে রওনা দিলে ভূতনাথ ব্রজরাখালের সঙ্গে। রাস্তায় বেরিয়ে ব্রজরাখাল বললে—খুব মন দিয়ে কাজ করবে বড়কুটুম—দেখো আমার বদনাম না হয়। ওঁরা আবার ব্রাহ্ম কিনা।

—ব্রাহ্ম মানে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—এই তোমরা যেমন হিন্দু, উনি তেমনি ব্রাহ্ম—অর্থাৎ এই দুর্গা, কালী, গণেশ ও-সব পুজো-টুজো করেন না—বলেন পুতুলপুজো, তা সে-সব নিয়ে তোমার কী দরকার—তুমি চাকরি করবে মন দিয়ে—ফাঁকি দেবে না, ব্যস, চুকে গেল ল্যাঠা।

ভূতনাথ বললে—আমাকে আমার হিন্দুধর্ম ছাড়তে যদি বলেন—

—তা তো বলবেনই—ব্রজরাখাল বললে।

—তা হলে?

—তুমি ছাড়বে না।

—তাতে যদি চাকরি যায়?

—যাবে, যাবে। তা বলে তো আর রাতারাতি ধর্ম বদলাতে পারো না। ধর্ম হলো তোমার মনের বিশ্বাসের ব্যাপার—আর যদি মনে করো সাত টাকাই তোমার কাছে বড় তা হলে হবে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে নেবে দীক্ষা।

ভূতনাথ উত্তর দিলে না। চুপ করে ভাবতে ভাবতে চললো। খানিক পরে বললে—এ-চাকরিতে তোমার মত আছে তো ব্রজরাখাল—তোমার মত না থাকলে দরকার নেই চাকরির। শেষে হয় তো গরু-শোর খেতে বলবে।

ব্রজরাখাল বললে—না না ও-সব ভয় তোমার নেই। সুবিনয়বাবু লোক খুব ভালো, আমার চেয়েও ভালো তবে একটু গোঁড়া। তাতেই বা তোমার কী! ওঁর ধারণা কেশববাবু যা বলেন তাই-ই ঠিক তাই-ই ধ্রুব আর কারোর কথা কিছু নয়। না হয় তাই-ই বললেন, তাতে তোমারই বা কী আর আমারই বা কী?

ভূতনাথ ব্রজরাখালের কথা কিছু বুঝতে পারলে না।

ব্রজরাখাল বলেই চললো—অথচ দেখ বড় কুটুম, আমার ঠাকুর বললেন—ও হিন্দুধর্মই বলো আর খৃস্টধর্ম কিংবা ইসলামই বলো, সব চর্চা করে দেখেছি—দেখলাম আসলে সেই ভগবানকেই

সবাই ডাকে—শুধু বিভিন্ন নামে। একটা পুকুরের যেমন অনেকগুলো ঘাট থাকে—তার একঘাটে হিন্দুরা ঘড়ায় করে 'জল' তোলে। আরেক ঘাটে মুসলমানেরা মশকে করে 'পানি' তোলে আর একটা ঘাটে খৃস্টানরা তোলে 'ওয়াটার'—আসলে সেই জলই তো সবাই-এর লক্ষ্য—শুধু নামটা নিয়ে মারামারি।

বউবাজার স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাধববাবুর বাজার পেরিয়ে সোজা উত্তরে চলতে লাগলো দু'জনে। এক ঘণ্টা সময় লাগলো পৌঁছতে।

বাড়ির সামনে বড় সাইনবোর্ডের ওপর লেখা—'মোহিনী-সিন্দূর কার্যালয়'।

দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ছোটখাটো আপিসের মতন চেয়ার-টেবিল সাজানো। কাগজ-পত্র গোছানো রয়েছে। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন। কে একজন এগিয়ে এল সামনে। এসে বলল—বাবু আপনাদের বসতে বলেছেন, আপনারা কি বনমালী সরকার লেন থেকে আসছেন—

খানিক পরে আবার ফিরে এল লোকটা।

এসে ব্রজরাখালকে বললে—আপনাকে ওপরে ডাকছেন বাবু।

ভূতনাথকে বসতে বলে ব্রজরাখাল ওপরে চলে গেল। ঘরটার চারধারে চেয়ে দেখলো ভূতনাথ। আপিস ঘর। দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো ফটো টাঙানো। ভূতনাথ কাউকে চেনে না। অনেকগুলো সাহেব-মেমদের ছবি। সোনালি ফ্রেমে বাঁধা। সদর দরজার মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্'।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। ভূতনাথ চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলো। খানিক পরে কোথা থেকে যেন গানের শব্দ কানে এল।—

ধন্য ধন্য তুমি বরেণ্য নমি হে জগত বন্দন
প্রণতজনে কৃপাবিধানে ঘুচাও কলুষ বন্ধন।
সত্যসার নির্বিকার সৃজন পালন কারণ
জীবনে মরণে শ্মশানে ভবনে জীবনের অবলম্বন
পূর্ণ পরম অনাদি চরণ, অনন্ত জ্ঞান নয়ন
ওতপ্রোত তোমাতে চিত জগত-চিত্তরঞ্জন।
অযাচিত দয়ার সিন্ধু, দুঃখ দারিদ্র্য ভঞ্জন,
পবিত্র পাপনাশন পতিতজন পাবন॥

গান গাইছে একজন মহিলা। ভূতনাথ অভিভূতের মতন সমস্ত গানটা শুনলে। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ। একা একা বসে থাকতে ভূতনাথের কেমন অসহ্য লাগছিল।

খানিক পরে আবার সেই লোকটা ঘরে এসে বললে—আপনাকে ওপরে ডাকছেন বাবু।

ভূতনাথ লোকটার পেছনে পেছনে গিয়ে হাজির হলো ভেতরের বারান্দায়। সেখানে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার রাস্তা। ওপরে উঠে লোকটা পাশের একটা ঘরের দরজা খুলে বললে—ভেতরে যান।

দরজা খুলতেই ভূতনাথ দেখলে প্রকাণ্ড এক ঘর। মাঝখানে একটা গোল টেবিলের চারপাশে নিচু নিচু চেয়ারে বসে আছেন সবাই। আর সব মুখ অচেনা। কেবল ব্রজরাখালের দেখা পেলো একপাশে।

ভূতনাথকে নিজের পাশের চেয়ারে বসিয়ে ব্রজরাখাল বললে—এই হলো আমার বড়কুটুম, এখন আপনার হাতেই এর ভার দিলাম। নেহাত গ্রাম্য সরল ছেলে—এখনও শহরের হাওয়া গায়ে লাগেনি।

সামনের ভদ্রলোক একমুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে হাসতে লাগলেন। হা-হা করে হাসি। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—বেশ নামটি। ভূতনাথ—ভূতনাথ। কয়েকবার নামটা উচ্চারণ করলেন মুখে। তারপর বললেন—শিবের আর এক নাম ভূতনাথ। উপনিষদে পড়েছি 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—এই শিবেরও বিত্ত নেই—বিভব নেই—ভোলানাথ।

ভূতনাথ বললে—বামুনগাছির পঞ্চানন্দের দোর ধরে হয়েছি কিনা, তাই পিসীমা আমার নাম রেখেছিল ভূতনাথ...

খুক্ খুক্ করে পাশ থেকে হাসির শব্দ এল।

ভদ্রলোক বললেন—ছি মা, হাসতে নেই, এ হাসি তোমার চাপল্যের লক্ষণ মা—ভূতনাথবাবু ঠিকই বলেছেন—সেই ব্রহ্মেরই কত নাম—পঞ্চানন্দও এক নাম তাঁর—আপনি কী বলেন ব্রজরাখালবাবু—

ভূতনাথ ব্রজরাখালের উত্তরের দিকে কান না দিয়ে দেখলে—যে হাসছে সে একটি মেয়ে। অনেকটা রাধার বয়সী। কিংবা হয়তো রাধার চেয়েও কিছু বড়। কিন্তু বড় সুন্দর দেখতে। তখনও হাসিটা মুখে লেগে রয়েছে তার। ভূতনাথের চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি আবার হাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিলো—কিন্তু কেন জানি না বোধ হয় বাবার মুখ চেয়েই চেপে গেল। মেয়েটির পাশে আরেকজন মহিলা বসে আছেন। বোধ হয় মেয়েটির মা। দুই হাতে কী একটা বুনছেন। সেই দিকেই নজর তাঁর। মাঝে মাঝে এক-একবার সুবিনয়বাবুর দিকে তাকাচ্ছেন।

—আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, বুঝলেন ব্রজরাখালবাবু—

সুবিনয়বাবু দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প করতে লাগলেন—ভারি গোঁড়া হিন্দু—কালীভক্ত—প্রতি শনিবার মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কালীপুজো করে রোববার দিন জল গ্রহণ করতেন—আমার এই খুকু যখন হলো উনি নাম রাখলেন জবাময়ী—কালীর যেমন জবা—শিবের তেমনি ধুতুরা—তুমি হাসছিলে মা, কিন্তু ভূতনাথবাবুর নামটা আমার ভারি পছন্দ—সেই গানটা গাও তো মা—

এতক্ষণে মহিলাটি হাতের বোনা বন্ধ করে চোখ তুললেন একটু।

—আর তুমি গাইতে বলো না ওকে—এখনি যদি গলা ভাঙিয়ে বসে থাকে, আসছে শনিবার দিন গাইতেই পারবে না যে একেবারে।

ব্রজরাখাল জিজ্ঞেস করলে—আসছে শনিবার গান-বাজনা আছে নাকি?

সুবিনয়বাবু বললেন—আসছে শনিবার আমার জবার জন্মদিন কিনা—তা হলোই বা জন্মদিন—জবার গলায় এ-গানটা আমার ভারি মিষ্টি লাগে ব্রজরাখালবাবু—খাঁটি জয়জয়ন্তীর ধ্রুপদ—গাও না—গাও না মা—বলে সুবিনয়বাবু নিজেই হাতে তাল দিতে দিতে ধরলেন।

—নাথ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ,

গান থামিয়ে ব্রজরাখালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—চৌতালে তাল দিয়ে যান তো—বলে আবার আরম্ভ করলেন—

—নাথ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ,
—তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ—

হঠাৎ এক সময় ভূতনাথের মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত কোকিল যেন এক সঙ্গে গান গেয়ে উঠলো। আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষের সমস্ত অশ্রুত সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। মধুকামারের পালা-যাত্রায় শ্রীকণ্ঠ হাজরাও বুঝি খেদের গান এমন করে গাইতে পারে না। অবাক হয়ে ভূতনাথ দেখলে, বাবার সঙ্গে জবাও গলা মিলিয়ে গাইছে—মুখে তার সেই বিদ্রূপের হাসি আর নেই. চোখ অর্ধমুদ্রিত—স্থির মূর্তিতে এক অলোকসামান্য জ্যোতি বেরুচ্ছে। সেই মুহূর্তে জবাকে যেন আরো সুন্দর দেখাতে লাগলো।

—জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক
তুমি সবার সৃজনকার, হৃদাধার ত্রিভুবনেশ!
তুমি এক, তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখ সোপান,
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষধাম...

পাশের ব্রজরাখালের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। হাতে তাল দিচ্ছে আর লম্বা লম্বা চুল ভর্তি মাথাটা মাতালের মতো দুলছে—আর চোখ দিয়ে অঝোরধারে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সুবিনয়বাবুরও সেই অবস্থা। কিন্তু আশ্চর্য—জবার মা আপন মনে মাথা নিচু করে একমনে বুনে চলেছেন, সঙ্গীত তাঁর কানে যাচ্ছে কিনা কে জানে!

এক সময়ে গান থামলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

সুবিনয়বাবু নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। বললেন—তাল কেটেছি নাকি ব্রজরাখালবাবু—? আপনি ভালো খোল বাজিয়ে—আর চৌতালটা আপনার ঠিক ধরতেও পারি না আমি—সুরের দিকে নজর দিতে গেলে আমার তালটা ওদিকে আবার গোলমাল হয়ে যায়। তারপর জবার দিকে চেয়ে বললেন—দেখলে তো মা, তুমি ভূতনাথ নাম শুনে হাসছিলে—যে ভূতনাথ সে-ই মহেশ, সে-ই ব্রহ্মা, সে-ই বিষ্ণু—সবই সেই এক ধ্রুব নির্বিকার অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা—উপনিষদ বলেছে 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি'—যিনি এক রূপকে বহুপ্রকার করেন—

এবার মহিলাটি আবার মুখ তুললেন, বললেন—কেন তুমি বার বার জবাকে বকছো বলো তো—ও তো হাসেনি।

জবা বললে—না বাবা, আমি হেসেছিলাম।

সুবিনয়বাবু দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—কেন হেসেছিলে মা, ভূতনাথকে দেখে, ঠিক বলো তো।

এবার ভূতনাথ কথা কইলে। বললে—হাসলেনই বা উনি, আমি তো সে-জন্যে কিছু মনে করিনি—রাধাও হাসতো—

—রাধা কে? প্রশ্ন করলেন সুবিনয়বাবু।

—নন্দজ্যাঠার মেয়ে—ভূতনাথ জবাব দিলে।

ব্রজরাখাল বুঝিয়ে দিলে—আমার পরলোকগতা স্ত্রীর কথা বলছে বড়কুটুম।

রাধা হাসতো, রাধার সই হরিদাসী হাসতো, হরিদাসীর বর হাসতো, আন্না হাসতো, রাধার বিয়েতে বাসরঘরে সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল—তোমার মনে আছে ব্রজরাখাল? তা হাসুকগে—আমি কিচ্ছু মনে করি না—বলে ভূতনাথ নিজেই হাসলো।

কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। জবা হাসলো, সুবিনয়বাবু হা হা করে হাসলেন, ব্রজরাখালও হেসে উঠলো। জবার মা হাসলেন কিনা দেখা গেল না। তিনি নিজের মনেই বুনতে লাগলেন, মুখ নিচু করে। সুবিনয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন—ব্রজরাখালবাবু, আপনার বড়কুটুমটি বেশ লোক—ভূতনাথবাবুকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

অতদিনের কথা। এখন সব মনে নেই। কিন্তু সুবিনয়বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি বলছিলে ওঁরা ব্রাহ্ম, কিন্তু বেশ লোক ওঁরা—না ব্রজরাখাল?

—আমি তো ওঁকে খারাপ লোক বলিনি বড়কুটুম—লোক খুব ভালো, বেশ আমুদে মানুষ, ওঁদের সমাজের একনিষ্ঠ সভ্যও বটেন—টাকাও আছে, কিন্তু মনে ওঁর শান্তি নেই।

—কেন?

—মাঝে মাঝে ওঁর ওই স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে যায়, তখন ওঁকে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হয়—যখন ভালো থাকেন তখন কেবল আপন মনে একটা কিছু নিয়ে বুনে যান—তা ওসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—তুমি চাকরিটা মন দিয়ে করে যাবে।

রাস্তায় আসতে আসতে ভূতনাথ কেবল সেই কথাটাই ভাবছিল—অমন প্রাণখুলে হা হা করে হাসতে পারেন কী করে সুবিনয়বাবু?

'মোহিনী-সিন্দুর' আপিসে চাকরি হয়ে গেল ভূতনাথের।

বার-বাড়িতে রাত্রে শোয়া আর সকালবেলা স্নান করে একটু জলখাবার খেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে আপিসে পৌঁছনো। তা হেঁটে যেতে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। সকাল থেকেই কাজ শুরু।

দুপুর বারোটার সময় ডাকতে আসে ঠাকুর—বাবু ভাত বেড়েছি—

তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা রেখে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে খেতে বসা। একতলায় বাড়ির পেছন দিকের সমস্ত ঘরটাই রান্নাঘর। তারই এক কোণে এক একদিন আসন পেতে জলের গ্লাস দেয় ঠাকুর। কলাপাতার ওপর গরম গরম ভাত ফেলে দেয়, হাতায় করে। বলে—মধ্যিখানটায় একটু গর্ত করুন তো—ডাল দিই—

এক রাশ গরম ভাতের ওপর গরম ডাল পড়ে। তারপর আলু-কুমড়োর একটা তরকারি দেয় এক থাবা। কোনো দিন শাক চচ্চড়ি গাদাখানেক।

ছোটবেলায় ফতেপুরে মাছ না হলে খেতে পারতো না ভূতনাথ। তা পরের বাড়ি। এমনিতেই খেতে লজ্জা করে। তার ওপর আবার চাওয়া!

আরো ভাত দিলে যেন হতো। কিন্তু ঠাকুর যেমন তাড়া দেয়, তাতে কেমন লজ্জা হয়। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ভূতনাথ—মাছ নেই ঠাকুর?

ঠাকুর বলেছিল—গোনাগুন্তি মাছ—সে তো সব ওপরে চলে গিয়েছে—তারপর তাড়া দিয়ে বলে—একটু হাত চালান বাবু, হাবার মা এখুনি এসে আবার এঁটো পাড়বে।

সুতরাং কোনোরকমে খাওয়া সেরে নিয়ে আবার কাজে বসতে হয়। কাজ না কাজ। হাজার হাজার প্যাকেট ভর্তি সিঁদুর। সেই কাগজের কৌটোয় সিঁদুর ভরা—তারপর মুখ বন্ধ করে ছাপানো লেবেল লাগিয়ে দেওয়া। এক একটি কৌটোর দাম—আড়াই টাকা। এক মাসের ব্যবহারের জন্যে আড়াই টাকা। কত দূর দূর দেশে যায়। কোথায় রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিম্‌হাচলম, পেনাঙ, আন্নামালাই, জাভা, বোর্নিও—

ফলাহারী পাঠক সিঁদুর ভরে, প্যাকেট আঁটে, লেবেল লাগায়—

আর চিঠিপত্র লেখে ভূতনাথ। মনিঅর্ডার এলে সুবিনয়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। ভি.পি. করে পার্সেল যায়! যত এজেন্ট আছে, তাদের কাছে পাঠাতে হয় হ্যাণ্ডবিল। নানান ভাষায় লেখা হ্যাণ্ডবিল। হ্যাণ্ডবিল-এ লেখা থাকতো—

'অদ্ভুত তড়িতশক্তি সম্পন্ন সিঁদুর। 'মোহিনী-সিঁদুরে'র গুণে মুগ্ধ হইয়া হাজার হাজার নরনারী অসংখ্য প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছেন। কোনো মানুষের জীবনে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিবার মতো অবস্থা আসিলে ইহার এক প্যাকেট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যাঁহারা জীবনে প্রিয়পাত্র কিম্বা প্রিয়পাত্রীর প্রেম পাইতে চান, প্রিয়জনকে আপনার বশীভূত করিতে চান, প্রণয়িনীকে যদি আপনার করতলগত করিতে চান, কিম্বা যে যে স্ত্রীলোক আপনাকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে বা দূরে পরিহার করে তাহাকে যদি হৃদয়েশ্বরীরূপে লাভ করিতে চান, আমাদের এই বহু পরীক্ষিত বহু প্রশংসিত 'মোহিনী-সিঁদুর' পরীক্ষা করিয়া দেখুন। স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্য, পিতা-পুত্র, শিক্ষক-ছাত্র, গুরু-শিষ্য সকলের পক্ষেই অপরিহার্য। নিত্য হাজার হাজার গ্রাহক ইহার কল্যাণে বিষময় সংসারে অপার শান্তিলাভ করিতেছেন। ইহা ছাড়া মকদ্দমায় জয়লাভ, দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম, নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনের সাক্ষাৎলাভ, ইত্যাদি নানা বিষয়ে ইহার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়। এক স্ত্রী এই 'মোহিনী-সিঁদুর' ব্যবহার করিয়া তাহার পানাসক্ত স্বামীকে পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছে, আর একজন দারিদ্র্য লাঞ্ছিত হতভাগ্য লটারিতে বিশ সহস্র অর্থ পাইয়া সুখে কালযাপন করিতেছে, আর একজন...বিফলে মূল্য ফেরত...সংসারে শান্তি ফিরাইতে, হতভাগ্যদের সৌভাগ্য সঞ্চারে, অপুত্রককে পুত্র মুখ দেখাইতে, ঋণীকে অঋণী করিতে, প্রবাসীকে ঘরে ফিরাইতে, ইহা অদ্বিতীয়...' ইত্যাদি ইত্যাদি—

হ্যাণ্ডবিল ছাড়া পাঁজিতে বিজ্ঞাপনের পাতায় বড় বড় হরফে লেখা থাকতো 'মোহিনী-সিঁদুর'—'মোহিনী-সিঁদুর'—

স্বদেশে, বিদেশে, বাঙলায়, ইংরেজীতে, জার্মানী, চীন, জাপানী, তারপর হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, গুরুমুখী, পুস্তু সবভাষায় সর্বত্র এই 'মোহিনী-সিঁদুরে'র বিজ্ঞাপন।

যত বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো—ততো বিক্রির অর্ডার। প্রশংসাপত্রও আসতো অসংখ্য। এক

প্যাকেট ব্যবহার করে যারা অল্প ফল পেয়েছে, তারা আরও দু'প্যাকেটের অর্ডার দিতো।

আরো দুটি পণ্য ছিল সুবিনয়বাবুর। 'মোহিনী আংটি' আর 'মোহিনী আয়না'।

আপিস ঘরের পেছনে গুদাম ঘরে ফলাহারী পাঠকের আপিস বা কারখানা। ফলাহারী হেড আর দশজন য়্যাসিস্টেন্ট। তারাও হিন্দুস্তানী। আপিসের ছুটির পর যখন তারা বেরোত, তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত লালে-লাল হয়ে গিয়েছে শরীর।

সিঁদুর ঢালাঢালি, কৌটোয় ভরা, লেবেল আঁটা আর তারপর প্যাকিং করার পর পোস্টাপিসে ডাকে পাঠানো সমস্ত ভার ফলাহারীর। কিন্তু তদারক করতে হবে ভূতনাথকে। কোন্ অর্ডারটি কখন এল, সেটা রেজিস্ট্রি করা, কত তারিখে ডেসপ্যাচ করা হলো—

সুবিনয়বাবু এক একবার সকালের দিকে তদারক করতে আসতেন। বলতেন—কাজকর্ম কেমন হচ্ছে ভূতনাথবাবু—

কালো চাপকা গায়ে, পরনে পায়জামা, কোঁচানো চাদর বুকের ওপর ক্রসের মতন লটকানো। পায়ে কখনও চটি কখনও য়্যালবার্ট ; এটা সেটা দেখতেন। বলতেন—চমৎকার হচ্ছে ভূতনাথবাবু—বলে একটু পরেই চলে যেতেন। হাসি হাসি মুখ। সদাশিব মানুষ। টাকার ব্যাপারটা নিয়ে যেতে হতো ওপরে। ওপরে সেই বড় ঘরটায় বসে থাকতেন তিনি। কখনও আপিসের কাগজপত্র নিয়ে। কখনও বই নিয়ে। হয়তো হেলান দিয়ে একটা কিছু পড়তেন। আশেপাশে তখন সাধারণত কেউ থাকে না।

সই করবার আগে একবার জিজ্ঞেস করেন—এটা ভালো করে দেখে নিয়েছেন তো ভূতনাথবাবু—তারপর আবার বই-এর দিকে মনোযোগ দেন। বাঁধানো বই সব। আলমারিতে থাকে থাকে সাজানো। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কামিনীকুমার', 'হংসরূপী-রাজপুত্র', 'বিজয়-বসন্ত' প্রভৃতি আরো অনেক বই। 'সোমপ্রকাশ', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'রহস্য-সন্দর্ভ', 'ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ', 'ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন'।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। একটু পরেই নিচে চলে আসতে হয়।

তারপর ঠাকুরমা রোজকার মতো ডাকতে আসে—বাবু ভাত বাড়া হয়েছে—খেতে আসুন।

সেই গরম ভাতের ওপর ডালের গর্ত, আর এক থাবা তরকারি। প্রত্যহের আপিসের কাজের মধ্যে খাওয়াটা যেন এক শাস্তির মতন অসহ্য হয়ে উঠলো।

ফলাহারীদের অন্য ব্যবস্থা। দুপুরবেলা কারখানা ঘরের মধ্যেই পেতলের কাঁসি বেরোয় এক একটা করে। কাগজের ঠোঙা করে ছাতু বেঁধে আনে কাপড়ে, সেটা ঢালে, তার ওপর ঢালে জল। অতি সংক্ষিপ্ত সরল প্রণালী। খাওয়ার পর বাঁ হাতে জলের ঘটিটা উপুড় করে মুখের মধ্যে। কী খাটতে পারে সব। সিঁদুর ঘাঁটতে ঘাঁটতে লাল হয়ে যায় চোখ মুখ—তবু ক্লান্তি নেই। তারা মাইনে পায় পাঁচ টাকা করে। মাসে মাসে মনি-অর্ডার করে তিন টাকা দেশে পাঠায়।

ঠাকুর সেদিন যথারীতি ডাকতে এসেছে। রান্নাঘরের কোণে আসন পেতে বসিয়ে ভাত আর ডাল দিয়ে ঠাকুর বললে আজ ওই দিয়েই খেতে হবে বাবু—তরকারি হয় নি।

ভূতনাথ মাথা উঁচু করে বললে—সে কি?

—সব ফুরিয়ে গিয়েছে, কম করে ভাঁড়ার থেকে আনাজ বেরুলে আমি কী করবো বাবু—ভাঁড়ার তো আমার হাতে নয়।

ভূতনাথ ভাবলে তাও তো বটে! বললে—ভাঁড়ারের ভার তবে কার ওপর?

—আজ্ঞে সে তো হাবার মা'র হাতে জবা দিদিমণি পাঠিয়ে দেয়।

ভূতনাথ বললে—হাবার মা'কে একবার ডাকো দিকি।

এল হাবার মা। আধ-ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ালো দরজার এক পাশে।

ঠাকুর বললে—ওই তো হাবার মা এসেছে—ওকে জিজ্ঞেস করুন।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আমাদের খাবার জন্যে আনাজ-তরকারি কিছু দেওয়া হয়নি তোমাকে?

ঘোমটার ভেতর থেকে হাবার মা কী বললে বোঝা গেল না।

ঠাকুর বুঝিয়ে বললে তাকে—আনাজ-তরকারি কিছু তোমাকে আজ দেওয়া হয়নি—কেরানীবাবু তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছিল।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আজ কম দেওয়া হয়েছিল কী?

—যেমন বরাদ্দ থাকে তেমনি দেওয়া হয়েছিল।

—কতখানি বরাদ্দ থাকে?

—আমি নেকাপড়া জানিনে, যা বরাদ্দ থাকে তাই নিয়ে আসি।

হাবার মা'র কাছ থেকে কোনো প্রশ্নের সমাধান যে পাওয়া যাবে এমন মনে হলো না।

এবার ভূতনাথ ঠাকুরকে বললে—তুমি কর্তাদের বলো যে, বরাদ্দ যেন বাড়ানো হয়—যা দেওয়া হয়, তাতে পেট ভরে না কারো—সারাদিন খাটবো-খুটবো, না খেতে পেলে তোমরাই বা কাজ করতে পারবে কেন—তোমরাও তো উপোস করবে।

ঠাকুর বললে—তা তো ঠিক বাবু—কিন্তু কর্তাদের ও-কথা বলতে পারবো না।

—কেন পারবে না, সবাই খেতে পেলে কি না পেলে তা তো তোমাকেই দেখতে হবে?

ঠাকুরকেই জিজ্ঞেস করে ভূতনাথ জানতে পারলে—এ বাড়ির নিয়ম প্রতিদিন সকালবেলা জবাদিদিমণি ভাঁড়ার খুলে তালিকা দেখে দেখে সারাদিনের জিনিস একসঙ্গে বের করে দেয়। বাড়ির লোকজন ছাড়া চাকর-ঠাকুর-ঝি, কেরানীবাবু, গরু-ঘোড়া-পাখি সকলের খাবার জিনিস দিয়ে দেয়। চাকরদের তামাক পর্যন্ত।

চাল ডাল তেল নুন তরি-তরকারি, কাঁচা আনাজ, ঘোড়ার দানা, গরুর খোল, ভূষি, চুনি সমস্ত। সমস্ত ওজন করে মেপে দেওয়া। কম পড়বার কথা নয়।

সুবিনয়বাবু যেমন ভালো লোক, তাকে এই নিয়ে বিব্রত করতে কেমন যেন লাগলো। ব্রজরাখালকে বললেও হয়। কিন্তু ব্রজরাখালই বা কী ভাববে? হয় তো এর পরে চাকরিটাই হাতছাড়া হবে শেষ পর্যন্ত। এত কষ্টের চাকরি।

বাড়িতে ফিরে এসে ব্রজরাখাল বলে—কী গো বড়কুটুম, কেমন চাকরি-বাকরি চলছে—কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না, কষ্ট আর কী! অন্য কিছু কষ্ট তো নেই তার। তবু মুখ ফুটে বলতে গিয়ে কেমন বাধে যেন। কিন্তু একদিন বলেই ফেললে। বললে—আজকে চালটা একটু বেশি নাও ব্রজরাখাল।

—কেন? পেট ভরে না বুঝি?

—ভরে।

—তবে?

ভূতনাথ বললে—আজ সকাল-সকাল খেয়েছি ওবেলা, আর তাই খিদেটাও পেয়েছে একটু বেশি।

সত্যি পিসীমা'র মতো কে আর সামনে বসিয়ে খাওয়াবে ভূতনাথকে। পেটের কাপড় সরিয়ে পিসীমা পেট দেখে তবে ছাড়ান দিতো। খা একটু দুধ দিয়ে। হরগয়লানী নতুন গরুর দুধ দিয়ে গিয়েছে, তার চাঁছি পড়েছে এতখানি—তাই দিচ্ছি আর নতুন আমসত্ব। ও ভাত ক'টা ফেলিসনে আর, আজ খাজা কাঁঠালটা ভাঙছি, বোস একটু—কত সব আদর, কত ভালোবাসা।

সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরটাতে বসে ভূতনাথ সেই আগেকার কথাগুলো ভাবে। ব্রজরাখাল বড়বাড়ির ভেতরে বাড়ির ছেলেদের পড়াতে চলে গিয়েছে। ডান দিকে নিচু একতলা বাড়িটার বারান্দায় এখন কেউ নেই। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ইব্রাহিম কোচোয়ান আর ইয়াসিন সহিস। ঘরের ভেতরে টিম টিম করে বাতি জ্বলছে। বোরখা পরা দু-একটা মূর্তি কখনও-সখনও ছাদের দিকে এসে পড়ে। আর দক্ষিণ দিক থেকে দাসু মেথরের ঢোলের চাঁটির শব্দ ভেসে ভেসে আসে। উত্তরের সদর গেটের দু'পাশে রেড়ির তেলের বাক্স বাতি দপ দপ করে জ্বলছে—যেন দিন হয়ে

গিয়েছে ওখানটায়—ঠিক যেমন রাস্তায় আলো জ্বলে তেমনি। ব্রিজ সিং-এর ডিউটি নয় এখন। নাথু সিং বন্দুক উঁচিয়ে পুতুলের মতন কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বসে পাহারা দিচ্ছে।

ব্রজরাখালের বাঁয়া তবলা জোড়া নিয়ে এবার বসলো ভূতনাথ। আগেকার অনেক বোল আবার তার মনে আসতে শুরু করেছে। চর্চাটা রাখা ভালো তো। আর তাছাড়া সন্ধ্যেটা এই অচেনা দেশে কাটেই বা কী করে? প্রথমটা আস্তে আস্তে। তারপর একবার লয়-এর স্রোতে গা ঢেলে দিলে আর কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। অন্ধকার ঘর। শুধু চাঁদনী রাত থাকলে—দক্ষিণের জানালাটা দিয়ে ঘরে আলো এসে পড়ে। আর ওধারের বাগানের টগর আর চাঁপা ফুলের গন্ধতে ঘর ভুরভুর করে সারারাত। আর তারপর ছুটুকবাবুর আসরে শুরু হয় আর একজোড়া বাঁয়া তবলার চাঁটি। হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে ঘাটগুলো বেঁধে নেয় তানপুরার সঙ্গে। একদিকে তানপুরা ছাড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে সাধা গলার শব্দ বেরিয়ে আসে। খেয়াল দিয়ে কোনো দিন আরম্ভ হয় আসর, কোনো দিন হয় না। কিন্তু জমে বেশি ঠুংরিতে, নয় টপ্পায়। সেটা বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে শোনা যায়। নিধুবাবুর টপ্পা।—

প্রেমে কী সুখ হোত—
আমি যারে ভালবাসি, সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে,
কেতকী কণ্টক বিনে
ফল হোত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত—

কোনোদিন আরো বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে শোনা যায়—মেজকর্তার গাড়ির শব্দ। তখন সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। বনমালী সরকার লেন-এর দূর থেকে ইব্রাহিম গাড়ির ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসে, ঘোড়ার গতি মন্থর হয়ে যায়। ব্রিজ সিং ঘড় ঘড় করে গেট খুলে দেয়। তারপর সেই গাড়ি এসে দাঁড়ায় খাজাঞ্চীখানা আর বৈঠকখানার মধ্যে লম্বা গাড়ি-বারান্দার তলায়। পাশের ঘর থেকে মেজকর্তার চাকর বেণী শব্দ পেয়ে ছুটে যায় নিচে। দরজা খুলে হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে। এক একদিন পা দুটো খুব টলে। সেদিন বেণীর ঘাড়ে ভর দিয়ে চলেন। অন্দরমহলে আর যান না, বাইরে বসবার ঘরে ঢালা ফরাস তাকিয়া পাশবালিশ আছে, সেইখানেই শয্যা পাতেন। ক্বচিৎ কদাচিৎ যদি কখনও ইচ্ছে হয়, সোজা চলে যান মেজগিন্নীর শোবার ঘরে। কিন্তু মেজগিন্নীর ঘুম বড় সাংঘাতিক। একবার ঘুমোলে কার সাধ্য জাগায় তাকে।

বংশী বলে—বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে মেজকর্তা দমাদ্দম লাথি মারতে থাকেন—ঘরের ভেতর মেজগিন্নীরও যত ঘুম, গিরিরও ঘুম তত।

শেষে বুঝি গিরির ঘুম ভাঙে। মস্ত বড় ঘোমটা টেনে দরজা খুলে দেয়। তারপর নিজের বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে বাইরে এসে বারান্দায় আবার পাতে।

কিন্তু ছোটকর্তা আসেন আরো অনেক রাতে। যখন রাত প্রায় শেষ হবার উপক্রম। তখন কেউ জেগে থাকে না। টেরও পায় না কেউ। ঘুমে ঢোলে ব্রিজ সিং। ছোটবাবুর সাদা ওয়েলার-জোড়া পায়ে ঠকা-ঠক শব্দ করে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ঢং ঢং বাজে ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেটের ঘণ্টা। ভেতরে জেগে বসে আছেন তিনি একলা। বেশি কথার লোক নন। গাড়ি এসে গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালে নিজেই নামেন। বংশী দরজা খুলে বাতিটা জ্বেলে দেয় ঘরে। এক এক করে গায়ের জামা, হাতের হীরের আঙটি, পায়ের জুতো খুলে নেয়। তারপর নতুন কোঁচানো ধুতি এগিয়ে দিতে হবে—সেটা পরে শুয়ে পড়বেন।

এ-সব বংশীর কাছে শোনা। এমনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

কিন্তু যদি ভূতনাথের এই ঘরের ছাতের ওপর ওঠা যায়, দেখা যাবে অন্দরমহলের সব আলোগুলো এখন নেভানো। বউদের মহলের বারান্দায় শুধু ঝিলমিলির ফাঁক দিয়ে টিম টিম করে জ্বলছে একটা তেলের ঝাড়। কিন্তু সব চেয়ে উজ্জ্বল বাতিটা জ্বলছে ছোটমা'র ঘরে।

বংশী বলে—ছোটমা তো ঘুমোয় না—সমস্ত রাতই পেরায় জেগে থাকে।

ভূতনাথ বলে—ঘুমোন না তো—করেন কী?

—ছোটমা যে নেখাপড়ি জানে শালাবাবু, বই পড়ে—নয় তো গল্প করে চিন্তার সঙ্গে—নয় তো পুতুলের জামাকাপড় তৈরি করে দু'জনে। ছোটমা'র পুতুলের সঙ্গে চিন্তার পুতুলের বিয়ে হয়। আমরা নুচি খাই—রসমুণ্ডি খাই—নয় তো পুজো হয় যশোদাদুলালের—

—সমস্ত রাত? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ. মাঝে মাঝে সমস্ত রাত।

তারপর যখন খবর পৌছোবে, যে ছোটকর্তা ফিরেছে, তখন আলো নিবে ছোটমা'র ঘরের। চিন্তা ঘরের দরজায় হুড়কো বন্ধ করে ঘরের মেঝের ওপর ছোটমা'র বিছানার পাশেই শুয়ে পড়বে।

এ সমস্ত বহুদিন আগের ঘটনা। কিন্তু অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের বাঁকা তৃতীয়ার চাঁদের মতন সমস্ত এখনও আঁকা আছে ভূতনাথের মনে।

'মোহিনী-সিঁদুরে'র আপিসে ঢুকে খাওয়ার কথাটা মনে পড়লেই যেন ঘৃণা হতো ভূতনাথের। বরাবর পেটুক মানুষ। ভালো জিনিস খাওয়ার দিকে বরাবরের ঝোঁক তার। বড়বাড়িতে রাত্রের খাওয়া তেমন পছন্দ হয় না। ব্রজরাখাল নিরামিশাষী। তা ছাড়া নিজের হাতে সে রান্না করে—। বাজার করবারই সময় হয় না তার। আর অই ষড় রিপুকে স্ববশে আনতেই সে ব্যস্ত। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য কোনোটাকেই সে প্রশ্রয় না দেবার পক্ষপাতী। সাধনপথে ওর বড় অন্তরায়।

কিন্তু কালীঘাটের পাঁঠা এনে যখন পেছনের বাগানে বেঁধে রাখা হয়, পরের দিন মাংস খাবার জন্যে, তখন সারা দিন রাত কী চিৎকারটাই না করে। এক একদিন অন্দরের রান্নাবাড়ির আব্রু পেরিয়ে বাইরে ভেসে আসে গরম মশলা আর মাংসের গন্ধ। সারা বাড়িটা সে-গন্ধে মাতাল হয়ে যায়।

ব্রজরাখালের নাকেও গন্ধ যায়। নাকে কোঁচার কাপড় চাপা দেয়। বলে—জ্বালালে দেখছি।

ভূতনাথ বলে—গন্ধটা ভালো লাগছে না তোমার ব্রজরাখাল? পেঁয়াজ রসুন আর...

ব্রজরাখাল বলে—রাখো তোমার পেঁয়াজ রসুন—শরীরের পক্ষেও কি এত-সব মশলা-পত্তর ভালো হে—কেবল তমো গুণ বাড়ায়, ও-সব তামসিক খাওয়া।

কিন্তু ভূতনাথের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্রজরাখাল বলে—বুঝি, তোমার রাতের খাওয়াটা সুবিধের হচ্ছে না—কিন্তু সুবিনয়বাবুর বাড়িতে দুপুরবেলাটা তো ভালোই খাও।

কিন্তু ব্রজরাখালকে তার অসুবিধের কথাটা যেন বলতে কেমন বাধে।

সেদিন সকালবেলা আপিস যাওয়ার মুখে হঠাৎ বংশী এসে ডাকলে—শালাবাবু!

শার্ট আর ধুতিটা তখন পরা হয়ে গিয়েছে। জুতোটা পায়ে গলিয়ে বেরোবার বন্দোবস্ত করছে সে। ব্রজরাখাল তখন রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত।

বাইরে থেকে বংশী আবার ডাকলে—শালাবাবু!

—কী রে বংশী?

বাইরে আসতেই বংশী হঠাৎ কাছে সরে এল। চারিদিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে গলাটা নিচু করলে। বললে—একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—কী কথা রে—ভূতনাথ উদগ্রীব হয়ে রইল।

বংশী ইতস্তত করে বললে—ছোটমা আপনাকে একবার ডেকেছেন।

—ছোটমা? ছোটমা কে? বড়বাড়িতে ছোটমা একজনই মাত্র। তবু কি জানি কেন ভূতনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—ছোটমা কে রে!

—আজ্ঞে ছোটকর্তার বউঠাকরুণ, ছোটবউঠাকরুণ এ-বাড়ির।

কানে কথাটা স্পষ্টই শুনতে পেলে ভূতনাথ। কিন্তু যেন বিশ্বাস হলো না। বললে—আমাকে

• ৷ মাস্টারবাবুকে?

—মাস্টারবাবুকে নয়, আপনাকে, আমি ঠিক শুনেছি।

এত লোক থাকতে তাকে যে কেন ছোটবৌঠাকরুণ ডাকবে তা বুঝতে পারলে না ভূতনাথ। এত আব্রু চারিদিকে। এতদিন আছে এ-বাড়িতে কোনো দিন কোনো সূত্রে বাড়ির কোনো মেয়ে-বউকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি ভূতনাথের। চারদিকে ঝিলিমিলি, পর্দা, পাল্কি—সব চিকে ঢাকা। বাড়ির ভেতরেও বাইরের পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। সে-বাড়ির বউ তাকে ডাকছে—সে কী রকম! ছোটমা'র নাম শুনেছে চাকর-বাকরদের কাছে। তাদের কথাবার্তা থেকে ছোটবৌঠাকরুণ সম্বন্ধে একটা ধারণাও করে নিয়েছে। কিন্তু বাইরের অজ্ঞাত পুরুষকে ছোটবৌঠাকরুণ ডেকে দেখা করতে চেয়েছেন—তাই বা কেমন বিচিত্র ব্যাপার! তা ছাড়া এ তো আর সুবিনয়বাবুর বাড়ি নয়। তাঁরা হলেন ব্রাহ্ম। জবাময়ী ভূতনাথের সামনে বেরিয়েছে, কথা বলতেও তার আপত্তি নেই হয়তো, কিন্তু তা বলে বড়বাড়ির ছোট বউ?

ভূতনাথ বললে—কী জন্যে, কিছু বলেছেন নাকি ছোটমা?

—তা কিছু বলেনি।

ভূতনাথ কী বলবে ভেবে পেলে না। ব্রজরাখালকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত যাবার আগে। বংশী বললে—তা হলে সন্ধ্যেবেলা আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো—কী বলেন?

ভূতনাথ 'আচ্ছা' বলে আপিসে বেরিয়ে পড়লো।

যথাসময়ে ঠাকুর এসে সেদিনও ডাকলে—ভাত বেড়েছি বাবু।

সেদিন তেমন কিছু গোলমাল হলো না। কিছু তরকারিও দিলে পাতে। তবু গত কয়দিন ধরে যেমন ব্যবহার করছিল, তার চেয়ে যেন কিছুটা ভালো। ভূতনাথ নিজের মনে মনে লজ্জিত হল। ঠাকুরের ওপর অন্যায় করে সে অবিচার করেছিল এ ক'দিন। হয় তো তার কোনো হাত নেই। আসলে তার জবাদিদিমণিই হয় তো ভাঁড়ার থেকে চাল-ডাল তরকারি দেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। জবাময়ীর তাচ্ছিল্যের প্রমাণ ভূতনাথ তো আগেই পেয়েছে যেদিন ব্রজরাখালের সঙ্গে সে প্রথম চাকরি হবার দিন এসেছিল। বাপ-মা-পিসীমা'র দেওয়া নামই সকলের থাকে। জবার নামও রেখেছিল সুবিনয়বাবুর কালীভক্ত হিন্দু বাবা। নিজের নামের জন্যে সকলকে পরের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। তা ছাড়া 'ভূতনাথ' নামটার মধ্যে কোথায় যে হাস্যকরতা আছে তা ভেবে পাওয়া যায় না। সকলেরই ঠাকুর-দেবতার নাম। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একজন দেবতা মহেশ্বর—তাঁরই এক নাম ভূতনাথ! আর সুবিনয়বাবুর বাবার নামই তো রামহরি। রামহরি ভট্টাচার্য। তার বেলায়!

সেদিন সুবিনয়বাবুই গল্প করেছিলেন—প্রথম যেদিন দীক্ষা নিলাম সে কী কাণ্ড ভূতনাথবাবু—শুনুন তবে—

জবা সুবিনয়বাবুর মাথার পাকা চুল তুলে দিচ্ছিলো। বললে—আমি সে গল্প দশবার শুনেছি বাবা।

—তুমি শুনেছো মা, কিন্তু ভূতনাথবাবু তো শোনেননি—কী ভূতনাথবাবু, আপনি শুনেছেন নাকি? তারপর ভূতনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললেন—আর শুনলেই বা—ভালো জিনিস দশবার শোনাও ভালো—বলে সুবিনয়বাবু গল্প শুরু করেন—

এই যে 'মোহিনী-সিঁদুরে'র ব্যবসা দেখছেন, এ আমার বাবার। বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু তান্ত্রিক কালীভক্ত। ছোটবেলায় মনে পড়ে—বাড়ির বিগ্রহ কালীমূর্তির সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করছেন—'ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'—কালীমন্ত্র জপ করতে করতেই তিনি স্বপ্নে এই মন্ত্র পান। সেই মন্ত্রপূত সিঁদুরই 'মোহিনী-সিঁদুর' নামে চলে আসছে। তা বাবা ছিলেন বড় গরীব, ওই যজন-যাজন নিয়েই থাকতেন, কিন্তু বোধ হয় দারিদ্র্যের জন্যই দয়াপরবশ হয়ে কালী ওই মন্ত্র দিয়েছিলেন যাতে সংসারে স্বাচ্ছল্য আসে—আমরা মানুষ হই—দু'মুঠো খেতে পাই—। মনে

আছে খুব ছোটবেলায় বাবা শেখাতেন—'বাবা তোমরা কোন্ জাতি?' তারপর নিজেই বলতেন—'বলো, আমরা ব্রাহ্মণ'।

আবার প্রশ্ন—কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? নিজেই উত্তর দিতেন—বলো, দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তারপর প্রতিদিন পূর্বপুরুষের নাম মুখস্থ করাতেন।

—তোমার নাম কী?

—তোমার পিতার নাম কী?

—তোমার পিতামহের নাম কী?

একে একে পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ—সকলের নাম মুখস্থ করাতেন আমাদের। এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই তাঁকে, বুঝলেন ভূতনাথবাবু—। মনে আছে আমি ছোটবেলায় হুঁকো কলকে নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসতুম। দিনের মধ্যে অন্তত দশ-বারোটা মাটির কলকে ভাঙতুম—তা দেখতাম বাবা সেই উঠোনের ধারে বসে আমার জন্যে মাটির কলকে তৈরি করে শুকিয়ে পোড়াচ্ছেন। তখন এক পয়সায় আটটা কলকে—সে-পয়সাও খরচ করবার মতো সামর্থ্য ছিল না তাঁর।

তারপর অবস্থা ফিরলো। 'মোহিনী-সিঁদুরে'র কৃপায় চালা থেকে পাকা বাড়ি হলো—দোতলা দালান কোঠা হলো—মা'র গায়ে গয়না উঠলো—। আর আমি এলাম কলকাতায় পড়তে। সেই পড়াই আমার কাল হলো, আমি চিরদিনের মতো বাবাকে হারালাম।

গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান সুবিনয়বাবু। জবা বলে—থামলেন কেন, বলুন—

সুবিনয়বাবু তেমনি চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন—না আর বলবো না। তোমাদের আমার গল্প শুনতে ভালো লাগে না।

—না, ভালো লাগে বাবা, ভালো লাগে, আপনি বলুন—জবা আদরে বাবার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো।

—আপনার ভালো লাগছে, ভূতনাথবাবু—সুবিনয়বাবু এবার ভূতনাথের দিকে চোখ ফেরালেন।

ভূতনাথ বললে—আপনি আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলেন—আমি বড় লজ্জা পাই।

—তবে তাই হবে—আচ্ছা, তুমি মা একবার জানলা দিয়ে দেখে এসো তো তোমার মা ভাত খেয়েছেন কিনা?

জবা চলে গেল।

সুবিনয়বাবু বলতে লাগলেন—যেবার সেই ডায়মণ্ডহারবারে ঝড় হয়—সেই বছর আমার জন্ম—সে এক ভীষণ ঝড়, বোধহয় ১৮৩৩ সাল সেটা—কলকাতায় সেই প্রথম ওলাওঠা হলো—জন্মেছি ঝড়ের লগ্নে—সারাজীবনটা কেবল ঝড়ের মতনই বয়ে গেল, দীক্ষাও নিলাম আর পৈতেও ত্যাগ করলাম—বাবাকেও একটা চিঠি লিখে দিলাম সব জানিয়ে—বাবা খবর পেয়ে নিজেই দৌড়ে এলেন। এসে নিয়ে গিয়ে দেশে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন—এক মাসের মধ্যে আর ঘরের বাইরে বেরোতে পারলাম না—আমি একেবারে বন্দী।

জবা এসে বললে—মা এখনও ভাত খায়নি—বলেছে আপনাকে খাইয়ে দিতে হবে।

—ও, তা হলে বাবা, আমি জবার মাকে ভাত খাইয়ে আসি, আব্দার যখন ধরেছেন তখন কিছুতেই তো আর ছাড়বেন না।

ভূতনাথের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললেন—জবার মা'র অসুখটা আবার বেড়েছে কিনা কাল থেকে—বেশ ভালো থাকেন মাঝে মাঝে—কিন্তু আবার...

সুবিনয়বাবু চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন—তুমি বসো মা জবা, ভূতনাথবাবুর সঙ্গে গল্প করো—আমি তোমার মাকে ভাতটা খাইয়ে আসছি।

হঠাৎ ভূতনাথ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। তবু কথা বলতে চেষ্টা করলে—তোমার মা'র এ-রকম অসুখ কতদিনের?

জবা মাথা নিচু করে বসেছিল, কথাটা শুনেই মাথাটা বেঁকিয়ে চাইলে ভূতনাথের দিকে। বললে—আপনি আবার আমার সঙ্গে কথা কইছেন!

—কেন? ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল—কেন? এমন কোনো কড়ার ছিল নাকি যে, জবার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না সে!

—যদি আমি আবার হেসে ফেলি। সেদিন সুনীতি-ক্লাশে বাবা রিপোর্ট করে দিয়েছেন জানেন!

—সুনীতি-ক্লাশ?

সে আবার কোথায়?

—সুনীতি-ক্লাশ জানেন না, যেখানে আমি রোজ রোববার সকালবেলা যাই। এ সপ্তাহে সবার রিপোর্ট ভালো, সুজাতাদি আর স্মৃতিদি'রা দু'জনেই এবারে very good পেয়েছেন, সরলা, সুবল, ননীগোপাল...

ননীগোপাল? কোন্ ননীগোপাল? কী রকম চেহারা বলো তো—ভূতনাথ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। সেই গঞ্জের স্কুলের হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে যদি হয়!

—চেনেন নাকি তাকে? ভারি দুষ্টু, আমাকে বাবা যা পয়সা হাতে দেন, জানতে পারলেই কেড়ে নেবে—খালি লজেন্স খাবে। মিস্ পিগ্‌ট যদি একবার জানতে পারেন—নাম কাটা যাবে ওর।

ভূতনাথ বললে—একদিন যাবো তোমাদের সুনীতি-ক্লাশে—দেখবো আমাদের ননীগোপাল কিনা—

—আপনাকে যেতে দেবে কেন?

—তুমি বলবে আমি তোমার দাদা।

—আপনি তো হিন্দু, আপনি কী করে আমার দাদা হবেন! যারা ব্রাহ্ম তারাই শুধু ওখানে যেতে পায়।

—কী শেখায় সুনীতি-ক্লাশে?

—নীতি শিক্ষা দেয়—সত্য কথা বলা, গুরুজনদের ভক্তি করা, পরমেশ্বরের উপাসনা করা আর ব্রহ্মসঙ্গীত।

—তোমার গান আমার খুব ভালো লাগে, সেদিন শুনেছিলাম—

—আমি রাঁধতেও পারি—আমার জন্মদিনে আমিই মুরগী রেঁধেছিলাম—সবাই...

—তোমরা মুরগী খাও? ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল।

—রোজ, রোজ খাই।

—কে রাঁধে?

—কেন ঠাকুর—ওই যে ঠাকুর আছে—ও—

—ঠাকুর তো হিন্দু।

—তা হোক, রাঁধে—আপনি খান না? বাবা বলেন—মুরগী খেলে শরীর ভালো হয়—ভূতনাথের কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করতে লাগলো। তা হোক—চাকরি করতে হলে এ-সব উৎপাত সহ্য করতে হবে। হঠাৎ ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, ভাঁড়ারের জিনিস কে বের করে দেয় রোজ?

—আমি, কেন? ও তো লেখা আছে সব মা'র আমল থেকে—আমি সেই দেখে দেখে বের করে দিই—আগে মা-ই দিতো, তারপর আমার ভাই মারা যাওয়ার পর থেকেই মা'র শরীর খারাপ হয়ে গেল—আমিই তারপর থেকে... কিন্তু ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ভূতনাথ উত্তর দেবে কি না ভাবছে এমন সময় সুবিনয়বাবু এসে পড়লেন। বললেন—তোমার মা'কে খাইয়ে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে এলাম মা,—তা যাক গে, যে-কথা বলছিলাম ভূতনাথবাবু—সেই দীক্ষা নেবার পর...

সুবিনয়বাবুর গল্প চলতে লাগলো। পুরনো দিনের কাহিনী। ঝড়ের লগ্নে জন্ম। ঘরের মধ্যে

বসে থাকতেন সুবিনয়বাবু। আর দলে দলে গ্রামের আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা জানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখতো, পৈতে ত্যাগ করেছে, ধর্ম ত্যাগ করেছে, এ কেমন অদ্ভুত জীব, কেউ কেউ মা'কে জিজ্ঞেস করতো—মাঠাকরুণ, তোমার ছেলে কথা কয়? মুড়ি খেতে দেখে মেয়েরা অবাক হয়ে গিয়েছে—এই তো মুড়ি খাচ্ছে মাঠাকরুণ, এ তো সবই আমাদের মতন।

ভাত খেতে বসে ভূতনাথের এই-সব গল্পের কথাই মনে পড়ছিল। খাওয়ার পর উঠে হাত ধুয়ে চলে যাবার সময় ঠাকুর হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো—বাবু—

—কী বলো?

ঠাকুরের চোখ দুটো যেন জ্বলছে। লাল টকটকে। ভয় পাবার মতন। গাঁজা খায় নাকি?

ঠাকুর ভূতনাথের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললে—বাবুর কাছে আপনি আমার নামে নালিশ করেছেন?

—নালিশ। ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল।

—হ্যাঁ নালিশ? কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, আমাদের সঙ্গে এমনি করলে এখানে আপনি তো টিঁকতে পারবেন না—

—সে কি, কী বলছো ঠাকুর তুমি?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, কত কেরানীবাবুকে দেখলাম, যদি ভালো চান তো বুঝে-শুনে চলবেন—বলে হন্ হন্ করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘটনাটা এক মিনিটের বটে। প্রথমটা থতোমতো লাগিয়ে দেয়। কিন্তু একটু ভাবতেই ভূতনাথ শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালো। খুব সামান্য ঘটনা তো নয়। আর একদিনও দেরি করা চলবে না এর পর। কিন্তু কী-ই বা উপায় আছে! নিজের টেবিলে এসে আবার কাজে মন দিলে ভূতনাথ। কিন্তু চোখের সামনে কিছু যেন স্পষ্ট দেখা যায় না। ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা। চাকরির জন্যেই সমস্ত অপমান আজ সহ্য করতে হলো তাকে।

হঠাৎ বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলেন সুবিনয়বাবু।

মুখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। যথারীতি কুশল প্রশ্ন করে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভূতনাথ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছন পেছন গিয়ে বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল স্যার—

থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এমন কবে কখনও তো কথা বলে না ভূতনাথবাবু! বললেন—খুব জরুরী কথা? কেমন যেন তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখছি ভূতনাথবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আর এখানে খাবো না কাল থেকে। আমার চাল নেওয়া যেন বন্ধ হয়—

কথাটা শুনে চুপ করে রইলেন সুবিনয়বাবু। একবার চেয়ে দেখলেন ভূতনাথের দিকে। কিন্তু দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্যের মধ্যে মুখের কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পেলো না। তারপর হঠাৎ 'আচ্ছা, তাই হবে'—বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

ভূতনাথ নিজের টেবিলে আবার বসলো। কাজ করতে আর মন বসে না। এখানে খাওয়া তো বন্ধ, তারপর। তারপর ব্রজরাখাল ভরসা। ব্রজরাখালকে মুক্তি দিতে পারলে না ভূতনাথ। এবারও সেই ব্রজরাখালেরই ওপর নির্ভর করতে হবে।

কিম্বা যদি খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত না হয়, তাকে অন্য কোনো চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। ব্রজরাখাল ওদিকে চেষ্টা করতে থাকুক, ভূতনাথ নিজেও ঘুরে চেষ্টা করবে। তারপর যা হয় হোক। কিন্তু বিকেলবেলা আপিস থেকে বেরোবার আগেই হঠাৎ ডাক এল।

ফলাহারী পাঠক এসে বললে—মালিক আপনাকে একবার ডাকছে কেরানীবাবু—

ফলাহারী পাঠকের হাসিমুখ দেখে ভূতনাথের কেমন যেন অবাক লাগলো। জিজ্ঞেস করলে—কী ব্যাপার ফলাহারী?

ফলাহারী বললে—নিজের চোখে গিয়ে দেখুন বাবু—

দোতলায় নয়। একতলায় ওপরে ওঠবার রাস্তাতেই সুবিনয়বাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া

গেল। একেবারে রান্নাঘরের দিক থেকে শব্দটা আসছে।

সামনে গিয়ে ভূতনাথ আরো অবাক। সুবিনয়বাবু একলা নন। জবাও পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সুবিনয়বাবু সিংহ-গর্জনে বলছেন—রাখ রাখ, হাতা বেড়ি রাখ—এখন ঘর থেকে বের হয়ে যা—

ঠাকুর ঠক ঠক করে সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

সুবিনয়বাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন—বেরিয়ে যা এখনি, এক মুহূর্তও আর তোকে স্থান দেওয়া চলবে না—বেরিয়ে যা, হাতা বেড়ি রাখ—

জবা পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে সব শুনছে। হঠাৎ ভূতনাথকে দেখেই সুবিনয়বাবু বললেন—ঠাকুর তোমায় কী বলেছে ভূতনাথবাবু, বলো তো? এসো এদিকে, সামনে এসো—

ভূতনাথ কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। সুবিনয়বাবুর এ-মূর্তি কখনও সে দেখেনি আগে। বললে—ঠাকুর তেমন কিছু বলেনি আমাকে—আপনি...

সুবিনয়বাবু হঠাৎ জুতোসুদ্ধ পা'টা মেঝের উপর সজোরে ঠুকে বললেন—আঃ কী বলেছে তাই বলো। বাজে কথা শুনতে চাই না—

—আজ্ঞে ও বলেছিল ওদের সঙ্গে এমন করলে আমি এখানে টিকতে পারবো না—ওই পর্যন্ত—আমাকে অপমান কিছু করেনি—

সুবিনয়বাবু বললেন—তা হলে বলতে আর বাকি রেখেছে কি? তোমায় দু'ঘা জুতো মারলে কি সন্তুষ্ট হতে ভূতনাথবাবু? বলে ঠাকুরের দিকে ফিরে বললেন—যা তুই, এ-বাড়ির চাকরি গেল তোর—এখানে তো টিকতে পারলিই নে, গাঁয়েও টিকতে পারবি কি না পরে ভাববো—

যে-কথা সে-ই কাজ! আর মুহূর্ত মাত্র দেরি নয়। ঠাকুর নিজের কাপড়-গামছা গুছিয়ে পুঁটলি বেঁধে নিয়ে তৈরি হলো। তারপর চোরের মতন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

সেদিনকার সেই ঘটনায় ভূতনাথের মনটা যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল। সুবিনয়বাবু বলেছিলেন—তোমরা ইয়ং-বেঙ্গল, বড় মিন্‌মিনে ভূতনাথবাবু, সেইজন্যেই সবাই তোমাদের অপমান করতে সাহস পায়—গুণ্ডার ভয়ে মেয়েদের পুরে রেখেছো পর্দার মধ্যে আর ওদিকে গোরার ভয়ে তেত্রিশ কোটি লোক দেশটাকে পরাধীন করে রেখেছো—তোমাদের গলায় দড়িও জোটে না—

ঠিক এমন কথা সুবিনয়বাবুর মুখ থেকে শোনবার আশা করেনি ভূতনাথ। আমতা আমতা করে বললে—আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি—

সুবিনয়বাবু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—তা হলে বলতে চাও—জবা-মা মিথ্যে কথা বলেছে?

হঠাৎ জবার দিকে চোখ পড়তেই জবা বলে উঠলো—আমি যে নিজের কানে সব শুনেছি ভূতনাথবাবু, আপনি ঠিক বলুন তো ঠাকুর আপনাকে শাসিয়ে ছিল কি না?

ভূতনাথ বললে—কিন্তু সে তো অন্য কারণে—

—কী কারণে, বলুন—জবা জবাবের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো।

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। একটু ভেবে বললে—ঠাকুর বলছিল, আমি নাকি পেট ভরে খেতে পাই না বলে আপনার কাছে নালিশ করেছি—

সুবিনয়বাবু বললেন—আমার তো তাই বক্তব্য—তুমি এতদিন নালিশ করোনি কেন ভূতনাথবাবু?

জবা বাবার দিকে চেয়ে জবাব দিলে—ভূতনাথবাবু বোধ হয় ভেবেছিলেন আমি কম করে ভাঁড়ার বার করে দিই—

—তুমি তাই ভেবেছিলে নাকি, ভূতনাথবাবু?—সুবিনয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

ভূতনাথ কিছু জবাব দেবার আগেই জবা বললে—আপনি যা ভেবেছিলেন বাবা, ভূতনাথবাবু তেমন লোক নন। দেখলেন তো, বুঝুন—আচ্ছা, আপনাকে কম খেতে দিয়ে আমার কী স্বার্থ আছে বলুন—আপনার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক? আপনি চাকরি করবেন, মাইনে নেবেন, পেট

ভরে খেয়ে যাবেন—সেটা আপনার ন্যায্য পাওনা—অসুবিধে হয় নালিশ করবেন—

—ঠিক কথা, জবা ঠিক কথাই বলেছে—তুমি এতদিন নালিশ করোনি কেন ভূতনাথবাবু?

জবা তেমনি উত্তেজিত হয়ে বলে চললো—উনি ঠাকুরের কথাই ধ্রুব বলে জেনেছেন, আর আমাকেই চোর বলে ঠিক করেছিলেন—তাই রাগ করে আপনার কাছে ভাত খাবেন না বলেছিলেন—বাবা আপনি ভূতনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করুন তো সত্যি করে উনি বলুন যা বলছি আমি সত্যি কিনা?

—সত্যি তুমি তাই ভেবেছিলে নাকি ভূতনাথবাবু?

জবা আবার বলতে লাগলো—কিন্তু ভাগ্যিস আমি নিজের কানে শুনতে পেলাম কথাটা। উত্তেজনার মুখে জবা যেন আরো কী কী সব বলে গেল, সব কথা ভূতনাথের কানে গেল না। ঘটনাচক্র এমনই দাঁড়ালো যেন ভূতনাথই আসল অপরাধী—ভূতনাথই যেন সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে। আসামী একমাত্র সে-ই। সুবিনয়বাবু আর তাঁর মেয়ে দু'জনে মিলে ভূতনাথের অপরাধেরই যেন বিচার করতে বসেছেন। ভূতনাথের চোখ কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো।

যখন আবার তার সম্বিৎ ফিরে এল তখন খেয়াল হলো সুবিনয়বাবু বলছেন—অন্যায় যারা করে তাদের যতখানি অপরাধ, সেই অন্যায় যারা ভীরুর মতো সহ্য করে তাদের অপরাধও কি কম—সুরেন বাঁড়ুয্যে মশাই-এর কথাটা ভাবো তো একবার, একরকম বিনা দোষেই তাঁর সেদিন চাকরি গেল। ভাবো একবার গোরাদের অত্যাচারের কথা—পয়সা দিয়েও রেলের কামরায় সাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে যাবার অধিকার নেই—সত্যি কথা বললে হয় রাজদ্রোহ—বুটের লাথির চোটে চা-বাগানের কুলির পিলে ফেটে গেলেও প্রতিবাদ করলে হয় জেল—এমনি করে আর কতদিন অত্যাচার সহ্য করবে ভূতনাথবাবু? এদিকে গোঁড়া বামুনদের অত্যাচার, বিলেত গেলেই, মুরগী খেলেই জাতিচ্যুত। আর একদিকে সাহেবের লাথি—ইয়ং-বেঙ্গল তোমরা, তোমরাই তো ভরসা—আমরা আর ক'দিনের—

অভিভূতের মতো কখন যে ভূতনাথ রাস্তায় বেরিয়েছে, কখন বাড়ির পথে চলতে শুরু করেছে খেয়াল ছিল না। গোলদিঘীর কাছে আসতেই খোলা হাওয়ার স্পর্শ লেগে সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো যেন আবার সজীব হয়ে উঠলো। ভূতনাথের মনে হলো কিছুক্ষণ আগে আপাদমস্তক বেঁধে কেউ চাবুক মেরে ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত শরীরে যেন এখনও তার যন্ত্রণার সঙ্কেত। সুবিনয়বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসবার সময় সে তো কিছু বলে আসেনি। আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা নয়। কিন্তু ওদের ভুল সংশোধনের চেষ্টাও তো ও করতে পারতো। কিম্বা ক্ষমা ভিক্ষা। জবাকে নীচ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা তো তার ছিল না। ঠাকুরকেই সে তো অবিশ্বাস করে এসেছে। ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগই তো সে করতে গিয়েছিল।

আবার ফিরলো ভূতনাথ। চারদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু যত অন্ধকারই হোক, যত রাত্রিই হোক আজ, 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে ফিরে গিয়ে আবার তাকে দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে।

পাশে একটা মদের দোকান। উগ্র গন্ধ নাকে এল। ভেতরে বাইরে ভিড়। সামনে রাস্তার ওপর বসে পড়েছে ভাঁড় নিয়ে লোকগুলো। আবছা অন্ধকারেও যেন হঠাৎ চমকে উঠলো ভূতনাথ। ঠাকুর না!

ভালো করে চেয়ে দেখবার সাহস হলো না তার। এক ঘণ্টা আগে যার চাকরি গিয়েছে সে-ও বুঝি বসে গিয়েছে এখানে ভাঁড় নিয়ে। হন্ হন্ করে পা চালিয়ে সোজা চলতে লাগলো ভূতনাথ। ঠাকুর তাকে দেখতে না পেলেই ভালো। অপ্রকৃতিস্থ মানুষ ভূতনাথের যুক্তিগুলো বুঝবে না ঠিক।

আরো আধ ঘণ্টা পরে যখন ভূতনাথ 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে গিয়ে পৌঁছলো তখন সদর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দরজা খুলে দিলে বৈজু দারোয়ান। বললে—আবার ফিরে এলেন যে কেরানীবাবু?

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বাবু কোথায়?

—ওপরে।

সোজা যন্ত্রচালিতের মতো ওপরে গিয়ে বড় হল্‌-ঘরে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। এদিক-ওদিক সব দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। অন্দরে যাবে কিনা ভাবছে—হঠাৎ হাবার-মা সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো।—

হাবার-মা বললে—বাবু এখন মাকে খাওয়াচ্ছেন।

—আর দিদিমণি?

—নিচে রান্নাঘরে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে আবার তেমনি করে নিচে নেমে এসে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালো ভূতনাথ। চার জন ঝি সাহায্য করছে জবাকে। জবা রান্না করছে। এ দৃশ্য হয় তো এ-বাড়ির লোকের কাছে নতুন নয়—কিন্তু ভূতনাথের কাছে অভিনব মনে হলো। পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে খানিকক্ষণ দেখতে লাগলো জবাকে। হঠাৎ সেই অবস্থায় ভূতনাথের মনে হলো জবাই তো এ-বাড়ির আসল গৃহিণী।

পেছন ফিরে কী একটা জিনিস নিতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়লো।

নজরে পড়তে জবাও অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—একি, আবার ফিরে এলেন যে আপনি—বাবা তো ওপরে—

ভূতনাথ প্রথমটা কেমন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বললে—তোমার সঙ্গেই আমার দরকার ছিল জবা—আজকে আমার সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে—বাবাকে বলো তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন—

আরো যেন কী কী বলবার ছিল ভূতনাথের, কিন্তু আর কিছু তার মুখ দিয়ে বেরোলো না। জবা হেসে ফেললে। বললে—আশ্চর্য, এই কথা বলতেই আবার এখন ফিরে এলেন নাকি?

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। জবা এবার হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—যে আপনার নাম রেখেছিল, তার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করছি—তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কেন? কেন আপনি ক্ষমা চান বলুন তো?

ভূতনাথ একটু ইতস্তত করে বললে—আমার জন্যেই তো তোমায় আজ রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছে—আমার জন্যেই তো ঠাকুরকে—

জবা বললে—রান্না করতে আমি ভয় পাই না ভূতনাথবাবু, কারণ বাবা যার-তার হাতে রান্না খান না—ঠাকুর নেহাৎ দেশের লোক ছিল তাই... আর... কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা—আপনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছেন তো?

ভূতনাথ বুঝতে পারলে না বললে—কীসের ভয়?

—জাত যাওয়ার ভয়।

—কেন?

—এবার থেকে তো আমিই রান্না করবো—ভুলে যাচ্ছেন কেন? আমি তো ম্লেচ্ছো!

কথাটা ভাববার মতন। ভূতনাথও হঠাৎ কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

জবা বললে—আজ বাসায় গিয়ে ভাবুন—সমস্ত রাত ধরে সেইটেই ভাবুন আগে—তারপর কাল যা বলবেন, সেই ব্যবস্থা করবো—এখন রাত হয়ে গেল—আপনি বাড়ি যান বরং—বলে উনুনে আর একটা হাঁড়ি চড়িয়ে দিলে।

ভূতনাথ নির্বোধের মতো আস্তে আস্তে বাইরে চলে আসছিল। অন্ধকারে রাস্তায় পা বাড়াতে গিয়ে পেছনে যেন জবার গলার আওয়াজ পেলে—

—শুনুন।

ভূতনাথ আবার ফিরলো। জবা বললে—বৈজুকে সঙ্গে নিয়ে যান—রাত্তির হয়ে গিয়েছে—এদিককার রাস্তাটা খারাপ—আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক ও—

ভূতনাথ মুখ তুলে জবার দিকে চেয়ে দেখলে। কথাটার মধ্যে বিদ্রূপের খোঁচা আছে যেন! কিন্তু অন্ধকারে জবার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না।

ভূতনাথ আর সময় নষ্ট না করে রাস্তায় পা বাড়ালো। কেন মিছিমিছি সে আবার ফিরে এল? কার কাছে সে ক্ষমা চাইলে! কে জানে, কী সমাজের মানুষ এরা সবাই। রাধা, আন্না, হরিদাসী তারা তো কেউ এমন আড়ষ্ট করে কথা বলতো না। শহরের সব মেয়েরাই কি এমনি? না শুধু ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরাই এই রকম?

ভূতনাথ চলতে চলতে বললে—না, সঙ্গে কারোর যাবার দরকার নেই—আমি মেয়েমানুষ নই।

বনমালী সরকার লেন-এর বড়বাড়ির সামনে আসতেই ব্রিজ সিং দেখতে পেয়ে ডাকলে—এ শালাবাবু, এ শালাবাবু—এ—

ভূতনাথ প্রথমটায় অবাক হয়ে গেল। তাকে হঠাৎ ডাকে কেন? তারপর বললে—কী দারোয়ান?

—আরে আপনাকে ছুটুকবাবু ডাকিয়েছেন—

ভূতনাথ আরো অবাক হয়ে গেল ছুটুকবাবু ডাকবেন কেন! ব্রজরাখাল কিছু জানে নাকি? ছুটুকবাবু তাকে চিনলেই বা কী করে! বড়বাড়িতে কে-ই বা তাকে চেনে। সবার অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে রোজ বাড়িতে এসে ঢোকে সে—আবার সকালবেলা নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় চাকরি করতে। কারুর সঙ্গে পরিচয় বা আলাপ করবার সাহসও হয় না তার। বংশী অবশ্য আসে মাঝে মাঝে। নিজের সমস্যা নিয়ে সে বিব্রত। তার কাছেই এ-বাড়ির সকলের নাম শুনেছে সে। স্নান করতে গিয়ে ভিস্তিখানার মধ্যে অন্য চাকর-বাকরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে একটু কিন্তু সে সামান্যই।

ওই ভিস্তিখানার পাশ দিয়ে যেতেই একদিন লোচন ধরেছিল। খোঁচা খোঁচা কদমফুলের মতো দাড়ি। গলায় দু'সারি কণ্ঠী। একটা চোখ বোধহয় ট্যারা। বুড়ো মানুষ বটে।

তখন আপিস যাবার তাড়া ছিল। কোনরকমে একটুখানি জল নিয়ে স্নান সেরে হাঁটা দিতে হবে। কিন্তু ভিস্তিখানায় তখন জল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। জল তুলছে শ্যামসুন্দর। সকালবেলায় এ-বাড়িতে বিশেষ তাড়াহুড়ো থাকে না। কর্তারা বেলা করে ওঠেন। তাই বেলাতেই কাজের চাপ।

লোচন ডেকে বসিয়েছিল বেঞ্চিতে। বললে—অধীনের নাম লোচন দাস—

চারদিকে হুঁকো গড়গড়া ফরসি আর তামাকের বোয়েম। দেয়ালের গায়ে সার সার নল ঝুলছে। লাল নীল রেশমের সিল্কের জরির কাজ করা সব। হুকোর নলের মধ্যে শিক পুরে দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

শিক চালাতে চালাতে লোচন বললে—তামাক ইচ্ছে করবেন নাকি শালাবাবু—

এ-বাড়িতে শালাবাবু নামেই ভূতনাথকে সবাই চেনে। আর সুবিনয়বাবুর বাড়িতে সে কেরানীবাবু। ভূতনাথ বললে—তামাক খাইনে তো আমি—

কথাটা শুনে লোচন মনোযোগ সহকারে ভূতনাথের দিকে চেয়ে দেখলে খানিকক্ষণ, তারপর বললে—কিন্তু এই তো তামাক ধরবার বয়েস আপনার—এবার ধরে ফেলুন আজ্ঞে—আর দেরি করবেন না—

ভূতনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। ভূষণকাকা তামাক খেতো খুব। রাধার বাবা নন্দজ্যাঠাও তামাক খেতেন। তা ছাড়া বারোয়ারি ক্লাবের যাত্রার দলে ছোট-বড় সবাই কম বেশি তামাক খেতো। কেউ সামনে—কেউ বা লুকিয়ে। মল্লিকদের তারাপদ খেতো 'বার্ডস্-আই'। একবার যাত্রাঘরের প্রায়-নিবন্ত হুঁকোতে টানও দিয়েছিল ভূতনাথ। কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছিল তখনি। বাইরে রসিক মাস্টার আসছিল। ঘরে ঢুকতেই বললে—কাশে কে—

তারপর ভূতনাথকে দেখে বললে—ও, নতুন খাচ্ছো বুঝি ছোকরা—তা প্রথম প্রথম অমন হবেই তো—একটু জল খাও—হেঁচকি উঠবে না—

সেই হেঁচকির চোটে আর খাওয়া হলো না তামাক। তারপর কলকাতায় এসে ব্রজরাখালের সঙ্গেই কাটালো দিনরাত। শহরের আশেপাশে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে ব্রজরাখাল। তার ওসব নেশা-টেশার বালাই নেই। আর সুবিনয়বাবু ঘোর ব্রাহ্ম! তাঁর বাড়িতে ও-পাটই নেই। ফলহারী পাঠকরা বিড়ি খায়—তাও কারখানার ভেতরে বসে নয়। রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে খেয়ে আসে।

লোচন বললে—তেল মাখার পরেই তামাকটা জমে কি না—নিই সেজে—বলে সত্যি সত্যিই সাজতে লাগলো লোচন। বললে—মেজকত্তা। যেটা ভাত খাবার আগে খান—সেই তামাকটা দিই আপনাকে—দেখবেন খিদে হবে—রাত্তিরে ঘুম হবে ভালো।

ভূতনাথ বললে—না লোচন, তামাক আমাকে ধরিও না—গরীব লোক, শেষকালে—

লোচন বললে—পয়সা খরচ আপনার কিসে হচ্ছে—ওই তো ভৈরববাবু খান—বাড়িতে তামাকের পাট রাখেননি—আমিই ব্যবস্থা করে দিয়েছি—দিনে একটি করে পয়সা দেন, যতবার খুশি খেয়ে যান—ওঁর ডাবা হুঁকো আমি কাউকে ছুঁতে দিইনে—

লোচন বেশ চুরিয়ে চুরিয়ে তামাক সাজতে সাজতে বললে—এ-বাড়িতে কোনো জিনিসের তো আর হিসেব নেই—ছত্রিশ রকমের নেশা বাবুদের—তারি মধ্যে যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন ওই তামাকটাই যা খান—ওই ছুটুকবাবুকে দেখেছেন তো—

ভূতনাথ বললে—দেখেছি বৈকি—ওই যে গানের আসর বসান—

—আজ্ঞে, ওই ছুটুকবাবুকে তো আমিই ধরিয়েছি—হালের ছোকরা মানুষ—তামাকের চেয়ে সিগারেটের দিকেই ঝোঁক বেশি, দশ পয়সায় এক কৌটো সিগারেট হয়—আর বাহারও খোলে চেহারার—আমি একদিন বড়মাকে গিয়ে বললাম—খোকাবাবুর বয়েস হচ্ছে, এবার তামাক ধরিয়ে দেই—

তা বড়মা বললেন—তামাক ধরাবি খোকাবাবুকে তা আমার অনুমতি কেন—

বড়মা আমার ভারি রাশভারি মানুষ, বিধবা হয়েছেন ওই খোকাবাবু হবার পর—কারো সাতে পাঁচে থাকেন না, চেহারা নয় তো, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী!

আমি হেসে বললাম—তা কি হয় বড়মা, যদ্দিন আপনি বেঁচে আছেন তদ্দিন আপনার হুকুম না নিয়ে কি কিছু করতে পারি—শেষকালে অধমকে অপরাধী করবেন আপনারা সবাই—

লোচন বলতে লাগলো—তারপর থেকে খোলাখুলি হুঁকোর ব্যবস্থা করে ফেললাম, খাজাঞ্চীখানায় গিয়ে সরকারবাবুকে ধরলুম, বড়মা'র হুকুম পেয়েছি—আর কার তোয়াক্কা—চিৎপুরের নতুন বাজার থেকে রূপোর গড়গড়া, ফরসি সব এল—ভটচায্যি মশাইকে দিয়ে দিনক্ষণ পাঁজি দেখিয়ে হাতে নল ধরিয়ে দিলুম—

কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে লোচন বললে—গোলাপ জল দিয়ে কাশীর কলকেয় বেশ করে তাওয়া দিয়ে বালাখানা তামাক সেজেছিলুম, ছুটুকবাবু খেয়ে এক গাল হাসি, ভারি খুশি হয়েছিলেন, একটু কাশি নয়, হেঁচকি নয়—বললে বিশ্বেস করবেন না, নগদ এক টাকা আমায় বকশিস করে ফেললেন, আর সরকারবাবুকে বলে দিলেন আমার নামে একটা গামছার খরচা খাতায় লিখতে—

তারপর একটা কড়ি বাঁধা ডাবা হুঁকোয় কলকে বসিয়ে ভূতনাথের দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—এটা বামুনের হুঁকো—তারকবাবু মতিবাবু সব এতেই খান—

ভূতনাথ বললে—কেন মিছিমিছি পেড়াপীড়ি করছো লোচন, আমি ও খাইনে—

—এ কেমন ধারা কথা হলো আজ্ঞে?

লোচন যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে এল। তারপর যেন একটা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে পেরেছে এমনি ভাবে বললে—মরুকগে, তা না হয় আপনি একটা করে আধলাই দেবেন রোজ, আমি তো রইলাম, রোজ এসে খেয়ে যাবেন যখন ইচ্ছে হয়—এই যে আজ দেখছেন এ-বাড়িতে

সকলের মুখে মুখে হুঁকো, এ কেবল অধমের জন্যেই, নইলে কবে উঠে যেতো এ-বাড়ি থেকে তামাক খাওয়ার পাট—আর তামাক খাওয়াই যদি উঠে যায় তো এ অধমের চাকরি কিসে থাকে বলুন তো—এতদিন ধরে তামাক সেজে সেজে, এখন বুড়ো বয়েসে তো আর ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কুঁচোনো কি মোসাহেবি করা পোষাবে না—

ভূতনাথ বললে—তা এতদিন ধরে তুমি এই কাজ করছো, এখন কি আর তা বলে তোমার জবাব হয়ে যাবে রাতারাতি—

—তা হুজুর সবই সম্ভব, এই দেখুন না বাবুরা শুনছি মোটর গাড়ি কিনবে, তা কিনলে ইব্রাহিম মিয়ার চাকরি কি আর থাকবে, আগে এই বাড়িতেই ছোটবেলায় দেখেছি পাঁচখানা পাল্কি, এখন যেখানে দাসু জমাদারের ঘর দেখছেন ওইখানে থাকতো পাল্কি-বেহারারা, কোথায় সব চলে গেল—এখন চুরুট সিগারেট যদি বাবুরা ধরে তা হলে গড়গড়া হুঁকো কে আর খাবে বলুন—

লোচন আরো বলতে লাগলো—বাবু, এই বয়েসে কত দেখলুম—ঘোড়ার টেরাম ছিল—এখন কলের টেরাম হলো—তারপর কলের গাড়িও হবে—তা আর ভেবেই বা কী হবে, একদিন হয় তো হুঁকো কেউ খেতেই চাইবে না, তখন...... কিন্তু তার আগেই যেন যেতে পারি শালাবাবু—নিন—ধরুন, গুলের আগুন কিনা—গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—তাহলে ওই কথাই রইলো, আপনি একটা করে আধলা-ই দেবেন—

কিন্তু ভূতনাথকে নিতে হলো না। বাধা পড়লো।

—এই যে ভৈরববাবু এসে গিয়েছেন।

লোচন তাড়াতাড়ি ভৈরববাবুর হুঁকো তৈরি করতে ভেতরে গেল। ভূতনাথ চেয়ে দেখলে—বাবু বটে ভৈরববাবু! ঢেউখেলানো বাবড়ি চুল, বাঁকা সিঁথি, পরনে ফিনফিনে কালোপেড়ে ধুতি, গায়ে চকচকে বেনিয়ান, গলায় মিহি চুনোট করা উড়ুনি, পায়ে বগলস আঁটা চীনে-বাড়ির জুতো—

লোচন হুঁকো বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আজ যে এত সকাল-সকাল ভৈরববাবু?

—আজ যে ছেনি দত্তর সঙ্গে পায়রার লড়াই আছে রে—শুনিসনি তুই—মেজবাবু সেবার হেরে গিয়েছিল না, এবার পশ্চিম থেকে নতুন পায়রা এসেছে—ছেনি দত্তর গুমোর ভাঙবো এবার, ভালো গমের দানা খাওয়ানো হচ্ছে তো ওই জন্যে—এবার দেখবি ছেনি দত্তর পায়রা তিন বার চক্কর খেয়েই বোম্-এ বসে পড়বে—মেজবাবুর সঙ্গে টেক্কা দিতে এসেছে ঠন্ঠনের দত্তরা—

খানিক ভুড়ুক করে হুঁকো টানতে লাগলো ভৈরববাবু—

লোচন বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো হুজুর—

—বল না—

—শুনেছি ছেনিবাবু নাকি হাটখোলায় তেনার মেয়েমানুষকে পাকাবাড়ি করে দিয়েছে—

—শুনেছিস ঠিকই লোচন, সে-বাড়ি তিন-তিনবার মর্টগেজ হয়ে এখন সে-বাড়ি মায় মেয়েমানুষ মল্লিকদের হাতে গিয়ে পড়েছে—সে খবর রাখিস—মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে মেয়েমানুষ পোষা ছেনি দত্তর কম্ম নয়—আর এদিকে আমাদের চুঁচড়োর বাগানে গিয়েছিলি নাকি এদানি?

—আজ্ঞে না।

—গিয়ে একদিন দেখে আসিস লোচন, খড়দা'র রামলীলার মেলায় সেদিন তিনটে মেয়েমানুষকেই নিয়ে গিয়েছিল মেজবাবু, দূর থেকে ছেনি দত্ত আড় চোখে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল—মেজবাবু বারণ করলে, নইলে শালাকে...

হঠাৎ এতক্ষণে ভূতনাথের দিকে নজর পড়তেই জিজ্ঞেস করলে—এ কে রে লোচন?

—আজ্ঞে উনি আমাদের মাস্টারবাবুর শালা, এখানেই থাকেন।

ভৈরববাবু তামাক খাওয়া বন্ধ করে বললে—তাই নাকি? কী নাম তোমার ছোকরা?

ভূতনাথ বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমার নাম শ্রীভূতনাথ চক্রবর্তী।

—দেশ কোথায়?

—নদেয়—ফতেপুর গাঁ।

—কী করা হয় এখানে?

—'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে চাকরি করি।

—কত বেতন পাও?

—সাত টাকা আর একবেলা খাওয়া।

—আর উপরি, উপরি কত... উপরি নেই? চলা শক্ত, নেশাটা-আশটা করতে গেলে একটু টেনে-টুনে চলতে হবে ভাই—আগে সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল, আগের কালে তুই বললে বিশ্বাস করবিনি লোচন, ওই এক পাঁটের দাম ছিল চার আনা—ওই গাঁজাই বল আর চরস-ই বল সব জিনিসের দাম কেবল বেড়েই চলেছে—এমন করে দিন দিন জিনিসের দাম বাড়লে কী খেয়ে মানুষ বাঁচে বল—

লোচন বললে—উনি তামাকই খান না—তায় আপুর বোতলের কথা বলছেন—

ভৈরববাবু বললে—তা তামাক খাও আর না-খাও ভাই—পাড়াগাঁ থেকে নতুন এসেছো, বড়ভাই-এর মতো ভালো কথা বলছি ওটি খাবে—নইলে এ নোনা হাওয়ার দেশ এমন পেট ছাড়বে—তখন... বলে ভৈরববাবু আবার টান দিলেন হুঁকোয়। তারপর থেমে বললে—বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি ভাই। মেজবাবু তো লেখাপড়া জানা লোক, মেজবাবু তো আর মিথ্যে বলবে না। তা ওই মেজবাবুর কাছেই শুনেছি, সেকালের মস্ত বড় একজন বাবু রামমোহন রায় খেতো আর সকলকে ডেকে ডেকে খাওয়াতো। রাজনারায়ণ বোস খেতো, মাইকেল মধুসূদন খেতো। তা ছাড়া রামমোহন রায় তো ছিল মাল খাওয়া শেখাবার গুরু রে! তারপর এক টান টেনে ভৈরববাবু বললে—এই এখন তো আমার এই চেহারা দেখছিস, আগে ছিল প্যাকাটির মতন, মেজবাবু বললেন—নোনা লেগেছে—মাল খেতে হবে। মেজবাবুর কথায় খেতে শুরু করলুম—শেযে নীলু কবিরাজের সালসায় যা হয়নি, মাল খেয়ে তাই হলো, এখন যা খাই দিব্যি হজম হয়ে যায়। জিনিসটা যদি খারাপই হতো তো সাহেব বেটারা সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদী পেরিয়ে এখানে এসে আর রাজত্ব করতে পারে?

কথাটা ভাববার মতন। না বিশ্বাস করে উপায় নেই।

তারপর ভৈরববাবু বললে—একবার চুপি চুপি খবরটা নাও তো লোচন মেজবাবুর ঘুম ভাঙলো কিনা। তারপর পকেট থেকে বার করলে একটা তামার পয়সা। বললে—নাও তোমার মামুলি নাও।

লোচন পয়সাটা নিয়ে ট্যাকে গুঁজলো।

সেদিন ওই পর্যন্ত। এ-বাড়ির হালচাল দেখে ভূতনাথ এখন আর অবাক হয় না। রবিবার দিন 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসের ছুটি। ব্রজরাখাল সেদিন সকাল সকাল বেরিয়ে যায়—বরানগরের বাগানে। ঠাকুরের চেলারা ওখানে থাকে। সারাদিন কী করে সেখানে, তারপর আসে সেই অনেক রাত্রে।

মেজবাবুকে এক এক রবিবার দেখা যায়। গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ইব্রাহিম মিয়া গাড়ি নিয়ে। আরো দু'খানা গাড়িতে থাকে মেজবাবুর মোসাহেবের দল। সকলেরই চুনোট করা উড়ুনি। বাঁকা সিঁথি, বাবড়ি চুল। ইব্রাহিমের গাড়ির ভেতর মেজবাবুর মেয়েমানুষ। ভালো করে দেখা যায় না। ফরসা টুকটুকে চেহারা। ঘোমটা খোলা। নাকে নাকছাবি। পানের ডিবে হাতে নিয়ে নামে এক-একদিন।

মেজবাবুর চাকর বেণী বলে—শালাবাবু সরে যান এখান থেকে—বাবু দেখতে পেলে রাগ করবে।

সদলবলে চলে যায় সবাই। কখনও বাগান-বাড়িতে। কখনও গঙ্গায় নৌকো-ভ্রমণে। কখনও খড়দা'র মেলায়। সঙ্গে থাকে ডুগি তবলা, ঘুঙুর। মেঝের উপর শোয়ানো থাকে নাকি সার সার বোতল। খাবারের চাঙারি গাড়ির মাথায়।

বেণী বলে—ওই যে কমবয়সী মেয়েমানুষটা দেখলেন, ও যা নাচে—

কমবয়সী মেয়েমানুষটার নাম হাসিনী। হাসিনী নাকি যেমন নাচে তেমনি গায়। ওর মা এসেছিল কাশী থেকে একবার দোলের সময় এ-বাড়িতে গাইতে। সঙ্গে এসেছিল হাসিনী। তখন হাসিনীর বয়স আট কি দশ। মেজবাবুর ভারি ভালো লাগলো দেখে। মা আর মেয়েকে আর ফিরে যেতে হলো না কাশীতে। এখানে বাড়ি ভাড়া করে দিলেন। আসবাবপত্র চাকর দারোয়ান বহাল হলো। তারপর হাসিনী বড় হলো, বুড়ী মা গেল মরে। এখন হাসিনী মেজবাবুর সম্পত্তি।

প্রথমে ছিল এক জন। তারপর এক জন বেড়ে হলো দুই। এখন তিন জন। মেজবাবুর বাবুয়ানি দেখে কলকাতার বাবু-সমাজের তাক লেগে গিয়েছে।

ভূতনাথ বললে—মেজগিন্নী এ-সব জানেন তো?

বেণী বলে—মেজমা বড় ঘরের মেয়ে—ওসব গা-সওয়া। মেজবাবুর শ্বশুর এখন বুড়ো থুত্থুড়ো, তবু এখনও রবিবার রাতটা বাড়িতে কাটান না, বাঁধা মেয়েমানুষ আছে তাঁর। মেজমা তাকে রাঙামা বলে ডাকে। এ-বাড়ি থেকে পুজোর নেমন্তন্ন গেলে রাঙামা'র বাড়িতেও খবর দিতে হবে—তত্ত্ব এলে দু'বাড়ি থেকেই আসে। সেবার মেজমা'র অসুখ হলো—রাঙামা নিজে এসে সাতদিন সাত রাত্তির সেবা করলে। কারো নিজের মা-ও অমন সেবা করতে পারে না। আহা, সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী, যেমন রূপ..... তেমনি..... এদানি তো মেজবাবু তবু যা হোক রাত্তিরে বাড়ি ফেরেন—আর আগে?

আগেকার ব্যাপার ভূতনাথের জানবার কথা নয়।

—আগে সেখানেই পড়ে থাকতেন যে। খাজাঞ্চীবাবু আমার হাতে দপ্তরের কাগজপত্তর দিতেন, আমি সেই মেজবাবুর মেয়েমানুষের বাড়ি থেকে সই-সাবুদ করে নিয়ে আসতুম। মদ খেলে মেজবাবুর আর জ্ঞান থাকতো না কিনা, কাপড় সামলাতে পারতেন না। আমি গেলেই জুতো পেটা করতেন। ও ছাইভস্ম খেলে কি আর জ্ঞানগম্যি থাকে মানুষের? আমি হাসতুম—কিন্তু মাঠাকরুণ খুব বকুনি দিতেন। বলতেন—নেশা করেছো বলে কি একেবারে বেহেড হয়ে গিয়েছো? তুই কিছু মনে করিসনে বাবা, এই চার আনা পয়সা নে—মেঠাই কিনে খাস।

বেণী বলে—ওই যে পানের ডিবে হাতে বুড়োপানা মেয়েমানুষকে দেখলেন—ওই হলো বড় মাঠাকরুণ। মেজবাবু ওঁকে ভারি ভয় করেন। বড় মাঠাকরুণ যদি বলেন মদ খাওয়া বন্ধ—তো বন্ধ। মেজ মাঠাকরুণ বলুন আর ছোট মাঠাকরুণই বলুন—বড়মাঠাকরুণ একবার 'না' বললে কারুর সাধ্যি নেই মেজবাবুকে দিয়ে 'হাঁ' বলায়।

রবিবার। মোসাহেব আর মেয়েমানুষের দল নিয়ে মেজবাবু চলে গেলেন। হয় তো গঙ্গার ওপর পানসিতে বসে খানাপিনা হবে। বড় মাঠাকরুণ নিজে মেপে মেপে মদ ঢেলে দেবেন। তাঁর নিজের পুজো-আর্চা ব্রত-পার্বণ আছে। সব সময় তিনি দলে যোগ দেন না। বড় মাঠাকরুণ পূর্ণিমে-অমাবস্যা তিথি-নক্ষত্র দেখে চলেন। ভারি বিচার সব বিষয়ে। বাসি কাপড়ে মদ খান না। কাচা কাপড় পরে ঠাকুরঘরে ঢোকেন। কালীবাড়িতে বিশেষ-বিশেষ তিথিতে পুজো পাঠিয়ে দেন পাণ্ডার হাতে।

আর মেজমা?

বেণী বলে—আর মেজমাকে দেখে আসুন গিয়ে। তেতলায় পালঙে বসে সিন্ধুর সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলছেন—নতুন নতুন গয়না গড়াচ্ছেন, একবার গোটছড়া ভেঙে বিছে হার হচ্ছে, বিছে হার পুরনো হলে অনন্ত হচ্ছে, অনন্তও পুরনো হয়ে গেলে চুড় হচ্ছে। হয় তো এবার পুজোয় হলো কমল হীরের নাকছাবি, আবার কালীপুজোয় হবে চুণী বসানো কানফুল, মুক্তোর চিক, নয় তো পান্না বসানো লকেটওয়ালা চন্দ্রহার।

মেজবাবুর গাড়ি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভূতনাথ চুপচাপ সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। পিসীমা'র কথা মনে পড়ে যায়। পিসীমা'র শ্বশুরবাড়ি থেকে পাঁচ টাকা মনি-অর্ডার আসতো। ওই টাকাতেই মাস চলবে। ওই পাঁচটা টাকার জন্যেই পিসীমা'র কত ভাবনা। গাজনার

পোস্টাপিসে ভূতনাথ হয় তো গিয়ে দেখলে মাস্টারবাবু নেই। শোনা গেল, পোস্টমাস্টারবাবুর অসুখ। বলে পাঠিয়েছে—আজ আর উঠতে পারছিনে—কাল এসো।

পোস্টমাস্টারবাবু বুড়ো মানুষ। এক-একদিন হয়তো গরুর জাব দিচ্ছে। বলে পাঠিয়েছে—এবেলা আর হবে না, বড় কাজে ব্যস্ত আছি, ওবেলা সকাল-সকাল এসো হে।

ওবেলা যেতে মাস্টারবাবু হয় তো বললে—গাঁয়ে তো যাচ্ছো, তা গাঁয়ের চিঠিগুলো নিয়ে যাও না সঙ্গে। পিওন আর আজকে ওদিকে যেতে পারবে না, গঞ্জের হাটে বেগুন কিনতে পাঠিয়েছি তাকে।

ছোটো একটা বাক্সের মধ্যে, সেই পাঁচটা টাকা রেখে একটি করে গুনে গুনে পয়সা খরচ করতো পিসীমা। ভূতনাথ মাঝে মাঝে চাইতো—একটা আধলা দাও না পিসীমা।

আধলা পিসীমা দিতো না। বলতো—রইল তো তোরই জন্যে—আমি মরে গেলে তুই-ই নিস।

কিন্তু সে পয়সাকড়ি পিসীমা'র অসুখেই সব খরচ হয়ে গেল তো তার জন্য আর কি থাকবে?

আর এ-বাড়িতে কোথায় কেমন করে কে পয়সা উপায় করে কে জানে। বাবুরা ঘুম থেকেই ওঠে দুপুর একটার সময়। আপিসেও কেউ যায় না। ব্যবসাও কেউ করে না। অথচ এতগুলো লোক—সব বসে বসে খাচ্ছে।

আয়ের বহরটা বোঝা যায় না। কিন্তু খরচের বহরটা বোঝা যায় খাজাঞ্চীখানায় গেলে।

বিধু সরকার মধ্যেখানে উবু হয়ে বসে, আর দু'পাশে আরো চার-পাঁচজন ঢালু বাক্সের উপর খেরো খাতায় লেখাপড়া করছে।

বিধু সরকার কানে কলমটা গুঁজে হাত বাড়ায়—পাট্টা-বইটা দেখি কেশব।

মোটা খেরো খাতাটা এগিয়ে দিয়ে আবার লিখতে বসে কেশব।

ভূতনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। খেরো খাতার ওপর মোটা হরফে লেখা—ফিরিস্তি কাগজ পাট্টা-নকল বহি, শ্রীযুত মিস্টার উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব, সন—

বিধু সরকার চিৎকার করে কেশবকে বলে—আমি বলি তুমি লেখো—আরকুলী সিমলা মছলন্দপুর গ্রামে পুষ্করিণী খনন জন্য শোভারাম বসাককে ৩০ বিঘা জমি লাখেরাজ স্বরূপে জমা দেওয়া হইল। বামাপদ সেন পোদ্দারের পৌত্র ক্ষমাপদ সেন, তাহার মছলন্দপুরের বাস্তুভিটাভুক্ত ১৮ কাঠা জমি তারাপদ মুন্সীকে আঠারো শত সিক্কা-টাকায় বিক্রয়..... হঠাৎ মাথা তুলে সামনে ভূতনাথকে দেখে বলে—তোমার কী?

ভূতনাথ হাতের কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বলে—আমি ব্রজরাখালবাবুর সম্বন্ধী, তার এ মাসের মাইনেটা আমার হাতে...

—রোসো—বলে বিধু সরকার সমস্তটা পড়ে বলে—এই সই কার?

—আজ্ঞে ব্রজরাখালের।

—ও ব্রজরাখাল শুধু বললে তো চলবে না, ব্রজরাখাল কী, দাস না রুইদাস, বামুন না কায়েত, কার পুত্র, নিবাস কোথায়, এ-সব পোস্টাপিস নয় হে ছোকরা, জমিদারী সেরেস্তার কাজ অমন সোজা নয়, সই মিললেই ছেড়ে দিলাম, সে সরকারী আপিসে পাবে, এখেনে চলবে না—তুমি লিখে দিলে কেলার পাতে আর আমি অমনি টাকা দিয়ে দিলাম, তেমন কাজ করলে বিধু সরকার আর বাবুদের জমিদারী রাখতে পারতো না—তা তিনি আসতে পারলেন না কেন শুনি?

—আজ্ঞে তিনি গিয়েছেন বরানগরে।

—ও-সব আমি দিতে পারবো না, তা সে যাই বলুক আর তাই বলুক। হাতকড়ি পড়বার কাজ আমি করিনে—এবার তোর কী?

ভূতনাথ একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। এবার তার পাশের লোকের ডাক পড়লো। একটা

হিন্দুস্থানী লোক সামনে এগিয়ে বললে—হুজুর আমার সেই টাকাটা—

—কিসের টাকা বল্ না বেটা, তুই কি আমার বাপের সম্বন্ধী যে তোকে চিনে বসে আছি, লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার এখানে, হাজার হাজার প্রেজার নাম আর বংশপরিচয় অমনি মুখস্থ রাখতে পারে মানুষে?

—আজ্ঞে, বরফের পাওনা, চার মাসের একেবারে জমে গেল।

—রোসো, দৈনিক জমা-খরচের খাতাটা দেখি কেশব।

বিচিত্র লোক এই বিধু সরকার। ভূতনাথের মনে পড়ে প্রথম দিন ভারি রাগ হয়েছিল তার। যেন লাট না বেলাট!

বিধু সরকার বলে—মেজবাবু বললে কী হবে, মুখের কথায় খাজাঞ্চীখানা চলে না হে, এখানে লেখা-পড়ি সই-সাবুদের কারবার। মেজবাবুর হাতের লেখা দেখা, আমি টাকা ফেলে দেবো। আমার কী, আমি তো হুকুমের চাকর—জমা-খরচের খাতায় সব লিখে রাখবো। সিকি, পয়সা, কড়ি, দামড়ি, ছেদামাটি পর্যন্ত হিসেবে ভুল হবে না। এ তোমার কারবারের পয়সা নয়, এ হলো জমিদারী, এর হিসেব রাখা যার-তার কম্ম নয়। তারপর থেমে আবার বলে—গোমস্তা যদি লেখে সুখচরের কালেক্টরীর কাছারিতে উমাচরণ মুহুরীকে পান খাওন বাবদ ১৫/- দেওয়া হইল, আমার খাতায় অমনি খরচ পড়ে যাবে ১৫/- উমাচরণ মুহুরীর পান খাওন বাবদ... কাউকে বলে—এ পোস্টাপিসের সরকারী কাজ নয় হে যে, পাঁচটা বাজলো আর দরজার তালা পড়লো। অত তাড়া-হুড়ো করলে চলে না এখানে, ছোটকাল থেকে এ-কাজ করছি, এ তো আমার জাত-পেশাই বলা চলে, এখনো এ-কাজের হদিস পেলাম না। রোজই নতুন, রোজই নতুন—একটি পয়সা এদিক-ওদিক হলে নায়েব-গোমস্তার গলা টিপে ধরবো না। তারপর হঠাৎ ভূতনাথের দিকে নজর পড়ায় বললে—তুমি দাঁড়িয়ে কেন ছোকরা? আমি তো বলেছি তোমায় কাজের সময় বিরক্ত করো না আমায়—আমি কম কথার মানুষ... লেখো কেশব, শেখ আসানুল্লার পুত্র শেখ জয়নুদ্দীনকে মৌরুসী-মোকরীর... এখন বিরক্ত করো না যাও দিকি সব—বলে বিধু সরকার আবার নিজের কাজে মন দেয়।

ভূতনাথ চলে এল।

ব্রজরাখাল এসে সব শুনে বললে—তা ভালোই তো করেছে। নগদ টাকাকড়ির কারবার, একটু দেখে শুনে হিসেব করে দেওয়াই তো নিয়ম। বিধু সরকার খুব হুঁশিয়ার লোক কিনা—তা ছাড়া তোমায় চেনে না। একটু মুখচেনা হয়ে যাক—তখন আবার...

এখন এই পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ ছুটুকবাবু যে কেন ডেকেছেন বোঝা গেল না।

ঘরে গিয়ে ভূতনাথ সবে জামা কাপড় ছাড়তে শুরু করেছে, এমন সময় শশী এল। বললে—শালাবাবু, ছুটুকবাবু আপনাকে ডেকেছে একবার।

ছুটুকবাবুর চাকর শশী। তোষাখানার কাছে দু'একবার দেখেছে তাকে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কেন রে? ডেকেছে কেন?

শশী বললে—বিরিজ সিংকে বলে রেখেছিলাম—আপনি এলেই খবর দিতে, বলেনি আপনাকে?

ভূতনাথ বললে—বলেছে সে, কিন্তু কী দরকার বুঝতে পারছিনে—জানিস কিছু তুই?

শশী বললে—ছুটুকবাবু আজ বিকেলবেলা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, মাস্টারবাবুর ঘরে ডুগি তবলা বাজায় কে রে? আমি বললাম মাস্টারবাবুর শালা, শুনে বাবু বললেন—আজ একবার ডাকিস তো, বেশ হাত—তা চলুন আজ্ঞে।

—বলে দে আমি আসছি এখুনি। বলে খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে ভূতনাথ সেদিনই ছুটুকবাবুর আসরে গিয়েছিল। অনেক দিন আগেকার কথা স্মৃতির মণিকোঠায় সব কথা জমা

করবার মতো হয় তো জায়গা নেই আর। তবু ছুটুকবাবুকে বোধ হয় কখনও ভোলা যাবে না। শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা বড়বউঠাকরুণের একমাত্র ছেলে। কার্তিকের মতো চেহারা। অমন স্বাস্থ্য। কিন্তু যে বংশের ঐশ্বর্যের আর বিলাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করেছে—তাকে কে বাঁচাতে পারবে?

বদরিকাবাবুর একটা কথা বার বার মনে পড়ে ভূতনাথের।

বদরিকাবাবু বলতো—এ সংসারে যে খেলতে জানে সে কানাকাড়ি নিয়েও খেলে—যে ভালো হতে চায়, ভালো থাকতে চায়, তার জন্যে সব পথই খোলা।

হয় তো তাই। নইলে ছুটুকবাবুই বা অমন হবে কেন!

ছুটুকবাবু দেখেই বললে—আরে আসুন, আসুন স্যার, ঘরে বসে রোজ তবলা শুনি আর ভাবি, এ তো পেশাদারী হাত। কানির কাজ এমন তো শুনিনি আগে—কোন্ ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন ভাই?

ছুটুকবাবুর বন্ধুবান্ধবে ঘর ভর্তি। একজন তানপুরা ধরেছে। আর একজন হারমোনিয়ম। সকলেরই ঢেউ তোলা বাবড়ি ছাঁট চুল। চুনোট করা উড়ুনি। কোঁচানো ধুতি। মেঝের ওপর একহাত পুরু গদিতে ঘর জোড়া। ধবধবে সার্টিনের চাদর। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ছুটুকবাবু বসে বসেই ঘামছে। পানের ডিবে, জরদার কৌটো, সিগারেট।

ঠুংরি গানের তানের সময় ছুটুকবাবু মাঝে মাঝে চিৎকার করছে—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

সমের মাথায় এসে তবলার চাঁটির সঙ্গে গানের ঝোঁক মিলে গেলেই বলছেন—শোহন্-আল্লা—শোহন্-আল্লা—

অনেক দিন অভ্যেস নেই ভূতনাথের। গাঁয়ের ওস্তাদের কাছে শেখা। দাদ্‌রা, কাহার্‌বা আর একতালা নিয়েই বেশি ঘাঁটাঘাঁটি ছিল। ক্বচিৎ কদাচিৎ যৎ, মধ্যমান চলতো। পুজোর সময় রসিক মাস্টারের ইয়ার-বক্সিরা এলে ঠুংরি টপ্পা হতো। যাত্রার আসরে মেথর-মেথরাণীর গানের সঙ্গে খেমটারই বেশি চল্।

ছুটুকবাবু চিৎকার করে বললে—আর ঠুংরি ভালো লাগছে না—এবার গজল হোক মাইরি—গজল গা বিশে।

ছুটুকবাবুর হুকুম। গজল ধরলো বিশে। মানে বিশ্বম্ভর। গলাটা ভালো। ধর্‌তা ধরতে না ধরতেই জমে উঠলো। সঙ্গে ভূতনাথের কাওয়ালির আড়ির ঠেকা।

ছুটুকবাবু আর পারলে না। দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—এবার গান জমে গিয়েছে মাইরি। তারপর উঠে গিয়ে পাশের পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। খানিক পরেই কাপড়ের কোঁচায় ঠোঁট মুছতে মুছতে আবার এসে তাকিয়ায় হেলান দিলে। গান তখন বেশ জমে উঠেছে। ছুটুকবাবু আরও ঘামতে লাগলো। লয় বাড়ছে। হাত তখন টন্ টন্ করছে ভূতনাথের। সমস্ত ঘরখানা মজে গিয়েছে সুরে।

বিশ্বম্ভর দুলছে। চোখ বোঁজা। উন্মাদ হয়ে গাইছে—জখ্‌মী দিল্‌কো না মেরে দুখায়া করো—

তারপর এক সময় সম পড়লো। হো হো করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ছুটুকবাবু। এক এক করে সবাই এক-একবার পর্দার ভেতরে গিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে ফিরে এসেছে। চোখ লাল সবার।

নেশার ঝোঁকে ছুটুকবাবু ভূতনাথের পা ছুঁতে এল।

—করেন কী, করেন কী, আহা হা—বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভূতনাথ।

মোসাহেবরা বলে—তা পায়ে না হয় হাতই দিলেন ছুটুকবাবু, পা তো আর আপনার ক্ষয়ে যাচ্ছে না।

ছুটুকবাবু পায়ে হাত দেবার চেষ্টায় উপুড় হয়ে পড়লো। বললে—বাড়ির মধ্যে এমন গুণী রয়েছে, আর তোরা গোঁসাইজীর খোশামোদ করিস, খবরদার—এই শশী, শশে—

পর্দার ভেতর থেকে শশী বেরিয়ে এল। ছুটুকবাবু বললে—শোন্ বেটা, কাল থেকে যদি গোঁসাইজীকে বাড়িতে ঢুকতে দিবি তো তোকে খুন করে ফেলবো, ব্রিজ সিংকেও খুন করবো আমি। তারপর হঠাৎ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ছুটুকবাবু মুখের কাছে মুখ এনে বললে—বড্ড খাটুনি গিয়েছে

আপনার, একটু হবে নাকি স্যার?

ছুটুকবাবুর কথা কিছু বুঝতে পারলে না ভূতনাথ। মুখ দিয়ে মদের গন্ধ অবশ্য আসছিল। তবু ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী?

—ভালো জিনিস ভাই। দিশি মাল নয়, বেশি নয়, একটুখানি, শ্যাম্পেন দিক একটু—

ভূতনাথ বড় বিব্রত বোধ করলো। সামনের একজন বললে—ছুটুকবাবু ভালোবেসে দিচ্ছেন, না বলবেন না ভূতনাথবাবু—বলুন হ্যাঁ।

ছুটুকবাবু বললেন—বেশ, তা হলে—সিদ্ধির সরবৎ দিক—তাও আছে। ওরে শশে—বেশ পেস্তা বাদাম দিয়ে যুৎ করে... পর্দার ভেতরে চলে যান, কেউ দেখতে পাবে না।

রাত বারোটা পর্যন্ত এমনি চললো সেদিন। গজলের পর টপ্পা। নিধুবাবুর টপ্পা। তারপর 'চমেলী ফুলি চম্পা—'

শেষে যখন সবাই উঠলো, ছুটুকবাবু তখন উত্থানশক্তি রহিত। তাকিয়ায় মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত বাড়ি নিঝুম হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ ভূতনাথেরও জ্ঞান ছিল না। সমস্ত পরিবেশটা যেন কেমন সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। গানবাজনা বন্ধ হবার পর বাইরে আসতেই আচমকা যেন একটা আঘাত পেলে ভূতনাথ।

ভূতনাথ বিশুবাবুকে বললে—আপনার গানটা বেশ জমেছিল আজ। বিশ্বম্ভর বললে—মনের মতো সঙ্গত করেছিলেন স্যার—গান গেয়ে বেশ আয়েস হলো।

সকলেই অল্পবিস্তর অপ্রকৃতিস্থ। সবাই প্রায় ভূতনাথের সমবয়স্ক।

পরেশ বললে—সবাই আমরা অমৃত খেলাম—আপনি স্যার একেবারে নিরম্বু—এ কেমন যেন এক যাত্রায় পৃথক ফল...

কান্তিধর বললে—আহা, আজকে প্রথম দিন, যাক না, তুই বড় তাড়াহুড়ো করিস পরেশ। ছুটুকবাবুও কি প্রথম প্রথম খেতো, কত কষ্টে নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছি—আর এখন?

দরজা পর্যন্ত সবাইকে এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসে নিজের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দাঁড়ালো ভূতনাথ। ব্রজরাখাল জানতে পেরেছে নাকি? ব্রজরাখালকে যাবার সময় জিজ্ঞেস করাও হয়নি। এখানে ব্রজরাখালের পরিচয়-সুবাদেই থাকা। যাতে ব্রজরাখালের কোনো মর্যাদাহানি হয়, এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়। আস্তে আস্তে ঘরের চাবি খুলে দরজায় খিল বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন থমকে দাঁড়ালো সে!

মনে হলো গাড়ি-বারান্দায় সদর রাস্তা দিয়ে কে যেন সন্তর্পণে বেরোলো। অস্পষ্ট মূর্তি। কিন্তু মেয়েমানুষ বলেই যেন মনে হয়। চারদিকে নির্জনতা। সমস্ত ঘরের আলো নিবে গিয়েছে। ইব্রাহিমের ঘরের ছাদের ওপর একটা রেড়ির তেলের বাক্সবাতি জ্বলছে, সেই আলোর কিছু রেখা এসে পড়েছে ইঁট-বাঁধানো দেউড়ির ওপর। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই। শুধু গেটের এক পাশে বসে ব্রিজ সিং বন্দুক হাতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় সদর-দরজা দিয়ে কে বেরোবে?

কেমন যেন কৌতূহল হলো ভূতনাথের।

আজকের মতন এত রাত্রে এ-বাড়ির এখনকার দৃশ্য কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আগে। কিন্তু তবু, এ-বাড়ির আবহাওয়া আর হালচালের যতখানি পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে যেন ওই নারী-মূর্তি দেখে অবাক হওয়ারই কথা।

উঠোন পার হবার পথে ওপরের আলোটা এসে পড়তেই যেন চেনা-চেনা মনে হলো। তারপর মূর্তিটা নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো ছুটুকবাবুর বৈঠকখানার সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কে যেন দরজা খুলে দিলে। ভূতনাথ ঘরে ভেতরকার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলে শশীকে। ছুটুকবাবুর চাকর শশী। আর নারী-মূর্তিটাও এক নিমেষের জন্যে ভূতনাথের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

গিরি! মেজগিন্নীর ঝি গিরি!

কিন্তু একটি মুহূর্ত! তারপরেই ঘরের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সমস্ত অন্ধকার। একটা অন্যায় কৌতূহল ভূতনাথের সমস্ত মনকে যেন পঙ্কিল করে তুললো। এখনও কর্তারা কেউ বাড়ি ফেরেননি। আকাশের তারার দিকে চেয়ে রাতটা অনুমান করবার চেষ্টা করলে একবার। দ্বিতীয় প্রহর শেষ হবার উপক্রম। মেজকর্তা এখনও ফেরেননি। ছোটকর্তা ফিরবেন কিনা কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজ না-ও ফিরতে পারেন। বন্ধ বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে শুধু দু'জন—আধো-অচেতন ছুটুকবাবু, আর শশী। ওদের মধ্যে কে?

ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল কিন্তু শুতে গিয়ে ঘুম এল না তার।

ব্রজরাখাল সকালবেলা দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলে—কা'ল কোথায় ছিলে বড়কুটুম? তারপর সব শুনে বললে—তা ভালো—তবে বুঝে শুনে চলো।

—কেন? ভূতনাথ একটু অবাক হয়ে গেল।

ব্রজরাখাল বললে—এখন সময় নেই আমার, আপিসে যেতে হবে, তবে একটা কথা বলি, ঠাকুর বলতেন—কাঁদলে কুম্ভক আপনিই হয়। গান-বাজনা টপ্পা-ঠুংরি ভালো বৈকি—কিন্তু মাঝে মাঝে একটু কেঁদো বড়কুটুম।

—কাঁদবো কেন মিছিমিছি?

—সে অনেক কথা বড়কুটুম, এখন আর আমার সময় নেই, আজকে আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে, শীগ্রি নরেন আসছে, তারই তোড়জোড় হবে সব...

—নরেন কে—ব্রজরাখাল?

—ওই তোমার বিবেকানন্দ। ঠাকুর বলতেন,—নরেন একদিন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবে—তা কাঁপিয়ে শুধু নয়, ভূমিকম্প লাগিয়ে দিয়েছিল আমেরিকায়। প্রতাপ মজুমদার, আনিবেশান্ত সব থ' হয়ে গিয়েছেন। সেদিনকার ছোকরা নরেন, তারই মধ্যে এত—তারা তো কেউ জানে না—এ শুধু ঠাকুরেরই লীলা—তারপর... তারপর থেমে আবার বললে—দেখবে বড়কুটুম, এবার আর ঠেকাতে পারবে না কেউ, একদিন এই নরেনই সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। অনেক নেড়া-নেড়ী এসেছে, অনেক পাদরী এল, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও হলো অনেক—কিন্তু দরিদ্রনারায়ণদের কথা আগে কেউ অমন করে বলেনি।

ভূতনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো।

আপিস যাবার দেরি হয়ে হয়ে গিয়েছে। তবু ব্রজরাখাল বলতে লাগলো—নরেন আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে এবার। বলেছে—সাত'শ বছরের মুসলমান রাজত্বে ছ'কোটি লোক মুসলমান হয়েছে, আর একশ' বছরের ইংরেজ রাজত্বে ছত্রিশ লক্ষ খৃস্টান—এটা কেন হয়? কেন হয়, এটা আগে কেউ এতদিন ভাবেনি বড়কুটুম, এবার মাদ্রাজে বক্তৃতা দিয়েছে নরেন, তাতে বলেছে অনেক কথা। দাসত্ব বড় খারাপ জিনিস বড়কুটুম—দেখো না, অনেকে কলম্বোতে গেল নরেনের সঙ্গে দেখা করতে—আমি পারলুম না।

আপিস যাবার সময় কোনো দিকে খেয়াল থাকে না আর। খানিক বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল ব্রজরাখাল। বললে—মাইনে পেয়েছো বড়কুটুম? পেয়েছে শুনে বললে—একটা টাকা দাও তো আমাকে।

—কেন, তুমিও তো কাল পেয়েছো মাইনে?

—পেয়েছি, কিন্তু... ব্রজরাখাল হাসলে। বললে—পেয়েছিলাম, কিন্তু বরানগরে গিয়ে দেখি গুরুভাইরা সব উপোস করছে, ঠাকুর দেহ রাখবার পর থেকে গুরুভাইদের বড় কষ্টে দিন কাটছে, ভিক্ষে করে পেট চালায় সব, কাল গিয়ে দেখি রান্নাবান্নার যোগাড় নেই—তা শুধু তো বেদ-বেদান্ত পড়লে পেট ভরবে না, কারো খাবার কথা মনেই ছিল না, নরেন আমেরিকা থেকে কিছু পাঠিয়েছিল—আর আমিও সব মাইনেটা দিয়ে এলাম গুরুভাইদের হাতে।

একটা টাকা দিয়ে ভূতনাথ বললে—তারপর সারা মাস যে সামনে পড়ে আছে—তখন?

ব্রজরাখাল হাসতে লাগলো। বললে—তোমাকে উপোস করাবো না বড়কুটুম, ভয় নেই। তারপর বললে—ঠাকুর বলতেন—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে না পারলে ভজন-সাধন হয় না। তা তোমার বোন মরে একটা দিক থেকে আমায় বাঁচিয়ে গিয়েছে। আর টাকা, সেটা কি করে যে ত্যাগ করি, আজই যদি চাকরিটা ছেড়ে দেই তো কালই অনেকগুলো পরিবার উপোস করতে শুরু করবে। প্রত্যেক মাসের শেষে আমার মুখ চেয়ে যে বসে থাকে তারা। এক-টাকা এগারো আনা জোড়া কাপড়—তা-ই একখানা কাপড়ে বছর চালায় সব হতভাগীরা।

বেশি সময় ছিল না। ব্রজরাখাল চলে গেল।

সেদিন 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিস থেকে আসবার পথে সেই কথাই মনে পড়লো। ফতেপুর থাকতে মানুষের দারিদ্র্য এমন করে কখনও তো চোখে পড়তো না। এখানে কলকাতা শহরের মধ্যে ক'মাস থাকতেই যেন চোখ খুলে গিয়েছে ভূতনাথের। চারদিকে বড় অভাব। বড় হাহাকার। রাস্তায় একটা ভিখিরী আধলা চাইতে চাইতে বড়বাজার থেকে একেবারে মাধববাবুর বাজার পর্যন্ত পেছন পেছন আসে। বলে—একটা আধলা-পয়সা দেও বাবু—একটা আধলা-পয়সা দেও।

ভূতনাথ বলে—কোথায় বাড়ি তোমার?

বুড়ো মানুষ। গেরো দিয়ে দিয়ে কাপড়খানা কোনোমতে কোমরে জড়িয়ে আছে। বলে—বন্যে হয়ে আমাদের দেশ-গাঁ সব ডুবে গিয়েছে গো, ভাসতে ভাসতে ডাঙায় এসে উঠেছি—দু'দিন কিছু খাইনি—একটা আধলা-পয়সা দেও বাবু।

সেদিন শিব ঠাকুরের গলি দিয়ে আসতে আসতে আর একজন এক বাড়ির ভেতর থেকে ডেকেছিল।

—বাবা শুনছো—ও বাবা—

কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই বললেই চলে। স্ত্রীলোকের গলার শব্দ।

—এই যে বাবা, আমি এই দরজার ফাঁক দিয়ে কথা বলছি।

—দরজা খুলুন না, কী হয়েছে আপনার?

—কিছু মনে নিও না বাবা, তুমি আমার ছেলের মতন, একখান কাপড় নেই যে, বেরোই সামনে, এই দুটো পয়সা দিচ্ছি, দু' পয়সার মুড়ি কিনে ওই জানালা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দাও না বাবা।

কোথায় মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ, ফরিদপুরের বন্যা—সবাই বুঝি জড়ো হয়েছে এখানে। অথচ বড়বাড়িতে অতগুলো লোক, অকারণে কত অপব্যয় হয়, কেউ দেখে না। বিলেত থেকে আসে কাঠের বাক্স ভর্তি নানান জিনিস। কাঠ-গ্লাসের ঝাড়-লণ্ঠন। একবার এল সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি উড়ন্ত পরী! গায়ে কাপড় নেই। হাতে একটা সাপ জড়ানো। মেজবাবুর নাচঘর সাজানো হলো। হাতীবাগানের বাজার থেকে নীলামে অর্কিড গাছ কিনে নিয়ে এল ভৈরববাবু। চীনে-অর্কিড। একটা বাচ্চা গাছের দাম তিনশ' টাকা। কলকাতা কেন, সারা বাঙলা দেশে কারো বাড়িতে এ-গাছ পাবে না। এই এক চিলতে গাছের জন্যে খদ্দের হলো অনেক। সবাই এল কিনতে। খাস লাট সাহেবের বাড়ি থেকে বাগানের সাহেব মালী এল, এল ঠনঠনে, পাথুরেঘাটা, হাটখোলা, সব বাড়ির লোক। পাঁচ টাকা থেকে হু হু করে দর উঠতে লাগলো। ভৈরববাবু যদি বলে—পঞ্চাশ—

ঠনঠনের দত্তবাবুরা বলে—বাহান্নো—

মল্লিকবাবুর লোক বলে—পঞ্চান্নো—

সেই গাছ কেনা হলো শেষ পর্যন্ত তিনশ' টাকা দিয়ে। ভৈরববাবু সগর্বে বুক ফুলিয়ে সকলকে হারিয়ে দিয়ে গাছ নিয়ে এলেন বড়বাড়িতে। গাছ দেখতে জড়ো হলো বার-বাড়ির সবাই। অন্দর-

মহলে পাঠানো হলো। মেজগিন্নী দেখতে চেয়েছেন। তিনশ' টাকার গাছ। সোনা-দানা নয়, কুকুর বেড়াল নয়, কিছু নয়—গাছ। মরে গেলেই গেল।

তা হোক, ভৈরববাবু গোঁফে তা দিতে দিতে বলতে লাগলো—বাবু তো বাবু মেজবাবু—ছেনি দত্ত বাবুয়ানি করতে এসেছে কার সঙ্গে জানে না।

সেই গাছ প্রতিষ্ঠা হলে তার জন্যে ঘর তৈরি হলো। মেজবাবু নিজে এসে তদারক করে গেলেন।

এদিকে খবর পৌঁছল লাট সাহেবের কাছে। চীনে-অর্কিড তিনশ' টাকায় কিনে নিয়েছে বড়বাড়ির চৌধুরী বাবুরা। লাট সাহেব খবর পাঠালেন—গাছ দেখতে আসবেন তিনি। সোজা কথা নয়। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। ভেল্‌ভেটের চাদর পড়লো নাচঘরে। ঝাড়-লণ্ঠন ঝাড়-পোঁছ হলো। চুনকাম হলো ভেতরে বাইরে। রাজা-রাণীর ছবি দু'খানা মুছে টাঙানো হলো মস্ত আয়নাটার মাথায়। তার ওপর লাল শালু দিয়ে লেখা হলো—**God save the King.** লাট সাহেব এসে তো শুধু মুখে যেতে পারেন না। খানার ব্যবস্থাও হলো। খাসগেলাশের ভেতর গ্যাসের বাতি জ্বললো। বাড়িসুদ্ধ লোকের নতুন সাজ-পোশাকের ফরমাশ গেল ওস্তাগরের কাছে।

তিনশ' টাকা গাছের পেছনে কিছু না হোক তিন হাজার টাকা বেরিয়ে গেল নগদ।

সেকালের বনমালী সরকার লেন-এর চৌহদ্দি গাড়িতে গাড়িতে ছেয়ে গেল।

তখন বড়কর্তা বেঁচে। লাট সাহেবকে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন তিনি। লাট সাহেব আর মেম। অনেক খানাপিনা হলো। খানার চেয়ে পানীয়ই বেশি।

তা গাছ দেখে ভারি প্রশংসা করলেন লাট সাহেব। ইণ্ডিয়ার এত সব ধনী মহাধনী রয়েছে। পরিচয় করে কৃতার্থ হলেন তিনি। খানা খেলেন। ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়িটা দেখলেন। বাঈজীর দল এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে। পাঁচশ' টাকার মুজরো। সে নাচ দেখলেন। বেনারসী পান খেলেন। যাবার সময় বড়কর্তা সামনে এগিয়ে গিয়ে চীনে-অর্কিড গাছটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরলেন। হুজুর যদি গ্রহণ করেন তো চৌধুরীবংশ নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করবেন।

লাট সাহেব নিজ হাতে করে আর নিলেন না। সঙ্গের লোক নিলে। যার জন্যে এত কাণ্ড, সেই গাছই চলে গেল শেষ পর্যন্ত লাট সাহেবের বাগানে।

কিন্তু ফল ফললো কয়েক বছর পরেই। বড়বাবু বৈদূর্যমণি চৌধুরী খেতাব পেলেন। তখন থেকে হলেন রাজবাহাদুর বৈদূর্যমণি চৌধুরী। বড়ভাই বৈদূর্যমণি চৌধুরী, মেজভাই হিরণ্যমণি চৌধুরী আর ছোট কৌস্তভমণি চৌধুরী। বৈদূর্যমণির ইয়া পালোয়ানি চেহারা। কাশীর পালোয়ান বাড়িতে পুষেছিলেন শরীরটা গড়ে তোলবার জন্যে। লোহাকাঠের মস্ত দুটো মুগুর দু'হাতে নিয়ে ভাঁজতেন দু'ঘণ্টা ধরে। সংসারের মাথায় ছিলেন তিনি। ওদিকে জমিদারী দেখা, বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখা, তা ছাড়া তাঁর ছিল নিজের কুস্তির সখ। পৈত্রিক সম্পত্তি শুধু রক্ষা নয়, আয়তনও বৃদ্ধি করেছিলেন তিনি। তাঁর আমলে বড়বাড়ির এ অবস্থা ছিল না। তখন এই বড়বাড়ির নাম করলে চিনতে পারতো সব লোক। আর এখন—

এ সব গল্প বদরিকাবাবুর কাছে শোনা। কোথায় তাঁর কোন্ পূর্বপুরুষ মুর্শিদকুলি খাঁ'র কাছে কানুনগোর কাজ করেছিলেন—তারই বংশধর।

বদরিকাবাবু বলেন—তাই তো বলি খেলতে জানলে কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায় হে—তা বড়বাবু যখন রাজাবাহাদুর হলো, চারদিকে কত ধুমধাম—সাহেব-মেমের খানাপিনা হলো—আমি এই ঘরটিতে চুপ করে বসে রইলাম। পিপেপিপে মদ খেলে সবাই। আমি বললাম—তোমরা,যাও, আমি ওর মধ্যে নেই, রাজাবাহাদুর হয়নি তো বড়বাবু, 'রাজসাপ' হয়েছে—যা বলেছিলুম সব ফলে গিয়েছে। সেই বড়বাবু মরলো একদিন, মরবার সময় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পায়নি।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে—কেন?

বদরিকাবাবু রেগে গেল। বললে—তুই আবার জিজ্ঞেস করছিস, কেন? সাতশ' বছর মোগল রাজত্বে ছ'-কোটি লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছে, আর একশ' বছর ইংরেজ রাজত্বে ছত্রিশ লক্ষ

লোক খৃস্টান হয়ে গেল—সে কি ভাবছিল ওমনি-ওমনি? নিমকহারামির গুনোগার দিতে হবে না? দেখবি সব যাবে—সব যাবে—কিচ্ছু থাকবে না, তাই দেখবো বলেই তো সারাদিন চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকি—আর ট্যাঁক-ঘড়িটার টিক টিক শব্দ শুনি।

আজও ভূতনাথের মনে পড়ে বদরিকাবাবুর কথাগুলো বর্ণে বর্ণে মিলে গেল একে একে। আপিস থেকে ফেরবার পথে বাড়ির সামনে আসতেই সেদিনও ব্রিজ সিং ডাকলে—শালাবাবু, ছুটুকবাবু বোলায়া আপকো।

একা পেয়ে সেদিন বংশী এসে ধরলো। রবিবার। বললে—আজ আপনাকে যেতেই হবে শালাবাবু—ছোটমা আমাকে রোজ বলেন—তোর শালাবাবুকে একবার ডেকে দিলিনে, আমি আপনাকে সুযোগ মতো ধরতেই পারিনে, আপনি ছুটুকবাবুর আসরে গিয়ে বসেন, আর রাত হয়ে যায়।

ভূতনাথ বললে—কী দরকার কিছু শুনিসনি তুই?

—তা তো ছোটমা আমাকে বলেননি আজ্ঞে।

—কিন্তু ব্রজরাখালকে জিজ্ঞেস না করে যাই কি করে—তা ছাড়া বাড়ির মধ্যে, অন্দরমহলে... আমি অচেনা পুরুষমানুষ—যদি কেউ কিছু বলে—তখন?

—সে ছোটমা ডেকেছেন, আপনি কী করবেন? তা ছোটবাবু তো আর জানতে পারছে না হুজুর—ছোটবাবু সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে গিয়েছেন—আসবেন সেই আবার কাল ভোরবেলায়।

—কোথায় যান তোর ছোটবাবু?

—আজ্ঞে, সেই পিশেচ-মাগীর কাছে, জানবাজারে, ছোটমা বলেন—বামুনের শাপে নাকি অমন হয়েছে, আর-জন্মে বামুনকে অপমান করেছিলেন—তাই এ-জন্মে এই ভোগ।

—তুই তাকে দেখেছিস নাকি বংশী?

—দেখিনি আবার, ছোটমা'র পায়ের যুগ্যি নয় সে—তাতেই আবার কত ঠ্যাকার, নিজের হাতে এক ঘটি জল পর্যন্ত গড়িয়ে খান না। বাবু যেদিন আসেন না, সেদিন ছোটমা পাঠায় কিনা আমাকে, মরতে মরতে যাই—এই এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি তাকে, কী ছিল আর কী হয়েছে! ওই যে যদুর-মা বাটনা বাটে, ওই কাজ আগে করতো ওর মা—আমরা ডাকতুম রূপো বলে—সেই রূপো দাসীর মেয়ে চুনী, তখন ছিল বারো বছর বয়েস। তারপর কেমন করে ছোটবাবুর নজরে পড়ে গেল, তখন ছোটবাবুর বিয়ে হয়নি, তারপর যখন ছোটমা এ-বাড়িতে এলেন, তখন রূপোর মেয়ের বয়স তেরো। তখন থেকে আলাদা বাড়ি করে দিলেন ছোটবাবু, রূপো এ-বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে উঠলো জানবাজারের নতুন বাড়িতে—তা সমস্তই ছোটমা'র কপালের লিখন শালাবাবু, রূপোরই বা কি দোষ আর তার মেয়েরই বা কী দোষ—তারপর বললে—তা হলে ওই কথাই রইল, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন—আমি ঠিক সময়ে আসবো'খন।

তারপর সন্ধ্যে হলো, গেটের পেটা ঘড়িতে ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো, আটটাও বাজলো। তখনও ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে ভূতনাথ। অনেকবার অনেকরকম করে ভাবতে লাগলো—ব্রজরাখালকে না বলে কি বাড়ির বউ-এর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ভালো? তাও আবার ছোটবাবুর অসাক্ষাতে। যে-সে বাড়ি নয়, রাজা-রাজড়ার বাড়ি। এতদিন ধরে এ-বাড়িতে আছে, কোনোদিন বউদের মুখ দেখা দূরে থাক, চেহারাও দেখেনি সে। পেছনের দরজা দিয়ে মেয়েদের যাওয়া-আসার রাস্তা। সে গেট চাবি বন্ধই থাকে। যখন গাড়ি ঢোকে, তখন চাবি খোলা হয়। বড়বউ যখন কোনো শুভ-তিথিতে গঙ্গায় স্নান করতে যান, তখন খোলা হয় মাঝে মাঝে। মেজবউ বাপের বাড়ি যান মাঝে মাঝে। তাঁর মা আসেন, রাঙামা আসেন।

আর ছোটবউ?

বংশী বলে—ছোটমা'র তো মা নেই যে আসবে, গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের একটি মাত্তোর মেয়ে, ছোটমা'র রূপ দেখে বড়বাবু এ-বাড়িতে বউ করে এনেছিলেন, তা বাপও এখন মারা গিয়েছেন, যখন বেঁচে ছিলেন তখনও চলা-হাঁটা করতে পারতেন না, ধম্মকম্ম নিয়ে থাকতেন, এক গুরু ছিল, গুরুর আশ্রমই ছিল তাঁর ভরসা।

ছোটবউকে দেখেনি ভূতনাথ। কোনো বউকেই দেখেনি। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয় যেন তাদের প্রত্যেককে সে চেনে। রাজা বাহাদুর বৈদূর্যমণি চৌধুরী মারা গেলেন জমিদারীতে। একলাই যেতেন তিনি। নিজে গিয়ে দেখাশুনো করে আসতেন। নদীর ধারে চৌধুরীদের বিরাট কাছারি-বাড়ি। মাসের মধ্যে এক বার করে তাঁর যাওয়া চাই-ই। প্রজাদের নালিশ শোনা, তাদের খাজনা মুকুব করা, এমন কত কাজ তাঁকে করতে হতো। গাঁয়ের পালোয়ানদের ডেকে তাদের কুস্তি দেখতেন। কুস্তিগীর হলে সাত খুন মাফ! সময় সময় লড়তেন তাদের সঙ্গে, তাঁর কুস্তির আখড়ায় হনুমানজীর মস্ত একটা মূর্তি আজও আছে। তেমন সিঁদুর মাখানো মানুষ-সমান মূর্তি। বদরিকাবাবু বলে—কিন্তু মরবার সময় একটা ফোঁটা জল পর্যন্ত পেলে না—ও রাজাবাহাদুর নয় রে, 'রাজসাপ'।

তা অত রাত্রে কেই-বা জল দেয়। আর কেই-বা খবর নেয়। আর কেউ জানতে পারলে তবে তো! সকালবেলা সবাই টের পেলে। অনাদি মৌলিক বুড়ো মানুষ। তিন পুরুষের গোমস্তা। তিনি দেখলেন। দারোয়ান, সেপাই, বরকন্দাজ, সবাই দেখলে।

অতখানি লম্বা-চওড়া দশাসই শরীর বড়বাবুর। কুঁকড়ে নীল হয়ে পড়ে আছে উঠোনের মধ্যিখানে। আর পায়ের কাছেই আর একটা জিনিস পড়ে আছে। সেটাও কম লম্বা-চওড়া নয়। উল্টে পাল্টে চিৎ হয়ে পড়ে আছে সেটা। দুটোই প্রাণহীন! অনাদি মৌলিক অন্ধকারে দেখেই সাত হাত পেছিয়ে এসেছিলেন। একে শনিবার, তায় জাত কালকেউটে।

সে-সব পুরনো ইতিহাস। ওই ছুটুকবাবু তখন ছোট। বড়বউ ছিলেন বড় ধর্মশীলা। সাত দিন জলস্পর্শ করলেন না। তারপর যখন উঠলেন ভূমিশয্যা ছেড়ে, তখন আর সে মানুষ নন। এখন ভাত খাবার পর চৌষট্টি বার সাবান দিয়ে হাত না ধুলে শুদ্ধ হয় না শরীর। একটা সাবানকে কেটে চৌষট্টি টুকরো করতে হয়। সিন্ধু সেই চৌষট্টি টুকরো সাবান আর চৌষট্টি ঘটি জল ঢেলে হাত ধুয়ে দেয় বড়বউ-এর। ঠাকুরবাড়ির প্রসাদের সন্দেশ, তা-ও ধুয়ে খেতে হবে। এমনি বিচার তাঁর।

বৈদূর্যমণি চৌধুরীর পর জমিদারীর ভার পড়লো হিরণ্যমণির ওপর। কিন্তু বড়মাঠাকরুণ ছাড়লেও, মেজবাবুই বা ছাড়বেন কেন তাকে? বরং সুবিধেই হলো। দু'জনের দুটো বাড়ি হলো। তারপর এল হাসিনী। হাসিনীরও কাঁচা বয়েস। অনাদি মৌলিক টাকা পাঠান। সে টাকাও কম পড়ে। চিঠি যায় জোর তাগাদা দিয়ে। বিধু সরকার নিজে যায় তাগাদা করতে।

মেজবাবুর পানসি গঙ্গার বুকে পাল তুলে বরানগরের দিকে ভেসে চলে। আশেপাশের গ্রামের লোক শুনতে পায় গানের সুর, ঘুঙুরের শব্দ। নৌকোর ভেতর জমকালো বাতি জ্বলে, গঙ্গার বুকের একটা অংশ আলোয় আলো হয়ে যায়।

ছোটবাবু কৌস্তভমণি চৌধুরীর তখন বয়েস কম। ওই ছুটুকবাবুর মতো। সবে লেখাপড়া ছেড়েছেন। ল্যাণ্ডোতে উঠতে যাবেন বিকেলবেলা। সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, মাথায় একটা আঘাত লাগলো সজোরে।

সর্বনাশ! একটা বাতাবি লেবুর খোসার টুকরো মাথায় লেগে পায়ের কাছে মাটিতে ছিটকে পড়লো!

প্রথমে রেগে গিয়েছিলেন ছোটবাবু। তারপর বললেন—কে রে ও?

তোষাখানার সর্দার মধুসূদন যাচ্ছিলো সেখান দিয়ে। বললে—আজ্ঞে ও রুপো দাসীর মেয়ে চুনী।

—রুপো দাসী কে?

—আজ্ঞে বাটনা বাটে আর ডাল ঝাড়ে ওই কোণের ঘরে বসে।

—ও—বলে বেরিয়ে গেলেন যেমন যাচ্ছিলেন। কিন্তু মধুসূদন ছাড়লে না। পাঁচ টাকা জরিমানা হয়ে গেল। মধুসূদনের জরিমানা। এ ওর প্রাপ্য। ওর আর নড়চড় নেই। মাইনেই তো পায় রূপো এক টাকা মাসে আর মা-মেয়ের খাওয়া-পরা। মা'র কাছে বারো বছরের চুনী টিপ্ টিপ্ করে কিল খেলে গোটা কতক। চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে নাকালের একশেষ করলে রুপো দাসী। শেষে কান্না—শতেক খোয়ারীর জন্যে আমার কি মরেও শান্তি নেই মা কবে মরবি তুই, যম কি ভুলে গিয়েছে নিতে? পোড়া পেটের জন্যে ভূতের মতন খাটি—তাতেও শান্তি নেই গা!

মধুসূদনের কাছে আর্জি গেল।

মধুসূদন বলে—ছোটবাবুর হুকুম, আমি কী করবো তার?

কিন্তু রুপোর সাহস আছে বলতে হবে বৈকি। পাঁচটা টাকা তো কম কথা নয়। কেঁদে-কেটে ছোটবাবুকেই ধরে পড়লো সে। চুনী ছিল সঙ্গে। বারো বছর বয়সের চুনীবালা। কাঁদা-কাটার ফল ফললো দিন কতক পরেই। রঙিন শাড়ি উঠলো চুনীবালার গায়ে, কানে মাকড়ি। পায়ে আবার আলতা। মাইনে বেড়ে এক টাকা থেকে দু' টাকা হলো। রুপো দাসীর মুখে কথা ছিল না আগে। সেই মুখের ঝাল বাড়লো।

সৌদামিনী আনাজ কুটতে কুটতে সব দেখে। অত যে মুখ তার, তাও কিছু বলতে পারলে না। তবু স্বভাব যায় না মরলে। গজ গজ করে বলতে থাকে—চোক গেল তো তিভুবন গেল—ভোলার বাপ তাই বলতো—ফুলবউ, চোক কান থাকতে থাকতে তিভুবন চিনে নাও। কপাল না কপাল, ছি ছি, গলায় দড়ি জোটে না তোদের!

এ-সব পুরনো দিনের কথা। ওই ওরা সব জানে। ওই মধুসূদন, লোচন, বংশী, বেণী, শশী, সিন্ধু, গিরির দল।

রাত আটটা বাজলো অথচ বংশী তখনও এল না। কিন্তু এল অনেক পরে, যখন ছুটুকবাবুর আসরে ভূতনাথ তবলা বাজাচ্ছে।

গান তখন জমে উঠেছে। হঠাৎ বংশী পেছন থেকে আস্তে আস্তে ডাকলে—শালাবাবু!

ভূতনাথ পেছন ফিরে দেখে বললে—দাঁড়া।

কিন্তু ছুটুকবাবু দেখতে পেয়েছে। বললে—কী বলছিস রে বংশী?

—আজ্ঞে, ছোটমা একবার শালাবাবুকে ডাকছেন।

—কেন?

বংশী বললে—তা জানিনে।

ছুটুকবাবুর তখন খোশ মেজাজ। একটু আগেই নিধুবাবুর টপ্পা শুনেছে। নেশার ঘোর রয়েছে। বললে—যাও না ভাই, ছোটমা ডাকছে, যাও না, দোষ কী!

কান্তিধরকে তবলা দিয়ে ভূতনাথ উঠলো! বললে—আমি আসছি এখনি।

অন্দরমহলের সিঁড়ির কাছে এসে ভূতনাথের যেন কেমন সঙ্কোচ হলো।

বংশী বললে—চলে আসুন শালাবাবু, দাঁড়ালেন কেন—বলে একবার গলা খাঁকারি দিলে। তারপর সে-সিঁড়ির শেষে দোতলার সিঁড়ি পড়লো। সিঁড়ির মাথায় তেলের আলো জ্বলছে টিম টিম করে। লম্বা বারান্দায় একটা কাকাতুয়া চিৎকার করে ডেকে উঠলো। একটু ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। তারপর কোথা দিয়ে কোন্ বারান্দা পেরিয়ে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে উঠে তেতলায় বউ-মহলে গিয়ে পড়েছিল সেদিন চিনতে পারেনি।

তেতলার বউদের মহলে পড়তেই সিন্ধুর গলা—কে?

—আমি বংশী।

—এখন একটু সবুর করতে হবে বাছা, বড়মা হাত ধুচ্ছে।

বংশী পিছন ফিরে বললে—একটু দাঁড়ান শালাবাবু।

একটু মানে যার নাম এক ঘণ্টা। ঠায় দু'জনে দাঁড়িয়ে সেখানে। কী হলো?

বংশী বললে—বড়মা'র ছুঁচিবাই কিনা, হাত ধুতে একটু দেরি লাগবে।

সিন্ধুর গলা শোনা গেল—বড়মা আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, উঠুন, উঠুন।

বড়মা'র গলা শোনা গেল অনেক ডাকাডাকির পর। বললেন—ক'বার হলো?

—আর তিন বার—

কথাটা কানে যেতেই বংশী বললে—আর দেরি নেই, হয়ে এসেছে, একষট্টি বার হয়েছে—আর তিন বার হলেই শেষ।

তারপর অনুমতি পাওয়া গেল। সিন্ধু বড়মাকে তখন ঘরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বললে—এবার এসো গা—

ভূতনাথ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলো একেবারে-শেষ ঘরখানার সামনে।

বংশী ডাকলে—চিন্তা, ও চিন্তা—

কালো কুচকুচে একখানা মুখ বাইরে এসেই হঠাৎ ভূতনাথকে দেখে ঘোমটায় ঢেকে গেল। বংশী বললে—হ্যাঁ রে, তোর ছোটমা কী করছেন?

মুখ নিচু করে চিন্তা কী বললে বোঝা গেল না। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দু'জনকেই আসতে বলে একপাশে সরে দাঁড়ালো সে।

আজ এতদিন পরে ভাবতে অবাক লাগে, সেদিন সেই প্রথম দেখা ছোটমা'র চেহারাটা কেমন করে অমন সুন্দর লেগেছিল। ভূতনাথ যেন অত রূপ মানুষের শরীরে আর কখনও দেখেনি। এক-এক জনের রূপ আছে, যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রশান্তির প্রলেপ লাগায়, জ্বালা ধরায় না—সে-ও বুঝি তেমনি। হঠাৎ তার সমস্ত শরীরে কে যেন চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে দিলো। চোখ নাক মুখের অমন শ্রী বুঝি দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ। কিন্তু তা ছাড়াও সব মিলিয়ে যে-টা সব চেয়ে প্রথম নজরে পড়ে সে তো ছোটমা'র চেহারার খুঁটিনাটি নয়। ভূতনাথের মনে হয়েছিল—সেই চারটে দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে যেন কোটি কোটি মানুষের প্রাণের নিভৃততম কল্পনা। যুগযুগান্তের লাখ লাখ যুগের সমস্ত সৌন্দর্যের তিল তিল আহরণ করে যেন ছোটমা'র অবয়বে তিলোত্তমা মূর্তি নিয়েছে। তবু সে-রূপ যেন শরীররূপ নয়, যেন তাকে স্পর্শ করা যায় না, ধরা-ছোঁয়ার অনেক ঊর্ধ্বে চাওয়া-পাওয়ার জগতের বাইরে সে এক অব্যক্ত বাণীময় রূপক কাব্য যেন। যেন দেহ স্পর্শ করলে দেখা যাবে—দুধের ফেনার চেয়ে তা নরম, কাছে গেলে মনে হবে—আকাশের রামধনুর চেয়ে তা বর্ণাঢ্য। এতখানি প্রশান্তি বুঝি প্রশান্ত মহাসাগরেও নেই।

ভূতনাথের দিকে চোখ তুলে ছোটমা এক বার ছোট করে ঘোমটা তুলে দিলে মাথায়। তারপর বংশীই যেন চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে—এই-ই শালাবাবু।

ছোটমা বললে—এসো—এসো এখানে।

মেঝেতে একখানা গালচে পাতা। ভূতনাথ বসলো।

ছোটমা বললে—বংশী, তুই একটু বাইরে দাঁড়া গিয়ে, আমি ডেকে পাঠাবো।

চিন্তাকেও কি একটা কাজের হুকুম করে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন ছোটমা। কেমন যেন প্রচণ্ড এক অস্বস্তিতে ঘামতে লাগলো ভূতনাথ। ছোটমা'র চেহারার দিকে—বিশেষ করে মুখের দিকে—যেন হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখলেও তৃপ্তি হয় না। মাথা নিচু করে বসে ছিল ভূতনাথ। কিন্তু কেবল মনে হচ্ছিলো—আর একবার মুখ তুলে দেখা যায় না মুখখানার দিকে?

ছোটমা'র গলা শোনা গেল—ওরা তোমাকে শালাবাবু বলে ডাকে সবাই। আসল নামটা কেউ জানে না। বংশীকে বলেছিলুম ও-ও বলতে পারলে না।

ভূতনাথ মাথা নিচু করেই বললে—আপনিও ওই নামেই ডাকবেন।

—তবু বাপ-মায়ের দেওয়া একটা নাম তো আছে তোমার।

—বাপ-মাকে চোখে দেখিনি, বাবা নাকি আমার নাম রেখেছিলেন অতুল, তা সে-নামে আমায় কেউ ডাকে না এখন আর—আর পিসীমা'র দেওয়া নাম ভূতনাথ—ভূতনাথ চক্রবর্তী—নামটা সকলের পছন্দ হয় না।

—তুমি ব্রাহ্মণ—তা হোক, তবু তোমাকে আমি ভূতনাথ বলে ডাকবো—কেমন? বয়সে আমি তোমার ছোট হলেও সম্পর্কে তো বড়—আমাকে তুমি বৌঠান বলে ডেকো।

ভূতনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর চোখ তুলে বললে—আমাকে ডেকেছিলেন কী জন্যে, বংশী বলছিল—

—বলছি, কিন্তু তার আগে তুমি একটু জল খেয়ে নাও। আমার হাতে খেতে তোমার আপত্তি নেই তো?

বৌঠানের চাবির আর চুড়ির শব্দ কানে এল। পায়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। চওড়া পাড় শান্তিপুরের শাড়ির নিচে যে-টুকু দেখা যায় তা হয়তো শরীরে এক সামান্যতম অংশ। ছোট ছোট আঙুলগুলো আলতার বেষ্টনীতে অপরূপ অনবদ্য মনে হলো। ধবধবে দুধের মতো সাদা নখ—আলতায় ঘেরা। টোপা কুলের মতো যেন রসে ভরা।

চিন্তা শ্বেতপাথরের রেকাবীতে এনে রাখলে খাবার।

বৌঠান বললে—সব আমার যশোদাদুলালের প্রসাদ—তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—চিন্তা একটু জল দে ভূতনাথের হাতে।

বৌঠানের মুখে নিজের নামটা আজ কেমন সুন্দর মনে হলো। ও নামটা আগে আর কারোর মুখে তো এত সুন্দর ঠেকেনি।

যন্ত্রচালিতের মতো এক-একটা করে মিষ্টি মুখে পুরতে লাগলো ভূতনাথ। তারপর আশেপাশে চেয়ে দেখলে। ঘরের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড পালঙ্ক। ছাদের কড়িকাঠ থেকে একটা রঙিন মশারি ঝুলছে। চূড়ো করে বাঁধা। এতখানি পুরু গদির ওপর শাঁখের মতো সাদা চাদর ঢাকা। দুটো মাথার বালিশ। সবই প্রকাণ্ড। পঙ্খের কাজ করা দেওয়ালের গায়ে অনেক ছবি। পটের ছবি, শ্রীকৃষ্ণের পায়েসভক্ষণ। গিরি-গোবর্ধনধারী যশোদাদুলাল। দময়ন্তীর সামনে হংসরূপী নলের আবির্ভাব। মদনভস্ম—শিবের কপাল দিয়ে ঝাঁটার মতন আগুনের জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। আরো কত কি। একটা কাঁচের আলমারিতে কত পুতুল! বিলিতি মেম—ঘাগরা পরা। গোরা পল্টন—মাথায় টুপি। খোঁপা মাথায় কালীঘাটের বেনে-বউ। আর মেঝের এক কোণে ছোট একটা জলচৌকির ওপর ধূপ ধুনো জ্বলছে। ফুল আর বেলপাতার ভিড়ের মধ্যে রুপোর সিংহাসনের ওপর বসা শ্রীকৃষ্ণ। বৌঠানের যশোদাদুলাল। সোনার মূর্তি। বাঁশিটা পর্যন্ত সোনার তৈরি।

—পান খাও?

—না।

—খাও, একদিন খেলে দোষ হয় না। বৌঠান দিচ্ছে খেতে হয়।

পান চিবুতে চিবুতে ভূতনাথ ভাবছিল, হঠাৎ কীসের জন্যে এত আয়োজন আপ্যায়ন। এখন যদি হঠাৎ কোনো কারণে ছোটবাবু এসে পড়ে ঘরের মধ্যে? বংশী অবশ্য বলেছে—ছোটবাবু রাত্রে কোনোদিন বাড়ি থাকেন না। চুনীর কাছে থাকেন। রুপো দাসীর মেয়ে চুনীবালা। বাড়ি করে দিয়েছেন তাকে জানবাজারে। ভূতনাথ বললে—এখন আসি তা হলে বৌঠান—

—সে কি, আসল কথাটাই যে বলা হলো না—বংশী বলছিল, তুমি নাকি 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে কাজ করো?

—সে এমন কিছু নয়, ব্রজরাখাল বলেছে, যদ্দিন ভালো চাকরি না পাই... তারপর ওদের আপিসে চাকরি খালি হলেই সায়েবকে বলে...

—আমি সে-কথা বলছি না—'মোহিনী-সিঁদুরে' কি কিছু কাজ হয় বলতে পারো?

এবার হঠাৎ ভূতনাথ সোজাসুজি বৌঠানের দিকে চেয়ে দেখলে। পাতলা দুটি ঠোঁট। লালচে

আভা বেরোচ্ছে। কানের হীরে দুটো টিক্ টিক্ করে দুলছে। আর কপালের ওপর দু'-একটা অবাধ্য চুলের ওড়া। ঠিক তার নিচে দুটো কালো চোখের সহজ অথচ সুগভীর চাউনি। কাজল পরেছে নাকি বৌঠান!

বৌঠান আবার বললে—বংশী কিছু বলেনি তোমায়?

ভূতনাথ জবাব দিলে—বংশী শুধু বললে—আপনি আমায় ডেকেছেন। আমি আসবো-আসবো করে আসতে পারিনি—আপিস থেকে ফিরতেই দেরি হয়ে যায় রোজ।

—খুব বুঝি কাজ সেখানে? সহানুভূতি মেশানো বৌঠানের গলা।

—একা তো সব আমাকেই করতে হয় কিনা—সুবিনয়বাবু শুধু টাকাকড়ির হিসেবটা রাখেন।

—সুবিনয়বাবু কে? তোমার মনিব বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রাহ্ম ওঁরা, কিন্তু লোক খুব ভালো। আমার জন্যে ওদের ঠাকুরটাকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন।

—কেন?

ভূতনাথ সবিস্তারে সব বললে। কত টাকা মাইনে, জবার ব্যবহার, জবার মা'র পাগল হওয়ার কথা—বাদ দিলে না কিছুই। যেন অনেক কথা বলতে আজ ভালো লাগলো ভূতনাথের। কোনো নারী আগে কোনোদিন ভূতনাথের কথা এমন মন দিয়ে শোনেনি, শুনতে চায়নি। এখানে এই বড়বাড়ির অন্দরমহলে এমন শ্রোতা পাওয়া যাবে কে জানতো! সহজ সাদাসিধে দুঃখের কাহিনী ভূতনাথের। ভালো করে গুছিয়ে বলবার ক্ষমতাও নেই তার। অথচ কে এমন করে আদর করে বসিয়ে খাইয়ে দাইয়ে তার মুখ থেকে গল্প শোনে! এখন বৌঠানের মুখের দিকে চোখ রেখে কথা বলতেও যেন আর লজ্জা হলো না ভূতনাথের। বৌঠানের হাতের চাবির গোছাটা মাঝে মাঝে টুং-টুং করে বাজছে। সঙ্গে সঙ্গে চুড়িগুলোও। সিঁথির ওপর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে সিঁদুরের রক্তিমা। মনে হয়, বৌঠান যেন এখনই সিঁদুর পরে উঠলো টাটকা। পাতাকাটা চুলের ওপর এখনও জল চকচক করছে। অল্প অল্প হাসি-হাসি মুখ। পাতলা ঠোঁট দুটো গল্প শুনতে শুনতে একটু একটু দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে বৌঠান। ভূতনাথের এমন ভালো যেন আর কখনও লাগেনি। ভূতনাথ আবার বললে—এবার আসি বৌঠান, আপনার খুব দেরি করে দিলাম।

কিন্তু কথাটা বলে ভয়ও হলো। যদি সত্যি সত্যিই এখনি উঠে চলে যেতে হয়।

বৌঠান বললে—খুব তো বুদ্ধি তোমার—সাধে কি আর জবা তোমায় বোকা বলে—এতদিন এ-বাড়িতে আছো, এখনও টের পাওনি কিছু? এ-বাড়িতে রাত বারোটায় সন্ধ্যে হয়, জানো না?

ভূতনাথ চুপ করে রইল এবার।

বৌঠান এবার বললে—তা হলে কত দাম ওর—এই 'মোহিনী সিঁদুরে'র?

—দাম দু'টাকা সওয়া পাঁচ আনা—তা এখন আমার টাকার দরকার নেই।

—কেন? চুরি করে আনবে? তা হচ্ছে না। তারপরে বৌঠান 'চিন্তা' বলে ডাকতেই চিন্তা ঘরে ঢুকলো। বৌঠান বললে—এই চাবি নে চিন্তা, ভূতনাথকে পাঁচটা টাকা বের করে দে তো।

—পাঁচ টাকা আমি কী করবো, বারে? ভূতনাথ প্রতিবাদ করতে গেল।

—বাকিটা না হয় ফেরত দিও—বলে পাঁচটা চকচকে রুপোর টাকা হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে বৌঠান। তারপর বললে—সিঁদুরের কথাটা কাউকে যেন বলো না আবার।

ভূতনাথের ততক্ষণে বাক্‌শক্তি রোধ হয়ে গিয়েছে। মনে হলো—বৌঠানের হাতের মধ্যে যেন কোনো যাদু আছে। এত নরম এত স্নিগ্ধ! বৌঠানের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। এখন যেন হঠাৎ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে বৌঠানের মুখটা!

বৌঠান বললে—সিঁদুরের ব্যাপারটা কাউকে বলবে না—মনে থাকবে তো?

—আপনি যখন বারণ করছেন, তখন কাউকেই বলবো না।

—বারণ না করলে বুঝি বলে বেড়াতে? বৌঠান হেসে ফেললে। ভূতনাথ এ-হাসির অর্থ ঠিক বুঝতে পারলে না। বৌঠানের মুখের দিকে চেয়ে বোবার মত চুপ করে রইলো।

বৌঠান বললে—হাঁ করে দেখছো কী? জানো না, এ-সব কথা কাউকে বলতে নেই।

এবার আরো হেঁয়ালি ঠেকলো ভূতনাথের। সিঁদুর কিনতে দেওয়ার মধ্যে এমন কী গোপনীয় থাকতে পারে! কত লোকই তো সিঁদুর চেয়ে চিঠি পাঠায়। দোকানেও আসে কত লোক। কিন্তু কোন্ দুর্বোধ্য রহস্য আছে বৌঠানের এই সিঁদুর চাওয়ার পেছনে?

ভূতনাথ বললে—আপনাকে কথা দিচ্ছি বৌঠান—আমি কাউকে বলবো না।

—এমনকি বংশীকেও নয়।

—বংশীকেও নয়—কথা দিচ্ছি।

—তোমার ভগ্নীপতিকেও নয়।

—কথা দিলাম।

—এমনকি জবাকেও নয়—সে-ও ঠিক বুঝতে পারবে না, বিয়ে হলে বরং বুঝতো।

ভূতনাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করলো—কেন?

—সে তুমি বুঝবে না ভাই, বিয়ে হবার আগে সব মেয়েমানুষ ও বোঝে না।

ভূতনাথ আবার প্রশ্ন করলো—আর রাধা? রাধার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বেঁচে থাকলে সে-ও বুঝতে পারতো?

বৌঠানের চোখে মুখে কেমন ফিকে হাসি ফুটে উঠলো। বললে—তা কি বলা যায়, যার কপাল ভাঙে, সেই বোঝে, মেয়েমানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় লজ্জা, এর চেয়ে বড় অপমান আর যে নেই ভাই।

ভূতনাথ বৌঠানের গলার আওয়াজে কেমন যেন চমকে উঠলো। ভালো করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। কাঁদছে নাকি বৌঠান! তবে চোখে মুখে অত হাসির ছটা কেন? সেইভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হেসে উঠলো বৌঠান। সাদা সাদা ঝিনুকের মতো দাঁত চিক্-চিক্ করে উঠলো বৌঠানের। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে এবার হরদম হাসতে লাগলো। বললে—এ এক অবাক বাড়ি ভাই—অবাক বাড়ি! আমার বাপের বাড়িও দেখেছি—আমার মা'র কথাও একটু-আধটু মনে পড়ে। আমি গরীব লোকের মেয়ে বটে—কিন্তু এ এক অবাক বাড়ি—অবাক বাড়ি এটা—

আবার মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তেমনি হাসতে লাগলো বৌঠান। ভূতনাথ যেন কেমন অভিভূতের মতো বসে রইলো সেই দিকে চেয়ে। পাগল নাকি ছোটমা! এতক্ষণ কি উন্মাদের সঙ্গে বসে সে গল্প করছে! ধবধবে ফরসা হাত, মুখ, পা—সব থর থর করে কাঁপছে বৌঠানের। টোপাকুলের মতো আলতা-মাখা পায়ের আঙুলগুলো এক-একবার বোধ হয় হাসির দমকে সঙ্কুচিত হচ্ছে।

একবার মনে হলো হাত দিয়ে জোর করে বৌঠানের আঁচলটা টেনে নিয়ে দেখে বৌঠান কাঁদছে, না সত্যি সত্যি হাসছে।

কিন্তু আঁচল যখন খুললো বৌঠান তখন একেবারে স্বাভাবিক মানুষ। বললে—আমাদের বাড়ির মানুষদের দেখছো তো ভাই, শুনেছোও নিশ্চয়ই অনেক কিছু—এক এক সময় ভাবি, এ সব কী রকম করে হলো, এত বড় বাড়ি, এত নাম-ডাক, এত পয়সা এঁদের, কার পাপে এমন হলো এঁরা, কিন্তু তখনি মনে হয়, দোষ আর কারো নয় দোষ আমারই কপালের। আর-জন্মে কত পাপ করেছিলাম—তাই সব পেলাম, মেয়েমানুষ যা চায় সব পেলাম, রূপ পেয়েছি জগদ্ধাত্রীর মতো, লোকে তো তাই বলে, অমন দেবতার মতো বাপ, মায়ের অভাব বুঝতে দেননি, এত বড় বাড়ির বউ হলাম, টাকাকড়ি, গাড়ি, বাড়ি, চাকর, বাঁদি—যা কেউ পায় না—কিন্তু আসল জিনিসেই ফাঁকি—এর চেয়ে—

ভূতনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলো।

বৌঠান বললে—স্বামীজিকে তুমি চেনো না, আমার বাপের বাড়ির কুলগুরু, তাঁকে বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন—পটুর কপাল এমন করে ভাঙলো কেন গুরুদেব? আমার ভালো নাম

পটেশ্বরী কিনা, বাবা আমাকে তাই পটু বলে ডাকতেন। তা গুরুদেব বললেন...। যাকগে সে-সব তোমার শুনে কাজ নেই ভাই।

ভূতনাথ কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলো—না বলুন বৌঠান—শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে কিন্তু—

বৌঠান বললে—স্বামিজীকে তুমি দেখোনি ভাই, তাই হয় তো বিশ্বাসও হবে না তোমার—কিন্তু বাবা বলেন—উনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, ওঁর কথা মিথ্যে হয় না, হিমালয়ে গিয়ে তিনি পঞ্চাশ বছর ধ্যানে কাটিয়েছেন, তারপর এখানে এসে এখন ধর্মপ্রচার করছেন।

—কী বললেন তিনি?

বৌঠান এবার মুখে আঁচল চাপা না দিয়েই খিল খিল করে হেসে উঠলো। বললে—গুরুদেব বললেন, পটু আর-জন্মে ছিল দেববালা, দেবসভায় ব্রাহ্মণের অপমান করেছিল—তারই শাপে এ-জন্মে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে—এ জন্মটা ওর এমনি করেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কিসে মুক্তি হবে ওর? গুরুদেব বললেন—স্বামীসেবায়।

—স্বামীসেবায়?

—হ্যাঁ ভাই, স্বামীসেবায়, এ-বাড়ির ছোটকর্তাকে দেখেছো তো? এতদিন আছো দেখেছো নিশ্চয়ই, তোমার কী মনে হয় জানিনে ভাই, কিন্তু আমাদের ভাঁড়ারে যে রাঙাঠাকমা আছে—সবাই তাকে রাঙাঠাকমা বলে—এ-বাড়ির সবচেয়ে পুরনো ঝি, আমার শাশুড়ীর বিয়ের সময় এ-বাড়িতে আসে, তা তারই মুখে শুনেছি—ছোটবেলায় ছোটকর্তাকে নাকি দেখতে ছিল ঠিক দেবকুমারের মতো—যেমন মুখশ্রী, তেমনি সুন্দর গড়ন, তা শুনে ভাবি আমিই যদি দেববালা হতে পারি তো ছোটকর্তারই বা দেবকুমার হতে দোষ কী! হয় তো শাপভ্রষ্ট দেবকুমারই হবেন, কী বলো ভাই, পৃথিবীতে এসেছেন প্রায়শ্চিত্ত-কাল পূর্ণ করতে। তা যেন হলো, কিন্তু একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয় ভাই—এক-একদিন যখন রাত্রে ঘুম আসে না, যশোদাদুলালের পায়ের তলায় মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকি, তখন এক-একবার ভাবি আমার বিধাতাপুরুষের দেখা পেলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতুম।

—কী কথা বৌঠান?

বৌঠান থামলো। বললে—না ভাই থাক, তুমি এক কাজ করো—সিঁদুরটা নিয়ে এসো—আর যদি পারো তো তোমার মনিবকে জিজ্ঞেস করো, মানুষদের বেলায় তোমাদের 'মোহিনী-সিঁদুর' যদিই-বা খেটে থাকে, দেবকুমারের বেলায় এ-সিঁদুর খাটবে কি না—

ভূতনাথ হেসে উঠল।

বৌঠান বললে—হাসি নয় ভাই, আমি সত্যিই বলছি, বাবা আর গুরুদেব তো বলেছেন স্বামীসেবা করতে—কিন্তু স্বামীকে কাছে পেলে তবে তো সেবা করবো! তাই সেদিন পাঁজি পড়তে পড়তে হঠাৎ ওই বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়লো—তারপর বংশীও বললে কথায় কথায়—তুমি নাকি কাজ করো ওখানে।

অনেক দিন আগেকার সব কথা। ভূতনাথের আজো যেন দৃশ্যটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ মনে পড়ে। সেই বড়বাড়ির তেতলার শেষ ঘরখানার কথা। পটেশ্বরী বৌঠানের ঘর। উঁচু পালঙ্ক। বিলিতি পুতুলে ভর্তি আলমারি। আর সামনে বসে অপরূপ রূপসী বড়বাড়ির ছোট বউ। যে-ঘরে ছোটকর্তার পদধূলি পড়ে না। যে-ঘরে বসন্ত-বাহার করুণ আর্তনাদ করে রাত্রের নির্জনে। যশোদাদুলালের সেবায় স্বামীসেবা যেখানে হাস্যকর হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের হিন্দু আভিজাত্য যেখানে মোগল আমলের চৌকাঠ পেরিয়ে ব্রিটিশ আমলের নাচ-দরবারে গিয়ে থেমেছে। অনেক কোতল-কচ্ছলের পর শাসন মানতে চায় না নবজাগ্রত মন। নিয়মানুবর্তিতাকে যখন শৃঙ্খল বলে মনে হয়। কিন্তু তখন ওদিকে চোখ রাঙিয়ে ছুটে আসছে আর-এক সভ্যতা। ঘড়ির কাঁটার মতো সময়-নির্দেশ করে পদক্ষেপ করে করে চলে যন্ত্রযুগ। গম-ভাঙা কল থেকে শুরু করে রেল-চলা পর্যন্ত অনেক পথ অনেক প্রান্তর পার হয়ে আসছে ১৮৯৭ সন। ওরা চেয়ে দেখলে না কেউ।

মুখ ফিরিয়ে রইল। ওই হিরণ্যমণি আর কৌস্তভমণিরা। বড়বাড়ির ইঁট-চুন-সুরকীর মধ্যে গাছের শেকড় তখন হাত বাড়িয়েছে অনেকখানি। মিছিমিছি মাদুলি পরে ছোটবউ, যশোদাদুলালকে মিছরিভোগ দেয়, শাড়ি গয়না আলতা পরে সারারাত প্রতীক্ষায় বসে থাকে। আর পাঁজির পাতায় উদ্গ্রীব আগ্রহে 'মোহিনী-সিঁদুরে'র বিজ্ঞাপনটায় চোখ বুলোয়।

অত বড় বাড়ির বউ। ঠিক এমন করে আলাপ পরিচয় হবে ভাবা যায়নি। ভূতনাথ ভেবেছিল—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে সে আর পর্দার আড়াল থেকে কথা হবে ঝি'র মারফৎ। কিন্তু এ যেন কেমন হলো! এত ঘরোয়া! এত ঘনিষ্ঠতা প্রথম দিনের পরিচয়ে! বিশ্বাস না হবার মতো। তফাৎ তো কিছু নেই আর-পাঁচজনের সঙ্গে। তবে হয় তো আড়ালে থাকে বলেই এত কৌতূহল, এত কল্পনা-বিলাস ওদের নিয়ে। কিংবা হয় তো বৌঠান গরীব ঘরের মেয়ে বলেই এ-বাড়িতে এক ব্যতিক্রম চরিত্র।

যাবার আগে বৌঠান বললে—আমার যশোদাদুলালকে প্রণাম করলে না ভূতনাথ।

ভূতনাথ সপ্রতিভ হয়ে এগিয়ে গেল বিগ্রহের দিকে। যশোদাদুলাল একপদ হয়ে সোনার বাঁশি বাজাচ্ছেন। টানা টানা প্রকাণ্ড দুটি চোখ। সামনে গিয়ে নিচু হয়ে প্রণাম করলো ভূতনাথ। কিন্তু মনে হলো তার সে প্রণাম যেন ঠাকুরের পায়ে গিয়ে পৌঁছল না। বাইরে বেরিয়ে এসেও তার যেন মনে হচ্ছিল—প্রণাম সে কাকে করেছে? সত্যি সত্যিই কি বৌঠানের ঠাকুরকে? না আর কাউকে! অথচ বৌঠানকে প্রণাম করার তো কোনো অর্থ হয় না। বৌঠানকে দেখে কি শুধু ভক্তিই হয়েছিল? আর কিছু নয়?

চলে আসবার আগে বৌঠান বলেছিল—সিঁদুরটা নিয়ে তুমি নিজেই চলে এসো, বংশীকে বললেই বংশী তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে, কেমন!

বাইরে বেরিয়ে এসে ভূতনাথের মনে হলো—বৌঠান যেন তাকে আগে থেকেই চিনতো। কিন্তু কেমন করে চিনলে! তবে কি বংশীই তাকে সব বলেছে?

বারবাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বংশীকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে—না শালাবাবু, আমি কেন বলতে যাবো, আমি তো কিছু বলিনি—আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ছোটমা—শালাবাবু লোক কেমন। তা আমি যা যা জানি সব বলেছি—মাইরি বলছি, আমি আপনার নিন্দে করিনি—আমি তেমন লোক নই শালাবাবু।

বংশী চলে গেল কাজে। ছুটুকবাবুর গানের আসর তখনও চলছে। 'চমেলি ফুলি চম্পা'। হৈ হৈ শব্দে সমে এসে গান থামলো। এখন আর আসরে যাওয়া যায় না।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। ইব্রাহিমের ঘরের ওপর টিম টিম করে রেড়ির তেলের বাক্স-বাতিটা জ্বলছে। কলকাতা শহরও নিস্তব্ধ। বাইরের গেটে নাথু সিং পাহারা দিচ্ছে অবিশ্রান্ত। ঘরে গিয়ে ভূতনাথ দেখলে—ব্রজরাখাল অনেকক্ষণ এসে গিয়েছে। কী যেন একটা পড়ছে। ব্রজরাখালকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে ভূতনাথ যেন কেমন চমকে উঠলো। একটু আগেই যেন কী একটা মহা অপরাধ করে এসেছে সে। মুখ দেখাতে যেন লজ্জা হলো।

ব্রজরাখাল সব শুনে বললে—তা বৌঠান যদি কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল—তবে বললে কেন আমাকে?

—তোমাকে সবই বলা যায় ব্রজরাখাল।

শেষে ব্রজরাখাল বললে—তা ভালো, কিন্তু কাজটা ভালো করোনি বড়কুটুম, ওরা হলো গিয়ে সাহেব বিবি আর আমরা হলাম গোলাম—ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম ভালো নয়—কাজটা ভালো করোনি বড়কুটুম।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েও সেই কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো। কাজটা কি সত্যিই ভালো করেনি সে? বৌঠানের ডাকে না গেলেই কি ভালো করতো সে? কিন্তু খারাপটাই বা হলো কোথায়? প্রণাম তবে করেছিল সে কাকে? শুধু কি বৌঠানের যশোদাদুলালকে?

'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে সেদিন সকাল থেকেই বড় কাজের তাড়া। একটা নিঃশ্বাস নেবার পর্যন্ত ফুরসৎ পাওয়া যায় না। পাঠকজী তারই মধ্যে দুপুরবেলা ছাতু ভিজিয়ে খেয়ে নিলে। ভূতনাথেরও খুব খিদে পেয়েছে। তবে কি আজকে কেউ আর ডাকতে আসবে না?

একটা মনি-অর্ডারের কাগজ নিয়ে সোজা ওপরে চলে গেল ভূতনাথ। সুবিনয়বাবু তেমনিভাবে বসেছিলেন। পাশে জবা। আর-একটা চেয়ারে জবার-মা। বসে বসে বই পড়ছেন।

কাছে যেতেই ভূতনাথ লক্ষ্য করলে সুবিনয়বাবু মেয়ের সঙ্গে কী যেন আলোচনা করছেন। ভূতনাথ কাছে যেতে জবা উঠছিল। সুবিনয়বাবু বললেন—না, উঠে যেও না মা, বোসো... লজ্জা কি মা?

জবা বললে—ভূতনাথবাবুর খাওয়ার এখনও যোগাড় হয়নি বাবা—আমি যাই।

—কেন? সুবিনয়বাবু অবাক হলেন। ভূতনাথবাবুর খাবার দিতে এত দেরি করা বড় অন্যায় মা।

—কিন্তু উনি কি আমাদের হাতে খাবেন? ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না বাবা।

—কেন, ও-কথা কেন বলছো মা? বৃদ্ধ যেন কিছু বুঝতে পারলেন না।

ভূতনাথ কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

জবার মা আপন মনেই বই পড়ছেন। তাঁর যেন এ-সব কথা কানে যাচ্ছে না।

জবা পরিষ্কার করে বললে—আমরা তো ব্রাহ্মণ নই বাবা।

—ও, তাও তো সত্যি। তা হলে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত কী হবে ভূতনাথবাবু? এ-কথাটা আগে ভাবিনি তো মা—একটা ঠাকুরের ব্যবস্থা করতে হয়। পাঠককে একবার খবর দিতে হবে। ওরে রতন—

—সে যখন হবে, তখন হবে, কিন্তু এখনি তো আর ঠাকুর আসছে না—আজকে কি উনি উপোস করবেন?

—সে কি একটা কথা হলো? বলে সুবিনয়বাবু হতবুদ্ধির মতো ভূতনাথের দিকে চেয়ে রইলেন।

ভূতনাথেরও এই পরিস্থিতিতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল।

জবা এবার সোজাসুজি ভূতনাথকে প্রশ্ন করলে—আমি হাঁড়িটা চড়িয়ে দিলে, আপনি নামিয়ে নিতে পারবেন না—তাতেও আপনার কিছু আপত্তি আছে?

ভূতনাথ বললে—পারবো।

—এ তো বেশ কথা, খুব উত্তম কথা, যতদিন নতুন ঠাকুর না আসে ততদিন এই রকম একটু কষ্ট করো ভূতনাথবাবু, জবা ঠিকই বলেছে।

—তা হলে আমি ব্যবস্থা করি গিয়ে।

সুবিনয়বাবু বললেন—তা হলে, একটা কথা শুনে যাও মা, ভূতনাথবাবুকে আমি তা হলে রবিবার দিন আসতে বলি? কী বলো?

জবা মুখ নিচু করে বললে—সে তোমার অভিরুচি বাবা।

—না না, সে কি, তোমার বিয়ে, উৎসবটা তোমাকে কেন্দ্র করে, যাদের যাদের তুমি নিমন্ত্রণ করবে, তাদেরই আমি ডাকবো—আর ভূতনাথবাবু তো আমাদের ঘরের লোক—ব্রজরাখালবাবুর নিজের বিশেষ আত্মীয়।

—আমি ভূতনাথবাবুর রান্নার ব্যবস্থা করি গে বাবা—বলে দ্রুতপায়ে জবা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল এক নিমেষে।

ভূতনাথ এবার হাতের কাগজপত্র সুবিনয়বাবুর সামনে এগিয়ে ধরলে। যেখানে সই করবার, সেখানে সই করলেন তিনি। তারপর বললেন—বসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে ভূতনাথবাবু।

ভূতনাথ বসলো।

সুবিনয়বাবু বললেন—জবার বিয়ের কথা বলছিলাম, তা আসছে রবিবারে একটা ছোটোখাটো উৎসবের দিন স্থির করেছি। পরস্পর কথাবার্তা হবে। পাকাপাকি কথা সেই দিনই হয়ে যাবে। ভেবে দেখলাম আমার আর ক'দিন—আর উনিও—

পাশে বসা জবার মা'কে নির্দেশ করে বলতে লাগলেন—আর উনিও না-থাকারই মতো। ওদিকে জবারও বিবাহের উপযোগী বয়েস, ভালো পাত্রও পেয়েছি, ছেলেটি মেধাবী, এম-এ পাশ করেছে। এবার আইন পড়ছে—বাপ বেঁচে নেই—তা হোক, এ-সব সম্পত্তির ভার তো একদিন জবাকেই নিতে হবে। এ আমাদের পৈত্রিক কারবার—বাবা ছিলেন গোঁড়া কালীভক্ত হিন্দু। আমি ধর্ম বদলেছি বটে, কিন্তু বংশের ধারা কোথায় যাবে—নিজের ছেলে নেই, তা না থাক, জামাইকেই ছেলের মতন করে নিতে হবে। তারপর খাওয়া-পরার জন্যে চিন্তা করতে হবে না—আমি যা রেখে গেলাম... কী বলো, অন্যায় কিছু বলছি?

খানিকক্ষণ চুপচাপ। ভূতনাথ বললে—আমি আসি এবার।

—না বসো একটু, তোমাকে সেই গল্পটা বলা হয়নি। প্রথম যেদিন দীক্ষা নিলুম—সে কী কাণ্ড ভূতনাথবাবু—শোনো তবে—

ভূতনাথ বললে—সে গল্প আপনি আমাকে বলেছেন।

—বলেছি নাকি? তা বলেছি বটে, কিন্তু কেবল মনে হয় বুঝি বলা হলো না কাউকে। কেউ কি মনে রাখবে সে-কথা ভূতনাথবাবু? আমার সময় তো ঘনিয়ে এল—শ্রীমদ্ভাগবতে পড়েছি রন্তিদেবের গল্প, সমস্তদিন ধরে সব দান করে করে যখন নিজের খাবার জলটুকুও এক ভিক্ষার্থী চণ্ডালকে দিয়ে দিলেন, তখন নিজের মনে যা বললেন—ভাগবতকার বলেছেন তা অমৃত—ইদমাহামৃতং বচঃ—কী বললেন? না, বললেন—আমি ভগবানের কাছে পরমগতি চাই না, অষ্টসিদ্ধিও চাই না—পুনর্জন্মও চাই না—আমি চাই, আমি যেন সমস্ত জীবের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের দুঃখকে পাই, যাতে তাদের দুঃখ না থাকে—আর এক জায়গায় ভাগবতকার বলছেন—

'ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন চ পুনর্ভবম্
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশং'—

—আহা, বাবাকে দেখেছি বাড়ির বিগ্রহের সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করছেন, 'ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'। বাবা ছিলেন আমার বড়ই গরীব—যজন-যাজন নিয়েই থাকতেন। মনে আছে আমি ছোটবেলায় হুঁকো কল্‌কে নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসতুম, দিনের মধ্যে অন্তত দশ-বারোটা কল্‌কে ভাঙতুম। মনে আছে বাবা সেই উঠোনের ধারে বসে বসে... তোমার শুনতে ভালো লাগছে তো ভূতনাথবাবু? খারাপ লাগলে বলবে।

বহুবার শোনা গল্প। আগেও বলেছেন। তবু ভূতনাথ বললে—না, খুব ভালো লাগছে, আপনি বলুন।

সুবিনয়বাবু দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আবার আরম্ভ করলেন—তখন এক পয়সায় আটটা কল্‌কে—সে পয়সাও খরচ করবার মতো সামর্থ্য ছিল না তাঁর—কোথায় গেল সে-সব লোক! সেই অবস্থার মধ্যেই একদিন ঈশ্বরের কৃপা পেলেন বাবা, ধ্যানে পেলেন 'মোহিনী সিঁদুরে'র মন্ত্র—তাই থেকে চালা ভেঙে পাকা দালান উঠলো, দোতলা কোঠা হলো, মা'র গায়ে গয়না উঠলো। আর আমি এলাম কলকাতায় পড়তে, সেই পড়াই আমার কাল হলো ভূতনাথবাবু, আমি চিরদিনের মতো বাবাকে হারালুম। গল্প বলতে বলতে চোখ ছল ছল করে ওঠে সুবিনয়বাবুর।

—জানো ভূতনাথবাবু, যেবার সেই ডায়মণ্ডহারবারে ঝড় হয়, সেই সময় আমার জন্ম সে এক ভীষণ ঝড়, বোধ হয় ১৮৩৩ সাল সেটা, কলকাতায় সেই প্রথম ওলাউঠো হলো, জন্মেছি ঝড়ের লগ্নে, সারাজীবনটা কেবল ঝড়ের মতনই বয়ে গেল, বাবাকে যা কষ্ট দিয়েছি, বাবা প্রতিজ্ঞা করলেন আমার মুখদর্শন করবেন না—সত্যিই আর করলেনও না। আমি একমাত্র সন্তান, আমার

অসুখের সময় বাবা কবিরাজ ডেকে আনলেন, কিন্তু ঘরে ঢুকলেন না, পাছে আমার মুখদর্শন করতে হয়। সেই বাবা আমার প্রেতলোকে এক গণ্ডূষ জলও পেলেন না তাঁর একমাত্র বংশধরের হাতে। তাই সেই পাপেই বোধ হয় আমি আজ নির্বংশ। বলে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভূতনাথের দিকে।

—কিন্তু কী করবো বলো ভূতনাথবাবু, মন বলে অন্য কথা। হৃদয়ের কথা মন শোনে না। বলে—ভুল, ভুল—সব তোমার ভুল ধারণা। তথাগত প্রচার করলেন—জন্মেই বন্ধন, জন্মরহিত হতে পারলেই মুক্তি। তাই তো ভাবি—দ্বৈতের জগতে স্বর্গরাজ্য আসতে পারে না, নিত্যবৃন্দাবনের পরমানন্দ ব্রহ্মের রসোল্লাস—যেখানে একত্বের মধ্যে সকল বহুত্বের চির-অবসান তা-ই কাম্য হওয়া উচিত—আমার জীবনের শেষদিনটা পর্যন্ত এর মীমাংসা বুঝি আর করতে পারবো না—মন বলে—ঠিক করেছো, হৃদয় বলে—না। অথচ দেখো ভূতনাথবাবু, 'মোহিনী-সিঁদুরে'র ব্যবসাও ত্যাগ করতে পারলাম না—ও ভড়ংটাও রাখতে বাধ্য হয়েছি।

সে কি! ভূতনাথ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না। সব তবে ভড়ং। কিছুই তবে সত্যি নেই এর পেছনে? খানিকটা দৈবশক্তি বা মন্ত্রশক্তি। ভূতনাথের মনে হলো কিছুটা দৈবশক্তি আছে জানতে পারলে যেন সে তৃপ্তি পায়। অন্তত একবারের জন্যেও সে বৌঠানের কাছে গিয়ে তা হলে এর গুণের কথা বলতে পারে।

সকাল থেকে যে-প্রশ্নটাই বার-বার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিলো, এই সুযোগে ভূতনাথ সেই প্রশ্নটাই করলে। বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, 'মোহিনী-সিঁদুরে' কিছু কাজ হয়?

কিন্তু প্রশ্নটা করবার আগেই বাধা পড়লো, হঠাৎ পাশ থেকে বই পড়তে পড়তে জবার মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

সুবিনয়বাবু সচকিত হয়ে উঠলেন। কী হলো রাণু—কী হলো রাণু?

সুবিনয়বাবু যেন ভুলে গিয়েছেন ভূতনাথ এখানে বসে আছে। হঠাৎ তিনি চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্ত্রীর মাথাটা দুই হাতে ধরলেন। জবার মার হাত থেকে বইটা পড়ে গেল। আঁচলটা খসে গেল শরীর থেকে। ছোট মেয়ের মতো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

—কী হলো রাণু—কী হলো? বৃদ্ধ অথর্ব শরীর নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। উঠে স্ত্রীর মাথাটি ধরে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

—কী হলো রাণু বলো আমাকে। বলো—

কাঁদতে কাঁদতে জবার মা বললেন—আমার খিদে পেয়েছে।

—খিদে পেয়েছে, বেশ তো কান্না কেন, খাও খাবার আনছি আমি।

—কিন্তু এইমাত্র খেলাম যে—আরো প্রবল বেগে কাঁদতে লাগলেন জবার মা।

—তাতে কী হয়েছে রাণু, আবার খাও।

ভূতনাথ এই পরিস্থিতিতে কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলো। বললে—আমি এখন আসি তাহলে।

সুবিনয়বাবু মুখ ফেরালেন—তুমি যাবে?... তা হঠাৎ এই রকম হয় জবার মা'র, এই-ই অসুখ কিনা, কিছুতেই সারলো না আর, আমার খোকার মৃত্যুর পর থেকেই এই রকম হচ্ছে। তোমারও খেতে দেরি হয়ে গেল ভূতনাথবাবু—তুমি যেন আবার রাগ করো না জবার ওপর।

আর বাক্য ব্যয় না করে সোজা নিজের চেয়ারে এসে বসলো ভূতনাথ।

খানিক পরেই রতন খেতে ডাকতে এল।

খাবার সময় প্রথমে বিশেষ কথা হলো না। সারাক্ষণ জবা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

একবার জবা বললে—ভাত নষ্ট করবেন না। ওগুলো সব খেতে হবে আপনাকে।

ভূতনাথ মুখ তুলে চাইলো। বললে—পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা ভাত একটু বেশিই খায়—কিন্তু তা বলে এত বেশি? চাল একটু কম নিতে বললেই পারতে।

—শেষে পেট না ভরলে, তখন?

জবার মুখ যেন গম্ভীর-গম্ভীর। বেশি কথার আবহাওয়া নেই তার। আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। এ যেন কেমন বিশ্রী ব্যাপার। এখানেই রোজ খেতে হবে—অথচ নিজের হাতে সব রান্নার ব্যবস্থা। যতদিন ঠাকুর না আসে, ততদিন। এ-ছাড়া গতিও নেই।

খানিক পরে ভূতনাথ আবার কথা কইলো। বললে—তোমার বাবা রবিবার দিন আমাকে আসতে বললেন, কিন্তু সন্ধ্যেয় না সকালে—কিছু বললেন না তো?

—সেটা বাবাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

—কিন্তু তোমারই যখন বিয়ে, তখন তুমিও তো কিছু জানো—আর হাতের কাছে তুমি থাকতে আবার...

—বিয়েটা আমার বলেই তো আমার মুখে ও-কথা শোভা পায় না।

—বিয়ে জিনিসটা কি লজ্জার? সময় হলে একদিন সবারই তো বিয়ে হবে।

—হবে নাকি? আমার কিন্তু সন্দেহ আছে।

ভূতনাথ বললে—পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ভাত বেশি খাই বলে কথাও বেশি বলতে পারবো এমন কথা নেই, কিন্তু এটা জানি যে, সব মেয়েই আর তোমার মতো নয় জবা।

—ক'টা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার?

ভূতনাথের মনে হলো—সকলের নাম করে দেয় সে। হরিদাসী, রাধা, আন্না, তাদের ব্যবহারও তো সে দেখেছে। আর কাল রাত্রের বৌঠান। বৌঠানের কথা মনে হতেই যেন সমস্ত মন প্রশান্ত হয়ে এল তার। এক মুহূর্তে যেন এই আপিস-বাড়ি ছেড়ে সে সোজা বড়বাড়ির তেতলার শেষ ঘরখানায় গিয়ে পৌঁছেছে। হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে ভূতনাথ এক নিমেষে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলো—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে, তোমাদের 'মোহিনী-সিঁদুরে' কাজ হয়?

জবা যেন প্রথমটায় থতমতো খেয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—এটাও কি বাবাকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয় না?

—মানছি ভালো হয়, কিন্তু তোমাকেই না হয় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কিছু জানো?

—পাঁজির বিজ্ঞাপনে তো সব লেখা আছে।

—সে তো সবাই জানে, তুমিও জানো আমিও জানি—আরো হাজার হাজার লোক জানে।

—আমিও তার বেশি কিছু জানি না, আমার নিজের কখনও ও সিঁদুর ব্যবহার করবার দরকার হয়নি—জবা হাসলো এবার। তারপর হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করলো—আপনার বুঝি দরকার হয়েছে?

ভূতনাথ খাওয়া থামিয়ে বললে—হ্যাঁ।

জবা শাড়ির আঁচলটা নিজের শরীরে বিন্যস্ত করে বললে—প্রয়োগটা কি আমার ওপরে করবেন নাকি? তা হলে কিন্তু ঠকবেন বলে রাখছি।

ভূতনাথ বললে—ঠাট্টা নয়, আমার বিশেষ দরকার, আজকেই জানা দরকার—তা হলে আজই কিনে নিয়ে যাই এক কৌটো। আমায় পাঁচটা টাকা দিয়েছেন কিনতে।

—কে?

—সে আমার এক বৌঠান।

—কী রকম বৌঠান? কী হলো আবার তার?

—সে কি তুমি বুঝবে? বৌঠান বলে—বিয়ে হবার আগে ও-সব মেয়েরা বুঝবে না, তা ছাড়া বলতেও বারণ আছে। মেয়েমানুষের অত বড় লজ্জা, অত বড় অপমান নাকি আর নেই।

—বৌঠানটি আপনার কে শুনি?

—বলেছি তো বলতে বারণ আছে।

জবা বললে—ডাক্তারের কাছে লজ্জা করা বিপজ্জনক, রোগ সারাতে গেলে সমস্ত প্রকাশ করে

বলতে হয়।

ভূতনাথ কী যেন একবার ভাবলে। তারপর বললে—কিন্তু বৌঠানকে যে আমি কথা দিয়েছি,—কথা দিয়েছি, ব্রজরাখালকে বলবো না, বৌঠানের চাকর বংশীকেও বলবো না, কাউকেই না, এমনকি, তোমাকেও না।

—আমাকে তিনি চেনেন নাকি?

—আমি যে বলেছি তোমার কথা।

জবা এবার হেসে বসে পড়লো সামনে। বললে—আমার সম্বন্ধে কী বলেছেন শুনি? খুব নিন্দে করেছেন নিশ্চয়।

—নিন্দে তোমার শত্রুতেও করবে না জবা—আর আমি তো তোমার শত্রুও নই—আর তা ছাড়া তুমি আমার কে বলো না যে, খামকা তোমার আমি নিন্দে করতে যাবো।

—আপনার সঙ্গে তো আমার মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক, কী বলেন—আর কিছু নয়।

—আমিও তাই-ই বলেছি। কথাটা বলে ভূতনাথ আবার নিচু মুখে খাওয়ায় মনোযোগ দিলে। জবাও খানিক চুপ করে রইল। তারপর বললে—আপনি দেখছি শুধু অকৃতজ্ঞই নন, আপনি মিথ্যেবাদীও।

ভূতনাথ খেতে খেতেই জবাব দিলে—আমি তাও বলেছি।

—তার মানে?

ভূতনাথ এ কথার কোনো জবাব দিলে না। যেমন খাচ্ছিলো তেমনি খেতে লাগলো।

—চুপ করে রইলেন যে—জবাব দিন!

ভূতনাথ এবার মুখ তুললে। দেখলে জবার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বললে—আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে একটু বেশি ভাত খাই, গুছিয়ে বলতে পারিনে বটে—কিন্তু মান-অপমান-জ্ঞান আমাদেরও আছে।

জবা বললে—শুধু আছে নয়, বেশি মাত্রায়ই আছে, নইলে মেয়েমানুষ বলে অপমান করতে সেদিন আপনার মুখে বাধতো।

ভূতনাথ এক মুহূর্তে বুঝে নিলে আবহাওয়াটা। তারপর বললে—সেদিন আমি অন্যায় করেছিলাম স্বীকার করি—কিন্তু ক্ষমা চাইতে ফিরে আসার পর তুমিও বা কোন আমার মর্যাদা রেখে কথা বলেছিলে? তারপর একটু থেমে আবার বললে—তোমাকেও তো দেখছি, আর বৌঠানকেও দেখলাম, অথচ—

—অথচ কী বলুন।

ভূতনাথ হাসলো। বললে—না থাক, তুমি রাগ করবে।

—রাগ যদি করিই তো আপনাকে কম খেতে দেবো না তা বলে।

ভূতনাথ বললে—না, সে কথা হচ্ছে না, তোমাকে রাগালে আমার লোকসানই তো ষোল আনা, তা জানি আমি, তোমার বাবা বলেছিলেন, এ-সংসারের মালিক তো একদিন তুমিই হবে, তখন? তখন আমার সাত টাকার চাকরিতে টান পড়তে পারে কিংবা সাত টাকা থেকে সতেরো টাকা হবার আশাতেও জলাঞ্জলি পড়তে পারে।

—দেখছি নামে আর চেহারাতেই শুধু ভূতনাথ—কিন্তু কথাগুলোর বেলায় কলকাতার ছোঁয়া লেগেছে এরই মধ্যে!

খাওয়ার পর হাত ধুতে ধুতে ভূতনাথ হাসতে হাসতে বললে—তুমি নিজের মুখে আসতে না বললে—রোববার কিন্তু আমি আসবো না জবা!

জবাও হাসলো। বললে—আপনার আশা তো বড় কম নয় ভূতনাথবাবু!

ভূতনাথ জবার মুখের দিকে চেয়ে মনের কথাটা একবার ধরবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জবা ততক্ষণে নিজের কাজে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

১৮৯৭ সাল। ব্রজরাখাল রাত্রে বাড়ি আসেনি। আগের দিন রাত্রে বলেছিল—খুব ভোরে উঠবে বড়কুটুম—নইলে হয় তো দেখতে পাবে না। ভিড়ও হবে খুব—এখন তো আর নরেন দত্ত নয়—এখন স্বামী বিবেকানন্দ। স্পেশাল ট্রেনটা বোধ হয় সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যেই এসে পৌঁছবে, তার আগেই গিয়ে হাজির হয়ো—আমি থাকবো।

স্বামী বিবেকানন্দ! কথা বলতে বলতে ব্রজরাখাল থর থর করে কাঁপে। বলে—যাবার আগে নরেন বলেছিল—"I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child and Christianity but a distant echo", হলোও তাই।

খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে ভূতনাথ। বড়বাড়িতে একটু দেরি করে সকাল হয়। তবু অন্ধকারে স্নান সেরে নিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে চাদর জড়িয়ে নিলে। কন্‌কনে শীত। তখনও বাড়ির আনাচ-কানাচের আলোগুলো নেভেনি। নাথু সিং পাহারা দিতে দিতে বুঝি একটু ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। পায়ের আওয়াজ পেয়েই সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত বাড়িটা নিদ্রাচ্ছন্ন। এখন বৌঠান কী করছে? এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। সারা রাত জেগে কী করে কে জানে! আশ্চর্য হয়ে যায় ভূতনাথ।

ব্রজরাখালের কথাগুলো তখনও কানে বাজছিল—বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে এসে বলেছেন—এসো, মানুষ হও, তোমার আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না—সামনে এগিয়ে যাও, ভারতমাতা অন্তত এমনি হাজার হাজার প্রাণ বলি চান, মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।

সাত টাকা মাইনের কেরানীকে চায় না কেউ। পরান্নভোজী ভূতনাথ। এতদিন কলকাতায় এসে কী দেখেছে সে? মানুষ দেখেছে ক'টা! বড়বাড়ির মানুষগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ওদের গায়ে কোনো ছোঁয়াচ লাগে না। সমস্ত ঘরগুলোর ভেতরে ঢুকলে যেন অশান্তির আবহাওয়ায় দম আটকে আসে। বৌঠান বলেছিল—অবাক বাড়ি এটা, বড় অবাক বাড়ি।

অবাক বাড়িই এটা সত্যি। সেদিন বদরিকাবাবুর কাছ থেকে এই কথাই শুনেছিল ভূতনাথ।

ডান পাশের ঘরটা খাজাঞ্চিখানা আর বাঁ দিকের বড় ঘরখানা খালি পড়ে থাকে।

দরজাটা খোলা ছিল বুঝি। চিৎ হয়ে তক্তপোশের ওপর কে যেন শুয়ে ছিল। অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে শব্দ এল—কে যায়?

—আমি।

'আমি' বলে চলে আসছিল ভূতনাথ। কিন্তু আবার যেন ডাক এল—শুনে যাও, শুনে যাও হে ছোকরা।

আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকেছিল ভূতনাথ। ঘরে ঢুকে দেখলে—একটা তুলোর জামা-গায়ে মোটাসোটা বৃদ্ধ মানুষ। ভূতনাথকে দেখে উঠে বসলো। বংশীর কাছে শুনেছিল এর কথা, এরই নাম বদরিকাবাবু।

বংশী বলেছিল—ওদিকে যাবেন না বাবু, ঘড়িবাবু দেখলেই ডাকবে—ওই ভয়ে কেউ যায় না।

—কিন্তু ভয়টা কিসের?

—বসো এখানে।

ভূতনাথ বসলো।

—নাম কী তোমার?

শুধু নাম নয়। বাবার নাম। জাতি। কর্ম! নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিলেন। সব শুনে বললেন—ভালো করোনি ছোকরা, গেঁজে যাবে।

ভূতনাথ কিছু বুঝতে পারলে না।

—হ্যাঁ, গেঁজে যাবে। বদরিকাবাবু মিছে কথা বলে না হে! যদি ভালো চাও পালাও এখনি,

নইলে গেঁজে যাবে! মুর্শিদকুলি খাঁ'র আমল থেকে সব দেখে আসছি। লর্ড ক্লাইভকে দেখলুম, সিরাজউদ্দৌল্লাকে দেখলুম, এই কলকাতার পত্তন দেখলুম—হালসী বাগান দেখলুম। শেষটুকু দেখবার জন্য এই ট্যাকঘড়ি নিয়ে বসে আছি সময় মিলিয়ে নেবো বলে। তারপর দেয়ালের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন—ওই দেখো, তাকিয়ে দেখো—সব কুষ্ঠি-ঠিকুজি সাজানো রয়েছে, সব বিচার করে দেখেছি—মিলতে বাধ্য।

ভূতনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে—দেয়ালের গায়ে আলমারিতে সাজানো সার সার বই সব। মোটা মোটা বই-এর মিছিল। সোনালী জলে লেখা নাম-ধাম।

—সব বিচার করে দেখেছি—মিলতে বাধ্য। যদি না মেলে তো আমার ট্যাকঘড়ি মিথ্যে। কেল্লার তোপের সঙ্গে রোজ মিলোই ভাই—একটি সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হবার জো নেই। বলে ট্যাক থেকে বার করলেন ঘড়িটা। মস্ত গোলাকার ঘড়ি। ঝকচক করছে। ঘড়িটাকে নিয়ে কানে একবার লাগিয়ে আবার ট্যাকে রেখে দিলেন। বললেন—১৩৪৫ সালে তৈরি আর এটা হলো গিয়ে ১৮৯৭। পাঁচশ' বাহান্ন বছর ধরে ওই একই কথা বলছে ঘড়িটা।

ভূতনাথ মুখ খুললে এবার। বললে—কী বলছে?

—বলছে, সব লাল হয়ে যাবে।

—লাল?

—হ্যাঁ, নীল নয়, সবুজ নয়, হল্‌দে নয়, শুধু লাল। দিল্লীর বাদশা বুঝেছিল, রণজিৎ সিং বুঝেছিল, সিরাজউদ্দৌল্লা, আলিবর্দি খাঁ, জগৎ শেঠ, মীরজাফর, রামমোহন, বঙ্কিম চাটুজ্জে সবাই বুঝেছে শুধু 'বঙ্গবাসী' বুঝলে না।

—বঙ্গবাসী?

—খবরের কাগজ পড়িস না? নইলে ওই লোকটাকে, ওই বিবেকানন্দকে বলে গরুখোর, মুরগীখোর? নইলে সাতশ' বছর মোছলমান রাজত্বে ছ'কোটি মোছলমান হয় আর একশ' বছর ইংরেজ রাজত্বে ছত্রিশ লক্ষ লোক খৃস্টান হয়। ও কি ওমনি-ওমনি? নেমকহারামির গুনোগার দিতে হবে না? পালা এখান থেকে—ভালো চাস তো পালিয়ে যা, নইলে গেঁজে যাবি, আর যদি না যাস তো মর এখানে। যখন এই বড়বাড়ি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে, শাবল গাঁইতি নিয়ে বাড়ি ভাঙবে কুলী-মজুররা, তখন কড়িকাঠ চাপা পড়বি, পাঁচশ' বছরের ঘড়ি দিনরাত এই এক কথা বলছে, আমি শুনি আর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকি।

এ এক অদ্ভুত লোক। ভূতনাথ সাইকেল চড়ে চলতে চলতে ভাবে সে এক অদ্ভুত লোক দেখেছিল জীবনে। সারা জীবন শুধু স্থবিরের মতো শুয়ে শুয়ে বিড় বিড় করে ভাবতো। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ কেমন করে সেই উন্মাদ লোকটার মস্তিষ্কে আবির্ভাব হয়েছিল কে জানে?

অনেকদিন ভূতনাথ ভেবেছে, ঘড়িবাবুর কোথায় যেন একটা ক্ষত আছে। বাইরে থেকে দেখা যায় না। বংশী বলে—এই বাড়িতে যত ঘড়ি দেখছেন, সব ওই বদরিকাবাবুর জিম্মায়। দম দেন উনি, আর ন'টার সময় কেল্লার তোপের সঙ্গে ট্যাকঘড়িটা মিলিয়ে নেন।

সে অনেক কালের কথা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

দিল্লীর বাদশার কাছে রাজস্ব পৌঁছে দিতে যাবে জবরদস্ত নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। দর্পনারায়ণ মিত্র তখন তাঁর প্রধান কানুনগো। তাঁর সই চাই, নইলে বাদশা'র সরকারে রাজস্ব অগ্রাহ্য হবে। জমিদারদের রক্তচোষা টাকায় তখন মাটিতে পা পড়ে না মুর্শিদকুলি খাঁ'র। একদিন খাজনা দিতে দেরি হলে জমিদারদের 'বৈকুণ্ঠ' লাভ। বৈকুণ্ঠ নরকের চেয়েও যন্ত্রণাকর।

দর্পনারায়ণ বেঁকে বসলেন। বললেন—তিন লক্ষ টাকা চাই, তবে সই দেবো।

মুর্শিদকুলি সোজা লোক নন। বললেন—একটা সই দিয়ে দাও, ফিরে এসে টাকা তোমায় দেবো।

দর্পনারায়ণও সোজা লোক নন। বললেন—তবে সইও পরে দেবো।

শেষ পর্যন্ত মুর্শিদকুলি খাঁ সই না নিয়েই চলে গেলেন দিল্লী। সেখানে গিয়ে আমীর

ওম্‌রাহদের ঘুষ দিয়ে কার্য সমাধা করলেন। কিন্তু অপমান ভুললেন না। ফিরে এসে তহবিল তছরূপের দায়ে জেলে পুরলেন দর্পনারায়ণকে। সেই জেলের মধ্যেই না খেতে পেয়ে মারা গেলেন দর্পনারায়ণ। ইতিহাস ভুলে গেল তাঁকে।

সেই দর্পনারায়ণের শেষ বংশধর বদরিকাবাবু আজ বড়বাড়ীর ঘরে ঘরে ঘড়িতে দম দিয়ে বেড়ান। বোধ হয় ঘড়ির টিকটিক শব্দের সঙ্গে তাল রেখে কালের পদধ্বনি শোনেন।

তারপর কতকাল কত পুরুষ পার হয়ে গিয়েছে। কোথায় গেল নাজির আহম্মদ আর কোথায় গেল রেজা খাঁ! কোথায় গেল মধুমতী তীরের সীতারাম, আর ফৌজদার আবুতোরাপ! নেই পীর খাঁ, নেই বক্স আলী। এক এক পুরুষের পর আর-এক পুরুষ উঠেছে আর শেষ হয়েছে। কিন্তু দর্পনারায়ণের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি আজও। সে-বংশ এবার নির্বংশ হতে চললো। তবুও বড়বাড়ির বৈঠকখানা ঘরটার ভেতরে বসে দুর্বল বদরিকাবাবু ইতিহাস পড়েন, আর অভিশাপ দেন। অভিশাপ দেন সমস্ত পৃথিবীকে। যে-পৃথিবী অত্যাচার করে, অন্যায় করে, মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয় না। যে-পৃথিবী শুধু টাকার গর্ব করে। সেই সামন্ত-সভ্যতার শিরে প্রতি মুহূর্তে দুর্বল আঘাত হেনে হেনে একটি দুর্বলতর মানুষ শুধু আরও দুর্বল হয়ে যায়।

বলেন—ঘড়ি বলছে—সব লাল হয়ে যাবে—দেখিস—

পাঁচশ' বাহান্ন বছর আগের সৃষ্টি যন্ত্রযুগের প্রথম দান ঘড়ি। ঘড়ির মধ্যেই যেন যন্ত্রসভ্যতার সমস্ত বাণী সঙ্কুচিত হয়ে আছে। ও বলছে—কিছুই থাকবে না। সব লাল হয়ে যাবে। অমৃতের পুত্র মানুষ, মানুষের জয় হবেই।

বদরিকাবাবু বলেন—একদিন দেখবি তুই, জয় হবেই আমাদের, আমি হয় তো সেদিন থাকবো না—এই বড়বাড়ি থাকবে না, এই মেজবাবু, ছোটবাবু তুমি আমি কেউ থাকবো না—এই ছোটলাট, বড়লাট, ইংরেজ রাজত্ব, কেউ নয়—কিন্তু আমার কথা মিথ্যে হবে না, দেখে নিস।

শীতের মধ্যে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ভূতনাথ চলছিল।

রাস্তার দু'পাশের দোকানপাট সব বন্ধ। অন্ধকার ভালো করে কাটেনি। চারদিকে শুধু ধুলো আর ময়লার গন্ধ। অন্ধকারে চলতে চলতে ভূতনাথের কেবল মনে হয়েছিল, বদরিকাবাবু পাগল হোক কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণী যেন সত্য হয়।

শেয়ালদা স্টেশনের সামনে বেশ ভিড় জমেছে। আবছা অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না মুখ। তবু ব্রজরাখালকে খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলো। এক-এক জায়গায় দল বেঁধে জটলা করছে লোকজন। বেশির ভাগ যেন ছেলের দল। চারদিকে প্রতীক্ষমান মানুষ। এই দেশেরই এক ছেলে মহাবাণী বহন করে নিয়ে আসছে। যে বলেছে—জগতের একটা লোকও যতদিন অভুক্ত থাকবে, ততদিন পৃথিবীর সমস্ত লোকই অপরাধী। যে বলেছে—'আজ হতে সমস্ত পতাকায় লিখে নাও—যুদ্ধ নয়, সাহায্য—ভেদ-বিবাদ নয়, সামঞ্জস্য আর শান্তি।' যে বলেছে—'তোমরা পাপী নও, অমৃতের সন্তান, পৃথিবীতে পাপ বলে কিছুই নেই, যদি থাকে তবে মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ। তুমি সর্বশক্তিমান আত্মা, শুদ্ধ, মুক্ত মহান। ওঠো জাগো—স্ব-স্বরূপ বিকাশ করতে চেষ্টা করো, উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ক্রমে ভোর হলো। আরো ভিড় জমলো। ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে দেখলে সমস্ত শেয়ালদা স্টেশনের আশেপাশে শুধু মানুষের মাথা। এরা কোথায় ছিল এতদিন! কারা এরা? এরাও কি বিবেকানন্দর ভক্ত ব্রজরাখালের মতন?

হঠাৎ জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেল। চিৎকার উঠলো—জয়—রামকৃষ্ণদেব কী জয়—জয় বিবেকানন্দ স্বামীজি কী জয়!

ভিড়ের স্রোতের সঙ্গে ভূতনাথ ঢুকলো স্টেশনে।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। বিপুল জনতা ঘন ঘন মহামানবের জয় ঘোষণা করছে। তারপর সেই অসংখ্য জন-সমুদ্রের কেন্দ্রে আর-এক দিব্যপুরুষের আবির্ভাব হলো। মাথায় বিরাট গেরুয়া পাগড়ী, গেরুয়ায় ভূষিত সর্বাঙ্গ। দুই চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। ভূতনাথের মনে হলো—মানবের

সমাজে যেন এক মহামানব এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত ভারতবর্ষের আত্মা মথিত করে নবজন্ম গ্রহণ করলো যেন এক অনাদি পুরুষ। হিমালয়ের ভারতবর্ষ, বৈদিক ভারতবর্ষ, উপনিষদের ভারতবর্ষ, আজ যেন নরদেবতার রূপ নিয়েছে। মানুষ বুঝি অমৃতের সন্তান হয়ে আবার জন্মগ্রহণ করলো। ভূতনাথের মনে হলো—*যেন শেয়ালদা স্টেশনের স্বল্পপরিসর প্ল্যাটফরম এটা নয়। অশ্রান্ত-কল্লোল* বারিধির বুকে বুঝি প্রথম জেগেছে একখণ্ড ভূমি। হিমালয়ের শীর্ষ জেগে উঠেছে বুঝি মহাসম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে। এইবার জন্ম হবে মানুষের। নতুন মানুষের হৃদস্পন্দনের মধ্যে ধ্বনিত হবে সেই আদি প্রশ্ন—কে আমি? কোথা থেকে আমি এলাম? তারপর গ্রহ নক্ষত্র সূর্য পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত স্তব্ধ করে এক মহাবাণী উচ্চারিত হবে আবার। আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে নতুন পৃথিবীর। নতুন মানুষ আর-এক নতুন উত্তর পাবে মহামানবের মহাবাণীর মধ্যে। মানুষ অমৃত, মানুষ আর কেউ নয়। মানুষ অমৃতস্য পুত্রাঃ—মানুষ অমৃতের সন্তান।

ঠিক এ কথাগুলোই যে বর্ণে বর্ণে সেদিন মনে হয়েছিল তা নয়। কিন্তু পরে যখন অনেক শিখে, অনেক পড়ে তার মনের তৃতীয় নয়ন খুলে গিয়েছিল, তখন সে ভেবেছে তার অপরিণত মনের কল্পদৃষ্টিতে সেদিন তার এমনি ভাবনা হওয়াই উচিত ছিল।

জনস্রোত ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে। ভূতনাথও মন্ত্রচালিতের মতো জনতাকে অনুসরণ করে এল। বাইরেও এক বিপুল জনসমুদ্র, কিন্তু প্রতীক্ষায় অস্থির অশান্ত।

ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন মহামানব। চারঘোড়ার গাড়ি।

হঠাৎ ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঘোড়াগুলোকে খুলে দিলে তারা। তাদের উপাস্যকে তারা নিজেরা বহন করবে। স্বামীজিকে তারা মাথায় তুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তাদের অন্তরের উৎস আজ অবারিত। জয়, স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়!

শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে সেই উল্লাসধ্বনিতে সমস্ত শহর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে গাড়ি গিয়ে হাজির হলো একটা গলির সামনে। রিপন কলেজের ভেতর স্বামীজিকে কিছু বলতে হবে। অন্তত একটু বিশ্রাম। অন্তত তারা সবাই দু'চোখ ভরে দেখবে কিছুক্ষণ।

হঠাৎ মনে হলো, যেন ব্রজরাখালকে দেখা গেল এক মুহূর্তের জন্যে। তাড়াতাড়ি ভূতনাথ ভিড় সরিয়ে কাছে যাবার চেষ্টা করতেই আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ব্রজরাখাল। এ-দিক ও-দিক কোথাও আর দেখা পাওয়া গেল না তার। কিন্তু হঠাৎ এক আশ্চর্য উপায়ে দেখা হয়ে গেল আর-একজনের সঙ্গে। আবার এতদিন পরে এমনভাবে দেখা হবে ভাবা যায়নি।

ননীলাল। ননীলালও চিনে ফেলেছে। বললে—তুই? তুই এখানে?

প্রথমটা যেন বিশ্বাস হয় না। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। কী এক অদ্ভুত চেতনা! ননীলালের সে চেহারা আর নেই। সেই কেষ্টগঞ্জের স্কুলের সহপাঠী, ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীলাল। এর দেখা পাওয়ার জন্যে কী কষ্টই না একদিন স্বীকার করেছে ভূতনাথ। ননীলাল সিগারেট টানছে। ছোট-বড় চুল। গোঁফ দাড়ি উঠেছে।

—তারপর?

—এখানে কী করতে? স্বামীজিকে দেখতে?

—দূর, ও-সব দেখার সময় নেই আমার। বলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে লম্বা করে। তারপর বললে—যত সব বুজরুকি—

একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগলো ননীলালের কথায়। কিন্তু কিছু বলতে পারলে না। তারপর জিজ্ঞেস করলে—কী করছিস এখন?

—বি-এ পাশ করেছি। এবার ল' পড়ছি—তুই?

—আমার পড়াশোনা হলো না, পিসীমা মারা গেল। এখানে আমার ভগ্নীপতি থাকে। তার কাছেই আছি, একটা ভালো চাকরি পেলে করি, ঘোরাঘুরি করছি।

—চল, চা খাস তো?

—না, এখনও ধরিনি।

—এখনও পাড়াগেঁয়েই রয়ে গেলি—বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো ননীলাল। ননীলালের গা থেকে এসেন্সের গন্ধ এসে নাকে লাগছে। সুন্দর জামাকাপড় পরেছে। ননীলালের কাছে নিজেকে যেন বড় বেশি দরিদ্র বলে মনে হলো আবার। কিন্তু কেন কে জানে, ভূতনাথের মনে হলো—ননীলাল যেন আগেকার মতন নেই। সেই আগেকার ননীলালই যেন ছিল ভালো। এখন যেন চোখে কালি পড়েছে। চোখের সে জ্যোতি কোথায় গেল তার? যেন অনেক বয়েস বেড়ে গিয়েছে তার এই ক'বছরের মধ্যেই।

—চা না খাস তো অন্য কিছু খা।

একটা দোকানের সামনে এসে ভূতনাথকে নিয়ে ঢুকলো ভেতরে।

—ডিম খাস?

—হাঁসের ডিম তো?

—কলকাতা শহরে এসে এখনও তোর বামনাই গেল না—ইয়ং বেঙ্গল আমরা, এই করে করে দেশটা গেল, গায়ে শক্তি হবে কী করে? বিফ্ খায় বলেই তো সাহেবরা অত দূর দেশ থেকে এদেশে এসে রাজত্ব করতে পেরেছে—আর তোরা পৈতে টিকি নিয়ে তাদের গোলামি করে মরছিস, ছাড় ও-সব, আমার সঙ্গে দু'দিন থাক, মানুষ করে দেবো তোকে—তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরালে ননীলাল। বললে—আছিস কোথায় বললি?

—বৌবাজারে, বড়বাড়িতে।

—চৌধুরীদের বাড়ি? তা ওদের ওখানে আছিস, ওরা তো জমিদার, শুনেছি ও-বাড়ির বৌগুলো খুব সুন্দরী, না?

—তুই জানলি কেমন করে?

কেমন একটা রহস্যময় হাসি হাসলো ননীলাল। বললে—রূপ আর পারা কখনও চাপা থাকে রে?

কী জানি কেন, ভূতনাথের মনে হলো—সেই ননীলালের এমন পরিবর্তন হওয়া উচিত হয়নি যেন।

ননী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আরম্ভ করলে—চূড়োমণিকে চিনিস, যার নাম ছুটুক? ওই তো আমার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল রে। দু'বার ফেল করে এখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে—তা বাড়ির ঝি-টি কাউকে আর বাদ দেয়নি। শেষে একদিন অসুখ হলো কিন্তু মিথ্যে বলবো না ভাই, বহু টাকা খরচ করেছে আমাদের জন্যে—এখন দেখা হয় না বটে, কিন্তু রোগ হবার পর থেকে... রোগটা সেরেছে?

রোগ? ভূতনাথ কিছু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কী রোগ?

ননীলালের মুখে রোগের নামটা শুনে শিউরে উঠলো ভূতনাথ। ননীলাল কেমন বেপরোয়াভাবে রোগের নাম উচ্চারণ করে গেল, যেন ম্যালেরিয়া কিম্বা পালাজ্বর। ও-রোগ ভদ্রলোকদের হয় ভূতনাথের জানা ছিল না।

ননীলাল সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বললে—হবে না রোগ? চেহারাটা দেখেছিস তো—আগে আরো লাল টুকটুকে ছিল, ক্লাশে বসে আমরা ওর গাল টিপে দিতুম; তা আজকাল কত রকম ওষুধ বেরোচ্ছে, ডাক্তার-ফাক্তার কাউকে দেখালে না, একদিন সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ বেরোলো—শেষে একদিন আর হাঁটতে পারে না। আর একটা সন্দেশ নিবি?

—না।

—তা সেই অসুখের সময় গিয়েছিলুম ওদের বাড়িতে। অনেক চেষ্টা করেছিলুম ভাই দেখতে—কিন্তু এমন আঁটা বাড়ি, কিচ্ছু দেখা গেল না, যারা ঘন ঘন যেতো, তারা বলতো—ওর কাকীদের নাকি পরীর মতন দেখতে—দেখেছিস তুই?

ভূতনাথ উত্তরটা এড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে বললে—দেখেছি, পরীদের মতো তো নয়।

—পরীদের মতো নয়, তবে কীসের মতন?

ভূতনাথ যেন কী ভাবলে। তারপর বললে—জগদ্ধাত্রীর মতন।

ননীলাল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুই আবার এত ভক্ত হয়ে উঠলি কবে?

ভূতনাথ বললে—পরী তো দেখিনি কখনও জগদ্ধাত্রী দেখেছি যে।

—জগদ্ধাত্রী কোথায় দেখলি?

—কেন, পটের ছবিতে।

—পরীর ছবি দেখিসনি?

পরীর ছবি কোথাও দেখেছে কিনা ভাবতে লাগলো ভূতনাথ। ননীলাল বললে—পরী যদি দেখতে চাস তো দেখাবো তোকে—আমার বিন্দী যাকে বলে ডানা-কাটা পরী।

—বিন্দী কে?

—আজ বিন্দীর বাড়ি যাবি? চল তোকে পরী দেখিয়ে নিয়ে আসি। ছুটুক ওকে দেখে এক রাতে পাঁচশ' টাকা খরচ করে ফেলেছিল—শেষে বিন্দী ওরই মুঠোর মধ্যে চলে যেতো, কিন্তু আমার বাবাও তখন তিপ্পান্ন হাজার টাকা রেখে মারা গিয়েছে—আমাকে পায় কে?

—বাবা মারা গিয়েছেন তোর?

বাবার মৃত্যুর সংবাদ এমন করে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে কেউ পারে, এ-যেন ভূতনাথ বিশ্বাস করতে পারে না।

—বাবা মারা গিয়েছে বলেই তো বেঁচে গেলুম ভাই, নইলে কি ছুটুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? ওরা কি কম বড়লোক। ওরা হলো সুখচরের জমিদার বংশ, প্রজা-ঠেঙানো পয়সা, এখানে বসে কর্তারা শুধু মেয়েমানুষ নিয়ে ওড়ায়—ওঁদের সঙ্গে তুলনা? ছোটবেলায় ওর কাকীমা'র পুতুলের বিয়েতে কত নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। তা এখন শুনতে পাই চূড়ামণি নাকি বাড়িতেই আড্ডা বসিয়েছে, গান বাজনা নিয়ে থাকে, আর একটু একটু মালটাল খায়, কিন্তু রক্তের দোষ ওদের যাবে কোথায়, তোকে বলে রাখছি ভূতো, তুই দেখে নিস, চূড়ামণির ও অভ্যেস-দোষ যাবে না, অমৃতে কখনও অরুচি হয় ভাই?

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো ননীলাল। ননীলাল তো আগে এমন কথা বলতো না। বিশেষ মুখচোরা লাজুক ছেলে ছিল। কেমন করে এমন হলো কে জানে!

ননীলাল আবার বলতে লাগলো—তা আমার এখন শুধু একটা সাধ আছে ভাই, তোকে বলেই ফেলি, একটা বেশ বড়লোক গোছের লোকের মেয়েকে যদি বিয়ে করে ফেলতে পারি, তো আর কাউকে ভয় করি না আমি। বাবার টাকাগুলো সব ফুরিয়ে এল কিনা—তোদের ও-পাড়ার দিকে আছে কোনো সন্ধান?

সেদিন যতক্ষণ ননীলালের সঙ্গে গল্প করেছিল ভূতনাথ, ততক্ষণই কেবল অবাক হয়ে ভেবেছিল। কই ব্রজরাখালও তো রয়েছে এখানে। স্বামী বিবেকানন্দর চার ঘোড়ার গাড়ি যারা কাঁধে করে টেনে নিয়ে গেল, যারা গলা ফাটিয়ে 'বিবেকানন্দ স্বামীজি কী জয়' স্টেশনে মহাপুরুষকে দেখবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, তারা তবে কারা? তারাও কি বাঙলা দেশের ছেলে? কলকাতার ছেলে? তারাও কি ননীলালের ক্লাশফ্রেণ্ড? তারা কি তবে ছুটুকবাবু কিম্বা ননীলালের মতন নয়? তাদের জাত কি আলাদা?

যাবার সময় ননীলাল বললে—সন্ধ্যেবেলা হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে থাকবো, ঠিক আসিস—বিন্দীর বাড়ি যাবো, বুঝলি? আর ছুটুককে যেন আমার কথা বলিসনি।

ভূতনাথ বললে—কেন?

—পরে বলবো তোকে—এখন আবার ক্লাশ আছে আমার।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, যার হাতের ছোঁয়া লাগলে একদিন ভূতনাথের শরীরে রোমাঞ্চ হতো,

যাকে দেখবার জন্যে ছুটির দিনেও কত ছুতো করে সাত মাইল হেঁটে গিয়েছে ইস্কুল পর্যন্ত, সেই ননীলাল!

বাড়িতে গিয়ে ভূতনাথ নিজের বাক্সটা খুললে। অনেক পুরনো জিনিস জমে আছে ভেতরে। পিসীমা'র হরিনামের মালা একটা। পুরনো মনি-অর্ডারের রসিদ কয়েকটা। দেশের বাড়ির সদর-দরজার চাবি, তারই মধ্যে থেকে একটা চিঠি বেরোলো। বহুদিন আগের ননীলালের লেখা। সেখানা খুলে ভূতনাথ আবার পড়তে লাগলো।

'প্রিয় ভূতনাথ,

আমরা গত শনিবার দিন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা বেশ বড় দেশ, কী যে চমৎকার দেশ বলিতে পারিব না। এখানে আসিয়া অবধি বাবার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বড় বড় বাড়ি আর বড় বড় রাস্তা। খুব আনন্দ করিতেছি। তোমাদের কথা মনে পড়ে। তুমি কেমন আছ জানাইও। উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও—'

পড়তে পড়তে সেদিনকার ননীলালের সঙ্গে আজকের দেখা ননীলালের তুলনা করে দেখলে ভূতনাথ। কিন্তু কেন এমন হলো! একবার মনে হলো দরকার নেই, চিঠিটা ছিঁড়েই ফেলে। কিন্তু আবার বাক্সের ভেতরে রেখে দিলে সে। থাক। সে ননীলাল হয়তো সত্যিই মরে গিয়েছে। কিন্তু শৈশবের সে-ননীলালের স্মৃতি যেন অক্ষয় হয়ে থাকে সারাজীবন।

ভোরবেলাই বংশী এসেছে। বললে—শালাবাবু, আপনাকে কাল রাত্তিরে দু'বার খুঁজে গিয়েছি, ছোটমা পাঠিয়েছিল দেখতে।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি 'মোহিনী-সিঁদুরের' কৌটোটা প্যাকেটে পুরে বংশীর হাতে দিয়ে বললে—এটা গিয়ে বৌঠানকে দাও, আর—আর এই টাকা ক'টাও দিয়ে দিও।

বংশী বললে—ছোটমা বলেছে, আপনাকে নিয়ে যেতে। আজ ভোরবেলাই যে চিন্তাকে পাঠিয়েছিল আবার।

সকালবেলা। এখন আপিসে যাবার তাড়া, অনেক কাজ বাকি, ব্রজরাখাল ক'দিন বাড়িতে আসছে না। মেতে আছে গুরু-ভাইদের নিয়ে। রান্নাবান্নার দিকটা একটু দেখতে হবে। রাত্রে রান্না করা হয়েছিল। তার বাসনগুলো মাজতে হবে। রাত্রের খাওয়ার জন্যে বাজারেও একবার যাওয়ার দরকার।

ভূতনাথ বললে—তাহলে আজ রাত্রে তুই আসিস, আমি নিজে গিয়ে বৌঠানকে দিয়ে আসবো'খন।

বংশী চলে গেল কিন্তু আপিসে যাবার পথে মনে পড়লো—সন্ধ্যেবেলা তো ননীলালের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে তার। হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে যে সে।

একবার মনে হলো যাবে না সে। আর কিসের সম্পর্ক তার ননীলালের সঙ্গে? ননীলালের কাছ থেকে আর কিছু আশা রাখে না সে।

আপিসে যেতে পাঠকজী হাসতে হাসতে এল। সেলাম করলো।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—অত হাসিমুখ কেন পাঠকজী?

লম্বা পাঞ্জাবী পরা ফলাহারী পাঠক এখনও বুঝি কুস্তি করে। ভারী জোয়ান চেহারা। পরিশ্রমে কাবু হয় না, হনুমানজীর ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছে জীবনের। গোঁফে তা দেয়।

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—মাইনে বাড়ালো নাকি পাঠকজী তোমার?

পাঠকজী বলেছে—যতদিন দিদিমণি থাকবে বাড়িতে, ততদিন তার মাইনে বাড়বার কোনো আশা নেই। তারপর বলে—লেকিন হনুমানজী রাখে তো মারে কৌন, কেরানীবাবু?

পাঠকজীর বয়স বেশি নয়। কিন্তু প্রচুর স্বাস্থ্যের জন্যে একটু বেশি বয়স দেখায়। কারখানায়

বসে প্যাকেট তৈরি করে আর ভজন গায় আপন মনে। বেপরোয়া মানুষ। কত কেরানীবাবু এ-বাড়িতে এল গেল, পাঠকজী কিন্তু হনুমানজীর কৃপায় এখনও টিকে আছে। কেন যে টিকে আছে কে জানে।

পাঠকজীকে জিজ্ঞাসা করলে বলে—সব হনুমানজীর কিরপা হুজুর!

লোকটা হনুমানজীর কথা বলে বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুখেই ওর যত ভক্তি। ভূতনাথের কতদিন সন্দেহ হয়েছে, আপিস থেকে যেন চুরিটা চামারিটা করে। এখানে বউ নেই। বলে বিয়ে করেনি। আসলে বিয়ে করেছিল বউ মারা গিয়েছে। খবর পেয়েছে ভূতনাথ। এই বাড়ির এক কোণে একটা ছোট ঘরে রান্না করে আর রাত্রে সেখানেই শুয়ে থাকে। এ-বাড়ির অনেক দিনের লোক।

—তা হাসি কেন অত পাঠকজী?

এবার হাসির কারণটা প্রকাশ করে বললে পাঠক। পাঠকও তা হলে খবর পেয়েছে। ফলাহারীব মনে হয়েছে—দিদিমণির বিয়ের পর শ্বশুরঘরে তো চলে যাবে দিদিমণি, তখন বাবুকে বলে মাইনেটা বাড়িয়ে নেবে সে। বাবু তো লোক ভালো।

ভূতনাথও কিছু বললে না। দরকার নেই প্রকাশ করে দিয়ে। আশা থাকা ভালো।

—আপনারও ভালো হবে কেরানীবাবু, দেখবেন।

কে জানে—হয়তো সত্যি। পাঠকজী এতদিন ধরে দেখছে—ও হয় তো ঠিকই চিনেছে জবাকে। কিন্তু ভূতনাথের কিছুতেই মাথায় আসে না ব্যাপারটা। রহস্যময়ী মনে হয় জবাকে, যেন পাঠকজীর কথাটাও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অমন যার বাবা। মাকেও যে ভালো বলেই মনে হয়। অন্তত পাগল হবার আগে জবার মতন অমন অস্থির প্রকৃতির নিশ্চয়ই ছিল না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কেমন ধীর-স্থির। আবেগ আছে কিন্তু অবিবেচক নয়। শুধু জবার বেলাতেই একটু অন্ধ। অথচ জবা যেন বাড়ির কাউকেই মানুষ বলে মনেই করে না। যেন তারা সবাই জবারই কর্মচারী। ইচ্ছে করলে জবা তাদের বরখাস্ত করতে পারে। একটু যেন বেশি সংসারী। হিসেবী, কে-কোথায় ফাঁকি দিচ্ছে, সেদিকে যেন গোপনে দৃষ্টিও রাখে। কথায় ঝাল মেশানো। ভূতনাথ ভেবে দেখলে—তার জানাশোনা কোনো মেয়ের সঙ্গেই জবার যেন কোনো মিল নেই। রাধা ছিল সরল সাদাসিধে। ব্রজরাখালের স্ত্রী হয়েও সে যে নন্দজ্যাঠার মেয়ে, তা সে ভোলেনি। আর আন্না—সে ছিল ছেলেমানুষ। গাছে উঠতেও যেমন, আবার সই-এর বিয়ের বাসর জাগতেও তেমনি। আর হরিদাসী ছিল ছোটবেলা থেকেই গিন্নী। বিয়ে হবার আগেই যেন সে স্ত্রী হয়ে গিয়েছে। আর বৌঠান? পটেশ্বরী বৌঠানের সঙ্গে মাত্র একদিনের আলাপ। কিন্তু তার সম্বন্ধে এত শুনেছে—যেন তার সব জানা হয়ে গিয়েছে। বৌঠান তো ভূতনাথের চেয়ে বয়েসে কিছু ছোট, কিন্তু তবু যেন সামনে গেলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ভালো লাগে। মনে হয় মাথাটা ঠেকিয়ে রাখে আলতাপরা পা-জোড়ার ওপর। বৌঠান যেন একাধারে সব। মা হয়নি বৌঠান, কিন্তু মা হলেই যেন মানাতো। স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি বৌঠান, কিন্তু ছোটবাবু চাইলেও যেন তাকে সহধর্মিণী করে নিতে পারবেন না—বৌঠান যেন ব্যক্তিত্বে ছোটবাবুর চেয়েও উঁচুতে। আর এ-বাড়ির জবা! জবা সত্যিই রহস্যময়ী। ধরা সে দেয় না, কিন্তু কেউ ধরে এটাই যেন সে চায়। কিন্তু নিজের আভিজাত্য যেন সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছে। স্নেহ-মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রেম-ভালোবাসা সমস্ত তার কাছে গৌণ।

কাজ করতে করতে সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা জরুরী কাগজ নিয়ে ওপরে যেতে হলো ভূতনাথকে। সুবিনয়বাবুর সই দরকার। সিঁড়িতে উঠে ডান দিকে হলের মধ্যে যাবার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। ওপাশেই সুবিনয়বাবুর সঙ্গে জবার কথা হচ্ছে। খানিকটা কানে আসতেই ভূতনাথ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সুবিনয়বাবু বলছেন—তুমি পছন্দ করেছো—আমি এতে কী বলবো মা।

জবা বলছে—তবু আপনি একবার বলুন আপনার অনুমতি আছে এ বিয়েতে।

—আমি তো কোনোদিন তোমার কোনো ইচ্ছেতে বাধা দিইনি মা, নিজে বরাবর বাবাকে দুঃখ দিয়েছি বলে—আমি চাইনে মা তোমার কোনো ইচ্ছেতে আমি বাধাস্বরূপ হই—আর তোমার মা যদি ভালো থাকতেন তো তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখতাম, কিন্তু তিনি তো এখন এ সংসারের বাইরে।

জবা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিন্তু আপনি তো দেখেছেন বাবা—আপনি তো চিনেছেন তাকে।

—শুধু একদিন নয়, ওরা আমাদের সমাজের পুরনো লোক—ওকে বিদ্বান বুদ্ধিমান আর খুব স্থিরবুদ্ধি বলে মনে হয়েছে আমার, ওর বাবাকে আমি বহুদিন থেকে চিনি। তোমার জন্মদিনে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে তুমি ঠিক মানুষটিকেই বেছে নিয়েছো বলে মনে করি—আমি আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখী হবে।

জবা বললে—কিন্তু কি জানি কেমন যেন ভয় করছে আমার। আমি আপনাকে ছেড়ে থাকবো কেমন করে?

—তুমি থাকবে মা আমার কাছে—তোমরা দু'জনেই থাকবে। নইলে এ-সব কে দেখবে, আমরা আর ক'দিন? উনি তো না-থাকার মধ্যে—আর আমি? যতদিন বেঁচে থাকি আমাকেও তোমরাই দেখবে—দেখবে না মা?

জবা চুপ করে রইল।

সুবিনয়বাবু বললেন—আর এই 'মোহিনী-সিঁদুর', ওটা যতদিন আছে থাক, তোমরা আজ-কালকার ছেলেমেয়ে, যদি ইচ্ছে হয় চালিও, আর যদি না চলে তবে ক্ষতিও নেই। তোমাদের জন্যে যথেষ্ট অর্থ রেখে যাবো মা—তোমাদের কোনোদিন উপার্জন করতে হবে না, তবে যদি পারো অন্য ব্যবসা করো—নতুন যুগ আসছে। আমি আর কিছু চাইনে, পরম গতিও চাই না, অষ্টসিদ্ধিও চাই না। সেই গানটা একবার গাইবে মা; অনেক দিন শুনিনি—জয়জয়ন্তীর ধ্রুপদ—নাথ! তুমি ব্রহ্ম তুমি নিত্য—

জবা একটু পরেই গান আরম্ভ করলে—

নাথ! তুমি ব্রহ্ম তুমি নিত্য
তুমি ঈশ তুমি মহেশ
তুমি আদি তুমি অন্ত,
তুমি অনাদি তুমি অশেষ

নিঃশব্দে ভূতনাথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তখনও জবার গান চলেছে। কাল সকালবেলা কাগজটা সই করালেই চলবে। টেবিল পরিষ্কার করে আরো খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে লাগলো ভূতনাথ। গানে সত্যিই যেন জবার তুলনা নেই। অন্তত এই একটা বিষয়ে সে যেন সকলের চেয়ে বড়।

রাস্তা দিয়ে সোজা আসতে আসতে একবার সময়টা আন্দাজ করলে। ননী হয়তো হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণ। বাঁ দিকের একটা গলি দিয়ে সোজা গেলেই হেদোর কোণটা পড়বে। ভূতনাথ হেদোর সামনে এসে দাঁড়াতেই চারপাশে নজর দিয়ে দেখলে। মনে হলো দক্ষিণ দিকের একটা আলোর নিচে যেন ননীলাল দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কাছে যেতেই ভুল ভাঙলো। ননীলাল নয়, অন্য লোক। অনেকটা যেন ভৈরববাবুর মতন দেখতে। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ভূতনাথ। তবে হয়তো তার দেরি দেখে চলেই গিয়েছে। ভালোই হয়েছে, ভূতনাথ রাস্তায় পা বাড়িয়েই ভাবলে ভালোই হয়েছে। দেখা হয়ে গেলে আর এক কাণ্ড হতো। হয়তো এড়াতে পারতো না।

আবার বড়বাড়ির দিকে ঘোরা পথ দিয়ে চলতে লাগলো ভূতনাথ। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। বৌঠানকে সিঁদুরটা দিতে হবে আজ। হঠাৎ পেছনে কে যেন ডাকলে—শালাবাবু—

অবাক হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ। এখানে এত রাত্রে কে তাকে ওই নামে ডাকবে? ভালো করে

দেখে ভূতনাথ বললে—শশী! তুই?

ছুটুকবাবুর চাকর—শশী! শশীর এ কী চেহারা হয়েছে! এত রাত্রে এখানে কেন? গানের আসর কি তবে বসছে না আজ?

শশী বললে—শালাবাবু, কিছু পয়সা দিতে পারেন?

পয়সা! পয়সা তো সঙ্গে নিয়ে আসেনি ভূতনাথ। বললে—পয়সা কি হবে? আর এত রাত্রে এখানে কেন তুই? ছুটুকবাবু কোথায়?

—আজ্ঞে ছুটুকবাবু তাড়িয়ে দিয়েছে আমায়।

শশীর চুল উস্কোখুস্কো। মনে হয় যেন অনেকদিন খায়নি। অথচ শশীর চুলের কী বাহার ছিল। ঢেউ-খেলানো চুলটার কী কসরৎ করতো। কাল-পরশুই যেন দেখেছে বড়বাড়িতে।

—কেন, তোকে তাড়িয়ে দিলে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে শশীও চলতে লাগলো। বললে—এতদিন ছুটুকবাবুর সেবা করলাম, আপনি তো দেখেছেন সব, গানের আসরে আমি না হলে চলতো না, রাত একটা দুটো পর্যন্ত আমি নিজের হাতে সিদ্ধি বেটেছি, গেলাস সাজিয়েছি, এখন আমার অসুখ হতেই তাড়িয়ে দিলে।

ভূতনাথ ভালো করে শশীর আপাদমস্তক দেখলে। রোগটা কী?

জিজ্ঞেস করলে—রোগটা কী তোর?

শশী শালাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—এই বামুনের পা ছুঁয়ে বলছি, মাইরি শালাবাবু, জগন্নাথের দিব্বি, আমার কোনো দোষ নেই, আমি বড়বাড়ির বাইরে একটা রাতও কাটাই না, নেশা-ভাঙটা পর্যন্ত করি না, আমার নামে মিছিমিছি দোষ দিয়েছে গিরি।

—গিরি!

—হ্যাঁ, মেজমা'র ঝি গিরি।

—সে কেন লাগবে তোর পেছনে?

—আপনি সব জানেন না শালাবাবু, গানের আসর যখন শেষ হয়, তখন কতদিন ঘুম পায় আমার, কিন্তু তখন গিরি আসে ছুটুকবাবুর ঘরে। ছুটুকবাবু তখন নেশায় অজ্ঞান থাকে, আমি হেন চাকর বলেই সব কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করি।

ভূতনাথ যেন কিছু বুঝতে পারলে। গিরির চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করলে ভূতনাথ। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে গিরির সেই লম্বা ঘোমটা টেনে দেওয়া। আর অসাক্ষাতে বাড়ির মধ্যে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করা। তারপর সেই প্রথম রাত্রে যেদিন সেই মধ্যরাত্রের অন্ধকারে ঝাপসা ছায়ামূর্তি।

শশী বললে—বংশীকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন শালাবাবু—ছুটুকবাবুর যখন অসুখ হয়েছিল এই শশী সেদিন কি সেবা করেছিল, ব্যথায় ছুটুকবাবু ছটফট করেছে, নিজের ছুঁচিবেয়ে মা পর্যন্ত কাছে মাড়ায়নি, এই শশীই সেদিন পুঁজ-রক্ত পরিষ্কার করে দিয়েছে, কাপড় সাফ করে দিয়েছে। বাবুদের বেলায় কোনো দোষ নেই—আর কিনা যত অশুদ্ধ চাকরদের বেলাতেই!

বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল হাঁটতে হাঁটতে।

শশী বললে—আর ওদিকে যাবো না হুজুর, মধুসূদন দেখতে পেলেই অনর্থ বাধাবে।

—মধুসূদন কী করবে তোর?

—আজ্ঞে, মধুসূদন কি কম লোক, বলে—চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবো এ তল্লাটে এলে—অথচ বুড়ো সব জানে, কার দোষ, কার দোষ নয়, সব জানে বুড়ো। একটা পয়সা নেই যে, দেশে চলে যাই।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই শশী চলে গেল।

বড়বাড়িতে ঢোকবার মুখে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল ভূতনাথের।

ভদ্রলোক সামনা-সামনি এসে বললেন—ব্রজরাখালবাবু এ বাড়িতে থাকেন?

ভূতনাথ বললে—হ্যাঁ।

—একবার ডেকে দেবেন তাঁকে, বড় দরকার।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে দেখে নিলে। আশে-পাশের দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করলে। তারপর এসে বললে—তিনি তো বাড়িতে নেই এখন—কিছু বলতে হবে?

ভদ্রলোক কেমন যেন অস্থিরভাবে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। বললেন—আজ তিন-চার দিন দেখা নেই তাঁর।—এখানে আছেন তো তিনি?

—আছেন এখানে, তবে সব দিন এখানে আসেন না রাত্রে—ভূতনাথ বললে।

—আজ যদি আসেন তো একটা খবর দেবেন তাঁকে, বলবেন, মেছোবাজারের সেই ফুলবালা দাসী, আজ দুপুর থেকে আবার ভেদবমি শুরু হয়েছে তার, একটা ওষুধ নিয়ে যেন যান আজ রাত্রেই... ব্রজরাখালবাবু আপনার কে হন?

—আমার ভগ্নীপতি।

ভদ্রলোক যেন খুব ব্যস্ত। বললেন—তাহলে এখন চলি আমি, বলবেন তাঁকে, ভুলবেন না যেন।

ভূতনাথ বললে—ফুলবালা দাসীর নাম করলেই চিনতে পারবেন তো তিনি?

ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—তা চিনবেন বৈকি! উনি আর শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই ফুলবালাকে পাদরীদের হাত থেকে বাঁচালেন, হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে দিলেন, সেই ফুলবালা আবার বিধবা হলো। একটা পয়সা ছিল না হাতে যে, নিজের পেটটা চালায়, ওই ব্রজরাখালবাবু না থাকলে ফুলবালা হয়তো দেখতেন কবে খৃস্টান হয়ে যেতো। নিজের পকেট থেকে মাসোহারা দিয়ে এতদিন চালাচ্ছেন—আর নামটা ভুলে যাবেন? আর যদিই চিনতে না পারে তো বলবেন কদম এসেছিল।

—কদম?

—হ্যাঁ, আমার নাম। আমার ডাক-নাম। আর পুরো নামটা যদি মনে থাকে তো বলবেন—যুবক সঙ্ঘের কদমকেশর বোস। তারপর যাবার সময় বললে—উনিই তো যুবক সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট কিনা!

হন হন করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। এতক্ষণে ভূতনাথ ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে, কামিজ গায়ে, অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ উঠেছে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না, তবু বেশি বয়স হয়নি যেন ভদ্রলোকের। লোকটি অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাবার পর ভূতনাথ বাড়ির ভেতর আবার ঢুকলো।

সেদিন আবার।

রাত হয়েছে বেশ। সেদিনও রাত্রে যথারীতি অন্দর মহলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সোজা তেতলায়। আগে আগে বংশী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে ভূতনাথ।

সদুর ঘরে তখনও টিম টিম করে আলো জ্বলছে। তরকারি কোটা শেষ করে তখন জানলার ধারে বসে পান সাজছে সদু। যদুর-মা অত রাতেও একমনে শিল-নোড়া নিয়ে বাটনা বেটে চলেছে। সদু পান সাজে আর বক বক করে বকে চলে—শীতের মরণ, শীতের ছিরি-ছাঁদ নেই, একটু তেল নেই যে, পায়ে দিই মা, পা ফেটে একেবারে রক্ত বেরোচ্ছে গা, ভোলার বাপ থাকতে পায়ের কি এই দশা ছিল? মিনসে মোলো আর কপাল পুড়লো আমার—মিনসে মরেছে তো হাড় জুড়িয়েচে, কিন্তু একটা মরা-হাজা ছেলে ছিল তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল গা—মিনসে বলতো—ফুলবউ—তিভুবনে কেউ কারো নয়।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই বাঁ দিকে কর্তাদের শোবার ঘর। এখন অন্ধকার। বারান্দায় মাদুর পেতে বসে বেণী তখন একমনে মেজবাবুর কাপড় কোঁচাচ্ছে। তারপর দোতলা

আর অন্দর-মহলের তেতলার মধ্যেকার পোলটা পেরিয়ে ওধারে যেতে হবে।

বংশী বললে—এখানে একটু দাঁড়ান শালাবাবু—দেখি বড়মা এখন রাস্তায় আছে কিনা।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বড়মা তখন নিজের ঘরে। বংশী ফিরে এসে বললে—আসুন।

একেবারে বরাবর ছোটমা'র ঘর। বংশী ভেতরে ঢুকে খবর দিলে। চিন্তা বেরিয়ে এল।

—যান, ভেতরে যান।

সেদিন বৌঠানকে যেমন দেখেছিল ভূতনাথ, আজও তেমনি। তেমনি অবিসম্বাদী রূপ। তবু অনেক-না-পাওয়ার প্রাচুর্য যেন অনেক-পাওয়াকে ম্লান করে দিয়েছে। হয় তো বৌঠানের ইতিহাস শোনা ছিল বলেই এ-কথা মনে হলো ভূতনাথের। কিন্তু হঠাৎ দেখলে বুঝি মনে হতো ওটা তার অহঙ্কারের আত্মপ্রকাশ! অহঙ্কারের সঙ্গে মিশে আছে প্রশান্ত মনের লালিত্য। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সুখী কি দুঃখী—সে প্রশ্ন আর মনে আসে না। দু'চোখের শান্ত-গাম্ভীর্য যেন দর্শকের সমস্ত বিচার-বুদ্ধিকে শিথিল করে দেয়।

অথচ সেই মানুষ যখন কথা বলে! যাকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়, শান্তি হয়, হয়তো খানিকটা ভয়ও হয়, তার কথা শুনলে যেন ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

বৌঠান বসেছিল সেদিনকার মতো। একটু সরে বসে বললে—এসো ভাই—

ভূতনাথ বসে পকেট থেকে কৌটোটা বের করে দিয়ে বললে—এনেছি সেটা—কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে সব লেখা আছে এতে।

তারপর ঠিক সেদিনকার মতোই চিন্তা আবার ঘরে ঢুকলো এক থালা খাবার নিয়ে।

ভূতনাথ বললে—আমি এত খেতে পারবো না বৌঠান।

খিদে যে পায়নি ভূতনাথের তা নয়, কিন্তু বৌঠানের সামনে বসে খেতে কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। কিন্তু বৌঠানও ছাড়বার পাত্রী নয়। বললে—না খেলে আমি কথাই বলবো না তোমার সঙ্গে। সব খেতে হবে।

সত্যিই খেতে হলো। খাওয়ার শেষে বৌঠান বললে—একটু বসো আসছি, বলে—উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। এতক্ষণে নজরে পড়লো ভূতনাথের। পাশেই আর একটা ঘর। সেদিন নজরে পড়েনি। ঘরখানার চারদিকে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। আলমারি ভর্তি পুতুলগুলো স্থির হয়ে রয়েছে কাঁচের ভেতরে। তাদের মধ্যে একটা বড় কাঁচের পুতুল যেন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে ভূতনাথের দিকে। সোনালি রুপালি পাড় বসানো শাড়ি-পরা, গায়ে পুঁতির গয়না। হঠাৎ মনে হলো পুতুলটা যেন একবার নড়ে উঠলো। আশ্চর্য! যেন চোখের ইঙ্গিতে তাকে ডাকলে। ভূতনাথ আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। না, ওটা তো নিষ্প্রাণ পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।

বৌঠান আবার ঘরে এল। ননীর মতো নরম আলতা-পরা পা দুটো ঘুরিয়ে আবার বসলো সামনে। হাতে একটা পাঁজি। পাঁজি খুলে পাতা উল্টে দেখে বৌঠান বললে—কাল তো একাদশী দেখছি—দিনটাও ভালো—কালকেই এটা পরবো তা হলে।

তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললে—ছোটকর্তার কোনো খারাপ হবে না তো এতে ভূতনাথ? শরীর তো ওঁর ভালো নয়, জানো, মাঝে মাঝে ভোগেনও খুব, অত অত্যাচার শরীরে সইবে কেন?

ভূতনাথ কী বলবে ভেবে পেলে না। খানিক পরে বললে—একদিন পরেই দেখুন না।

—তাই ভালো।

তারপরে কী যেন ভাবতে লাগলো বৌঠান নিজের মনে। যেন চিন্তাগ্রস্ত। খানিক পরে মুখ তুলে বৌঠান বললে—আজ পর্যন্ত সজ্ঞানে মিথ্যে কথা বলিনি ভূতনাথ, কিন্তু হয়তো তাই-ই আমায় বলতে হবে। আমার যশোদাদুলাল জানেন, আমি কারোর ওপর কোনো অন্যায় করিনি, কাউকে জীবনে একটুও কষ্ট দিইনি, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার কাছেও স্বীকার করছি। বাবার উপদেশ আমি বর্ণে বর্ণে মেনে এসেছি—কিন্তু স্বামীসেবার জন্যে তা-ও করবো আমি। বলে

ডাকলে—চিন্তা—

চিন্তা আসতে বৌঠান বললে—বংশীকে একবার ডেকে দে তো এখানে।

বংশী আসতে বৌঠান বললে—ছোটবাবু আজ কখন বেরিয়েছে রে?

—আজ্ঞে সন্ধ্যে সাতটার সময়।

—আচ্ছা, কালকে দুপুরবেলা একবার আমার ঘরে নিয়ে আসতে পারবি ছোটবাবুকে? বলবি—আমার ভীষণ অসুখ, একবার যেন দেখতে আসেন। যে-কোনো রকমে একবার তোকে এ-ঘরে আনতেই হবে ছোটবাবুকে, আর চিন্তা, তুই রাঙাঠাকমাকেও বলে দিস আমার অসুখ—আমি কিছু খাবো না আজ।

বংশী বললে—ছোটবাবু যে দুপুরে ঘুমোবে।

—ঘুম থেকে ওঠার পর বলবি।

—সেই ভালো।

—আচ্ছা, এবার যা।

বসে বসে ভূতনাথের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। এই সুযোগে বললে—আমিও তা হলে এবার আসি বৌঠান।

—তুমি একটু বোসো, এত তাড়া কিসের তোমার, কোনো কাজ আছে?

ভূতনাথ বললে—না, কাজ নেই।

—তবে, লজ্জা করছে বুঝি? সেদিন মেজদিও তো বলছিলেন—ছেলেটি লাজুক বড়।

—মেজদি কে?

—এ-বাড়ির মেজগিন্নী, এই পাশের ঘরেই থাকেন। আমাকে প্রথম দিনেই জিজ্ঞেস করেছেন—কে তোর ঘরে এসেছিল রে ছোট বউ? আমি বললাম—আমার গুরুভাই। এ-বাড়ির ভেতরে এমন করে আগে আর কখনও বাইরের পুরুষমানুষ আসেনি তো, তা আজকাল এ-বাড়ির নিয়ম-কানুন তো একটু একটু করে ভাঙছে, মেজদি'র বাবাও এখন এই অন্দর-মহলে আসেন—তা আমিই বা...

কথা অসমাপ্ত রেখে বৌঠান থামলো। তারপর আবার বললে—আজই তোমার সঙ্গে হয়তো শেষ দেখা ভূতনাথ, এ-বাড়িতে বউদের সঙ্গে সাধারণত কেউ কথা বলতে পায় না, আমারও হয়তো আর দেখা পাবে না, কিন্তু বৌঠানকে যেন ভুলে যেও না—আর তোমার যদি কোনো উপকার করতে পারি, দরকার হলে বংশীকে দিয়ে খবর পাঠিও—কেমন?

ভূতনাথ উঠলো। তারপর যশোদাদুলালের সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে প্রণাম করলে একবার।

বংশী এসে আবার তেমনি করে নিচে নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

ভূতনাথের মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল অনেকক্ষণ। আর দেখা হবে না! একটা সামান্যতম উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করে দু'দিনের সামান্য পরিচয়। কিন্তু তবু পটেশ্বরী বৌঠানের সঙ্গে যেন একটা পরম আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল দু'দিনেই। এতখানি স্নেহ-করুণ আত্মীয়তা ভূতনাথ যেন জীবনে কখনও পায়নি আগে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সেই কথাই ভাবছিল ভূতনাথ। উঠোনের ওপর এসে দাঁড়াতেই বংশী বললে—একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে শালাবাবু।

—আমার সঙ্গে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে, আপনিই পারেন।

—কী কাজ, বল্ না।

—ছুটুকবাবুর আসরে তো আপনি তবলা বাজাতে যান, ওঁর একটা চাকরের দরকার, আমার ভাই-এর জন্যে যদি বলেন একটু—

—কেন, ছুটুকবাবুর চাকরের কি হলো?

—আপনি সে কাণ্ড জানেন না?

—কিসের কী কাণ্ড?

—শশীকে ছুটুকবাবু যে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শশীর কথাটা মনে পড়ল এতক্ষণে। আজই সন্ধ্যেবেলা দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে, বললে—শশী যে আমার কাছে পয়সা চাইছিল, আজই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে রাস্তায়।

—তাই নাকি, ছোঁবেন না আজ্ঞে ওকে।

—কী হয়েছিল তার?

—পারা, পারা ঘা বেরিয়েছিল সারা গায়ে মুখে—এক সঙ্গে শোয়া-বসা করি, শেষকালে ছোঁয়াচ লেগে আমাদের হোক আর কি—মধুসূদনকাকাকে গিয়ে লোচন বলে দিলে। মধুসূদন-কাকা বলে দিলে ছুটুকবাবুকে, সরকারমশাই খাজাঞ্চীখানার খাতা থেকে নাম কেটে দিলে ওর।

ভূতনাথ বললে—বেচারি বলছিল বড় কষ্টে পড়েছে, দেশে যাবার পয়সা নেই।

—তা তখন মনে ছিল না? আমরা পই-পই করে মানা করেছি, আজ্ঞে, ও-সব বাবুদের পোষায়, টাকা আছে, রোগ সারিয়ে ফেলে, ছুটুকবাবুর হয়েছিল—সেরে গেল—কিন্তু ভদ্দরলোকের বাড়িতে ও-রোগ হলে সে-চাকরকে রাখবে কেন?

বংশী একটু থেমে বললে—তা আজ্ঞে ওই জায়গায় আমার ভাইকে আপনি ঢুকিয়ে দিন না ছুটুকবাবুকে বলে।

—আচ্ছা বলবো—বলে ভূতনাথ নিজের ঘরে এল। ব্রজরাখালের ঘরের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। এখনও আসেনি। এখন ব্রজরাখাল ব্যস্ত বড়। সেই কদমকেশর বোস! ভদ্রলোকের জরুরী কাজ ছিল ব্রজরাখালের সঙ্গে। ফুলদাসী মৃত্যু-শয্যায়। কে জানে কত কাজ—কত প্রতিষ্ঠান ব্রজরাখালের। ঠাকুরের নাম প্রচার করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন। কাজ আরো বেড়ে গিয়েছে। বেদান্ত আর অদ্বৈতবাদ প্রচার করতে হবে। মিস্টার আর মিসেস সেভিয়ারও সঙ্গে এসেছেন শিষ্য হয়ে। সাহেব-মেম শিষ্য—এ কেমন জিনিস! কিসের আকর্ষণে এসেছে ওরা?

অন্ধকার ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে রইল ভূতনাথ। হঠাৎ যেন সমস্ত বড়বাড়ি একটা গুঞ্জন শুরু করলো। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। ভূতনাথের মনে হলো—কবে ১৩৪৫ সালে কে ঘড়ি তৈরি করেছিল প্রথম, সেই ঘড়ির কল-কব্জা ধীরে ধীরে আজ বুঝি চলতে শুরু করেছে। আজ এতদিন পরে। বদরিকাবাবুর কথাই বুঝি সত্য হবে। সব লাল হয়ে যাবে। কিন্তু লাল কেন হবে? এ-বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট কি টের পেয়েছে? কবে মোগল বাদশাহদের আমলে এ-বাড়ির পূর্বপুরুষ জমিদারীর সনদ পেয়েছিল। পেয়েছিল কোতল করবার অধিকার। কবে হাজার হাজার লাঠিয়ালের আঘাতে গ্রাম-জনপদ ভীত-বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কত নারীর সৌন্দর্য-সৌজন্য-শালীনতা আর সতীত্ব নিয়ে ছিনি-মিনি খেলেছে এ-বাড়ির পূর্বপুরুষ! এই চৌধুরী পরিবারের অত্যাচারের তরঙ্গ কত সুদূর সীমান্তে গিয়ে গ্রামবাসীদের অভিশাপকে থামিয়ে দিয়েছে! বদরিকাবাবুর কাছে সব সেদিন শুনেছে ভূতনাথ। আর শুধু কি এরা! কলকাতার প্রাচীন সমস্ত বংশের ইতিহাসের পেছনে যে-মর্মান্তিক বিশ্বাসঘাতকতা আর জাতি-দ্রোহিতার কলঙ্ক লুকিয়ে আছে, আজ এই রাত্রে সব যেন একসঙ্গে তারা মুখর হয়ে উঠলো। ওই যে বদরিকাবাবু শুধু নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে বসে দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে যান, ওর ব্যথা কে বুঝবে? বৌঠান বুঝি কাঁদছে এখন তেতলার অন্দর-মহলের একান্তে। কে ঘোচাবে তার দুঃখ? ননীলালের জন্যে কি কেউ দায়ী নয়? আর ওই সুবিনয়বাবু! তার স্ত্রী উন্মাদগ্রস্ত কার পাপে! শশী কেন হঠাৎ বেকার হয়ে যায়? একদিন জলাভূমির ওপর যে শহরের পত্তন হয়েছিল জব চার্নকের আমলে, সেই শহর আজ দিনে দিনে সৌধমালায় সেজে উঠেছে কি অকারণে? ছুটুকবাবুর ঘর থেকে তখনও গানের আলাপ কানে আসছে—'চামেলি ফুলি চম্পা'। পাশের জানলা খোলা ছিল। ওধারে দক্ষিণের বাগানে বুঝি দাসু জমাদারের ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে। 'বিল্বমঙ্গলের' গানের সুর—'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে।' ভূতনাথের মনে হলো—সমস্ত কলকাতা শহর যেন কাঁদছে। তার প্রথম জীবনে ভূতনাথ যে বেজিটা পুষেছিল, সেই বেজিটা মরবার দিন ঠিক এমনি অদ্ভুত সুরেই কেঁদেছিল যেন।

কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগলো ভূতনাথের। কিছুতেই যেন ঘুম আসছে না। হয়তো পটেশ্বরী

বৌঠানের দুঃখটাই আজ তাকে বড় অভিভূত করে দিয়েছে। মনে হলো—এখন এই সময়ে প্রাণ ভরে বাঁয়া-তবলা বাজাতে পারলে ভালো হতো। তবলায় চাঁটি দিয়ে মনের সমস্ত দুর্ভাবনাগুলোকে হয়তো এড়াতেও পারা যেতো। কিন্তু হঠাৎ একটা আচমকা শব্দে চমকে উঠেছে ভূতনাথ।

—কে?

—আমি, এখনও ঘুমোওনি বড়কুটুম?

—এত দেরি হলো? তোমাকে এক ভদ্রলোক খুঁজতে এসেছিলেন।

আলো জ্বাললে ব্রজরাখাল। তারপর গায়ের জামা খুলে ফেললে। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ব্রজরাখালকে।

—আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি, কিছু খাবার আছে বড়কুটুম?

—মুড়ি আছে, খাবে? দিচ্ছি—আমি আজ রাঁধিনি, বাইরে খেয়েছি। বলে ভূতনাথ টিনের কৌটো থেকে মুড়ি বার করে দিলে। সারা গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ব্রজরাখাল মুখ হাত-পা ধুয়ে এল। হাত-পা গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বললে—সারাদিন খুব ঘোরাঘুরি গেল, শেয়ালদা থেকে গেলাম রিপন কলেজে, সেখান থেকে বাগবাজারে রায়বাহাদুর পশুপতি বোসের বাড়ি, তারপর সেখান থেকে স্বামীজি আর সেভিয়ারদের নিয়ে গেলাম কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগান-বাড়িতে। ওঃ, খুব সাজিয়েছিল বাগান-বাড়িটা।

—দুটি খেয়ে নিলে না কেন ওরই মধ্যে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—সময় পেলাম না। কাল আবার সকালবেলাই ছুটতে হবে কাশীপুরে, সন্ধ্যেবেলা আবার যেতে হবে আলমবাজারের মঠে।

তেল-মাখা মুড়ির বাটিটা হাতে নিয়ে ব্রজরাখাল বললে—কে খুঁজতে এসেছিল বললে?

—কদমকেশর বোস নামে এক ভদ্রলোক।

—কেন, কিছু বলেছে?

—তোমায় বলতে বলেছে যে, মেছোবাজারের ফুলবালা দাসীর দুপুর থেকে ভেদবমি শুরু হয়েছে, একটু ওষুধ চাইছিল।

—ভেদবমি? তবে আর খাওয়া হলো না—

বলে উঠলো ব্রজরাখাল। আবার জামা গায়ে দিয়ে জুতো গলিয়ে নিলে পায়ে।

ভূতনাথ বললে—আবার চললে নাকি?

—যেতেই হবে।

—কাল সকালে গেলে চলে না?

—কাল সকালে অনেক কাজ—বলে বাইরে বেরোলো ব্রজরাখাল।

—মুড়ি ক'টা খেয়ে যাও।

কিন্তু কথাটা হয়তো শুনতে পেলে না ব্রজরাখাল। ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে সে। বাইরে শীত-শেষের রাত। ইব্রাহিমের ঘরের ছাদের কোণের টিমটিমে আলোতে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা উঠোনের ওপর একবার দেখা গেল শুধু। যেন হাঁটছে না, দৌড়চ্ছে।

ভূতনাথ ঘরের দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। ছুটুকবাবুর ঘর থেকে তখনও গানের সুর ভেসে আসছে—'চমেলি ফুলি চম্পা', বিশ্বম্ভরের গলা, কান্তিধরের তবলার চাঁটি। আর ওদিকে দক্ষিণের বাগানের কোণ থেকে দাসু জমাদারের ছেলের বাঁশিতে 'বিল্বমঙ্গলে'র গান 'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে'—

আজও মনে আছে সেটা শুক্রবার। কী একটা উপলক্ষ্যে বুঝি ছুটি ছিল। বংশী এল। বললে—ছুটুকবাবু একলা আছেন, এখন আজ্ঞে দেখা করলে চাকরিটা হয়ে যায়। শশীর কাছে শুনতাম ছুটুকবাবু আপনাকে খুব পছন্দ করেন নাকি।

শেষ পর্যন্ত যেতে হলো।

ঠিক সন্ধ্যে হয়নি তখনও। গানের আসর বসতে তখনও দেরি আছে। একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন ছুটুকবাবু। কোঁচানো ধুতি। ঢেউ-তোলা বাবড়ি-ছাঁট চুল।

পাশে পানের ডিবে। জর্দার কৌটো। সিগারেট। আর মেঝের ওপর গড়গড়া। বোধ হয় একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে।

ভূতনাথকে দেখতে পেয়ে বললে—আসুন স্যার, কী খবর—অনেক দিন পদধূলি পড়েনি।

ভূতনাথ বসলো গদির ওপর।

ছুটুকবাবু বললে—কালকে এলেন না, বেনারসের ওস্তাদ আনোয়ার আলী এসেছিল, আহ্-হা কী আলাপ আর কী খেয়াল গাইলে ভাই কী বলবো, যেমন তৈরি গলা তেমনি লয়-জ্ঞান, সঙ্গত করছিল বৈজু। যাই বলুন বৈজুর হাত বড় মিঠে স্যার, রাত তিনটের সময় দরবারি কানাড়ার খেয়াল ধরলে একখানা—আ হা হা কোথায় লাগে আপনাদের ইয়ে। তারপর একটু থেমে বললে—আমাদের বাড়ীতেই ছোটবেলা গান শুনেছি কজ্জন বাঈ-এর—দোলের দিন। সে কী নাচ আর গান! আমার বাবামশাই-এর বন্ধু ধর্মদাসবাবু ডুগি-তবলা বাজিয়েছিলেন। আমরা স্যার তখন ছোট, দপ্তরখানার ভেতর-দরজার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলুম। নাচতে নাচতে সোনার থালা থেকে ঠোঁট দিয়ে সবগুলো মোহর তুলে নিলে। তারপর আর একবার তাকে দেখেছিলাম অনেক দিন পরে, সে-চেহারা তখন আর নেই। মেজকাকীর কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে গেল। অনেক বলা-কওয়াতে একটা গান গাইলে—'বাজু বন্দ্ খুলু খুলু যায়—' ভৈরবীর রে-গা-ধা-নি-র মোচড়গুলোতে তখনও যেন যাদু মেশানো রয়েছে। সেই কজ্জন বাঈ-এর গান শুনেছিলুম আর কালকের আনোয়ারির দরবারি, আ-হা-হা—

গানের গল্প আর থামতে চায় না ছুটুকবাবুর। একটু ফুরসত পেতেই ভূতনাথ বংশীর কথাটা আরম্ভ করতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ বাধা পড়লো। কে যেন ঘরে ঢুকছে। সামনে চেয়েই ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। ননীলাল।

ননীলালও বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। বললে—আরে, ভূতনাথ যে! তারপর ছুটুকবাবুর দিকে চেয়ে বললে—চূড়ামণি, একটা কাজে এলুম তোর কাছে।

ছুটুকবাবুও যেন বেশ খুশি। বললে—কাজ হবে'খন—তোর খবর কী বল্? বিন্দীর খবর কী?

—বিন্দী ভালো আছে, তোর খবর জিজ্ঞেস করে। আমি বলি সে এখন সাধু হয়ে গিয়েছে, গান-বাজনা নিয়ে আছে,—কিন্তু আজকে সে-সব গল্প করবার সময় নেই—এখনি যেতে হবে।

ছুটুকবাবু বললে—সে কী রে, একটু বোস। সরবৎ খা।

—না ভাই, ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।

কথাটা ছুটুকবাবুর কাছে যেন বিশ্বাস না হবার মতো। বললে—সে কী?

—হ্যাঁ ভাই, বিন্দীর কাছেও আর যাই না।

—কেন?

—বিয়ে করছি।

ভূতনাথও এবার অবাক হলো। বললে—বিয়ে?

ছুটুকবাবু জিজ্ঞেস করলে—ননীলালকে আপনি চিনলেন কেমন করে ভূতনাথবাবু?

—ও যে আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়েছে, আমাদের গাঁয়ের স্কুলে।

কিন্তু ননীলালের তখন বাজে আলোচনা করবার সময় নেই। বললে—সেই জন্যেই তো এসেছি তোর কাছে, কিছু টাকা চাই আমার, বিয়ের পর সব শোধ করে দেবো। বেশি না, পাঁচ হাজার টাকা।

ছুটুকবাবু কিছু কথা বললে না। একটা সিগারেট ননীলালকে দিয়ে নিজে আর একটা ধরালে। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে ননীলালকে বললে—সত্যি বলছি, টাকাটার বিশেষ দরকার, তারা তো জানে না, বাড়ি-টাড়ি সব বাঁধা পড়েছে। জানে বড়লোক, টাকার অভাব নেই। তা যা হোক, এবার আমিও

ভাই তোর মতন বিয়ের পর সাধু হয়ে যাবো, সত্যি বলছি।—

ছুটুকবাবু বললে—সে সব কথা থাক—বিয়ে করছিস কোথায়, মেয়ে কেমন?

ননীলাল বললে—মেয়েমানুষের নেশা আমার চলে গিয়েছে ভাই, এখন শুধু টাকা চাই—টাকার বড় দরকার—ওদের অগাধ টাকা, ওখানে বিয়ে হলে সারাজীবনের মতো টাকার ভাবনাটা ঘুচবে—কিন্তু তার আগে আমার নিজের খরচটার জন্যে হাতে কিছু টাকা চাই।

ছুটুকবাবু আবার বললে—বিয়ে করছিস কোথায়?

ননীলাল টপ করে কথাটার জবাব দিতে পারলে না। একবার ভূতনাথের দিকে চাইলে। যেন সঙ্কোচ হচ্ছিলো। ভূতনাথ উঠলো। হয়তো গোপনীয় কোনো কথা আছে। বললে—আমি এখন উঠি ছুটুকবাবু—পরে আসবো।

বংশীর ভাইটার চাকরির কথা বলতেই আসা। বলা হলো না। তা পরে হবে একদিন।

বাইরে আসতেই বংশী ধরেছে। বললে—বলেছেন আজ্ঞে?

—না রে, বলা হলো না, একজন বন্ধু এসে পড়লো—তা তোর ভাবনা নেই, বলবো'খন একদিন।

আজ সেই বংশীও নেই, তার ভাই-এর চাকরিটাও হয়নি সেদিন। কিন্তু সে-চাকরির উপলক্ষ্যে ছুটুকবাবুর কাছে না গেলে তো ননীলালের সঙ্গে দেখাও হতো না ভূতনাথের। অথচ সমস্ত সর্বনাশের বীজ বুঝি সেইদিনই প্রথম বোনা হয়ে গেল। শুধু ভূতনাথের জীবনেই বা কেন? ওই ছোটবাবু, ওই পটেশ্বরী বৌঠান, সকলের জীবনের ওপরই এক ধূমকেতুর মতন আবির্ভাব হলো ননীলালের। ননীলাল যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বণিক-সভ্যতার বিষ! বিষের আঙুর। আজ ঘরে ঘরে সে আঙুরের চারা গজিয়েছে যেন। কিন্তু সেদিন সেই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো বড়বাড়ির ইতিহাস অন্যরকম করে লেখা হতো।

'মোহিনী-সিঁদুর' আপিস থেকে বেরিয়ে ভূতনাথ হাঁটা-পথে আসছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাগবাজারের ভেতর দিয়ে গলি-রাস্তা। চারদিকে অন্ধকার। দু'পাশের নর্দমার নোংরা এড়িয়ে রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে আসতে হয়। ছাড়া ছাড়া খোলার বাড়িতে টিম-টিমে বাতি। দুটো রাস্তার মোড়ের কাছে সেই দিশী মদের দোকানটার কাছে আসতেই নাকে গেল চেনা গন্ধ। এড়িয়েই যেতে চেয়েছিল ভূতনাথ। রাস্তার ওপরেই বসে বসে কয়েকজন ভাঁড়ে করে মদ খাচ্ছে। সুর ভাঁজছে। হল্লা করছে। একজন গাইছে—

পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই লো।
ওলো রাধে, রাজার মেয়ে,
ভুলে গেলি রাখাল পেয়ে, ছি লো,
খাসা দৈকে ফেলে দিয়ে কাপাস খেলি তুই লো
লাজে মরে যাই লো—

আর একজন পাশ থেকে সমের মাথায় চিৎকার করে উঠলো—হা হা হা হাঃ...

অন্ধকারে মূর্তিগুলোকে সব দেখা যায় না। হট্টগোলের মধ্যে কয়েকটা মাতালের নৈশ-উল্লাস। কিন্তু এমন সময়েই কাণ্ডটা ঘটলো। হঠাৎ সামনে একটা মূর্তিকে দেখে যেন চিনতে পারলে ভূতনাথ। সেই জবাদের বাড়ির পুরনো ঠাকুরটা না? কিন্তু সামলে নেবার আগেই একটা আস্তো থান ইট ভূতনাথের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে। মাতাল ঠাকুরটার কথাগুলোর কিছু অংশ যেন কানে গেল—শালার কেরানীবাবুকে দে শেষ করে—

তারপর আর কিছু মনে নেই ভূতনাথের।

তখন বিংশ শতাব্দীর শুরু। লর্ড কার্জনের রাজত্ব। আজও সাইকেল-এ যেতে যেতে স্পষ্ট মনে পড়ে সব। সেদিনকার আঘাতে সে যে মরেনি এই-ই তো আশ্চর্য! গোলদীঘির ধারেই বুঝি কোন্ একটা বাড়িতে কারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

প্রথম যখন চোখ মেললে, দেখলে—একটা পাকা ঘর। পুরনো ময়লা দেয়াল। চারদিকে লাল কালিতে লেখা—'বন্দেমাতরম্' কয়েকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। জানলা খোলা ছিল। দেখা যায়—সামনে কুস্তির আখড়া। বাইরে বিকেল হয়ে এসেছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা। একটু ওঠবার চেষ্টা করতেই কে একজন এসে ধরলে। কামিজ পরা, অল্প-অল্প দাড়ি গোঁফ উঠেছে। চেহারাটা যেন চেনা চেনা মনে হলো।

মাথাটা ধরে বললে—এখন উঠতে চেষ্টা করো না ভাই। তারপর কাকে যেন ডেকে বললে—শিবনাথ আর একটু দুধ আনো তো।

শিবনাথ দুধ এনে দিতে লোকটি বললে—এটুকু খেয়ে নাও দিকি।

দুধ খেয়ে আবার যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল খানিকক্ষণ। আবার যখন তন্দ্রা ভাঙলো কানে এল কাদের কথাবার্তা। বেশ অন্ধকার হয়েছে চারদিকে। একটা হারিকেন জ্বলছে টিম টিম করে। ভূতনাথ মনে মনে ভাবছিল এ কোথায় এল সে। যারা একটু আগে এসে তাকে দুধ খাইয়ে গিয়েছে, তারা বোধ হয় বাইরেই রয়েছে।

কে একজন বললে—কদমদা, এবার ওদের একটা শিক্ষা দিতেই হবে। কালকে গড়ের মাঠেও একজন গোরা বুটের লাথি মেরে একজনকে একেবারে অজ্ঞান করে দিয়েছে।

—গোরাতে একে মেরেছে জানলি কী করে?

—গোরাতে না মারলে কি ভূতে মারতে এল?

—গুণ্ডাও তো হতে পারে? নিজের চোখে তো দেখিসনি তুই? কলকাতার রাস্তায় গুণ্ডাও তো কম নেই আর তা ছাড়া একটা গোরাকে মেরেও তো লাভ হবে না কিছু—ক'টা গোরাকে সামলাবি? শেষকালে কেল্লা থেকে যখন হাজার হাজার গোরা বেরিয়ে মারতে শুরু করবে তখন বাঙালীরা পালাবে কোথায়? সাহস তো খুব বোঝা গিয়েছে। একটা কুস্তির আখড়াতেই মেম্বার যোগাড় করা যায় না।

—কিন্তু কদমদা ভারতবর্ষ জয় করতে ক'টা ইংরেজ এসেছিল?

খানিকক্ষণ কোনো কথা শোনা গেল না। তারপর কে যেন বলতে লাগলো—তোরা ভুল করছিস শিবনাথ, আমাদের 'যুবক-সঙ্ঘে'র উদ্দেশ্যই যে তা নয়—স্বামীজি বলেছেন—'The world is in need of those whose life is one burning love—selfless. The love will make every word tell like a thunder-bold. Awake, awake great souls! The world is burning in misery, can you sleep?' রাজনীতি দিয়েও দেশের উপকার হবে না, ধর্মের জয়ঢাক পিটিয়েও কিছু হবে না, অর্থনীতি দিয়েও অভাব মিটবে না আমাদেব, আমরা 'যুবক-সঙ্ঘে'র সভ্যরা একটা জিনিস চাই, সে এই যে, দেশের ওপর মাতৃভূমির ওপর প্রেম—জ্বলন্ত প্রেম—। সে প্রেম তোর আত্মা, তোর বিত্ত, তোর সন্তানের চেয়েও বড়। যে সেই জ্বলন্ত প্রেম নিয়ে গরীব-বড়লোক, হিন্দু-মুসলমান, জৈন-খৃস্টান সকলকে সমান চোখে দেখতে পারবে, সে-ই শুধু পারবে। তবেই সমস্ত ভারতবর্ষ এক হবে। তোরা ভুল বুঝিসনে, সিস্টার নিবেদিতাও সেদিন সেই কথাই বললেন—বড়দা'রও সেই মত।

হঠাৎ অনেকগুলো গলার আওয়াজ এক সঙ্গে উঠলো—ওই যে বড়দা এসে গিয়েছেন।

বড়দা এসেই জিজ্ঞেস করলে—কীসের কথা হচ্ছে?

শিবনাথ বললে—আজ আবার গোরারা আর একজনকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে।

—কই? কোথায়?

—ওই যে ঘরের ভেতর রয়েছে।

ঘরে আসতেই চেহারা দেখে চমকে উঠলো ভূতনাথ।

ব্রজরাখালও কম বিস্মিত হয়নি। বললে—এ কী, বড়কুটুম!

ভূতনাথের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। কিন্তু মুখে কিছু বলবার ক্ষমতা নেই।

ব্রজরাখাল মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—কাঁদছো কেন বড়কুটুম, কোনো ভয় নেই তোমার, আমাদেরই 'যুবক সঙ্ঘে' রয়েছো, এখানে কোনো অসুবিধে হবে না তোমার, কদম রয়েছে, শিবনাথ রয়েছে, বরং বড়বাড়িতে থাকলে দেখাশোনা করতো কে? তারপর শিবনাথের দিকে চেয়ে বললে—আরে, এ যে আমার বড়কুটুম হয়—কোথায় পেলি একে?

যাবার সময় ব্রজরাখাল বলে গেল—আসবো আবার আমি, এখন কিছুদিন বড় ব্যস্ত আছি।

সে কতকাল আগের কথা। গোলদীঘির ধারের সেই 'যুবক-সঙ্ঘে'র ঘরটাতে ভূতনাথ তারপরেও কতদিন গিয়েছে। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে নিতান্ত অসহায়ের মতন যে কয়েকদিন সে শুয়ে পড়েছিল ওখানে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে তার স্মৃতি যেন জড়িয়ে আছে। শুয়ে শুয়েই সব দেখতো সব শুনতো সে। ছেলেরা কুস্তি করতো, মুগুর ভাঁজতো, লাঠি খেলতো আর গান করতো। কয়েকটা গান এখনও মনে আছে—

'মাগো যায় যেন জীবন চলে—
বন্দে মাতরম্ বলে—
বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মা'র সেই ছেলে।
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে'

আর একটা গান—

'শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়া চরণে নম্র শির।
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর—'

নিবারণের কথাও মনে পড়লো। ছেলেটা মাথার কাছে বসে ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সামনের আখড়া ফাঁকা। কারো গলার শব্দ আসছে না। হঠাৎ মাথার কাছে একটা শব্দ হতেই ভূতনাথ চোখ তুলে দেখলে কে যেন বসে আছে তার দিকে চেয়ে।

নিবারণ বলেছিল নিচু হয়ে—কিছু কষ্ট হচ্ছে আপনার?

ভূতনাথ শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে দেখেছিল নিবারণের মুখের দিকে। কিছু কথা বলেনি।

নিবারণ শেষে নিজেই বলেছিল—একটু জল খাবেন?

জল খেয়েও ভূতনাথ তেমনি তাকিয়ে আছে দেখে নিবারণ বলেছিল—কিছু বলবেন আমাকে?

ভূতনাথ বলেছিল—তুমি কে?

নিবারণ বলেছিল—আমি নিবারণ, আমায় চিনতে পারবেন না—আমি 'আত্মোন্নতি-সমিতি' থেকে নতুন এসেছি—আপনার কাছে রাত্রে থাকবো।

ভূতনাথ বললে—'আত্মোন্নতি-সমিতি' কোথায়?

—আগে খেলাত্ ইনস্টিটিউশনে বসতো—এখন 'যুবক-সঙ্ঘে'র সঙ্গে মিশে গিয়েছে, যেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হয়, সেদিন থেকেই ঠিক হয়েছে দুটো সমিতি এক হয়ে যাবে। ফিরিঙ্গীগুলো বড় অত্যাচার আরম্ভ করেছে কিনা, যাকে তাকে রাস্তায় মারধর

করছে। আমরাও ঠিক করেছি ফিরিঙ্গী ছোকরা দেখলেই মারবো, কিন্তু কদমদা' বলে, ওতে কাজ হবে না, তাই নিয়েই তো আজকে মিটিং ছিল আমাদের।

—মিটিং-এ কী ঠিক হলো?

—ঠিক হলো না কিছুই, বড়দা' হাজির ছিলেন না।

—বড়দা' কে?

—ব্রজরাখালবাবু, উনিই আমাদের প্রেসিডেন্ট কিনা।

ব্রজরাখাল! নামটা শুনেই ভূতনাথ যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। একথা তো ব্রজরাখাল কখনও বলেনি।

নিবারণ কিন্তু তখন নিজের মনেই বলে চলেছে—কিন্তু কদমদা যাই বলুন, আমরা ঠিক করেছি আমরাও আমাদের নিজেদের পথে চলবো। বৃটিশ রাজত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন মনুষ্যত্ব বজায় রেখে বেঁচে থাকা কঠিন।

আজও মনে পড়ে সেদিনকার নিবারণের সেই কথাগুলো। কী জ্বলন্ত আগুনের ফুল্কির মতো সব ছেলে। কথাগুলো যেন আজও কানে বাজছে। সেই ২২শে জুন তারিখের ঘটনা যেন তার কণ্ঠস্থ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসবের পর পুণার গণেশখণ্ডের লাটসাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড সাহেব। দুর্দান্ত বদমাইশ সাহেব। সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুন করলে দুই ভাই—দামোদর চাপেকার আর বালকৃষ্ণ চাপেকার। শিবাজী মহারাজার বংশধর। বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনের সেই তো আরম্ভ। আর সেই 'চাপেকার সঙ্ঘে'র সদস্যরাই তো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের গুরু। সে বুঝি ১৮৯৯ সাল। একদিন শেষ রাত্রে দুই ভাই-এর ফাঁসি হয়ে গেল নিঃশব্দে। কিন্তু যে বিশ্বাসঘাতকরা চাপেকার ভাইদের ধরিয়ে দিলে, তারাও তো প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলো না শেষ পর্যন্ত।

নিবারণ হঠাৎ থেমে বললে—কিন্তু বাঙালীরাই বা পেছিয়ে থাকবে কেন? তাই 'চাপেকার সঙ্ঘ' থেকে লোক কলকাতাতেও আসছে—আমি চিঠি দেখেছি। একটা র‍্যাণ্ডকে খুন করলে তো কিছু কাজ হবে না, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ র‍্যাণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে যে ভারতবর্ষে, নীলকর সাহেবরা গিয়েছে কিন্তু চা-বাগানের সাহেবরা?

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কারা আসছে কলকাতায় বললে?

—তিন জন বাঙালী, যতীন বাঁড়ুজ্জে, বারীন ঘোষ আর তার দাদা অরবিন্দ ঘোষ। আর এখানে আমাদের ব্যারিস্টার সাহেব পি. মিত্তির রয়েছেন। একটা সমিতি করার কথা হয়েছে, নাম হবে 'অনুশীলন-সমিতি'। মানিকতলা স্ট্রীটের মানিক দত্তর বাড়িতে ওদের আড্ডা বসেছে। তারপর একটু থেমে নিবারণ আবার বললে—আপনি ওখানে যাবেন একদিন?

—আমাকে যেতে দেবে কেন?

—খুব যেতে দেবে। নিবারণ বললে—আপনি ব্রজরাখালবাবুর শালা, কেউ আটকাবে না, আর সবাই মিলে না লাগলে কিছু হবেও না। এই সেদিন বুয়র যুদ্ধ হয়ে গেল, আবার রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধছে। দেখবেন সাদা চামড়ারা এবার হারবেই হারবে। আপনি ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির লাইফ পড়েছেন? আপনাকে আমি বই দিতে পারি, এইরকম করেই তারাও তো স্বাধীন হয়েছিল। সেদিন সিস্টার নিবেদিতা এসেছিলেন এখানে, তিনিও আশীর্বাদ করে গিয়েছেন আমাদের, বলেছেন—তোমরা স্বামীজির মতন হও।

নিবারণের কথা শুনতে শুনতে ভূতনাথের চোখ দুটো বুজে এল। মনে হলো—এ এক আশ্চর্য জগতে এসে পৌঁছেছে সে। কলকাতার কেন্দ্রে বসে ভারতবর্ষের এক নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। জব চার্নক আর লর্ড ক্লাইভের কলকাতার এ যেন এক বিস্ময়কর রূপান্তর। যে-কলকাতায় ননীলাল থাকে, থাকে ছুটুকবাবু, ছোটবাবু, ছোটবৌঠান আর থাকে সুবিনয়বাবু আর জবা—এ যেন সে কলকাতা নয়। কলকাতায় এসে ভূতনাথও তো নিজের চোখে কত কি দেখেছে!

সেদিনের সেই ঘটনাটা মনে পড়লো। বৌবাজার থেকে বনমালী সরকার লেন-এ ঢুকতেই

সেই যে বটগাছটার তলায় সান-বাঁধানো বেদীটার ওপর নরহরি মহাপাত্রের বিগ্রহগুলো—লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, দুর্গা, মনসা, শিব, কালী, ছোট পুতুলের মাপের অসংখ্য ঠাকুর সব। প্রথম যেদিন কলকাতায় এসে পৌঁছোয় ভূতনাথ, নরহরি তাকে ওখানে প্রণাম করিয়ে পয়সা নিয়েছিল। মন্তর পড়িয়েছিল। তারপর 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে যাতায়াতের পথে কতবার কত পয়সা আদায় করেছে। মিথ্যে হোক, বুজরুকি হোক, তবু ঠাকুর-দেবতা তো। যে অদৃশ্য শক্তি এই বিশ্ব-চরাচরের নিয়ামক, তাকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি তো ভূতনাথের নেই। ভূতনাথের নিজেরই জন্ম তো পঞ্চানন্দতলায় মানতের ফলে। হোক ওটা নরহরি মহাপাত্রের ব্যবসা বা দোকান, তবু ঈশ্বরের নাম করে যখন চাইছে, তাতে কী-ই বা এমন ক্ষতি? তাই আসা-যাওয়ার পথে প্রণাম করতে কখনও ভোলোন ভূতনাথ।

কিন্তু সেদিন দুপুরে কী অভাবনীয় কাণ্ড!

গোটা কয়েক গোরা সৈন্যই বুঝি। বনমালী সরকার লেন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো শিস দিতে দিতে। সামনে যথারীতি নরহরি মহাপাত্র সবে গঙ্গাস্নান সেরে মাথার শিখাতে একটা গাঁদাফুল ঝুলিয়ে পথচারীদের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। এমন রোজ থাকে সে। নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে গোরা সৈন্য দুটোর মনে কী মতলব হলো কে জানে। একজন হাতের ছড়িটা দিয়ে মারলে নরহরির মাথার গাঁদা ফুলটাকে! উদ্দেশ্য হয়তো রসিকতাই, কিন্তু ভয় পেয়ে নরহরি চিৎকার করে উঠলো। সে চিৎকারে ফল ফললো উল্টো। পাশ থেকে একজন গোরা সৈন্য বুট দিয়ে মারলে লাথি নরহরির মুখে। কিন্তু মুখ তা বলে বন্ধ হলো না নরহরির। রাস্তার ধারে এক নিমেষে ছিটকে পড়লো নরহরি আর কানফাটা চিৎকার করতে লাগলো। শব্দ শুনে এদিক-ওদিক থেকে জনতা কতক বেরিয়েও এল ব্যাপার দেখতে।

ভূতনাথও শব্দ শুনে বড়বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখতে এসেছে। কিন্তু সে কি লোমহর্ষক ব্যাপার! বুক দুর দুর করে কাঁপছে সকলের। কারো কিছু বলবার সাহস নেই।

ভারি ভারি বুট দিয়ে দুটো গোরা তখন লাথি মারতে শুরু করেছে। এক একটা লাথি মারে আর লক্ষ্মী গণেশ ঠাকুরগুলো দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। শিব, দুর্গা, মনসা সব মার্বেলগুলির মতো যেদিকে খুশি ছিটকে ফেলছে। শান-বাঁধানো বেদীটাও বুঝি ভেঙে-চুরে গেল বুটের ঠোকর লেগে। আর একপাশে পড়ে নরহরি মহাপাত্র চিৎকার করে পাড়া মাত করছে।

শেষকালে যেন ক্ষেপে উঠলো গোরা দুটো। যাকে সামনে পায়, তাকেই মারতে যায়। বড়বাড়ির গেটে ব্রিজ সিং দাঁড়িয়েছিল। বুকে গুলীর বেল্ট। হাতে সঙ্গীন লাগানো বন্দুক। লোহার গেট বন্ধ করে দিলে। যে-যেখানে পারলে লুকোলো গিয়ে। সব বাড়ির দরজা জানলা খড়খড়ি খটাখট বন্ধ হয়ে গেল।

এমন সময় বড়বাড়ির মেজকর্তা হিরণ্যমণি চৌধুরী বেরুচ্ছিলেন।

কোচোয়ানের বসবার জায়গায় আমিরী ভঙ্গীতে ইব্রাহিম লাগাম ধরে জুড়ি চালাচ্ছে। শঙ্কর মাছের চাবুকটা খাপের ওপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। মোম-লাগানো মস্ত গোঁফ জোড়া দু'পাশে কাঁকড়া বিছের মতো চিতোনো। মাথার বাবড়ি চুল কাঁধের ওপর গিয়ে ঠেকেছে। মাথার পেছনে কাঠের চিরুনি আঁটা। জরির কাজ করা সাদা প্লেটের ওপর সোনার তক্তি ঝুলছে গলায়। আর ইয়াসিন সহিস পেছনে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে সাবধান করছে সবাইকে। হুঁশিয়ার হো—হুঁশিয়ার হো—

ব্রিজ সিং লোহার গেট খুলে দিয়ে অ্যাটেনসনের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। তারপর গাড়ি বেরুবার আগে চিৎকার করে উঠলো—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার হো—

সে-চিৎকারে হঠাৎ যেন কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চমকে উঠেছে। গোরা দুটো লড়াই থামিয়ে যেন একটু ইতস্তত করতে লাগলো।

ততক্ষণে গাড়ি সামনে এসে গিয়েছে। ভেতরে ভৈরববাবু বসেছিল। চেঁচিয়ে বললে—ইব্রাহিম গাড়ি থামাও—মেজবাবু গাড়ি থামাতে বলছেন—থামাও গাড়ি।

আগে মেজকর্তা নামলেন। পেছনে ভৈরববাবু। মেজবাবু হাঁকলেন—ইব্রাহিম চাবুকটা দে তো।

কিন্তু গোরা দুটো তখন রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে পোঁ পোঁ ছুটতে শুরু করেছে।

মেজবাবু নরহরির কাছে গিয়ে এক ধমক দিলেন—উল্লুক, শুয়ার-কা বাচ্চা, কাঁদছিস যে? মারতে পারলি না দু'ঘা—আবার পড়ে পড়ে কাঁদছিস! বেল্লিক কাঁহিকা—বলে সপাং সপাং করে চাবুকটা দিয়ে বেদম মারতে লাগলেন নরহরি মহাপাত্রের পিঠে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! নরহরি কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগলো রাস্তার ওপর। যারা এতক্ষণ দরজা-জানলা বন্ধ করে মজা দেখছিল, তারা এবার দরজা খুলে নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ নরহরিকে মারা বন্ধ করে তাদের দিকে চাবুকটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন মেজকর্তা। বললেন—কি দেখছিস সব—বেরো এখান থেকে—বেরো—

আবার ঝটাপট সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শান্ত সৌম্য মেজকর্তা হিরণ্যমণি চৌধুরীকে কেউ রাগতে দেখেনি। সেই তিনিও রেগে লাল হয়ে উঠলেন। তারপর ভৈরববাবু আর মেজকর্তা গাড়িতে উঠে বসতেই জুড়ি আবার বনমালী সরকার লেন পার হয়ে গেল।

পরদিন খাজাঞ্চী বিধু সরকারের ডাক পড়লো। বেলা তিনটে তখন। বিধু সরকার আসতেই বললেন—নরহরি মহাপাত্রকে একশ' টাকা দিয়ে বিদেয় করে দাও তো বিধু—আর সুখচরের গোমস্তাকে চিঠি লিখে দাও, রাজীবপুরের বিলের ধারের দশ বিঘে জমি ওর নামে প্রজাবিলি করে দেয় যেন।

যে হুকুম সেই কাজ। তারপর নাথু সিংকে ডেকে বললেন—নরহরি যেন এ-গলির মধ্যে কখনও না ঢোকে আর তাকে যদি কখনও দেখতে পাই তো গুলী করবো, ওকে বলে দিস।

তারপর থেকে নরহরিকে আর কখনও ভূতনাথ দেখেনি কলকাতায়।

গল্প করতে করতে নিবারণ যেন একবার থামলো। বোধ হয় ঘুম আসছিল ওর। ঘরের আলোটা একটু একটু কাঁপছে। ভূতনাথের চোখে যেন কেমন তন্দ্রার ভাব। আর শুধু কি নিবারণ আর ভূতনাথ? সমস্ত ভারতবর্ষই বুঝি তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। বাদশাহী আফিঙের নেশা। জাগতে চেষ্টা করলেও ভালো করে চোখ মেলা যায় না। এই একশ' বছরে রাজ্য ভাঙা-গড়ার ইতিহাস নেই, রাজবংশের উত্থান-পতনের গুরুগর্জন নেই। বেশ নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় সবাই ঘুমিয়েছে। সেই সর্বনাশা ঘুমের অন্তরালে কখন ধানকল এসেছে চুপিচুপি, এসেছে পাটকল আর গম-পেষা কল, কাপড়ের কল, আরো এসেছে স্টীম ইঞ্জিন, স্টীমার, ছাপাখানা আর টাকাছাপানো কল—কেউ টের পায়নি। তৈমুর লঙ-এর আরবী ঘোড়া আর নাদির শা'র তলোয়ার যা পারেনি তাই করেছে একশ' বছরের ইংরেজ রাজত্ব। ওপর নিচে সমস্ত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভেতরে ভেতরে সমাজের ভিত গিয়েছে ধসে। বুদ্ধ-যিশু-মহম্মদ আর চৈতন্যদেব যা পারেননি তাই পেরেছে বাষ্প আর বাষ্পীয় যান।

ঘুম ভেঙে গিয়েছে নিবারণের। ঘুম ভেঙে গিয়েছে ভূতনাথেরও।

বাইরে কে যেন জোরে কড়া নাড়ছে। ডাকছে—নিবারণ—নিবারণ—ও নিবারণ—

নিবারণ ধড়ফড় করে উঠে দরজা খুলে দিলে। বললে—কে, কদমদা নাকি?

—হ্যাঁ, শিগগির চল—বেলুড়ে যেতে হবে।

—কেন? এত রাত্রে?

—হ্যাঁ, স্বামীজি মারা গিয়েছেন।

—স্বামীজি?

—হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ!

কোথা দিয়ে ঘুমের মধ্যে রাতটা কেটে গিয়েছিল মনে নেই ভূতনাথের। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও যেন স্বপ্ন দেখেছে ব্রজরাখালকে। মনটা ছটফট করেছে ব্রজরাখালের কাছে যাবার জন্যে। ব্রজরাখাল এত বড় সংবাদ কেমন করে সহ্য করবে কে জানে! বাঙলা দেশে এত বড় নীরব ভক্ত আর কে ছিল!

ভোরবেলা কিন্তু আর এক কাণ্ড ঘটলো। 'যুবক-সঙ্ঘ'র সদর দরজার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো একটা। ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ। তারপরেই সুবিনয়বাবুর গলা।

—কই? এই বাড়িতে নাকি? ভূতনাথবাবু কি থাকেন এখানে?

শিবনাথ বুঝি ছিল সামনে। বললে—ভূতনাথবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন একটু—তা আপনি ভেতরে আসুন।

সুবিনয়বাবু বললেন—অথচ ক'দিন থেকেই আমি ভাবছিলাম—কী হলো, কী হলো—ভূতনাথবাবু আসে না কেন, সকলকে জিজ্ঞেস করি—কেউই বলতে পারেন না—শেষে আজ ভোরবেলা... বলতে বলতে ঘরের মধ্যে উদয় হলেন। সেই কালো চাপকানের ওপর কোনাকুনি পাকানো চাদরটা ফেলা। দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্যের মধ্যেও মুখের উদ্বিগ্নভাব ধরা পড়লো। ভূতনাথকে জেগে থাকতে দেখে সামনে এসে ঝুঁকে বললেন—কেমন আছো এখন ভূতনাথবাবু? তারপর একটু থেমে আবার বললেন—গোরাদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ নেই, কিন্তু আঘাতটা যে মারাত্মক হয়নি এই রক্ষে। সর্বজীবের যিনি নিয়ন্তা, যিনি ভূলোক-দ্যুলোকের অধিপতি সেই পরম...

শিবনাথ বললে—আমরা যথাসাধ্য সমস্ত রকমের যত্ন নিয়েছি। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি।

সুবিনয়বাবু বললেন—কিন্তু জবা-মা যে বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, আমাকে বলে দিয়েছে ও-জায়গায় ভূতনাথকে রেখে আসা ঠিক হবে না—হয়তো ঠিকমতো সেবা হচ্ছে না। জবা যে আমার বড় একগুঁয়ে মেয়ে শিবনাথবাবু। নিজেই আসতে চাইছিল, আমি তাকে বারণ করলাম—বললাম, আমি তাকে নিয়েই আসবো। আমি যে জবা-মাকে কথা দিয়ে এসেছি একেবারে।

শিবনাথ বললে—ব্রজরাখালবাবুর বড়কুটুম—তাঁকে জিজ্ঞেস না করে—

সুবিনয়বাবু বললেন—তিনি যদি আপত্তি করেন, তাই বলছেন শিবনাথবাবু?

শিবনাথ বললে—তাঁকে না জিজ্ঞেস করে নিয়ে যাওয়া কি ভালো হবে?

সুবিনয়বাবু বললেন—তা-ও তো ঠিক হবে না জানি, কিন্তু জবা মা-কে আমি গিয়ে কি জবাব দেবো? বড় একগুঁয়ে মেয়ে কিনা। কিন্তু ব্রজরাখালবাবুকে এখন একবার খবর দিলে হয় না?

—তিনি তো এখন বেলুড়ে—স্বামীজির ব্যাপারে.. তার দেখা পাওয়া শক্ত।

—তা হলে কি হবে শিবনাথবাবু?

এতক্ষণে ভূতনাথ যেন কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে পেলো। বললে—আমি আপনার সঙ্গেই যাবো সুবিনয়বাবু।

সুবিনয়বাবু যেন অকূলে কূল পেলেন। বললেন—আমাকে বাঁচালে ভূতনাথবাবু, জবা ভোরবেলা খবরটা পাওয়া অবধি বড় কাতর হয়ে আছে কি না—ক'দিন থেকেই আমরা ভাবছিলুম, ভূতনাথবাবু সেদিন বাড়ি গেল, আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। খবর পাঠালুম ব্রজরখালবাবুকে, তিনিও নেই, খবর পেলাম তিনি নাকি বাইরে গিয়েছেন।

শিবনাথ ধরাধরি করে ভূতনাথকে উঠিয়ে দিয়েছিল সুবিনয়বাবুর গাড়িতে। সারা রাস্তা সুবিনয়বাবু কথা বলেছেন। শিবনাথও সঙ্গে ছিল। 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে এসে পাঠকজী আর শিবনাথ নামিয়ে নিলে গাড়ি থেকে!

যে-ঘরে শোয়ানো হলো সে-ঘরটা জবার মা'র ঘর। একেবারে অন্দর-মহলে এনে ওঠানো হলো। জবা তৈরিই ছিল। বললে—বাবা, আপনি এখন একটু বিশ্রাম করুন, ভূতনাথবাবুকে আমি

দেখছি। তারপর হাবার মাকে ডেকে বললে—বৈজুকে বল্ ডাক্তারবাবুকে একবার যেন খবর দেয় আর একটা গামলায় খানিকটা গরম জল করে নিয়ে আয় তো তুই।

অনেকখানি পরিশ্রমের পর ভূতনাথ বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কখন দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে টের পায়নি। যখন আবার তন্দ্রা ভাঙলো, মনে হলো—কোথায় এসেছে সে। স্মরণ করতে একটু সময় লাগলো। তারপর ভালো করে নজর পড়তেই দেখলে পাশে বিছানার ওপর জবা বসে আছে মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। হঠাৎ এ মূর্তি দেখলে যেন চিনতে পারার কথা নয়। ভূতনাথের একেবারে কাছাকাছি বসে আছে। এতখানি সান্নিধ্যের অবকাশ অবশ্য আগে কখনও মেলেনি। জবার শরীরের গন্ধ যেন নাকে এসে লাগছে। হাতের স্পর্শে যেন রোমাঞ্চ হয়। ভূতনাথের শরীরে উত্তাপ যেন আরো বেড়ে গেল। সুবিনয়বাবু একবার ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু কিছু প্রশ্ন করার আগেই জবা বললে—বাবা, আপনি আবার কেন এলেন?

ডাক্তারবাবু তো বলে গেলেন কোনো ভয় নেই—জ্বরটাও একটু কম। আপনি যান বসুন গিয়ে, আমি যাচ্ছি।

সুবিনয়বাবু বললেন—মাথার ঘা-টা কেমন আছে মা?

জবা জলপট্টি দিতে দিতে বললে—ডাক্তারবাবু বললেন আরো কিছুদিন সময় নেবে। শুকোবার মুখ এখন, চুপচাপ কেবল শুইয়ে রাখতে বলেছেন, ঘা-টা ভালোর দিকে গেলেই জ্বরটাও কমে আসবে।

—দেখো মা, ছেলেদের ইচ্ছে ছিল না ভূতনাথবাবুকে এখানে পাঠায়, তোমার জন্যে নিয়ে এলাম এখানে, যেন বিপদ না হয় দেখো—বলে সুবিনয়বাবু চলে গেলেন।

জবা ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এসে আবার বসলো পাশে। ভূতনাথের জ্বরের ঘোরেও মনে হলো জবা যেন তার বড কাছাকাছি ঘেঁষে বসেছে। জবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন। এ এক নতুন অনুভব। এমন করে এত কাছাকাছি যেন কেউ আগে এসে বসেনি। অস্পষ্ট কুয়াশার মতো ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়ে শুধু পিসীমা'র কথা। অসুখ হলে এমনি করে পিসীমা কাছে এসে বসতো। বড় ভাল লাগতো তখন। কত বায়না করতো ভূতনাথ। অসুখ থেকে সেরে ওঠবার পর পিসীমা ভাত খেতে পারতো না। বিধবা মানুষ। দুপুরবেলা শুধু একবার পাথরের থালাটা নিয়ে বসতো খেতে। কিন্তু টের পেয়েই ভূতনাথ আস্তে আস্তে পাশে গিয়ে বসতো।

পিসীমা বলতো—ও মা, তুই ঘুমোচ্ছিস দেখে দুটো ভাত নিয়ে বসলাম।

ভূতনাথ নিবিষ্টচিত্তে দেখতো পিসীমা কেমন করে ডাল দিয়ে ভাত মাখছে, কেমন করে মুখে তুলছে। ভাতের সে[illegible] সমস্ত শরীরটা যেন লালায়িত হয়ে উঠতো তার।

—পিসীমা, কুলের অম্বল করোনি আজ?

—না বাছা, কুলের অম্বলে আর কাজ নেই, বাড়ির ছেলের অসুখ আর আমি কুলের অম্বল দিয়ে কি ভাত খাবো, তোর অসুখ ভালো হলে তখন আবার কুলের অম্বল করবো।

—কবে ভাত খাবো পিসীমা?

পিসীমার গলা দিয়ে যেন ভাত নামতো না। সান্ত্বনা দিয়ে বলতো—অসুখ থেকে উঠে কী কী খাবি বল্ দিকিনি শুনি?

কত তালিকা তৈরি করতো ভূতনাথ। শুয়ে শুয়ে লিখতো কাগজের ওপর অসুখ সারলে কী কী খাবে সে। কুলের আচার। বড়ি ভাজা। সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি। কত সাধারণ জিনিস সব। তবু অসুখের সময় ভাবতে কি ভালোই যে লাগতো! কিন্তু সেরে ওঠবার পর আবার যে-কে-সেই।

পিসীমা বলতো—ও কি রে, আর দুটো ভাত নে।

—পেট ভরে গিয়েছে পিসীমা।

—তবে যে বললি আজকে অনেক ভাত খাবি। এই তোর খাওয়া, তুই-ই যদি না খাবি তো কার জন্যে এত সব রান্না?

অসুখের সময় যে-মানুষ খাবার জন্যে এত ব্যস্ত, অসুখের পর সেই মানুষকেই খাওয়াবার

জন্যে কী পেড়াপীড়ি! বোধ হয় এমনিই হয় সকলের। এ-বাড়িতে এসেও সেই-সব কথা মনে পড়ে ভূতনাথের। দিনের বেলা যখন ভূতনাথ জেগে থাকে, কেউ থাকে না ঘরে—চারদিকে চেয়ে দেখে। ঘরের বাইরেই বসবার হল্-ঘর। জবা আর সুবিনয়বাবুর গলা শোনা যায়।

জবা মাঝে মাঝে বই পড়ে শোনায় বাবাকে, আধো জাগা আধো তন্দ্রার মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীতের সুর ভেসে আসে। মনে পড়ে যায় নিবারণের কথা। ছেলেটা যেন স্বপ্ন দেখছে কোন্ দূর স্বর্গের। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন। মনে পড়ে যায় সেই গানটা—'মা গো যায় যেন জীবন চলে, বন্দে মাতরম্ বলে'। কবে আসবে সেই তিন জন বাঙালী—যতীন বাঁড়ুজ্জে, বারীন ঘোষ আর অরবিন্দ ঘোষ? মনে পড়ে যায় প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডে সাহেবের হত্যার কাহিনী। এমন চমৎকার করে বলতে পারে নিবারণ! পুণার বড়লাটের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে র‍্যাণ্ড সাহেব। চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে সে-দৃশ্য। আর মনে পড়ে ১৮৯৯ সালের একটা দিন। নিঃশব্দে নাকি একদিন প্রত্যুষে ফাঁসি হয়ে যায় চাপেকার ভাইদের। সেই রক্তের বীজ বাঙলা দেশে এসে বুনেছে ওরা। ওই 'আত্মোন্নতি-সমিতি', 'অনুশীলন-সমিতি' আর 'যুবক-সঙ্ঘে'র ছেলেরা, একা-একা শুয়ে শুয়ে আরো এলোপাতাড়ি কত কি কথা মনে পড়ে।

বড়বাড়ির কথাও মনে পড়ে। ব্রজরাখাল আর তাকে দেখতে আসেনি, কত কাজ ব্রজরাখালের কখন সে আসবে? কোথায় ফুলবালা দাসীর ভেদবমি, কার অসুখের ওষুধ, আলমবাজারের মঠ, দক্ষিণেশ্বরের আশ্রম, নিজের যোগসাধনা। তারপর আছে চাকরি। তবু যে কেন চাকরি করে ব্রজরাখাল? কাদের জন্যে? বড়বাড়ির ছেলেদের রাত্রে পড়ানো তো সব দিন হয় না। যেবার প্লেগের হিড়িক হলো—কি কাণ্ডটাই না করলো সে ক'দিন। কলকাতার বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরে সেই অমানুষিক সেবা আর অমিত পরিশ্রম। এখনও মনে আছে ভূতনাথের। লম্বা-লম্বা ছুঁচের মতো যন্ত্র নিয়ে ইনজেকশন দিতে আসতো। বড়বাড়ির চাকর-ঝি কেউ বাদ গেল না। কী ব্যথা হয়েছিল হাতে ক'দিন ধরে। রাস্তায়-রাস্তায় যাকে দেখতে পায় তাকেই দেয় ছুঁচ ফুটিয়ে। হাত ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে। দলে দলে প্লেগের ভয়ে পালাতে শুরু করলো লোক। শেয়ালদা স্টেশনে নাকি ভিড়ের জন্যে টিকিট কাটাই দায়।

সারাদিন পরিশ্রমের পর ব্রজরাখাল যখন রাত্রে ফিরতো কী চেহারা তার!

ভূতনাথ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—আপিস যাচ্ছো না ব্রজরাখাল, তোমার চাকরি থাকবে তো?

ব্রজরাখাল বলেছিল—চাকরি বড়, না মানুষের প্রাণ বড়? তারপরে একটু থেমে বলেছিল—আর পারছিনে বড়কুটুম- -এ সাহেব আসে স্যালিউট দাও, ও সাহেব আসে স্যালিউট দাও—একটু স্যালিউট দিতে ভুল হয়েছে কি চাকরি নট—কিন্তু আমিও ঠিক করেছি এক ঠাকুর ছাড়া কারুর কাছে মাথা নোয়াবো না বড়কুটুম—বলে ঠাকুরের ছবিটার দিকে চেয়ে চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করেছিল।

ভূতনাথ বলেছিল-—কিন্তু তবে কেন তোমার ছাই চাকরি করা?

ব্রজরাখাল নিজের মনেই বলেছিল—সাধ করে কি আর চাকরি করি বড়কুটুম।

ভূতনাথও জানতো সে-কথা। ক'দিন ব্রজরাখাল বাড়িতে না এলেই লোকের পর লোক এসে হাজির হয়। এ এসে জিজ্ঞেস করে—ব্রজরাখালবাবু আছেন? ও এসে জিজ্ঞেস করে—ব্রজরাখালবাবু আছেন? মাসের প্রথম দিকটা অনেকগুলো লোক হাঁ করে বসে থাকে ব্রজরাখালের পথ চেয়ে।

বড়বাড়ির কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় ছোটবৌঠানের কথা। সেই তেতলার ঘরখানার কথা। উঁচু পালঙ্ক। কড়িকাঠ থেকে একটা রঙিন মশারি ঝুলছে। দিনের বেলায় চূড়ো করে বাঁধা। এতখানি পুরু গদির ওপর শাঁখের মতো সাদা চাদর পাতা। সারা দেয়ালে পটের ছবি। শ্রীকৃষ্ণের পায়েস-ভক্ষণ। গিরিগোবর্ধনধারী যশোদাদুলাল। দময়ন্তীর সামনে হংসরূপী নলের আবির্ভাব। ঠোঁটে একটা ভাঁজ করা চিঠি। মদনভস্ম। শিবের কপাল ফুঁড়ে ঝাঁটার মতন আগুনের জ্যোতি

বেরিয়ে আসছে। পাশের কাঁচের আলমারিতে পুতুল। বিলিতি মেম—ঘাগরা পরা গোরাপল্টন—মাথায় টুপি।

চোখ বুজলেই সব নিখুঁত মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে যায় ছোটবৌঠানের আলতা-পরা পা জোড়া। টোপাকুলের মতো টলটলে আঙুলগুলো। 'মোহিনী-সিঁদুরে' কিছু কাজ হয়েছে কি না কে জানে? অনেকদিন তো হয়ে গেল। ছোটকর্তা কি আজও সেইরকম নিয়ম করে বিকেলবেলা ল্যাণ্ডোলেট চড়ে বনমালী সরকার লেন পেরিয়ে চলে যায়? কড়ির মতো সাদা ঘোড়া দুটো টগবগ করতে করতে কি তেমনি বড়বাড়ির গেট পেরিয়ে ছুটতে শুরু করে?

সুবিনয়বাবু সেদিন এলেন ঘরে। বললেন—এখন কেমন আছো ভূতনাথবাবু?

ভূতনাথ বললে—একটু ভালো বোধ করছি—আর কিছুদিন বাদেই কাজ আরম্ভ করতে পারবো ভাবছি।

—কিসের কাজ?

—আপিসের কাজ—ভূতনাথ বললে।

—কোন্ আপিসের কাজ?

ভূতনাথ হঠাৎ এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলে না। তারপর বললে—আপনি একলা সব পেরে উঠছেন না।

—ও-ও-ও—সুবিনয়বাবু যেন এতক্ষণে বুঝতে পারলেন। বললেন—না ভূতনাথবাবু, ভাবছি, ও আমি তুলে দেবো—ও বুজরুকি আর করবো না, বিবেকে বাধছে, অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিতের দেশ, এখনও 'মোহিনী-সিঁদুরে'র কাটতি আছে এবং কাটতি আরো বাড়ছে, বোধকরি যতদিন চালানো ততদিন চলবে, আমার অর্থ সম্পত্তি সব দিয়েছে ওই 'মোহিনী-সিঁদুর'—উপনিষদে আছে...

বাধা পড়লো। জবা ঢুকলো ঘরে। বললে—বাবা, আপনি বিশ্রাম করুন গে যান, আমি ভূতনাথবাবুকে দেখছি।

সুবিনয়বাবু চলে গেলেন নিঃশব্দে। কিন্তু কথাটা শুনে ভূতনাথের কেমন ভয় হলো। 'মোহিনী-সিঁদুরে'র ব্যবসা যদি তুলে দেন তা হলে সে করবে কি?

জবা এসে বিছানার পাশেই বসলো। তারপর ভূতনাথের চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কিছু বলবেন আমাকে?

ভূতনাথ প্রথমে কেমনভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারলে না। শেষে বললে—বাবা যা বলছিলেন সত্যি?

—বাবা কী বলছিলেন?

—ওই যে বলছিলেন, 'মোহিনী-সিঁদুরে'র কারবার তুলে দেবেন?

জবা বললে—বাবার কথায় কান দেবেন না, বাবার এখন মাথার ঠিক নেই, এখন ওঁর কেবল মনে হচ্ছে এ লোক-ঠকানো ব্যবসা, কিন্তু লোকে যদি ইচ্ছে করে ঠকে তো আমরা কী করতে পারি? এ হচ্ছে কর্তাভজার দেশ, মন্ত্র-তন্ত্রের দেশ, অবতারবাদের পীঠস্থান, এর মতন ফলাও ব্যবসা আর আছে নাকি? এর পেছনে আরো মূলধন ঢালতে পারলে এ আরো চলবে।

ভূতনাথ খানিকটা আশ্বস্ত হলেও যেন নিঃসন্দেহ হতে পারলো না। বললে—কিন্তু উনি যে বললেন, এ সব বুজরুকি।

জবা বললে—আজকাল ওই রকম ওঁর মনে হচ্ছে—বাবার এখন মাথার ঠিক নেই।

হঠাৎ আর এক কথা মনে পড়লো ভূতনাথের। তবে তো ছোটবৌঠানকে সে ঠকিয়েছে। কোনো কাজই হয়নি সে সিঁদুরে। মিছিমিছি ছোটবৌঠান সেই সিঁদুর নিয়ে আজও ছোটকর্তার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে হয়তো। এখনও হয়তো পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। এখনও হয়তো তেমনি রাতের পর রাত ছোটকর্তার জন্যে জেগে জেগে কাটে! তারপর ভোরের দিকে যখন ছোটকর্তা আসে, যখন বংশী কাপড় বদলিয়ে দোতলার ঘরে শুইয়ে দেয়, নেশায় অচৈতন্য হয়ে

বাড়িতে ফেরে, তখন খবর যায় ছোটবৌঠানের ঘরে। ছোটবৌঠানের যশোদাদুলাল তেমনি জলচৌকির ওপর নিশ্চল নিথর দৃষ্টিতে পাথরের চোখ দিয়ে সব দেখে। সমস্ত বংশের পাপের জন্যে একা ছোটবৌঠানই হয়তো প্রায়শ্চিত্ত করে। তবে বুঝি পটেশ্বরী বৌঠানের বাবার গুরুদেবের কথাই সত্যি। পূর্বজন্মে পটেশ্বরী ছিল বুঝি দেববালা। দেবসভায় ব্রাহ্মণের অপমান করায় এ জন্মটা এমনি প্রায়শ্চিত্ত করে করেই কাটাতে হবে।

পটেশ্বরী বৌঠানের কথা মনে পড়তেই ভূতনাথের যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। মনে হলো—অনেকদিন যেন দেখেনি ছোটবৌঠানকে। যদি আর কখনও দেখা না হয়! এখনি ছুটে যেতে পারলে যেন ভালো হতো। অন্তত বড়বাড়িতে যেতে পারলেও শান্তি পাওয়া যেতো। কিছুটা তো কাছাকাছি। দেখতে না পাওয়া যাক। একটু সান্নিধ্য। একই বাড়ির ঘেরাও-এর মধ্যে। এক ছাদের তলায়। একই আবহাওয়ার মধ্যে। অন্তত বংশীর কাছে থাকতে পারলেও যেন ভালো হতো। বংশীর মুখে ছোটবৌঠানের কথা শুনতো। এ যেন এক অপূর্ব আকর্ষণ। মাত্র দু'দিনের দেখা। তা-ও অত অল্প সময়ের জন্যে। কিন্তু মনে হলো বৌঠানের কাছে না গেলে সে যেন বাঁচবে না। সে শুধু একবার গিয়ে বলবে—ছোট বৌঠান—সব মিথ্যে—সব মিথ্যে কথা। 'মোহিনী-সিঁদুরে' কিছু কাজ হয় না।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আগে তবে বলোনি কেন যে 'মোহিন সিঁদুরে' কিছু হয় না। সব তোমাদের বুজরুকি, কেন তবে বলোনি আমাকে?

জবা ভূতনাথের এই কথায় কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সান্ত্বনার সুরে বললে—বাবার কথা বিশ্বাস করে মিছিমিছি কেন মন খারাপ করছেন? বাবার কি এখন মাথার ঠিক আছে, মা মারা যাবার পর থেকেই বাবা কেবল ওই কথা বলছেন।

ভূতনাথ যেন বুঝতে পারলে না। বললে—মা? তোমার মা?

—আপনি শোনেননি? মা তো মারা গিয়েছেন।

—সে কি? কবে? কী হয়েছিল?

জবা বললে—এখনও পনেরো দিনও হয়নি হঠাৎ হার্টফেল করলেন, রাত্রে যেমন শুয়ে থাকেন বিছানায় তেমনি শুয়েছিলেন, ঠিক এই ঘরেই... সকালবেলা জানতে পারলুম—রাত্রে কেউ টেরও পাইনি। কাউকে এতটুকু কষ্ট দিয়ে যাননি। বলতে বলতে জবার চোখ দিয়ে যেন জল পড়বার উপক্রম হলো।

ভূতনাথ বললে—কই? আমি তো কিছুই জানতুম না, বাবাও কিছু বলেননি—অন্তত ব্যবহারেও কিছু জানতে দেননি।

জবা বললে—বাবাকে আপনি চিনলেন না, যে দিন মা মারা গেলেন সেদিনও বাবা সমাজে গিয়ে নিয়মমতো প্রার্থনা করে এসেছেন, সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন, কেউ বুঝতে পারেনি আমাদের এত বড় দুর্ঘটনার কথা, রাত্রে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছি বাবা যেন কেবল জপ করছেন—'ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'—'ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'—পরের দিন আমাকে সেই বাবার প্রিয় ব্রহ্মসঙ্গীতটি গাইতে বলেছেন—

—নাথ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ—

আমি আপন মনেই গেয়ে চলেছি আর বাবা হাতে চৌতালে তাল দিয়ে চলেছেন। শেষে আমার সঙ্গেই গলা মিলিয়ে গাইতে লাগলেন। আমি গান থামালুম, বাবা তখনও গান গাইছেন—

জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক
তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ...

বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না বাবাকে দেখে, বেশ স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমূল বদলে গিয়েছেন। কেবল বলেন, লোক ঠকানোর পাপেই আমার এই ঘটলো—এ ব্যবসা আমি তুলে দেবো মা।

কথা বলতে বলতে জবা যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ভূতনাথের। ভূতনাথ আস্তে আস্তে জবার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরলো। জবা কোনো আপত্তি করলে না। তারপর কি জানি কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে ভূতনাথ জবার হাতটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করলে। তবু যেন জবার কোন সম্বিত নেই। জবা যেন নিষ্প্রাণ প্রস্তর-প্রতিমা। ভূতনাথ অনেকক্ষণ ধরে তেমনি করে জবার স্পর্শের সান্নিধ্য আস্বাদ করতে লাগলো। জবা হাত না সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—'মোহিনী-সিঁদুর' উঠে গেলে আপনার ভয় কেন? চাকরি যাবে বলে?

ভূতনাথ দুই হাতে জবার হাতটা তখনও তেমনি করে ধরে আছে। মুখ আর বুকের মাঝামাঝি জায়গায় হাতটা লাগিয়ে রেখে বললে—ঠিক তা নয়—আগে জানতে পারলে ছোটবৌঠানকে অন্তত আমি বিশ্বাস করে 'মোহিনী-সিঁদুর' দিতুম না।

—ছোটবৌঠান আবার আপনার কে? কী হয়েছিল তার?

একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল ভূতনাথ পটেশ্বরী বৌঠানের কাছে যে, এ-কথা কাউকে বলবে না। এমনকি জবাকেও নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল ভূতনাথ। বললে—তার কথা তো তোমায় বলেছি, বড়বাড়ির ছোটবউ। ছোটকর্তা রাত্রে বাড়ি আসেন না—তাকে বশ করবার জন্যে 'মোহিনী-সিঁদুর' কিনে দিয়েছিলাম।

জবা যেন কি ভাবলো। তারপর বললে—আপনার ছোটবৌঠানের বয়েস কত?

—তোমার চেয়ে বড়, আমার চেয়ে কিছু ছোট।

জবা হেসে বললে—ছোটবৌঠানের জন্যে আপনার এতখানি দরদ ভালো নয়।

ভূতনাথ কিন্তু হাসতে পারলে না। বললে—পটেশ্বরী বৌঠানকে দেখলে তুমি এ-কথা বলতে পারতে না জবা।

জবা তেমনি হেসে বললে—আমি না দেখলেও কল্পনা করে নিতে পারি।

ভূতনাথ বললে—আর-সবাইকে কল্পনা করা যায়—কিন্তু ছোটবৌঠান কল্পনার বাইরে। তাঁকে না দেখলে কল্পনা করা শক্ত, দেখবার আগে আমারও সেই ধারণাই ছিল।

জবা বললে—তা হলে দেখছি জল অনেকদূর গড়িয়েছে। তারপর একটু থেমে বললে—'মোহিনী-সিঁদুর' কখনও বিফল হয় না জানতুম।

ভূতনাথ বললে—তার মানে?

—তার মানে, বড়লোকের বাড়ির স্বামী-পরিত্যক্তা রূপসী বউ, আপনার... হঠাৎ জবা হাত টেনে নিলে। রতন ঘরে ঢুকেছে।

রতন বললে—দিদিমণি, খোকাবাবু এসেছেন।

জবা বিছানা ছেড়ে উঠে বললে—বসতে বল্ হল্-ঘরে, আর চা করে আন—আমি আসছি। বলে এক নিমেষে জবা পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভূতনাথ যেন হতবাকের মতো অসহায় অপ্রস্তুত হয়ে শুয়ে পড়ে রইল। কিছু যেন করবার নেই। নিরুপায় সে। কে এক খোকাবাবু! কিন্তু সে যে-ই হোক এই মুহূর্তেই কি তাকে আসতে হয়! যেন অনেক কথা বলবার ছিল জবাকে, সবেমাত্র সূচনা হয়েছিল, কিন্তু বলা হলো না।

ও-পাশের হল্-ঘর থেকে ওদের গলার শব্দ কানে আসছে। জবা কথায় কথায় হাসছে! জবা এত হাসতে পারে! এত হাসির কথা হচ্ছে কার সঙ্গে? একবার মনে হলো চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখে আসে। আজ সবে ভাত খেয়েছে সে এতদিন পরে! এটুকু পরিশ্রমে কিছু ক্ষতি হবে না তার। কিন্তু লজ্জাও হলো। যদি ধরা পড়ে যায়। হঠাৎ মনে হলো—যেন চেনা-চেনা গলার আওয়াজ। যেন ননীলালের গলা! ঠিক সেইরকম কথার ভঙ্গী। ভারী কৌতূহল হলো দেখবার।

উঠতেই যাচ্ছিলো ভূতনাথ। আস্তে-আস্তে নিঃশব্দে উঁকি দিয়ে দেখে আসতে যাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ রতন আবার ঘরে ঢুকলে। কী একটা জিনিস নিয়ে চলে যাবে। ভূতনাথ ডাকলো।

রতন ঘাড় ফেরালো—আমায় ডাকছেন নাকি কেরানীবাবু?

—হ্যাঁ, শোনো এদিকে, কাছে এসো।

রতন কাছে সরে এল।

ভূতনাথ গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করলে—ও-ঘরে কে এসেছে?

রতন বললে—ও খোকাবাবু।

—খোকাবাবু? খোকাবাবু কে? এ-বাড়ির কে হয়?

—এ-বাড়ির জামাইবাবু হবে, দিদিমনির সঙ্গে বিয়ে হবে।

—ওর আসল নামটা কী?

—তা জানিনে আমি—বলে রতন চলে গেল।

সেদিন রাত্রে শোবার আগে জবা একবার ঘরে এল। বললে—ওষুধটা খাননি কেন?

ভূতনাথ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কোনো জবাব দিলে না। জবা ওষুধের শিশিটা নিয়ে কাছে এল। বললে—জ্বর ছেড়ে গিয়েছে বলে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করবেন নাকি? নিন, হাঁ করুন—

ভূতনাথের কী মনে হলো কে জানে। নিঃশব্দে ওষুধটা খেয়ে নিলো। কোনো ওজর-আপত্তি করলে না। কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। জবা ওষুধ খাইয়ে চলেই যাচ্ছিলো। হঠাৎ ভূতনাথ শাড়ির আঁচল চেপে ধরতেই কাঁধ থেকে কাপড়টা খসে পড়লো জবার। একটি মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু এক মুহূর্তে দু'জন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। এক নিমেষের মধ্যে যেন একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেল।

জবার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বললে—অভদ্র নীচ কোথাকার—বলে আর দ্বিরুক্তি না করে ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন খুব ভোরেই ঘুম ভাঙলো। কিম্বা হয়তো সারারাত ঘুমই হয়নি ভূতনাথের। নিজের মনের মধ্যে সারারাত কেবল এই একটা দুশ্চিন্তাই জেগেছে যে, এ-বাড়িতে সে জবার কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? জবা তো শুধু নারী নয়, সে যে একাধারে তার মনিব। মাসে মাসে সাত টাকা মাইনে আর এক বেলা খাওয়ার পরিবর্তে সে এখানে দাসত্ব করে। মানুষের পক্ষে যা অপরাধই মাত্র, তার পক্ষে যে তা ঘোরতর অপরাধের সামিল।

যথারীতি সুবিনয়বাবু রোজ ভোরবেলা একবার ঘরে এসে কুশল প্রশ্ন করেন। সেদিনও এলেন। তখনও ভালো করে সকাল হয়নি। কিন্তু এসে বললেন—ভূতনাথবাবু, তোমার একটা চিঠি আছে।

চিঠি! চিঠি ভূতনাথের বড় একটা আসে না কখনও। চিঠি তাকে কে লিখতে গেল? বিশেষ করে এই ঠিকানায়। সুবিনয়বাবু বললেন—একটি লোক চিঠি নিয়ে এসেছে—নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠিটা খুলে পড়তেই ভূতনাথের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হলো। ছোটবৌঠানের চিঠি।

সুবিনয়বাবু বললেন—তা হলে রতনকে বলছি ওকে ডেকে দিক এ-ঘরে—বলে সুবিনয়বাবু চলে গেলেন।

ভূতনাথের সমস্ত শরীর কাঁপছিল। চিঠিটা আবার পড়লো সে।

'প্রাণাধিক ভূতনাথ,

পরে বংশীর নিকট এইমাত্র তোমার সংবাদ পাইলাম। কেমন আছো এখন? বড় উদ্বেগ বোধ করিতেছি। বংশীকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। যদি সম্ভব হয় এখানে চলিয়া আসিবে। পাল্কি পাঠাইলাম। আশীর্বাদ জানিবে।

তোমার ছোটবৌঠান'

বার বার চিঠিটা পড়েও যেন তৃপ্তি হলো না ভূতনাথের। এমন করে পটেশ্বরী বৌঠান যে তাকে চিঠি লিখবে এ যেন কল্পনাও করা যায় না। ভূতনাথের জীবনে এই সামান্য কাগজের একটা টুকরো যেন এই মুহূর্তে এক অমূল্য সম্পদ বলে মনে হলো। ক্ষমতা থাকলে এখনি উঠে বসতো ভূতনাথ। তারপর বিশ্বসুদ্ধ লোককে এই চিঠিখানা দেখাতো।

বংশী এল। ভূতনাথকে দেখবার জন্যে তারও যেন আগ্রহের শেষ নেই। এসেই বললে—শালাবাবু, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার আজ্ঞে!

ভূতনাথ যেন এতদিনে একজন নিতান্ত আপনার লোক পেয়ে গিয়েছে। শুধু বললে—বংশী তুই...

বংশী বললে—ক'দিন থেকেই খবর করছি—শালাবাবু কোথায় গেল—ছোটমা'ও অস্থির—থানায় লোক পাঠাই, বড়বাড়ির চাকর-বাকর সবাইকে শুধোই, ভৈরববাবু দশ জায়গায় ঘোরেন, তাঁকেও শুধোলাম, তিনি বললেন—কেল্লার গোরারা বোধহয় জখম টখম করে দিয়েছে দেখ—মধুসূদনকে শুধোতে সে বললে—আপদ গিয়েছে তো বাঁচাই গিয়েছে, তার গায়ের জ্বালা আছে কিনা আপনার ওপর।

ভূতনাথ বললে—কেন, তার গায়ের জ্বালা কেন রে আমার ওপর?

—ওই যে আপনি হলেন গিয়ে আমাদের তরফের লোক, ওর সুবিধা হচ্ছে না, আপনি আসার পর থেকে তেমন বাব্ আদায় হচ্ছে না, আর ঝি-চাকরে ঝগড়া হলে তো ওরই লাভ, বদ্‌লা এনে নতুন লোক বসিয়ে দেবে, বাব্ নেবে, তারপর চাকরি করে দিলে এক টাকা করে মাইনে থেকে কেটে নেবে—সেটা পুরোপুরি হচ্ছে না।

ভূতনাথ বললে—আমি তো আর ওর পাওনায় ভাগ বসাতে যাচ্ছি নে।

—ভাগ বসাতে যাবেন কেন, কিন্তু ওর তো ভয় আছে, আপনি যদি ছোটমা'কে বলে দেন, ছুটুকবাবুর সঙ্গে আপনার পেয়ার আছে, দেখেছে আপনি ছুটুকবাবুর আসরে গান-বাজনা করে যান—যদি বলে দেন? ও সব জানে যে, সব দেখে যে—চোখজোড়া ছোট হলে কী হবে—নজর যে আছে সাড়ে আঠারো আনা।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে বংশী বললে—ওদিকে এক কাণ্ড হয়েছে শোনেননি—না, আপনি আর শুনবেন কী করে, ঠন্‌ঠনের দত্তবাবুরা মেজবাবুর পায়রা চুরি করেছিল।

—পায়রা?

—হ্যাঁ শালাবাবু, গেরোবাজ পায়রা, পশ্চিম থেকে নিলেমে কিনেছিল ভৈরববাবু দেড়শ' টাকা দিয়ে একজোড়া, সেই পায়রা তিন বার লড়াই-এ জিতেছিল, ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছিলো না তাদের, মেজবাবু সকালবেলা উড়িয়ে দিয়েছে রোজকার মতো, বার কয়েক আকাশে চক্কর মেরে তারা যেমন ঘুরে আসে রোজ, সেদিন আর তেমন এল না, শ্যামবাজারের দিকে উড়ে গিয়েছিল, তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল—সন্ধ্যে পর্যন্ত দেখা নেই, মেজবাবুর মেজাজ খারাপ রইল ক'দিন ধরে, বেণীও সামনে যেতে ভরসা পায় না। শেযে পাওয়া গিয়েছে ছেনিবাবুর হাটখোলার মেয়েমানুষের ঘরে।

—সে কি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ শালাবাবু পুলিশ এল, মামলা হলো, দু'শ টাকা আদালতে গুণে দিয়েছে ছেনিবাবু—পরশু যে আমাদের বড়বাড়িতে তাই ধুমধাম হলো খুব, বেণীর দু'টাকা বক্‌শিশ হয়ে গিয়েছে, চাকরদের কাপড় হলো একখানা করে, মেজবাবু দলবল নিয়ে গঙ্গায় পানসি চালাতে গেলেন, সঙ্গে বড়মাঠাকরুণ, মেজমাঠাকরুণ, ছোটমাঠাকরুণ সবাই গিয়েছিল, নাচ-গান-বাজনা খানা-পিনা করে সমস্ত রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু আমার মনটা ভালো ছিল না—কেবল ভাবছিলাম শালাবাবুর কী হলো!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ঘড়িবাবুর খবর কী?

—তাকেও শুধোলাম আজ্ঞে, অত হৈ চৈ, তিনি কিন্তু সেই বৈঠকখানা ঘরে শেতলপাটির ওপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছেন, বললেন—ছোকরা বেঁচে গিয়েছে খুব, ভেগেছে নির্ঘাৎ—বলে ট্যাকঘড়িটা একবার বড় ঘড়িটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিলেন। পাগল না পাগল—কিন্তু আর দেরি নয়, আপনি চলুন আজ্ঞে, অনেক কাজ ফেলে এসেছি, ওদিকে আবার ছুটুকবাবুর বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে।

ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। ছুটুকবাবুর বিয়ে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ শালাবাবু, বড়মা ধরে বসেছেন, তাঁর ভারি ইচ্ছে, নিজের তো ছুঁচিবাই, কবে আছেন কবে নেই, সখ হয়েছে বউ দেখে যাবেন, অধর ঘটকী ক'দিন ধরে যাতায়াত করছে, সিন্ধু বলছিল আসছে মাসে নাকি হবে। তা এখন থেকে তো তৈরি হতে হবে, ঘর-বাড়ি সাফ করা, কেনা-কাটা—হাতে আর সময় কই বলুন?

রতন ঘরে এল। বললে—দিদিমনি বললেন, আপনার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে কেরানীবাবু—

ওষুধ! ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু দিদিমনি কোথায়?

—দিদিমনি ভাঁড়ার বার করে দিচ্ছেন।

—একবার ডেকে দিতে পারো? কিন্তু তারপর কী ভেবে বললে—আচ্ছা থাক, বাবু কোথায়?

—বাবুকে ডাকবো? বলে রতন চলে গেল।

ভূতনাথ বংশীর দিকে ফিরে বললে—বড়বাড়ির আর কী খবর?

কী জানি ছোটবৌঠানের কথা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে কেমন লজ্জা করতে লাগলো ভূতনাথের। আর কখনও তার কাছে যাবার সুযোগ মিলবে কি না কে জানে? আর একবার যদি তার কাছে যাওয়া যেতো।

বংশী বললে—লোচন ক'দিন ধরে আপনার খোঁজ করছিল।

—আমার খোঁজ করে কেন সে?

—আজ্ঞে আয় কমে গিয়েছে যে তার, তামাক আর কেউ খাচ্ছে না, ছুটুকবাবুর আসরে বরাদ্দ ছিল তিন সের তামাক হপ্তায়, তাও এদানিং বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেন—তামাক কেউ খায় না, বিড়ি খায় সবাই, তা সবাই যদি বিড়ি-সিগারেট ধরে, ওর চলে কী করে আজ্ঞে, লোচন আমাকে বলেছিল সেদিন—শালাবাবুর সঙ্গে তোর এত ভাব, ওকে তামাক ধরাতে পারিস না, না হয় মাসে কয়েকটা করে পয়সাই নেবো আমি—আর ওদিকে ইব্রাহিমেরও ভারি ভয় লেগে গিয়েছে।

—কেন?

বংশী হাসতে লাগলো। বললে—যে-যার ভাবনা নিয়ে আছে শালাবাবু, আমার ভাইটাকে আমি যেমন বড়বাড়িতে ঢোকাবার কত চেষ্টা করছি কিছুতেই পারছি না, ওরও তেমনি—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ও আবার কাকে চাকরিতে ঢোকাবে?

—আজ্ঞে চাকরিতে ঢোকাবে আর কাকে, নিজের চাকরি তাই-ই থাকে কি না দেখুন, মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে ভাবনায়, অমন বাবড়ি চুল, পাঠানী দাড়ি, তাই আর ভালো করে আঁচড়াচ্ছে না...

—কেন?

—আজ্ঞে খবর সব পেয়েছে ও, খবর তো আর জানতে কারো বাকি নেই, বাবুরা যে হাওয়া-গাড়ি কিনছে, সে-গাড়ি চালাতে তো আর কোচোয়ান লাগবে না, ঘোড়াও লাগবে না, হাওয়ায় চলবে, বিলেতে একরকম গাড়ি উঠেছে শোনেননি?

—হাওয়া-গাড়ি? বাবুরা কিনবে নাকি হাওয়া-গাড়ি? কার কাছে শুনলি তুই?

বংশী বলতে গিয়েও যেন থেমে গেল। শেষে বললে—আজ্ঞে শুনেছি আমি ভালো লোকের মুখ থেকেই, চুনীদাসী—ছোটবাবুর মেয়েমানুষ...

চুনীদাসী! রূপোদাসীর মেয়ে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—গিয়েছিলি নাকি চুনীদাসীর বাড়িতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ শালাবাবু, গিয়েছিলাম, ছোটোবৌঠান যেতে বলেছিল বলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু না গেলেই ভালে হতো আজ্ঞে।

—কেন?

—আজ্ঞে ছোটমা'র সেদিন উপোস, উনি পুজো-আচ্চা করেন তো মাঝে মধ্যে, নীলের উপোস ছিল সেদিন, নির্জলা একেবারে, সারাদিন ধকল গিয়েছে নীলের পুজোর, রূপলাল ঠাকুর এসে যশোদাদুলালের পুজো করে গিয়েছে, দুপুরবেলা চিন্তা সেই নৈবিদ্যি থালায় বারকোষে সাজিয়ে বার-বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে সরকারী পুজোবাড়ির সিধে-পত্তোর সব নিয়ে একসঙ্গে বার-বাড়ির লোক গিয়ে রূপলাল ঠাকুরের বাড়ি দিয়ে আসবে। আমি যেমন গিয়েছি সন্ধ্যেবেলা, দেখি ছোটমা'র মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে—তখনও জল খাওয়া হয়নি। বরাবর উপোসের পর আমি গিয়ে ছোটবাবুর কাছে জলের বাটি নিয়ে যাই, ছোটবাবু পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে দেন, তারপর সেই জলটুকু খেয়ে ছোটমা উপোস ভাঙেন, কিন্তু ছোটবাবু সেদিন বাড়ি আসেননি, ছোটমা'র কিছু পেটে পড়েনি।

—কেন, ছোটবাবু বাড়ি আসেননি কেন?

—তা কি আমি জানি, না ছোটমা জানেন? ছোটমা আমাকে বললে—যা বংশী, তুই একবার জানবাজারে যা একবাটি জল নিয়ে—আর দেখে আসিস বাবু কেমন আছেন। তা সেই অন্ধকারেই গেলাম আজ্ঞে জানবাজারে। গেলাম মরতে মরতে—গিয়ে দেখি সে এক কাণ্ড—ছোটবাবু শুয়ে আছে পা ভেঙে, খুব বেশি নাকি খেয়ে ফেলেছিলেন, মাথার ঠিক ছিল না, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পা ফস্‌কে পড়ে গিয়েছেন—আমাকে দেখে কী রাগ, বললেন—বংশী, তোকে বারণ করেছি না—এ-বাড়িতে আবার এসেছিস!

ছোটবাবুর রাগের মাথায় কিছু উত্তর দিতে নেই, তা হলেই আরো রেগে যাবেন। কিছুই বললাম না, চুপ করে রইলাম। আস্তে-আস্তে পায়ের কাছে বাটিটা নিয়ে ধরলাম গিয়ে। ছোটবাবু পা সরিয়ে নিলেন। বললেন—কে তোকে আসতে বলেছে এখানে? বেরো এখান থেকে—তবু কিছু উত্তর দিলাম না। মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইলাম। জানি কথা বললে আরো রাগ চড়ে যাবে। তারপর খানিক পরে ছোটবাবু বললেন—পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে তো।

বুঝলাম এবার ঘুম আসবে। তারপর ছোটবাবু যেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন, অমনি পায়ের আঙুলটা টপ্ করে জলে ছুঁইয়ে নিলাম আজ্ঞে—কিন্তু জলটা নিয়ে চলে আসছি হঠাৎ দেখি সামনে নতুন-মা।

ভূতনাথ বললে—নতুন-মা কে?

—আজ্ঞে ওই চুনীদাসী, ওকে আমরা নতুন-মা বলি কিনা, তা আমাকে দেখেই নতুন-মা বলে উঠলো—বংশী তুই কখন এলি?

বললাম—বাবু কাল বাড়ি যাননি, তাই দেখতে এসেছিলাম আজ্ঞে।

—হাতে কী?

—আজ্ঞে ছোটমা আজ নীলের উপোস করেছে কিনা।

নতুন-মা'র হাতে ছিল পানের ডিবে। দিনরাত পান খায় নতুন-মা, এক মুখ পান, ভালো করে চেয়ে দেখলাম নতুন-মা যেন আরো ফরসা হয়েছে, আরো মোটা হয়েছে, এক-গা গয়না, নাকে নাকছাবিটা চকচক করছে।

নতুন-মা খানিক ভেবে বললে—হ্যাঁ রে বংশী, তোর ছোটমা শুনেছে আমি মোটর-গাড়ি কিনছি?

বললাম—হাওয়া-গাড়ি? কই শুনিনি তো?

—তোর ছোটমাও গাড়ি কিনবে নাকি? শুনেছিস কিছু?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে চলেই আসছিলাম। ছোটমা বাড়িতে না খেয়ে বসে আছেন। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে এসেছি, নতুন-মা আবার ডাকলে—বংশী, শুনে যা একবার।

কাছে যেতেই নতুন-মা বললে—এই রাস্তা দিয়েই তো যাচ্ছিস, যাবার পথে ওই মোড়ের দোকানে একবার খবর দিয়ে যাবি তো, বলবি আরো পনেরোটা সোডার বোতল যেন পাঠিয়ে দেয়, আজ রাতটা ওতেই চলে যাবে। কাল সকালবেলা আবার খবর দেবো, আর দু'সের বরফ

ওই সঙ্গে। এই নে টাকা—বলে তিনটে টাকা দিলে আমার হাতে।

ভূতনাথ বললে—পনেরো বোতল সোডা! অত সোডা কী করবে বংশী?

বংশী হাসলো, বলল—মদ খাবে আজ্ঞে, কপালে ভাত জুটতো না যার এককালে, এখন সেই লোকের আজ ছোটবাবুর দৌলতে—

হঠাৎ সুবিনয়বাবু ঘরে ঢুকলেন—আমাকে ডাকছিলে নাকি ভূতনাথবাবু? না, উঠতে হবে না।

ভূতনাথ উঠে বসে বললে—আমি তো একটু ভালো হয়েছি, বড়বাড়ি থেকে ওঁরা পাল্কি পাঠিয়েছেন—তাই ভাবছি—

সুবিনয়বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—তা হলে বেশ তো... কিন্তু জবা-মাকে একবার খবর দাও। তার অনুমতিটা একবার—ওরে রতন—

সেদিন 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিস থেকে পাল্কি করে যেতে যেতে বার-বার মনে হয়েছিল বটে যে, জবা যাবার সময় একবার দেখা করতেও এল না! কিন্তু আর একটা দুর্বার আকর্ষণে ভূতনাথ তখন সে অপমানও ভুলতে পেরেছে। অসভ্য ছোটলোকের মতনই তো ব্যবহার করেছে সে জবার সঙ্গে। অমন ব্যাপারের পর ভূতনাথেরও তো লজ্জার আর সীমা ছিল না।

মাধববাবুর বাজার পেরিয়ে ভূতনাথের পাল্কি তখন দুলতে-দুলতে চলেছে। পাল্কি-বেহারাদের মুখের সেই বোল্ এখনো যেন এত বছর পরেও কানে এসে বাজে—হিন্-তাল, হিন্-তাল, হিন্-তাল, হিন্-তাল—হিন্-তাল, হিন্-তাল, হিন্-তাল, হিন্-তা—ল্—ল্...

পাল্কি এসে সদর দরজা দিয়েই ঢুকলো বটে। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কোথায় চললো ঠিক ধরা গেল না। আস্তাবলবাড়ি, রান্নাবাড়ি, ভিস্তিখানা পেরিয়ে গিয়ে থামলো একেবারে বড়বাড়ির দক্ষিণে। সে-দিকটায় গিয়ে নজরে পড়ে ধোপাদের কাপড় কাচবার জায়গা, বাগান, পুকুর। এদিকে কখনও আসেনি ভূতনাথ আগে। বংশীর গলা কানে এল—'এইবার পাল্কি নাবাও হলধরদা'।

পাল্কি নামালো ওরা। বংশী এসে দরজা ফাঁক করে মখমলের ঝালর-দেওয়া পর্দা সরিয়ে দিলে। মুখ বাড়িয়ে বললে শালাবাবু, এখানেই নামতে হবে আজ্ঞে।

দুর্বল শরীরটা ঠিক যুৎসই হয়নি তখনও। একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথাটা ঘুরে যায়। বংশী ধরলো এক পাশে। তারপর বললে—আমার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে চলুন।

প্রথমটা সিঁড়ির মুখে অন্ধকার। ছোটো-ছোটো সিঁড়ি। ভালো ঠাহর পাওয়া যায় না। তারপর ভেতরে ঢুকে বেশ ফুটফুটে। চলতে চলতে একটা জায়গায় উঠে বংশী একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। ছোটখাটো ঘরটা। এককালে বুঝি সাজানো ছিল এ ঘর। এখনও পালঙ আছে একটা। দেয়ালে পঙ্খের কাজ করা। উড়ন্ত পরী, বেশ-বাস অবিন্যস্ত। কোথাও পাখি উড়ে যাচ্ছে, মুখে তার রঙিন চিঠি। আরো কত কী আঁকা। দেয়ালের বালি খসে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। তবু ছবিগুলো ঠিক রুচিশীল বলা যায় না। চারদিকে চেয়ে দেখে ভূতনাথের দৃষ্টিতে কেমন কৌতূহল ফুটে উঠলো।

বংশী বললে—ছোটমা এই ঘরটাতেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা করেছেন আজ্ঞে। কোনো অসুবিধে হবে না আপনার এখেনে।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ব্রজরাখাল যদি খোঁজে—তোমাদের মাস্টারবাবু?

বংশী বললে—মাস্টারবাবু? তিনি তো আর আসেন না এখানে।

—সে কি! ব্রজরাখাল কোথায় গেল?

—আজ্ঞে, তা বলতে পারিনে। বহুদিন আসছেন না তিনি। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এ-বাড়ির।

সে কি! আকাশ থেকে পড়লো যেন ভূতনাথ। তার সঙ্গে এ-বাড়ির সম্পর্ক তো ব্রজরাখালকে কেন্দ্র করেই। ব্রজরাখালই যদি চলে গেল তা হলে এখানে থাকবে সে কোন্ অধিকারে। ওদিকে 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসও যদি উঠে যায় তা হলে সে যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে! কেমন যেন নিজেকে অসহায় বোধ করলো ভূতনাথ। আবার সেই ফতেপুরেই ফিরে যেতে হবে নাকি।

খাবে কী সে সেখানে? থাকবেই বা কোথায়? এতদিনে সে বাড়ি কী অবস্থায় আছে কে জানে। পাশের বিপিন কলুদের তেঁতুল গাছের জঙ্গল বোধ হয় আরো বেড়ে-বেড়ে তাদের বাড়িটাও গ্রাস করে নিয়েছে।

সেইখানে বাঘের আড্ডা হয়েছে হয়তো। হয়তো সাপ-ক্ষোপের বাসা হয়েছে, রান্নাঘরটা তো ছিল বাঁশঝাড়ের লাগোয়া। বাঁশগুলো কে আর কাটছে। বাঁশগুলো সব হয়তো নুয়ে পড়েছে খড়ের চালের মাথায়। উই ঢিপিতে ঢেকে গিয়েছে দাওয়া। পিসীমা'র অত যত্নের রান্নাঘর। গোবর লেপে লেপে কী সুন্দরই বাহার করতো পিসীমা। তারপর গোবর লেপা হলে মাটির দাওয়ার ওপর ঘুঁটের আগুনে পোরের ভাত চাপিয়ে দিতো। কত বছর খায়নি পোরের ভাত। কাঁঠাল বিচি ভাতে, পোরের ভাত আর সরের ঘি। কিন্তু সে কথা থাক, ব্রজরাখাল তাকে ফেলে গেল কোথায়? কেনইবা গেল! বংশীকে জিজ্ঞেস করলে সে-ও বিশেষ কিছু বলতে পারে না।

ওই ঘরটার মধ্যেই কাটলো সমস্তটা দিন। একবার ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেল ভূতনাথকে। কোট ধুতি বুট জুতো পরা ডাক্তার। কী একটা ওষুধও বুঝি নিয়ে এল বংশী। বললে—খেয়ে ফেলুন দিকি ওষুধটা—বেশি তেতো লাগলে এই ফলগুলো খাবেন—বেদানা, আঙুর, নাশপাতি কুচিয়ে কেটে এনেছে রেকাবিতে। বললে—আপনার জন্যে আজ্ঞে বকুনি খেতে হলো ছোটমা'র কাছে।

—কেন?

বংশী বললে—আমার হয়েছে জ্বালা শালাবাবু, চিন্তা কাজ করবে না তা-ও আমার দোষ, এই যে আপনি রুগী মানুষ বাড়িতে এসেছেন, ফলগুলো কুচিয়ে রাখতে পারে না ও, ভাঁড়ারে গিয়ে যদি রাঙাঠাকমাকে বলি তো শত হেনস্থা হবে আমার, ফরিস্তি দাও কি হবে, কে খাবে, কেন খাবে, কী অসুখ, শালাবাবু তোর ছোটমা'র কে হয়! হ্যান্ ত্যান্, ছোটমা তাই চিন্তাকে দিয়েছিল ফল কুচোতে, অথচ ওর কাজ কী বলুন, আমার মতো কাজ করতে হতো তো বুঝতো। মেয়েমানুষের সোয়ামী থাকলে সেও কি বসিয়ে খাওয়াতো ওকে—না কি বলুন শালাবাবু—অন্যায্য কিছু বলেছে ছোটমা?

ভূতনাথ ঢক-ঢক করে ওষুধ খেয়েই মুখটা বিকৃত করে বললে—বড্ড তেতো ওষুধ বংশী।

—আজ্ঞে, খাঁটি ওষুধ তো তেতো হবেই, শশী ডাক্তারের সব খাঁটি ওষুধ কিনা, ছোটমা বলেছেন যত টাকা লাগে সব দেবো আমি, রোগ সারা চাই—সস্তা ওষুধ হলে চলবে না। তা ছোটমা'রও তো ক'দিন থেকে মেজাজ ভালো যাচ্ছে না কিনা।

—কেন? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—ছোটমা যে নেকাপড়া জানা মেয়ে শালাবাবু, মেজমা'র মতো নয় তো যে, দিন-রাত কেবল বাঘবন্দি খেলবে, কি বড়মা'র মতন নয় যে, দিনের মধ্যে চৌষট্টিবার চানই করছে কেবল, কেবল সাবান আর জল ঘাঁটছে, ছোটমা হলো মনিষ্যি যাকে বলে—কিন্তু পড়েছেন আজ্ঞে ছোটবাবুর মতন মানুষের হাতে, কপালের লেখন কে খণ্ডাবে বলুন। এই যে এতদিন পরে বাড়ি এলেন, মানুষটা পড়েছিলেন বাড়ির বাইরে সেই জানবাজারে নতুন-মা'র বাড়িতে, কেমন আছেন, ছোটমা'র দেখতেও তো ইচ্ছে হয়, কিন্তু না-ডেকে পাঠালে সে-হুঁশও নেই, শেষে ডেকে পাঠালুম ছোটমা'র ঘরে। ছোটবাবু তখন বেরোচ্ছেন, কাপড় কুঁচিয়ে দিয়েছি, জুতো পরিয়ে দিয়েছি, রুমাল দিয়েছি, আঙটি দিয়েছি, টাকাকড়ি গুছিয়ে দিয়েছি, সব শেষে বললুম—ছোটমা একবার ডাকছিলেন আপনাকে ওপরে।

ছোটবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন। বললেন—কেন?... আচ্ছা চল যাচ্ছি—

যাবার মুখে এলেন ঘরে। আমিও এলুম পেছন পেছন। সব শুনলুম আড়ি পেতে। ছোটবাবু বললেন—ডেকেছিলে নাকি আমাকে?

ছোটমা গলায় আঁচল দিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম করলে। বললেন—কেমন আছো?

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কিছু দরকার আছে কি?

—না, দরকার আর কি, এমনি একবার দেখতে ইচ্ছে হলো, অনেকদিন দেখিনি। আজ আমার হিতসাধিনী ব্রত।

ছোটবাবু হো-হো করে হাসলেন—আবার তোমার সেই ন্যাকামি আরম্ভ হলো।

ছোটমা কিছু কথা বললেন না। ছোটবাবু রেগে গেলেন বুঝি। বললেন—সেই কান্না আর কান্না, কেন, হাসতে পারো না, হাসতে পারো না আর-সব বউদের মতো, দেখো তো বড়বৌঠান, মেজবৌঠান সবাই কেমন করে হেসে খেলে আছে, হাসো—গাও—যা খুশি করো—যা দু'চক্ষে দেখতে পারি না তাই হয়েছে।

—কিন্তু হাসি যে আমার আসে না।

—কেন আসে না? কী হয়েছে তোমার?

—কিন্তু তুমিই কি হাসো—এ-ঘরে তোমার হাসি দেখিনি কখনও। অথচ শুনতে পাই তুমি ভারি আমুদে লোক, আমি কী দোষ করলুম বলতে পারো?

—তার কৈফিয়ৎ তোমার কাছে দিতে হবে নাকি, আমি চললুম। এখন সময় নেই তোমার ন্যাকামি শোনবার—বলে ছোটবাবু ফিরছিলেন।

ছোটমা সরে এসে তাড়াতাড়ি ছোটবাবুর চাদরের খুঁটটা ধরলেন। বললেন—না গেলেই নয়?

ছোটবাবুর ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছিলো বোধ হয়। ল্যাণ্ডোগাড়ি জোতা রয়েছে, একবার উঠলেই টগবগ করে ছুটতে আরম্ভ করবে ঘোড়া দুটো। ওদিকে নেশার সময় বয়ে যাচ্ছে, জানি তো সব, নতুন-মা গেলাস সাজিয়ে বসে থাকবে কিনা, আর ছোটবাবুও মেজাজী লোক, সব কাজ ঘড়ি ধরে, নেশা মাথায় চড়ে গেলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না আজ্ঞে। তা ছোটবাবু একবার শুধু ফিরে তাকালেন ছোটমা'র দিকে। ছোটমা আবার বললেন—না-ই বা গেলে আজ সেখানে।

ছোটবাবু রেগেই ছিলেন! বললেন—না গিয়ে তোমার আঁচল ধরে বসে থাকবো, কেমন?

ছোটমা কিছু কথা বললেন না। ছোটবাবু বলতে লাগলেন—বড়বাড়ির পুরুষমানুষদের তুমি তেমনি অপদার্থ ভাবো নাকি?

—কিন্তু তুমি তো মানুষ—তোমারও তো মনুষ্যত্ব...

ছোটবাবু এ-কথার আর জবাব দিলেন না আজ্ঞে, শুধু যেতে যেতে হেসে বললেন—বউ-এর কাছ থেকে যে মনুষ্যত্ব শেখে তার গলায় দড়ি ছোটবউ।

বংশী গল্প বলতে পারে বেশ। ভূতনাথ একমনে শুনছিল। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ছোটবৌঠানের এতটুকু যদি উপকারে আসতে পারা যেতো! হঠাৎ ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বংশী, তোর ছোটমা সিঁদুর পরে কপালে?

—আজ্ঞে, পরেন বৈকি, এতখানি জ্বলজ্বলে টিপ রোজ পরেন।

—তোর ছোটমা'কে বারণ করে দিস ও-সিঁদুর পরতে।

—কেন আজ্ঞে?

—তুই বারণ করে দিস, ও-সব বুজরুকি—আগে জানলে... বলেই ভূতনাথ সতর্ক হয়ে গেল। বংশীর সঙ্গে অত কথা বলবার দরকার কী! আগে যদি সে জানতো তা হলে অমন করে ঠকাতো না ছোটবৌঠানকে। মিছিমিছি গোটাকতক টাকা নষ্ট হলো। হঠাৎ যেন রাগ হলো সুবিনয়বাবুর ওপর। রাগ হলো জবার ওপর। ওরা সব পারে। যাদের জাত নেই, তারা আবার ভগবানের কথা মুখে আনে! সব মিথ্যে কথা ওদের। ও-বাড়ির চাকরিটা যদি চলেও যায়, কোনো দুঃখ থাকবে না তার। আর একটা নতুন চাকরি যোগাড় করে নিতে হবে। শরীরটা একটু ভালো হলেই ঘুরবে চাকরির চেষ্টায়। ওই 'যুবক-সঙ্ঘ'-এর নিবারণকে বলে একটা যা হয় কিছু চাকরি নেবে। ওরা কলকাতার লোক। জানে শোনে সব। ব্রজরাখাল যদি ফিরে আসে তাকেও ধরতে হবে। এন্ট্রান্স পাশ করেছে সে, চাকরির জন্যে এত ভাবনা! ডালহাউসি স্কোয়ারের ওদিকটায় জাহাজ কোম্পানীর সব আপিস হয়েছে কয়েকটা। ওখানে ঘোরাঘুরি করতে হবে। ঘোরাঘুরি না করলে কে এসে সেধে চাকরি তুলে দেবে তার হাতে? নতুন রেল-লাইন খুলছে পুরীর দিকে, সেখানেও

একবার চেষ্টা করতে হবে। রেলের চাকরি ভালো। ঢুকেই পনেরো টাকা মাইনে।

বিকেলবেলার দিকে ভূতনাথ বিছানা ছেড়ে ওঠে। একলা একলা শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগে না। মাসের পর মাস এই শুয়ে থাকা। আরো কত মাস শুয়ে থাকতে হবে কে জানে। প্রায় এক বছর হতে চললো তো। ঘরের বাইরেই একটা সরু চলাচলের পথ। লোক আসা-যাওয়া করে না বড় একটা। দক্ষিণ দিকে গেলে রাস্তাটা সোজা নেমে গিয়েছে সিঁড়ি দিয়ে। তারপর বাগান, পুকুর, ধোপাদের বাড়ি, হীরু মেথরের ঘর। আর উত্তর বরাবর চলে গিয়েছে আর একটা পথ সোজা। সে পথটা গিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একটা দরজার সামনে। দরজাটা বন্ধই থাকে। খিল দেওয়া। ওর ও-পাশেই বুঝি বাড়ির বউদের কথাবার্তা শোনা যায়।

বোঝা যায় এ-জায়গাটা না-দোতলা, না-তেতলা, না-বারমহল, না-অন্দরমহল। কবে এ বাড়ির খোদ মালিক অতীতে এইখানে এই চোরকুঠরির মধ্যে তাঁর কোন্ নৈশ-অভিযানের খোরাক এনে পুষে রেখে দিয়েছিলেন! রোজ রাত্রে বুঝি গোপনে সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলতো তাঁর অভিসার। আজও ভাঙা দেয়ালের গায়ে তার স্মৃতি তাই জড়িয়ে আছে বুঝি।

বৈদুর্যমণি, হিরণ্যমণি আর কৌস্তুভমণিরা তখন ছোট তিন নাতি। নিমকমহলের বেনিয়ান হয়ে খোদ কর্তা ভূমিপতি চৌধুরী এখানে বাড়ি করেন। এক ইটালিয়ান সাহেব এসেছিল নতুন বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে ছবি আঁকতে। বর্ধমানের সুখচর মহকুমা থেকে তখন নতুন এসেছেন জমিদারবাবু। পাশের বস্তিতে কুলিরা থাকে—আর সারা দিন খাটে বাড়ির পেছনে। ইটালিয়ান সাহেব থাকে হেস্টিংস হাউসের কাছে খাড়ির ধারের বাগান-বাড়িতে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাহেব দেখে—মেমসাহেব একলা নয়, সামনে বসে কাছে ঘেঁষে গল্প করছেন ভূমিপতি চৌধুরী।

সাহেবের মেজাজ গেল বিগড়ে। কয়েকদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো সাহেবের। মেমসাহেব যেন একটু বেশি সাজে, গুন্ গুন্ গান গায়। একটু অন্যমনস্ক ভাব। আজ হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেল দু'জনেই।

মেমসাহেব সাহেবকে দেখে চমকে উঠেছে। ভূমিপতি চৌধুরীও কম চমকাননি। এমন দিনে সাধারণত সাহেব বাড়ি ফেরে না। বাড়ি ফেরবার কথা নয় আজকে।

দু'জনের ভাব লক্ষ্য করে সাহেব আর থাকতে পারলো না। কোমার থেকে পিস্তলটা বার করে দু'জনকেই লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো। ভূমিপতি বেঁচে গেলেন একটুর জন্যে, কিন্তু অব্যর্থ গুলী গিয়ে লাগলো মেমসাহেবের গায়ে। মেমসাহেব ঢলে পড়লো মাটিতে। ভূমিপতি তখন সামলে নিয়েছেন নিজেকে। একমুহূর্তে উঠে খপ্ করে হাত ধরে ফেলেছেন সাহেবের। ভয়ে সাহেবেরও বুঝি মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

বললে—লেট্ মি গো বাবু—লেট্ মি গো—আমাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু ভূমিপতির বজ্রমুষ্ঠির চাপে বুঝি পালাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। ক্ষমা চেয়ে সাহেব তো ছাড়া পেলো। কিন্তু পিস্তল কেড়ে নিলেন ভূমিপতি। বললেন—তুমি খুন করেছো তোমার বউকে, তোমাকে পুলিশে দেবো।

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে শিল্পী এসেছিল জীবিকার জন্যে জলামাটির দেশে। রাস্তায় মেমসাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জাহাজেই তাদের নাকি বিয়ে হয়ে যায়। তারপর ভাগ্যের ফেরে আজ এই অবস্থা। সাহেব খানিক পরে বললে—ফরগিভ মি বাবু, আমি কাউকে কিছু বলবো না। আমায় শান্তিতে দেশে ফিরে যেতে দাও। আমি আর কখনও তোমাদের দেশে আসবো না।

ভূমিপতি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিলেন সাহেবকে। সেই রাত্রেই সাহেব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা যায়নি তাকে। যে লোক এসেছিল এদেশে ছবি আঁকতে, কী ছবি সে এঁকে নিয়ে গেল নিজের চিত্তপটে কে জানে!

কিন্তু মেমসাহেব বুঝি সত্যি-সত্যিই মরেনি। একটু জ্ঞান ছিল তখনও। সাহেব-বাড়ির চাকরবাকরদের টাকাপয়সা দিয়ে মুখবন্ধ করে ভূমিপতি সেই রাত্রেই নিজের পাল্কিতে করে তুলে নিয়ে এসেছিলেন মেমসাহেবকে। নিজের বাড়িতে একেবারে। এনে তুলেছিলেন এই চোরকুঠুরিতে। বাড়ির পুরনো কবিরাজ এসেছিল। দেখে গেল। নাড়ি টিপে বললে—প্রাণ আছে এখনও—বাঁচবে এ রোগী।

সত্যি-সত্যি মেমসাহেব বেঁচে উঠলো একদিন। ঘা শুকিয়ে গেল হাতের। নতুন করে যেন নবজন্ম হলো মেমসাহেবের। নতুন ঘোড়ার গাড়ি কেনা হলো মেমসাহেবের জন্যে। মেমসাহেব ঘরের বৌ হয়ে গেল তারপর থেকে। পান খেতো, তামাক খেতো, শুক্ত, চচ্চড়ি, কুলের অম্বল খেতো। কিন্তু তবু বাড়ির মেয়েরা ছুঁতো না কেউ তাকে। বলতো—ও গরু খেয়েছে, ও মেলেচ্ছো—ওর জল চল্ নয় বাছা হিন্দুর বাড়িতে।

মেমসাহেব ওই ঘরে থাকতো আর এক আয়া ছিল তার কাজ করবার জন্যে।

সারা বাড়ির মধ্যে তাকে ছুঁতেন শুধু ভূমিপতি। বাড়ির মালিক। তা-ও রাত্রে। দেওয়ানি কাজের ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে যখন রাত্রে চোখে তাঁর লাল-নেশা ধরতো। ছেলে—একমাত্র ছেলে—সূর্যমণি চৌধুরী তখন রীতিমত সাবালক হয়েছে। ওদিকে মেমসাহেবেরও ছেলে হয়েছে একটি। এমন সময় ভূমিপতি মারা গেলেন হঠাৎ। ধূমধাম করে শ্রাদ্ধ হলো জবর। কিন্তু মেমসাহেব তারপর আর এ-বাড়িতে থাকতে চাইলে না। নিজের আর ছেলের আজীবনের ভরণপোষণের মতো নগদ টাকা নিয়ে চলে গেল স্বদেশে। ভূমিপতি তাঁর উইলে সে-ব্যবস্থা করে যেতে ভোলেননি নাকি!

বড়বাড়ির চারপুরুষ আগের ইতিহাস এ-সব। বাড়ির চাকর থেকে আরম্ভ করে নায়েব গোমস্তা, বদরিকাবাবু সবাই এ-ইতিহাস জানে। তার চাক্ষুষ সাক্ষী আজকের এই চোরকুঠুরির লাগোয়া এই এক ফালি বারান্দা।

রোজ সকালে জানলাটা দিয়ে দেখা যায়—সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টা কেমন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় দিনের পর দিন। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসে সমস্ত মন। কেবল ওষুধ আর পথ্য। বিশ্রাম আর ঘুম। একঘেয়ে ক্লান্তিকর দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না ভূতনাথের।

কিন্তু ভূতনাথের সেদিন যে কী খেয়াল হলো। উত্তর দিকের দরজাটা খোলা যায় কিনা দেখতে ইচ্ছে হলো একবার! এই দরজা দিয়েই অন্দরমহল পেরিয়ে আসতেন বুঝি ভূমিপতি মেমসাহেবের ঘরে!

একটি দরজা শুধু। কিন্তু ভূতনাথ জানতো কি অন্দরমহলের এত ঘনিষ্ঠ এই একটি মাত্র দরজা তাকে ছোটবৌঠানের এত কাছাকাছি পৌঁছিয়ে দেবে।

কেন যে এ-ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল কে জানে! হয়তো এ-ঘরটা একটু নিরিবিলি বলে। চাকর-দারোয়ান-গাড়ি-ঘোড়া, রান্নাবাড়ি, সমস্ত গোলমাল হট্টগোল থেকে দূরে থাকলে রোগীর পক্ষে সেটা ভালোই। কিন্তু দরজাটা খুলতে গিয়ে যেন রোমাঞ্চ হলো সারা শরীরে। এ যেন নিষিদ্ধ দরজা। তার এলাকার বাইরে সে যাচ্ছে। অধিকার-বোধের চৌকাঠ পেরিয়ে তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করছে।

ওপার থেকে যেন সিন্ধুর গলা শোনা গেল—ও লো ও গিরি—ওখান থেকে সরে যা তো।

গিরি বললে—থাম বাছা, সবুর কর একটু—হাতের কাজটা গুছিয়ে নি।

সিন্ধুও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—তোর হাতের কাজটাই বড় হল লো, ওদিকে বড়মা সাজঘরে যাবে, তোর জন্যে বসে থাকবে নাকি? সর শীগগির, চোখের আড়াল হ'।

মেজবউ-এর গলা কানে আসে। খিল-খিল করে হাসতে হাসতে বলে—ও গিরি, তোর সুপুরী কাটা রাখ বাপু—শুনছিস বড়দি সাজঘরে যাবে।

গিরি গজ-গজ করতে করতে বলে—আমি তো আর পুরুষ মানুষ নই মা যে, আমাকে নজ্জা। সাতজন্মে যেন ছুঁচিবাই না হয় মানষের—ছিঃ!

ভেতর থেকে হুড়কো সরাতেই দরজাটা একটু ফাঁক হলো। ভূতনাথ স্পষ্ট দেখতে পেলে সব।

বিকেলের ছায়া-ছায়া আলো চারদিকে। একেবারে মাথার ওপরেই অন্দরমহলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে।

সিন্ধু চিৎকার করে উঠলো—তোর কাপড়টা সরিয়ে নিলিনে গিরি, বড়মা'র ছোঁয়া লেগে যাবে যে, ছুঁয়ে শেষে কি নোংরা হবে নাকি মানুষ?

—হলো, এই নিলাম সরিয়ে—হলো? বলে গিরি দড়ির ওপর থেকে কাপড়খানা সরিয়ে নিলে।

আর চোখের সামনে... আর ভূতনাথের চোখের সামনে এক কাণ্ড ঘটে গেল সেই মুহূর্তে।

বোধ হয় এ-বাড়ির বড়বউ। বিধবা বড়বউ। সম্পূর্ণ নিরাবরণ নিরাভরণ অবস্থা। ত্বরিত গতিতে নিজে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকলেন গিয়ে সাজঘরে। পেছন-পেছন চললো সিন্ধু গামছা সাবান নিয়ে।

কাণ্ডটা ঘটলো এক নিমেষের মধ্যে। কিন্তু সমস্তটা দেখবার আগেই ভূতনাথ নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে! ছি-ছি! ছি!!

সেদিন ছোটবৌঠান ডেকে পাঠালেন।

বংশী বললে—অত ঘুরে যাবার দরকার কী শালাবাবু—এই তো সামনেই দরজা।

কী জানি কেমন যেন সঙ্কোচ হলো ভূতনাথের। সেদিন দরজার ফাঁক দিয়ে অন্দরমহলের যে নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখেছে তারপর ওটা খুলতে আর সাহস হয়নি তার। এ ক'দিন একটু-একটু বাগানে গিয়ে বেড়িয়েছে। পুকুরের পাড়ে গিয়ে হাওয়া খেয়েছে।

ছুটুকবাবু দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কী খবর ভূতনাথবাবু, দেখাই পাওয়া যায় না যে আপনার। সেদিন ওস্তাদ ছোট্টু খাঁ এসেছিল, আহা, পুরিয়ার খেয়াল যা শোনালে ভাই—কানা বাদল খাঁ'র পরে এমন পুরিয়া আর শুনিনি মাইরি—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আজকে আসর বসবে নাকি?

—আর আসর—আসরই বোধ হয় ভেঙে দিতে হবে। এখন যাত্রা-থিয়েটারের গানেরই আদর বেশি দেখছি—ওস্তাদী গানের আর কদর কই—তেমনি ওস্তাদও আর জন্মাচ্ছে না—তা আসুন আজকে আপনি।

—কখন?

—সন্ধ্যেবেলা।

বাড়ির চারদিকে রাজমিস্ত্রী খাটছে। ছুটুকবাবুর বিয়ের জন্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

সেই লোচন আবার দেখতে পেয়ে ডাকলে—আসুন শালাবাবু!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—এ-সব কী হচ্ছে লোচন?

এ-ঘরেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ঘর ধোয়া-মোছা চলছে। হুঁকো নল ফরসি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে লোচন। বললে—ছুটুকবাবুর বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে হুজুর। নতুন ফরসি এসেছে সব, নতুন তামাক এসেছে গয়া থেকে, খেয়ে দেখবেন নাকি?

ভূতনাথ বললে—না, এখন ও খাইনে।

—বড় ভালো জিনিস ছিল আজ্ঞে, ন'সিকি ভরির জিনিস, এখানে বসে খেলে এ-বৌবাজার অঞ্চলটা একেবারে খোশবাই হয়ে যাবে, মেজবাবু ফরমাশ দিয়ে আনিয়েছে হুজুর, ছোটবাবুর বিয়ের সময় একবার এসেছিল। খাস নবাবী মাল কিনা—তা আধলা না-হয় দিলেন, কে আর জানতে পারছে?

আতরের শিশি নিয়ে ঢেলে তামাক মাখতে বসলো লোচন।

তাড়াতাড়ি লোচনকে এড়িয়ে ভিস্তিখানায় জল নিয়ে স্নান সেরে নিলে ভূতনাথ। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলে, একবার ব্রজরাখালের ঘরটায় গিয়ে দেখলে হয়! কোনো চিঠিপত্র এসেছে কিনা। কেমন ধারা লোক ব্রজরাখাল! একটা খবর পর্যন্ত দিলে না। কোথায় গেল! কেমন আছে সেখানে? কিন্তু ব্রজরাখালের ঘর তেমনি তালাবন্ধই পড়ে আছে।

পাশের ঘরে ব্রিজ সিং আটা মাখছিল। বললে—মাস্টারসাব তো নেহি হ্যায় শালাবাবু।

—কোথায় গিয়েছেন জানো ব্রিজ সিং?

—কেয়া মালুম বাবু, রোজ রোজ হামেশা দশ বিশঠো আদমি এসে পুছে—লেকিন মাস্টারসাব তো পাত্তা ভেজলো না।

দুপুরবেলাটাও কাটতে চায় না তার। সেই কর্কশ এক-একটা চিলের ডাক বাতাসে ভেসে আসে। এখানে বসে ফতেপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে 'কুয়োর ঘটি তোলা—আ—আ' শব্দ করতে করতে যায়। কখনও যায় মুশকিল আসান। তখন অন্দরে বেশ গুলজার চলে। দরজাটার কাছে গিয়ে কান পাতলে বিচিত্র কথা শোনা যায়।

মেজবৌ প্রশ্ন করে—হ্যাঁ বড়দি, সিন্ধু যে তোমায় আজ খাইয়ে দিচ্ছে বড়!

সত্যি সত্যি বড়বৌ-এর ঝি সিন্ধুই খাইয়ে দিচ্ছে আজ।

—ওমা একি! গিরিও এসে পাশে দাঁড়িয়ে গালে হাত দেয়।

শুচিবায়ুগ্রস্থা বড়বৌ-এর বিচিত্র কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে।

সিন্ধু বলে—বড়মা'র দুটো হাতই অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে আজ।

মেজবৌ হাসতে হাসতে বলে—এরকম অশুদ্ধ হলো কী করে বড়দি?

বড়বৌ হাসলেন না। বললেন—কাপড় শুকোবার দড়িতে হাত দিয়েছিলুম মরতে ওমনি পোড়ারমুখো একটা কাক কোত্থেকে এসে বসলো দড়িতে।

হাসি চাপতে পারে না গিরি।

মেজবৌ আবার জিজ্ঞেস করে—তা এমন অশুদ্ধ ক'দ্দিন চলবে তোমার?

বড়বৌ বুঝি রাগ করেন। বলেন—হাসিস নে মেজবৌ, হাসতে নেই—হাসলে তোরও হবে।

মেজবৌ বলে—রক্ষে কবো মা, আমার হয়ে কাজ নেই, সাতজন্মে অমন রোগ আমার যেন না হয়। আমার ভাতার আছে, আমার কেন হতে যাবে শুনি।

বড়বৌ মেজবৌকে কিছু বলেন না। বলেন সিন্ধুকে—শুনলি লো সিন্ধু, তবু যদি ওর ভাতার ঘরে শুতো।

মেজবৌ কিন্তু রাগে না কথা শুনে। খিলখিল কবে হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসির দমকে হাতের চুড়ি, গায়েব গয়না টুংটাং করে বেজে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—আর ভাসুরঠাকুর কা'র ঘরে শুতো বলবো বড়দি—বলে দেবো?

কথা শুনতে শুনতে ভূতনাথের একবার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে। এত বড় বাড়ির বউ সব—এরা কী ভাষায় কথা বলে!

বড়বৌ একবার চিৎকার করে ডাকেন—ছোট—ও ছোট—ও ছোটবউ—ছুটি—

চিন্তা খর-খর করে এগিয়ে আসে—ছোটমাকে ডাকছো নাকি বড়মা?

—ডাকতো একবার ছোটমাকে তোর—এসে কাণ্ড দেখে যাক।

—কী হলো বড়দি?

ছোটবৌঠান বুঝি এতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বলে—আবার বুঝি তুমি বড়দিকে কিছু বলেছো মেজদি?

—দেখ না ভাই—সারা দিনমান উনি ন্যাংটো হয়ে ঘোরাঘুরি করবেন, কিছু বললেই দোষ, আমরাও গা খুলে বেড়াই, কিন্তু পরনের কাপড়টা পর্যন্ত...

—ওর না হয় রোগ হয়েছে মেজদি, কিন্তু তোমাকেও তো দেখেছি, তুমিই বা কম যাও কিসে?

—তুই আর বলিসনি ছোট, তোর আবার বুড্ড বাড়াবাড়ি। কে আছে শুনি দশটা চোখ মেলে?

অত জামা-কাপড়ের বাহার কেন শুনি, ঘরের মানুষেরা তো ফিরেও চায় না!

ছোটবৌঠান কী জবাব দেবে বুঝি ভেবে পেলে না। তারপর বললে—তুমি কি সত্যিই চাও মেজদি যে, ঘরের মানুষ ঘরে থাকুক?

—তুই আর কথা বাড়াসনে ছোট, বড়ঘরের পুরুষমানুষেরা কবে আর ঘরে কাটিয়েছে শুনি, আমার বাপের বাড়িতেও দেখেছি, এ-বাড়িতেও দেখছি। তোর বাপের বাড়ির কথা অবিশ্যি আলাদা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। নাপতিনী আসে আলতা পরাতে। মেজবৌ আলতা পরে, নখ চাঁছে, পায়ে ঝামা ঘসে। গল্প করে ইনিয়ে বিনিয়ে। সাদা সাদা পা বাড়িয়ে দিয়ে মেজবৌ গল্প করে—হ্যাঁ রে রঙ্গ, কাল রাত্তিরে তোদের পাড়ায় শাঁখ বাজছিল কেন রে?

নাপিতবৌ বলে—ধোপাবৌ-এর ছেলে হয়েছে যে মেজমা—শোনেননি?

—ওমা, এই সেদিন যে মেয়ে হলো রে একটা— ছুর-বিউনি নাকি? খুব ভাগ্যি ভালো তো ধোপাবৌ-এর।

হঠাৎ তেতলার সিঁড়ি দিয়ে বংশী উঠে আসে। বলে—ছোটবাবু আসছে মা।

নাপতিনী সন্ত্রস্ত হয়ে এক মাথা ঘোমটা টেনে দেয়। মেজবৌ গায়ের কাপড়টা টেনে দেয়। গিরি লম্বা করে ঘোমটা টেনে আড়াল হয়ে দাঁড়ালো।

মেজবৌ বলে—ওমা, ছোট দেওর যে... কী ভাগ্যি!

ছোটবাবু তর-তর করে উঠে আসে তেতলায়। বাতাসে একটা মৃদু গন্ধ! চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায় এক মুহূর্তে।

প্রতিদিন এই দৃশ্যেরই রকম-ফের অন্দরের বউ-মহলে। ভূতনাথের মনে হলো এত বড় বাড়ির বৌ সব—এরাও তো আর-পাঁচবাড়ির বৌদের মতনই সাধারণ। অতি সাধারণ। শুধু দূর থেকেই বুঝি একটা রহস্যের আবরণ থাকে। অন্দর-মহলের ভেতরে যখন এই দৃশ্য, বাইরের মহলেও এমনি সাধারণ ঘটনাই ঘটে সব।

বংশী সেদিন শশব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছিল—আসুন শালাবাবু, মজা দেখবেন আসুন, গন্ধবাবা এসেছে।

— গন্ধবাবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বারবাড়িতে লোক আর ধরছে না, গন্ধবাবা এসেছে, যে-যা গন্ধ চাইছে তাই-ই দিচ্ছে।

ভূতনাথও ছুটলো। গাড়িবারান্দার নীচে পৈঠের ওপর বসে আছে এক সাধু। মাথায় জটা। কপালে সিঁদুরের প্রলেপ। বিকটাকার মূর্তি। চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে চাকর-বাকর লোক-লস্কর সবাই। দাসু জমাদারের ছেলেমেয়েরাও এসে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। ইব্রাহিমের ছাদের ওপরেও লোক।

অনেক কষ্টে বংশী ভূতনাথকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো ঠেলে ঠুলে।

লম্বা-চওড়া চেহারা লোকটার। বলছে—বেহেস্ত্‌কা হুরী, ওউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্‌সে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়—হামারা ইয়ে পাথল্ দেওতা মহাদেওতানে আপ্‌না হাতসে দিয়া হুয়া হ্যায়—ই পাথল্ দেখো—গরীবোঁকে রূপেয়া দেনেওয়ালা, মোকদ্দমামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা—মাঙনেওয়ালোকো সব কুছ দেনেওয়ালা—ই পাথল্ দেখো—দেওতাকো জরিমানা পাঁচ-পাঁচ আনা।

মধুসূদন ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—গন্ধবাবা, আমাকে পদ্মফুলের গন্ধ করে দাও দিকি হাতে... দেখি একবার।

গন্ধবাবা পাত্থরটা দিয়ে মধুসূদনের হাতের তেলোয় ঘযে দিলে।

মধুসূদন হাতের তেলোটা শুঁকে দেখে। সত্যিই তো! খাঁটি পদ্মফুলের গন্ধ।

—দেখি মধুসূদনকাকা, দেখি শুঁকে।

—দেখি, আমি শুঁকে দেখি।

সবাই শুঁকে পরীক্ষা করে দেখে ভুল নেই। কোনো ভুল নেই। পদ্মফুলই বা কোত্থেকে এল?

—গন্ধবাবা, আমার হাতে কেরোসিন তেলের গন্ধ করে দাও তো দেখি।

গন্ধবাবা পাথরটা তার হাতে ঘষে দিলে আবার। যে-হাতে পদ্মফুলের গন্ধ ছিল সেই হাতেই এখন কেরোসিন তেলের কড়া গন্ধ।

—দেখি, শুঁকে দেখি—ওমা, কেরোসিনের গন্ধই তো বটেক।

সবাই ঝুঁকে পড়ে। গন্ধবাবা আবার বক্তৃতা দেয়—বেহেস্ত্‌কা হুরী ওউর জাহান্নম্‌কা কুত্তি ইস্‌সে সব কুছ ঘায়েল হোতি হ্যায়—হামারা ইয়ে পাথল্ দেওতা মহাদেওতানে আপনা হাতসে দিয়া হুয়া হ্যায়—ই পাথল্ দেখো—গরীবোঁকে রূপেয়া দেনেওয়ালা, মোকদ্দমামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা, মাঙ্‌নেওয়ালোঁকো সব কুছ দেনেওয়ালা—দেওতাকো জরিমানা পাঁচ-পাঁচ আনা...

পাঁচ আনার পুজো দিতে হবে। মাত্র পাঁচ আনাতেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এমন সুযোগ বোধ হয় কেউ ছাড়তে চাইলে না। বংশী চুপি চুপি বললে—শালাবাবু, ভাইটার চাকরির জন্যে পাঁচ আনা জরিমানা দেবো।

মধুসূদনেরও বুঝি কিছু মনস্কামনা ছিল। দেশের একটা ধানজমির ওপর বহুদিনের লোভ ওর। নিজের জমির লাগোয়া। দরে পোষাচ্ছিল না। সে-ও পাঁচ আনা দিলে জরিমানা। হুড় হুড় করে আরো পয়সা পড়তে লাগলো।

গন্ধবাবা তখনও বক্তৃতা দিয়ে চলছে—সব ইয়ে পাথল্‌কা খেল্, মহাদেওতা মহাদেওকী খেল্, ইয়ে পাথল... দুনিয়ামে যো কুছ্ মাঙ্‌না হ্যায় তো মাঙ লেও, ইয়ে পাথল্‌কো দৌলতমে সব কুছ্ মিলনেওয়ালা হ্যায়, বেহেস্ত্‌কা হুরী ওউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্‌সে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়, হামারা ইয়ে পাথল—গরীবোঁকো রূপেয়া দেনেওয়ালা, মোকদ্দমামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা, মাঙ্‌নেওয়ালোঁকো সব কুছ মিলনেওয়ালা...

দেখতে দেখতে পঞ্চাশ ষাট টাকার খুচরো পয়সা জমে উঠলো গন্ধবাবার সামনে।

হঠাৎ ভূতনাথেরও মনে হলো যেন তারও কিছু মনস্কামনা আছে। নিজের চাকরি নয়। সংসারে কারোর কিছু নয়। কিন্তু অন্তত ছোটবৌঠানের জন্যে যেন পাঁচ আনা জরিমানা দিলে হয়। যেন সুখী হয় ছোটবৌঠান। যেন স্বামীসেবা করতে পারে ছোটবৌঠান। যেন মনস্কামনা সিদ্ধি হয় ছোটবৌঠানের। যেন 'মোহিনী-সিঁদুরে' যে কাজ হয়নি তা সফল হয়।

গন্ধবাবা জিজ্ঞেস করলে—তুলসীপাতা হ্যায় ইধার?

—আছে বাবা, আছে, তুলসীপাতা আছে।

গন্ধবাবা সবার হাতে গাঁজার কল্‌কে থেকে নিয়ে একটু পোড়া তামাক দিলে। সেই পোড়া তামাক হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে তুলসীগাছকে প্রণাম করে এসে আবার হাতের মুঠো খুলতে হবে।

বংশী, মধুসূদন, লোচন, বেণী, দাসু জমাদার, ইব্রাহিম কোচোয়ান, ইয়াসিন সহিস, ব্রিজ সিং সবাই মনস্কামনা নিয়ে মহাদেবকে পাঁচ আনা জরিমানা দিয়েছে। সবাই হুকুম মতো কাজ করলো।

গন্ধবাবা এবার সকলের মুঠোর ওপর তার স্ফটিক পাথরটা ছুঁইয়ে দিলে। মনে মনে কোনো মন্ত্র পড়লে কিনা কে জানে। তারপর বললে—আভি মুঠি খোলো।

বংশী ভূতনাথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বংশী মুঠো খুললো।

ভূতনাথ দেখলে তার মুঠোর মধ্যে পোড়া তামাকের বদলে একটা নীল কাগজ। নীল কাগজের ওপর একটা ত্রিভুজ আঁকা। সেই ত্রিভুজের ভিতর আরেকটা ত্রিভুজ।

সকলের হাতের মুঠোর মধ্যে ওই ব্যাপার।

গন্ধবাবা বললে—মাদুলী করে ওটা গলায় পরতে হবে। এক মাস পরে গন্ধবাবা আবার আসবে এ-বাড়িতে, তখন যদি না মনস্কামনা পূর্ণ হয় তো সকলের পয়সা ফেরত দিয়ে যাবে।

বংশী বললে—শালাবাবু, আপনিও একটা জরিমানা দিন না আজ্ঞে।

ভূতনাথও সে কথা ভাবছিল।

গন্ধবাবা তখন টাকাপয়সাগুলো কুড়োচ্ছে আর মুখে বক্তৃতা—বেহেস্ত্‌কা হুরী, ওউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্‌সে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়—ইস্ পাত্থল্—মহাদেওনে দিয়া হুয়া হ্যায়— গরীবোঁকো

রূপেয়া দেনেওয়ালা, মোকদ্দমামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা—মাঙ্‌নেওয়ালোঁকো সব কুছ্...

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। বদরিকাবাবু বুঝি গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসেছেন।

বললেন—কী হচ্ছে রে? এত গোলমাল কিসের?

মস্ত বড় ভুঁড়ি। গায়ে তুলোর জামা। বরাবর বৈঠকখানা ঘরে শুয়েই থাকেন। বড় একটা লোকচক্ষুর সামনে বেরোন না। এই আজকের অস্বাভাবিক গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন প্রথম।

—কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া? গন্ধবাবার সামনে এসে বললেন—কেয়া হুয়া? কোন হ্যায় তুম্?

বংশী বললে—উনি গন্ধবাবা।

আরো অনেকে বললে—যা গন্ধ চান, উনি করে দেবেন আজ্ঞে।

সব শুনলেন বদরিকাবাবু। বললেন—দাও দিকি আমার হাতে গন্ধ করে—ফুলের গন্ধ করে দাও—নিমফুলের গন্ধ।

নিমফুল! তাই সই।

গন্ধবাবা স্ফটিক পাথরটি একবার হাতে ঘষে দিলে বদরিকাবাবুর। তারপর আওড়াতে লাগলো—বেহেস্ত্‌কা হুরী ওউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্‌সে ঘায়েল হোতি হ্যায়... কেয়া বাবুজি মিলা?

বদরিকাবাবু বার বার নিজের হাতটা শুঁকতে লাগলেন। যেন অবাক হয়েছেন একটু। বললেন—কী করে করলে বলো দেখি বাপধন?

—ইয়ে পাত্থল্‌কা খেল্ হ্যায় বাবুজি, মহাদেওতানে দিয়া হুয়া হ্যায়।

—দেখি বাবা তোমার পাথরখানা—ছোট স্ফটিকখানা নিয়ে বার বার দেখতে লাগলেন বদরিকাবাবু। সামান্য এক টুকরো পাথরের কারসাজি! অবিশ্বাসের বিদ্রূপ ফুটে উঠলো ভাব-ভঙ্গীতে।

ছোট ছেলে যেমন রসগোল্লা নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে! মুর্শিদকুলি খাঁ'র কানুনগো দর্পনারায়ণের শেষ বংশধরও সহজে বিচলিত হবার লোক নন। কত রাজা-মহারাজাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন তুড়ি দিয়ে। ইতিহাসের বিলুপ্তপ্রায় অধ্যায়ের এক টুকরো ফসিল যেন হাতে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বসেছেন। বললেন—কী হয় এতে বাপধন?

গন্ধবাবা বললে—সব কুছ্ হো স্যাকতা হ্যায় বাবুজি—মহাদেওকা কির্‌পা মে...

—অমর হওয়া যাবে?

—জী হাঁ, অমর ভি হো স্যাক্‌তা হ্যায়।

—তবে অমরই হয়ে যাই—বলে বলা-নেই কওয়া-নেই বদরিকাবাবু পাথরটা নিয়ে টপ্ করে মুখে পুরে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গন্ধবাবা চিৎকার করে উঠলো—সত্যনাশ হো গয়া, সত্যনাশ হো গয়া...

—আরে রাখ তোর সর্বনাশ, সর্বনাশের মাথায় পা—বলে বদরিকাবাবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যেন কিছু অস্বস্তি বোধ করছেন। বললেন—লোচন এক গ্লাশ জল দে তো।

গন্ধবাবা বললে—বাবুজী মর্ যাইয়ে গা।

কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো যেন বদরিকাবাবুর দম আটকে আসছে। আইঢাই করতে লাগলো সারা শরীর। চোখ দুটো উল্টে এল। গেলাস গেলাস জল খেলেন। মস্ত বড় ভুঁড়ি আরো ফুলে উঠলো দেখতে দেখতে। সাক্ষাৎ মহাদেবের দেওয়া স্ফটিক যে!

গন্ধবাবা চলে গেল এক ফাঁকে। যাবার সময় বলে গেল—বাবুজী মহাবীর হ্যায়—লেকিন্ মর যায়গা জরুর।

মধুসূদন ভয় পেয়ে গেল—কী সর্বনেশে কাণ্ড!

লোচনও ভয়ে জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে। কী জানি কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। বদরিকাবাবু যদি মারাই যায়, সাক্ষীসাবুদ, পুলিশ-আদালত নানান হ্যাঙ্গাম পোয়াও। মেজবাবু যদি টের পায়, কানে যদি যায় কোনোরকমে। মেজবাবুর যা মেজাজ, জরিমানা হবে সকলের।

বদরিকাবাবু গাড়িবারান্দার তলায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে হাঁসফাঁস করছেন।

বংশী বললে—চলে আসুন শালাবাবু ওখান থেকে—কাজ কী এ-সব হ্যাঙ্গামে?

হ্যাঙ্গাম দেখে সত্যিই তখন সবাই সরে পড়েছে একে একে। ভূতনাথ চেয়ে দেখলে জায়গাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

বংশী আবার কামিজটা ধরে টানলে—চলে আসুন শালাবাবু, কাজ কি ছেঁড়া ঝঞ্ঝাটে—আমার আবার ওদিকে কাজ পড়ে রয়েছে।

ভূতনাথ বললে—তুই বরং যা বংশী, ছোটবাবু জানতে পারলে আবার...

—তাই যাই—বলে বংশীও চলে গেল।

ভূতনাথ নিচু হয়ে বদরিকাবাবুর মাথায় হাত দিলে। মুর্শিদকুলি খাঁ'র কানুনগোর শেষ বংশধর। এখানে এই বেঘোরেই বুঝি গেল এবার।

হঠাৎ যেন অস্পষ্ট শব্দ বেরোলো। বদরিকাবাবু কথা বলছেন—বেটা গিয়েছে নাকি হে ছোকরা?

ভূতনাথও কম অবাক হয়নি। বললে—কেমন আছেন?

চোখ মিট-মিট করতে করতে বদরিকাবাবু বললেন—বেটা গিয়েছে নাকি হে ছোকরা?

—চলে গিয়েছে—কিন্তু আপনি কেমন আছেন?

বদরিকাবাবু এবার উঠে বসলেন। নিজের জামা-কাপড় সামলাতে সামলাতে বললেন—আমার হয়েছে কি যে, কেমন থাকবো—

বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের বৈঠকখানার দিকে চলতে লাগলেন।

ভূতনাথও সঙ্গে সঙ্গে গেল। বদরিকাবাবু ঘরে ঢুকে শেতলপাটি বিছানো তক্তপোশের ওপর আবার চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে একবার ট্যাঁক ঘড়িটা বার করে সময় দেখে নিলেন।

ভূতনাথের যেন ভারি অবাক লাগছিল সমস্ত ঘটনাটা ভেবে। বললে—আপনি শুধু শুধু কেন খেতে গেলেন পাথরটা—সাধু-সন্ন্যাসীদের পাথর।

—খেতে যাবো কেন,—খাইনি তো—বদরিকাবাবু বিস্মিতের মতো চাইলেন। আমার আর কাজকম্ম নেই, আমি ওই পাথর গিলতে যাবো। বলো কি ছোকরা, এই দেখো—বলে আর এক ট্যাঁক থেকে স্ফটিক পাথরটা বার করলেন—এই দেখো।

তাজ্জব ব্যাপারই বটে।

—নবাবের আমলের পুরনো বংশ আমাদের হে, আমি সেই বংশের বটে, তা আমি গলায় পাথর আটকে মরতে যাবো কেন শুনি? এতদিন ঘড়ি ধরে বসে আছি অপঘাতে মরবো বলে? সব দেখতে হবে না! ইতিহাস কি মিথ্যে হয় নাকি? সব লাল হয়ে যাবে না? রণজিৎ সিং তো মিথ্যে বলবার লোক নয়, নাজির আহমদ রইল না, রইল না রেজা খাঁ, বলে মধুমতী তীরের সীতারাম আর ফৌজদার আবুতোরাব—তারাই রইল না! কোথায় গেল পীর খাঁ, কোথায় গেল তোর বক্স আলী—এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ উঠেছে আবার নেমেছে—চৌধুরীরাও নামবে—এই বড়বাড়িও ভাঙবে একদিন, রাজসাপ যখন কামড়েছে, একেবারে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করবে না! এখনও যে দর্পনারায়ণের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি রে!

কী কথায় কী কথা উঠে গেল। ভূতনাথ বললে—কিন্তু গন্ধবাবা কি দোষ করলো?

—আরে, এটা যে গন্ধবাবার যুগ রে, গন্ধবাবারাই তো আজ রাজা হয়ে বসেছে—ওদের তাড়াতে হবে না? এই আমাদের মেজবাবু, ছোটবাবু, তোর এই 'মোহিনী-সিঁদুর' সব যে গন্ধবাবার দল।

আর মুহূর্ত দাঁড়ালো না ভূতনাথ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল হঠাৎ। ও-কথার তো আর শেষ নেই। সব কথার মানেও বোঝা যায় না বদরিকাবাবুর। সেদিন সুবিনয়বাবুও বললেন, 'মোহিনী-সিঁদুর' বুজরুকি। এই এত ঐশ্বর্য, গাড়ি, বাড়ি, লোকজন, চাকর-বাকর সব উচ্ছন্নে যাবে!

কী অদ্ভুত যুক্তি, কী অদ্ভুত হেঁয়ালি!

সন্ধ্যেবেলা ছুটুকবাবুর ঘরে গিয়ে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আজ এখনও কেউ আসেনি?

ছুটুকবাবু আসর সাজিয়ে বসেছিল। বললে—এই আপনার কথাই ভাবছিলাম, কোথায় ছিলেন

অ্যাদ্দিন, ননীলাল যে খুঁজছিল।

—ননীলাল? গঞ্জের ডাক্তারবাবুর ছেলে সেই ননীলাল? নামটার সঙ্গে যেন অনেক রোমাঞ্চ, অনেক স্মৃতি জড়ানো আছে। অনেক সমারোহ, অনেক সৌরভ। ননীলালের নামটা মনে পড়লেই যেন সমস্ত ছেলেবেলাটা আবার সজীব হয়ে ওঠে। তার সেই চিঠি! সেই চিঠিটা আজও সযত্নে টিনের বাক্সের মধ্যে যে রেখে দিয়েছে সে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আমার খোঁজ করছিল কেন?

—ওর বিয়ে হলো কিনা? আপনাকে নেমন্তন্ন করতে চেয়েছিল।

—বিয়ে? হয়ে গিয়েছে?

ছুটুকবাবু বললে—হ্যাঁ, হয়ে গেল বিয়েটা। ননীটা যা হোক খুব দাঁও মেরেছে বিয়েতে। তিনখানা বাড়ি—সাত লক্ষ টাকা।

—সেকি? ভূতনাথও কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। এই সেদিন যে সে টাকা ধার করতে এসেছিল ছুটুকবাবুর কাছে এরই মধ্যে এত টাকার মালিক হয়ে গেল সে!

ছুটুকবাবু আবার বললে—এ যাত্রা খুব বেঁচে গেল ননীটা, বরাবর জানতুম ও একটা সোজা ছেলে নয়। আমাদের টাকায় বরাবর বাবুয়ানি করে আমাদের ওপরই টেক্কা মেরেছে—তা বাহাদুরি আছে ননীর, কোত্থেকে কার সঙ্গে ভাব জমিয়ে শেষ পর্যন্ত কী যে করে বসলো—

—কী করে কী হলো ছুটুকবাবু?

ননীলাল অবশ্য তার কল্পনায় চিরকালই উঁচু ছিল। ছোটবেলা থেকে ননীই ছিল ভূতনাথের আদর্শ। অমন চমৎকার সুন্দর চেহারা। রূপবানই বলা যায়। কিন্তু মাঝখানে যেদিন দেখা হয় ওর সঙ্গে সেইদিনই কেমন আঘাত পেয়েছিল ভূতনাথ মনে মনে। তার সেই আগেকার চেহারা যেন আর নেই। সেই লাবণ্য মুছে গিয়েছে মুখ থেকে। তার সেই ঘন-ঘন সিগারেট খাওয়া। সেই কোঠরগত চোখ। আর সেই অশ্লীল প্রসঙ্গ আলোচনা। যে-মানুষ এত নীচে নামতে পারে চরিত্রহীনতার একেবারে শেষ ধাপে, সে কেমন করে জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে! কেমন করে সে সাত লক্ষ টাকার মালিক হবে—তিনখানা বাড়ির স্বত্বাধিকারী হবে!

ছুটুকবাবু বলতে লাগলো—হেন রোগ নেই যা ওর হয়নি ভূতনাথবাবু, আমরা কত বারণ করেছি ও-পথে আর যাস্‌নি—কিন্তু ননী বলতো—'ও-সব তোদের কুসংস্কার—এটা আর কুলমর্যাদার যুগ নয় রে—এটা টাকার যুগ'—বলতো—'টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম, টাকা বংশ, টাকা গোত্র—টাকাই জপ-তপ-ধ্যান—সবার চাইতে বড় কুলীন টাকা, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ টাকা'—

বলতাম—তোর স্বাস্থ্য গেলে টাকা কে খাবে?

ননী বলতো—টাকা না থাকলে এ স্বাস্থ্য নিয়ে কী হবে? কখনও বলতো—এ যুগের খৃষ্ট, বুদ্ধ আর চৈতন্যদেব কে জানিস?

আমরা প্রশ্ন শুনে হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম—খৃষ্ট, বুদ্ধ আর চৈতন্যদেব—ওরা আবার যুগে যুগে বদলায় নাকি?

ননীলাল বলতো—বলতে পারলিনে? এ যুগের অবতার হলেন শেঠ, শীল আর মল্লিক।

ছুটুকবাবু কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়লো। হাসির চোটে ভুঁড়ির মাংস থল্‌-থল্‌ করে নেচে ওঠে। যেন একটা কৌতুক করবার দারুণ বিষয়বস্তু পাওয়া গিয়েছে।

—আমাদের কলেজের ভেতর ঢুকতে মস্ত বড় সদর-দরজার ওপর লেখা ছিল 'God is Good.'। একদিন কলেজে মহা সোরগোল বেধে গেল। হৈ-চৈ কাণ্ড। কী সর্বনাশ ব্যাপার! দেখা গেল কে যেন বড় বড় হরফে সেখানে লিখে রেখেছে—'God is Money'। আমরা তো অবাক সবাই। সেকালে রসিককৃষ্ণ মল্লিক আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যখন বলেছিল—'I do not believe in the holiness of the Ganges.' তখনও হিন্দুসমাজ এত চমকায়নি—তা সেই ননীলাল শেষ পর্যন্ত...

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বউ কেমন হয়েছে?

—বউটাও রূপসী ভূতনাথবাবু, তাই তো বলছি—ওর কপালটা ভালো, কাল নেমন্তন্ন খেয়ে

এসে পর্যন্ত ওই কথাই তো ভাবছি। শালাটা করলে কী? আজ এসেছিল সবাই গান-বাজনা করতে—মন বসলো না। পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে গিয়েছে ননী, এই সেদিন। এখনো শোধ করেনি। তার কাছে সে টাকা চাইতে এখন লজ্জা করবে আমার। পাঁচ হাজার টাকার জন্যে নয়, দশ হাজার টাকা গেলেও কিছু ভাবতুম না। ননী আমার কাছ থেকে অমন অনেক টাকা নিয়েছে—হিসেব রাখিনি কখনও—কিন্তু এমনভাবে ননী আমাকে টেক্কা দিয়ে যাবে ভাবিনি তো কখনও!

ছুটুকবাবু যেন কেমন মুষড়ে পড়েছে। বলতে লাগলো—এই যে সব নেশা-টেশা দেখছেন এ-সব ও-ই আমাকে প্রথম শেখায়, এই যে গানবাজনার সখ—এ-ও ওরই কাছ থেকে প্রথম শিখি—তখন কলেজে সবে ঢুকেছি. চাকরের সঙ্গে গাড়িতে যাই আর গাড়ি করে ফিরে আসি। একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা কলেজ ছুটি হয়ে গেল—দু'জনে একসঙ্গে বেরোলাম রাস্তায়। কোন্ রাস্তা দিয়ে ঢুকে কোন্ রাস্তায় বেরিয়ে শেষে এক গলির মধ্যে নিয়ে গেল ননী, সেখানে একটা বাড়িতে গান-বাজনা হচ্ছিলো। আমাকে বললে পেছন পেছন চলে আয় চূড়ো—বলে নিজেই আগে ঢুকে পড়লো।

আমিও গেলাম, গিয়ে দেখি দোতলার ওপর গানের আসর বসেছে, গান গাইছে একটা মেয়ে, নাকে একটা প্রকাণ্ড নথ্।

ননী একপাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে পড়লো। আমাকেও টেনে পাশে বসালো।

গান থামলো। সারেঙ্গী বাজাচ্ছিল যে সেও থামলো। তবলচিও থামলো।

ননী গিয়ে মেয়েটার কানে কানে চুপি চুপি কী বললো কে জানে! মেয়েটা আমার দিকে দু'হাত তুলে সেলাম করে বললে—আপনার বহুত্ মেহেরবানি—কী গান গাইবো ফরমাশ করুন।

তা বুঝলেন, তখন আমার বুক কাঁপছে, বয়েসও কম, গোঁফও ওঠেনি বলতে গেলে, তা ছাড়া ও-সব জায়গায় কখনও যাইনি আগে, আমি কিছু কথাই বলতে পারলুম না। গান-বাজনা শোনা অবশ্য অভ্যেস ছিল আমার, বাড়িতে এসে কত বাঈজী গান গেয়ে গিয়েছে, নজরানা নিয়ে গিয়েছে, নাচ দেখেছি, সে-সব অন্য রকম। নাচঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি আমরা, বাড়ির চাকর-বাকর সবার কাছে কত কিছু শুনেছি, কাকামশাইরা বাঈজীদের সঙ্গে সারারাত ধরে ফূর্তি করেছে, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, নেশা-টেশাও চলেছে, তোষাখানায় যখন গিয়েছি চাকরদের মুখে বাবুদের কীর্তিকলাপও শুনেছি। বড় ছোট মাঝারি নানান মাপের রঙ-বেরঙের বোতলের চেহারা দেখেছি, কিন্তু আমরা মানুষ হয়েছি ও-সব আওতার বাইরে। ও-সব চলতো আমাদের চোখের আড়ালে। কিছু আমাদের জানতে পারবার কথা নয়। মা'র কাছে গিয়ে বাবামশাই-এর অন্য চেহারা দেখতুম। বড় ভয় করতাম কিনা কর্তাদের—কিন্তু এমন করে বাঈজীর মুখোমুখি হইনি কখনো। ননী মেয়েটাকে বললে—কিছু খাওয়াও ভাই আমাদের—আমার বন্ধু আজ এই প্রথম এল এ-সব জায়গায়।

আমার দিকে চেয়ে বললে—কীরে চূড়ো—খিদে পেয়েছে—কী খাবি বল? তোর তো আজ বিকেলের বরাদ্দ দুধ খাওয়া হয়নি।

'আমার তখন ভাই ঘাম ঝরছে—খাবো কি মাইরি, খেতেই ইচ্ছে করছে না। ননী জানতো বিকেলবেলা এক গেলাস দুধ আর ফল খাওয়া অভ্যেস আমার। কতদিন কলেজের পরে আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে ও ফলটল খেয়ে গিয়েছে কিন্তু তখন কে আমার কথা শোনে ভাই! মেয়েটা কাকে যেন কী বললে। আর খানিক পরেই এল সব খাবার। ফলও এল, মিষ্টিও এল। আর আমার জন্যে দুধও এল। মেয়েটা আমাকে বললে—আপনার বড় লজ্জা বুঝি?

কিন্তু ননীটা কী বদমাইশ জানেন! মেয়েটাকে বললে—তুমি তো লজ্জাহারিণী ভাই—ওর লজ্জা আজ ভাঙতে পারবে না?

মেয়েটা জিভ কেটে বললে—তেমন অহঙ্কার নেই ননীবাবু, আপনাদের মতন ভদ্দরলোকের পায়ের ধুলো পড়ে আমার কুঁড়েঘরে, তাইতেই আমি ধন্য।

ননী বললে—বাজে কথা থাক, খাবার দিলে, আর মুখশুদ্ধি দিলে না, এ কী রকম! তেষ্টা পাচ্ছে যে।

মেয়েটা ঝলমল করে উঠে পড়লো। বললে—ছি ছি আগে বলতে হয়।

বেনারসী ওড়নার ঘোমটা সরিয়ে মেয়েটা 'খস্-খস্' শব্দ করতে করতে গিয়ে এবার দাঁড়িয়ে দেরাজ খুলে পেছন ফিরে তাকালো আমার দিকে। বললে—কড়া জিনিস চলবে আপনার?

তখন কড়া মিঠে কিছুই জানিনে। কখনও খাইনি ও-সব। কিন্তু খেলাম। কড়া খেলাম কি মিঠে খেলাম জানিনা ভাই কিন্তু খেলাম। সেদিন কী আদর আমার! আমাকে তোয়াজ করাই একমাত্র কাজ হলো বাড়িসুদ্ধ লোকের। তারপর গান চলতে লাগলো। মতিয়ার মুখেই ওই গানটা প্রথম শুনি। এখনও মনে আছে সেটা—'জখ্‌মী দিলকো না মেরে দুখায়া করো'—

একে গজল তায় মতিয়ার গলা, সঙ্গে সারেঙ্গী আর পেশাদারী হাতের সঙ্গত্। তার ওপর আবার একটু অমৃত পেটে গিয়েছে। কখন যে কোথা দিয়ে সময় চলেছে টের পাবার কথা নয়। তখন বাড়ির কথাও আর মনে নেই, কারোর কথা মনে নেই। তখন মতিয়াকে আমি কেবল বলেছি নেশার ঘোরে—তোমায় বিয়ে করবো আমি—তোমায় ছাড়বো না আমি।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভেঙেছে নেশা কেটেছে তখন ননী এল।

এসেই গালাগালি। বললে—ছি-ছি চুড়ো, তোর একটা জ্ঞানগম্যি নেই, সারা রাত বাঈজীর বাড়ি কাটালি এত বড় বংশের ছেলে হয়ে!

আমি তো অবাক। বলে কী! আমাকে ওই-ই নিয়ে এল আর এখন কিনা আমাকেই গালাগালি!

আড়ালে নিয়ে এসে চুপি চুপি বললে—আমরা ভদ্দরলোকের ছেলে—একটু ফুর্তিটুর্তি করে চলে যাবো নিজের বাড়ি, তা না রাত কাটাবো এখানে? কত বললুম—চল চুড়ো, চল, চল—তুই কিছুতেই শুনলি না। ছি-ছি—এখানে কি রাত কাটাতে আছে?

তখন আমারও তাই মনে হচ্ছিলো মাইরি। এ কী করলুম! আমি তো ভদ্রলোক! আমি বড়বাড়ির ছেলে—আমি নিমকমহলের বেনিয়ান ভূমিপতি চৌধুরীর প্রপৌত্র। সূর্যমণি চৌধুরীর নাতি, বৈদুর্যমণি চৌধুরীর ছেলে—আমার এ কী পরিণাম! বললাম—চল বাড়ি চল।

ননীলাল বললে—সে কি? বাড়ি যাবি কী রে?

আবার কী দোষ হলো বুঝতে পারলুম না। বললাম—কেন?

—ওকে কিছু দে—মতিয়ার তো এটা ব্যবসা—ও এত কষ্ট করলো, সারা রাত জাগলো।

তাও তো বটে! কিন্তু সঙ্গে তো কিছু আনিনি।

ননী বললে—বাড়ি থেকে আনিয়ে দে—কিছু না দিলে খারাপ দেখাবে যে—তোদের বংশের মুখে চুনকালি পড়বে যে।

বললাম—কত দিতে হবে?

—তোর যা খুশি, মতিয়া কিছু চাইবে না, ও তেমন মেয়ে নয়, তা হলে আর তোকে এখানে আনতুম না, অন্য মেয়ে হলে অবিশ্যি হাজার টাকা চেয়ে বসতো, তা ছাড়া তুই তো কিছু বলিসনি, আমিই এনেছি তোকে... দায়িত্বটা তো আমারই। তবে ওর তো এটা ব্যবসা, ওরই বা চলে কিসে—আর তোদের বংশের নামডাক আছে—দেখিস যেন বদনাম না হয়—

—কত দেবো তুই বল।

ননী গলা নিচু করে বললে—নবাবী করে যেন আবার বেশি দিতে যাসনি তুই। আসলে তো ওরা বাঈজী—পাঁচশ' টাকা দিয়ে নমো নমো করে সেরে দে এ-যাত্রা।

তা এই হলো ননীলাল! আপনি ভেবেছেন ননী সেই পাঁচশ টাকার সবটা দিয়েছে মতিয়াকে? নিশ্চয়ই অর্ধেক নিজে মেরে দিয়েছে। তারপর যখন আবার পরে একদিন মতিয়ার কাছে গেলুম—জিজ্ঞেস করলুম।

মতিয়া বললে—সে কি, আমাকে একটা পয়সাও তো দেয়নি ননীবাবু।

তা ননীলালকে চিনতে আমার আর বাকি নেই ভূতনাথবাবু। আর শুধু কি আমাকে? আমার মতন আরো কত বড়লোক আছে কলকাতায়। সারা কলকাতার লোকের কাছ থেকে ধার করেছে। ঠন্‌ঠনের ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্তর কাছ থেকেও নিয়েছে। একটু বড়লোক দেখলেই তার কাছ

থেকে টাকা ধার করেছে। শোধ কাউকেই দেয়নি। শুধু কি এক বার? বার বার আমার কাছে একটা-না একটা ছুতো করে ধার চেয়েছে। ওর ওই একটা গুণ। ও চাইলে কেউ না বলতে পারে না। খানিক থেকে ছুটুকবাবু বললে—একটু চলবে নাকি আজ? একটুখানি।

ভূতনাথ ছুটুকবাবুর হাত দুটো চেপে ধরে বললে—মাপ করবেন ছুটুকবাবু। সেদিন তো খেয়েছিলাম—আজকে আর নয়...

ছুটুকবাবু বললে—তবে বলছেন যখন থাক, কিন্তু আমি একটু খেয়ে আসি—বলে পর্দার ভেতরে গিয়ে আবার মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। এসে বললে—সেই কথাই কাল থেকে ভাবছি, ননীটা বাহাদুর ছেলে বটে—কত ঘাটের জল খেয়েছে আর কত ঘাট যে পার হয়েছে তার শেষ নেই। অথচ একজামিনেও পাশ করলে, আর নেশা ধরে গেল আমাদেরই...

হঠাৎ সুযোগ বুঝে ভূতনাথ বললে—আপনার সেই শশী কোথায় গেল—শশীকে দেখছিনে।

—না ভাই, ও-সব চাকর আর রাখবো না ঠিক করেছি, পারা ঘা হয়েছিল সারা গায়ে।

—বংশীর একটা ভাই আছে, বংশী বলছিল ওর ভাইটাকে যদি...

কথাটা শুনে ছুটুকবাবু যেন চটে গেল। বললে—না ভাই, ও-সব এক ঝাড়ের বাঁশ, ওদের কাউকেই আর বিশ্বাস নেই, বেটারা সবাই পাজি—ও সবাই যেন মালকোশের ধৈবত্—যেখানেই থাকুক ঘুরে ফিরে ঠিক সেই ধৈবতে এসে দাঁড়াবে... তা এবার ভাবছি পরীক্ষাটা আবার দেবো—একটা মাস্টার ঠিক করেছি। হপ্তায় চারদিন লেখাপড়া আর তিনদিন গান-বাজনা। আর এই নেশাভাঙটাও ছাড়তে হবে—বলে আবার উঠলো ছুটুকবাবু। উঠে পর্দার আড়াল থেকে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।

বলে—আপনি বেশ ভালো আছেন স্যার—কোনো নেশাটেশার মধ্যে নেই—এ একবার ধরলে ছাড়ায় কোন্ শালা!

হঠাৎ বাইরে যেন কার ছায়া পড়লো।

ছুটুকবাবু চিৎকার করে উঠলো—কে রে, কে ওখানে? কে?

—আমি বংশী আজ্ঞে।

—তা বাইরে কেন? ভেতরে আয়—কী দরকার?

বংশী বললে—আমি শালাবাবুকে একবার ডাকছিলাম।

—ও—বলে ভূতনাথ উঠে বাইরে এল।

ভূতনাথ বাইরে আসতেই বংশী গলা নিচু করে বললে—কই, ছোটমা'র কাছে যাবেন বলেছিলেন—যাবেন না?

ভূতনাথ বললে—ছোটবাবু আছেন, না চলে গিয়েছেন?

বংশী বললে—ছোটবাবুর তো অসুখ খুব—পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে কতদিন থেকে—বাড়িতেই থাকেন।

—তা হলে?

—আমি ছোটমা'কে বাইরে ডেকে আনবো'খন, আপনি কথা বলবেন—তাতে কি—ছোটমাও যে আপনার কথা বলেছিলেন আজ্ঞে।

—তবে চল।

ছুটুকবাবুর ঘরে ঢুকে ভূতনাথ বললে—তা হলে আজ আসি ছুটুকবাবু আর একদিন আসবো। বাইরে বেরিয়ে ভূতনাথ বললে—কোন্ দিক দিয়ে যাবি বংশী?

বংশী বললে—কেন আপনার সেই চোরাকুঠুরির সরু বারান্দা দিয়ে?

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ইঁটবাঁধানো উঠোনের ওপর তখন ইব্রাহিমের ছাদের আলোটা থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে।

ওদিকে খাজাঞ্চিখানার দরজায় তালা পড়ে গিয়েছে। দক্ষিণের কোণ থেকে দাসু মেথরের ছেলেটা বাঁশিতে বিল্বমঙ্গলের সুর ভাঁজছে—'ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে'। আস্তাবলের ভেতর

ছোটবাবুর শাদা ওয়েলার জোড়া অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঠকাঠক পা ঠুকে চলেছে। আস্তাবলের ওপর দোতলায় ব্রজরাখালের ঘরটা তেমনি অন্ধকার। তার পাশে ব্রিজ সিং-এর ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। বোধ হয় আটা মাখছে এখন। থপ থপ শব্দ আসছে সে-ঘর থেকে। তার পেছনে তোষাখানায় চাকরদের ঘরে এখন তাস-পাশা চলছে। সন্ধ্যেবেলা কাজ কম। বাবুরা বেরিয়ে গিয়েছেন বেড়াতে।

ভূতনাথ আস্তাবলবাড়ির পাশ দিয়ে একেবারে বাগানের কাছে এল। বংশী আগে আগে চলেছে। মনে হলো—প্রথমে গিয়ে কী কথা বলবে? বহুদিন থেকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিলো ছোটবৌঠানকে। গিয়ে বলতে হবে—'মোহিনী-সিঁদুর' আগাগোড়া সব মিথ্যে কথা। সব বুজরুকি। ছোটবৌঠান যেন 'মোহিনী-সিঁদুর' না পরে। আগে যদি জানতো ভূতনাথ 'মোহিনী-সিঁদুর' দিতো না কখনও।

বংশী আবার ডাকলে—চলে আসুন শালাবাবু।

—এ আবার কোন্ রাস্তা বংশী?

চোরকুঠুরির ঠিক সামনাসামনি একটা দরজা। এতদিন নজরে পড়েনি তো। সেই ইটালিয়ান সাহেবের মেমসাহেব! এখান দিয়ে এই গুপ্ত পথে বুঝি অভিসারের আয়োজন হতো। ভূমিপতি চৌধুরী বুঝি এই দরজা খুলে দিতেন মধ্যরাত্রে। নিমকমহলের বেনিয়ানের হৃদয় নিয়ে লেনদেন চলতো বুঝি এইখানে। এই লোকচক্ষুর অন্তরালে!

বংশী বললে—এই রাস্তা দিয়েই ছোটমা আনতে বলেছেন আপনাকে আজ্ঞে।

অতি নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। ভূতনাথের মনে হলো—ভূমিপতি চৌধুরীর পর এ-দরজা এই প্রথমবার বুঝি আবার খোলা হলো এতদিন পরে। নিঃশব্দে সে বুঝি পেরিয়ে চলে এসেছে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যায়ে। সেদিনটা এই বারান্দার মতোই বুঝি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কলকাতা শহর তখন সবে গড়ে উঠছে। সূতানুটীতে তখন কেবল হোগ্‌লার জঙ্গল। সেই হোগ্‌লার জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আর্মেনিয়ানরা মেয়েমানুষেব ব্যবসা করে আর ডাকাতরা টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে পথিকদের খুন করে ফেলে দেয় গঙ্গার জলে। মানুষ বলি দেয় কালীঘাটের কালীর সামনে। তারপর জব চার্নকের আমল থেকে শুরু করে শহর যখন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে এসে প্রথম এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো, তখন এল স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস আর এক মাদাম গ্র্যাণ্ড! পৃথিবীর সেরা প্রেমের কাহিনী। সেদিন সেই রাত্রে যখন মাদাম গ্র্যাণ্ডের শোবার ঘরে প্রথম ধরা পড়লো ফ্রান্সিস সাহেব তখন ভূমিপতি চৌধুরীরও জন্ম হয়নি। কিন্তু মাদাম গ্র্যাণ্ড বুঝি বার বার বিভিন্ন রূপ নিয়ে জন্মেছে সংসারে। কখনও ফ্রান্সিস সাহেবকে, কখনও ভূমিপতি চৌধুরীকে, আবার কখনও জবার রূপ নিয়ে ছলনা করেছে পুরুষ জাতকে। এই অসময়ে ছোটবৌঠানের আকর্ষণের পেছনেও যেন সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির যোগাযোগ রয়েছে। রয়েছে এক মহা অপরাধের পূর্বাভাস। নইলে এত আকর্ষণ কেন? ব্রজরাখাল তো বার বার বলেছিল—কাজটা ভালো করোনি বড়কুটুম—ওরা হলো সাহেব-বিবির জাত—আর আমরা হলাম গিয়ে গোলাম—ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম ভালো নয়।

সেই অন্ধকারাবৃত আবহাওয়ায় বংশীর পেছনে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল ভূতনাথ। কেন সে যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে? কার কাছে যাচ্ছে? এই কি তার কলকাতা দেখতে আসা? জীবনে সে প্রতিষ্ঠা করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে—তবে আজ কেন এই অভিসার! রোজ রোজ ঘরের অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে কেন এই তিমিরাভিসার! যে-পথ দিয়ে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, ভূমিপতি চৌধুরী সবাই একদিন গিয়েছে, আজ ভূতনাথও আবার সেই পথ দিয়েই বুঝি যাত্রা করছে—তার এই অবৈধ নৈশ যাত্রা! বংশী পেছন ফিরে আর একবার ডাকলে—কই, আসুন শালাবাবু।

হঠাৎ কি যেন হলো। মনে পড়লো ফতেপুরের বারোয়ারিতলার মা মঙ্গলচণ্ডীকে। আর মনে পড়লো—নরহরি মহাপাত্রের সর্বসিদ্ধিদাতা বিনায়ককে। ভূতনাথ বললে—চল—যাই।

দরজাটা খুলেই সামনে ছোটবৌঠানের ঘর। একেবারে মুখোমুখি।

আগে থেকেই বুঝি বন্দোবস্ত ঠিক ছিল সব। বংশী দরজার সামনে যেতেই ছোটবৌঠান বেরিয়ে

এল। ঘরের আলো পড়ে ছোটবৌঠানের কানের হীরেটা চক চক করে উঠলো। ভূতনাথকে তখনও বুঝি ভালো করে দেখতে পায়নি ছোটবৌঠান। বললে—কই রে বংশী—ভূতনাথ কই?

ভূতনাথ সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—বৌঠান এই যে আমি!

—ও, এসেছো—এসো—মাথা থেকে নিঃশব্দে ঘোমটাটা খসে গেল বৌঠানের। এতক্ষণে ভালো করে যেন দেখতে পেলো মুখটা। সেই ছোটবৌঠান! ভূতনাথের যেন চোখ নামতে চায় না। ছোটবৌঠানের নজরে পড়লো। একটু হেসে বললে—এসো, ঘরের ভেতরে এসো।

তবু ভূতনাথের যেন দ্বিধা হলো। বললে—ছোটবাবু কোথায়?

—আছেন, কিন্তু সেজন্যে তোমার কিছু ভয় নেই—তুমি এসো।

ঘরে যেতেই ছোটবৌঠান বললে—কেমন আছো ভূতনাথ?

ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে দেখলে একবার। সব ঠিক তেমনি আছে। আলমারির পুতুলগুলো ঠিক তেমনি করে তার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সোনার বাঁশি হাতে করে ছেটোবৌঠানের যশোদাদুলাল তেমনি অচল-অটল দাঁড়িয়ে। ছোটবৌঠানের দিকে চাইতেই ভূতনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। মনে হলো, একটু আগেই যেন ছোটবৌঠান খুব কেঁদে ভাসিয়েছে। কিন্তু ভূতনাথের চোখে চোখ পড়তেই ছোটবৌঠানের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। বললে—কী দেখছো ভাই অমন করে?

ভূতনাথ বললে—না, আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম একটা কথা।

—কী কথা—বলো না শুনি।

—ও সিঁদুর আর আপনি পরবেন না—ওই 'মোহিনী-সিঁদুর'।

—কেন, সিঁদুরে আবার কী দোষ করলো ভাই—জবার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে?

—না, ঠাট্টা নয়, সুবিনয়বাবু নিজে বলেছেন, ও-সব বুজরুকি।

—তা হোক, কিন্তু আমার কাজ হয়েছে ভাই।

—সে কি!

—হ্যাঁ, 'মোহিনী-সিঁদুরে'র ফল ফলেছে আমার, অনেক ওষুধ-বিযুধ আগে খেয়েছি, মাদুলি-তাগা, কিছুই বাদ রাখিনি, পুজো-মানত সব করে দেখেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি আগে—কিন্তু 'মোহিনী-সিঁদুরে' কাজ হয়েছে।

—সে কি বৌঠান, সুবিনয়বাবু নিজেই বললেন যে ও বুজরুকির ব্যবসা তুলে দেবেন।

—তা হোক।

—কী করে হলো?

—সব কথা তো তোমাকে বলা যায় না, তুমি শুনতেও চেও না কিছু—কিন্তু...

—কিন্তু কী বৌঠান?

ছোটবৌঠান যেন একটু দ্বিধা করলো। তারপর বললে—ছোটকর্তা কথা দিয়েছেন আমাকে, জানবাজারের বাড়িতে আর যাবেন না। বরাবর রাত্রে বাড়িতেই থাকবেন, যদি আমি...

—যদি আপনি...?

—এখন এর বেশি আর শুনতে চেও না—এর বেশি আমি বলবোও না।

ছোটবৌঠান যেন নিজেকে সামলে নিলে।

তারপর বংশীকে ডেকে ছোটবৌঠান বললে—বংশী তুই এখন যা—পরে ডেকে পাঠাবো।

বংশী চলে যাবার পর ছোটবৌঠান গলা নিচু করে বললে—কিন্তু ভূতনাথ, তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে—আজকেই।

ভূতনাথের উৎসুক দৃষ্টির সামনে চোখ রেখে পটেশ্বরী বৌঠান বললে—করবে? পারবে?

—পারবো। কী?

—কেউ যেন জানতে না পারে—বংশীও নয়।

—কেউ জানবে না বৌঠান।

—আমাকে মদ কিনে এনে দিতে হবে।

—মদ?

—হ্যাঁ, মদের অভাব নেই, এ-বাড়িতে তা সবাই জানে। এ-বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাই খায়, কিন্তু তবু দরকার, খুব ভালো মদই নিয়ে এসো, বেশি নয়। সামান্য হলেই চলবে'খন, কিন্তু আজ রাত্রেই—আমি টাকা দিচ্ছি—

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে টাকা বার করে দিলে।

বললে—এই জন্যেই তোমায় ডেকেছিলাম।

ভূতনাথ উঠলো। পটেশ্বরী বৌঠান বললে—হ্যাঁ ভাই যাও—তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। রাস্তা তো চিনে নিলে—ওইখান দিয়ে আসবে, কেউ জানবে না।

হতবুদ্ধির মতো ভূতনাথ বেরিয়ে এল বাইরে, কোথাও কিছু নেই, কিন্তু এমন যে হবে ভাবতে পারেনি ভূতনাথ। বড়বাড়ির রহস্য বুঝি আলাদা। অন্য কোনো নিয়মে বুঝি একে বাঁধা যায় না। ইতিহাসের পাতায় এর মানুষগুলো বড় বেশি নড়েচড়ে, কথাও বুঝি বেশি বলে—কিন্তু কিছুতেই বুঝতে দেয় না নিজেদের। ভূতনাথের মনে হলো পটেশ্বরী বৌঠান যেন সত্যিই ইস্কাবনের বিবির মতন—হাতে যদিই বা আসে সে শুধু হাতের বাইরে চলে যাবার জন্যেই!

ভূতনাথ সন্ধ্যের অন্ধকারেই গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

আজ এতদিন পরে ভাবতে যেন কেমন লাগে। সে-মানুষগুলো, সে-দিনগুলো কোথায় গেল! সেই লঘুপক্ষ দিন আর রাতগুলো। উঠে বসে ধীরে সুস্থে চলা, ভাবা আর বাঁচা! দিন যেন আর ফুরোয় না, রাত যেন আর কাটে না। সূর্য উঠতো যেন বড় আস্তে আস্তে। ডুবতো যেন বড় দেরি করে। গড়িয়ে গড়িয়ে চলতো সময়ের চাকা। হচ্ছে, হবে, অত তাড়া কিসের? তামাক খাও। আর একটু জিরোও! সমস্ত দিনটা তো পড়ে রয়েছে। কত কাজ করবে করো না।

সে অনেকদিন আগের ঘটনা। সেবার হুজুগ উঠলো চৈত্রমাসের অমাবস্যার দিন মহাপ্রলয় হবে! প্রলয় মানে এক ভীষণ কাণ্ড! কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে। পাঁজিতে লিখেছে—অমাবস্যা তিথিতে দ্বাদশ ঘটিকা সপ্তম পল ত্রয়োদশ দণ্ড গতে ঘাতচন্দ্র দোষ।

ভৈরববাবু এসে বললেন—লোচন, দে বাবা, ভাল করে তামাক দে—আর তো ক'টা দিন।

লোচনও কথাটা শুনেছিল। বললে—বলেন কি ভৈরববাবু, কলি উল্টে যাবে?

—উল্টে যাবেই তো। কলির চারপো পূর্ণ হয়েছে যে—উল্টোবে না!

লোচন বললে—উল্টে গেলে কী হবে?

ভৈরববাবু বললেন—সত্যযুগ শুরু হবে।

লোচন বললে—আমরা দেখতে পাবো তো?

—বেঁচে যদি যাস তো দেখতে পাবি বৈকি—কিন্তু বেঁচে থাকলে তো—কী হয় আগে দেখ্?

লোচন সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লো। বললে—বাঁচবো না ভৈরববাবু—বলেন কি!

ভৈরববাবু হুঁকো টানতে টানতে বললেন—বাবুরা বাঁচবে কি না তাই আগে দেখ্। বাবুরা বাঁচলে তবে তো চাকর-বাকরেরা! মনে কর, সাততলা বাড়ির মতো উঁচু জল দাঁড়িয়ে গেল এখানে, কলকেতা শহর হয়তো সমুদ্দর হয়ে গেল—তখন কোথায় থাকবি তুই, আর কোথায় থাকবো আমি—মেজবাবু পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছে।

সমস্ত কলকাতার লোকগুলো ভয় পেয়ে গেল। যেখানে যায়, সেখানেই ওই আলোচনা। রাস্তার ধারের রোয়াকে আড্ডা বসে। জোর আলোচনা চলে।

নিশা ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল—যদি বেঁচে থাকি তো আবার ফিরে আসবো। শালাবাবু, মরবার আগে জমি-জিরেতের পাওনাগণ্ডাগুলো সব বুঝে নেই তো—মরে গেলে কে আর দেবে।

লোচন বলে—পেট ভরে ভাত খেয়ে নে বংশী—এ জন্মে আর খেতে পাবি কি না পাবি?

বংশীও বড় ভয় পেয়ে গিয়েছে। বলে—কী হবে শালাবাবু? বোনটার জন্যেই ভাবি, বিয়ে দিয়েছিলুম, আট কুড়ি টাকাও খরচ হয়ে গেল। সোয়ামীও বাঁচলো না ওর। এখানে যাহোক ছোটমা'র পায়ের তলায় বসে দু'মুঠো খেতে পাচ্ছিলুম—কিন্তু এখন এ কী কাণ্ড বলুন তো!

এক-এক করে দিন যায়। চৈত্র মাসের অমাবস্যা এগিয়ে আসে। একদিন 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে গিয়ে সুবিনয়বাবুর কাছে কথাটা পাড়লে ভূতনাথ। আপনি কিছু শুনেছেন স্যার?

সব শুনে সুবিনয়বাবু বললেন—শেষ দিনটার জন্যে অত ভয় পাও কেন ভূতনাথবাবু, গানেরও তো সম্ আছে, ছন্দেরও তো যতি আছে, কিন্তু নদী যেখানে থামে, নদী যেখানে শেষ হয়, সেখানে একটা সমুদ্র আছে বলেই তো শেষ হয়—তাই শেষ হয়েও তার তো কোনো ক্ষতি নেই—

I have come from thee—why I know not;

But thou art, God! What thou art;

And the round of eternal being is the pulse of

thy beating heart.

জানো ভূতনাথবাবু—ফল যখন পাকে, তখন ডাল থেকে ছিঁড়ে পড়াই তার গৌরব, কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি সে দীনতা বলে মনে করে তবে তার মতো কৃপার পাত্র আর কে আছে—

কথা বলতে গেলে সুবিনয়বাবুর আর মাত্রাবোধ থাকে না।

শেষে সেই অমাবস্যা তিথি এল। সমস্ত বাড়িতেই যেন একটা উত্তেজনা। ইব্রাহিম সহিসও আজ অসুখের ভান করে কাজে আসেনি। তোষাখানা, ভিস্তিখানা, খাজাঞ্চিখানা, আজ সব যেন থম থম করছে। রান্নাবাড়ির কাজ সকাল সকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্রজরাখাল তখন ছিল এখানে। কিন্তু তারও দেখা নেই। বিকেলবেলা ভূতনাথ ব্রজরাখালকে বলেছিল—আজ সন্ধ্যেবেলা একটু সকাল-সকাল ফিরো ব্রজরাখাল।

ব্রজরাখাল বলেছিল—কেন?

—কী সব শুনছি হবে—পাঁজিতে লিখেছে?

—তুমিও যেমন বড়কুটুম, পাঁজির কথা বিশ্বাস করো, অত 'দৈবের' ওপর বিশ্বাস করলে কাজ চলে না, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন—কাপুরুষতা!

—কিন্তু পাঁজি কি মিথ্যে লিখেছে? কত জ্ঞানী পণ্ডিত লোকদের লেখা সব।

ব্রজরাখাল বলেছিল—রেখে দাও পাঁজিওয়ালাদের জ্ঞান ; জ্ঞানের পরেও আছে বিজ্ঞান, ঠাকুর বলতেন—'যে দুধের কথা কেবল কানে শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ খেয়েছে সে জ্ঞানী, আর যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে সে হলো বিজ্ঞানী'। যাই বলো বড়কুটুম আমার ও-পাঁজিতে বিশ্বেস নেই—জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাইরে ওরা—বলে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল নিজের কাজে।

ব্রজরাখাল বিশ্বাস করেনি, সুবিনয়বাবুও গুরুত্ব দেননি, কিন্তু মেজবাবু সেদিন বাড়ি থেকে বেরোলেন না। সকাল-সকাল খানা সেরে নিলেন। নাচঘরেই সেদিন আড্ডা বসলো। ভৈরববাবু এলেন গোঁফে তা দিয়ে। বগলেশ-আঁটা জুতোজোড়া সন্তর্পণে দরজার পাশে রেখে—ফরাসের ওপর গিয়ে বসলেন। মতিবাবুও এলেন। ছাতাটা একপাশে রেখে কোঁচানো চাদর আর কোঁচা সামলে বসলেন এগিয়ে। সকলেরই বাঁকা সিঁথি, বাবড়ি চুল। আর এলেন বড়মাঠাকরুণ। ভারিক্কি চেহারা, হাতে পানের ডিবে। বারো গাছা করে মোটা বেঁকি চুড়ি দু'হাতে। টাঙ্গাইলের কড়কড়ে দাঁতওয়ালা চওড়া পাড়ের শাড়ি। এসেছে তিনকড়ি। বয়েসকালে তিনকড়ির চেহারা ভালো ছিল বোঝা যায়। নাকে হীরের নাকছাবি। গালভর্তি পানদোক্তা। মোটাসোটা মেয়েটি। এককালে হাসিনী আসার আগে ওই-ই ছিল সুয়োরাণী। তারপর আসে হাসিনী। বয়সে কচি। গায়ের গয়না তারই বেশি। বেশি কথা বলে। ছটফটে। চুলবুলে।

মেজবাবু গড়গড়ায় মুখ দিয়েই হুঙ্কার দিলেন—বেণী—বেণী—

বেণী এলে মেজবাবু বললেন—রূপলাল ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয় তো।

ভৈরববাবু বললেন—আজ্ঞে পাঁজি আমি নিজে দেখেছি—রাত বারোটা বেজে সাত পল ত্রয়োদশ

দণ্ডে ঘাতচন্দ্র দোষ।

মেজবাবু বললেন—না, না, রূপলাল আসুক না, যদি মহাপ্রলয় হয়ই তো ঠাকুরমশাই-ই বা কেন বাদ যাবেন—সকলের একযাত্রা হওয়াই তো ভালো।

মতিবাবু বললেন—আজ্ঞে আমি তো গিন্নীকে বলে এসেছি, আজ সব যেন একঘরে এসে শোয়—কিন্তু ঘুম কি আর কারো আসবে? সবাই জেগে বসে আছে।

ভৈরববাবু বললেন—কলিযুগ শেষ হয়ে গেল, একরকম বাঁচা গেল স্যার। ছোটলোকদের আস্পর্ধা দিন দিন যেমন বাড়ছিল, সত্যযুগ এলে আবার জিনিস-পত্তরের দাম কমবে, জামাকাপড় সস্তা হবে, আটআনা মণ চাল কিনবো—চাই কি দামই লাগবে না।

মতিবাবু বললেন—সে গুড়ে বালি, এ রামরাজত্ব তো নয়, এবার ইংরেজের রাজত্ব। এখানে অবিচার চলবে না আর।

মেজবাবু বললেন—সেদিন ব্রহ্মজ্ঞানী শিবনাথ শাস্ত্রীমশাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল জানো!

সবাই উন্মুখ হয়ে উঠলো।

মেজবাবু বললেন—জিজ্ঞেস করলাম—কী করছেন? তিনি বললেন—মানুষের ডাকে যেমন দেবতার আসন টলে, তেমনি মানুষের পাপেও তাঁর আসন টলে।

—তা মিথ্যে তিনি বলেননি স্যার, টলবেই তো, এই যে কলিযুগে প্রজারা জমিদারকে মানতে চায় না, ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে না, এ-ও পাপ বৈকি স্যার।

মেজবাবু একটু পরে বললেন—ক'টা বাজলো দেখো তো?

—এই তো সবে সন্ধ্যে—সাতটা বেজে চল্লিশ—

মেজবাবু বললেন—তাহলে এখনও তো অনেক দেরি, তা হলে... বলে বড়মাঠকরুণের দিকে তাকালেন।

বড়মাঠাকরুণ পান সাজতে সাজতে বললেন—আজকে আর গাইতে বোলো না হাসিনীকে। কারোর মেজাজ ভালো নেই।

মেজবাবু বললেন—গান না হয় না হলো, তুমি তবে ওইগুলো বার করো, বরফও তো এসেছে।

বড়মাঠকরুণ তাতেও নারাজ। বললেন—তোমার মতিচ্ছন্ন হচ্ছে দিন দিন। আজকে কোথায় বসে বসে জপ্‌তপ্ করবার দিন।

– তবে সিদ্ধিই হোক, সিদ্ধির সরবৎ, গরমটাও পড়েছে খুব, বেশ করে পেস্তা বাদাম বেটে, একটু ল্যাভেণ্ডার দিয়ে... কী বলো ভৈববাবু?

ইতিমধ্যে রূপলাল ঠাকুর এসে পড়লেন। গায়ে গরদের চাদর। পায়ে খড়ম।

পাশের ঘরের ফাঁক দিয়ে দেখছিল ভূতনাথ, লোচন, আরো সবাই। আজকে প্রায় সকলের ছুটি। সকাল সকাল রান্নাঘরের পাট শেষ।

বংশী তাড়াতাড়ি এসে বললে—শালাবাবু, ওদিকে সব্বনাশ হয়েছে—শিগগির আসুন!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো রে বংশী?

একরকম জোর করেই টানতে টানতে ভূতনাথকে বাইরে নিয়ে এল বংশী। বংশী বললে—শিগগির চলুন একবার জানবাজারে—ও-সব পরে দেখবেন আজ্ঞে—ও সমস্ত রাত ধরেই চলবে আজ।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—আজ্ঞে, এখুনি খবর এসেছে জানবাজারের বাড়ি থেকে, ছোটবাবুর অসুখ—আমাকে ছোটমা ডেকে বলে দিলেন—তোর শালাবাবুকে নিয়ে যা।

সেই রাত্রেই বেরোলো ভূতনাথ। সঙ্গে বংশী। রাস্তায় বেরিয়ে বংশী বললে—এমনি করেই প্রাণটা খোয়াবেন ছোটবাবু, ও ছাই-ভস্ম খেয়ে পেটে একেবারে ঘা হয়ে গিয়েছে, আজ থেকে তো নয়, সেই বিয়ের আগে থেকে—মানুষের শরীরে কত সয়, বলুন?

জানবাজারের অন্ধকার গলিতে ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেট দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া দুটো চুপচাপ মাথা

নিচু করে পা ঠুকছে। বংশী একেবারে সোজা গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো—বিন্দা—ও বিন্দা—

বৃন্দাবন দরজা খুলে দিয়েছে। বংশী বললে—ছোটবাবু আমার কেমন আছে বিন্দাবন?

বৃন্দাবন বললে—এখনও জ্ঞান হয়নি। যা না ওপরে যা—বাবুর কাছে নতুন-মাও বসে আছে।

বংশী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে—চলে আসুন শালাবাবু, ছোটমা বলেছে রাত বারোটার আগে যেমন করে হোক ছোটবাবুকে বড়বাড়িতে নিয়ে যেতেই হবে... বারোটার পর কি হয় কে জানে।

ছোটবাবুর ঘরের কাছে পৌঁছতেই ভেতর থেকে কে যেন পায়ের শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এল। ভূতনাথকে দেখে একটুখানি ঘোমটা টেনে দিলে। বললে—কে, বংশী এলি? ভালোই হয়েছে।

বংশী বললে—আমার বাবু কেমন আছে এখন নতুন-মা?

—এখনও জ্ঞান হয়নি বংশী, ডাক্তার ডেকেছিলুম, বড় ভয় করছে।

—কই দেখি—বলে বংশী ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। ভূতনাথও গেল পেছন পেছন। চুনীবালার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। বেশ সুন্দরী দেখতে। কিন্তু যেন বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে সেবা করছে একটানা।

বৃন্দাবন এসেছিল ঘরে। বললে—তুমি এবার খেয়ে নাও গে—বংশী তো রয়েছে।

নিঃসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে ছোটবাবু। ধপধপে ফরসা রং-এর মানুষটা। ওষুধ খেয়ে বোধ হয় বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। বংশী গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করলো। মনে হলো বংশী যেন ছোটবাবুকে জাগিয়ে তুলতে চায়। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বংশীর চোখ দুটো যেন একেবারে পাথরের মতো নিষ্প্রাণ কঠিন হয়ে এসেছে। ভূতনাথের মনে হলো—বংশীর এ রূপ যেন দেখেনি কখনও আগে। এই মুহূর্তে ছোটবাবু উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চাবুক মারলে যেন বংশী খানিকটা স্বস্তি পেতো। যেন প্রাণ ফিরে আসতো বংশীর শরীরে।

সেই রকম চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একেবারে ফেটে পড়লো বংশী। বললে—ও ছাই-ভস্মগুলো তুমি কেন খাও নতুন মা। নিজে না হয় গেলো কিন্তু আমার ছোটবাবুকে কেন গেলাও বলতে পারো?

বংশীর কথায় ভূতনাথও কেমন যেন চমকে উঠলো।

চুনীবালা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বংশীর দিকে একবার চাইলে। মনে হলো—বংশীর এ ধরনের কথার জন্যে যেন চুনীবালা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কিছু উত্তরও দিলে না।

বংশী আবার হঠাৎ বলে উঠলো—ছোটবাবু মরলে তোমরা বাঁচো, না নতুন-মা?

এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেলো চুনীবালা। জোরগলায় বলতে গেল—বংশী...

বংশী আবার চিৎকার করে বলে উঠলো—হ্যাঁ, নিশ্চয় বলবো, হাজার বার বলবো, তোমাকে আমি ভয় করি নাকি?

চুনীবালা চাপা গলায় বললে—চেঁচাতে হয় বাইরে গিয়ে চেঁচা।

—কেন, অত দরদ কিসের, বিষগুলো খাওয়াবার সময় মনে থাকে না কার দৌলতে খেতে পরতে পাচ্ছো? কার দৌলতে রাজরাণী হয়েছো?

চুনীবালা নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—বংশী তোর তো বড় আস্পর্দা দেখছি...

বৃন্দাবন এসে বংশীর হাত ধরলে এবার। বললে—চুপ কর তুই বংশী, একে সারাদিন মা'র খাওয়া হয়নি, তুই আর জ্বালাসনে।

বংশী কান্নার মতো হাউ-হাউ শব্দ করে উঠলো—খায়নি তো কার কি, বারণ করতে পারে না ছোটবাবুকে যে ও বিষগুলো খেও না?

চুনীবালা যেন স্বগতোক্তির সুরে বলে উঠলো—বিয়ে করা বউ-এর কথা যে শোনে না, সে শুনবে আমার কথা—কথা শুনলি বিন্দাবন!

বংশী বললে—বিয়ে করা বউ-এর কথাই যদি ছোটবাবু শুনবেন তো ছোটমা'র আর দুঃখ

কিসের? এই আমার শালাবাবু সাক্ষী আছেন, ছোটমা'র কপাল যে পুড়িয়েছে তার কখ্খনো ভালো হবে না, কখ্খনো ভালো হবে না—এই বলে রাখছি আমি—তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললে—আসুন শালাবাবু, ধরুন তো একবার।

সেই ছ'ফুট লম্বা শরীর। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। সারা শরীরে আতরের ভুর-ভুর গন্ধ। ভারিই কি কম। বৃন্দাবনও এসে হাত লাগালে। তারপর তিন জনে মিলে ধরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে তোলা! গাড়ি ছাড়বার আগে বৃন্দাবন ভূতনাথকে বললে—আপনাকে একবার নতুন-মা ডাকছে।

—কে ডাকছে?

—আমার নতুন-মা।

—কোথায়? বলে ভূতনাথ বৃন্দাবনের সঙ্গে বাড়ির ভেত'র যেতেই দেখলে দরজার একপাশে চুনীবালা দাঁড়িয়ে আছে। বললে—আমায় ডেকেছিলেন?

চুনীবালা বললে—তুমি বড়বাড়িতে নতুন ঢুকেছো বুঝি, আগে দেখিনি। তা একটা কাজ তোমায় করতে হবে।

ভূতনাথ বললে—বলুন?

—ছোটকর্তাকে তো তাড়াহুড়ো করে তোমরা নিয়ে চললে, শরীরের অবস্থা ওঁর বড় খারাপ, ডাক্তার নড়া-চড়া করতে বারণ করেছিলেন, কাল একবার খবর দিয়ে যাবে কেমন থাকেন উনি?... পারবে আসতে?... নইলে শান্তি পাবো না মনে।

ভূতনাথ কি বলবে ভেবে পেলে না।

চুনীবালা আবার বললে—আর এই ওষুধটা নাও—ডাক্তার বলেছিলেন যন্ত্রণা হলে এটা খাওয়াতে। রাত্রে যদি ব্যথা বাড়ে তো... তাহলে তুমি আসবে তো ঠিক?

পরের দিন যাবার কথাই দিয়েছিল ভূতনাথ। কিন্তু পরের দিনই যাওয়া হয়নি।

সেদিন রাত্রে ছোটমা'র ঘরেই নিয়ে গিয়ে একেবারে তুলেছিল ছোটবাবুকে। ছোটমা'র হাতে ওষুধের শিশিটা দিয়ে ভূতনাথ বলেছিল—ছোটবাবুর জন্যে এই ওষুধটা দিয়েছে নতুন-মা।

শিশিটা না নিয়েই বৌঠান বলেছিল ও ওষুধ তুমি রাস্তায় ফেলে দিও—ওতে বিষ থাকতে পারে।

তারপর বৌঠানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িবারান্দার তলায় ভূতনাথ অনেকক্ষণ বসেছিল। রাস্তায় সেদিন লোকের ভিড়। অত রাত্রেও গঙ্গাস্নান করতে চলেছে দলে দলে। মহাপ্রলয়ের আগে মানুষ পুণ্যসঞ্চয় করে মরবে। পরলোকের পাথেয় স্বরূপ। ওপরের নাচঘরে তখনও মেজবাবুর আড্ডা চলছে। শেষ পর্যন্ত হাসিনীর গান হয়েছে, নাচও হয়েছে। তারপর নাকি মদও চলেছে। মহাপ্রলয়ই যদি হয় তো তা হলে মনে কেন মিছিমিছি আপসোস থেকে যাবে।

রাত তখন এগারোটা। বংশী এল। বললে—ছোটবাবুর এতক্ষণে জ্ঞান হয়েছে শালাবাবু—শশী ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গেল। তারপর বললে—ছোটবাবুর জ্ঞান হতেই পালিয়ে এসেছি আজ্ঞে, যে-রাগী মানুষ, আমাকে এখন সামনে পেলে খুন করে ফেলবে হয়তো।

ভূতনাথ বললে—কেন?

—আজ্ঞে, আমিই তো নতুন-মা'র বাড়ি থেকে ছোটমা'র ঘরে এনে তুলেছি। ছোটবাবু তো আমাকেই দুষবে।

তারপর ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা বাজলো। পৌনে বারোটা। বারোটাও বাজলো। আজ আর সারা বাড়ি নিঝুম নয়। আজ ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। উদগ্র প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মানুষ। এবার কী ঘটে! তারপর বাজলো সাড়ে বারোটা। একটা। দুটো। তিনটে। রাত পুইয়ে গেল নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে।

কিছুই ঘটলো না। প্রতিদিনকার মতো পুরনো সূর্য ইব্রাহিমের ছাদের কোণ দিয়ে উঠলো আকাশে। তারপর সেই দাসু মেথরের উঠোন ঝাঁট দেওয়া। তোষাখানায় চাকরদের হৈ-হল্লা। ভিস্তিখানায় জল তোলার শব্দ। লোচনের হুঁকো পরিষ্কার করা। নাথু সিং-এর ডন-বৈঠক। খাজাঞ্চিখানায় বিধু

সরকারের বক্তৃতা। ইয়াসিন সহিসের ঘোড়া ডলাই-মালাই। রান্নাবাড়ির পাশে সদুর তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসা। যদুর-মা'র বাটনা বাটা। ঘরে ঘরে দিনগত পাপক্ষয়। বদরিকাবাবুর ট্যাঁকঘড়ি নিয়ে ঘরে ঘরে ঘড়িতে দম দিয়ে বেড়ানো, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। শুধু ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেটটা আর ঘোড়া জোড়া আজ প্রথম বুঝি এ বাড়িতে রাত কাটালো। ছোটবাবুর আস্তাবল-বাড়িটাকে আজ আর খালি পড়ে থাকবার অগৌরব বহন করতে হয়নি। এ ঘটনা আজই বুঝি প্রথম! রাস্তায় বেরিয়ে ভূতনাথ এই কথাগুলোই ভাবছিল।

রাত হয়ে এসেছে। এত রাতে মদ কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে কে জানে। কোথায় দোকান তাও জানা নেই। একটি মাত্র জায়গা আছে সেখানে গেলে এখন পাওয়া যেতে পারে। জবাদের বাড়ির ঠাকুর হয়তো এখন সেখানে রাস্তার ওপর ইঁট পেতে মাটির ভাঁড় নিয়ে বসেছে। আর সেই গান গাইছে 'পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই লো'—কিন্তু এত রাত্রে অত দূরেই বা সে যায় কী করে? হঠাৎ বংশীর সঙ্গে মুখোমুখি।

বংশী বললে—এত রাত্রে কোথায় চলেছেন শালাবাবু?

কিন্তু বৌঠান তো বংশীকেও বলতে বারণ করে দিয়েছে। বংশীর কথার উত্তরে কী বলা যায় ভেবে পেলে না ভূতনাথ। বললে—তুই কোত্থেকে বংশী?

—চিন্তার আবার জ্বর এসেছে শালাবাবু, মাস্টারবাবু নেই, গিয়েছিলাম শশী কবিরাজের কাছে—কিন্তু আপনি কোথায় চললেন কোথায় আজ্ঞে?

কেমন যেন বিব্রত বোধ করলে ভূতনাথ।

বংশী বললে—কোথায় আপনি যাচ্ছেন তা আমি জানি শালাবাবু। সন্ধ্যেবেলা থেকেই আপনাকে ডাকছে ছোটমা, আমার তো সন্দেহ হলো, বলি, ছোটবাবুর শরীরটা এখনও ভালো করে সারেনি, রাতের বেলা আজকাল বাড়িতেই থাকছেন, তবু শালাবাবুকে কেন ডাকে ছোটমা?

ভূতনাথ বললে—ছোটবাবু আজকাল বাড়িতে থাকছে?

শুনে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল ভূতনাথ। এ-খবরটা তো জানা ছিল না।

বংশী বললে—ওঠবার কি সাধ্যি আছে তেমন। কোনো রকমে একবার ছোটমা'র ঘরে যান, আর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েন। ডাক্তার মানা করেছে যে। বলেছে, যদ্দিন না সেরে ওঠেন একেবারে ওঠা-হাঁটা বন্ধ। কী চেহারা কী হয়েছে শালাবাবু, দেখলে আপনার কান্না পাবে মাইরি।

—মদ খাওয়া ছেড়েছেন নাকি?

—ও বিষ কি আর কেউ ছাড়তে পারে আজ্ঞে! এই আমিই দেখুন না কেন—আজকাল যখন ছোটবাবু শয্যাশায়ী থাকেন, গেলাসে ঢেলে দিই, তা একটু-আধটু জল মিশিয়ে দিই শালাবাবু, মনে হয় মানুষটাকে তো আমিই মেরে ফেলছি। ডাক্তার পই-পই করে বলেছে, ও খেলে আর বাঁচবে না। তা কার কথা কে শোনে—সেই আগেকার মতনই খাচ্ছেন, আর আমিই সেই বিষ নিজের হাতে ঢেলে দিচ্ছি। সকালবেলায় এক একদিন নিজের ঘরের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ান, বাইরে চেয়ে দেখেন একবার—দিনের বেলাটায় তত নেশা থাকে না বাবুর, কিন্তু সন্ধ্যে হলেই—আন্ বরফ্, আন্ বোতল—তবু ভালো যে নতুন মা'র বাড়ি যাবার ক্ষেমতা নেই, ক্ষেমতা থাকলে কি আর ছাড়তেন—ঠিক ছুটতেন। মাগী ওঁকে কী বশই যে করেছে—

তারপর হঠাৎ থেমে বংশী বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা, জানেন, সেদিন নতুন-মা যে বড়বাড়িতে এসেছিল—শোনেননি?

—কবে? টের পাইনি তো কিছু?

আপনি টের পাবেন কি করে, তখন আপনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, রাত তখন অঢেল, নাথু সিং এসে চুপি চুপি আমায় খবরটা দিলে। বললে—বংশী। রূপোদাসীর মেয়ে চুনীবালা এসেছে। ছোটবাবুর কাছে যেতে চায়, গেট খুলবো?

আমি ভাবলাম—চুনীবালা এসেছে ছোটবাবুর কাছে, ক'দিন যেতে পারেননি বাবু তাই, বাবু শুনলে যদি আবার অনত্থ বাধায়, বললাম—দাঁড়া—বলে সোজা ছোটমা'র কাছে দৌড়ে গেলাম। ছোটমা তখন পুজো সেরে সবে উঠেছে। কথাটা শুনেই রেগে একেবারে আগুন! ছোটমা'কে দেখেছেন তো ওই রকম ভালো মানুষ, কিন্তু রাগলে আবার ওই মানুষেরই চেহারা বদলে যায়। বললেন—ছোটবাবুর গাড়ির চাবুকটা নিয়ে দু'ঘা মারতে পারবি রাক্ষুসীর পিঠে—পারবি বংশী—আর না পারিস তো ডাক, নাথু সিংকেই ডাক—আমিই তাকে বলছি।

আমার কেমন ভয় হলো দেখে। ছোটমা বললে—পারবি না?

বললাম—জানতে পারলে ছোটবাবু আমার মাথাটা আর আস্ত রাখবে না ছোটমা।

—আমিও এ-বাড়ির ছোটবউ, যা বলছি কর গিয়ে—চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে রক্ত বের করে দিগে যা।

বললাম—মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে কেবল বাধে, নইলে—

—ওকে তুই মেয়েমানুষ বলিস, ডাইনি ও, তুই না পারিস নাথু সিংকে ডাক। ও যদি বড়বাড়ির মাটি ছুঁয়েছে তো তোদের সকলের চাকরি যাবে বলে দিচ্ছি—আর যা বললুম যদি করতে পারিস তো তোদের দু' ভাই-বোনের জীবনে কখনও খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না—এই বলে দিচ্ছি।

ছোটমা'র চিৎকারে তখন মেজমা, বড়মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মেজমা বললে—কী হলো রে ছোট?

সব শুনে মেজমা হেসেই আকুল। বললে—তুই অবাক করলি আমাদের, পুরুষমানুষের চরিত্তির তো তসরকাপড়—ওর আবার শুদ্ধু অশুদ্ধু কি? তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি—আমার রাঙামাকেও দেখেছি, আর মেজকর্তাকেও দেখেছি—ও-সব মনে করতে গেলে কবে গলায় দড়ি দিতুম।

বড়মা বললে—তোর সবই আদিখ্যেতা ছোটবউ।

—তা বললে বিশ্বাস করবেন না শালাবাবু, সেই রাতের বেলা গেলাম। নাথু সিং নিয়ে গেল গেটের সামনে। নতুন-মা তার নতুন কেনা মোটর গাড়িতে করে এসেছে। আমাকে দেখে ডাকলে—বংশী, ছোটবাবু কেমন আছে রে?

বললুম—একটু ভালো।

—ওষুধ খাচ্ছেন তো?

—খাচ্ছেন।

—আমাকে ভেতরে নিয়ে চল একবার—নতুন-মা বললে।

তা তখন কী আর বলবো! মিথ্যে কথাই বললুম আজ্ঞে। বললাম—বাবু যে মানা করে দিয়েছে তোমাকে আসতে দিতে—মাইরি বলছি নতুন-মা, বলেছে তোর নতুন-মা যদি আসে তো ঢুকতে দিবি নে বাড়িতে—ওর মুখ দেখতে চাইনে।

—নতুন-মা কী যেন ভাবলে কতক্ষণ। বললে—বলেছে ওই কথা?

—আজ্ঞে, আমি কি মিথ্যে-মিথ্যে বলতে গিয়েছি—আমার লাভ কি বলো?

—তবে আমার সামনে বলুক ও-কথা, নিজে আমাকে ছোটকর্তা বলুক চলে যেতে—নিজের কানে না শুনে আমি যাচ্ছিনে। এ পথে আমি নিজে আসিনি, ছোটকর্তাই নিয়ে এসেছে আমাকে।

—কী বিপদেই যে পড়েছিলুম শালাবাবু সেদিন কি বলবো। ছিল রূপোদাসীর মেয়ে, হয়েছে রাজরাণী, সে কেন অত সহজে হাল ছাড়বে? জানবাজারের বাড়ি, চারটে দাসী, তিনটে চাকর, মোটর গাড়ি—ও হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গিয়েছে! আর কী চাই! নষ্ট মেয়েমানুষের তো কেবল ওই দিকেই নজর। ছোটবাবুর অসুখ বলে তো ওর রাতের ঘুম হচ্ছে না একেবারে!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—তা গেল শেষ পর্যন্ত—চলে গেল চুনীবালা?

—তা কি আর আমি দেখতে গিয়েছি শালাবাবু, যাবে না তো করবে কী? আমি নাথু সিংকে গেট বন্ধ করতে বলে চলে এসেছি। তারপর আর কি হয়েছে জানি না—আমার তখন অন্য ভাবনা।

—কীসের ভাবনা?

—ভাবনা নয়? বলেন কী? ছোটবাবু যদি শোনে সব তো অনত্থ বাধাবে না? তখন আমার চাকরিটা ঠেকাবে কে? চিন্তার হাত ধরে আবার তো সেই দেশে গিয়ে না খেয়ে মরবো। দেশে কি জমিদারি আছে আমার যে, ভাঙাবো আর খাবো। সেই যে কথায় আছে না—'তোর ভাবনা কী লো ভাবি'... আমার তো আর তা নেই শালাবাবু।

—তা বলে ছোটমা তোকে আর ছাড়বে না বংশী—এত করছিস তুই ছোটমা'র জন্যে।

বংশী বললে—কিন্তু ছোটমা'র কথা কে শুনবে শালাবাবু, ছোটকর্তাই আমল দেয় না তো শুনবে বাড়ির লোকে! এই যে এত রাতে আপনি ছোটমা'র জন্যে মদ কিনতে যাচ্ছেন—

সাপ দেখে সরে আসার মতো ভূতনাথ এক পা পিছিয়ে এল!

—তুই কী করে জানলি বংশী?

বংশী নির্বিকারভাবে সঙ্গে চলতে চলতে বললে—বলবে আবার কে শালাবাবু, এতদিন বড়বাড়িতে চাকরি করছি, সব জানতে পারি, চাকর-বাকর যদি না জানে তো জানবে পাড়ার পাঁচজনে? আমি যা জানি তা ছোটমা'ও জানে না, মেজমা'ও জানে না, ছোটকর্তা, মেজকর্তা কেউ জানে না,—কোন ঘরে কার রাত কাটে, কবে চুপি-চুপি বড়বাড়িতে ডাক্তার আসে, দাই আসে, ওষুধ-বিষুধ আসে, রোগ-জ্বারি হয়, সব টের পাই আমরা। এই তো গেল বছরে বড়বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে সকালবেলা লোকের ভিড়, পুলিশ পেয়াদা, হৈ-চৈ, কাক-চিল-শকুনির পাল—সবাই অবাক হয়ে দেখে কী? না একটা একদিনের মরা ছেলে—সবে জন্মেছে আজ্ঞে। সব জানি, কে ফেলেছে—কোন্ ঘর থেকে বেরিয়েছে—কিন্তু আমরা চাকর মনিষ্যি, আমাদের সাত-সতেরোতে থাকার কী দরকার! পুলিশ এল—জিজ্ঞাসাবাদ করলে—বললুম—কিচ্ছু জানি না বিত্তান্ত—চুকে গেল ল্যাটা।

ভূতনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, ছোটমা হঠাৎ এই বিষ কিনতে দিলে কেন জানিস বংশী?

বংশী খানিক চুপ করে রইল। তারপর বললে—মাইরি শালাবাবু, আপনি বামুন মানুষ, আপনার এই পা ছুঁয়ে বলতে পারি, ছোটমা'কে আমি ঠাকুর-দেবতার মতো ভক্তি করি, ছোটমা'র দুঃখ ঘোচাতে আমি প্রাণ দিতে পারি আজ্ঞে। লোচন, মধুসূদনদাদা ওরা তো তাই হিংসে করে, বলে—আর জন্মে তুই ছোটমা'র পেটের ছেলে ছিলি। তা পেটের ছেলে তো ছোট কথা হলো হুজুর, পেটের ছেলেই কি দেখতে পারে সব মা'কে—তেমন মায়ের মতন আবার মা তো হওয়া চাই। তা সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাবু ঘরে এসেছে, আমিই ডেকে এনেছি তাঁকে। মা ডাকতে পাঠিয়েছিল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি আজ্ঞে।

ছোটমা বলছে—তুমি আবার যাবে নাকি ওখানে?

ছোটবাবুর তখনও বিষ পেটে পড়েনি কিছু। জ্ঞান আছে বেশ টনটনে। বললে—যাই যদি তো তোমার কী!

ছোটকর্তার তো ওই রকমই কথার ঢং কিনা?

ছোটমা বললে—না-ই বা গেলে—না গেলে হয় না?

—বউ-এর আঁচল ধরে থাকি তেমন বংশে আমার জন্ম নয় ছোটবউ।

ছোটমা যেন কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে—আঁচল ধরে থাকতে বলছি না, কিন্তু আঁচল না ধরেও তো ঘরে থাকা যায়।

—ঘরে বসে তোমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবো, তাই চাও নাকি?

—চেয়ে থাকতে ভালো না লাগলে চেও না, মুখ ফিরিয়ে থেকো—আমি তোমার সেবা করবো।

ছোটবাবুর হাসির শব্দ শুনতে পেলুম আজ্ঞে। অপগেরাজ্যির হাসি। একটু পরে ছোটবাবু বললে—সেবা করতে জানো তুমি ছোটবউ?

ছোটমা বললে—একবার পরখ করেই দেখো না, সেবা করতে জানি কি না?

ছোটবাবু বললে—আমি তো তোমার যশোদাদুলাল নই, পাথরের কিংবা সোনা-রুপোর ঠাকুরদেবতাও নই—আমি মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ—আমাকে সেবা করতে পারবে? ভেবে দেখো।

ছোটমা'র গলা শুনতে পেলুম—ভাববার কিছু নেই, হিন্দু মেয়েদের স্বামীসেবা শিখতে হয় না।

ছোটবাবু আর একবার হেসে উঠলো আজ্ঞে, সেই অপগেরাজ্যির হাসি। বললে—আমি তো তেমন স্বামী নই ছোটবউ। বড়বাড়ির পুরুষমানুষেরা জন্মের আগে থেকে মদ খেতে শেখে, মানুষ হয় ঝি-চাকরের কোলে, আটদশ বচ্ছর বয়সের পর অন্দরমহলে ঢোকা বন্ধ তাদের, বয়েসকালে রক্ষিতা রাখে, পাল্লা দিয়ে বাবুগিরি করে, মোসাহেব পোষে—এমন স্বামীকে সেবা করে খুশি করা তোমার কম্ম নয় ছোটবউ।

—একবার পরখ করেই দেখো না তুমি।

ছোটবাবু বললে—মিথ্যে পরখ করা ছোটবউ, মেহনত সার হবে, ঘরের বউরা তা পারবে না, বড়বাড়ির কোনো বউই পারেনি আজ পর্যন্ত, শুধু বড়বাড়ি কেন, দত্তবাড়ি, মল্লিকবাড়ি, শীলবাড়ি, শেঠবাবুদের বাড়ির কোনো বউ চেষ্টাও করেনি, পারেওনি। ওতে অনেক ল্যাঠা, সে পারে ওরা—ওই বাগানবাড়ির মেয়েমানুষেরা—ওরা কায়দা-কানুন জানে।

ছোটমা'র গলার শব্দ কেমন কাঁদো-কাঁদো শোনালো আজ্ঞে। বললে—এই তোমার পায় ধরে বলছি ওগো—দেখো, কেউ পারেনি সত্যি, কিন্তু আমি পারবো—ওরা সবাই বড়লোকের ঘরের মেয়ে, আমায় গরীবের ঘর থেকে এনেছো। আমি পারবো—তুমি যা বলবে তাই করবো, যেমন করে সাজতে বলবে তেমনি করে সাজবো, যেমন করে কথা বলতে বলবে তেমনি করে বলবো, তোমার মাথা টিপে দেবো, পা টিপে দেবো।

—গান গাইতে পারবে?

ছোটমা বললে—গান তো বাবার কাছে শিখেছিলাম, সেই-সব গান যদি তোমার পছন্দ হয় গাইবো।

—নাচ?

ছোটমা বললে—নাচিনি কখনও, কিন্তু শিখিয়ে নিলে তাও পারবো—তোমার জন্যে আমি সব পারি জানো।

ছোটবাবু এবার হঠাৎ বললে—আর মদ? মদ খেতে পারবে? যেমন করে চুনীবালা মদ খায়?

খানিকক্ষণ চুপচাপ। কোনো কথা শুনতে পেলাম না আজ্ঞে। ছোটমা বুঝি ভাবতে পারেনি ছোটকর্তা এমন কথা মুখে আনতে পারে। আমিও কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম। নিজের সোয়ামী কেমন করে এ-কথা বিয়ে-করা ইস্তিরীকে বলতে পারে আজ্ঞে! ও মদ আর বিষ তো একই জিনিস, সেই বিষ নিজের ইস্তিরীকে কেমন করে খাওয়াতে পারে মানুষ! তা ছোটবাবু তো আজ্ঞে মানুষ নেই আর। নতুন-মা'র কাছে থেকে থেকে মানুষটার মধ্যে আর কিছু নেই হুজুর। কিন্তু ধন্যি আমার ছোটমা, মা তো নয় সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী! তা মা-ও সেই কথা বললে—আমার মা'র মতন উপযুক্ত কথাই বললে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী বললে?

বললে—তা খাবো, মদই খাবো, তুমি হাতে করে তুলে দিলে আমি বিষও খেতে পারি হাসিমুখে।

ছোটবাবু হেসে উঠলো। বললে—কিন্তু নিয়ম তো তা নয়, আমি তুলে দেবো না, তুমিই বরং আমার হাতে গেলাস তুলে দেবে ছোটবউ।

—তা-ই দেবো, আমি মদ খেলে তুমি যদি ঘরে থাকো তো তাই করবো।

শুনতে শুনতে আমার শরীর হিম হয়ে এল শালাবাবু! শেষকালে ছোটমা বিষ গিলবে আর আমরা তাই দেখবো! মনে হলো... বড়বাড়িতে একটি মানুষ ছিল যার পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করলে বুক ভরে যায়, তা সে মানুষটাও গেল। কী যে কষ্ট হলো মনটার ভেতর! মনে হলো গিয়ে মানা করি ছোটমা'কে—বলি যে খেয়ো না তুমি, ও-বিষ খেলে তুমি বাঁচবে না মা—কিন্তু চাকর হয়ে জন্মেছি, ছোট মুখে বড় কথা মানায় না।

চলে গেল ছোটবাবু। আমিও অন্ধকারে চলে আসছিলাম আজ্ঞে, কিন্তু ছোটমা ডাকলে। গেলাম। বললে—তোর শালাবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো।

বললাম—এখুনি?

ছোটমা বললে—হ্যাঁ, এক্ষুণি, বলবি খুব জরুরী দরকার। এখনি যেন একবার আসে আমার কাছে।

তাই তো তখন আপনাকে ডেকে আনলাম—তা আমি সব জানি, আমার কাছে আপনি কিছু লুকোতে পারবেন না আজ্ঞে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু এ জিনিস কোথায় কিনতে পাওয়া যায় তাও আমি জানি না—কত দাম তাও জানি না। শুধু এই দশটা টাকা আমায় দিয়েছে বৌঠান।

বংশী বললে—ছোটবাবুর মদের আলমারির চাবি তো আমার কাছে, আমি জেনে ফেলবো বলেই আপনাকে কিনতে দিয়েছে ছোটমা, কিন্তু আমি হলে ও-বিষ হাতে তুলে দিতে পারতাম না শালাবাবু।

ভূতনাথ বললে—তুই কী বলিস, আমি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসবো?

—তাই দিন আজ্ঞে—সেই-ই ভালো হবে বরং।

—তবে ফিরে চল। তাই ভালো—ফিরিয়েই দিয়ে আসি টাকা—বলিগে আমি পারবো না।

বংশী বললে—কিন্তু আমার নাম করতে পারবেন না শালাবাবু, বলবেন না যেন আমি বলেছি সব কথা।

আবার সেই পথেই ফিরলো ভূতনাথ। বললে—না রে বংশী, তা কখনও বলি।

শহর তখন নিঝুম। কিন্তু বড়বাড়ি তখনও সরগরম। ছুটুকবাবুর ঘরে বুঝি অনেকদিন পরে আবার গানের আসর বসেছে। আজকাল সব দিন আসর বসে না। আস্তাবলের ভেতর অনেক গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে ছোটবাবুর ঘোড়া দুটোও আজ পা ঠুকছে। শুধু মেজবাবু নিত্যকার মতো বাইরে গিয়েছেন মোসাহেবদের নিয়ে। তোষাখানায় চাকরদের তাস-পাশা-দাবার আড্ডার শব্দ। খাজাঞ্চিখানার দরজায় একটা পাঁচসেরী ওজনের ভারি তালা ঝুলছে। ইব্রাহিমের ঘরের কোণে রেড়ির তেলের বাতিটা থেকে এক ফালি তেরছা আলো এসে পড়েছে শানবাঁধানো উঠোনের ওপর। বড়বাড়িতে সব ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলে আজকাল। তবু রেড়ির তেলের বাতিটা তুলে নেবার কথা কারো মনে আসেনি। বদরিকাবাবুর ঘর থেকে জানলার ফুটো দিয়ে ক্ষীণ আলো দেখা যায়। আর দেখা যায় এখান থেকে একেবারে বারান্দার ধারে ব্রজরাখালের ঘরখানা অন্ধকার নিস্তব্ধ নির্জীব। জীবনে ওই একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ে এসেছে ভূতনাথ। এই কলকাতা শহরে যে-লোকটা শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটতে জানে। আর সেই লোকটাই আজ হারিয়ে গিয়েছে।

পাশ দিয়ে শ্যামসুন্দর যাচ্ছিলো। ভূতনাথকে দেখেই থামলো। ডাকলে—শালাবাবু!

—আমাকে ডাকছিস?

—আপনার একটা চিঠি।

—কোথায় চিঠি?

—মধুসূদনকাকার কাছে আছে, আপনাকে দেবে।

—কা'র চিঠি, ডাকপিওন দিয়ে গেল?

—তা জানিনে—বলে শ্যামসুন্দর নিজের কাজে চলে গেল।

ভূতনাথ একবার দাঁড়ালো। কা'র চিঠি হতে পারে। নিশ্চয়ই ব্রজরাখালের। ক'দিন থেকেই আশা করছিল চিঠির। অন্তত একটা খবর তো দেবে। তেমন মানুষ তো ব্রজরাখাল নয়। কাজের লোক বটে। কিন্তু ব্রজরাখাল নেই, আর তার পরিচয়-সুবাদেই থাকা এ-বাড়িতে। ব্রজরাখালের অনুপস্থিতিতে কতদিন আর এখানে থাকা যায়। লোকেই বা কী বলবে! আজকাল—সেই চোট লাগার পর এ-

বাড়িতে পাল্কি করে আসার পর থেকে তার ভাত-তরকারি আসে রান্নাবাড়ি থেকে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। খাজাঞ্চিখানার খাতায় বিধু সরকার প্রত্যেকটি জিনিসের হিসেব রাখে। একদিন দেখতে পেলে হয়তো বলবে—কে তুমি? কোন্ তরফের লোক? নাম কি তোমার? কোন্ খাতায় তোমার নাম? রান্নাবাড়ি, না বারবাড়ি, না দেউড়ি, না তোষাখানা, না...

বিধু সরকারের হিসেবের বাড়তি লোক সে। হিসেবের বাইরে এখন সে। এতদিন সে যে ধরেনি কেন, এইটেই আশ্চর্য!

যারই চিঠি হোক সে পরে দেখলেই হবে। এখন আর সময় নেই। ভূতনাথ অন্ধকার পেরিয়ে সেই দক্ষিণের চোরকুঠুরির বারান্দা দিয়ে আবার গিয়ে হাজির হলো মুখোমুখি। ভেতরে যথারীতি রোজকার মতো আলো জ্বলছে। ছোটবৌঠান বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। বেড়া খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে। ঘাড়ের ওপর বিছে হারটা ইলেক্‌ট্রিক আলোয় চিক-চিক করছে। ও-দিকে যশোদাদুলালের সামনে দু'চারটে ধূপকাঠি জ্বলে-জ্বলে নিঃশেষ হবার মতো। আলমারির ভেতরের সেই পুতুলটা যেন কটাক্ষ করলো আবার। চিন্তাকে আশে-পাশে কোথাও দেখা গেল না। ভূতনাথ দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকলো—বৌঠান!

এক নিমেষে চমকে-ওঠা হরিণীর মতন ঘাড় বেঁকিয়ে দেখেই উঠে পড়লো ছোটবৌঠান। তারপর কাপড়টা গুছিয়ে বললে—কে, ভূতনাথ? এনেছো? তারপর সামনে এসে বললে—দাও।

ভূতনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ছোটবৌঠান আবার বললে—কই, দাও দেখি।

ভূতনাথ এবার স্পষ্ট করে জবাব দিলে—আনিনি।

—আনোনি? কেন? দোকান খোলা পেলে না?

—দোকান পর্যন্ত যাইনি।

—কেন? পটেশ্বরী বৌঠানের আর বিস্ময়ের সীমা নেই।

ভূতনাথ বললে—আমি আনতে পারবো না বৌঠান, এই তোমার টাকা ফেরত নাও—ও-বিষ আমি আনতে পারবো না।

বৌঠান এবার শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। তাকালো ভালো করে ভূতনাথের মুখের দিকে। বললে—তুমি আনতে পারবে না তা হলে?

ভূতনাথ বললে—তুমি আমাকে আনতে বলো না বৌঠান।

—কেন ভূতনাথ, কী হলো হঠাৎ তোমার?

ছোটবৌঠান এবার ভূতনাথের দুটো হাত ধরে বললে—আচ্ছা পাগল যা হোক, কেউ কিছু বলেছে নাকি শুনি?

ভূতনাথ কেমন যেন নরম হয়ে এল। মনে হলো, এক্ষুণি সে বুঝি কেঁদে ফেলবে। বললে—কেন খেতে যাবে ওই ছাই-পাঁশ—ও বুঝি কোনো মানুষ খায়? লক্ষ্মীছাড়ারাই কেবল ওই-সব খায় যে।

ছোটবৌঠান বললে—কেন, এ-বাড়ির ছোটকর্তা তো খায়—কেউ না খেলে ওদের দোকান চলে কী করে?

—যে-খায় সে-খায়, কিন্তু তুমি খেতে পাবে না, তোমাকে আমি খেতে দেবো না—কিছুতেই। ওগুলো খেয়ে তুমি বাঁচবে না।

ছোটবৌঠান এবার খিল খিল করে হেসে উঠলো। বললে—মরাই আমার ভালো ভূতনাথ, স্বামী যার দিকে ফিরে দেখে না, তার বেঁচে থেকে লাভ কী? তবু একবার দেখি না আমার স্বামীকে ফেরাতে পারি কি না। মহাভারতে পড়েছি, সেকালের সতীরা কত কী করেছে—কলাবতী, মাদ্রী, লোপামুদ্রা, তাঁদের মতো হতে চাইছি না, কিন্তু স্বামীর কথা একবার শুনেই দেখি! ও খেলে তো কেউ মরে না।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—মরতে তোমার বড় সাধ, না বৌঠান?

ছোটবৌঠান বললে—না ভাই, বরং ঠিক তার উল্টোটা, আমার মতো এমন করে কেউ বাঁচতে চায় না সংসারে, তবে স্বামীর জন্যে মরতেও আমার আপত্তি নেই—কিন্তু এই না-বাঁচা, না-মরা অবস্থা

আমি আর সহ্য করতে পারছি না ভূতনাথ।

—কিন্তু এতেও যদি ছোটকর্তার মতিগতি না ফেরে, তখন? তখন কী করবে বৌঠান?

ছোটবৌঠান বললে—তখন তোমার ভয় নেই ভূতনাথ—তোমায় দোষ দেবো না তা হলে—কাউকেই দোষী করবো না, আমার কপালেরই দোষ বলে মানবো... কিন্তু সে কথা থাক, আমার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা করতে হবে না। এ-বাড়িতে একটা ঘোড়ার জন্যেও ভাববার লোক আছে, কিন্তু বউ বড় সস্তা, বউ মরলে বউ আসবে, কিন্তু ঘোড়া মরলে ঘোড়া কিনতে পয়সা লাগে যে।

—তবে একটা কথা দাও বৌঠান, মদ তুমি বেশি খাবে না।

—তা কি হয়, ছোটকর্তা যত খেতে বলবে তত খাবো, আমি যে কথা দিয়েছি, যা বলবে ছোটকর্তা, সব করবো।

ভূতনাথ খানিক থেমে বললে—কিন্তু ছি, এমন কথা কেন দিতে গেলে তুমি?

ছোটবৌঠান হেসে উঠলো। গলা নিচু করে বললে—তুমি আমায় খুব ভালোবাসো, না ভূতনাথ!

লজ্জায় ভূতনাথের কান দুটো বেগুনি হয়ে উঠলো। ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো মাথাটা এক নিমেষে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো নামিয়ে নিলে। খানিকক্ষণের মধ্যে মাথা তুলতে পারলো না সে।

ছোটবৌঠান কিন্তু অপ্রস্তুত হয়নি একটুও। বললে—পরস্ত্রীকে ভালোবাসা পাপ—তা জানো তো।

ভূতনাথ একবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো।

ছোটবৌঠান আবার বললে—তা যদি সত্যি ভালোবাসো আমাকে—তো ওটা নিয়ে এসো। যদি নিয়ে আসতে পারো আজ রাত্রে তো বুঝবো সত্যিই ভূতনাথ আমাকে ভালোবাসে।

এ কথার পর ভূতনাথ আর মুহূর্তও দাঁড়ায়নি সেখানে।

সেদিন বংশীকে নিয়ে সেই রাত্রেই শেষ পর্যন্ত মদ কিনে দিয়ে এসেছিল ভূতনাথ। যে-হাতে একদিন 'মোহিনী-সিঁদুর' এনে দিয়েছিল বৌঠানের হাতে, সেই হাতেই এনে দিয়েছিল মদের বোতল। আজ অবশ্য অনুতাপ হয় সেজন্যে। এত বছর পরে যদিও অনুতাপের কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু সেদিন সে তা না দিলে বড়বাড়ির ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হতো! কিন্তু তা হোক, ছোটবাবু তো ফিরেছিল। ফিরেছিল তার মতিগতি। এতদিন পরে সেইটেই শুধু ভূতনাথের সান্ত্বনা!

তোষাখানার সর্দার মধুসূদন বললে—এই নিন শালাবাবু আপনার চিঠি—কাল থেকে পড়ে আছে।

চিঠি খুলে কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। চিঠি লিখেছেন সুবিনয়বাবু। 'মোহিনী-সিঁদুরে'র মালিক। আলোটার তলায় এসে অত রাত্রেই পড়ে দেখলে।

সুবিনয়বাবু লিখেছেন—

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্—

সুচরিতেষু,

শুভানুধ্যায় বিজ্ঞাপনঞ্চ বিধায়—

পরে ভূতনাথবাবু, প্রেমময় ঈশ্বরের কৃপায় তুমি এতদিনে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিয়াছ। তুমি যথাসত্বর আমার সহিত একবার দেখা করিবে। বিশেষ প্রয়োজন বিধায় পত্র লিখিলাম। আমার বড় দুঃসময় যাইতেছে। আমি পাপী, অপদার্থ, আমি অনুতাপ-অনলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। তুমি আসিলে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইব। ইতি সত্যং জ্ঞানমনন্তং... নিবেদক

শ্রী............................

অত রাতে আর 'মোহিনী-সিঁদুরে'র আপিসে যাবার উপায় নেই তখন। কিন্তু রাতটা যেন একরকম জেগেই কাটালো ভূতনাথ। হঠাৎ আধো-ঘুমের মধ্যে যেন তন্দ্রা ছুটে যায়। যেন সে

বিছানায় শুয়ে নেই। যেন সে ছোটবৌঠানের ঘরে গিয়েছে। পাশাপাশি বসে আছে তারা। চিন্তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে বৌঠান। অনেক গল্প করছে দু'জনে। বৌঠান বলছে—'তুমি আমাকে অত ভালোবাসো কেন ভূতনাথ—'। বৌঠানের সাদা চোখের ভেতর দুটো কালো কুচকুচে তারা। তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। নীচের ঠোঁটটাকে এক-একবার দাঁত দিয়ে কামড়ায়। ঠিক দু'কানের নীচে ঘাড়ের দিকের কয়েকটা চুল উড়ে এসে সামনে পড়েছে। বৌঠান তেমনিভাবে চেয়ে বললে—'আমি যদি মদ খাই—তাতে তেমার কি এসে যায়—আমি তোমার কে বলো না যে, আমায় তুমি বারণ করেছো'।... অসম্পূর্ণ কথার সব টুকরো। ঘুমের ঘোরের মধ্যেই যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে ছোটবৌঠানকে। হঠাৎ বৌঠান বোতলটা কাত করে ঢালতে গেল।

ভূতনাথ খপ করে বৌঠানের চুড়িসুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলেছে।

—তুমি আবার খাচ্ছো বৌঠান?

বৌঠান একবার কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ভূতনাথের দিকে। বললে—হাত ছেড়ে দাও বলছি।

—এই তো খেলে, আবার খাচ্ছো কেন?

ছোটবৌঠান সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে—তুমি এবার যাও ভূতনাথ—তুমি এবার যাও—অনেক রাত হয়ে গেল।

—আগে বলো, আর খাবে না।

ছোটবৌঠান বললে—একটু অভ্যেস করে নিই। একটু একটু অভ্যেস না করলে যে হেরে যাবো ছোটকর্তার কাছে—কিন্তু বড্ডো ঝাঁঝ ভূতনাথ।

ভূতনাথ দেখলে—বৌঠান গেলাসটা নিয়ে অতি সঙ্কোচে যেন একবার জিভে ছোঁয়ালো। ছোঁয়াতেই গেলাসটা সরিয়ে নিলে। মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে উঠলো। বড় ঝাঁঝ বুঝি। তারপর আর একবার ছোঁয়ালে জিভে। এবার সবটা। তারপর সমস্ত শরীরটা যেন কেমন শিউরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা পান মুখে পুরে দিলে। দর দর করে ঘাম ঝরছে সারা শরীরে। লাল হয়ে উঠলো সারা মুখখানা। একটা আবেগ ছড়িয়ে পড়লো সর্বাঙ্গে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কেমন লাগছে এখন?

ছোটবৌঠানের চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে এল। শুধু একবার বললে—বড় জ্বালা করছে—আর একটু বরফ দাও তো ভূতনাথ।

ভূতনাথ জল গড়িয়ে দিলে গেলাসে।

জল খেয়ে বৌঠান বললে—আমার ঠাকুরমা'র যিনি মা ছিলেন ভূতনাথ, শুনেছি, তিনি সহমরণে গিয়েছিলেন, মহা ঘটা হয়েছিল সে-সময়, তিনি নাকি হাসতে হাসতে চিতায় উঠেছিলেন, তাঁর হাতে-পায়ে দড়ি বাঁধতে হয়নি, দেশের লোকে ধন্য-ধন্য করেছিল—আর আমিও আজ সহমরণে যাচ্ছি ভূতনাথ—দেখো, আমি মরলেও ধন্য-ধন্য পড়ে যাবে ঠিক।

হঠাৎ ভূতনাথ হাত দিয়ে ছোটবৌঠানের মুখটা চাপা দিয়ে দিলে।

—মরা ছাড়া তোমার আর কথা নেই মুখে?

কিন্তু সেই মুহূর্তে কী যে কাণ্ড ঘটে গেল। ছোটবৌঠান নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ভূতনাথের গালে এক চড় বসিয়ে দিলে। কোমল হাতের চড়! কিন্তু চড়টা ভূতনাথের গালের ওপর পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

চিৎকার করে উঠলো বৌঠান—যাও বেরিয়ে যাও—এখনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—যাও—

এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা-বিপর্যয়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ। হঠাৎ মনে হলো যেন ছোটকর্তার জুতোর আওয়াজ কানে এল। আর দাঁড়ানো যায় না। ভূতনাথ ভয় পেয়ে গিয়েছে। এখনি ছোটকর্তা এসে ঘরে ঢুকবে। ভূতনাথ পেছন ফিরে এক নিমেষে চোরের মতো নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে এসেছে। শুধু মনে হলো—তার এই ভয় পাওয়া দেখে যেন হেসে উঠলো বৌঠান।

প্রচণ্ড হাসি। সে-হাসি আর থামতে চায় না। পাগলের মতো, মাতালের মতো বৌঠান ঘর ফাটিয়ে হাসছে!

আর তারপরেই আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল ভূতনাথের। প্রথমটা যেন ঠিক বোঝা গেল না। তারপর জ্ঞান হলে বোঝা গেল, ভূতনাথ তার ছোট চোরকুঠুরিতেই শুয়ে আছে। আর তারপরেই খেয়াল হলো—কে যেন দুমদাম শব্দ করে দরজা ঠেলছে অনেকক্ষণ ধরে। ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলতেই দেখা গেল বংশীকে। বংশী একা নয়। সঙ্গে একজন চীনেম্যান, আর একজন নুরওয়ালা লোক। মনে হয় মুসলমান।

বংশী বললে—কী ঘুম আপনার শালাবাবু—কত বেলা হয়ে গেল, কতক্ষণ ধরে দরজা ঠেলছি!

ভূতনাথ যেন একটু লজ্জায় পড়লো। চারদিকে বেশ কড়া রোদ উঠে গিয়েছে। ছোটঘর বলে বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি।

বংশী তখন চীনেম্যানকে বললে—হাঁ করে দেখছো কি সাহেব—এই পায়ের মাপ নিয়ে নাও।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী ব্যাপার আবার?

—আপনার পায়ের মাপ নিতে হবে, ছোটমা'র হুকুম—ছুটুকবাবুর বিয়েতে বাড়িসুদ্ধ লোকের পায়ের মাপ নিতে হচ্ছে যে।

চীনেম্যান সাহেব ভূতনাথের পায়ের মাপ নেবার পর বংশী পাশের লোকটিকে বললে—খলিফা সাহেব, এবার তুমি এগিয়ে এসো, দেরি করো না বাপু আবার, একটা কামিজ আর একটা কোট—আমার ও-দিকে আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। ছোটবাবু আবার আজ বাড়িতে রয়েছে।

মাপ নেওয়া হলো। চীনে মুচি আর ওস্তাগর চলে গেল।

ভূতনাথ ডাকলে—ও বংশী, শোন এদিকে?

বংশী এল। বড় শশব্যস্ত।

—কী ব্যাপার বল্ তো? আমার এ-সব কেন?

—আজ্ঞে, এই যে রেওয়াজ, বাড়িসুদ্ধ সবার হচ্ছে আপনার হবে না? ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবু, ওঁয়ারা সব এ-বাড়ির কে বলুন না, ওঁদেরও হলো, আর শুধু ওঁদেরই নাকি? ওঁদের ছেলে নাতি সবাই সক্কালবেলা এসে গায়ের-পায়ের মাপ দিয়ে গেল যে—তাই তো ছোটমা বলে পাঠালে—

—ছোটমা নিজে বলেছে?

—তা ছোটমা নিজে বলবে না তো কি মেজমা বলেছে? মেজমা'র বয়ে গিয়েছে।

কেমন যেন অবাক লাগলো ভূতনাথের। এ ক'দিন থাকতেই খারাপ লাগছিল তার। যেন অনধিকার-প্রবেশ করেছে সে এ-বাড়িতে। কোন্ দিন খাজাঞ্চিখানার বিধু সরকার না...

ভূতনাথ বললে—অথচ আমি ভাবছিলাম কোন্ দিন সরকারমশাই হয়তো কী বলে বসবে আবার, ভাবছিলাম ব্রজরাখাল নেই, আমি এখানে আছি, অন্ন ধ্বংস করছি—

বংশী বললে—সে কথাও হয়ে গিয়েছে।

—হয়েছে নাকি সে কথা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হয়েছে বৈকি! মেজমা'র ছেলেরা এখন মামারবাড়ি গিয়েছে, পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, তাই ছুটি—তাই তারা ফিরে এলে আপনিই পড়াতে শুরু করে দেবেন।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, সে ছেলেদের সব একদিনও তো দেখতে পেলাম না—থাকে কোথায়?

—তারা আজ্ঞে, বেশির ভাগই তো মামার বাড়িতে থাকে, লেখাপড়া যা হয়, তা খুব জানি, গাড়ি করে স্কুলে যেতে দেখেননি, তা আপনি তো ভোরবেলাই আপিসে চলে যান, আর আসেন সন্ধ্যেবেলা—দেখবেন কখন? সন্ধ্যেবেলা তারা বাড়ির ভেতর নিজেদের ঝি-এর কাছে থাকে... তা বিধু সরকারকে আপনার অত ভয় কি?

তারপর শশব্যস্ত হয়ে বললে—আমি এখন যাই শালাবাবু—ছোটবাবু বাড়িতে আছে আজ।

—তাই নাকি? ছোটকর্তা কোন্ ঘরে শুয়েছিল কাল রাতে?

—কেন ছোটমার ঘরে। রাত্রে গিয়ে ছোটবাবুকে আমি ছোটমা'র ঘরে পৌঁছে দিলাম আজ্ঞে—যাই বলুন, আপনার 'মোহিনী-সিঁদুরে'র ফল আছে বলতে হবে কিন্তুক।

বংশী চলে গেল। ভূতনাথ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে। আজ সকালবেলাই যেতে হবে 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে। বাইরে সারা বাড়ি রং করা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন জানলা দরজায় রং হচ্ছে। শ্যামসুন্দর জল তুলছে ভিস্তিখানায়। লোচনের কাজ অনেক বেড়েছে। অনেক হুঁকো কল্‌কে আর তামাকের সরঞ্জাম সংগ্রহ হয়েছে। বিয়ে-বাড়ির আয়োজন। ভূতনাথকে দেখে বললে—প্রেণাম হই শালাবাবু।

—কী খবর লোচন?

—আজ্ঞে, ফুরসত আর নেই আজকাল তেমন, সমস্ত তামাকের ব্যাপারটা তো একা আমাকেই সামলাতে হবে, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি একেবারে, একটা নতুন তামাক তৈরি করেছি আজ্ঞে, গয়া মিঠেকড়া বালাখানার সঙ্গে ছটাক আন্দাজ কাশী মিশিয়ে বেশ নতুন রকমের সোয়াদ এনেছি—খেয়ে দেখবেন নাকি?

ভূতনাথের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে—না, না, ভয় পাবেন না—পয়সাটয়সা চাইনে, আধলাও নয়, এমনিই আপনাকে খেতে দিচ্ছি। মতিবাবু তো জহুরী লোক, তিনি পর্যন্ত খেয়ে ধরতে পারেন নি আজ্ঞে—জিজ্ঞেস করলাম—কী তামাক বলুন দিকি মতিবাবু? মতিবাবু খানিকক্ষণ ভাবলেন, দু'চার বার টানলেন, এদিক-ওদিক সাত-পাঁচ সব ভেবে বললেন—আট আনা ভরির অম্বুরি যেন মনে হচ্ছে—

ভূতনাথ বললে—তারপরে?

—তারপরে আর কী ঘটনা ঘটলো তা লোচন বললে না। নিজের কাজে মন দিলে কিছুক্ষণ। তারপর বললে—ওই মতিবাবু, মেজবাবু, ভৈরববাবুর মতো দু'একজন লোক এখনও আছে বলে পৃথিবীটা টিকে আছে—নইলে য়্যাদ্দিনে কবে কলিযুগ এসে যেতো... দেখতেন।

—তা তো বটেই লোচন—আচ্ছা, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, আসি—

বলে ভূতনাথ ভিস্তিখানায় ঢুকে পড়লো।

বেরোতে বেরোতে বেশ বেলা হয়ে গেল। মাধববাবুর বাজারের পাশে বেশ ভিড় জমেছে। সিনেট হল্-এর সামনে গাড়িঘোড়া পুলিশের ভিড়। চারদিকে য়ুনিয়ন জ্যাক উড়ছে। ভিড়ের ঠেলায় কাছে ঘেঁষা যায় না। সামনে লাল কাপড়ের ওপর বড়-বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে—'কন্‌ভোকেশন'।

বেশ মনে আছে বোধ হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ সাল। ভিড় কাটিয়ে চলে যাওয়ারই কথা। চলেই যাচ্ছিলো ভূতনাথ। হঠাৎ চারদিকে বেশ গুঞ্জন শুরু হলো। পুলিশেব দল বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। হট যাও—হট যাও শালে লোক—এই উল্লুঃ—

পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো—ওই বড়লাট আসছে!

বড়লাট। ভূতনাথও দাঁড়িয়ে পড়লো। বড়লাটকে কখনও দেখেনি ভূতনাথ। সামনে-পেছনে মাউন্টেড পুলিশ। গাড়ি থেকে নেমে বড়লাট উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

ভূতনাথের তখন দাঁড়াবার সময় নেই। বি-এ পাশ করলে সে-ও এইখানে এসে ডিগ্রি নিতো বড়লাটের হাত থেকে। কালো গাউন পরে গিয়ে বসতো সকলের সঙ্গে।

—ভূতনাথদা' না?

পেছন ফিরে দেখলে ভূতনাথ। অচেনা লোক। কাঁধে হাত দিয়েছে। হাসি হাসি মুখ।

—চিন্‌তে পারছেন আমাকে?

চিনতে পারা যায় না। কোথায় যেন দেখেছে।

—আমি নিবারণ, 'যুবক-সঙ্ঘে'র কথা মনে আছে? আপনি তো আর গেলেন না ওখানে? কেমন আছেন? প্রায় দু'বছর পরে দেখা আপনার সঙ্গে—একসঙ্গে অনেক কথা বলে গেল নিবারণ।

—কী খবর তোমাদের? তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ, ভালো কথা, ব্রজরাখাল কোথায় জানো? তোমাদের 'যুবক-সঙ্ঘে'র প্রেসিডেন্ট?

—কেন, আপনি জানেন না?

—না, এই তো সবে ক'দিন হলো উঠে বেড়াচ্ছি, অনেকদিন তো শয্যাশায়ী ছিলাম, ঘা বিষিয়ে গিয়েছিল। উঠে বেড়ানো বারণ করেছিল ডাক্তার। আরো এক বছর কাটলো বিশ্রাম নিতে, এখনও বেশি পরিশ্রম করলে মাথা ধরে। কোথা দিয়ে যে সময়গুলো হু-হু করে কেটে যায় টের পাওয়া যায় না, মনে হচ্ছে এই যেন সেদিন তোমাদের ওখানে ছিলাম।

—এখন কোথায় যাচ্ছেন?

—সেই 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে, কতদিন আপিসে যাইনি, চাকরি বোধ হয় আমার নেই, মাঝখানে শুধু দু'তিনখানা চিঠি লিখে ওদের জানিয়েছিলাম যে, এখনও পুরোপুরি সারিনি। সেরে উঠলেই যাবো। আজ কর্তা একবার ডেকে পাঠিয়েছেন—যাই দেখে আসি।

নিবারণ বললে—বড়দা'ও আসবে কলকাতায় দু'একদিনের মধ্যে।

—কে? ব্রজরাখাল? এতদিন কোথায় ছিল সে?

নিবারণ বললে—তিনি তো সেই তখন থেকেই বাইরে—অনেকদিন পর্যন্ত আমরা কোনো খবর পাইনি, স্বামিজীর আলমোড়ার আশ্রমে অনেকদিন ছিলেন, সেখান থেকে একবার খবর আসে তিনি অসুস্থ। তারপর শুনলাম তিনি তিব্বতে চলে গিয়েছেন। এই সেদিন আবার শুনলাম তিনি নাগপুরে এসেছেন প্লেগের জন্যে, খুব প্লেগ হচ্ছিলো, সেই শুনে তিনি কারোর বারণ না শুনে প্লেগরুগীদের সেবা করতে এসেছিলেন। এবার সিস্টার নিবেদিতা ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন—লিখেছেন—মোক্ষ নিতে দৌড়চ্ছো ব্রজরাখাল, কিন্তু যারা লাফাতে পারে না তারা পার হবে লঙ্কা! দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পারো না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পারো না—মোক্ষ নিতে দৌড়চ্ছো। বৌদ্ধরা ঐখানটাতেই গুলিয়ে ফেলে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! সিস্টার নিবেদিতা বলেন—অহিংসা ভালো কিন্তু নিঃশত্রু হওয়া আরো বড় কথা, আততায়িনমায়ান্তং ইত্যাদি, অর্থাৎ হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নেই, তোমাদের মনুই তো বলেছেন—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ করো, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ করো, ভোগ করো, পৃথিবী ভোগ করো, তবেই তুমি ধার্মিক—আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও তাই—কথা বলতে বলতে নিবারণ থামলে।

ভূতনাথ বললে—ব্রজরাখাল সে-চিঠির কিছু উত্তর দিয়েছে?

—দিয়েছেন। আমাদের কদমদাকে একটা চিঠিতে লিখেছেন—আমি যাচ্ছি শিগ্‌গির, তোমরা তৈরি হও। সিস্টার নিবেদিতা সেদিনও আমাদের 'যুবক-সঙ্ঘে' এসে বলে গেলেন—স্বামীজি বলে গিয়েছেন—অর্জুন ওই তমোগুণে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান অত করে বোঝাচ্ছেন গীতায়—প্রথম ভগবানের মুখ থেকে বেরুলো—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—জৈন-বৌদ্ধদের পাল্লায় পড়ে আমরাও ওই তমোগুণের মধ্যেই পড়েছি—কেবল ডাকছি ভগবানকে—ভগবান শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না—তা ভগবান। এখন আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের উপদেশ শোনা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—'তস্মাত্তমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব'... আমাদের 'যুবক-সঙ্ঘে' গীতা-ক্লাস হয়—একদিন যাবেন না বেড়াতে?

—যাবো একদিন, আর সেই তোমাদের 'অনুশীলন-সমিতি'—তা শুরু হয়েছে?

—হয়েছে, সব বলবো আপনাকে, একদিন আসুন আপনি। সারা কলকাতায়, সারা বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামে ব্রাঞ্চ খোলা হবে, কুস্তি শেখানো, গীতা পড়া, ড্রিল করা... অনেক কাজ এগিয়েছে—কদমদা বড়দা'কে লিখে দিয়েছে চলে আসতে, বড়দা'ও লিখেছে রওনা হয়েছে, দু-একদিনের মধ্যেই হয়তো এসে পড়বে। আমি এখন চলি, পরে দেখা হবে।

আর কিছু না বলে ভূতনাথও চলে এল।

'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসের সামনে এসে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল ভূতনাথ। সামনের সে

সাইন-বোর্ডটা নেই সেখানে। সামনের দরজাটা দিনের বেলাও বন্ধ। এমন তো হয় না। সারাদিন তো লোকজনের আনাগোনা থাকে। অথচ আজ এ-রকম কেন?

দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে বৈজু। ভূতনাথকে দেখে সেও যেন অবাক হয়ে গিয়েছে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বাবু আছেন?

—আছেন, ওপরে যান।

ভূতনাথ একটু দ্বিধা করে আবার জিজ্ঞেস করে—ওরা কোথায় সব, পাঠকজী, ভরত, মিশির—

বৈজু বললে—পাঠকজী আছে, অন্য সবাই চলে গিয়েছে।

—কেন? এখন সিঁদুরের প্যাকেট তৈরি করে কে?

—সিঁদুর আর তৈরি হয় না, কারবার বন্ধ করে দিয়েছেন বাবুজী।

—সেকি!

বাড়ির ভেতরে সোজা চলতে গিয়ে মুখোমুখি এসে পড়ে গেল জবা। ভূনাথকে দেখে জবা যেন হঠাৎ একটা আশ্রয় পেয়ে গিয়েছে এমনি করে সামনে এগিয়ে এল। আরো অবাক হলো ভূতনাথ। চোখ নামিয়ে নিতে চাইলে। সেদিনকার জ্বরের ঝোঁকে যে-কাণ্ড সে করে ফেলেছিল তারপর সোজাসুজি চোখ তুলে চাইবারও যেন অধিকার নেই আজ তার।

জবাই সামনে এসে পড়লো। বললে—ভূতনাথবাবু—আপনি এসে গিয়েছেন—কাল থেকে আপনার অপেক্ষা করছি।

অনেকদিন পরে দেখা। তবু ভূতনাথের মনে হলো জবা যেন আরো অনেক বড় হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। আরো শ্রীমতী, আরো প্রীতিময়ী হয়েছে। শরীরের রেখায় আরো প্রখরতা। হঠাৎ চোখ তুলে চাইলে ধাঁধা লাগে। মাথা ঝিম-ঝিম্ করে ওঠে।

জবা বললে—বাবা আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন—পেয়েছিলেন আপনি?

ভূতনাথ বললে—পেয়েছি, অসুখের পর আজ এই প্রথম এতদূর বেরুলাম।

জবা বললে—বাবা আজ সকালেও বলেছেন—ভূতনাথবাবু এল না—আমার ওপর নিশ্চয় অপরাধ নিয়েছে সে।

—বাঃ রে, অপরাধ কিসের তাঁর—অপরাধ তো আমারই হয়েছে।

তারপর জবার মুখের দিকে চেয়ে বললে—নিজের অপরাধেই এতদিন এত জ্বলেছি যে, চিঠি না পেলে আসতেই সাহস হচ্ছিলো না। ভাবছিলাম এ-বাড়ির দরজা আমার কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমার বাবার স্নেহের সুযোগ নিয়ে আমি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

জবা হঠাৎ যেন আবার পুরনো দিনের সুরে বললে—এবার আপনাকে কেউ পাড়াগাঁয়ের মানুষ বলে ভুল করবে না। শুধু নামটা আপনার বদলে ফেলুন এবার।

ভূতনাথ কিন্তু হাসতে পারলো না। বললে—আমি ভাবতেও পারিনি যে, এ-বাড়ি থেকে আবার আমার ডাক আসবে—আমি আবার চাকরি ফিরে পাবো।

জবা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো—কিন্তু চাকরি তো আপনার নেই ভূতনাথবাবু।

জবা রসিকতা করছে কি না দেখবার জন্যে জবার মুখের দিকে ভালো করে তাকাবার প্রয়োজন হলো এবার। জবা তেমনি কঠিনস্বরেই বললে—শুধু আপনারই নেই, তা নয়। কারোর চাকরিই আর নেই। বাবা কারবার তুলে দিয়েছেন।

—কেন?

—সেই কথার জবাব দেবেন বলেই হয়তো বাবা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, ভাবছিলেন, হয়তো আপনি নিজে থেকেই একদিন আসবেন, যখন এতদিন ধরেও এলেন না তখন বাবাই যেতে চাইছিলেন আপনার কাছে। আমিই কেবল বারণ করেছি—বলেছি—যিনি নিজে থেকে চলে গিয়েছেন, আমাদের সমস্ত আদর-যত্ন সত্ত্বেও যিনি এখানে থাকতে চাইলেন না, আপনি নিজে গিয়ে ডাকলেও তিনি হয়তো আসতে নাও পারেন—কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, বাবা যেতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজেরই গরজে।

ভূতনাথ বললে—আমি আবার একটা মানুষ, এতখানি বয়েস অবধি যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারলে না—তার জন্যে আবার কারো গরজের প্রশ্ন উঠতে পারে এইটেই তো অবাক্ লাগে!

—আপনার কাছে লাগতে পারে, কিন্তু বাবা কাউকে কোনোদিন ছোট ভাবতে পারেন না। আমার বাবাকে আপনি এখনও চিনতে পারলেন না। সেদিন সমাজে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে, তিনি এতদিন যা করে এসেছেন সব ভুল করে এসেছেন, কেবল গোঁজামিল দিয়ে এসেছেন! লোক ঠকিয়ে এসেছেন—এখন নাকি তাই সব হিসেব মিটিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবেন।

—সে কি?

—বাড়ি এসেই সাইন-বোর্ডটা খুলিয়ে ফেললেন। সব কর্মচারীদের বিদায় দিলেন। সকলকে হাত জোড় করে বললেন—তাঁকে যেন সবাই ক্ষমা করে। বললেন—যা করেছি সব ভুল, সব মেকি, এতদিন যে চলেছে, সে কেবল বাজারের চলা, কিন্তু এখন ব্যাঙ্কের পোদ্দারের কাছে আমার সব খাদ ধরা পড়ে গিয়েছে।

—তার মানে?

—তার মানে কি আমিই জানি ছাই, মা'র মৃত্যুর পর থেকে তো ওইরকম সব বলতে শুরু করেছিলেন। এখন আরও বেড়েছে। প্রতি রোববার সমাজে যান, বেশিক্ষণ একলা চুপ করে বসে থাকেন, 'সঞ্জীবনী' কাগজখানা নিয়ে খুলে বসেন—কিন্তু মনে হয় কিছুই যেন নজরে পড়ছে না।

ভূতনাথ বললে—চলো, বাবার কাছে যাই।

জবা বললে—চলুন।

ভূতনাথ বললে—তা ছাড়া এমন চালু ব্যবসা এভাবে হঠাৎ নষ্ট করে দেওয়াও তো উচিত নয়। এতগুলো লোকের জীবিকা—তোমার ভবিষ্যৎ।

জবা কিছু উত্তর না দিয়ে চলতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে।

সুবিনয়বাবু তখন একখানা 'সঞ্জীবনী' নিয়ে পড়ছিলেন।

ভূতনাথ সামনে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

সুবিনয়বাবু মুখ তুলে চেয়ে চিনতে পেরে বললেন—আমার চিঠি পেয়েছিলে ভূতনাথবাবু? তোমার কথা আমি দিবারাত্রি ভাবি। ব্রজরাখালবাবু নিজে এসে তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন। আমি তোমার কিছু করতে পারলাম না—অবশ্য সারাজীবন ধরে কারই বা কী করতে পেরেছি।

ভূতনাথ পাশের চেয়ারে বসে রইল চুপ করে। জবাও গিয়ে বসলো বাবার চেয়ারের হাতলের ওপর। তারপর জবার দিকে চেয়ে বললেন—মা জবা, তা হলে ভূতনাথবাবুকে বলো সেই কথাটা—সেই কথাটা বলো।

জবা বললে—আপনিই বলুন।

সুবিনয়বাবু বললেন—তা হলে আমিই বলবো মা, আমিই বলবো—কিন্তু তার আগে তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া দরকার ভূতনাথবাবু। আমি তোমার কিছু করতে পারিনি—ব্রজরাখালবাবু নিজে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তোমাকে।

ভূতনাথ হাত জোড় করে বলে উঠলো—আমাকে অপরাধী করবেন না মিছিমিছি।

—সে কি কথা, অপরাধ তো আমারই, সেই বিশ্বনিয়ামক যিনি, সমস্ত তিনি জানেন, তাঁর প্রতি আমি অবিচার করেছি, সমাজের প্রতি অবিচার করেছি, সমস্ত বিশ্বের ওপর অপরাধ করেছি—অপরাধ কি আমার সামান্য ভূতনাথবাবু, অথচ এই অপরাধ সম্বন্ধেই এতদিন অজ্ঞান ছিলাম আমি। সেদিন সচেতন করে দিলেন আমার বাবা।

—আপনার বাবা? ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ, তবে শোনো, সেদিন স্বপ্নে আমাকে দেখা দিলেন। আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, কালীভক্ত, তোমাকে তো বলেছি! বাবা বললেন—খোকা, আমি মুক্তি পাচ্ছি না, তুই আমাকে মুক্তি দে।

শেষ-জীবনে বাবা আমার মুখদর্শন করেননি। আমি ধর্মত্যাগী বলে আমার হাতে এক গণ্ডূষ জলও পাননি তিনি। বললেন—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে খোকা, মুক্তি পাচ্ছিনে—আমাকে তুই মুক্তি দে। তারপরেই আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল ভূতনাথবাবু, আমি চারদিকে চোখ মেলে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। বিদ্যাসাগরমশাই অবিশ্যি লিখেছেন—'স্বপ্ন সত্য নহে—' আমিও ভালো রকম তা জানি। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মনে শান্তি পেলাম না। সারাদিন কাজকর্ম করতে মন গেল না! জবাকে বললাম—একটা ব্রহ্মসঙ্গীত করতে—তবু যেন ভুলতে পারলাম না কথাটা। শেষে সন্ধ্যেবেলা আমাদের সমাজে গেলাম। মনে হলো যেন ওখানে গেলে শান্তি পাবো।

ভূতনাথ বললে—তারপর?

—সেদিন আচার্যদেব বক্তৃতা দিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে। মন দিয়ে শুনতে শুনতে মনে হলো এ তো আমারই কথা। যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর দুই স্ত্রীকে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে গেলেন, তখন মৈত্রেয়ী বললেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্—কিমহং তেন কুর্যাম্—যা দিয়ে অমরত্ব লাভ করতে পারবো না তা নিয়ে আমি করবো কী! বড় ভালো কথা! মন দিয়ে শুনতে লাগলাম ভূতনাথবাবু, অমৃতের মধ্যেই যে সত্য আছে, অমৃতের মধ্যে দিয়েই যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাই এ উপলব্ধি আমরা কখন করি? যখন আমার কোনো পরমাত্মীয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। যাকে আমরা ভালোবাসি, মৃত্যুতে যে সে থাকবে না, একথা ভাবতে আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে। যে মানুষকে আমরা অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখবো কেমন করে! তখন ভাবি—প্রেম কি কেবল আমারই? কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়? তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না ভূতনাথবাবু, তুমি বুঝবে না, জবাও বুঝবে না।

ভূতনাথ বললে—আপনি বলুন আমি বুঝতে চেষ্টা করবো।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সুবিনয়বাবু বলতে লাগলেন—বাবার মৃত্যু আমি দেখিনি! শুনেছি। কিন্তু জবার মায়ের মৃত্যু আমি প্রতিদিন পলে পলে অনুভব করেছি ভূতনাথবাবু—মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু যতই চঞ্চল হতো ততই কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতুম নিজেকে—তোমরা হয়তো কিছু জানতে পারোনি। কিন্তু এই বলে সান্ত্বনা পেতাম যে, 'পিতা নোহসি'—হে আমার অনন্ত পিতামাতা তুমি আছো, তাই আমার পিতাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই। মনে মনে বলতাম—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ—

মনে হতো পৃথিবীর ধুলো থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্ত কিছু অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে মধুময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ উপলব্ধি বেশিক্ষণ থাকতো না—প্রতিদিনের দুঃখ-কষ্ট রোগ-যন্ত্রণা আমাকে আবার পৃথিবীর মাটিতে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসতো। সে ভাব চিরস্থায়ী হতো না।

সমাজে আচার্যদেব বলছিলেন—ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়—কেননা, দুঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই প্রেমের পূর্ণ সার্থকতা!... কিন্তু একথা আমাকে আর একজন বলে গিয়েছিলেন।

তারপর জবার দিকে ফিরে বললেন—একথা তোমাকেও বলা হয়নি মা, তোমার মায়ের মৃত্যুর দিনের কথা—আজ শোনো।

স্থির হয়ে এল সুবিনয়বাবুর দুই চোখ। চোখ বুজে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—সেদিন রাত দুটো বেজেছে। তোমার মায়ের অবস্থা খুব খারাপ, তুমি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছো মা, আমি একলা তোমার মায়ের পাশে বসে আছি। হঠাৎ মনে হলো যেন চোখ মেলে চাইলেন। আমি এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিলাম। তখন সেই মরণাপন্ন রোগী আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আমার হাত দুটো ধরলেন। যে মানুষ চিরকাল অসংলগ্ন কথা বলে এসেছেন, সেদিন সেই রাত দুটোর সময় তিনি যা বললেন, খুব জ্ঞানী লোকও তেমন জ্ঞানের কথা বলতে পারে না। আজও আমার সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ছে ভূতনাথবাবু।

আমার হাতটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—তুমি এখনও জেগে আছো?

জিজ্ঞেস করলাম—কষ্ট হচ্ছে খুব?

তিনি বললেন—খুব কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু আর হবে না।

—কেন?

—আর বেশিক্ষণ বাঁচবো না আমি।

তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

একবার জিজ্ঞেস কবলাম—জবাকে ডাকবো এখন?

বললেন—না।

বললাম—তবে কী করলে তোমার কষ্ট কমবে—বলো?

তিনি বললেন—তোমাকে আমি যা করতে বলবো করতে পারবে?

বললাম—বলো।

তিনি হঠাৎ বললেন—আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

কেমন যেন চমকে উঠলাম। সেদিন স্বপ্নে বাবা যা বলেছিলেন, জবার মা-ও সেই এক কথাই বললেন। তবে কি আমি সবাইকে আমার কাছে আবদ্ধ করে রেখেছি! যেখানে প্রেমের সম্পর্ক সহজ, সেখানে তো বন্ধনের প্রয়োজন বাহুল্য। প্রেম মানেই তো মুক্তি। আবার জিজ্ঞেস করলাম—একথা কেন বলছো তুমি?

তিনি বললেন—আমাকে মুক্তি না দিলে, তুমি নিজেও যে মুক্তি পাবে না, তাই। তোমার মুক্তির জন্যেই আমার মুক্তি চাইছি—জবাকেও তুমি মুক্তি দাও—পারবে?

আর তারপরেই তার হাতটা শিথিল হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন।

জবা হঠাৎ বলে উঠলো—বাবা!

ভূতনাথ দেখলে জবার চোখেও জল নেমেছে।

সুবিনয়বাবু বললেন—এর এক বর্ণও অসত্য নয় মা—সব সত্যি—প্রথমটা কী করবো বুঝতে পারলাম না। শেষে নিজের মনকে দৃঢ় করলাম। তখন মনে পড়লো বাবা বলেছিলেন—সচ্ছলতাটুকু হলেই ধন্য মনে করবে নিজেকে—দৈব আশীর্বাদে বিলাসিতা করবার জন্যে কালীর অনুগ্রহ নয়। মনে আছে—সচ্ছল হয়ে খেয়ে পরে বাঁচার পর যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকতো বাবা সব দান করতেন। 'মোহিনী-সিঁদুর' নিয়ে বিলাসিতা করতে তিনি বাবণ করেছিলেন—দেবীর নাকি নিষেধ ছিল। আমারও মনে হলো—আমার যে ঐশ্বর্য এ তো বিলাসিতারই নামান্তর।

তারপরেই 'মোহিনী-সিঁদুরে'র সাইন-বোর্ডটা খুলে ফেলে দিলাম। চিঠি লিখে দিলাম সর্বত্র। তোমাকেও সেই সঙ্গে চিঠি লিখে দিলাম ভূতনাথবাবু। এখন আমি মনস্থির করে ফেলেছি—এতদিন যে অন্যায় করেছি তারই প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো সারাজীবন। ধুলোয় আমার সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠেছে। উপনিষদে সেই প্রার্থনা আছে—'আবীরাবীর্ম এধি'—হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক—তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছে নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না—মৈত্রেয়ীর সেই প্রার্থনা—'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোর্তিগময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—মনে হলো জবার মাও যেন উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রীর মতো সেই প্রার্থনাই করে গেলেন মরবার সময়—উপনিষৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি—আমিই জবার মা'কে উপনিষৎ পড়িয়েছিলাম একদিন আর আজ আমাকেই তিনি শিখিয়ে গেলেন। আজ আমি বুঝেছি ভূতনাথবাবু, আমি যা চাই তা এ নয়। টাকা আরো চাই, খ্যাতি আরো দরকার, ক্ষমতা আরো না হলে আর চলছে না। এই ভেবে ভেবেই দিন কাটিয়েছি—কিন্তু 'আবীরাবীর্ম এধি'—হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন সুন্দর মুখ তাই আমাকে দেখাও, আমাকে বাঁচাও—সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ। তাই আমি ঠিক করেছি আমার সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পত্তি আমি সমাজকে দিয়ে দেবো—সমস্ত সঞ্চয়ের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করবো—সমস্ত ত্যাগ করে শান্ত হবো, পবিত্র হবো।

জবা ভূতনাথের দিকে তাকালে এবার।

ভূতনাথ বললে—আপনি 'মোহিনী-সিঁদুরে'র ব্যবসাও তুলে দেবেন?

—তুলে দেবো নয়, তুলে দিয়েছি ভূতনাথবাবু।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—একটু বসো ভূতনাথবাবু, আমি আসছি—বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ভূতনাথ জবার দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা, বাবা যা বললেন সব সত্যি?

জবা বললে—বাবা মিথ্যে কথা বলেন না।

—কিন্তু তুমি তো বারণ করতে পারতে—তোমার ভবিষ্যৎ—

জবা কিছু উত্তর দিলে না। তারপর বললে—ভবিষ্যতের কথা তো অনেক দূরে, বর্তমানই আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এ থেকে বাঁচবার কোনো উপায় আর দেখতে পাচ্ছি না।

—তুমি কিছু বলোনি বাবাকে?

জবা বললে—বাবাকে আপনি এখনও তা হলে চিনতে পারেননি ভূতনাথবাবু। যেদিন ধর্মত্যাগ করেছিলেন সে গল্প তো শুনেছেন আপনি, সেদিন যেমন কোনো কিছুর টানই তাঁকে ভোলাতে পারেনি আজও যখন সঙ্কল্প করেছেন সমস্ত ত্যাগ করবেন, এ সঙ্কল্প থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারবে না।

ভূতনাথ বললে—আমি অবশ্য বাইরের লোক, আমার কিছু বলা শোভা পায় না, কিন্তু তোমার কথা ভেবেই বলছি।

জবা হাসলো এবার। বললে—আমার কথা অত ভাববেন না।

উত্তরটা শুনে ভূতনাথও লজ্জায় মাথা হেঁট করলো। কী মনে করে জবা কথাটা বললে কে জানে। তবু সেদিনের সেই ঘটনাটা যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভূতনাথের। বললে—আমাকে তুমি ক্ষমা করো জবা।

জবা বললে—কিন্তু কথায়-কথায় যারা অমন অপরাধ করে, তাদের কি কথায়-কথায় ক্ষমা করা যায় নাকি?

—কিন্তু অনেকদিন আমি সে-ঘটনার জন্যে মনে মনে অনুতাপ করেছি জানো।

জবা বললে—কিন্তু কেন আপনি অনুতাপ করতে গেলেন মিছিমিছি, আপনার চাকরি তো চলেই গিয়েছে।

—চাকরিই কি আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করো নাকি?

—আপনার জীবনের লক্ষ্য কী তা তো আমার ভাববার কথা নয়। আপনার কথা আমি বসে বসে ভাবি এই আপনি ভাবেন বুঝি?

—কিন্তু যত অধমই হই আমি, ক্ষমা চাইবার অধিকারও কি নেই আমার?

জবা বললে—ক্ষমা আদায় করবার ক্ষমতা সকলের থাকে না ভূতনাথবাবু, সকলের কি সব ক্ষমতা থাকে? তা নিয়ে কোনো দুঃখ করবেন না আপনি।

ভূতনাথ বললে—আমার দুঃখ যদি তুমি বুঝতে, তবে আমায় এত দুঃখ দিতে পারতে না জবা!

জবা বললে—দুঃখ কথাটা সবাই-এর মুখে বড় বেশি শুনি ভূতনাথবাবু, সত্যি বলুন তো, সত্যিকার দুঃখটা কি?

ঠিক সেই মুহূর্তে সুবিনয়বাবু একগাদা কাগজপত্র হাতে ফিরে এলেন। বললেন—এই দেখো ভূতনাথবাবু—বলে কাগজপত্র খুলে দেখাতে লাগলেন। অনেক হিসেব অনেক রসিদ। অনেক পাওনা, অনেক দেনা। বললেন—সকলের সব পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি, যাদের পাওনা এখনও মেটাতে পারিনি, তাদের খবর দিয়েছি। তোমার পাওনাটা আজ শোধ করে দিতে চাই ভূতনাথবাবু। তুমি প্রাণ দিয়ে কাজ করেছো, তোমার যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক কম দিয়েছি তোমায়। এই দেখো তোমাকে আমি বেশি দিতে পারিনি, তুমি আমার এখানে কাজ করেছো সবসুদ্ধ...

ভূতনাথ কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো মনে মনে। বললে—আপনি আর একবার ভেবে দেখুন।

সুবিনয়বাবু একবার চাইলেন ভূতনাথের দিকে। বললেন কী ভেবে দেখবো ভূতনাথবাবু?

ভূতনাথ বললে—এতদিনের ব্যবসা, তা ছাড়া জবার ভবিষ্যৎ...

—সব ভেবেছি ভূতনাথবাবু, আজ পনেরো বছর ধরে ভেবেছি, ভেবো না এ-সঙ্কল্প আমার হঠাৎ হয়েছে। তোমরা ভাববে আমি বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিন্তু পনেরো বছর আগে থেকে এ সঙ্কল্প শুরু হয়েছে আমার যখন জবা এতটুকু মেয়ে। কিন্তু তখন আমার যৌবন ছিল, কিছু গ্রাহ্য করিনি, তখন যাতে আমার তৃপ্তি ছিল, এখন তাতেই বিতৃষ্ণা হয়ে গিয়েছে—মনের জোয়ার-ভাঁটা আছে এটা তো বিশ্বাস করো, যে-মন নিয়ে একদিন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছি, সেই মন নিয়েই আজ আমি সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে চলেছি—আর জবার ভবিষ্যতের কথা বলছো—ওদের দু'জনের অনুরাগ হয়েছে, আমি ধনীই হই আর নিঃস্বই হই তাতে কিছু এসে যায় না, ওদের অনুরাগ যদি তাতে কিছু কমে তো বুঝতে হবে কোথাও ত্রুটি আছে সে অনুরাগের মধ্যে। কী বলো মা জবা? তোমার কি মনে হয় মা?

জবা চুপ করে রইল। সুবিনয়বাবু বললেন—সুপবিত্রকে কি তুমি সব বলেছো?

জবা মাথা নাড়লো—না, তাঁকে কিছুই বলিনি বাবা।

—তুমি তাকে বলে দিও মা, সাধনার পথে প্রত্যয়ের বাধাই তো বড় বাধা, অনুরাগের ক্ষেত্রেও তাই। তোমরা দু'জনে দু'জনকে গ্রহণ করবে সমস্ত সংস্কারমুক্ত হয়ে। আমি চাইনে মা যে, কোনো আবিলতা থাকুক সেখানে, তোমরা হয়তো আমায় অপ্রকৃতিস্থ ভাববে, ভাববে তোমাদের হয়তো বঞ্চিত করছি আমি। কিন্তু আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি মা যে, 'মোহিনী-সিঁদুরে'র উপার্জন থেকে আজ পর্যন্ত আমি যা সঞ্চয় করেছি, তার ওপর তোমাদের বা আমার কোনো অধিকার নেই। শুধু জীবনধারণ করার জন্যে যেটুকু সামান্য প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া। যে অসত্যকে আশ্রয় করে আমি বেঁচে ছিলাম—তার জন্যে আমি বিশ্বপিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছি বার বার। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—আমার পাপ—বিশ্বের সকলের পাপ মার্জনা করো—প্রার্থনা করি বার বার।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু আমাদের 'মোহিনী-সিঁদুরে' একজনের খুব উপকার হয়েছে জানি।

—কে সে?

—আমাদের বড়বাড়ির ছোটবৌঠান।

সুবিনয়বাবু হাসলেন। বললেন—উপকার তাঁর কতটুকু হয়েছে জানি নে, কার্য-কারণ সম্পর্ক এখানে কতটুকু তা-ও বলতে পারবো না ভূতনাথবাবু, তবে আমাকে যদি প্রশ্ন করো এ কেমন করে হলো, আমি বলবো নিষ্ঠায় সবই সম্ভব, বিশ্বাসে সবই সম্ভব—সে-বিশ্বাস যদি তোমাদের বড়বাড়ির ছোটবৌঠানের থাকে তো ফল তিনি পাবেন, তা সে আমার 'মোহিনী-সিঁদুর'ই নিন আর অন্য কিছুই তিনি নিন। 'মোহিনী-সিঁদুরে'র গুণ হয়তো এককালে ছিল। বাবা তা বিশ্বাস করতেন বলেই গুণ ছিল। আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান, যৌবনেই মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস হারিয়েছি, কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি হারাইনি, তখন থেকে তাই এতদিন সেই ব্যবসাবুদ্ধিতেই চালিত হয়ে এসেছি, কিন্তু হঠাৎ জবার মায়ের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমি আমার চরম সত্যকে দেখতে পেয়েছি, আজ আমি আর নিজেকে ক্ষমা করবো না ভূতনাথবাবু, নিজে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি, জবাকেও আমি মুক্তি দিয়ে যাবো। কী মা জবা, তোমার কিছু বলবার আছে?

জবা বললে—আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন বাবা, আমি তাইই ভালো বলে মানবো।

সুবিনয়বাবু বললেন—তা হলে এবার সুপবিত্র এলে তাকে সব খুলে বলো মা তুমি।

—বলবো বাবা।

—বলো, এতদিনে ঐশ্বর্যশালী হলাম, বিত্তবান হলাম। এতে অগৌরবের কিছুই নেই মা, দেখবে মনে জোর পাবে, সাহস পাবে, তোমাদের দু'জনের অনুরাগ যদি খাঁটি হয় তো এ-ঘটনায় তা ছিন্ন হবে না, তা আরো গাঢ় হবে। সুপবিত্র তো অবুঝ নয়,—তাকে আমি যতদূর জানি সে ভুল বুঝবে না, আর ভূতনাথবাবু—

ভূতনাথ বললে—বলুন।

—তোমার আমি কিছুই করতে পারলাম না, ব্রজরাখালবাবুকে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে জীবনে

সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবো, তাও হলো না। অবশ্য অনেক বন্ধুবান্ধবকে আমি চিঠি লিখেছি তোমার সম্বন্ধে, হয়তো তাঁরা একদিন তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। তা সে যা হোক, আজ তোমাকে এই সামান্য পারিশ্রমিকটুকু নিতে হবে ভূতনাথবাবু—নিতে দ্বিধা করো না।

ভূতনাথের হাতে সুবিনয়বাবু একটা টাকার তোড়া তুলে দিলেন।

সুবিনয়বাবু আবার বললেন—পাঁচশ' টাকা আছে এতে ভূতনাথবাবু, সামান্য এ দান, তবু প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করো, করে আমায় মুক্তি দাও, একে-একে আমি ঋণমুক্ত হতে চাই। জানো—এমনি করে সকলের সব ঋণ শোধ করে আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি সমাজকে দিয়ে যাবো।

ভূতনাথের চোখে জল এসে গিয়েছিল। মনে আছে প্রথম ব্রজরাখালের সঙ্গে যেদিন এ-বাড়িতে এসেছিল ভূতনাথ, সেদিন কত দ্বিধা-সঙ্কোচের ফণা তুলেছিল মন। ভেবেছিল হয়তো তার ধর্মত্যাগ করতে হবে। অখাদ্য খেতে হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। সমস্ত আশঙ্কা তার মিথ্যেই হয়েছিল।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ। জবা এক মনে চুপ করে বসে আছে। সুবিনয়বাবুও চোখ বুজে রয়েছেন। এই শান্ত পবিত্র পরিবেষ্টনীর মৌনতা ভাঙতে যেন কেমন দ্বিধা হলো ভূতনাথের। দুই হাতের অঞ্জলিতে তখনও সুবিনয়বাবুর দেওয়া টাকার তোড়াটা যেন কাঁটার মতো ফুটছে। হঠাৎ ভূতনাথ আর্তনাদের মতো বলে উঠলো—আমি এ টাকা নিতে পারবো না সুবিনয়বাবু।

সুবিনয়বাবু সুপ্তোত্থিতের মতন চোখ খুললেন। জবাও চোখ তুলে চাইলে।

—আপনি ফিরিয়ে নিন এ টাকা, আমি নিতে পারবো না।

—কেন? কেন নেবে না ভূতনাথবাবু?

—আমি অন্যায় করেছি—আমাকে ক্ষমা করুন।

—কী অন্যায় তুমি করেছো ভূতনাথবাবু? কোন অন্যায়ই তুমি করোনি।

—করেছি, জবা জানে—বলে ভূতনাথ মাথা নিচু করলে।

—কই মা, ভূতনাথবাবু কী অন্যায় করেছে, জানো তুমি?

জবা হয়তো কী-একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো—কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘরে কে যেন প্রবেশ করলো। বেশ সুদীর্ঘ চেহারা। গায়ে কালো আলপাকার কোট, বয়েস অল্প। ভূতনাথ কখনও দেখেনি একে।

সুবিনয়বাবু তাকে দেখেই বলে উঠলেন—এই যে সুপবিত্রবাবু, এসো বাবা, এসো, এসে পড়েছো ভালোই হয়েছে, তোমার আসা দরকার ছিল। আজ জবা-মা'কে এই একটু আগে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন—ও কি ভূতনাথবাবু, উঠলে কেন? বোসো, তোমার সামনে কথা বলতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

জবাও বললে—আপনি যাবেন না ভূতনাথবাবু, বসুন।

—না, অনেক বেলা হয়ে গেল, আর একদিন আসবো—বলে হন-হন করে সোজা বাইরে বেরিয়ে এল ভূতনাথ।

রাস্তায় বেরোতেই রতন পেছন থেকে ডাকলে—কেরানীবাবু!

—কী রে?

—একবার শুনে যান, দিদিমনি ডাকছেন।

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। ভূতনাথ আবার ফিরলো। জবা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ভূতনাথ কাছে আসতেই বললে—চলে যাচ্ছেন যে, টাকাটা নিয়ে গেলেন না?

ভূতনাথ বললে—এইজন্যেই আমায় ডাকছিলে?

—আপনি টাকাটা ফেলে গেলেন—ভাবলাম, ভুলে গেলেন বুঝি।

ভূতনাথ জবার মুখের দিকে চেয়ে বললে—ঠিক ভুলে যাইনি আমি।

—ভুলে যদি না যান তো ফেলে যাবার মানে?

ওটা আমি তোমাকেই দিয়ে গেলাম।

—আমাকে? আমাকে দান করবার অধিকার আপনার আছে বলে মনে করেন নাকি? বাবা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন বলে ভেবেছেন আপনার দানের ওপর বুঝি নির্ভর করতে হবে আমাকে?

—তা কেন ভাবতে যাবো জবা, তাতে যে সুপবিত্রবাবুকে অপমান করা হয়, তা ছাড়া আমি দান করতে পারবো এমন সামর্থ্য আমার কোথায়?

—সামর্থ্য থাকলে আমাদের এই দুরবস্থার সময় আমায় ঋণী করে রাখতে পারতেন, তাই না?

ভূতনাথ হঠাৎ হেসে উঠলো। বললে—আমি এত কথাই যদি বলতে পারবো তা হলে কবে তোমাদের সমাজে গিয়ে পৈতে টিকি ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হয়ে যেতাম। আর আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারবো এমন ক্ষমতাও আমার নেই। আমি ও-টাকাটা তোমাকে যৌতুকই দিলাম।

—যৌতুক, কীসের যৌতুক?

ভূতনাথ বললে—তোমাদের বিয়েতে ও-টাকাটা তোমাকে যৌতুক দিলাম মনে করো।

—আপনার কাছ থেকে যৌতুক নেবোই বা কেন আমি? তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক, আপনি এক সময়ে চাকরি করতেন এ-বাড়িতে, সম্পর্কটা বন্ধুত্বেরও নয় কিম্বা...

—কিম্বা...?

জবা হাসলো এবার। বললে—কথাটা আমার মুখ দিয়ে না বলিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

ভূতনাথ বললে—না বলতে চাও বলো না, তোমার ওপর আমার জোরও নেই, কিন্তু এমন কী আমাদের সম্পর্ক যাতে উপহারও দেওয়া যায় না?

—উপহার দেওয়া হয়তো যায়, কিন্তু উপহার নিতে বাধে। আপনার চাকরি নেই, পরের বাড়িতে আশ্রিত আপনি, আপনি তো সব বলেছেন আমাকে। আমার চেয়ে আপনার প্রয়োজন কি কিছু কম?

—টাকার প্রয়োজন হয়তো আমার বেশিই। হয়তো কেন, সত্যিই তাই, কিন্তু টাকার চেয়েও আরো বড় জিনিস আছে পৃথিবীতে যার কাছে টাকা তুচ্ছ।

জবার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে—সে জিনিসটা কী? বলতে আপত্তি আছে?

ভূতনাথ বলতে যাচ্ছিলো। কেমন যেন সঙ্কোচ হলো—কথাটা জবা কেমনভাবে গ্রহণ করবে কে জানে। আসলে তো জবার সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক সহজবোধ্য নয়, আর সমানে-সমানেও নয়। উত্তর দিতে গিয়ে ভূতনাথের মনে হলো পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছে। বললে—আজ নয় জবা, আর একদিন বলবো।

—কিন্তু আর যদি বলবার অবকাশ না আসে?

—সে অবকাশ আমি করে নেবো।

—কিন্তু আমার যদি শোনবার অবকাশ না হয় আর?

ভূতনাথ আবার বিপদে পড়লে। বললে—না-ই বা শুনলে, না-হয় আমার কথা আমারই মনে থাক, একদিন ভুল করে তোমাকে অপমান করে ফেলেছিলুম, না-হয় সারাজীবন তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। তোমাদের সাত টাকা মাইনের কেরানীর মুখে এর চেয়ে বেশি কথা না-ই বা শুনতে চাইলে।

—খুব টাকার খোঁটা দিয়ে কথা বলতে পারেন আপনি, কিন্তু সে যাক—এখন থেকে তো টাকার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল আপনার সঙ্গে—আর যেদিন আঁচল ধরে টেনেছিলেন, তখন সহ্য করিনি স্বীকার করি, কিন্তু এখন আমি শুনবোই—বলুন।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু সুপবিত্রবাবু ওদিকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন—তোমার দেরি দেখে হয়তো রাগ করতে পারেন।

—সুপবিত্রবাবুর ওপর ভারি হিংসে আপনার, না?

ভূতনাথ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক মিনিটে এর উত্তর দেওয়া যায় না জবা, দিলেও তুমি তা বুঝবে না, আমিও ঠিক বোঝাতে পারবো না। সুতরাং সে চেষ্টা করবো না আমি। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমায়। আজ তো আর আমি এ-বাড়ির কর্মচারী নই। হয়তো এ-বাড়িতে আর আসার অধিকারও থাকবে না, কিন্তু যে-প্রশ্ন করবো, তার ঠিক-ঠিক উত্তর

দেবে?

জবা বললে—দেবো, কী বলুন?

কিন্তু ভূতনাথ কথা বলবার আগেই রতন দৌড়ে এসেছে হাঁফাতে হাঁফাতে।

—দিদিমনি, বাবু কেমন করছেন যেন।

জবা চঞ্চল হয়ে উঠলো—কেমন করছেন রতন?

—খোকাবাবু শিগ্‌গির আপনাকে ডাকতে পাঠালেন—আপনি চলুন এখুনি।

জবা এক নিমেষে ছুটে চললো আগে আগে। রতনও গেল পেছন পেছন। ভূতনাথও হতবুদ্ধির মতো একমনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। একবার মনে হলো ফিরে যাবে। কিন্তু এমন দুঃসংবাদ শোনবার পর চলে যাওয়াই বা যায় কী করে! আস্তে আস্তে আবার গিয়ে উঠলো ওপরে। সুবিনয়বাবু আরাম-কেদারায় যেমনভাবে বসেছিলেন, তেমনিভাবেই হেলান দিয়ে রয়েছেন। চোখ দুটি বোঁজা, বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে যেন তাঁর। মাঝে মাঝে ছটফট করে উঠছেন।

সুপবিত্র মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে একবার—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি বাবা?

সুবিনয়বাবুর যেন সে কথার উত্তর দেবার সামর্থ্যটুকুও নেই।

সুপবিত্র ভূতনাথকে ডেকে বললে—আসুন তো একটু ধরাধরি করে ওঁকে শুইয়ে দিই।

তারপর সুপবিত্র আর ভূতনাথ দু'জনে মিলে ধরে সুবিনয়বাবুকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

তারপর জবার দিকে চেয়ে বললে—জবা, তুমি একটু দেখো—আমি আমাদের ডাক্তারবাবুকে খবর দিই গে—বলে বেরিয়ে গেল সুপবিত্র।

ভূতনাথ নিষ্কর্মার মতো একমনে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হলো যেন এই সময়ে তারও একটা কিছু উপকারে লাগা উচিত। কিছু কাজ! সুবিনয়বাবুর এই আকস্মিক বিপদে তাদের কিছুটা উপকার করতে পারলে যেন বাঁচা যেতো।

নিজের বিছানায় শুয়ে সুবিনয়বাবু একবার চোখ খুললেন। তারপর অভিভূতের মতন চারদিকে চাইতে লাগলেন। একবার ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন—সুপবিত্র কোথায়, চলে গিয়েছে?

জবা বাবার মুখের ওপর নিচু হয়ে বললে—তিনি ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গিয়েছেন, এখুনি আসবেন।

সুবিনয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

জবা জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন লাগছে বাবা?

সুবিনয়বাবু যেন হাসলেন মৃদু মৃদু। একটু বিকৃত হয়ে এল মুখটা। খানিক পরে বললেন—সমাজের ওঁদের একবার খবর দাও মা।

জবা আবার বললে—আপনি ভালো হয়ে যাবেন বাবা, আপনি ভাববেন না।

—আর রূপচাঁদবাবুকে একবার খবর দাও, আর ধর্মদাসবাবুকেও খবর দিও ওই সঙ্গে—তারপর খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। তন্দ্রার মধ্যে সুবিনয়বাবু আবার বললেন—আচার্যদেবকেও খবর পাঠাও মা।

তারপর আবার তন্দ্রা। তন্দ্রাচ্ছন্ন সুবিনয়বাবু নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর আবার চোখ খুললেন। আবার তন্দ্রা। তারপর তন্দ্রা আর জাগরণের দোলায় জীবন-নৌকা এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো।

এর পর থেকে ভূতনাথের জীবনে সব যেন কেমন ওলট-পালট [illegible] কোথায় ছিল ভূতনাথ আর এক ধাক্কায় কোথায় গিয়ে পড়লো। নিবারণদের দল যে কী [illegible] দেশে! ব্রজরাখালও একদিন হঠাৎ এসে হাজির হলো। আর ছোটবৌঠান! কিন্তু.. কিন্তু সে কথা থাক। প্রকাশ ময়রার কথাই ধরা যাক প্রথমে। সেদিন কী কুক্ষণেই যে প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রকাশ ময়রা সামনে আভূমি নিচু হয়ে প্রণাম করলে—পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই, চিনতে পারলেন

আমাকে?

—আরে তুমি—কী খবর! কতদিন তোমার ওখানে জিলিপী খেতে গিয়েছি, দেখি তুমি নেই।

—জিলিপীর ব্যবসা উঠিয়ে দিলাম ঠাকুরমশাই, লাভের গুড় সব পিঁপড়েয় খেয়ে ফেলতো আজ্ঞে, ও হলো না আমার, দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাচ্ছিলো, শেষে দুগ্যা বলে দোকান একদিন দিলাম তুলে।

—এখন করছো কী?

—কিছুদিন ঘটকালীর কারবার ধরলাম, তেমন ঘরে-ঘরে বিয়ে দিতে পারলে দু'পয়সা থাকবারই কথা, বেশ হচ্ছিলোও, মাঝে-মাঝে নেমন্তন্ন-আশটা মিলতো, এই গেল ফাল্গুনে চাকদা'র ঘোষাল বাড়ির ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম কলকাতায়। ও-বাড়ি দু'দিন আর বরের বাড়ি দু'দিন খাওয়া হলো, মাংস করেছিল, তিন রকম মিষ্টি, আমাদের বর্ধমানের মনোহরা আনিয়েছিল—এমনি বড়ো বড়ো মাপের, তা মাথা পিছু চারটে করে দিয়ে গেল পাতে।

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—তা এখন করছো কী?

—আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্বাদে এদানি ননীবাবুর আপিসে একটা কাজ পেয়েছি।

—কোন্ ননীবাবু?

ননীবাবুকে চেনেন না? নতুন আপিস খুলেছেন, তা শ'তিন চার লোক খাটে, আরো অনেক লোক ভর্তি হবে শুনেছি। তিন-তিনটে কোলিয়ারি—পটলডাঙার সরকার বাড়ির জামাই যে, পাকা সাহেব মানুষ কিনা, এমন ইংরেজী বলেন ঠাকুরমশাই, বোঝে কার সাধ্যি? তা আপনি এখন আছেন কোথায়?

—সেই বড়বাড়িতেই—আর যাবো কোথায়?

প্রকাশ বললে—বিয়ে থা...?

—করিনি।

—সে কি ঠাকুরমশাই, কুলীন ব্রাহ্মণ আপনারা, সেকালে হলে গণ্ডা দশেক বিয়ে করলে আপনার চাকরি করে খেতে হতো না। বলেন যদি তা... হাতে আমার একটা সন্ধান আছে।

—আচ্ছা, পরে একদিন দেখা করো প্রকাশ, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে আজ—বলে ভূতনাথ চলে এসেছিল। ছুটুকবাবুর বিয়ের দিন সেটা। সন্ধ্যেবেলা বরযাত্রী যেতে হবে।

বংশী বলেছিল—বিকেল-বিকেল বাড়ি ফিরবেন আজ্ঞে, চুলটা ছেঁটে দাড়িটা কামিয়ে নেবেন তাড়াতাড়ি। বাড়ি সুদ্ধু কামাবে কিনা আজকে—হাতে সময় রেখে না এলে সন্ধ্যে উৎরে যাবে একেবারে।

ছোটবৌঠান ডেকে বলেছিল—জামা জুতো তোমার পছন্দ হয়েছে তো ভূতনাথ?

আজ তিন দিন থেকে ন'বৎ বসেছে নহবতখানায়। কাশীর বাজিয়ে। এক-একটা রাগ ধরে আর ঝাড়া দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধরে কালোয়াতি চলে তার ওপর। মীড়ে, গমকে, মূর্চ্ছনায় সারা বৌবাজারটা যেন মেতে ওঠে। বনমালী সরকার লেন-এ কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে। ভেতরের উৎসবের কিছুটা আভাস পাবার চেষ্টা করে।

ব্রিজ সিং মাঝে মাঝে বন্দুকটা বাগিয়ে তাড়া করে—ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে—রাস্তা ছোড়ো—

একজন হুমড়ি খেয়ে সামনে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে—ওই দ্যাখ—ওই দ্যাখ—ওই দ্যাখ—উ-উ-ই—

গায়-হলুদ্ তত্ত্ব যাবে। রান্নাবাড়ি থেকে বারকোষ, থালা, ঝুড়ি মাথায় লোক বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। নতুন কাপড় পিরেন পেয়েছে সবাই। পুরনো ঝিরা পেয়েছে গরদের থান। নাথু সিং আছে সামনে। পাগড়ি লাল রং করেছে। হাতে বাঁশের লাঠি। পেতলের পাত বাঁধানো। দাসু জমাদার ছেলেমেয়ে নিয়ে নতুন কাপড় পরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। ইব্রাহিম ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছে। জাফরির ফাঁক দিয়ে বউরাও উঁকি মারছে হয়তো। শাঁখ বেজে উঠলো।

বিধু সরকার আজ উড়ুনি চড়িয়েছে গলায়। সামনে এসে ধমক দেয়।—সব সার বেঁধে চলবি,

সার যেন কেউ না ভাঙে, রাস্তার একপাশ দিয়ে।

প্রথমে বাসন-কোসন, ঘড়া, পিলসুজ, থালা, বাটি, গাড়ু। চল্লিশটা লোক। তারপর মশলা-পত্তোর। পান সুপুরী লবঙ্গ এলাচ। তারপর কাপড়-জামা-সেমিজ। তাও জন পঞ্চাশ। তারপর—মিষ্টি—মিষ্টির লোকের আর শেষ নেই! ছানার খাবারের পর ক্ষীরের খাবার, তারপর নোনতা। তারপর দই-এর হাঁড়ি। গয়নার বাক্স নিয়ে চলেছে নাথু সিং সকলের আগে আগে।

বিধু সরকারের হাতে একটা লিস্ট। এক-একজনের নাম ধাম লেখে আর ছাড়ে—একশ' চল্লিশ দফা—লোচন দাস, একশ' একচল্লিশ—শ্যামসুন্দর ভুঁইয়া, একশ' বিয়াল্লিশ—নন্দ পরামাণিক—তুই কে? তোর নাম কি রে বেটা, নাম বল্ কার লোক—বাড়ী কোথায়?

শাঁখ বাজাতে বাজাতে চললো মিছিল। ব্রিজ সিং গেট খুলে দিলে। বনমালী সরকার লেন ছাড়িয়ে মিছিল গিয়ে পড়লো বৌবাজারের মোড়ে।

বাহার হলো রাত্তিরবেলা। বিরাট দোতলা বাড়ি সমান চতুর্দোলা। ছুটুকবাবু তার ওপরে বসে। নীচের রাস্তায় সার-সার গাড়ি চলেছে আস্তে আস্তে। জুড়ি, চৌঘুড়ি, ছয়ঘুড়ি, আটঘুড়ি ল্যান্ডোর সঙ্গে জোতা। চতুর্দোলার সামনে কিছুটা দূরে বাঁশের ময়ূরপঙ্খীতে খেমটার নাচ চলেছে। মেজবাবুর সঙ্গে আরো তিন চারটে গাড়িতে মোসাহেব নকলবাবুদের ভিড়। হৈ-হল্লা চলেছে। দেড় মাইল দু'মাইল লম্বা মিছিল। কত রকমের গাড়ি। ল্যান্ডো, ফিটন, বগি, ল্যান্ডোলেট, দশ ফুকরে ব্রাউনবেরি, ব্যারুষ। আর সামনে রোশনচৌকি বাজতে বাজতে চলেছে সঙ্গে—আর মাঝে মাঝে তুবড়ি ফুটছে এক-একবার—আর তারই দু'পাশে রাস্তার দু'ধার দিয়ে লম্বা হয়ে চলেছে খাস-গেলাসের আলোর ঝাড়।

আশে-পাশে বাড়ির জানলা-দরজায় লোকজনের ভিড়। সারা কলকাতা যেন গম-গম করছে।

বংশী বললে—ছুটুকবাবুকে বেশ দেখাচ্ছে—না, শালাবাবু?

মেজবাবুর ইচ্ছে ছিল বাঁধা-রোশনাই-এর ব্যবস্থা করবেন। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দুই ধার জুড়ে একেবারে গ্যাস লাইন বসে যাবে। ছোকরাদের কাঁধে খাস-গেলাসের ঝাড় যা গেল তা তো গেলই। তার ওপর দু'পাশে বাঁধা আলোর ঝাড়।

ভৈরববাবু বললেন—বাঁধা রোশনাই দেখেছিলুম কালীকেষ্ট ঠাকুরের ছেলের বিয়েতে—লাখ টাকা খরচা হয়েছিল।

এদিকে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটের পশ্চিম দিকের শেষাশেষি আর ওদিকে কন্যাপক্ষের বাড়ি রামবাগানের কাছাকাছি। প্রায় আধ-ক্রোশের দূরত্ব। সমস্তটা জুড়ে বাঁধা রোশনাই।

কিন্তু খাস-গেলাস নিয়েও বিপদ আছে বৈকি! ছেলে-ছোকরাদের রাস্তা থেকে ধরে এনে তাদের দু'চারটে পয়সা দিয়ে ঝাড় বওয়াতে হয়। কিন্তু বর যখন কনের বাড়িতে ঢুকলো তখন তাদের নিয়ে মুশকিল। যে যেদিকে পারে ছিটকে পালিয়ে যায়।

ভৈরববাবু সিরেট টানছিল। বললে—এ আর কী খাস-গেলাস দেখছিস—আগে ছিল দু'আনায় যোল বাতির প্যাকেট। সেটা হচ্ছে খাঁটি তিমি মাছের চর্বি—আর এ তো নকল মোম।

বংশী বললে—আমি আর যাবো না শালাবাবু, আমি এখান থেকে ফিরি—ছোটমা'র শরীরটা ভালো নয়।

—সে কী, কী হয়েছে বৌঠানের? শুনিনি তো কিছু।

—না শুনেছেন তো শুনে আর কাজ নেই আপনার—ও না শোনাই ভালো।

ছোটবৌঠানের শরীর খারাপের কথা কখনও আগে কানে আসেনি। তাই খবরটা যেন কেমন অস্বাভাবিক লাগলো ভূতনাথের কাছে। জিজ্ঞেস করলে—সত্যি, কী অসুখ রে বংশী?

—সে শুনে কাজ নেই আপনার—তবে যদি পারেন তো চটপট চলে আসবেন খাওয়া-দাওয়া সেরে। গান-বাজনার মধ্যে যেন জমে যাবেন না আবার।

—কেন, কিছু ভয়ের ব্যাপার আছে নাকি?

—তা ভয়ের ব্যাপার না থাকলে কি আর শুধু শুধু বলছি? কাল তো দুপুরবেলা বারোটার সময় ঘুম ভেঙেছে আজ্ঞে।

—কেন, বৌঠান তো আগে খুব সকাল-সকাল উঠতো?

—আগে উঠতো—কিন্তু আজকাল অন্য রকম, কাল তেঁতুল গোলা জল খাইয়ে তবে জ্ঞান ফিরিয়েছি আজ্ঞে।

—কেন, এমন হলো কেন?

—আজ্ঞে, বলি আর কাকে, নিজে নিজের ভালো বুঝতে না শিখলে আমি কী করবো—যাক, আমার কী, আমি হুকুমের চাকর বৈ তো নয়—কে বাঁচলো, কে মরলো তা আমার দেখার কী দরকার—বলে মাঝ পথ থেকে ফিরে গেল বংশী।

ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে চতুর্দোলা চলেছে। পাথুরেঘাটায় দত্তবাড়িতে গিয়ে একেবারে থামবে এ মিছিল। সামনের ময়ূরপঙ্খীতে খেমটা নাচ, নকলবাবুদের গাড়িতে হৈ-হুল্লোড় আর দু'পাশে ছেলে-ছোকরাদের কাঁধে খাস-গেলাসের ঝাড়। রোশনচৌকির তালে তালে মিছিল চলেছে। বৌবাজার স্ট্রীটের দু'পাশের বাড়ির জানলা-দরজায় মেয়ে-পুরুষের ভিড়।

—বাঃ বরকে বেশ মানিয়েছে দ্যাখ্।

—ও মা, কী সুন্দর নাচছে দেখো।

—হ্যাঁগো, কনে'র বাড়ি কোথায় গা?

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কনস্টেবল চলেছে পাহারা দিতে দিতে। আগে, পেছনে, পাশে। বাইরের কেউ যেন না ঢুকে পড়ে ভেতরে। খুব হুঁশিয়ার। কোনো ছোকরা যেন খাস-গেলাসের ঝাড় নিয়ে না পালায়।

—এই শালা, ভাগো, উধার ভাগ্ যাও!

মাঝে মাঝে ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবুর উল্লাসধ্বনি শোনা যায়।—কেয়াবাৎ বুড়ো বাঈজী—ঘুরে ফিরে—

মেজবাবুর দল বরের চতুর্দোলার পেছনেই। আজ বেশ রঙ-এ আছেন মেজবাবু। দিল-দরিয়া মেজাজ। এক-একটা তুবড়ি ফোটে আর হা-হা-হা করে ওঠে মোসাহেবদের দল। গাড়ির তলা থেকে বোতল বোরোয়। গরম বনেদী রক্ত আরো গরম হয়ে ওঠে।

ছুটুকবাবুর বন্ধুরাও আছে পেছনে। কান্তিধরের গলার জোর বেশি। কোত্থেকে একটা ছোট টিনের বাক্স যোগাড় করেছে। সেইটেই ডুগিতবলা করে বাজায়। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে—আহা-হা, তালে ভুল হলো যে, মেরে খোঁপার খাঁচা উড়িয়ে দেবো বেটির।

কিন্তু বিপদ বাধলো ঠনঠনের শিবঠাকুরের গলির ভেতর ঢুকে। আস্তে আস্তে মিছিল ঢুকছে গলির ভেতরে। পাথুরেঘাটায় কনের বাড়ি যেতে হলে এ গলি পেরোতে হবে। চতুর্দোলা বরকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে। মেজবাবুর গাড়িও ঢুকেছে। ছুটুকবাবুর বন্ধুদের গাড়িও ঢুকতে যাবে এমন সময় ওপাশ থেকে সমবেত গলার আওয়াজ এল—বল হরি, হরি বোল—বল হরি, হরি বো-ও-ও-ল্—সঙ্গে খোল-কর্তালের হরি-সঙ্কীর্তন।

রাত্রের অন্ধকারে কিছু দেখতে না পাওয়ারই কথা। কিন্তু খাস-গেলাসের আলোয় সমস্ত গলিটা তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেখা গেল গলির ওপাশ থেকে আর একটা মিছিল আসছে। বিয়ের বর-যাত্রীর মিছিল নয়। আনন্দ-উৎসব নয়। শবযাত্রা!

কে যেন বললে—কে মরেছে গো?

—কে জানে, কোন্ শালা মরেছে, মরবার আর সময় পেলে না।

সত্যি তো! মরবার সময়-অসময় নেই! মরলেই হলো! আর ঠিক এই সময়েই তার শবযাত্রা! বর বেরিয়ে যাক, বরযাত্রীরা বেরিয়ে যাক... তবে তো!

মেজবাবু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন—দেখো তো ভৈরব, কে? কে মরলো আবার!

ভৈরববাবু গাড়ি থেকে নামলো। সাধারণ কেউ নয় নিশ্চয়ই! নইলে এত জাঁক। পালিশ করা

সেগুন কাঠের খাট। ফুলে একেবারে ছেয়ে গিয়েছে, ভরে গিয়েছে। ধামা-ধামা খই ছড়াচ্ছে। আনি-দোয়ানি-টাকা ছড়াচ্ছে। রোশনাই রয়েছে। লোকজন প্রচুর। পেছনে ল্যাণ্ডো গাড়ি, ব্রুহাম, ব্রাউনবেরি, ব্যারুষ ওদের দলেও রয়েছে। সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। চিৎকার করছে—বল হরি—হরি বো-ও-ও-ল্...

ভৈরববাবু কোঁচা হাতে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিলেন—সর্বনাশ হয়েছে মেজকত্তা—ছেনি দত্ত মারা গিয়েছে!

সবাই শুনলে। ছেনি দত্ত! ঠন্ঠনের ছেনি দত্ত! মেজবাবুর পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী। এতদিনে মারা পড়লো তাহলে। মেয়েমানুষ নিয়ে খড়দা'র রামলীলার মেলায় রেষারেষি হয়েছে বছরের পর বছর। গঙ্গার বুকে নৌকায়, পানসিতে প্রতিযোগিতা। পায়রা ওড়ানো নিয়ে সেদিন পর্যন্ত লড়াই হয়েছে, মামলা হয়েছে আদালতে। মেজবাবুর হাসিনীর ওপর বরাবরের হিংসে ছিল ছেনি দত্তর। ছোটবাবুর চুনীবালাকেও কতবার ভাঙচি দিয়ে বার করে আনবার চেষ্টা হয়েছে জানবাজারের বাড়ি থেকে। ছোটবাবুর দেখাদেখি নিজের মেয়েমানুষের গা গয়নায় মুড়ে দিয়েছে। বাড়ি করে দিয়েছে চিৎপুরে। সেই ছেনি দত্তর মৃত্যু!

মেজবাবু বোতলটা আর একবার মুখে তুললেন। তারপর বললেন—তা বলে ও সব শুনছি না, আমাদের বর আগে যাবে।

সরু গলি। বর, বরযাত্রী গেলে আর জায়গা থাকে না। শবযাত্রা পিছিয়ে যাক। কিম্বা অন্য রাস্তা ঘুরে যাক। অন্য রাস্তা খোলা পড়ে রয়েছে। নিমতলায় যাবার রাস্তার অভাব নেই।

মেজবাবু আবার বললেন—বলে দাও ওদের ভৈরব—বর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?

ভৈরববাবু গেল।

কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দা। ছেনি দত্ত ছিল ঠন্ঠনের রাজা। মরে গিয়েছে বলে রাজত্বও চলে গিয়েছে নাকি? ছেলেরা নেই নাকি? জ্বল-জ্বল করছে বংশ। নাতি, নাতনী, আত্মীয়, কুটুম, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মোসাহেব, চাকর, দারোয়ান সবই আছে।

ওপাশে ছেনি দত্তর বড় ছেলে—নটে দত্তরও তখন মেজাজ গরম। সেও ফুর্তি করতে জানে। বাপের মৃত্যুতে সে কি কম শোক পেয়েছে নাকি! শোক ভোলবার জন্যে সেও বিকেল থেকে অনেক গেলাস খালি করে ফেলেছে। বললে—কুছ পরোয়া নেই—আগে আমরা যাবো, ওরা ওদের বরকে পিছে হটিয়ে নিক, পাথুরেঘাটায় যাবার বহুৎ রাস্তা পড়ে আছে।

লাগলো ঝগড়া। মুখোমুখি দুই দল থমকে দাঁড়িয়ে, কেউ নড়বে না।

এরা বলে—ওরা নড়ুক।

ওরা বলে—ওরা নড়ুক।

মেজবাবু এবার গরম হয়ে উঠলেন। ছেনি দত্ত মরেও জ্বালাতে এসেছে! বললেন—ভৈরব, ব্রিজ সিংকে ডাকো তো একবার। ব্রিজ সিং আজ রেশমী মুরেঠা পরেছে। সাদা লম্বা প্যান্ট। গায়ে গলাবন্ধ কোট আর বুকে গুলী ভরা চামড়ার বেল্ট, হাতে বন্দুক। কাছেই ছিল দাঁড়িয়ে। ভৈরববাবুর ডাকে গোঁফে চাড়া দিয়ে এসে হাজির হলো।

সেলাম করে বললে—হুজুর—

মেজবাবু বললেন—ফায়ার করো।

করুক ফায়ার। ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবু, সবাই মনে মনে খুশি। করুক ফায়ার। বোঝা যাক কে কত বড় বাবু।

ফায়ার করলে ব্রিজ সিং। কিন্তু আকাশের দিকে মুখ করে।

সমস্ত শিবঠাকুরের গলি কাঁপিয়ে সে শব্দ আকাশে গিয়ে ফাটলো।

আর-এক বার। আবার আর-এক বার। হৈ-হৈ করে ততক্ষণে পুলিশ-কনস্টেবল দৌড়ে এসেছে মেজবাবুর কাছে। ইন্সপেক্টর সাহেবও দৌড়ে এসেছে।—হোয়াটস আপ্, কী হলো?

দারোগা সাহেব মেজবাবুর সঙ্গে কী কথা বললে যেন কানে কানে।

• রোশনচৌকির দল ততক্ষণে বাজনা থামিয়ে দিয়েছে হতবুদ্ধি হয়ে। খাস-গেলাসের ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে লাইন ভেঙে পালাচ্ছে। হৈ-হৈ হট্টগোল চারদিকে। আশে-পাশের বাড়ির জানলা খুলে যারা এতক্ষণ বর দেখছিল তারা দমাদম দরজা বন্ধ করে দিলে। বড়লোকের ব্যাপার। দরকার কী হ্যাঙ্গামে!

ইতিমধ্যে পুলিশ আর দারোগার দল কি কল টিপে এল কে জানে। দেখা গেল শবযাত্রা পিছু হটছে। পিছু হটতে হটতে একেবারে শিবঠাকুরের গলির মুখে গিয়ে একপাশে এসে দাঁড়ালো। নটে দত্ত দাঁতে দাঁত ঘষছে তখন। পুলিশ-দারোগা পাশে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। মেজবাবুর গাড়ি সপারিষদ বরের চতুর্দোলার পেছন-পেছন মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো। ভূতনাথ এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। কেমন যেন অবাক হচ্ছিলো দেখে। এত বড় একটা সমস্যার এমন নির্বিরোধ সমাধান হলো দেখে অবাক হবারই কথা। বড়বাড়ির এই জয়যাত্রা সেদিন হয়তো নির্বিঘ্নেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে পেরেছিল—কিন্তু ইতিহাসের অদৃশ্য ইঙ্গিত এড়াতে পারেনি যেন শেষ পর্যন্ত! সেদিনও তো বন্দুকে ফায়ার করা চলতো। দারোগা-পুলিশকে ঘুষ দেওয়া চলতো। কিন্তু বদরিকাবাবু জানতো যে ইতিহাস বড় নির্মম। দারোগাকে ঘুষ দিয়ে ইতিহাসের গতি ফেরানো যায় না।

ছোটবৌঠান পুরনো সিন্দুকের ডালা খুলে একদিন বলেছিল—এ যা কিছু দেখছো ভূতনাথ, সব আমার—এই হীরের কঙ্কন, মোতির চূড়, পান্নার কান, মিছরিদানা চুড়ি, সব—স-অ-অ-ব—

ভূতনাথ সিন্দুকের ভেতর মাথা নিচু করে দেখেছিল—ফাঁকা সিন্দুক। একটা কণাও আর বাকি নেই কোথাও। সিন্দুকের প্রত্যেকটি কোণ নিঃস্ব। হা-হা করছে অন্ধকার প্রেতগর্ভ খালি সিন্দুকটা। কিন্তু তবু ছোটবৌঠানের অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টির সামনে কিছু বলতে সাহস পায়নি সেদিন।

ছোটবৌঠান তখন টলছে। গায়ের শাড়িটা খুলে-খুলে পড়ে যাবার উপক্রম করছে বার বার। সমস্ত শরীর আঙুরের থোলোর মতো টলমল করে ছোটবৌঠানের।

আবার বললে ছোটবৌঠান—এই-সব দিতে পারি, কিন্তু তুই আমাকে কি দিবি বল?

ভূতনাথ বলেছিল—কী চাও তুমি ছোটবৌঠান—আমি তো গরীব মানুষ।

—তোকে আমি বড়লোক করে দেবো ভূতনাথ, ভয় কী? এই বাড়ি, বড়বাড়ির সব সম্পত্তি দিয়ে যাবো, তুই আরাম করে থাকবি এখানে—পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে।

কী জানি ভূতনাথের কেমন যেন ভয় হয়েছিল সে কথা শুনে। ছোটবৌঠান কী বলছে তা সে নিজেই জানে না। ছোটকর্তা যে এখনও বেঁচে! এ বলে কী ছোটবৌঠান!

ভয়ে ভয়ে ভূতনাথ বলেছিল—আমি কিছু নিতে চাই না বৌঠান। আমি কিছুই চাইনে।

ছোটবৌঠান নেশার ঘোরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ভাসিয়েছিল সেদিন। বলেছিল—তুই বেইমান, বেইমান তুই ভূতনাথ!

পাশের ঘরেই ছোটকর্তা অসুখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। হয়তো কান্না শুনতে পাবে ছোটবৌঠানের। ছোটবৌঠানের মুখে হাত চাপা দিয়েছিল ভূতনাথ। বলেছিল....

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক!

পাথুরেঘাটার দত্ত বাড়িতে তখন বরের চতুর্দোলা পৌঁছে গিয়েছে। একশ' শাঁখ বেজে উঠেছে একসঙ্গে। অন্দরমহল থেকে হুলুধ্বনি কানে এল। কন্যাকর্তা সামনে এগিয়ে এসে ছুটুকবাবুকে কোলে করে আসরে নিয়ে গেলেন। বিরাট পুজোবাড়ি জুড়ে বরের আসর বসেছে। গোলাপ জল ছড়িয়ে দিয়ে গেল সকলের গায়ে। গোড়ের মালা দিলে সকলের হাতে-হাতে।

মেজকর্তা গিয়ে বসেছেন একেবারে আসরের মধ্যিখানে। আসর আলো হয়ে গিয়েছে।

ছুটুকবাবুর শ্বশুর ব্যবসাদার লোক। স্ট্র্যাণ্ড রোডে আটার কল বসিয়েছেন। ঢালাই লোহার

ব্যবসাও আছে। কিন্তু তাঁরও গায়ে গিলে করা মলমলের দামী পাঞ্জাবী। সামনে এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। বললেন—ছোটকর্তাকে দেখছিনে—কই?

—না, তার শরীরটা খারাপ হয়েছে আজ, আসতে পারলে না আর।

—বিশেষ কিছু ভয়ের ব্যাপার নাকি?

—না শরীরটা তার প্রায়ই খারাপ হয়—আসবার ইচ্ছে ছিল খুব।

আরো দু'একটা কথা হলো।

—এই আমার বড়জামাই পটলডাঙার সরকার এরা।

—এই আমার... এঁকে তো দেখেইছেন।

—আর, এই হলো—

চারদিকে ঝাড়-লণ্ঠন। আলো জ্বলছে। ইলেক্‌ট্রিক আলো'এ-বাড়িতেও হয়েছে। তবু বাহার হিসেবে ঝুলছে টানা পাখাগুলো। এখনো খোলা হয়নি। বড় বড় আয়না চারদিকের দেওয়ালে টাঙানো, মানুষ সমান উঁচু। দেওয়ালে পঙ্খের ছবি আঁকা। ফুল লতা পাতা। সবুজের ওপর কালো নীল হলদে রঙের কাজ। ভূতনাথ একপাশে আড়ষ্ট হয়ে সব দেখছিল। এখানে তার যে কী পবিচয় দেবার আছে! কী পরিচয়ে এখানে এসেছে সে? হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতেই মুশকিলে পড়ে যেতে হবে। হঠাৎ বাইরে সোরগোল উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে মোটরের শব্দ। কোনো সম্মানিত অতিথি যেন এসে গিয়েছে। কয়েকজন মোটর দেখতে ছুটলো। মোটরগাড়িটা একেবারে সামনের ঘেরা জায়গাটার ভেতর ঢুকে পড়েছে বুঝি। কয়েকটা ঘোড়া ভয় পেয়ে শব্দ করে উঠলো। গোঁ-গোঁ আওয়াজ চলছে মোটরের। তারপর একটা বিকট শব্দ করে যন্ত্রটা থেমে গেল একেবারে।

হাবুল দত্ত দু'পুরুষের বড়লোক। কিছুদিন আগেও খাটো ধুতি পরেছেন ওঁর বাবা। যখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট তৈরি হয়, সেই সময়ে লটারিতে বহু টাকা হাতে এসে যায় তাঁর। সেই টাকা খাটিয়ে বড়বাজারের লোহাপট্টিতে দোকান করেছিলেন। সঙ্গে ছিল আর একজন কর্মকারের ছেলে। বুদ্ধি তারই। টাকাটা হাবুল দত্তর বাবার। তারপর কোথায় গেল কামারের ছেলে, আর কোথায় গেল তার শেয়ার। পুরো মুনাফাটা এসে গেল দত্তবাড়ির কবলে। কী একটা বড় রকমের ঠিকেদারিতে বেশ লাভ হতে লাগলো কয়েক বছর ধরে। তখন কিনলেন আটার কল। কল দেখতে সে কী ভিড় রাস্তায়! চাকাটা বন-বন করে ঘোরে আর একটা নল দিয়ে পেষা আটা বেরিয়ে আসে। আটা না পিষে চালও পিষতে পারো। ছাতু তৈরি করতে পারো। তারপর এই পাথুরেঘাটার বাড়ি দেখছেন। মেয়েদের বড় বড় ঘরে বিয়ে। লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে মারা গেলেন তিনি। তখন সমস্ত সম্পত্তি হাতে এল নাবালক হাবুল দত্তর।

ভূতনাথ হাঁ করে দেখছিল হাবুল দত্তর দিকে। ছুটুকবাবুর শ্বশুর। উঠতি বড়মানুষ। নতুন উঠছে এখন। বড়বাড়িতে মেয়ে দিতে পেরেছে এটা ওঁর গর্ব। আজ ওঁর আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই। হাবুল দত্তকে কোনো দিকে দেখতে হচ্ছে না। সবাই রয়েছে। এবার একটা নতুন পাটকল করবার ইচ্ছে আছে আর কয়লার খনি। ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারবার যে রকম বাড়ছে চারদিকে, তাতে কয়লার চাহিদা বেড়ে যাবে ক্রমেই। এই দেখুন না, রাণীগঞ্জে গিয়েছিলাম—এখনও অনেক খনি পড়ে রয়েছে। নিতে পারলে টাকা রাখবার জায়গা থাকবে না। আর শুধু তো জমিদারিতে চলছে না কারো। অজন্মা হলো গ্রামে তো প্রজারা দিলে না খাজনা। তা বলে তো আর রাজস্ব বন্ধ থাকবে না। রাত কাবার হতে-না-হতে কালেক্টরিতে খাজনা জমা করে আসতে হবে। প্রজা ঠেঙিয়ে আর কতকাল আয় হবে বলুন। তারপর ব্রেহ্মরা যে-কাণ্ড করছে। সব প্রজারা লেখাপড়া শিখতে লেগে গিয়েছে দেশে। মেয়েরা পর্যন্ত লেখাপড়া শিখছে মশাই! শেষে এমন দিন আসবে যখন ছোটলোক প্রজা-পাঠক আর মানতেই চাইবে না জমিদারদের। তখন? তখন গাড়ি-ঘোড়া, পাল্কি, বেয়ারা, বাবুয়ানি চলবে কী করে!

হাবুল দত্ত গল্প জমাতে পারে বেশ। বললেন—ছোটবেলায় আপনারাও দেখেছেন, আমিও

দেখেছি, চিৎপুর রোডের ওপরেই যে ঠিকে গাড়ির আড্ডা ছিল, ওইখানে থাকতো বটুবাবু। সারাদিন ভোর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বটুবাবু বসে থাকতো একটা বেঞ্চির ওপর। একটা হাত-গড়গড়া ছিল, তাতেই তামাক পুড়ছে। দিনরত খ্যাচ-খ্যাচ করতো গাড়োয়ানদের সঙ্গে। ঘোড়ার দানা কম দিয়েছে। কি ভালো ডলাই-মলাই হয়নি—দেখতাম সারাদিন ওই একভাবে বসে। বাঙালীর ছেলে অমন কেউ পারবে মশাই, ও হিন্দুস্থানী বলেই তো পারতো।

ভৈরববাবু বললে—বাঙালীদের কেবল বাবুয়ানিই সার।

হাবুল দত্ত বললেন—তবে শুনুন, আমার আপিসে একজন বাঙালী ছোকরাকে রেখেছিলাম—দশ টাকা মাইনে দিতাম, একদিন দেখি ফুলদার রেশমী মোজা পায়ে আর ডসনের বাড়ির বার্নিস করা জুতো পরে আপিসে এসেছে। এদিকে নানারকম ফুর্তিটুর্তি করে শরীরটাকে তো আগে থেকে অকেজো করেই রেখেছিল। একদিন বলা নেই কওয়া নেই ফট্ করে মরে গেল মশাই—আর দেখুন মাড়োয়ারীদের—ওরা লক্ষ টাকা আয় না হলে এখনও মশারি কেনে না মশাই!

মেজবাবু এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে শুনছিলেন। এবার কথা বললেন। বললেন—কিন্তু ওরা বড় চশমখোর, কী বলেন।

—তা যদি বলেন তবে আমিও একটা গল্প বলি—শুনুন—

হাবুল দত্ত পায়ের ওপর পা দিয়ে বসলেন।

—সেদিন নতুন যে হ্যারিসন রোড হয়েছে না, ওইখান দিয়ে যাচ্ছি, টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ একটা মাড়োয়ারীর ছেলে দেখি আমার সামনে এসে বলছে—এক পয়সায় দুটো দেশলাই কিনবেন বাবু?

আমি তো চমকে উঠলাম। গুলজারীলাল আমাদের পুরনো বন্ধু। বড়বাজারের অতবড় লোহার মার্চেন্ট, তার ছেলে কিনা রাস্তায় দেশলাই বেচছে!

গুলজারীলালকে ধরলাম সেদিন দর্মাহাটায়। বললাম—তোমার ছেলে কিনা শেষে দেশলাই বেচছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে!

গুলজারীলাল বললে—ওটা যে আমাদের নিয়ম ভাই। পাঁচ বছর বয়েস থেকে কিছু-না-কিছু আয় করতেই হবে—দিনে অন্তত তিন আনা।

আমি তো শুনে অবাক! তিন আনা পয়সা আয় করলে তবে নাকি সেদিন পুরো খোবাকি পাবে, আদ্দেক আনলে আধ-খোরাকি আর কিছুই না আনতে পারলে উপোস—তা দেখবেন এই কলকাতাই একদিন মাড়োয়ারীতে ভরে যাবে মশাই। হ্যারিসন রোড হতে-না-হতে যতগুলো বাড়ি হলো সব তো মাড়োয়ারীদের।

হঠাৎ গল্পে বাধা পড়লো। কে যেন একজন শশব্যস্তে এসে বললে—ননীবাবু এসেছেন কর্তাবাবু!

—ননীবাবু? কোথায়? বলে হাবুল দত্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

হাবুল দত্ত উঠে যেতেই ভৈরববাবু বললেন—না স্যার, বেয়াইমশাই লোহার ব্যবসা করে করে একেবারে মাড়োয়ারী হয়ে উঠেছে দেখছি—রস-কষ নাস্তি।

মেজবাবু পান চিবুচ্ছিলেন। বললেন—যা বলেছো—টাকাটা চিনেছে খুব।

মতিবাবু বললে—তা আপনার সঙ্গে হাবুল দত্তর সম্পর্কটা কিসের স্যার? আপনি মেয়ে নিয়ে গিয়ে খালাস। আপনি তো আর ছেলে বেচতে আসেননি এ বাড়িতে?

কিন্তু ভূতনাথ তখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। ননীবাবু এসেছে। কোন্ ননীবাবু? ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীলাল! তাকেই এত খাতির! কয়েকজন কর্তাব্যক্তি উঠে গেলেন বাইরে। ভূতনাথ একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো সবার অলক্ষ্যে। লোক গিস-গিস করছে। সামনে খোলা জায়গাটায় ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। মাঝখানে একটিমাত্তর মোটর। বিয়েবাড়ির রোশনাই লেগে সমস্ত মোটরটা চক-চক করছে। গোল গোল চারটে চাকা। মাথার ওপর ছাদের মতন করে মোটা চটের কাপড়ে ঢাকা। কয়েকজন তাই-ই হাঁ করে দেখছে।

বেশ জ্বল-জ্বল করছে চেহারাটা। জানবাজারের চুনীবালাকেও এমনি গাড়ি কিনে দিয়েছে

ছোটবাবু। এখন তো এমনি চুপচাপ। একটু কল চালালেই ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে থর-থর করে কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে চলবে। পেছন দিয়ে ধোঁয়া বেরোবে।

—এই, হাত দিবিনি কেউ।

—গাড়ির কাছে কে যায়?

চারদিকে ছুটোছুটি। লাল বনাতের কাপড়ের ওপর দিয়ে বরযাত্রীরা এসেছে—সেটা ধুলোয় ধুলো হয়ে উঠেছে। ফুলের মালার টুকরো-টাকরা ছড়িয়ে আছে সারা জায়গাটায়। ফুলের গন্ধ! রান্নার গন্ধ! চারদিকে যেন ননারকম গন্ধের উৎসব। বড়বাড়ির লোকজন ঝেঁটিয়ে এসেছে এখানে।

লোচন যাচ্ছিলো পাশ দিয়ে। ভূতনাথ ডাকলে—কে লোচন নাকি, চলেছো কোথায়?

লোচন থেমে গেল। বললে—এই শালাবাবু, দেখি কুটুমবাড়ির তামাক্-বিড়ির ব্যবস্থাটা কেমন, পরশু তো আবার বড়বাড়িতে আমাকেই সব করতে হবে কি-না।

ভূতনাথ বললে—ঘড়িবাবুকে দেখেছো নাকি লোচন? এসেছেন তিনি?

—না আজ্ঞে, তিনি তো এলেন না, বললাম অত করে। তিনি পাগল-ছাগল মানুষ। বললেন—আমি চলে গেলে ঘড়ি মেলাবে কে? তা এদিকে দেখেছেন—ব্যবস্থার কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই, ফুলের মালা, আতরপানি, সবই তো করেছে—কিন্তু আসল জিনিসই বাদ দিয়েছে।

—আসল জিনিস কী?

—আজ্ঞে, লক্ষ্য করছেন না, মেজবাবুর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে!

—কেন?

—আমি তো সেই জন্যেই ঘুর-ঘুর করছি, সন্ধ্যে থেকে এতখানি হুজ্জুৎ গেল, তার ওপর রাস্তায় ছেনি দত্তর বাড়ির কাছে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল, এর পর মেজবাবুর কি মেজাজ ঠিক থাকে? গাড়িতে সঙ্গে যা ছিল, সব তো ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবু, ওঁনারা শেষ করে দিয়েছে। আমি তো তাই তখন থেকে ভাবছি—এ কী রকম বড়লোক, ইয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেনি!

সত্যিই তো! ভূতনাথের এতক্ষণে খেয়াল হলো। মেজবাবু যেন অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে মুখ বুজে রয়েছেন। বিয়ে সেই রাত বারোটার পর। সুতহিবুক লগ্ন। ততক্ষণ মেজবাবুর মতো বরকর্তা কি উপোস করে থাকবেন নাকি? লোচনের কিন্তু সব দিকে নজর আছে।

মেজবাবু হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলেন—লোচন—

—ওই ডাকছেন, আসি হুজুর—বলে এক ঝটকায় লোচন ঘরে ঢুকে গেল।

ওপাশে পুজোবাড়ির দরদালানের ওপর ছুটুকবাবুকে বসিয়েছে। মোটা-সোটা শরীর। দূর থেকে বোঝা যায়, বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেজেগুজে বেশ সুন্দর মানিয়েছে বরকে। মাথায় রঙীন পালক লাগানো রেশমী পাগড়িটা এখন নামিয়ে রেখেছে। কিন্তু সার্টিনের চুমকি-বসানো পাঞ্জাবীর ওপর হীরের লকেট-বসানো হারটা ঝকমক করছে। দু'হাতে তাগা, আর কানে মুক্তোর কান—মনে হয় যেন ঠিক সোনার কার্তিকটি—পাশে কান্তিধর, পরেশ সবাই রয়েছে। লাল মখমলের তাকিয়ায় মাঝে মাঝে হেলান দিচ্ছে। ছুটুকবাবুরও তো নেশাটা-আশটার দরকার হবে। রাত বারোটা পর্যন্ত থাকবে কী করে!

ভূতনাথ এবার বারান্দা পেরিয়ে নেমে রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ যেন মনে হলো চেনা মুখ একজন লোক তার দিকে চেয়ে আছে। খানিক চেয়ে থাকতেই লোকটা সামনে এগিয়ে এল। এ কি! বৃন্দাবন না! চুনীদাসীর চাকর।

বৃন্দাবন সামনে এসে দাঁত বার করে হাসতে লাগলো। ভূতনাথ বললে—তুমি এখানে?

বৃন্দাবনের আর সে চেহারা নেই। এই রাত্রের অন্ধকারেও যেন কামিজের ফাঁক দিয়ে গলার কণ্ঠা দেখা যায়। পানের ছোপ লাগা দাঁতগুলো মিশমিশে কালো। শেষ-ফোঁকা বিড়িটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বৃন্দাবন। ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—এত রাতে এখানে কী করতে?

—আপনার কাছেই এইছিলাম।

—আমার কাছে? ভূতনাথ আরো অবাক হয়ে গেল—আমার কাছে কী করতে?

বৃন্দাবন খানিক ইতস্তত করলো যেন। বললে—একটু কথা ছিল আসুন না, একটু নিরিবিলিতে আসুন—বলছি।

আরো একটু নিরিবিলিতে এসে দাঁড়াতে হলো। হৈ-চৈ হট্টগোল যা-কিছু সব পাশে ফেলে এসে দাঁড়ালো গলিটার কোণে। এঁটো কলাপাতার পাহাড় জমেছে রাস্তার কোণে। ঝুড়ি ভরতি এনে ফেলেছে ওখানে। কয়েকটা কুকুর খাওয়া-খাওয়ি লাগিয়েছে তাই নিয়ে। খাস-গেলাসের নেভানো ঝাড়গুলো কাত করে রেখেছে দেয়ালের গায়ে। নকল মোম পোড়ার গন্ধও আসছে নাকে। বৃন্দাবন বললে—এখানে নয় আজ্ঞে, ওই দিকটায় চলুন—একটু নিরিবিলি চাই।

ভূতনাথ আরো নিরিবিলিতে সরে চললো। এখানটায় একটা পুরনো ডোবা বোজানো হচ্ছে। গাড়ি-গাড়ি আবর্জনা বুঝি দিনেরবেলা ফেলা হয় এখানে। সবটা বুঝি বোজানো হয়নি এখনো। আবর্জনাতে বুঝি আগুন লাগানো হয়েছে। ওদিকটা দুর্গন্ধময় ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে।

বৃন্দাবন বললে—আপনাদের বড়বাড়ি গিয়েছিলাম এখন।

—কেন?

—দরকার ছিল যে আপনার সঙ্গে—গিয়ে দেখলাম সবাই এ বাড়িতে, তাই হাঁটতে হাঁটতে আবার এলাম এখানে, পা দুটো একেবারে টনটন করছে—বংশী কোথায়?

ভূতনাথ বললে—বংশী তো আসেনি।

—আসেনি তো ভালোই হয়েছে—ও বেটা ভারি বজ্জাত। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলেছি জানতে পারলে মুণ্ডু খেয়ে ফেলবে আমার।

—কিন্তু বংশীর ওপর তোমার অত রাগ কেন বৃন্দাবন?

—আজ্ঞে বংশীই তো যত নষ্টের গোড়া, ছোটবাবুকে ফুসলে নিয়ে গেল কে শুনি? সেই যে কথায় আছে না, 'মাছ খায় না যত্নে পাতে তিনটে খোল্‌সে'—ও হলো তাই শালাবাবু, ওকে চিনবেন না সহজে, ওর মতলব যে আলাদা, নইলে ছোটবউরাণীকে মদ ধরায় ও—

—এ-সব তোমায় কে বললে বৃন্দাবন?

—শুনতে পাই আজ্ঞে সব, নতুন-মা ও বাড়িতে যে অতদিন ছিল, সবাইকে জানে যে—ওই বাড়িতে কাজ করে মধুসূদন বড়লোক হয়ে গেল, বালেশ্বরে জমি-জিরেত কিনেছে, লোচন তামাক সাজে টিপে-টিপে, কিন্তু তলে-তলে ওদিকে ঠিকে নিয়েছে ঠেলাগাড়ির, দর্মাহাটায় গেলেই দেখতে পাবেন—আর ওই যে আপনাদের বিধু সরকার—বিধু সরকারকে দেখেছেন নিশ্চয়ই...

ভূতনাথ ঘাড় নাড়লো।

—ওই বিধু সরকার, আপনাকে আজ বলে রাখি, বাবুদের জমিদারী দেখবার তো সময় নেই, কত বিঘে জমিতে কত ধান হয়, তারও হিসেব রাখেন না, রাখবার সময় কখন, কিন্তু নায়েবের সঙ্গে যোগসাজস করে কী সব্বনাশ যে করেছে তা একদিন-না-একদিন টের পাবেন—নইলে সুখচরের যে জমিতে সোনা ফলতো সেই জমিতে এখন তিন মণ ধানও হয় না। প্রেজা বিলির যখন সময় হয়—সেলামী যা আসে তার কি আদ্দেকও ওঠে বাবুদের খাজাঞ্চিখানায়?

ভূতনাথ যেন কেমন অবাক হলো। বললে—এত কথা তো তোমার জানবার কথা নয় বৃন্দাবন—তুমি সব জানলে কী করে?

বৃন্দাবন চুপ করে রইল। তারপর খানিক পরে বললে—জানে সবাই শালাবাবু, ওই বংশী, লোচন, মধুসূদন, ইব্রাহিম, যদুর-মা সৌদামিনী, বিধু সরকার, এমনকি ব্রিজ সিং পর্যন্ত সবাই জানে। জানেন না কেবল বাবুরা আর বিবিরা আর জানেন না আপনি—পারা কখনও চাপা থাকে আজ্ঞে?

ভূতনাথ বললে—কিন্তু তোমার নতুন-মা?

—আমার নতুন-মা'র কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, চুনীদাসী! ছিল তো ঝিয়ের মেয়ে—সে-ই বা কী ভালো করেছে শুনি ছোটবাবুর? ছোটবাবুর ওই তো শরীর, ওঁকে মদ খাইয়ে, টাকা দুয়ে নিয়ে কী সাশ্রয়টা হচ্ছে শুনি?

—তবে বলি শুনুন—বৃন্দাবন আবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিলে ভালো করে। বললে—নতুন-

মা'র আমি পেটের ছেলেও নই সাতপুরুষের জ্ঞাতি-কুটুমও নই যে, তার কোলে ঝোল টানবো—কিন্তু একথাও বলি, দশটাও নয় বিশটাও নয়, ছোটবাবুর ওই একটি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ না হলে বাবুদের চলবেও না, কিন্তু আপনাদের শুধু-শুধু নতুন-মা'র ওপরে জ্বালা কেন বলুন তো? আর মেজবাবুর ক'টা মেয়েমানুষ গুণে দেখুন তো—পায়রার পেছনে, মোসাহেবের পেছনে তিনি কত টাকা উড়োচ্ছেন—আর ছোটবাবু তো কোথাও যান না, শুধু আসেন নতুন-মা'র কাছে, আর মদ খান—কিন্তু নতুন-মা'কে মদ খাওয়াতে কে শেখালে শুনি? এখন যদি ছোটবাবু ছেড়ে দেন নতুন-মাকে, নতুন-মা'র এখন বয়েস হয়েছে, এ বয়সে আবার কার কাছে গিয়ে হাত পাতেন বলুন তো—নতুন গাড়িটা পর্যন্ত বেচে দিতে হলো সেদিন—চলে কী করে? এক মণ চাল তা-ই কিনতে লাগে তিন টাকা—দশ আনা সের ঘি, পাঁচ আনা সের সরষের তেল—আর আমরা এতগুলো লোক বাড়িতে দু'বেলা খেতে—

ভূতনাথের কেমন যেন রাগ হলো। বললে—কিন্তু মদ, সোডা আর বরফের খরচ তো ঠিক

বৃন্দাবন বললে—সে জুটছে কি না-জুটছে আমি আর পাপ মুখে তা বলতে চাইনে শালাবাবু।

ভূতনাথ বললে—তা ছাড়া ছোটবৌঠান তার বিয়ে-করা বউ, তার কথা তোমার নতুন-মা একবার ভেবে দেখে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তার কেমন করে কাটে, ছেলে নেই, স্বামী থেকেও নেই, মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের এতবড় দুঃখ বুঝতে পারে না। ভাবো তো একবার নিজের মা-বোনের কথা?

বৃন্দাবন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না। তারপর বললে—আপনি এতবড় কথা বললেন?

কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল বৃন্দাবনের মুখ। ছল-ছল করে এল বৃন্দাবনের চোখ। সেই পাথুরেঘাটার গলির ভেতর অন্ধকারেও ভূতনাথ দেখলে—বৃন্দাবন যেন হঠাৎ বড় ঘা খেয়েছে, হঠাৎ যেন বোমা ফাটার মতো বৃন্দাবন বললে—ওই চুনীদাসী আমার কে হয় জানেন?

—কে?

তারপর এক নিমেষে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বৃন্দাবন বললে—না থাক, দরকার নেই—তার চেয়ে আমি যে-কথা বলতে এসেছি তাই বলি।

ভূতনাথ বাধা দিয়ে বললে—চুনীদাসী তো শুনেছি রূপোদাসীর মেয়ে—রূপোদাসী তোমার কে?

বৃন্দাবন মাথা নাড়তে লাগলো—না, না—না।

—কেন, বলতে বাধা কী?

—না শালাবাবু, যে কথা কেউ জানে না এক আমি আর চুনীদাসী ছাড়া, সে কথা বলতে পারবো না আমি—বরং যে কথা বলতে এসেছি, সেটা বলে নিই, পেটের দায়ে সবই করি, কিন্তু লজ্জা, সরম, আমাদেরও আছে শালাবাবু, নতুন-মা'র চাকর বলে সবাই জানে আমাকে, তাই জানুক। দেশে থাকলে আমাদের দু'বেলা পেট ভরে ভাত জোটে না, এমন আকালের দেশ, কিন্তু তবু দেশে গাঁয়ে সমাজ আছে, পঞ্চায়েৎ আছে—এ-সব জানলে 'এক ঘরে' করবে যে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভূতনাথ বললে—তা আমাকে কী করতে হবে বলো?

—আপনি সব পারেন শালাবাবু!

—আমি? যেন বিদ্রূপের মতো শোনালো কথাটা।

বৃন্দাবন বললে—আমি বংশীর কাছে গিয়েছিলাম, তা বংশী আমাকে তেড়ে মারতে এল। মধুসূদনের মুখে শুনলাম ছোটবৌঠানকে মদ ধরিয়েছে বংশী, ভালোই করেছে, তার উপযুক্ত কাজই করেছে। সেদিন নাকি সাত ঘণ্টা অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, শেষে ডাক্তার ডাকতে হয়। বংশীর হাতেই মদের আলমারির চাবি কিনা, কর্তা-গিন্নী দু'জনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে বংশীরই সুবিধে, দুই ভাই-বোনে দেশে ফিরে গিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে থাকবে।

ভূতনাথ প্রতিবাদ করতে গেল—সব মিথ্যে কথা বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন সে-কথা কানে না তুলে বলতে লাগলো—আর করবে না-ই বা কেন, লোচন দর্মাহাটায় ঠেলাগাড়ির ঠিকেদারি নিয়েছে, মধুসূদন জমি-জিরেত কিনেছে দেশে। বিধু সরকারও কাজ গুছিয়ে নিয়েছে বেশ, কেউ বাদ যায়নি, চাকরি যদি চলেও যায়, কারো অসুবিধে হবে না, পারলাম না শুধু আমি।

ভূতনাথ বললে—পারোনি কেন?

—আজ্ঞে আমিও পারিনি, আপনিও পারেননি, অথচ বৌঠানের সঙ্গে আপনার অত ভাব—ছোটবৌঠানের সিন্দুকে গয়নাগাঁটি যা আছে তাই-ই একটা-একটা করে ফুরোতে জীবন কেটে যাবে, মদের নেশায় কোথায় থাকবে চাবির গোছা আর কোথায় থাকবে হিসেব—তা আপনি না নেন, নেবে বংশী—বংশী আর ওর বোন চিন্তা।

রাত গভীর হয়ে এল। বিয়েবাড়িতে নহবৎ-এ কানাড়ার আলাপ বড় করুণ আবেদন জানাচ্ছে। এই মুহূর্তে কানাড়ার মূর্ছনার মধ্যে যেন জবা, ছোটবৌঠান, চুনীদাসী ছাড়াও রাধা, আন্না, সকলের মনের নিভৃততম কামনাটি মূর্ত হয়ে উঠতে লাগলো ভূতনাথের মনে। কলকাতার নির্জনতম অংশে পচা ডোবার পাশে দাঁড়িয়ে মনে হলো—আবার যেন সকলের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে চলেছে সে। বাইরে থেকে সবাই পরস্পর-বিরোধী—কিন্তু আসলে সবাই এক। কেউ ঘৃণা দিয়েছে, কেউ তাচ্ছিল্য, কেউ ভালোবাসা, কেউ-বা স্নেহ, কেউ করেছে বিদ্রূপ। কিন্তু সকলের সঙ্গে আজ এই মুহূর্তে ওই কানাড়া রাগিণীর মূর্ছনার পটভূমিকায় এক নিবিড় যোগ স্থাপন হয়ে গেল হঠাৎ। যে তাচ্ছিল্য করেছে, যে কেবল বিদ্রূপ করেছে, তার সঙ্গে যে ভালোবেসেছে তার আর কোনো পার্থক্য রইল না। ওরা সবাই এক। সবাই এক। এখানে এই অন্ধকার পরিপ্রেক্ষিতে যেন সকলের অন্তঃস্তল পর্যন্ত এক অলৌকিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। হয়তো এ শুধু অন্ধকারের ছলনা কিম্বা হয়তো কানাড়া রাগিণীর ভুল বকা, নয় তো এইটেই বোধ হয় অনন্তকালের চরমতম সত্য!

হঠাৎ সচেতন হয়ে ভূতনাথ বললে—আচ্ছা, আমি আসি—দেরি হয়ে যাচ্ছে ওদিকে আবার।

বৃন্দাবন বললে—তা হলে ওই কথাই রইল শালাবাবু।

—কী কথা?

বৃন্দাবন বললে—চুনীদাসী আমাকে পই-পই করে বলে দিয়েছে যে।

—কী বলে দিয়েছে?

—আজ্ঞে, সবার কাছে নতুন-মা শুনেছে যে, ছোটমা'র সঙ্গে আপনার খুব মাখামাখি—আপনাকে জামা-কাপড়-জুতো দিয়েছে ছোটমা, আপনাকে একটু পেয়ারের চোখে দেখেন তিনি। বিধু সরকার তো সরাতেই চেয়েছিল আপনাকে বড়বাড়ি থেকে, খোরাকির খাতা থেকে নামও কেটে দিয়েছিল, কিন্তু ছোটমা'র কথাতেই তা রাখতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। তাই আপনাকে একবার জানবাজারে দেখা করতে বলেছে নতুন-মা।

ভূতনাথ বললে—কেন, আমি কী করতে পারবো তার?

—তা জানিনে কিন্তু দেখা করতে আপনার দোষটা কী?

ভূতনাথ খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলে। বললে—কিন্তু যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে হয়তো বড়বাড়িতে আমি বেশিদিন থাকবো না বৃন্দাবন।

—সে আপনি পারবেন না আজ্ঞে, ছোটমা আপনাকে ছাড়বে না।

ভূতনাথের রাগ হলো কথাটা শুনে। বললে—কেন ছাড়বে না, ছোটবৌঠান আমার কে শুনি? আমি যদি ছেড়ে চলে যাই—কে আমায় আটকাতে পারে?

—পারে শালাবাবু, আটকাতে পারে ছোটমা, মধুসূদন কাকা সব বলেছে যে—নইলে ভেবে দেখুন না, এত লোক থাকতে এত রাতে আপনার সঙ্গে এত কথা বলি?

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা, এখন তা হলে তুমি এসো বৃন্দাবন।

—তা হলে আপনি আসছেন তো?

—কথা দিতে পারছি না আমি—কিন্তু ভেবে দেখি।

—আসবেন কাল ঠিক।

সে-কথার উত্তর না দিয়ে ভূতনাথ হন-হন করে বিয়েবাড়ির দিকে চলে গেল।

ইতিহাসের একটা বাঁধা পথ আছে। জব চার্নক থেকে লর্ড ক্লাইভ। লর্ড ক্লাইভ থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে লর্ড ডালহৌসি, তারপর লর্ড ডালহৌসি থেকে কার্জন। বাঁধা পথ বটে কিন্তু সত্য পথ নয়। সহজ সত্য পথটা অনেকদিন হারিয়ে গিয়েছিল। রামমোহন রায়ের পর আর পথ ছিল না। তারপর আবির্ভাব হলো স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু ১৮৩৩ থেকে ১৯০২ অনেক দূর। এ-পথটারও নিশানা ঠিক ছিল না। মাঝে মাঝে তার আগাছা আর মরুভূমি। পথ খুঁজে বার করবার আগ্রহ হয়তো ছিল, ধৈর্য ছিল না। বিবেকানন্দর স্মৃতি প্রায় মুছে এসেছে। বড়বাড়িতে বাবুরা ঘুমে অচেতন। ছোটবৌঠান 'মোহিনী-সিঁদুরে'র মায়ায় আচ্ছন্ন। ছুটুকবাবু নতুন বউ নিয়ে উন্মত্ত। ব্রজরাখাল নিরুদ্দেশ। নিরাশ্রয় ভূতনাথ মায়াবী কলকাতায় গোলকধাঁধার কূটচক্রে বিপর্যস্ত। আর নিবারণদের দল তখনও অসঙ্ঘবদ্ধ। শুধু সিস্টার নিবেদিতা একলা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

কিন্তু সহজ পথটা দেখিয়ে দিলেন লর্ড কার্জন। সিনেট হলে দাঁড়িয়ে কনভোকেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন—তোমরা ভারতবাসীরা মিথ্যাবাদী—সত্য, যাকে বলে truth, তা জানতে হলে জানতে হবে আমাদের কাছে—ইউরোপের কাছে—

সেদিন জবাদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সিনেট হল্-এর সামনে দিয়ে আসছিল ভূতনাথ। সামনেই দেখা হয়ে গেল নিবারণের সঙ্গে আবার। একলা নিবারণ নয়, কদমদা, শিবনাথ, কুমুদ সবাই।

কদমদা বলছেন—ভালোই হলো নিবারণ, লর্ড কার্জন এক মহা উপকার করলেন আমাদের। এবার আমরা চিনতে পারবো নিজেদের।

নিবারণের চোখ দিয়ে তখন আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। বললে—এত বড় মিথ্যে কথা বলবে, আর আমরা সহ্য করবো কদমদা?

কদমদা হাসলো, বললে—এই তো ভালো হলো রে বোকা। মনে করে দেখ স্বামীজি কী বলেছিলেন—তোমার দেবতা আজ চায় তোমাদের জীবন-বলি... আরো বলেছিলেন—আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তেত্রিশ কোটি নয়, তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা—সে তোমার জননী জন্মভূমি, তখন তো সে কথা কেউ শুনিনি, এখন লর্ড কার্জন মনে না করিয়ে দিলে সে তো ভুলেই গিয়েছিলুম রে।

ভূতনাথকে দেখেই নিবারণ বলে উঠলো—এই যে ভূতনাথদা,—বড়দা এসেছে জানেন?

—কই না, এখনও তো আসেনি।

কদমদা বললে—আজকালের মধ্যেই আসবেন।

—আপনাকে চিঠি লিখেছে ব্রজরাখাল?

—কালই আর একখানা চিঠি পেয়েছি তাঁর, লিখেছেন রওনা হচ্ছি—কিন্তু আমাদের আর অপেক্ষা করা যায় না। কার্জনের একখানা বই যোগাড় করতে হবে—'Problems of the Far East' বইখানা যেখান থেকে হোক যোগাড় করতেই হবে নিবারণ—স্যার গুরুদাস চেয়েছেন বইখানা।

নিবারণ বললে—কেন?

—সিস্টার নিবেদিতার কাছে উনি শুনেছেন নাকি—বইটাতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা লেখা আছে। কোরিয়ায় যখন ছিল কার্জন তখন ওখানকার লোকদের ধারণা ছিল চল্লিশ বছর বয়েস না হলে মানুষ

বিচক্ষণ হয় না। কোরিয়ার মন্ত্রী যখন কার্জনের বয়েস জিজ্ঞেস করলেন, কার্জন তখন সবে তেত্রিশ বছরে পড়েছে, কিন্তু মন্ত্রীর উত্তরে অনায়াসে বললে—চল্লিশ।

কুমুদ বললে—কথাটা 'হিতবাদী'তে ছাপিয়ে দিলে হয় না কদমদা।

কদমদা বললে—ছাপালে এর প্রতিকার হবে না ভাই, আমাদের এই ঘা খাওয়ার প্রয়োজন ছিল রে আজ। আমাদের এখন থেকে তৈরি হতে হবে—৩০শে আশ্বিনের জন্যে এখন থেকে তোড়জোড় করা দরকার—যেমন করে আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা মায়ের সামনে দীক্ষা নিয়েছিল, তেমনি করে শক্তির দীক্ষা নিতে হবে—তেমনি করে সবাই মিলে বলতে হবে—বন্দেমাতরম্ --

পরে দেখেছিল ভূতনাথ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কার্জনের সে মিথ্যেবাদিতা ধরিয়ে দিয়েছিল। শুনেছি—সিস্টার নিবেদিতা নাকি মতিলাল ঘোষের কাছে, 'Problems of the Far East' বইখানা নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন।

রাত হয়ে যাচ্ছিলো। ওরা চলে যেতেই ভূতনাথ আস্তে আস্তে বড়বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। মনে পড়লো সেদিন নিবারণও ওই কথাই বলেছিল। গীতায় আছে 'ক্লৈব্যম্ মাস্ম গমঃ পার্থ'। ক্লৈব্য ত্যাগ করতে হবে। সত্যি সত্যি এই বসে বসে খাওয়া—এ আর কতদিন চলবে! ব্রজরাখাল এসে পড়লে বাঁচা যায়। একটা কিছু চাকরি-বাকরি করতে পারলে ভালো হতো। কে যোগাড় করে দেয়! কার সঙ্গেই বা তার জানাশোনা আছে।

বনমালী সরকার লেন-এর ভেতরে আসতেই মনে হলো যেন বাড়ির সামনে বেশ ভিড় জমেছে। এখন কীসের ভিড়!

কেমন যেন ভয় হলো। সেদিনকার মতো পুলিশ-দারোগা এসেছে নাকি? সেই ছুটুকবাবুর বিয়ের দু'দিন পরেই। সেদিনও ঠিক এমনি দূর থেকে পুলিশের লালপাগড়ি দেখে চমকে উঠেছিল মনটা। কী, হলো কী বড়বাড়িতে!

কিন্তু কাছে আসতেই ভুলটা ভেঙে গেল। না, পুলিশ সেপাই কিছু না। দক্ষিণের পুকুরটা সাফ করতে এসেছিল মজুররা। মাথায় গামছা জড়ানো। হপ্তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বিধু সরকার পাওনাদারদের অকারণ দাঁড় করিয়ে রাখতে কেমন যেন আনন্দ পায়। একরকম অহেতুক দুর্বোধ্য আনন্দ। সেদিনের মতো পুলিশের গণ্ডগোল হলেই হয়েছিল আর কি!

সে কী কাণ্ড! সেদিনও দূর থেকে ভিড় দেখে বোঝা যায়নি।

তখনও বিয়েবাড়ির গন্ধ যায়নি বড়বাড়ির গা থেকে। বাড়ির সামনে এঁটো কলাপাতা, মাটির গেলাস আর ভাত-তরকারির পাহাড় জমেছে। ওদিকটা কুকুর, মাছি আর বেড়ালের উৎপাত। ব্রিজ সিং লোহার গেট বন্ধ করে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

কাছে আসতেই—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

—হট যাইয়ে বাবু, হট যাইয়ে।

—ওপরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন - বলিহারি বাবা!

দুই একজন বৃদ্ধ রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে ভিড় দেখে উঁকি মেরে দেখে। দেখেই নাকে কাপড় দিয়ে ছি-ছি করতে করতে চলে যায়।

ভূতনাথও দেখলে। দেখেই শিউরে উঠলো। সমস্ত নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল যেন তার। সকাল বেলা এ কী দৃশ্য!

—কোন্ বাড়ি থেকে ফেলেছে মশাই?

—আবার কোন্ বাড়ি—বলেই একজন দাঁত বার করে অর্থভরা হাসি হেসে বড়বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

কিন্তু এ-বাড়ি থেকে কে ফেলবে! কে এমন পাপী হে!

—ওগো, নড়ছে নাকি ছেলেটা?

—আরে না মশাই, মরে কখন ভূত হয়ে গিয়েছে। দেখেছেন না, সাদা হয়ে গিয়েছে অঙ্গ।

ছোট সাদা ধবধবে একটা রক্তপিণ্ড! শিশু না বলে রক্তপিণ্ড বলাই ভালো। মাংসের ডেলা। ভালো করে হাত পা চোখ নাক কান মুখ এখনও গড়ে ওঠেনি। পুষ্টি হবার আগে আত্মপ্রকাশ করেছে হয়তো।

—ছেলে না মেয়ে—কী মশাই?

ছেলে না মেয়ে বুঝবো কেমন করে! উপুড় হয়ে পড়ে আছে যে! আর ছোঁবে কে ওকে! আগে পুলিশের ডোম আসুক। নেড়েচেড়ে দেখুক সে। তারপর বোঝা যাবে ছেলে কি মেয়ে। কিন্তু তবু দেরি যেন আর সয় না কারো। ছুঁড়িকে টেনে হিঁচড়ে বার করুক। দারোগা তো ঢুকেছে ভেতরে। মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। এত দেরি হচ্ছে কেন!

হাঁ করে চেয়ে থাকে সবাই, একেবারে সদ্য-হওয়া মরা ছেলেটার দিকে—আর-এক বার গেটের ভেতরে বড়বাড়ির লম্বা শান-বাঁধানো উঠোনটার দিকে। যার কীর্তি তাকে দেখা চাই। না হলে তৃপ্তি হচ্ছে না ঠিক! কী রকম চেহারা। বয়েস কত তার। ফর্সা না কালো। বিধবা না সধবা! ঝি না বউ কে?

—দারোয়ানজী, তোমার মেজবাবু নেমেছে?

ভূতনাথ এগিয়ে গেল। ভূতনাথকে দেখে ব্রিজ সিং গেট খুলে দিলে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী ব্যাপার ব্রিজ সিং?

ব্রিজ সিং বন্দুক হাতে নিয়ে পরম বৈষ্ণবের মতো বললে—সব কুছ হনুমানজী কী খেল বাবুজী—হনুমানজী নে দিয়া, হনুমানজী নে লিয়া।

বাড়ির ভেতরে কিন্তু কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই। যে যার কাজ করে চলেছে। বিধু সরকারের ঘরের দিকে চোখ পড়তেই নজরে পড়লো দারোগা সাহেব বসে আছে। বসে বসে বিধু সরকারের সঙ্গে কথা বলছে। খেরো খাতা সামনে নিয়ে বিধু সরকার বলছে—কিন্তু মেজবাবুর তো এখন সময় হবে না দারোগা সাহেব, আজ তিনি পায়রা ওড়াতে ছাদে উঠেছেন।

—ডাকতে পাঠাও তাঁকে—সাহেব বলল।

—ডাকতে তো হদ্দ-হদ্দ তিন বার লোক পাঠালাম হুজুর, মেজবাবু কাজ না সেরে নামবেন না তো!

—কী কাজ করছেন?

—পায়রা ওড়াচ্ছেন—এখন যদি মেজাজ বিগড়ে যায় তো দিন ভর কারো মাথা আর আস্ত থাকবে না। পায়রা ওড়ানোর পরে একবার খাজাঞ্চিখানায় আসেন রোজ—তখন হিসেবপত্তোর দেখেন, পাওনাগণ্ডা বুঝে নেন। এ তো আর সরকারী পোস্টাপিস নয় হুজুর, এখানকার কানুন আলাদা।

মনে আছে ইংরেজ দারোগা সাহেব কথাটা শুনে খুশি হয়নি। হাতির লাঠিটা ঠুকছিল মেঝের উপর বারকয়েক। মেজবাবু তখনও ছাদের ওপর পায়রা ওড়াচ্ছেন।

বেণী বললে—পায়রা ওড়াতে সবাই তো পারে না হুজুর, পায়রাগুলো চক্কর মেরে-মেরে আকাশে উড়তে থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে মেজবাবুর হাতও তালে তালে ঘুরবে—আকাশের দিকে চোখ রেখে বাঁ হাতে মাঝে মাঝে একটা করে তুড়ি মারবে।

—তুড়ি মারবে কেন?

—যাঁহাতক না তুড়ি মারা আমি তাঁহাতক আমার হাতের পায়রাটা উড়িয়ে দেবো। পত্-পত্ করতে করতে সেটাও উড়ে গিয়ে বড় দলটার সঙ্গে ঘুরতে শুরু করবে—এই তো খেলা। সে দেখতে ভারি মজা শালাবাবু—এক সময়ে নেশা লেগে যায়। মাথায় বেশ ঘুরুনি ধরে—মাথার ওপর সূর্যি

উঠেছে—তেজ হয়েছে রোদের, খেয়ালও নেই কারো, আমারও নেই, বাবুরও নেই, ভৈরববাবুরও নেই, মতিবাবু, ফটিকবাবু, তারকবাবু কাবোরই নেই।

—এমনি কতক্ষণ চলে?

—তা ধরুন না কেন, রোদের তেজ বাড়লে পাযরার মেহনত হয় কিনা খুব—পায়রা হলো সুখী জানোয়ার আজ্ঞে। ওই একটা একটা করে পায়বা ছাড়বো আমি, তারপর যখন সব পায়রা ছাড়লুম, তখন মেজবাবুর খেলা আরম্ভ হবে—খেলছে তো খেলছেই—তারি মধ্যে দু'বার কল্‌কে বদলে দিয়ে গেল লোচন, সে টিকে তামাক পুড়ে কখন ছাই হয়ে গিয়েছে। মেজবাবু আঙুল দিয়ে ভৈরববাবুকে ইশারা করবেন—আর ভৈরববাবু মুখের মধ্যে দুই হাতের আঙুল পুরে এমন শিস দেবে—পায়রা ঘুবতে ঘুরতে হঠাৎ সোজা রেললাইনেব মতো দু'সার হয়ে উড়তে লাগলো। তারপর আবার শিস—নতুন কায়দায় শিস—তখন যেন ঠিক গোড়ে মালার মতো হয়ে গেল। আবার শিস—তখন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে গাছের পাতার মতো ঝব-ঝর করে ঝরে পড়তে লাগলো। তা শিস দিতে পারে খুব ভালো আমাদের ভৈরববাবু—একবার বরানগরের বাগানে গিয়ে খুব শিস দিয়েছিল আজ্ঞে—সে এক কাণ্ড!

—কী কাণ্ড বেণী?

—বরানগরের বাগানে একদিন আপনাকে নিযে যাবো আজ্ঞে। দেখবেন কী সুন্দর গাছের কেয়ারী—এক-একটা গাছের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ খুঁজে পাবে না আপনাকে, ওইখানেই 'কানা-মাছি-ভোঁ-ভোঁ' খেলে কিনা বাবুবা।

—কার সঙ্গে খেলে?

—কলকাতা থেকে কখনও-কখনও মেয়েমানুষ নিয়ে যায় মেজবাবু, চোখে দু'পাট কাপড় বেঁধে তাদের ছেড়ে দেয় বাগানের মধ্যে। বাগানের গাছের ঝোপে বাবুরা কুঁ-কুঁ আওয়াজ করে—আর তেমনি চোখ বেঁধে বাবুদের ছুঁতে হবে, ভারি মজার খেলা। আমরা এক-একবার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি দরজার ফোকর দিয়ে।

—লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হবে কেন—দেখা তোমাদের বারণ বুঝি?

—দেখতে আপনারই লজ্জা হবে যে শালাবাবু, একেবারে উদোম গা যে—কাপড়-জামার বালাই নেই—কিন্তু একবার বেশ নতুন খেলা হয়েছিল—মেজবাবু বাগানে বস্ত্রহরণ পালা করেছিল সেবার।

—বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক যেমন বড়বাড়িব ঠাকুরঘরে ছবি আছে দেয়ালে টাঙানো, অবিকল ওই রকম—মেজবাবু সেজেছিল কেষ্ট।

মেজবাবুর যৌবনকালে এ-রকম সখ ছিল আরো। বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন—নানারকম খেলা। সে-কালও নেই, সে জাঁকজমকও নেই। ওই যে লোচনকে দেখছেন তামাক সাজছে একলা বসে বসে, ওর কি তখন ফুরসত থাকতো নাকি? একা মানুষ দশ হাতে চিলিম তদারক করছে তখন। আর আসতো কত বাবু! সারাদিন ধরেই তো আড্ডা চলেছে নাচঘরে। নাচঘর তখন দিনরাতই গুলজার। বেলোয়ারি ঝাড় আসছে বিলেত থেকে। এই যে এখন দেখছেন দীপকের আলো—চোখে লাগে বটে, কিন্তু তার বাহারই ছিল আলাদা! একটা বেলোয়ারি ঝাড়ে সতেরোটা মোমবাতি আমি তো নিজের হাতে জ্বালিয়েছি—সে-আলো আর এ-আলো! বড়মাঠকরুণের হীরের চুড়ির ওপর সে আলো ঠিকরে পড়ে একেবারে নাচঘর ঝকমক করে উঠতো। পশ্চিম থেকে বাইজী আসতো, নান্নে বাঈ, জহরা বাঈ—কী সব নাম তাদের, আমরা গেলাস সাজিয়ে দিয়ে এসেছি আসরে—আমাদের এই চেহারাই খোলতাই হয়ে উঠতো সেই আলোর তলায়।

কাপড় কোঁচাতে কোঁচাতে বেণী হতাশা প্রকাশ করে। বলে—এই কাপড়ের ডাঁই ছিল মেজবাবুর। বাড়ির মধ্যে মেজবাবুই তো ছিল বাবু। কাপড়ের কি হিসেব ছিল তখন? আমরাই কত কাপড় দিয়ে দিয়েছি একে ওকে। ভৈরববাবুই কত কাপড় নিয়ে গিয়েছেন লুকিয়ে লুকিয়ে। আর

সেদিন মতিবাবু এসে বললেন—কই রে বেণী, কাপড়-চোপড় তো ছিঁড়ে এল সব—এবার আর না পেলে তো চলছে না। তা আমি বললাম—*আর সে দিনকাল নেই মতিবাবু, এখন গুণতির কাপড়* সব—বিধু সরকার গুণে হাতে তুলে দেয়, একটা হারালে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে—ছিঁড়ে গেলে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দেখাতে হবে—বড় কড়াকড়ি করে দিয়েছে খাজাঞ্চিবাবু।

—তা এমন কেন হলো বেণী?

বেণী তখন পাটির ওপর উপুড় হয়ে বসেছে। কোঁচানো কাপড়ের একটা দিক পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে আর একটা দিকের ওপর ফর ফর করে গিলে চালাচ্ছে।

একটু থেমে বলে—কী জানি কেন এমন হলো শালাবাবু। এতবড় বিয়ে গেল ছুটুকবাবুর, তা এ-বাড়ির কাজকম্মে আগে দেখেছি মিষ্টির ছড়াছড়ি চলেছে—কাগে পক্ষীতে খেয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেনি, শেষে রাস্তায় পাহাড় হয়ে যেতো মিষ্টি তরকারির—আর এবার দেখুন তো—বিয়ে হলো শুক্কুরবার আর সোমবারের মধ্যে সব ভোঁ ভোঁ—কেউ কিছু দেখতে পেলে না। প্রত্যেকবার একটা করে ধুতি আর একখানা করে গামছা বরাদ্দ থাকতো—এবার গামছার মুখ পর্যন্ত দেখা গেল না, ভাবলাম ফুলশয্যার দিন পাবো—তা কোথায় কী!

সত্যি সত্যি ভূতনাথেরও যেন কেমন অবাক লাগছিল। ক'বছরের মধ্যেই যেন কত কী বদলে গেল সব। কতদিন থেকে বংশীর মুখে শোনা গিয়েছে, বাবুরা হাওয়া-গাড়ি কিনবে। ছোটবাবু তো চুনীদাসীকে কিনেই দিলে একটা গাড়ি। তা সে হয়তো চুনীদাসীর পীড়াপীড়িতেই। কিন্তু বাড়ির জন্যেও তো দরকার। শেঠ, শীল, মল্লিকদের বাড়ি-গাড়ি উঠেছে। ছেনি দত্তও মরবার আগে গাড়ি চড়ে গিয়েছে।

একদিন গাড়ি এসেও ছিল একটা। ভূতনাথ তখন খেয়ে উঠেছে সবে। খেতে একটু দেরিই হয়েছে সেদিন। ভেতরবাড়ি থেকে ভাত আসতেই দেরি হলো।

বংশী বললে—আজ রান্নাবাড়িতে কেলেঙ্কারি হয়ে গিয়েছে শালাবাবু, তাই এত দেরি হলো—আঁশ নিরামিষ একাকার হয়ে গিয়েছে সব।

—সে কি?

—আজ্ঞে, বিধবাদের ভাত চড়ে সকাল-সকাল, সেজখুড়ী নিজে নিরিমিষ চড়ায়, বড়মা ছুঁচিবাই মানুষ, একটু সকাল-সকাল খেয়ে নেয় কিনা—কিন্তু আঁশের হেঁসেলের হাতা বেড়ি সব নিরিমিষের ঘরে দিয়ে এসেছে সদু। রাত থাকতে বাসনমাজার লোক আসে কিনা, তারা ঘষ ঘষ করে বাসন মেজে রেখে গিয়েছে রোয়াকে, তাড়াতাড়িতে আর বাসনের কুঠরিতে রাখেনি, সদুর কাছে বাসন চেয়েছে সেজখুড়ী, সদু আর অত চোখ মেলে দেখেনি, সেই আঁশের বাসনই তুলে দিয়ে এসেছে নিরিমিষের ঘরে। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গিয়েছে, তখন দেখে ফেলেছে রাঙাঠাকমা, তার তো নজর সব দিকে, সব্বোনাশ কাণ্ড—রাঙাঠাকমা চিৎকার করে উঠলো। বলে—ফ্যাল বাতাসী, ফেলে দে—ও ছিষ্টি আঁশ হয়ে গেল হেঁসেলের—তা তখন ধরুন অড়র ডাল, বড়ি-শাকের ঘণ্ট, সুক্ত, চালতার অম্বল, সব রান্না হয়ে গিয়েছে। রাঙাঠাকমা জিজ্ঞেস করলে—কে বাসুন তুলেছে নিরিমিষ হেঁসেলে? খোঁজ, খোঁজ—সদু বলতে চায় না নিজের নাম।

তা সেই নিরিমিষ আঁশ সব আবার নতুন করে রান্না হলো কিনা—তাই এত দেরি।

তখন খাওয়াও ভালো করে শেষ হয়নি। নীচ থেকে ভোঁ ভোঁ করে আওয়াজ এল। একেবারে উঠোনের ওপর থেকে শব্দ আসছে।

বংশী দৌড়ে গেল—ওই হাওয়া-গাড়ি এসেছে মেজবাবুর।

ভূতনাথও দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালো উঠোনে। চক চক করছে চেহারা। আগাগোড়া লোহার। শুধু ছাদটা মোটা কাপড়ের—আর চাকা চারটে রবারের। রবারের বেলুনের মতো একটা জিনিস টেপে আর ভোঁ ভোঁ করে শব্দ হয়। সাড়া পেয়ে দৌড়ে এল সবাই। দাসু জমাদারের ছেলেমেয়েরা এসে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে।

ইব্রাহিম ছাদের ওপর টুলে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলো। সে-ও দেখলে। চোখ দুটো তার যেন

জ্বলছে। বংশী বললে—ওই দেখুন শালাবাবু, ইব্রাহিমের গা জ্বালা করছে—দেখুন—জ্বলছে।

—কেন, ওর রাগ কীসের?

—আজ্ঞে, এবার হাওয়া-গাড়ি এল, এর পর আর কে ওর ঘোড়ার গাড়িতে চড়বে, বলুন।

লোচন তামাকের বোয়েম ফেলে এসেছে। মধুসূদন তোষাখানা ছেড়ে দেখতে এসেছে। শ্যামসুন্দর ভিস্তিখানার জল তোলা থামিয়ে দেখতে এল এক ফাঁকে। খাজাঞ্চিখানা থেকে বিধু সরকারই শুধু আসেনি। দোতলার বারান্দা থেকে ঝি-এর দলও ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে দেখছে।

তারপর এল মেজবাবু।

মেজবাবু আসতেই সাহেব নামলো উঠোনে। তারপর কথা হলো দু'জনে। গাড়িটাকে আগা-পাশ্-তলা দেখানো হলো। দু'জনে কী সব কথাও হলো ইংরেজীতে।

মেজবাবু বললেন—ভেরি গুড্—অন্য কথার সব কিছু বোঝা গেল না। কথার শেষে মেজবাবু সাহেবকে নাচঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

কিন্তু হাওয়া-গাড়িখানা বার বার দেখেও যেন তৃপ্তি হয় না কারো। গাড়ি তো অনেকেই কিনেছে। কলকাতার রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু এখানা যেন সকলের চেয়ে সেরা। মেজবাবু বলেছিল—কলকাতায় যত গাড়ি আছে—সকলের চেয়ে ভালো হওয়া চাই আমারটা।

তা টেক্কা দেওয়ার মতো জিনিসই বটে।

শ্যামসুন্দর অবাক হয়ে দেখছিল। এতক্ষণ কিছু কথা বলেনি। হঠাৎ বললে—চালাবে কে?

কে যেন পাশ থেকে বললে—কেন, ইব্রাহিম।

কে বললে কথাটা? কে এমন বোকা রে! যে বলেছে সে মাথা ঢাকা দিয়েছে। এমন বোকামির কথা কে আর বলতে পারে! ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম তখনও তার বাবড়ি চুল আঁচড়াচ্ছে। কথাটা বুঝি কানে গেল তার।

—ও ইব্রাহিম মিয়া কী বলছে, শুনলে?

ইব্রাহিমের কান দুটো আরো লাল হয়ে উঠলো। ইয়াসিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুলের কেয়ারি করে দিচ্ছিলো।

ইব্রাহিম শুধু মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে আয়নাতে মুখ দেখতে লাগলো একবার। মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো—বেওকুফ্।

বেওকুফের মতোই কথাটা বটে। সমস্ত দুনিয়াটাই বেওকুফে ভরা। অন্তত ইব্রাহিমের ধারণা তাই। যোধপুরের নেটিভ রাজার ঘোড়সওয়ার ছিল ইব্রাহিমের চাচা। ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা তার। সোনা-চাঁদির কাজ করা প্লেট কুর্তার বুকে আর আস্তিনে লাগানো। মহারাজার ছিল পোলো খেলার সখ। সে-ই দু'শ' ঘোড়ার তদারক। একবার চাচার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল মহারাজার দলের ভেতর। এখানকার লাটসাহেবের বাড়ি, গঙ্গাতীর আর কেল্লা দেখে যখন সবাই চলে যাবার মতলব করছে, সেই সময় চাকরির কথা হলো এখানে। এই মেজবাবুর কাছে। মেজবাবু তখন সবে নতুন ওয়েলার জোড়া কিনেছে। তারপর বেশ সুখেই দিন কেটেছে। মেজবাবুকে নিয়ে গিয়েছে বাগানবাড়ি, খড়দা'র রামলীলার মেলায়। নানা উৎসবে আমোদে মেজবাবুকে সেবা করেছে। আর এখন?

মোটরটা যখন ঘড়ঘড় শব্দ করে নড়ে ওঠে, ইব্রাহিম ঘর থেকে চুপি চুপি উঠে আসে। নিঃশব্দে দোতলার ছাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে। চোখ দুটো দেখতে দেখতে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। শিকারের দিকে চেয়ে বন্য জানোয়ারের চোখও বুঝি এত নিষ্ঠুর হতে জানে না। মুখ দিয়ে নিশ্চয় কিছু শব্দ বেরোয়। অস্ফুট শব্দ। হয়তো ওই নিষ্প্রাণ হাওয়া-গাড়িটাকেই লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় গালাগালি দেয়—বেওকুফ্।

কিন্তু ইব্রাহিমের সে-গালাগাল বিংশ শতাব্দীকে এতটুকু চঞ্চল করতে পারে না। হাওয়া-গাড়ি জাহাজ ভর্তি হয়ে চালান আসে চাঁদপাল ঘাটে। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে রেলি ব্রাদার্সের কাপড় চালান আসে। আসে কলের গান, আলুর পুতুল, স্টিম ইঞ্জিন, কল-কব্জা, ছোট বড় মাঝারি। তার সঙ্গে এল

বিলিতি আলতা, সাবান, এসেন্স, মাথার ফুলেল তেল, চুলের কাঁটা, রেশমি ফিতে, ঝাড়-লণ্ঠন আর বিলিতি মদ। বেঁটে, লম্বা, চ্যাপ্টা, গোল—নানা আকারের বোতলে ভরা।

কিন্তু তাক লেগে গেল ননীলালের মোটরগাড়িখানা দেখে। সকলের সেরা গাড়ি। যেমন লম্বা, তেমনি চকচকে, তেমনি আওয়াজ। বরারের বেলুনটা টিপলে ভারি চমৎকার একরকম শব্দ হয়। সে-শব্দ শুনে ঘোড়াগুলো তেমনি করে ক্ষেপে ওঠে না। সমস্ত বাড়িটায় প্রতিধ্বনি ওঠে না। মৃদু মন্থর একটু উত্তেজনা হয় শুধু। যেন গাড়িটার কাছে দাঁড়ালে বেশ সুগন্ধ বেরোয় একটা। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয়, গন্ধটা গাড়ির তেলের, না ননীলালের জামা-কাপড়ের, না ননীলালের সিগারেটের? ও তিনটে গন্ধই চেনা। তবু যেন গন্ধটা নতুন ঠেকে ননীলালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে।

সেদিন হাবুল দত্তর পাথুরেঘাটার বাড়িতে ছুটুকবাবুর বিয়ের দিনে দেখা হয়েছিল ননীলালের সঙ্গে। সে না-দেখা হওয়ারই সামিল। বৃন্দাবনের সঙ্গে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডোবার ধারে অতক্ষণ কথা বলার পর যখন বিয়েবাড়িতে আবার ঢুকেছে তখন ননীলাল বিদায় নিচ্ছে। সবাই ননীলালকে পেড়াপীড়ি করছে খাওয়ার জন্যে আর ননীলাল হাতজোড় করে আপত্তি জানাচ্ছে।

আরও আশ্চর্যের কথা, হাবুল দত্ত—ছুটুকবাবুর শ্বশুর—নিজে বলছে—ননীবাবু, এ কী রকম হলো—আপনি কিছু মুখে দিলেন না?

ননীলাল বলছে—এই তো বরানগর থেকে খেয়ে আসছি, এর পর আবার কলুটোলায় একটা নেমন্তন্ন—মানুষের শরীর তো।

কে যেন বললেন—আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে এ-বাড়িতে এতেই কিতাথ হয়েছে পাথুরেঘাটা।

ননীলাল চুপ করে রইল।

—নতুন মিলটা কবে চালু করছেন? বাজার থেকে শেয়ারগুলো সব হু হু করে উড়ে গেল সেবার। এবার যেন মনে থাকে স্যার আমাদের কথা।

ননীলাল সিগারেটে টান দিলে। গাড়ির পা-দানিতে একটা পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়ালো। ভিড়ের পেছনের সারিতে দাঁড়িয়েও ভূতনাথ দেখলে ননীলালের বিলিতি কোট-প্যান্টের ভাঁজগুলো কী তীক্ষ্ণ, কী স্পষ্ট! মনে হলো, ছুটুকবাবুর মলমলের গিলে করা পাঞ্জাবীর চেয়েও যেন দামী পোষাক ননীলালের। এমনকি ছুটুকবাবুর মখমল-সার্টিনের বরের পোষাকের চেয়েও যেন জমকালো! গাড়ির ভেতরে আরো দু'জন কারা বসে আছে। খুব ফরসা চেহারা। দেখে মনে হয় সব সাহেব।

ননীলাল একবার সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলো—তা হলে আসি এখন মিস্টার...

হাবুল দত্ত সামনে হাত জোড় করে এগিয়ে গিয়ে বললে—কড়েয়ার নতুন বিল্ডিং-এর কনট্রাক্টটা তা হলে যে রকম দেখছি—

—ওঃ, নো ফিয়ার—আমি তো আছি।

হাবুল দত্ত বললে—আপনি তো কিছু জলগ্রহণ করলেন না—ভয় হচ্ছে বড্ড—

—করবো, করবো, আপনার জামাই ছুটুক তো আমার ফ্রেন্ড। এক ক্লাশে পড়েছি আমরা—এখন তো আত্মীয় হয়ে গেলাম। এবার থেকে না বলতে পারবো না আর..

হো হো করে বিলিতি কায়দায় হেসে ননীলাল গাড়িতে গিয়ে বসলো এবার।

সেই শেষ দেখা। সেদিন ভিড়ের মধ্যে থেকে সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছিল একবার। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ননীলাল তখন ব্যস্ত। শুধু গাড়িটা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিয়েবাড়ির সমস্ত গন্ধ ছাপিয়ে আর একটা গন্ধ তীব্র হয়ে নাকে এসে লেগেছিল। হয় মোটর গাড়ির তেলের, নয় সিগারেটের, নয় তো ননীলালের পোশাক-পরিচ্ছদের। কিছুই ঠিক করে বলা যায়নি।

কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। আদ্যোপান্ত ননীলালের সমস্ত ইতিহাসটা যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সেই ননীলাল। গঞ্জের স্কুলের বড় ডাক্তারের ফুটফুটে ছেলেটা! কী যে মোহ ছিল ওপ ওপর! সেই ভূতনাথের জীবনের প্রথম চিঠিটা তো ননীলালেরই লেখা। এখনও টিনের বাক্সটা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। লিখেছিল—'বড় চমৎকার শহর এই কলিকাতা। কী যে সুন্দর দেশ বলিতে পারিব না'। কই ভূতনাথের চোখে তো সে-সৌন্দর্য এখনও ধরা পড়লো না। তারপর সেই যেদিন স্বামীজি কলকাতায় এলেন—ননীলালের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। স্বামিজীকে বলেছিল—বুজরুকি। তারপর ছুটুকবাবুর কাছে শোনা মতিয়া বিবির বাড়ির গল্প। সেই গান—'জখমী দিল্‌কো না মেরে দুখায়া করো'— সেই শিব্‌ঠাকুরের গলির বিন্দীর কথা। কলেজের দরজার ওপর থেকে 'God is good' কেটে দিয়ে 'God is money' লিখে দেওয়া। আর আজ অন্য এক মূর্তি।

ছুটুকবাবু বলেছিল—একদিন আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল ননী, আজ আর তার কাছ থেকে টাকাটা ফেরত চাইতেই লজ্জা করবে। ছুটুকবাবু আরো বলে—এই ননীই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে ভূতনাথবাবু, কী টাকাটাই না নষ্ট করেছি বন্ধবান্ধবদের পেছনে। এক-একজনের জন্যে এক-একটা দামি বোতল আনিয়ে রেখেছি, যার যা দরকার হয়েছে আমিই যুগিয়েছি টাকা, কোথাও গিয়েছি একসঙ্গে তো সমস্ত খরচা আমার, পান সিগারেট থেকে শুরু করে সমস্ত—আমার স্বার্থ কী? না তারা আমার সঙ্গে আড্ডা দেবে। আমাকে ঘিরে থাকবে চারপাশে দিনরাত—এই আমার লাভ। ছুটুকবাবু আবার বলে—অথচ আজ সাহেব-মেমরা পর্যন্ত খাতির করে চলে ননীকে—একটা ব্যাঙ্কও করলে সেদিন, তিনটে জুট মিল, ছ'টা কোলিয়াবির শেয়ার কিনেছে, রাতকে একেবারে দিন বানিয়ে ছাড়লে, বাহাদুর ছেলে বটে—তাব ওপর আবার ওই শাঁসালো শ্বশুর, আর রূপসী বউ—অথচ একদিন শেষের দিকে এমন হয়েছিল ওর—জামা করতে দিয়েছে বিলিতি দোকানে, ছাড়িয়ে আনবার পয়সা নেই—এই আমিই দিয়েছি টাকা সেদিন।

ছুটুকবাবুর বৌভাতের দিন সেই ননীলালকে আরো ভালো করে দেখবার সুযোগ হয়ে গেল। পেছন থেকে মৃদুস্বরে ডাকলো—ননী।

শেঠ, শীল, লাহা, মল্লিকরা সবাই যার-যাব গাড়ি নিয়ে এসেছে। আতর, গোলাপজল, ফুলের মালা, তামাক সিগারেটের ছড়াছড়ি। লক্ষ্ণৌ থেকে বহমতউল্লা এসে তিন দিন ধরে তোড়ি, ভোঁরো, দরবারি-কানাড়া যত সব ওস্তাদী রাগ বাজিয়ে চলেছে। বড়বাড়ির ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্যের আড়ম্বর কোথাও যেন হানি না হয়।

সুখচর থেকে খোদ নায়েব সেলামি পাঠিয়েছে এবার মোটারকম। এবার বিধু সরকার নিজে চলে গিয়েছিল কাছারি-বাড়িতে মেজবাবুর নিজের হাতের লেখা চিঠি নিয়ে। সেবাব বড়কর্তার শ্রাদ্ধের কাজে ফাঁকি দিয়েছিল মালোপাড়ার প্রজাবা। ১৮৩৩ সালের ঝড়-বৃষ্টিতে যখন ঘরবাড়ি ক্ষেত-খামার জমি-জিরেত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, প্রজাদের দু'সালেব খাজনা মুকুব করা হয়েছিল। সে-কথা মনে আছে তো! ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময় প্রজারা এসে জমিদাববাড়ি থেকে ধান মেপে মেপে নিয়ে গিয়েছে, সে তো আর জমা হয়নি সেবেস্তাব খাতায়। তোমাদের মনে না থাকে মনে আছে সমাজের মাতব্বরদের। সব লেখা আছে খাজাঞ্চিখানার পুরনো রেকর্ডে। দরকার হলে বিধু সরকার সব বার করে শুনিয়ে দিতে পারে। এবার বেগার পাঠাতে হবে গাঁ পিছু একজন করে। আর মাথা পিছু আট গণ্ডা পয়সা নজরানা। বিধু সরকার এই নিয়ম করে দিয়েছিল। না দিলে পরের সনের প্রজা বিলির সময় দেখা যাবে।

এবার তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল সুখচরের চৌধুরীবাবুদের কাছারি-বাড়িতে।

বিধু সরকারের সঙ্গে গিয়েছিল মধুসূদন। তল্পী-তল্পার হিসেব রাখতে হবে। বোকা মাল নিয়ে গেলে চলবে না। আদায়-পত্তোর কি যাকে তাকে দিয়ে হয়? বাবুরা না হয় যান না, তাঁদেব সময় কোথায়? কিন্তু প্রজারা হলো জাত-বদমাইশ। হাজার থাকুক, কাছারিতে এসে কান্নাকাটি করা তাদের

স্বভাব। এমন-এমন বদলোকও আছে যারা পেয়াদা পাঠালে কথাই বলে না। বলে—যাও যাও পেয়াদার পো, আমরা পাচ্ছিনে খেতে—জমিদার-পুত্তুরের বিয়েতে নজর পাঠাবো!

বিধু সরকার ফিরে এসে বললে—সে সুখচর আর নেই হুজুর, হুজুরের ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে সেবার বেটারা রাত জেগে ডোবার ধারে সারা রাত ব্যাং তাড়িয়েছিল—মনে আছে আপনার? আর সেই যেবার রাজাবাহাদুর গিয়েছিলেন দোলের সময়, মালোপাড়ার সর্দার নিজে এসে হুজুরের পা ধুইয়ে দিয়েছিল—শুনেছেন সব আপনি মেজবাবু—এখন বলে কিনা জমিদার হলো বাপের মতন, বিপদে আপদে না দেখলে তুমি আমার কিসের জমিদার—বাপও তেমন হলে তো খেতে দেয় না ছেলেরা।

কথাগুলো মেজবাবুর ভালো লাগেনি। ঠিক ছুটুকবাবুর বিয়ে না হলে ঘটনাটা অন্যরকমভাবে মোড় নিতো। কথাটা ছুটুকবাবুর কানেও গেল।

বাড়ি-বাড়ি নেমন্তন্ন করতে যাওয়ার সময় একটা করে ধুতি, আট পণ সুপুরী আর একথালা সন্দেশ—এই দেবার রীতি। চিরকার এমনি চলে আসছে। পুরনো খেরো খাতায় এর রেকর্ড আছে। রূপলাল ঠাকুরের কত পাওনা, দানসামগ্রী কত, চাকর-ঝিদের পাওনাগণ্ডা সমস্ত হিসেব বাঁধা ছক কাটা আছে।

কিন্তু এবার যেন একটু ত্রুটি হলো সব জিনিসে। একখানা ধুতি বা আট পণ সুপুরী গেল, একথালা করে সন্দেশও দেওয়া হলো আটশ' তিরানব্বুই ঘরে। কিন্তু সন্দেশ চিনির পাকের। ধুতিটা কিছু নিরেশ। সুপুরী কিছু পরিমাণ দাগী।

তা হোক, তবু সবাই এসেছে। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার জো নেই। রহমতউল্লা তোড়ির সুরে সমস্ত বৌবাজার কেন সমস্ত কলকাতাটা যেন মাতিয়ে তুললে। সে ক'দিন খেতে খেতে ঘুমোতে ঘুমোতে সর্বক্ষণ যেন নেশার ঘোর লেগে রইল। নহবৎ-এর সঙ্গে ডুগি তবলার সঙ্গত আর সঙ্গে খঞ্জনী। কাজে অকাজে যেন ভুল হতে লাগলো সবার। মেজবাবু ভুলে গেলেন মালোপাড়ার সর্দারের অপমান। অনুষ্ঠানের ত্রুটির কথা ভুলে গেল ছুটুকবাবু। সন্ধ্যেবেলা জম-জমাট হয়ে উঠলো বড়বাড়ি।

ভূতনাথ আবার পেছন থেকে ডাকলো—ননী—

ননীলালের তখন যাবার পালা। কনে দেখা হয়ে গিয়েছে। প্রকাণ্ড একটা হাজার বারোশ' টাকা দামের খোকা পুতুল উপহার দিয়েছে চূড়ামণির বৌকে। খোদ প্যারিস থেকে ননীলালের এক ব্যবসাদার মক্কেল পাঠিয়ে দিয়েছে।

ননীলাল গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে। এমন সময় ফাঁক বুঝে ভূতনাথ আবার ডাকলে—ননী—

—আরে ভূতো—কী খবর, চলে আয়—বলে হাত ধরে টেনে একেবারে গাড়িতে তুলে নিলে। বললে—কোথায় আছিস এখন?

—কেন, এখেনে, এই বড়বাড়িতে।

—কী করছিস?

—কিছু না।

গাড়ি তখন বনমালী সরকার লেন দিয়ে চলতে শুরু করেছে। ননীলালের নতুন মোটর। এই-ই ভূতনাথের প্রথম মোটরগাড়ি চড়া। কেমন অনায়াসে এতখানি পথ চলেছে। তেমন ঝাঁকানি নেই। আরামে গা এলিয়ে দিলে ভূতনাথ।

হঠাৎ ননীলালই প্রথম কথা বললে—চূড়োর বৌ কেমন দেখলি?

—খুব ভালো, ওরা তো রূপ দেখেই বিয়ে করে।

—কিন্তু বড্ড ছোট, বয়স বোধ হয় দশ বছরের বেশি হবে না—ওকে নিয়ে চূড়ো কি করবে?

ভূতনাথ বললে—ওদের বাড়ির যে নিয়মই ওই—তারপর খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। খানিক

পরে বললে—আমি আর কতদূর যাবো, এখানে নামি।

—কেন, চল্ আমার বাড়িতে পটলডাঙ্গায়।

—এত রাত্রে ফিরে আসবো আবার কী করে?

—সে জন্যে তোর ভাবনা নেই, আমার বাড়িটা চিনে রাখ—তা এখন কী করছিস?

—বললুম তো, কিছু না।

—চাকরি করবি?

—কে দেবে চাকরি?

—আমি দেবো—আমার ব্যাঙ্কে এত লোক নিচ্ছি।

—আমি কি পাববো?

—কাজ তো তেমন শক্ত নয়—যাদের টাকা আছে, তারা এসে টাকা জমা রাখবে আমার ব্যাঙ্কে, সুদ পাবে—আর যদি তুই কারো টাকা আনতে পারিস, তার জন্যেও কমিশন পাবি। টাকা খাটানোর ভার আমার—ধর, এমন লোক যদি কেউ থাকে তোর জানাশোনা যার অনেক টাকা আছে, আমার ব্যাঙ্কে রাখলে সে সুদ পাবে—টাকাও সেফ রইল—যখন ইচ্ছে তুলে নিতে পারবে।

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো ননীলাল। ভূতনাথ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যায়। টাকা নাকি ছড়ানো আছে পৃথিবীতে, শুধু নিতে জানলেই হয়। কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখে ননীলাল। ননীলাল বলে—টাকা হলো আমার ধ্যান। দুনিয়ায় টাকা না থাকলে কিছুই নেই। এই মূল সত্যটি জানতে হবে। শুধু জানলে চলবে না, বিশ্বাস করলেও চলবে না, ধ্যান করতে হবে। জীবনের যা-কিছু কাম্য অর্থাৎ যশ, খ্যাতি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ভোগ, স্ত্রী, পরিবার, প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা—সকলের মূলে হলো টাকা! এই যে এখন টাকা হয়েছে—তাই সবাই খাতির করে। এমন কোনো কাজ নেই এমন কোনো দুষ্কর্ম নেই যা করিনি আমি, কিন্তু আমি ডুবে যাইনি তা বলে। মদ খেয়েছি, এখনও খাই, বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে ভাব করেছি, আড্ডা দিয়েছি, দেনা করা টাকা দু'হাতে উড়িয়েছি, কী জন্যে? না, আরো টাকা পাবার জন্যে! আমি বিয়ে করেছি রূপ দেখে নয় শুধু, টাকা দেখেও! রূপও চাই টাকাও চাই। তাই তো চূড়োকে বলেছিলুম—

—ছুটুকবাবু কত টাকা পেয়েছে?

—কিছুই পায়নি, একটা পয়সা না, তা ছাড়া হাবুল দত্ত টাকা পাবে কোত্থেকে? আমার কাছে তো দু'বেলা ছুটোছুটি করে টাকার জন্যে। ওর হাঁড়ির খবর আমি জানি, আমি কাজ দিলে তবে তো ও পাবে—আমার টাকা নিয়েই তো ও বড়লোক।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—হাবুল দত্তকে টাকা দিয়ে তোর লাভ?

—আরে, আমি কি আমার টাকা দেবো? রামের টাকা শ্যামকে দেবো আবার যদুর টাকা রামকে দেবো—আমার কিছুই না, মাঝখান থেকে আমি খাবো লাভ—এই যে এত লোককে আমি মাইনে দিই, আমি কি আমার পকেট থেকে দিই, দিই রাম, শ্যাম, যদুর টাকা।

অত কথা বুঝতে পারে না ভূতনাথ। জিজ্ঞেস করলে—এখন কোথায় যাচ্ছিস?

—এখন আর কোথাও যাবো না, সোজা বাড়ি, সারাদিন খাওয়া হয়নি আজ।

—বড়বাড়িতে খাসনি কিছু?

—খেতে ওরা বলছিল খুব, কিন্তু পেটে আর জায়গা নেই। সারা বিকেলটা শুধু মদ খেয়েছি।

—মদ! কেন মদ খেয়ে টাকা নষ্ট করিস?

ননীলাল হো হো করে হেসে উঠলো—তুই এখনও মানুষ হলি না, আরে মদ খেয়ে যারা টাকা ওড়ায় তারা ওই চূড়োমণি গোবরমণির দল—আমি মদ খেলে টাকা পাই!

—সে কী রকম?

ননীলাল বললে—তোকে আর একদিন বোঝাবো, এমন লোক আছে কলকাতায় যাদের সঙ্গে মদ খেলে তারা টাকা দেবে আমাকে। আমি কথা বললেই তারা কৃতার্থ—এই যে এত কারবার চালাচ্ছি, এর একটা পয়সা পর্যন্ত আমার নয়, সব পরের টাকা—বিশ্বাস করবি?

ভূতনাথের কাছে বিশ্বাস না হবার মতোই কথা। এ কোন্ কলকাতার কথা বলছে ননীলাল। স্বামীজির যখন সম্বর্ধনা হয়েছিল বাগবাজারে, সে-সভার খরচ পর্যন্ত ওঠেনি। এমনি টাকার অভাব হয়েছিল। সে-খবর ব্রজরাখালের কাছে শুনেছিল ভূতনাথ। বন্যা কি দুর্ভিক্ষের সময় গান গেয়ে লোকেরা চাল, কাপড়, পয়সা চেয়ে বেড়ায়। কেউ দেয় না। টাকার অভাবে কত ভালো কাজ হতে পারছে না দেশে। নইলে স্বামীজির একটা মূর্তি তৈরি করে রাখা হতো কলকাতার একটা বড় রাস্তার মোড়ে। ব্রজরাখাল কতদিন সে কথা বলেছে। সুবিনয়বাবু অবশ্য ব্রাহ্মসমাজে টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু সুবিনয়বাবুর মতো লোকই বা ক'জন আছেন? টাকার অভাবে চিকিৎসার জন্যে কত ফুলদাসীর মতো মেয়েমানুষ কলেরায় মারা যাচ্ছে। নিবারণদের দল টাকা পেলে কত কী করতে পারতো। জার্মানী থেকে রিভলবার, বন্দুক, বোমা আসতো। গরীব-দুঃখীদের জন্যে অন্তত একটা হাসপাতালও হতো! অথচ ননীলালের কাছে টাকাটা একটা সমস্যাই নয়।

ননীলাল বলে—টাকা পাওয়া সহজ—টাকাটা খাটানোই হলো শক্ত, টাকার বাচ্চা হয় জানিস—সেই বাচ্চা পাড়ানোই হলো শক্ত কাজ।

ভূতনাথ বললে—আমার নিজের পাঁচশ' টাকা আছে।

কথাটা শুনে ননীলালের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না কিন্তু। শুধু বললে পাঁচশ'—

—হ্যাঁ, পাঁচশ'।

ননীলাল এবারও কোনো মন্তব্য করলে না। ভূতনাথ মনে মনে হিসেব করতে লাগলো—পাঁচশ' টাকা যদি ননীলালের ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়া যায় তো বছরে পাঁচ বারোং ষাট টাকা সুদ আসে। জবার বিয়েতে একটা কিছু দেবে বলেই ছোটবৌঠানের কাছে রেখে দিয়েছে টাকাটা। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন ব্যাঙ্কে থাকলে কিছু সুদও আসে।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আর একজনের কাছে কিন্তু অনেক টাকা আছে—লক্ষ লক্ষ টাকা।

এবার ননীলালের বেশ আগ্রহ দেখা গেল। গাড়ির বাইরে পোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কার কাছে?

একটা আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা আবার সোজা চলতে লাগলো।

ভূতনাথ বললে—আর অত টাকা তাঁর শুধু পড়েই আছে, কোনো কাজে লাগছে না—অবশ্য ছুটুকবাবুদের মতো নয়.. তা ছুটুকবাবুরা টাকা রাখেনি তোর ব্যাঙ্কে?

ননীলালের গলায় কেমন তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো। বললে—ওদের ওই বাইরেই যা চাল-চলন—নগদ টাকা নেই—সে আমি জানি—চারদিকে দেনা।

—সেদিন তো মেজবাবু গাড়ি কিনলে।

—ওই কোঁচানো ধুতি, ওই ঝি-চাকর আর গাড়ি-ঘোড়া থাকলেই বড়লোক হয় না, আজকাল বড়লোকের ইয়ে বদলে গিয়েছে। ওদের আছে জমি, জমিদারি যদ্দিন তদ্দিন বড়মানুষি—তাও প্রজারা খাজনা না দিতে পারলেই ব্যাস্—সেদিন যে একটা ঘোড়া মরে গেল, এখনও কিনতে পারলে না—এদিকে মেয়েমানুষের নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে কেবল, পায়রার লড়াই হচ্ছে—এ-সব শুধু চাল দেখানো।

ভূতনাথ খানিক চুপ করে থেকে বললে—যার কথা বলছিলাম, তার কিন্তু অনেক টাকা—রাখবি তোর ব্যাঙ্কে?

—কে সে?

—সুবিনয়বাবু, আমি যেখানে চাকরি করতুম, ওই 'মোহিনী-সিঁদুরে'র মালিক। তিনি সব টাকা দান করে দিচ্ছেন, যদি তুই বলিস গিয়ে রাখতেও পারেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গেও আমার জানা শোনা হয়েছে—জবাকে ধরলেও হয়—

—জবা?

—হ্যাঁ, ব্রাহ্ম হলে কী হবে, সুবিনয়বাবুর বাবা হিন্দু ছিলেন কিনা, ওই নাম রেখেছিলেন—মেয়েটি খুব ভালো, চিনিস নাকি?

—কী রকম চেহারা বল্ তো?

ভূতনাথ বললে—চেহারাটা খুব ভালো—তার ওপর ব্রাহ্ম তো, লম্বা হাতা জামা পরে, ভেলভেটের কলার লাগানো জামা, চুলটা বিনুনি করে ঝুলিয়ে দেয়, ছুটুকবাবুর কাকীদের দেখেছিস তো, ওদের রূপ অন্য রকম—আর জবাকে দেখতে আলাদা একেবারে।

ননীলাল খানিকটা ভেবে জিজ্ঞেস করলে—ব্রাহ্ম?

—হ্যাঁ, ব্রাহ্ম।

—ব্রাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে এককালে খুব মিশেছি, চিনি বলে মনে হচ্ছে—খুব জেদী মেয়ে, না রে—

ভূতনাথ বললে—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, খুব জেদী, কিছুতেই ভাঙবে না।

—তবে চল্ একদিন—

ভূতনাথ বললে—সুবিনয়বাবু এখন অসুস্থ—মাঝখানে তো খুবই খারাপ অবস্থা গিয়েছিল—শুনছি এখন ভালো আছেন। আমি আগে দেখে আসি একদিন একলা গিয়ে কেমন আছেন, তারপর বরং তোকে নিয়ে যাবো। ততক্ষণে গাড়ি পটলডাঙার ধারে এসে গিয়েছে। গাড়ি বাড়ির কাছে আসতেই একটা বিরাট কুকুর চিৎকার জুড়ে দিলে।

গাড়ি থেকে নেমে ননীলাল কুকুরটাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাকলে—বদরি—

ননীলাল চলে যাচ্ছিলো। ভূতনাথ ডাকলে—ননী—

ননীলাল কুকুরটাকে বুকে নিয়ে মুখ ফেরালে—কিছু বলবি?

—তোর সেই বিন্দী, বিন্দীর কাছে আর যাস না?

ননীলালের মনে পড়লো—ও-ও-ও—মনে পড়েছে—না, এখন তাকে ছেড়ে দিয়েছি—এখন আছে মিসেস গ্রিয়ারসন।

—মিসেস গ্রিয়ারসন, সে কে?

—আমার পার্টনারের বউ।

পায়রা ওড়ানো শেষ হতে প্রায় দশটা বেজে গেল। মেজবাবু যখন নীচে নেমে এলেন তখন রাস্তায় আরো ভিড় জমেছে। দারোগা সাহেব বিধু সরকারের ঘরে বসে বসে তখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে দেয়ালের চারদিকে চেয়ে দেখছে। গোটাকতক ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো এ ঘরে। হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে উড়ে চলেছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে। রাবণরাজা ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে এসে সীতার কাছে ভিক্ষে চাইছে। এমনি আরো সব। সাহেব কিছু বুঝলে কি না কে জানে।

অধৈর্য হয়ে একবার সাহেব বললে—মেজবাবুকে বোলাও।

বিধু সরকার চশমা তুলে বললে—আর একটু বসুন হুজুর—এইবার আসবার সময় হলো, এই দশটা বাজলো এবার।

—কী করছে বাবুসাহেব এতক্ষণ?

—পায়রা ওড়াচ্ছেন হুজুর—পিজিয়ন্!

সাহেব কী বুঝলো কে জানে। লাঠিটা একবার ঠুকে বসে পড়লো তক্তপোশে। বললে—ড্যাম ইট—

কিছু বলাও যায় না। পুজোর সময় বড়বাড়ি থেকে প্রতি বছর মোটা রকমের প্রসাদ বিতরণ হয় থানার লোকদের। বিয়ের ব্যাপারেও কাপড়, চোপড়, পোশাক-আশাক দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া পুলিশের লোকদের ওপর বরাবর বড়বাড়ির বিশেষ কৃপা আছে। সেকালের কর্তাদের আমল থেকে এ রেওয়াজ। পুজোর পুরনো খেরো খাতায় লিস্টির মধ্যে থানার দারোগার নাম আছে শ্রীযুক্ত মিস্টার উইলসন কার্লাইল ব্রেক। নাম লেখা আছে ব্রেক সাহেবের। কিন্তু ব্রেক সাহেব কবে চাকরি

থেকে বিদায় নিয়েছে। নিয়ে স্কটল্যান্ডের এক কবরের তলায় মাটি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও তার নামে খরচ লেখা হয়। ভূমিপতি চৌধুরীকে এই ব্লেক সাহেবই খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছিলেন। যে-রাত্রে ইটালিয়ান শিল্পী তার মেমসাহেবকে গুলী করে পালায়, সেই রাত্রেই থানার দারোগার কাছে পৌঁছে যায় পাঁচশ' এক গিনি। তারপর ব্লেক সাহেবের পর থানার ভার নিয়ে এসেছে টাউনসেন্ড সাহেব। তারও খাতির ছিল এ বাড়িতে। তারপর যেবার বৈদূর্যমণি চৌধুরী রাজাবাহাদুর হলেন, বড়লাটকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে চীনে-অর্কিড উপহার দেওয়া হলো, সেবার থানার চার্জে ছিল রবিনসন সাহেব। খানা-পিনার অর্ধেক যা বাঁচলো সেদিন সব গিয়েছিল রবিনসন সাহেবের বাড়িতে। খাঁটি সব বিলিতি মাল। তারপর হিরণ্যমণি চৌধুরীর বিয়ে গিয়েছে, কৌস্তুভমণির বিয়ে গিয়েছে, সব শেষে বিয়ে হয়েছে চূড়ামণির। পুলিশের সঙ্গে দোস্তি না রাখলে সেদিন ঠনঠনের ছেনি দত্তর শবদেহ নিয়ে একটা রক্তাক্ত কাণ্ড বেধে যেতো। ব্রিজ সিং বন্দুকটা সোজা করে ছুঁড়লেই দাঙ্গাটা জোর বেধে উঠতো। কিন্তু বাঁচালো দারোগা সাহেব।

যতবার সিধে গিয়েছে পুলিশ সাহেবের বাড়িতে, বিধু সরকার পুরনো খেরো খাতাটা পেড়ে নিয়ে ততবার লিখেছে—শ্রীযুক্ত মিস্টার উইলসন কার্লাইল ব্লেক সাহেবকে মিষ্টান্ন বিতরণ বাবদ. ।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভিস্তিখানায় আঁচাতে গিয়ে বংশীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনে হলো বড় যেন ব্যস্ত আজ বংশী। বংশীর তখনও স্নান হয়নি, তাড়াতাড়ি মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে সরে পড়বার মতলব। ভূতনাথকে দেখেই বংশী বললে—আজ কথা বলবার সময় নেই শালাবাবু—চললুম আজ্ঞে।

ভূতনাথ বললে—কাজ তোমার খুব বেড়েছে বংশী এদানি—সত্যি কথা।

কথাটা মিথ্যে নয়। যতদিন ছোটবাবু বাড়িতে থাকতো না, ততদিন বংশীরও বেশি কাজ ছিল না। গল্প করে কাটাতো এ-ঘর ও-ঘর। তোষাখানায় বসে তাস নিয়ে বিন্তি খেলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে মাঝে ফাই-ফরমাশ খেটেছে ছোটমা'র। আজকাল দেখাই হয় না শালাবাবুর সঙ্গে। ভূতনাথও চাকরির চেষ্টায় ঘুরছে কেবল। অনেক লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়েছে। ব্রজরাখালের পরিচয় সুবাদে যেখানে-যেখানে একটু সামান্য পরিচয় ছিল সব জায়গায় গিয়ে ধন্না দিয়েছে। সুবিনয়বাবুর নাম করে সমাজের কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও করেছে। সামান্য একটি চাকরি, যে-কোনো রকমের। যে-কোনো মাইনের। পাঁচ টাকা, ছ'টাকা, যা হয়। তারপর ডালহৌসি স্কোয়ারের বড় বড় হৌসগুলোতে দুপুরবেলা গিয়ে খোঁজ করেছে। নতুন আপিস হয়েছে সব এদিকে। র‍্যালি ব্রাদার্স, মালকম এণ্ড কোং, মার্টিন পিলার্স এণ্ড কোং, টার্নার ক্যাডোগান এণ্ড কোং। তারপর দেশী কোম্পানীও আছে। প্রেমচাঁদ কিলস্ এণ্ড কোং, দত্ত লিনজি এণ্ড কোং .

কেউ কেউ শুধু বক্তৃতা দিয়েই বিদায় দিয়েছে—মতি শীলের নাম শুনেছো হে ছোকরা, তোমার মতো গরিব অবস্থা থেকেই বড়লোক হয়েছিলেন—শুধু বসে বসে তাস খেললে তো চলবে না।

ভূতনাথ হয়তো মৃদু প্রতিবাদ করেছে—তাস খেলতেই জানি না স্যার তা—

—ওই দেখো, সামান্য তাস, ওই তাসের ব্যবসা করেই কত লোক লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে, আর তোমরা তাসটা খেলতে পর্যন্ত শিখলে না। মতি শীল বোতল আর কর্কের ব্যবসা করে কত পয়সা কামিয়েছেন, জানো সেকালে বিস্কুট চালান দিতেন অস্ট্রেলিয়ায় ওই মতি শীল। শুধু মতি শীল কেন, বিশ্বম্ভর সেন আট-দশ টাকা নিয়ে ব্যবসায়ে নেমে শেষে দু'লক্ষ পাউন্ড গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে—আর রাজা নবকেষ্ট—

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু উদাহরণ দেয় সবাই। উপদেশ দেয় সবাই। হুইলার সাহেবের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর, ফেয়ারলি সাহেবের দেওয়ান রামদুলাল দে, নুনের এজেন্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ান রামহরি বিশ্বাস, কলকাতার জমিদারী কাছারির দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র, রসদের ঠিকেদার গোকুলচাঁদ মিত্র, পামার কোম্পানীর খাজাঞ্চি গঙ্গানারায়ণ সরকার, নুনের কারবারি কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রফের ব্যবসায় মথুর সেন, হেস্টিংস-এর সরকার রামমোহন... ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র উদাহরণ।

ভূতনাথ বলে—শেষ পর্যন্ত দারোগা সাহেব কী বলে গেল বংশী?

—বলবে আবার কী মাথামুণ্ডু শালাবাবু, কাল সিধে যাবে সাহেবের কুঠিতে—চুকে যাবে ল্যাঠা। আমার ভাবনা শুধু চিন্তাকে নিয়ে—সোয়ামীকে খেয়েছে, এদিকে আবার খেটে খাবার যুগ্যিতা নেই—তার ওপর এই তো দেখছেন বড়বাড়ির হালচাল।

কৌতূহলটা আর চাপতে পারলে না ভূতনাথ। বললে—এ-সব কার কাজ বংশী?

—এ-কাণ্ড এই কি প্রথম দেখলেন শালাবাবু, মাঝখান থেকে শশীর চাকরি গেল শুধু-মধু পারা হয়েছে বলে—তা এদানি গিরির চেহারা কী হয়েছে দেখেছেন?

—গিরি?

—আজ্ঞে, মেজবাবু তো এই মারে আর সেই মারে, বলে—বার বার পারবো না ঠেকাতে। মেজমাও চেঁচিয়ে উঠলো। বললে—যত দোষ মেয়েমানুষের, আগে বাড়ির ছেলেকে সামলাও তোমার, আজ বাদে কাল যার বিয়ে হবে তার প্রবৃত্তির বলিহারি, তোমাদেরই তো শিক্ষা, তোমাদেরই তো রক্ত—কত আর ভালো হবে। মেজবাবু ধীর স্থির মানুষ, বেশি কিছু বলেন না—কিন্তু তারপর চুলোচুলি বাধলো বড়মা'তে আর মেজমা'তে।

ভূতনাথ বললে—কী রকম?

—বড়মা সাজঘরে গিয়েছিল, কানে গিয়েছে কথাটা—সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে এল। বললে—আমার ছেলের নামে তুই এই অপবাদ দিস মেজবৌ? আমার রূপে গুণে কার্তিক ছেলে, সে আর মেয়েলোক পেলে না! শহরে কি মেয়েলোক নেই, না খাজাঞ্চিখানার পয়সা কম পড়েছে, কত্তা বেঁচে থাকতে বাড়িতে নাচউলী আসেনি? খেমটাউলী আসেনি? না কত্তার নজরের কথা কেউ জানে না? কত্তা একরাতে লাখ ট্যাকা ওড়ায়নি? তোর বাপ পেরেছে তেমন ওড়াতে? তোর চৌদ্দপুরুষ পেরেছে?... আমার ছেলের নামে অপবাদ! সে আর মেয়েলোক পেলে না, নজর দিতে গেল তোর ঝি-এর ওপর!

—তারপর, নতুনবউ সব শুনলে তো?

বংশী বলে—সে এক কুরুক্ষেত্তোর কাণ্ড শালাবাবু, আপনি দেখতেন যদি, সিন্ধু তাড়াতাড়ি এসে ভিজে গামছাখানা বড়মা'র গায়ে ঢাকা দিলে—তাই একটু আব্রু হলো?

—আর নতুনবউ?

—ছুটুকবাবু ঘরের মধ্যেই ছিল, বাইরে বেরিয়ে এসে মাকে বললে—তুমি থামো মা, থামো তুমি.. সে অনেক কাণ্ড, পরে বলবো অখন, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই—চললুম আজ্ঞে।

—এত কাজ তোমার কিসের বংশী?

—না শালাবাবু, ছোটবাবু আজ আবার বেরোবেন আজ্ঞে। ছোটমা'র সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে। বলেই চলে যাচ্ছিলো বংশী। কিন্তু ভূতনাথ চেপে ধরলো। বললে—কোথায় যাবে ছোটবাবু আবার?

—আবার কোথায়, জানবাজারে।

—সে কি!

জানবাজারে! আবার সেই চুনীদাসীর কাছে! এতদিনের সব আয়োজন, সব সাধনা ব্যর্থ হলো বুঝি! কোথাও কোনো ত্রুটি হয়েছে নাকি! সাধনায় কোনো বাধা! ব্যাঘাত! এতদিন ছোটবাবু ঘর থেকে একদিনের জন্যেও বেরোয়নি। ছোটবাবুর ল্যাণ্ডো এ-ক'দিন আস্তাবলে আলসে হয়ে পড়েছিল। ঘোড়া দুটো কেবল খামোকা দানা খেয়েছে আর জিরিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুটিয়েছে। এত বড় বিয়ে গেল বাড়িতে, দু'-একবার ছাড়া ছায়াও দেখা যায়নি ছোটকর্তার। অন্দরমহলে কোথায় নিজের ঘরে বসে কী করেছে কেউ জানে না। বরযাত্রীর দলের মধ্যেও যায়নি সেদিন পাথুরেঘাটাতে।

অবাক শুধু ভূতনাথই হয়নি। আবাক হয়েছে বাড়িসুদ্ধ লোক। লোচন, মধুসূদন, শ্যামসুন্দর, বেণী, ঝি, ঝিয়ারী, বিধু সরকার। কেউ বাদ যায়নি। অবাক হয়েছে ইব্রাহিম কোচোয়ান, দাসু

জমাদার সবাই।

মেজবৌ মুখ টিপে হেসেছে—তুই কিছু তুকতাক করলি নাকি ছোটবৌ?

বিধবা বড়বৌও কথাটা শুনেছে সিন্ধুর কাছে—বলিস কি সিন্ধু এ-বংশে রাত্তিরে মাগের কাছে শোয়া এই প্রথম দেখলুম মা, বড়বাড়ির কর্তাদের নাম ডোবাবে ছোটবাবু এবার!

গিরির আজকাল আর সে-তেজ নেই। দুপ-দাপ সিঁড়ি লাফিয়ে তেতলায় উঠতে পারে না। গলা চড়িয়ে ঝগড়া করতে পারে না আর সৌদামিনীর সঙ্গে। কিন্তু সৌদামিনী তারকেশ্বরের প্রকাণ্ড বঁটিটা নিয়ে এঁচোড় কুটতে কুটতে নিজের মনেই ফোড়ন কাটে তেমনি—অমন ভাতারের নিকুচি করেছে মা, দিনরাত মাগের আঁচল ধরে পড়ে থাকে, এ কেমন ভাতার মা, ভোলার বাপ তাই বলতো—ফুলবৌ, চোখ থাকতে থাকতে তিভুবন চিনে নাও। তা ভোলার বাপ নিজেও মলো, আমাকেও মেরে রেখে গেল মা। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মরি...

ভাঁড়ার ঘরের পাশের কুঠুরিতে বসে যদুর মা একমনে হলুদ, লঙ্কা, ধনে বেটে চলে পাথরের শিল-নোড়া নিয়ে। হলুদের সোনালি জল নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠোনে পড়ে একাকার হয়ে যায়। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাটনা বাটতে বাটতে সব শোনে বুড়ী। বলে—কার কথা বলছিস লা সদু?

সৌদামিনী উত্তর না দিয়ে চুপ করে যায় হঠাৎ।

সেদিন গিরির একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেল ভূতনাথ। সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল গিরি। গজ গজ করছে আপন মনে—শতেক খোয়ারিরা চোখের মাথা খা, আমার দিকে নজর দিতে আসে, আমার গতর ভেঙেছে তো তোদের কি লা, তোদের কী সব্বনাশ করেছে গিরি, গতরখাকীদের গতরে পোকা পড়ুক—বলছি আমি গিয়ে মেজমা'র কাছে।

তারপর সামনে মাথা তুলে ভূতনাথকে দেখেই হঠাৎ এক-গলা ঘোমটা টেনে পাশে সরে দাঁড়ালো। এক পলকের দেখে নেওয়া। ঘোমটার ভেতর থেকেই গিরি তেমনি গজ গজ করতে লাগলো কোন্ অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে—মর হারামজাদিরা—আবাগীরা মরলে আমার হাড় জুড়োয়, কাঁধে করে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে আসি নিমতলায়, কলসী করে জল ঢালি তার চিতের ওপর, পিণ্ডি দিয়ে আসি গয়ায় গিয়ে—

এরই মধ্যে কিন্তু যেটুকু দেখা গেল, ভূতনাথের মনে হলো যেন পোড়া কাঠের মতো চেহারা হয়েছে গিরির। অথচ এই ক'দিনের মধ্যেই। এমন তো ছিল না। কিছুদিন আগেও গোলগাল ভারি মানুষ ছিল।

বংশী বলেছিল—এই নিয়ে তো ওর চার বার হলো শালাবাবু। এই হালচালের মধ্যে চিন্তাকে রেখেছি শুধু পেটের দায়ে—মাইরি বলছি আজ্ঞে শুধ্‌ধু পেটের দায়ে—

হাবুল দত্তর মেয়ের বয়েস দশ বছর। এ বাড়িতে নতুন-বৌ হয়ে এসেছে। সে-ও অবাক। অবাক হয়ে গিয়েছে সে-ও। এ বাড়িতে বউ হয়ে আসার আগে শুনেছিল অনেক কথা। পুরুষরা কেউ রাত্রে বাড়ি থাকে না। না-থাকাটাই নাকি আইন। আরো অনেক কথা। বনেদী বাড়ির হালচাল সম্বন্ধে।

মেজখুড়শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করেছে—ছোটঠাকুর বুঝি রাতের বেলায় বাড়ি থাকেন?

মেজমা হেসেছে। হেসে ঠেলা মেরেছে গিরিকে—শোন্ লা গিরি কথা শোন্ বৌমার।

বাঘবন্দি খেলতে খেলতে গিরি বলে—যাই বলো মা, আমার তো মন বলে, ছোটমা ছোটকর্তাকে তুক্ করেছে—পুজো-আচ্চা সব বাজে কথা, ওযুধ-বিষুধ খাইয়েছে কিছু।

সত্যিই সবারই অবাক লেগে গিয়েছিল ছোটবাবুর কাণ্ড দেখে। বনেদী বাড়ির ছেলের এ কী অ-বনেদীয়ানা!

ছোটবৌঠানও এতদিনের মধ্যে আর তেমন ডেকে পাঠায়নি ভূতনাথকে। ভূতনাথও মনে মনে ভেবেছে মদ খাওয়াটা হলো উপলক্ষ্য, আসলে ফল ফলেছে 'মোহিনী-সিঁদুরে'র গুণে। মন্ত্রপূত সিঁদুরের অলৌকিক ক্রিয়া। গাদা-গাদা যে-সব চিঠি আসতো আপিসে, তখন এতটা বিশ্বাস হয়নি

তার। কিন্তু আজ বিশ্বাস হয়েছে যেন! মনে হলো—হবেও বা। সব জিনিসের কি প্রমাণ পাওয়া যায়!

মাঝখানে একবার ছোটবৌঠানের কাছে গিয়েছিল ভূতনাথ। গিয়েছিল নিজের গরজেই।

চোরকুঠুরির বারান্দাটা পেরিয়ে চুপিসাড়ে গিয়ে পৌঁছেছে একেবারে ছোটবৌঠানের ঘরের সামনে। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বারান্দায় কেউ নেই কোথাও। মেজবৌঠানের ঘরের ভেতর তখন একমনে বাঘবন্দি খেলা চলেছে। আর বড়মাও তখন নিজের ঘরে সিন্ধুর সঙ্গে গল্প জুড়েছে আবোল তাবোল। যেমন সচরাচর হয়। বারান্দার কোণে সাজঘরের সামনে ছোট বাতিটা টিম টিম করে জ্বলছে। এই সুযোগ! আর ছুটুকবাবুর বিয়েও তখন হয়নি। নতুনবৌও আসেনি তখন বড়বাড়িতে!

ঘরের সামনে গিয়েই ভূতনাথ চাপা গলায় ডাকলে—বৌঠান—

আওয়াজ এল—কে রে, ভূতনাথ না?

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে ভাবছে। এমন সময় ঘোমটা টেনে চিন্তা বেরিয়ে এসে মুখ নিচু করে বললে—ভেতরে যান—বলে চিন্তা ঘরের বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পা কাঁপছিল ভূতনাথের। ছোটবৌঠানের কাছে এলেই ভূতনাথের কেমন যেন পা দুটো কাঁপে। শুধু পা কেন—সর্বাঙ্গ। কেন কাঁপে তা বলা শক্ত। বোঝানো শক্ত। অথচ জবাও যে তার খুব ঘনিষ্ঠ তা তো নয়। জবাও তার কাছে আকাশের চাঁদের মতো দূরের মানুষ। তাকে এত ভয় করে না। বোধ হয় এতখানি ভালোও বাসে না তাকে। তবু কেন যে এমন হয় কে বলবে!

ছোটবৌঠান বোধ হয় পালঙ-এর ওপর শুয়েছিল, আর গা হাত পা টিপে দিচ্ছিলো চিন্তা।

ঘরের ভেতরে মাথা গলিয়ে ওই অবস্থা দেখে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল ভূতনাথ।

ছোটবৌঠানও ওঠবার বা শশব্যস্ত হবার চেষ্টা করলো না।

—আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন রে? আয়, বোস এখেনে।

ভূতনাথ পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে গেল। কিন্তু কেমন অহেতুক লজ্জা করতে লাগলো যেন। বললে—শরীর খারাপ বুঝি বৌঠান?

ছোটবৌঠান শুয়ে শুয়ে হাসলো—শরীর খারাপ কেন হতে যাবে? আমি খুব ভালো আছি রে আজকাল। তারপর একটু থেমে হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলে—আমাকে তোর মনে পড়ে এখনও?

—রোজই তো আসতে ইচ্ছে করে তোমার কাছে বৌঠান।

—তা বলে যেন রোজ আসিস নি তুই।

—কেন? প্রশ্নটা করে ভূতনাথ কেমন চমকে উঠলো। যেন অধিকার আছে তার রোজ এ ঘরে আসবার!

—না, রোজ আসতে নেই, আজকাল ছোটকর্তা আসে যে এ ঘরে।

—সে তো রাত্রে।

—তুই জানিসনে ভূতনাথ, রাত্রে ছোটকর্তা আসে বটে কিন্তু দিনের বেলাও সেই রাত্রের কথাই ভাবি যে। আমার দিনরাত যে একাকার হয়ে গিয়েছে রে আজকাল। জানিস, সময়মতো যশোদাদুলালের পুজো করতেও ভুলে যাই আজকাল।

—সে কী!

—কেন, তাতে দোষ কী! যশোদাদুলাল আর স্বামী কি আলাদা নাকি! যে যশোদাদুলাল সেই তো...

ভূতনাথ চুপ করে রইল। কথা বলতে বলতে ছোটবৌঠানের মুখটা কেমন যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠলো। এ ক'দিনে যেন ছোটবৌঠান শুধু আরো সুন্দরই হয়নি, আরো শুচিশুভ্রও হয়েছে, পবিত্র হয়েছে। আরো সম্পূর্ণ হয়েছে। আরো নতুন, আরো নরম!

ভূতনাথ বললে—একটা কাজে এসেছিলাম, তোমার কাছে বৌঠান।

—কী কাজ, বল্?

হাতের একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা পুঁটলি দেখিয়ে বললে—এই কিছু টাকা এনেছিলাম—রেখে দেবো তোমার কাছে। আমার তো বাক্স-পেটরা কিছু নেই।

—টাকা কিসের?

—এই পাঁচশ' টাকা পেলাম সুবিনয়বাবুর কাছে। জবার বাবা দিলেন, চাকরি চলে গেল কিনা—আপিসই উঠে গেল তো চাকরি থাকবে কী করে?

—চাকরি চলে গেল, ভালোই হয়েছে।

—বারে, চাকরি চলে গেলে থাকবো কোথায়, খাবো কী—চিরকাল তো তুমি খাওয়াবে না।

—খাওয়াবো রে, চিরকাল খাওয়াবো, আমি যদি বেঁচে থাকি, তোর খাবার অভাব হবে না। তুই থাকবি বড়বাড়িতে, কে তোকে কী করবে শুনি, ছোটকর্তাকে এখন যা বলবো শুনবে। তুই আমার এত বড় উপকার করলি ভূতনাথ—আমি যে আবার স্বামীসেবা করতে পেলাম, বাঘের মুখ থেকে ছোটকর্তাকে ফিরে পেলাম—এ কার জন্যে শুনি—

ছোটবৌঠান এবার পাশ ফিরলো। বার দুই আড়মোড়া ভাঙলো। একবার হাই তুললে।

ভূতনাথ বললে—তোমার ঘুম পাচ্ছে—আমি এখন তা হলে—

—না রে পাগল, ঘুম পায়নি, সারারাত ছোটকর্তা ঘুমোতে দেয় না বটে—কিন্তু তা বলে এত সকাল-সকালও ঘুম আসে না। এই নে, চাবিটা নে, ওই সিন্দুকটা দেখছিস, ওখানে গিয়ে চাবি দিয়ে ওটা খুলে ভেতরে রেখে দে।

ভূতনাথের কেমন ভয় হলো কথাটা শুনে।

—নে চাবি নে।

বৌঠানের গলায় ধমকের সুর নয়, আদেশের সুরও নয়। সুরটা কিসের তাই বিচার করতে গিয়ে ভূতনাথ ছোটবৌঠানের মুখের দিকে একবার চাইলে। চোখে কি সুর্মা পরেছে বৌঠান! না কালি পড়েছে! রাত জাগার কালিমা! আশ্চর্য লাগে, এই চোখের এত আকর্ষণ কী করে ছোটকর্তা এতদিন এড়াতে পেরেছিল! এত মোহ, এত মায়া, এত নেশা আছে মেয়েমানুষের সহজ চাউনিতে, ভাবা যায় না। সেই ফতেপুরের রাধা। সেই যখন অভিমান করতো এত নেশা ছিল না সে চোখে। আর সেই যে টিটকিরি দিতো কথায় কথায় আন্না! আন্নাকালী! এত টানতো না সে মেয়েও। হরিদাসী ছিল গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু পেটে পেটে দুষ্টুমি ছিল তার-ও। সে-ও যখন ঠাট্টা করতো ভূতনাথকে নিয়ে, তখন খুব রাগ হতো বটে, কিন্তু ভালোও লাগতো। জবা যখন কথার মারপ্যাচ দিয়ে পাড়াগেঁয়ে বলে তাকে উপহাস করে বিদ্রূপ করে, হাজার রাগ হলেও তা ভালো লাগে। কিন্তু ভালো লাগারও তো একটা তারতম্য আছে। এ ভালো লাগার যেন শেষ নেই।

ভূতনাথ বললে—আমি কি চাবি খুলতে পারবো?

—খুব পারবি, আমি এখন উঠতে পারছিনে তা বলে।

—যদি না পারি?

—খুব পারবি, না পারবি তো পুরুষমানুষ হয়েছিলি কি জন্যে?

সিন্দুকের ভেতর চোখ মেলে সেদিন ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওটা বুঝি মুক্তোর হার, তার পাশে একগাদা গিনি। হীরের কয়েকটা গয়না অন্ধকারের ভেতর জ্বল জ্বল করছে। একটা রুপোর রেকাবি ছিল, তারই ওপর টাকার তোড়াটা রেখে দিলে ভূতনাথ। রাখতেই একটা ঝন ঝন শব্দ করে উঠলো। চমকে উঠলো ভূতনাথ। কেমন যেন শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাতে তার ঝঙ্কার চলতে লাগলো কিছুক্ষণ ধরে। মনে হলো যেন বৌঠানের গায়ে হাত ঠেকে গিয়েছে তার। পাতলা নরম গা। হাত ঠেকতেই বৌঠান চমকে উঠেছে, আর হাতের চুড়িগুলো বেজে উঠলো ঠুন ঠুন করে।

—সিন্দুকটা বন্ধ করে, দেরাজ থেকে ওই বোতলটা আন্ তো ভূতনাথ।

ভূতনাথের নজরে পড়লো কালো একটা বোতল। তার ওপর কাগজের লেবেন আঁটা। কী আছে

ওতে? মদ?

—হ্যাঁ, নিয়ে আয় না।

নিতে গিয়েও ভূতনাথের হাতটা সরে এল। একবার দ্বিধা হলো। মনে হলো যেন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ওখানে মিট মিট করে মাথাটা তুলে তাকাচ্ছে। হাত ছোঁয়ালেই ছোবল মারবে। ভূতনাথ এবার পেছন ফিরলো। বললে—এখন কি আবার ওইটে খাবে নাকি!

বৌঠান উঠে বসল। বললে—শরীরটা কেমন যেন লাগছে।

—তা বলে ওইটে খেলে কি সারবে?

বৌঠান হাসলো এবার। বললে—সারবে রে সারবে, সেদিন নীলের উপোস ছিল, সারাদিন তো জল মুখে দিইনি, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ওই একটু খেয়ে বেশ তাজা হয়ে উঠলুম।

—এখন আর বমি আসে না বৌঠান? সেই প্রথম যেমন হয়েছিল?

—বমি আসবে কেন?

—মনে নেই, প্রথম প্রথম কী রকম ঝাঁঝ লেগেছিল—সেই আমি যেদিন প্রথম কিনে এনে দিলাম, মনে নেই—ছিপি খুলতে গিয়েই কেমন বমি-বমি ভাব এসেছিল তোমার?

বৌঠান হো হো করে হেসে উঠলো।

—হাসছো যে?

—হাসবো না, এখন যে উল্টোটা হয়েছে, সারাটা দিন না খেলেও চলে—কিন্তু সন্ধ্যে হলেই কেমন হাই ওঠে, ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, কিন্তু একটু জিভে ছোঁয়ালেই সব ঠাণ্ডা।

ভূতনাথ গম্ভীর হয়ে গেল—তোমার তা হলে নেশা হয়েছে বৌঠান, ঠিক নেশা হয়েছে—

—দুর, ছোটকর্তা যতদিন চায় ততদিন খাবো, তারপরই দেবো ছেড়ে।

—তা হলে এখন কেন আবার খাচ্ছো?

—শরীরটা কেমন করছে তাই—দে তুই, একটুখানি খাবো। সত্যি বলছি—বিছানায় শুয়ে শুয়েই হাত বাড়ালো বৌঠান।

—দেবো না আমি—আমাকে তুমি কথা দিয়েছিলে যে, বেশি খাবে না।

—সত্যি বেশি খাই না রে ভূতনাথ, সত্যি বলছি বেশি খাই না। যেদিন ছোটকর্তার পাল্লায় পড়ে খাই—সেদিন খুব শরীর খারাপ হয়, মাথা তুলতে পারি না সকালবেলা, একদিন সারাদিন জ্ঞান হয়নি, আবোল-তাবোল কী সব বকেছি, চিন্তা দিনভোর আমার পাশে বসে বরফ দিয়েছে মাথায়। ছোটকর্তাকে বললাম, উনিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, বললেন—প্রথম প্রথম অমন একটু হয়—অভ্যাস হয়ে গেলে আর হবে না। দেখছিস না ওটা খাবার প'র থেকে কেমন মোটা হয়ে গিয়েছি।

বৌঠান সত্যি মোটা হয়েছে কিনা ভূতনাথ তাকিয়ে দেখলে। বললে—মোটা কোথায়—তবে তোমায় দেখতে আগের চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছে।

—ছোটকর্তা বলেছে মদ খেলে কখনও শরীর খারাপ হয় না। মদ তো আঙুরের রস—ফলের রস।

ভূতনাথ বললে—কখ্‌খনো না, মদ যদি আঙুরের রস হবে তো ওটা খেলে অমন নেশা হবে কেন? মদের নেশায় লোকে সর্বস্বান্ত হয় কেন? কেন মদ খেলে মাথা ঘোরে, পা টলে, আবোল-তাবোল কথা বলে?

বৌঠান এবার শুয়ে পড়লো আবার বালিশে মাথা দিয়ে। বললে—তা তুই কি বলতে চাস ভূতনাথ যে, ছোটকর্তার কথা না শুনে তোর কথাই শুনি?

ভূতনাথ হঠাৎ আবার কাছে সরে এল। বললে—আমি কি তাই বলেছি? আমার নামে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছো কেন বৌঠান?

—তবে তুই যে বড় বারণ করতে আসিস?

—আমি বারণ করি, সেকি বৌঠান আমার জন্যে? তুমি বসে বসে চোখের সামনে আত্মঘাতী

হবে তাতে তোমারই ক্ষতি—আমার কী?

বৌঠান বললে—আত্মঘাতী যদি হই-ই, তবু তো ছোটকর্তার পায়ে মাথা রেখে আত্মঘাতী হতে পারবো। স্বামীসেবা করতে করতে মরবো—সধবা মেয়েমানুষের এর চেয়ে আর বড় সাধ কী থাকতে পারে বল্ তো?

ভূতনাথের তখন সত্যিই বেশ রাগ হয়েছে। খপ্ করে কালো বোতলটা দেরাজ থেকে নিয়ে এসে হাতে দিয়ে বললে—তবে তুমি মরো বৌঠান, গেলো, প্রাণের সাধ মিটিয়ে খাও।

বৌঠান হাসতে হাসতে এবার উঠে বসলো। বললে—তা হলে এটা যখন দিলি সোডার বোতলটাও দে—বলে বোতলের ছিপিটা নিজেই খুলে ফেললে।

ভূতনাথ এক দৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো। একদিন মদের বোতল হাতে তুলে নিতে এই পটেশ্বরী বৌঠানেরই হাত কেঁপে উঠেছিল। বোধ হয় কিছুটা আতঙ্কও হয়েছিল। বোধ হয় বুকচাপা কান্না ঠেলে উঠেছিল গলায়। সেদিনের সে-দৃশ্যটা ভাবতে গেলে এখন যেন আর বিশ্বাস হয় না। অথচ আজ কত সহজ হয়ে গিয়েছে। কত সংক্ষিপ্ত। অভ্যস্ত হাতের কৌশলে বৌঠান গেলাসে ঢেলেছে বিষ! টল টল করতে লাগলো পাত্রটা ইলেকট্রিক আলোর তলায়।

তারপর?

তারপর বিস্মিত ভূতনাথের নির্নিমেষ দৃষ্টির সামনে... পটেশ্বরী বৌঠান একবার শুধু একটু ঘোমটা তুলে দিলো মাথায়। তারপর নিঃশেষ হয়ে গেল গেলাসটা। একটু মুখ-বিকৃতি নেই। একটু সঙ্কোচ নেই। সমস্তটা খেয়ে নিয়ে হাসতে লাগলো বৌঠান। বললে—তোকে ঠিক কালপেঁচার মতো দেখাচ্ছে ভূতনাথ—তারপর আর একটু ঢেলে বললে—তুই একটু খাবি ভূতনাথ?

ভূতনাথ কোনো কথা বললে না।

—খেয়েই দেখ্ না একবার—আয় না এক সঙ্গে দু'জনে মরি।

ভূতনাথ এবারও কথা বললে না।

পটেশ্বরী বৌঠান মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে গেলাসটা এক চুমুকে আবার নিঃশেষ করে দিলে। তারপর যেন কেমন স্থির হয়ে এল। থিতিয়ে এল। সমস্ত শরীরে সেই আগেকার মতন প্রশান্তি। যেন নিজের মনেই বৌঠান বলতে লাগলো—আমি যদি খাই, কার কি বলবার আছে শুনি, পরের পয়সায় খাচ্ছি না আমি। বেশ করবো খাবো... আলবৎ খাবো... এই তো আবার খাচ্ছি—কে কী বলে দেখি—বলে সত্যি সত্যিই বৌঠান আবার মদ ঢাললো গেলাসে। তারপর আবার এক চুমুকে নিঃশেষ হয়ে গেল গেলাসটা। এবার ঘোমটা খসে গেল মাথা থেকে। বললে—বেশ করছি খাচ্ছি—আমার খুশি আমি খাবো—যার ভালো না লাগে সে সরে যাক এখান থেকে—বেরিয়ে যাক ঘর থেকে—আমি কারো খাই না পরি?

এবারও ভূতনাথের মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোলো না।

বৌঠানের চোখ দুটো দেখতে দেখতে লাল হয়ে এল। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। পাতলা ঠোঁট দুটো যেন হঠাৎ রসালো হয়ে উঠলো। পালঙ-এর ওপর তাকিয়াটা হেলান দিয়ে উঠে বসলো একবার। বললে—কি দেখছিস ভূতনাথ?

ভূতনাথ বললে—তোমার লজ্জা করছে না—ছিঃ।

বৌঠান হেসে উঠলো খিল খিল করে। হাসির দমকে সমস্ত শরীর যেন উথলে উঠতে লাগলো। তারপর থেমে বললে—লজ্জা! লজ্জা করবো কোন্ দুঃখে শুনি—আমার মতন কে এমন সুখী বলতে পারিস, আমার মতো রূপসী কেউ আছে? আমার মতো এত বড়লোকের বাড়ির বউ—ছোটকর্তার মতো স্বামী—যা এ বংশে কেউ কখনো করেনি, ছোটকর্তা আমার জন্যে তাই করেছে জানিস। ছোটকর্তা রাত্তিরে বাড়িতে শোয়—আমার মতো সুখী কে—লজ্জা করবো কোন্ দুঃখে রে? হিংসেয় তোদের বুক ফেটে যাচ্ছে—বুঝতে পারছি।

ভূতনাথ চুপ করে রইল। মনে হলো—বৌঠান যেন তার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

একটু থেমে বৌঠান আবার বলতে লাগলো—ছোটকর্তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম—তুমি

সুখী হয়েছো তো? ছোটকর্তা কি বললে জানিস—বললে...

—কী বললে?

—বললে—আমার কথা থাক, তুমি সুখী হয়েছো? তুমি যা চেয়েছিলে পেয়েছো তো?

আমি বললুম—তোমার সুখেই আমার সুখ, আমার আলাদা সুখ বলে কিছু নেই, স্বামীর সুখেই স্ত্রী সুখী—কিন্তু তুমি? তুমি কি সুখী হওনি? আমি কি পারিনি তোমায় সুখী করতে? তুমি যে বলেছিলে—আনন্দ দিতে পারে বাগানবাড়ির মেয়েরা, ওরা কায়দা-কানুন জানে। আমি যে বড় গলায় বলেছিলুম—আমি পারবো, তোমার জন্যে সব করতে পারবো—তুমিই বলো তো আমি কি পেরেছি? ছোটকর্তা হাসতে লাগলো। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। আমার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে তখন ছোটকর্তা। মাথার চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। আবার বললুম—উত্তর দিচ্ছো না যে—কথা বলো?

ছোটকর্তা অনেকক্ষণ কি ভাবলে। বললে—মন্ত্রে বিশ্বাস করো তুমি ছোটবউ?

বললুম—তুমি কী যে বলো—মন্ত্রে যদি পৃথিবীতে কেউ একজন বিশ্বাস করে তো সে আমি। আজ যে তোমাকে বুকে পেয়েছি সে তো মন্ত্রের জোরে। আমার এই মুখের দিকে চেয়ে দেখো তো—দেখো চেয়ে.

ছোটকর্তার চিবুকটা ধরে আমার দিকে ফেরালুম। বললুম—কী দেখছো বলো তো?

—কই কিছু না।

—কপালে কী দেখছো আমার?

—কপালে? কিছুই দেখছি না তো?

—সিঁদুর দেখতে পাচ্ছো না?

—হ্যাঁ, সিঁদুরের টিপ দেখছি।

—ওই তো মন্ত্র, মন্ত্রপড়া সিঁদুর, 'মোহিনী-সিঁদুর', ওই সিঁদুরের জোরেই তোমায় ফিরে পেয়েছি—এই যে তুমি আমার কাছে রয়েছো—এ ওরই জন্যে।

কথাটা শুনে ছোটকর্তা হাসতে লাগলো। হাসলে ছোটকর্তাকে খুব ভালো দেখায়। কখনও তো আগে হাসি দেখিনি। বললাম—হাসছো যে?

ছোটকর্তা বললে—আমি ও মন্ত্রের কথা বলছি না। ও তো বুজরুকি—পয়সা নেবার ফিকির—আমি বলছি অন্য মন্ত্রের কথা, মনে আছে বিয়ের সময় রূপলাল ঠাকুর মন্ত্র পড়িয়েছিল—তোমার হয়তো মনে নেই ছোটবউ, তোমার তখন বোধ হয় দশ বছর বয়েস, সে মন্ত্রের মানেও তখন বুঝিনি—তবু যেটুকু মানে বুঝেছি তাতে তোমার ওপর আমি অন্যায় করেছি ছোটবউ।

মুখটা চাপা দিয়ে দিলাম হাত দিয়ে। বললাম—তুমি কিছু অন্যায় করোনি গো, সে আমার কপালের দুর্ভোগ—তুমি কী করবে?

ছোটকর্তা বললে—না ছোটবউ—আমি অন্যায়ই করেছি—তোমায় আমি যে মদ ধরিয়েছি।

সারারাত দু'জনে তখন অনেক মদ খেয়েছি, তবু দেখলাম ছোটকর্তার জ্ঞান রয়েছে খুব। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—ও আমি যেদিন তুমি বলবে সেইদিনই ছেড়ে দেবো—তোমার ভালো লাগে বলেই তো খাই।

ছোটকর্তা বললে—না ছোটবউ, আমি দেখছি তোমার নেশা ধরে গিয়েছে।

কথাটা বলেই ছোটকর্তা চোখ বুজলো। চেয়ে দেখি, দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। জানিস ভূতনাথ, মানুষটাকে এতদিন আমরা কেবল ভুল বুঝেছি। আসলে বড়বাড়িতে কেউ ওকে বুঝলো না তাই কাউকেই ও বুঝতে চায় না। ওই তো মেজভাসুর রয়েছেন, তাঁর তো একটা নেশা নয়, দশ রকমের নেশা নিয়ে কাটাচ্ছেন, কিন্তু ছোটকর্তার শুধু জানবাজার, আসলে জানবাজারের চুনীদাসীর ওপর ওর নেশা নয়, ওর নেশাটা বাইরের জিনিস, ও ভারি অভিমানী, তাই অভিমান করে নেশায় ডুবিয়ে রাখে নিজেকে। দেখেছি তো—বাড়িতেও খুব যে মদ খায় তা নয়, বরং

আমাকেই খাওয়ায় বেশি—আদর করলে গলে যায়, ভালোবাসা পেলে কৃতার্থ হয়।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু বৌঠান সত্যি সত্যিই যদি তোমার নেশা ধরে যায়?

বৌঠান বললে—ওটা নেশা নয় ভূতনাথ, তুই খেয়ে দেখ্, তুইও বুঝবি, কেমন যেন একটা আমেজ আসে, সে-সময় মনে হয় সকলকে বুঝি ক্ষমা করতে পারি, সকলকে ভালোবাসতে পারি, কারোর খারাপটা আর চোখে পড়ে না। আমার যশোদাদুলাল আমার ছোটকর্তা সব তখন একাকার হয়ে যায়—তোকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে তখন।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু এমন করলে—আমার আর যে এ বাড়িতে বেশিদিন থাকা চলবে না।

বৌঠানের মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেল—কেন?

—সবাই বলাবলি করে তোমার সঙ্গে আমার নাকি খুব মাখামাখি, তুমি আমাকে জামা-জুতো-কাপড় কিনে দিয়েছো, বিধু সরকার তো খোরাকির খাতা থেকে আমার নাম কেটেই দিয়েছিল—তুমিই জোর করে...

—বলে নাকি? বৌঠান বসে বসেই যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলো। তারপর সেইভাবে ঝুঁকে পড়ে ভূতনাথের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আর একটু হলেই যেন পালঙ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতো।

হঠাৎ ঠিক সময়ে ভূতনাথ খপ্ করে ধরে ফেলেছে বৌঠানকে। বললে—এখুনি কি সর্বনাশ হতো বলো দিকিনি বৌঠান।

—হাত ছাড়, গায়ে হাত দিসনে—বলে বৌঠান নিজের কাপড় সামলে নেবার চেষ্টা করে বললে—যা, বেরো এখন তুই—বলে বৌঠান আবার বোতল উপুড় করে গেলাসে ঢালতে লাগলো।

ভূতনাথ বললে—আবার খাবে নাকি তুমি ওই—

—যদি খাই, তোর কি?

ভূতনাথ সামনে সরে এসে দাঁড়ালো। বললে—আর খেতে পাবে না তুমি!

—জোর নাকি?

—হ্যাঁ জোর, ছোটকর্তার সামনে যা করো করো, আমি কিছু বলতে যাচ্ছিনে, কিন্তু আমার সামনে আর খেতে পাবে না—বলে ভূতনাথ জোর করে বৌঠানের হাত থেকে কেড়ে নিতে গিয়েই বোতলটা পিছলে পড়ে গেল মেঝের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন শব্দে চুরমার হয়ে গিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে গেল কাঁচের টুকরো। সমস্ত ঘর মদের স্রোতে ভেসে গেল। কাঁচের টুকরো লেগে ভূতনাথের হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে তখন। অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ সেই মুহূর্তে।

কিন্তু আর এক কাণ্ড করে বসলো পটেশ্বরী বৌঠান।

হঠাৎ—কী হলো কে জানে—খিল খিল করে সশব্দে হেসে উঠলো বৌঠান। সে হাসি আর থামতে চায় না। ঘর-ফাটানো সে হাসি। হাসতে হাসতে বৌঠানের যেন দম আটকে আসবে। বোতল ভাঙার শব্দের সঙ্গে বৌঠানের হাসির শব্দ যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল সে রাত্রে।

সেদিন সেই ঘটনার পর ভূতনাথ নিঃশব্দে চোরকুঠুরির দরজা দিয়ে নিচের ঘরে এসে খিল লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ বংশীর কথা শুনে যেন অবাক লাগলো। কিসের ঝগড়া হলো ছোটবাবুর সঙ্গে? আবার কেন জানবাজারে যাবে ছোটকর্তা? বৃন্দাবন কি আবার কোনো সূত্রে ফুসলে নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে!

বংশী বললে—ওই দেখুন না, ছোটবাবুর ল্যাণ্ডো আবাব ধোয়ামোছা সাফসুতরো হচ্ছে। নতুন আতর বের করতে হবে—সাজগোজ সব করে দিতে হবে—আজকে বড্ড কাজ শালাবাবু, চললুম।

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা বংশী, একটা কথা বলতে পারিস?

—কী? বংশী ফিরে দাঁড়ালো।

—চুনীদাসী বৃন্দাবনের কে হয় জানিস?

বংশী যেন আকাশ থেকে পড়লো—আপনি কেমন করে জানলেন শালাবাবু?

—বৃন্দাবনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

—আপনার কাছেও এসেছিল—খবরদার শালাবাবু, ওকে আমল দেবেন না। ঠন্‌ঠনের ছেনি দত্তর বাড়িতে গিয়েও অমনি ক'দিন ঘোরাঘুরি করছে আজ্ঞে, এখন তো ছেনি দত্ত মারা গিয়েছে, এখন আবার নটে দত্তর পেছনে লেগেছে, এখন যে হাড়ির হাল ওদের, ছোটবাবু তো যায় না, খাবার জোটে না এখন দু'বেলা ভালো করে হুজুর—ছোটবাবুর দেওয়া মোটরগাড়িটা পর্যন্ত বেচতে হয়েছে। হবে না, বাজার যা পড়েছে—মাংস সাত আনা, চৌদ্দ পয়সা সরষের তেল, দশ পয়সা দুধ, এক সের ঘি কিনতে গেলে বারো গণ্ডা পয়সা লাগে। পারবে কোত্থেকে শুনি—এখন কোত্থেকে বরফ সোডার খরচ আসে দেখবো। তারপর একটু থেমে বংশী জিজ্ঞেস করলো—তা কী বলছিল আপনাকে বিন্দাবন?

—বলছিল, তার নতুন-মা নাকি একবার দেখা করতে বলেছে আমাকে—জানবাজারের বাড়িতে।

বংশী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো—কী আস্পদ্দা দেখুন বিন্দাবনের, আপনাকে কিনা যেতে বলে নতুন-মা'র কাছে, নতুন-মা ডেকেছে না ছাই ও-সব বিন্দাবনের চালাকি শালাবাবু। বিন্দাবন আপনাকে কোনো রকমে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চায় ওখানে, তারপর খাইয়ে-দাইয়ে ভুজং-ভাজং দিয়ে—

—তুমি কি আমাকে তেমনি লোক পেয়েছো নাকি বংশী—আমাকে যা বলবে, আমি তাই শুনবো!

—তা আর কী কী বললে শালাবাবু?

—এই-সব দুঃখ করছিল আর কি। গাড়ি বেচতে হয়েছে, পেট চলে না, ছোটবাবুকে বলে কয়ে পাঠিয়ে যদি দিতে পারি এই বোধ হয় মতলব, খুলে কিছু বললে না, কেবল বললে—আমাকে নতুন-মা ডেকেছে।

—খবরদার শালাবাবু, আপনি যাবেন না, ও-মাগী ডাইনী, ছোটবাবুর হাড়মাষ শুষে খাচ্ছে। এখনও আশা ছাড়েনি, কেন বাপু, কলকাতা শহরে তো আরো বাবু রয়েছে, ওই তো শীলেরা রয়েছে, ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্ত রয়েছে—ওরা গাড়ি দেবে—মেয়েমানুষের পায়ের শুকতলা চাটবে—তাদের কাছে যা না—বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বংশী।

ভূতনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, চুনীদাসী সত্যি সত্যি বৃন্দাবনের কে হয় রে বংশী?

বংশী মাথা নেড়ে উঠলো—না শালাবাবু, মহাপ্রভুর দিব্বি করেছি, সে আমি কাউকে বলবো না—কিন্তু এও আমি বলে রাখছি, নরকেও ঠাঁই হবে না বিন্দাবনের, চামারের অধম ওই বিন্দা—নইলে... না, না, আমি দিব্বি গেলেছি—সে আমি বলতে পারবো না শালাবাবু।

ভূতনাথ খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু ছোটবাবু তা হলে আবার এতদিন পরে কেন জানবাজারে যাচ্ছে?

—কী জানি বাবু, চাকর মানুষ, ভদ্দরলোকের মনের কথা কেমন করে বলবো।

—কিচ্ছু শোনোনি তুমি?

—শুনেছি সব, কিন্তু বুঝতে পারিনি কিছু।

—কী শুনলে শুনি?

বংশী বললে—তবে শুনুন, সেদিন ছোটমা'র কাছে গিয়েছি, তখনও সন্ধ্যে হয়নি, দেখি ভেতরে ছোটবাবু, ছোটবাবুকে দেখে আমি আর ঘরে ঢুকলুম না। খুব ঝগড়া হচ্ছে দু'জনে তখন—ছোটমা বলছে—আমার কি কিছু অন্যায় হয়েছে? সত্যি করে বলো তো তুমি।

ছোটবাবু বললে—সে তুমি ঠিক বুঝবে না ছোটবউ—মন্তর পড়ে যাকে বিয়ে করা যায়—তার সঙ্গে ঠিক ফুর্তি হয় না—তাতে পুরুষমানুষের ঠিক তৃপ্তি হয় না—বিশেষ করে বড়বাড়ির

পুরুষমানুষদের।

ছোটমা বললে—কিন্তু তুমি যা যা বলেছো, সব তো আমি করেছি, তোমার জন্যে ঠাকুরপুজো পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি, জানো—ভেবেছি তুমিই আমার ঠাকুর-দেবতা সব—তুমি ছাড়া আর কোনো ঠাকুর-দেবতাকে তো আমি জানি না। আমার যশোদাদুলাল যে, তুমিও সে—কত জন্মের তপস্যার ফলে তোমার মতো স্বামী পেয়েছি আমি। তোমার জন্যে আমার কত গর্ব জানো—এ-বাড়ির কোনো বউ যা পারেনি, আমি তাই-ই পেরেছিলুম—আমি তোমাকে হাতে পেয়ে স্বর্গ পেয়েছিলুম, জানো।

ছোটবাবু বললে—স্বর্গ-নরকের কথা চিন্তা করবো বুড়ো বয়েসে। এখন এ-বয়েসে ও-সব মাথায় ঢুকবে না ছোটবউ—এই ক'মাস বাড়িতে হাঁফিয়ে উঠেছি আমি—সমস্ত দিনটা ছটফট করে মনটা।

ছোটমা বললে—তোমার জন্যে আমি আরো দামী মদ আনিয়েছিলাম—একটু খাবে?

ছোটবাবু বললে—আমাকে তুমি ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করো না ছোটবউ।

ছোটমা একবার লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললে—তোমাকে যদি সত্যি-সত্যিই ভোলাতে পারতুম! তারপর মদের বোতলটা খুলতে খুলতে বললে—লোকে বলে তোমাকে নাকি আমি বশীকরণ করেছি, তোমাকে যাদু করেছি, কিন্তু মেয়েমানুষের যা কিছু অস্ত্র ভগবান দিয়েছেন, সব তো খাটিয়ে দেখেছি, শিবকে তবু ভোলানো যায়—কিন্তু তোমাকে! তুমি পাথরের দেবতা হলেও বুঝতুম যে, তার তবু একটা মানে আছে, তোমাকে আমি আমার কোলে শুইয়ে তোমার মুখের হাসি দেখেছি—আর কিছু না হোক, যখন কিচ্ছু থাকবে না, তখন ওই স্মৃতিটা নিয়েই ভাববো কেবল। তারপর গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে ছোটবাবুর সামনে ধরে ছোটমা বললে—নাও—নেবে না?

—মদে আমার কখনও অরুচি নেই ছোটবউ—দিচ্ছো খাচ্ছি।

ছোটমা বললে—তুমি একে মদ বলো আর আমি বলি অমৃত। একদিন মনে আছে কী ঘেন্নাই ছিল মদের ওপর—মাতালের ওপর—কিন্তু এই অমৃতই একদিন তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছিল—একথা আমি ভুলবো না। আমি এ খাই এখন কেন জানো?

—কেন?

—তোমার জন্যে। নেশা আমার হয়নি, হবেও না কোনো কালে। নেশা যদি হয়েই থাকে, সে মদের নয়, তোমার ওপর আমার নেশা—তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না। এ-ক'মাসে তোমার ওপর আমার নেশা হয়ে গিয়েছে। তোমার পায়ে পড়ছি—তুমি দিনের বেলা যেখানে যাও-যাও কিন্তু রাত্তিরে আমার কাছে থেকো।

ছোটবাবু বললে—ফুর্তি কি দিনের বেলা হয় ছোটবউ?

ছোটমা বললে—তা হলে এক কাজ করো।

—কী কাজ?

—আমাকে তুমি তোমার বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দাও। বরানগরে কি খড়দ'য়—কিংবা জানবাজারের আর একটা বাড়ি কোনো—সেইখানেই আমি থাকবো।

—এ-বাড়ির বউ হয়ে এ-বাড়ির বাইরে থাকবে?

—তা, তুমি রাত্তিরে এ-বাড়িতে না থাকলে এ-বাড়ি আমার কাছে অরণ্য—বরং বাইরে থাকলে তবু তুমি রোজ যাবে সেখানে, রাত্তিরে আমার কাছে থাকবে—এমনি করে তোমার সেবা করবো আমি, তুমি না হয় মনে করবে চুনীদাসীর কাছে এসেছো, আমার নাম বদলে তুমি নাম রাখবে, যে-নাম তোমার খুশি, তাতেও আমি রাজী।

ছোটবাবু বললে—কিন্তু তুমি যে এ-বাড়ির বউ—তা কি করে হতে পারে। বড়বাড়ির বদনাম হবে যে তাতে—এ-বাড়ির বউ হয়েছো যখন, তখন চিরকাল এ-বাড়িতেই থাকতে হবে তোমাকে।

—আর তুমি বাইরে বাইরে রাত কাটালে বুঝি বদনাম হবে না!

—বরং বাড়িতে রাত কাটালেই বদনাম হবে, যেমন এখন হচ্ছে।

—এ কেমন ব্যবস্থা তোমাদের বাড়ির বলো তো?

—ব্যবস্থা নয়, আইন, এ-বাড়ির আইন এই যে, পুরষরা বাইরে বাগানবাড়িতে রাত কাটাবে বাইরের মেয়েমানুষ নিয়ে, কিন্তু বাড়ির বউদের সতী হতে হবে। একটু পদস্খলন হলে তার আর ক্ষমা নেই, মার্জনা নেই।

—তাহলে আমি কী করি?

ছোটবাবু বললে—কেন মেজবৌরাণী, বড়বৌরাণী যেমন বাঘবন্দি খেলে, গয়না ভাঙে, গয়না গড়ায়, তেমনি তুমিও করো—ভাবনা কি তোমার?

ছোটমা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। কিন্তু তারপরেই সাপের মতন ফণা তুললো—মেজদি আর বড়দি'র সঙ্গে আমার তুলনা করলে তুমি—কিন্তু... বলে হঠাৎ থেমে গেল ছোটমা।

ছোটবাবু কিন্তু থামলো না। বললে—থামলে কেন বলো—কিন্তু কী...

ছোটমা হঠাৎ এতক্ষণ পরে গেলাসটা উপুড় করে সমস্তটা ঢক ঢক করে গিলে ফেল্‌লে। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম। বিষ খেলে বুঝি মানুষের চেহারা ওইরকমই হয়। চোখ, মুখ, কান, নাক দিয়ে ছোটমা'র যেন আগুন বেরোতে লাগলো শালাবাবু। ছোটবাবু আমার মনিব, কিছু বলতে পারিনে, কিন্তু মনিব না হলে কী করতুম বলা যায় না।

তারপর খিল খিল করে পাগলের মতন হেসে উঠলো ছোটমা। আমার মনে হলো ছোটমা হাসছে না, যেন কাঁদছে। অন্তত মনে হলো ছোটমা যেন খানিকটা বুক ভরে কাঁদতে পেলেও ঠাণ্ডা হতো। সে কী জোর হাসি! যেন মাতালের মতো, পাগলের মতো হাসি। সে-হাসি আর থামতে চায় না শালাবাবু। হেসে ছোটমা গড়িয়ে পড়লো বিছানার ওপর।

ছোটবাবু তখন ছোটমা'র কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। মদ খেলে মেয়েমানুষের কী রকম নেশা হয়, তা ছোটবাবু খুব ভালো রকমই জানে। তবু ছোটমা'র মতো কাণ্ড যেন আর দেখেনি ছোটবাবু। পালঙ-এর কাছে গিয়ে বললে—কী হলো, হাসছো কেন এত?

ছোটমা মুখ তুললো। ছোটবাবুর চোখে চোখ রাখলো খানিকক্ষণ। তারপর আবার হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বললে—তুমি মেজদিদির সঙ্গে তুলনা করলে আমার—আমি গয়না ভাঙবো আর গয়না গড়াবো আর বাঘবন্দি খেলবো ঘরে বসে!

ছোটবাবু বললে—কেন, কী অন্যায়টা বলেছি—চিরকার ধরে, ঠাকুরবাবার আমল থেকে তাই তো হয়ে আসছে, কেউ তো আপত্তি করেনি। কর্তারা মদ খেয়েছে, পায়রা পুষেছে, মেয়েমানুষ রেখেছে, বউদের গয়নাগাটি, শাড়ি, ঝি-চাকর, সব যুগিয়েছে, কেউ আপত্তি করেনি, আত্মহত্যাও করেনি অপমানে—অপমানও মনে করেনি তাতে—চিরকালই চলে এসেছে তাই—আর আজ হঠাৎ তোমার কথায় সব বদলে যাবে নাকি রাতারাতি!

ছোটমা খানিকক্ষণ কিছু বললে না। চুপ করে বিছানায় মুখ গুঁজে রইল।

ছোটবাবু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ঘর থেকে চলে আসছিল। ছোটমা পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুললো। বললে—তুমি বলে যাও—আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও—

ছোটবাবু ফিরে দাঁড়ালো। বললে—কিসের উত্তর?

—ওই যে তুমি কেন অন্য বউদের সঙ্গে তুলনা করলে আমায়?

—তা তুমি কি আলাদা? তুমি কি সৃষ্টিছাড়া?

ছোটমা যেন বাঘিনীর মতো চিৎকার করে উঠলো—হ্যাঁ, আলাদা—আলাদা না হলে আমার এ কপালের ভোগ কেন? আর কেউ এমন করে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে, বিশ্ব-সংসারে? হিন্দুঘরের বউ হয়ে এমন করে আর কেউ মদ খেয়েছে—বলো তুমি, তোমায় বলতেই হবে—উত্তর না দিয়ে যেতে পারবে না।

ছোটবাবু গম্ভীর গলায় শুধু একবার বললে—ছোটবউ!

ছোটমা আবার সাপের মতো মাথা তুললো। বললে—কী বলবে বলো?

—মদ আমরাও খাই—কিন্তু নেশা হলে তোমার মতন এমন মাতাল হই না।

ছোটমা বললে—এই কি আমার কথার উত্তর হলো?

—মাতালের কথার উত্তর দিই না আমি—বলে দরজার দিকে ছোটবাবু পা বাড়ালো।

ছোটমা এবার চিৎকার করে উঠলো। বললে—শোনো, আমার কথার উত্তর আমিই দেবো। অন্য বউ-এর সঙ্গে আমার তুলনা করলে তুমি কোন্ মুখে? ওদের যা আছে, যা ছিল, আমার কি তাই আছে? আমাকে তুমি কি সংসার দিতে পেরেছো—ছেলে দিতে পেরেছো?

হঠাৎ বোমা ফাটলে যেমন চমকে উঠতে হয়, তেমনি চমকে উঠলো যেন ঘরখানা শালাবাবু। কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে বলা সেই ছোটবাবুর কানে বোধ হয় গেল না কথাটা। গট গট করে বেরিয়ে গিয়েছে তখন ছোটবাবু। আমি অন্ধকারে পাশ কাটিয়ে লুকিয়ে পড়েছি তখন। ঘরের ভেতর চেয়ে দেখলুম ছোটমা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে তখন ফুলে-ফুলে উঠছে। হয় হাসছে, নয় কাঁদছে। ঠিক হাসি কি কান্না, তা কিন্তু বুঝতে পারলুম না।

ভূতনাথ বললে—তারপর?

বংশী বললে—তারপর আর কী! কী করবো বুঝতে পারছিলুম না, হঠাৎ ছোটমা ডাকলে—বংশী—

আমি ঘরের মধ্যে গেলাম। বললাম—আমাকে ডাকছো ছোটমা?

ছোটমা বললে—চিন্তা কোথায় রে?

বললুম—চিন্তা রাঙাঠাকমা'র কাছে গিয়েছে তোমার খাবারের বন্দোবস্ত করতে।

ছোটমা বললে—বলে দে, আমি খাবো না আজ—আর চিন্তাকে ডেকে দে এখুনি, বলবি আমার কাপড়-গয়না বার করে দেবে—আর গাড়ি ঠিক করতে বল আমার—আমি বেরুবো।

জিজ্ঞেস করা অন্যায় হবে কিনা ভাবলাম একবার। কখনও তো বেরোয় না ছোটমা। গঙ্গায় চান করতেও যেতে দেখিনি। বরাবর দেখে এসেছি মেজমা, বড়মা, যদিও-বা বেরিয়েছে পালা-পাব্বণে তা-ও পাল্কি করে, নয় তো গাড়িতে, কিন্তু ছোটমা কখনও বেরোয় নি। সেই বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত এ বাড়ির বাইরে কখনও পা বাড়ায়নি। ছোটমা'র বাবা মারা যাবার পর একবার যেতে হয়, তা-ও যায়নি। কার জন্যেই বা যাবে। আপন বলতে সংসারে তো শুধু ছিল বাপ, তা তা-ও তো কেবল গুরুদেব-গুরুদেব করেই নাকি দিন কাটাতো। সংসার-ধর্ম সব তার চুকে গিয়েছিল ছোটমা'র বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে। তাই ছোটমা'র কথায় যেন অবাক হলাম শালাবাবু। কিন্তু তবু জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় বেরুবে ছোটমা?

ছোটমা রেগেই ছিল। বললে—তোর কাছেও কি তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি বংশী?

কথাটা শুনে চলে আসছিলাম। ছোটমা'র গাড়ি তো বহুদিন বাইরে বেরোয় না। সাফসুফ করতে হবে, খবর দিতে হবে মিঁয়াজানকে—কিন্তু ছোটমা আবার ডাকলে—বংশী, শোন।

গিয়ে দাঁড়ালাম কাছে। ছোটমা বললে—আর দেখ তো ভূতনাথ আছে কি না—যদি থাকে বলবি জামাকাপড় পরে যেন তৈরি হয়ে নেয়—আমার সঙ্গে ভূতনাথ যাবে।

ভূতনাথও অবাক হয়ে গেল—আমার নাম করলে নাকি ছোটবৌঠান?

—হ্যাঁ, শালাবাবু, আমিও শুনে কতকটা অবাক হয়ে গেলাম। একে তো ছোটমা কোথাও বেরোয় না, তার ওপর সঙ্গে ঝি-চাকর কেউ যাবে না, এ কেমন ধারা কথা! এ-বাড়ির কর্তারা যা করে করুক, গিন্নীরা একটু বে-এক্তিয়ার কিছু করলে সমস্ত মহলে একেবারে টি-টি পড়ে যায় আজ্ঞে। ছোটকর্তার কানে গেলে কি আর রক্ষে থাকবে!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—তা, তারপর?

—তারপর আজ্ঞে, আপনাকে খুঁজলাম সমস্ত বাড়িময়, মাস্টারবাবুর ঘরে দেখলাম, যেমন তালা দেওয়া তেমনি তালা লাগানো রয়েছে। বারবাড়ি, ভেতরবাড়ি, আপনার চোরকুঠুরি—ছুটুকবাবুর বৈঠকখানা দেখলুম—তা বৈঠকখানা ফাঁকা। ছুটুকবাবুর বিয়ের পর তো আর তেমন আগের মতো গানের আসর বসে না এখন। দেখলাম তোষাখানা, জিজ্ঞেস করলাম লোচনকে—শালাবাবুকে দেখেছিস? কত জায়গায় দেখলাম—কেউ বলতে পারলে না আজ্ঞে।

ছুটে গিয়ে আবার বললাম ছোটমাকে—শালাবাবু তো কোথাও নেই।

ছোটমা বললে—সব জায়গায় দেখেছিস?

বললাম—কোনো জায়গা আর বাকি রাখিনি খুঁজতে—

—তা কালকে কোথায় সারাদিন ছিলেন আজ্ঞে আপনি?

ভূতনাথ বললে—চাকরির জন্যে সারাদিনই তো ঘুরছি—আর বাড়িতে এসেই বা করবো কী!

—তা রাত তখন দশটা—তখন আবার ছোটমা ডাকলে। বললে—ভূতনাথ এসেছে?

বললাম—না, এখনো আসেনি তো।

ভূতনাথ বললে—তারপর?

—তারপর আর কি? সারারাত ছোটবাবু মদ খেয়েছে নিজের ঘরে। আমার এতটুকু ঘুম হয়নি—আর চিন্তারও সেই দশা, ছোটমাও ঘুমোয়নি সারারাত—কেবল নাকি মদ গিলেছে। কী যে হলো কে জানে শালাবাবু! কেন যে অত কথা-কাটাকাটি তারও মানে বুঝলুম না। বেশ ছিল ক'মাস। ছোটমা'র মুখে হাসি সারাদিন লেগেই আছে, বমি করে দু'-একবার ঘর ভাসিয়েছে বটে, কিন্তু তবু মনে শান্তি ছিল, ছোটবাবুও যেন বেবাক বদলে গিয়েছিল—নিয়ম করে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিলো—এখন কী যে হবে?

ভূতনাথ বললে—কিন্তু কেন এমন হলো—বৃন্দাবন কি ছোটবাবুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছিল ইদানীং?

—কী জানি শালাবাবু, আমি তো বিন্দাবনকে দেখলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি—বলেছি এবার বড়বাড়ির কাছে এলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো তোর, কিন্তু তবু লুকিয়ে-চুরিয়ে আসে এদিকে। ওই যে মধুসূদনকাকাকে দেখেন না, ওরা সবাই যে বিন্দাবনের দলে—ও দলে অনেকে আছে, সবাইকে আমি চিনি, সরকারমশাইও কম যান না, ওই বিধু সরকার—বিন্দাবন যে ওদের হাত করেছে। ভেতরে ভেতরে ওরা কী মতলব আঁটছে কে জানে, আজ সকালে উঠে ছোটবাবু বললে—গাড়ি তৈরি রাখতে বলিস বংশী, সন্ধ্যেবেলা জানবাজারে যাবো। তা সেই সকাল থেকে তোড়জোড় করছি আজ্ঞে—গাড়ি ধোয়ামোছার ব্যবস্থা, কাপড় কুঁচনো, আতর বার করা—ও-সবের পাট তো এতদিন তেমন ছিল না,... অনেকক্ষণ কথা বললাম আপনার সঙ্গে—আজকে ছোটবাবু না বেরোনো পর্যন্ত আমার আর ফুরসত নেই শালাবাবু।

বংশী চলে যাচ্ছিলো। হঠাৎ আবার ফিরলো। বললে—আর একটা কথা—

ভূতনাথ বললে—কী?

—আজ কিন্তু ছোটমা সকালবেলাই খবর নিয়েছে আপনার। বললে—ভূতনাথ এসেছে?

আমি বললাম—কাল অনেক রাত্তিরে এসেছিল শালাবাবু—দেখা হয়নি আমার সঙ্গে—দেখা হলেই বলবো।

ছোটমা বললে—দেখা হলে নয়, দেখা করবি, বিকেলবেলা যেন কোথাও না বেরোয় আজ—ছোটবাবু জানবাজারে বেরিয়ে যাবার পরই আমি বেরোবো। ভূতনাথ সঙ্গে থাকবে আমার—তা আপনি যেন কোথাও বোরোবেন না হুজুর—তা হলে খেয়ে ফেলবে আমাকে ছোটমা।

ভূতনাথের কেমন যেন ভয় হলো। পটেশ্বরী বৌঠানের সঙ্গে আড়ালে যত ঘনিষ্ঠতাই থাক, তার সঙ্গে প্রকাশ্য গাড়িতে করে যাওয়া, সে কেমন দেখাবে। এ-বাড়ির চোখে অস্বাভাবিক ঠেকবে না! তারপর চারদিকে এত শত্রুতা! কোথাও যদি কোনো কথা ওঠে, ছোটমা হয়তো পার পেয়ে যাবে। আর মাঝখান থেকে আশ্রিত ভূতনাথ—আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, বন্ধুবান্ধব কেউ নয়—সে নিজেকে ঠেকাবে কেমন করে! এ-বাড়িতে তার কতটুকু পরিচয়! কিসের অধিকার! ব্রজরাখাল তো কবে কতদিন আগে এ-বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে চলে গিয়েছে। ব্রজরাখাল থাকলে না হয় তবু একটা কথা ছিল। সে যে আশ্রিতের আশ্রিত। কত সুদূর সম্পর্ক! তাও আপন ভগ্নীপতি নয়। শুধু ছোটমা'র কৃপার পাত্র সে! সেইটুকুই যা ভরসা। কিন্তু ভয়ও তো আবার সেই কারণেই! এ-বাড়ির অসূর্যম্পশ্যা বধূর সঙ্গে তার সম্পর্কটা তো অসামাজিক, অবৈধ, বে-আইনী। তারপর আরো একটা

কথা ভাববার আছে। ছোটকর্তার সঙ্গে ছোটবৌঠানেরও সদ্ভাব নেই। তা ছাড়া, ছোটবৌঠান হয়তো অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কী কাণ্ড করে বসবে কে জানে! সেদিন যেমন কাণ্ড করেছিল। টানাটানিতে কাঁচের বোতল চুরমার হয়ে যাবার পর সেই উন্মাদের মতো হাসি। রাস্তায় গাড়ির মধ্যে যদি তেমন কোনো ঘটনা ঘটে! তখন কেমন করে সে পালাবে! অথচ এতখানি অনুগ্রহ পেয়েছে বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করাই তো উচিত! যেদিন সে ব্রজরাখালের চিঠি পেয়ে বনমালী সরকার লেন-এর ভেতরে বড়বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল এমন করে এত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠবে এ-বাড়ির ছোটবউ-এর সঙ্গে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে আবার—কিন্তু তোমার কী মনে হয় বংশী—আমার যাওয়া উচিত?

—আপনি লেখাপড়ি শিখেছেন আজ্ঞে—আপনাকে কী বলবো শালাবাবু।

—তবু তুমি তো এ-বাড়ির হালচাল জানো কতকটা?

—আমি শালাবাবু, আমার জন্মে এমন কাণ্ড দেখিনি, শুনিনি। এ-বাড়িতে বউরাণীরা যদি কখনও বেরোয় তো খিড়কীর দরজা খুলে পাল্কি করে যায় তারা। আগে পেছনে-পেছনে ঝিয়েরা দৌড়ুতে দৌড়ুতে যেতো, তা-ও কালে-ভদ্রে পালা-পাব্বণে। এদানি গাড়ি হয়েছে, পাল্কি গাড়ির দরজা জানলা বন্ধ করে তবে গিয়েছে—যেমন মেজমা বাপের বাড়ি যায়, আগে তাও মানা ছিল—আর গাড়ি থেকে নামবার সময় চারদিকে মশারির মতন চাদরের ঢাকা পড়ে যেতো—কিন্তু এমন কখনও শুনিনি। ছোটমা তো আর মেজমা নয়—ছোটমা এ-বাড়ির আলাদা ধরনের মানুষ আজ্ঞে। অত অভিমানও যেমন কারো নেই, অত ভালোবাসতেও কেউ জানে না। এই যে তিন মাস আমরা ভাইবোনে মাইনে পাইনি কেউ, তবু তো আছি এখানে বুক ঠুকে।

ভূতনাথ কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল—বলো কী বংশী?

—আজ্ঞে, ঠিকই বলছি শালাবাবু।

—পাওনি কেন মাইনে?

—সেকথা আর জিজ্ঞেস করবেন না—অনেকেই পায়নি—আমাদের মতো যারা ছোটমা'র দলে।

—ছোটমা জানে সে কথা?

—ছোটমাকে দেবতার মতন ভক্তি করি শালাবাবু, আপনি জানেন কিনা জানি না, সারাজীবন কষ্ট করতেই আমার ছোটমা'র জন্ম, স্বামী পেলে না, সংসার পেলে না, আর বলতেও দুঃখও হয়, এত বড় বাড়ির বউ হয়েও মেয়েমানুষের যা সব চেয়ে বড় সাধ তাই-ই পুণ্য হলো না। এক-এক সময় তাই সন্দেহ হয়—মাইরি বলছি শালাবাবু—ভগবান কি আছে! মেজমা, বড়মা তবু তো ভাগ্যি করে এসেছিল—ছোটমা'র মনেও তো সাধ আছে।

—কী সাধ বংশী?

—ছেলে! একটা ছেলের সাধ! তা তো হলো না—আব হবেও না। তা ছোটমাকে সেই জন্যেই মাইনের কথা বলে আর কষ্ট দিতে চাইনে শালাবাবু। দেখলেন না, সেদিন হাওয়া-গাড়িটা নিয়ে কি কাণ্ড হলো?

হাওয়া-গাড়িটার কথা মনে আছে ভূতনাথের। কী চমৎকার গাড়ি! বেছে বেছে সব চেয়ে বড় গাড়ি কিনেছিল মেজবাবু। সে গাড়ির কী বাহার! শেঠ, শীল, মল্লিকদের বাড়িতেও অমন গাড়ি ওঠেনি! ছেনি দত্ত তখন বেঁচে নেই। থাকলে আর একবার বুক ফাটতো বড়বাড়ির ঐশ্বর্য দেখে। সাহেব মেজবাবুর সঙ্গে নাচঘরে গিয়ে বসলো। খানাপিনার বন্দোবস্ত হলো। গাড়ি যখন বাড়িতে ঢুকলো তখন সকাল। আর সাহেব যখন গেল তখন ভর-সন্ধ্যে। ঠিক সোজা হয়ে আর চলতে পারছে না পা ফেলে। ওদিকে অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ির আস্তাবলে ছেলে-পিলে আর লোকজনদের ভিড়। দেখে আর আশ মেটে না কারো।

কে একজন বললে—ঠিক যেন আর্শির মতো মুখ দেখা যায়—না রে?

সবাই মুখ দেখে। আবছা-আবছা চেহারা দেখা যায়।

কে একজন আর বুঝি কৌতূহল না চাপতে পেরে রবারের বেলুনটা টিপে দিয়েছে আর গাঁক করে শব্দ হয়েছে একটা। আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে চারিদিকে।

—কে হাত দিচ্ছে গাড়িতে—কে রে?

দৌড়ে এল মধুসূদন। লোচন। বিধু সরকার।

মেজবাবু পই পই করে বলে দিয়েছে—কেউ যেন হাত না দেয়। নতুন গাড়ি, একটু নখের আঁচড় লাগলেই ছোপ লেগে যাবে। এ তোমার ল্যান্ডো, ফিটন, ব্রুহাম নয় যে দাগ লাগলো আর সারিয়ে নিলাম ব্রাইটন কোম্পানীর কারখানা থেকে। এ খাস বিলিতি জিনিস। এখানে সারানো যাবে না। কল বিগড়ে গেলে পাঠাতে হবে খাস বিলেতে। সেখানে সাহেব মিস্ত্রি সারাবে তবে আবার চলবে।

বিধু সরকার এক ধমক দিলে—বেরো সব এখান থেকে, বেরো।

ঝি-চাকর আর অন্য কর্মচারিদের ছেলেমেয়েরা তাড়া খেয়ে পালালো। দাসু মেথরের ছেলেটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে ছোঁয়ওনি গাড়ি। ছোঁবার সাহসও তার নেই। দাসু নিজেও ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়ে গাড়ি দেখতে এসেছিল। এক সময়ে সবাই আবার ফিরে চলেও গিয়েছে। তার ছোট ছেলেটা কেবল শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে। লোভ সংবরণ করতে পারেনি আর কি!

বিধু সরকার তাকেই ধরতে গেল। কিন্তু ধরতে গিয়েই চিনতে পেরে যেন থমকে দাঁড়ালো। মেথরের অস্পৃশ্য ছেলেকে সন্ধ্যেবেলা ছুঁলে আবার স্নান করতে হবে। এক ধমক দিলে বিধু সরকার—বেরো ছোঁড়া—হারামজাদা—দূর হ। ইত্যিজাতের আবার শখ দেখো না!

দাসু জমাদারের ছেলে সরকারবাবুকে দেখেই যে কেঁদে ফেলেনি তাই-ই যথেষ্ট। তার ওপর আবার ধমকানি। কিন্তু পাশেই ছিল আর একটা ছেলে। সে-ও পালায়নি। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। হাতের কাছে তাকে পেয়েই কান ধরে হিড়্-হিড় করে টানতে লাগলো বিধু সরকার।

—কে রে তুই? কাদের ছেলে?

ছেলেটা জবাব দেয় না তবু। লোচন পাশ থেকে বললে—ও ইব্রাহিমের ছেলে সরকারবাবু।

এক থাপ্পড় মেরে বিধু সরকার মুখ খিঁচিয়ে উঠলো—যেমন বাপের ছিরি, ছিলে যোধপুরের রাজার পিলখানার আস্তাবলে, মরতে আর জায়গা পেলিনে—এবার যা আবার মরতে সেখানে—এখন তো বাবুদের মোটর এসেছে, এখন কী চাকরি করবি কর।

কিন্তু ছেলেটাও জাঁহাবাজ বলতে হবে বৈকি! ওইটুকু এক রত্তি ছেলে। যেন কেউটের বাচ্চা! কাঁদলো না, কিছু না। গালাগালিও দিলে না প্রাণ ভরে। করলে কি এক দলা থুতু মুখ থেকে থুঃ করে ফেললে বিধু সরকারের মুখে!

আর যায় কোথায়! আগুনে যেন ঘি পড়লো। বিধু সরকারকে তখন দেখবার মতো! ওই তো চিমড়ে শরীর। শুকনো কাঠটি। কী লম্ফঝম্ফ! হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা! সারা বাড়ি থরহরি কম্পমান। যারা গাড়ি দেখতে আসেনি সকালে, এবার তারাও এল। না হয় না-ই বা হলো বামুন, তবু মুসলমানের থুতু তো! ধর্মটাই তো গেল চিরকালের মতো। ডাকো ইব্রাহিমকে। ডাকো তার গুষ্টিবর্গকে। ইব্রাহিমের চাকরির তখন টলোমলো অবস্থা। এখন যায় তখন যায়।

শেষে গোলমাল শুনে বদরিকাবাবু পর্যন্ত এসে হাজির। কী হলো রে? মোট-সোটা মানুষ। এতটুকু আসতেই হাঁপিয়ে পড়েছে। খালি গা। ট্যাকঘড়িটা ট্যাকে নিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। সবিস্তারে শুনলে সব। তারপর বললে—গোবর খাও বিধু, জাত ফিরে আসবে।

বিধু সরকার রেগে গেল—তুমি থামো দিকি ঘড়িবাবু, নাস্তিক কোথাকার! মুর্শিদকুলি খাঁ'র এঁটো খেয়ে মানুষ—জাতের মর্ম তুমি কি বুঝবে শুনি।

বদরিকাবাবু হাসতে লাগলো—আমি তো জাত মানিনে বিধু—সবাই জানে।

—তা আমি জানি, তুমি হিন্দুও নয়, বেহ্মও নও, খ্রীস্টানও নও, মোছলমানও নও, তুমি অধার্মিক, জোচ্চোর।

বদরিকাবাবু শান্ত গলায় বললে—জাত মানিনে বলে ধর্ম মানিনে, তা তো নয় বিধু। তোমার বিদ্যেবুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে—ধর্ম আর জাত, দুটো আলাদা জিনিস।

বিধু সরকার বললে—বিদ্যেবুদ্ধি থাকলে তুমি আরও ঘড়ি দম দিয়ে জীবন কাটাতে না, খাজাঞ্চিখানায় পোদ্দারি করতে আমার মতন।

বদরিকাবাবু এবারও শান্ত কণ্ঠে বললে—ভাগ্যিস খাজাঞ্চিখানায় পোদ্দার হইনি।

—তা কেন হবে ঘড়িবাবু, তাতে যে বিদ্যেবুদ্ধির দরকার লাগে।

—তা লাগুক কিন্তু ধর্ম থাকে না।

বিধু সরকার এবার ক্ষেপে লাল হয়ে উঠলো। বললে—আমার ধর্ম নেই বলতে চাও! বাবুদের ধর্মের পয়সা—আমি অধর্ম করলে বাবুদের জমিদারী কি টিকতো অ্যাদ্দিন?

—এই যে জমিদারী আর টিকছে না, সে তো তোমার জন্যেই বিধু।

—তার মানে? বিধু সরকার মারমুখী হয়ে উঠলো।

—তার মানে ঘড়ি আর চলবে না, আমি হাজার দম দিলেও আর চলবে না, একদিন দেখবে আমার ট্যাকঘড়িটাও পট করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অত বড় আলমগীর বাদশা তাই-ই রইল না, সীতারাম, আবুতোরাপ, রেজা খাঁ, ঈশা খাঁ, কেউই রইল না—তোমার বাবুদের জমিদারী তো কোন্ ছার তার কাছে—আর তা ছাড়া এবার এই তো এসে গিয়েছে—

—কী এসে গিয়েছে শুনি?

—এই যে—বলে মোটরগাড়িখানাকে দেখিয়ে দিলে বদরিকাবাবু।

—মোটরগাড়ির দাম কত জানো ঘড়িবাবু, এ তোমার ঘড়ি নয়।

—দামী জিনিস বলেই তো যাবে, দর্পনারায়ণ যখন জেলখানায় তখন একদিন রাত্রে এক সাধু জেলখানার ভেতের এসে হাজির। চল্লিশদিন না-খাওয়া না-দাওয়া, মুর্শিদকুলি খাঁ তাকে খুন করে তবে শান্ত হবে প্রতিজ্ঞা করেছে। তা সে সাধু এসে বললে—ধর্ম চাও, না জীবন চাও—যা চাও তাই পাবে। দর্পনারায়ণ বললেন—ধর্ম! সাধু চলে গেল। আবার পনেরো দিন পরে সাধু এল। তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন দর্পনারায়ণ। এক ফোঁটা জল। এক কণা ভাত। সেই অবস্থায় আবার সেই প্রশ্ন। সেবারও দর্পনারায়ণ আবার বললেন—ধর্ম। তারপর যেদিন জেলখানার মধ্যে মারা গেলেন সেই রাত্রে আবার সেই সাধু এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ধর্ম চাও, না জীবন। তখন দর্পনারায়ণ সেই একই উত্তর দিয়েছিলেন। আমি সেই দর্পনারায়ণের শেষ বংশধর—কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তুমি বাবুদের ধর্মের পয়সায় ক'টা তৌজি আর ক'টা তালুক কিনেছো এ পর্যন্ত বিধু?

এতক্ষণ যাকে নিয়ে এত গণ্ডগোল সে কিন্তু কখন ঘটনাস্থল থেকে সরে গিয়েছে। হঠাৎ ইব্রাহিম সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে—যানে দিজিয়ে ঘড়িবাবু—

ইব্রাহিমকে হঠাৎ সামনে দেখে বদরিকাবাবু বললে—এই যে এসে গিয়েছো দেখছি—তুমি ক'মাস মাইনে পাওনি ইব্রাহিম সাহেব—বলো তো?

—দো মাহিয়ানা—

বিধু সরকার হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—মেজবাবুকে আমি আজই বলছি গিয়ে, ঘড়িবাবু সকলকে ক্ষেপাচ্ছে। আর চাবুক মেরে আজ সবাইকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছি।

বদরিকাবাবু বিধু সরকারকে শুনিয়ে বলে উঠলো—তাতে কিন্তু তোমার জাত ফিরবে না—তুমি মুসলমানদের থুতু খেয়েছো বিধু, মনে থাকে যেন—

রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল বিধু সরকার।

কিন্তু বদরিকাবাবুর কথা ফললো দু'দিন বাদেই। একদিন সেই সাহেবটা আবার এল। সাহেব আসার খবর শুনে সেদিনকার মতো মেজবাবু আর নিচে নেমে এল না। সাহেবকে ওপরের নাচঘরে নিয়ে গিয়ে খানাপিনাও হলো না। সাহেব বুট পায়ে দিয়ে গট গট করে এসে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে ভোঁ-ভোঁ করতে করতে চলে গেল। আর ফিরে এল না।

যেদিন গাড়ি প্রথম এসেছিল বড়বাড়িতে, সেদিনও ইব্রাহিম কিছু বলেনি। আজও দোতলার বারান্দায় নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো খালি। আর সন্ধ্যেবেলা ইব্রাহিম যথারীতি বড় গাড়িটা নিয়ে দাঁড়ালো গিয়ে গাড়ি-বারান্দার নিচে। ইয়াসিন এসে হাতে চাবুকটা ধরিয়ে দিলে। মেজবাবু উঠলো। বড়মাঠকরুণ পানের ডিবে হাতে নিয়ে উঠলো। তারপর মেজমাঠাকরুণ উঠলো। হাসিনী উঠলো। পেছনের গাড়িতে ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবু উঠলো। আর উঠলো গোটাকতক বোতল, খাবারের চাঙারি, বরফ, সোডার সরঞ্জাম, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম, ঘুঙুর আরো কত কি!

ব্রিজ সিং গেট খুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার হো—

ইব্রাহিম লাগাম ধরে গাড়িখানাকে বনমালী সরকার লেন পার করে একেবারে বৌবাজার স্ট্রীটে পৌঁছে দিলো।

গাড়িটা এলই যদি তবে গেলই বা কেন! মধুসূদন বলে—গাড়িটা পছন্দ হয়নি মেজবাবুর।

লোচন বলে—মেজবাবু বললে আরো বড় গাড়ি কিনবে—

লোচনের ঘরে হুঁকোটা টানতে টানতে ভৈরববাবু বললে—না রে, তা নয়—মেজবাবু বলেছে—ও কালো রংটা পছন্দ নয়, বড় চোখে লাগে—ময়ূরপঙ্খী রং চাই, বিলেত থেকে ময়ূরপঙ্খী রং-এর নতুন গাড়ি জাহাজে করে আসছে—এই এল বলে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—গাড়ি সত্যিই আসবে নাকি বংশী?

—আজ্ঞে, আর এসেছে, দেখেন না রোজ ছুটুকবাবুর শ্বশুর আসে।

—কেন আসে?

ভূতনাথও দেখেছে। বিয়ে হবার পর প্রথম-প্রথম তেমন আসতো না। কিন্তু ইদানীং হাবুল দত্ত বড় আসা-যাওয়া শুরু করেছে। হাবুল দত্তর মোটরগাড়ি নেই। ঘোড়ার গাড়ি করেই আসতো প্রথম-প্রথম। যেবার কনে-বউ পাথুরেঘাটায় যায়, হাবুল দত্তর গাড়িতে যায়। আসে বড়বাড়ির গাড়িতে। আজকাল হাবুল দত্ত ট্রামে চড়েই আসে। লোহাপটি থেকে ঘেমে নেয়ে কাজ সেরে একেবারে এসে হাজির।

ভৈরববাবু বলে—ট্রামে এলেন নাকি বেয়াইমশাই?

—হ্যাঁ, ট্রামেই এলাম বৈকি!

—খুব কষ্ট হলো—ক'পয়সা নিলে?

—সাত পয়সা—তোফা আরামে এলাম।

—কিন্তু ট্রামে—যা-ই বলুন—ইজ্জত নেই তেমন।

মেজবাবু হঠাৎ আসরে ঢুকলেন—সঙ্গে সঙ্গে আতরের গন্ধে ভুর ভুর করে উঠলো ঘরটা। বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নেমেছেন একেবারে। গোঁফজোড়া সরু ছুঁচলো করেছেন মোম লাগিয়ে। লোচন এসে তামাক দিয়ে গেল পাশে। ফুঁ দিয়ে ধোঁয়াও বার করে দিয়ে গেল। নল টানতে টানতে বললেন—ইজ্জতের কথা কী যেন বলছিলে ভৈরববাবু?

—আজ্ঞে, ট্রামের কথা বলছিলাম, হয়েছে ভালো হয়েছে, কিন্তু ইজ্জত নেই ওতে—দশজনের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা।

হাবুল দত্ত বললে—মোটরগাড়ি কিনলেন নাকি বেয়াইমশাই?

মতিবাবু পাশ থেকে বললে—মোটর না কেনাই ভালো মেজবাবু। হুস্‌স করে ছাড়লো আর দেখতে না দেখতে উড়ে গেল কোথায়—কেউ দেখতে পেলে না, বাহবা দিলে না—ও যেন কেমন—

ভৈরববাবু বললে—আর কলকব্জার ব্যাপার—বিগড়ে গেল তো গেল—পড়ে থাকো রাস্তায় হা-পিত্যেশ করে।

তারকবাবু বললে—তেমন-তেমন ঘোড়া হলে মোটরকে হার মানিয়ে দেয় মশাই। হীরে, মুক্তো দিয়ে সাজিয়ে দিন না ঘোড়াকে, কোচোয়ান-সহিসকে জরির সাজ-পোশাক পরিয়ে দিন—দু'দণ্ড হাঁ করে চেয়ে দেখতে হবে না!

কথা যেন জমে না। এমনি রোজই হয়। হাবুল দত্ত বলে—বাবাজীর ঘুম ভেঙেছে নাকি?

মেজবাবু বেণীকে ডাকেন—দেখে আয় তো বেণী, ছুটুক নিচে নামলো কিনা?

সেদিন ছুটুকবাবুর সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল।

ভূতনাথই জিজ্ঞেস করলে প্রথমে—কেমন আছেন ছুটুকবাবু?

হালচাল এই কয়েকদিনের মধ্যেই বদলে গিয়েছে ছুটুকবাবুর। বৈঠকখানা ঘর থেকে গানের শব্দ আর কানে আসে না। ছুটুকবাবু যেন অদ্ভুত সৃষ্টি এ-বাড়ির। এর আগেও বিয়ে হয়েছে এ-বাড়ির পুরুষদের। কিন্তু বিয়ের আগেও যা বিয়ের পরেও তাই। ছোটকর্তা কৌস্তুভমণি চৌধুরী ফুলশয্যার রাত্রে বাড়ি ফিরেছিল রাত বারোটার সময়। একলা একলা অপেক্ষা করে করে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে পটেশ্বরী বৌঠান, তখন সোরগোল তুলে বাড়িতে ঢুকতে লজ্জা হয়নি ছোটকর্তার। মুখে দুর্গন্ধ, পা টলছে। নতুন বৌ-এর সঙ্গে একঘরে এক রাত্রি কাটিয়েছে বটে। ঘরে ঢুকে খিল বন্ধও করেছে। কিন্তু কাণাঘুষো চলেনি সেজন্যে বড়বাড়িতে। অনুযোগ শুনতে হয়নি দশ বছরের কনে-বউ পটেশ্বরী বৌঠানের কাছে। বৈদূর্যমণি চৌধুরীও কাঁচা বয়েসে কমতি ছিলেন না কিছু। বড়মা'কে দেখলে সেদিনকার কনে-বউকে আজ হয়তো চিনতে পারা যাবে না। দুধের মতো সাদা ধবধবে গা। বৌ-ভাতের রাত্রে সবাই হাঁ করে বসে আছে। কখন আসবে বর। তখনও দেখা নেই বৈদূর্যমণির। তারপর খোঁজ পড়লো সারা কলকাতায়। শেষে পাওয়া গেল রামবাগানের এক বাড়িতে। সাহেব-বীণার ঘরে। সাহেব-বীণা ছিল রামবাগানের মেয়েমানুষ। সাহেবদের মতো গায়ের রং তার। সেখানে পাওয়া গেল বড়বাবুকে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায়। ভূমিপতি চৌধুরীর বংশের ওপর সেজন্যে বদনাম হয়নি সেদিন। মাথায় বরফ দিয়ে, জ্ঞান ফিরিয়ে তবে ফুলশয্যার আয়োজন হয়েছে তাঁর। বড়মা তখন ছোট। বোঝবার বয়েস না হলেও সেকথা ভেবে চোখের জল পড়েনি তাঁর কোনোদিন। তারপর যেদিন রাজাবাহাদুর হয়েছেন, নাম যশ হয়েছে খুব, সাহেবসুবোরা এসেছে, খোদ লাটসাহেব নিজে এসেছেন খানা খেতে, চীনে-অর্কিড উপহার নিয়ে গিয়েছেন, সেদিন গর্বে বুকটা দশ হাত হয়েছে বড়মা'র। আর মেজবাবু! হিরণ্যমণি চৌধুরী। হিরণ্যমণি চৌধুরীর আর একটাতে কুলোয়নি। একরাশ মেয়েমানুষ নিয়ে রাসলীলা করেছেন, মোসাহেব পুষেছেন, গঙ্গায় পানসি ভাসিয়েছেন দলবল নিয়ে, খড়দ'র রামলীলার মেলায় গিয়ে মাতলামি করেছেন, পায়রা নিয়ে ছেনি দত্তর সঙ্গে মামলা করেছেন, কাশী-লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী আনিয়ে নাচ দেখেছেন, মুজরো দিয়েছেন, আবার খেয়াল হলো তো বরানগরের বাগানবাড়িতে একপাল মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলেছেন কখনও, কখনও শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের আধুনিক অভিনয় করেছেন। এ-সব ব্যাপারে সুনাম বই দুর্নাম হয়নি। বাবুসমাজে তাতে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তিও বেড়েছে বৈ কমেনি!

কিন্তু ছুটুকবাবু যেন সৃষ্টিছাড়া। দেখা হতেই ভূতনাথ বললে—আজকাল আপনাকে দেখতে পাই না মোটে—গানের আসরও আর বসে না আপনার।

ছুটুকবাবু গাড়ি থেকে নামছিল। হাতে বই। কলেজ থেকে ফিরছে হয়তো। বললে—সামনে এগজামিন কিনা—একটু পড়াশুনোয় মন দিয়েছি ভূতনাথবাবু। তা আসছে দোলের দিন ভাবছি একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা করবো।

ভূতনাথ বললে—এখন আবার কিসের পরীক্ষা?

—এ্যাটর্নীশিপটা দিচ্ছি কিনা—বড় শক্ত পরীক্ষা—বিয়েতে অনেকদিন সময় নষ্ট হয়ে গেল, কিছু পড়তে সময় পাইনি।

ওইটুকু মাত্র কথা হয়েছিল একদিন। কোথায় কোন্ ঘরে বসে পড়ে ছুটুকবাবু, কে জানে!

বংশী বলেছিল—আপনি তো আমার ভাইটার একটা কিছু হিল্লে করে দিতে পারলেন না ছুটুকবাবুকে বলে—কী যে করি।

ভূতনাথ বলেছিল—শশীর জায়গাটা এখনও খালি আছে নাকি বংশী—তা, এ্যাদ্দিন বলোনি কেন আমাকে?

—আজ্ঞে, সে-চাকরি আর খালি নেই শালাবাবু, ভর্তি হয়ে গিয়েছে লোক।

—কে ভর্তি হলো শেষ পর্যন্ত?

—সে মধুসূদনের লোক নয় শালাবাবু, ছুটুকবাবুর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে। এবার এ-বাড়ির লোক আর রাখবে না, ছুটুকবাবু বলেছে।

—এ-বাড়ির লোকের ওপর অত রাগ কেন বলো তো ছুটুকবাবুর?

বংশী বললে—ছুটুকবাবু একটু আলাদা ধরনের লোক শালাবাবু, যা বলবো সত্যি কথা আজ্ঞে। দেখেন না দিন রাত কেবল শ্বশুরবাড়ি যান, আর ছুটুকবাবুর শ্বশুরমশাইও কম নাকি—কেবল এ-বাড়িতে এসে দিন রাত জামাই-এর সঙ্গে গুজুর গুজুর গল্প—কানে ফুস্ মন্তর দিচ্ছে খালি।

ভূতনাথ বললে—হাবুল দত্তর কথা বলছো!

—আজ্ঞে, দত্তমশাইরা তো তেমন বনেদী ঘর নয় কলকাতার, মেজবাবুর তাই তেমন ইচ্ছে ছিল না ওখানে বিয়ে দিতে, কিন্তু বড়মা'র মেয়ে পছন্দ হয়ে গেল। বললে—ওখানেই বিয়ে দিতে হবে—সৈরভী ঘটকী একদিন মেয়ে নিয়ে এসেছিল বড়বাড়িতে—পাকা ঘটকী কিনা। ওইটুকু মেয়ে এসেই বড়মাকে একেবারে মা বলতে শুরু করেছে। ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে বাড়িময়—সব যেন আপন করে নিলে একদণ্ডে। বড়বাড়ির নিয়মই নাকি এই। বড়মা'র বাপও নাকি এখানে এনে মেয়ে দেখিয়েছে। মেজমা'র বিয়ের আগে তাঁকেও এ-বাড়িতে দেখাতে নিয়ে এসেছিল মেজবাবুর শ্বশুর।

বংশী বললে—চৌধুরীরা তো আজ্ঞে কনের বাড়িতে মেয়ে পছন্দ করতে যায় না কখনও—তা দত্তমশাই যেদিন নতুনবউকে দেখাতে আনলে—সে এক কাণ্ড শালাবাবু—হাসতে হাসতে মরি আমরা।

বড়মা একবার জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম কি মা?

নতুন কনে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে জানে না, ছটফট করে ঘুরে ঘুরে তখন দেখছে সব। একবার দৌড়ে যায় মেজমা'র ঘরে, বাঘবন্দির ঘুঁটিতে হাত দেয়, আবার কখনও ছোটমা'র ঘরে গিয়ে পুতুলের আলমারিতে হাত দেয়। টু-উ-উ-উ—করে দম টেনে দৌড়ে যায় বারান্দার এ-কোণ থেকে ও-কোণ।

মেজমা দেখে শুনে তো হেসে খুন। বলে বউ তোমার স্বগ্যে বাতি দেবে বড়দি—দেখে নিও।

বড়মা বলে—তুই নিজে কী ছিলি মেজো, আজ না হয় এত বড় ধিঙি হয়েছিস। চিৎপাত হয়ে মাটিতে শুয়ে দেয়ালে পা তুলে দিয়ে—'আয় বিষ্টি ঝেঁপে' বলে ছড়া গাসনি?

সৈরভী ঘটকী বললে—সবে তো দশে পা দিয়েছে মাঠাকরুণ—মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান কিনা একটু ছটফটে তো হবেই।

বড়মা বললে—গড়ন-পেটন তো ভালোই হবে বলে মনে হচ্ছে আমার।

নতুন রেশমী শাড়ি পরে এসেছিল নতুন কনে। দৌড়ঝাঁপের চোটে তখন অঙ্গ থেকে শাড়ি খসে পড়েছে। বারান্দায় লুটোচ্ছে শাড়িটা।

সৈরভী বললে—কেমন ভারি-ভারি ধাঁচ দেখছো না মাঠাকরুণ—বয়েসকালে ডাগর হলে ঠিক তোমার মতন দেখতে হবে বউমাকে।

বড়মা ভারি খুশি। সেইদিনই বিধু সরকারকে ডাকিয়ে আনানো হলো তেতলার সিঁড়ির গোড়ায়। আড়ালে দাঁড়িয়ে বড়মা বললেন—ও সিন্ধু, সরকারমশাইকে বল—মেজকর্তা এখানেই কথা দিক—আমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে।

মেজকর্তা সব শুনে বললে—দেখো তো কাণ্ড—লোহার কারবারি—দু'পুরুষ হলো সবে উঠেছে—এখনও বাড়িতে দুর্গোৎসব হয় না ওদের। রাস্তার ধারের ঘরে আবার ভাড়াটে বসিয়েছে—যা বনেদী ঘরে কেউ কখনও করেনি—তাদের কুটুম করা...

ভৈরববাবু বললে—আমি সব খবর নিয়েছি মেজবাবু, হাবুল দত্ত মদের নাম শুনলে নাক সিঁটকোয়।

মেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন—খবর নাও তো ভৈরববাবু—মেয়ে-মানুষ-টানুষ রেখেছে কিনা।

—তা-ও খবর নিয়েছি স্যার।

—কী শুনলে?

—কী যে আপনি বলেন মেজবাবু, হাবুল দত্ত রাখবে মেয়েমানুষ! এ হলো আলাদা কেলাশের লোক স্যার, লোহার-কারবার করে আর ঠিকেদারির কাজ আছে। মেয়েমানুষ-টানুষ পুষতে গেলে বনেদী দিল্ থাকা চাই মেজবাবু—শেষকালে জামাইকে না হাত করে ফেলে।

কিন্তু যা ভবিতব্য তা হবেই। হাবুল দত্ত দোকান বন্ধ করে আসে রোজ এক বার করে। কর্তাদের সঙ্গে দেখা হয় ভালো আর না দেখা হয় ক্ষতি নেই। সোজা চলে যায় ছুটুকবাবুর ঘরে।

সেদিন দুপুরবেলায় ডাক পড়লো বিধু সরকারের। খাজনা আদায়-পত্তোরের জমা-খরচ, রসিদ বহি, প্রজা-বিলি, সেলামী-আদায়ের নথি-পত্র সমেত।

বিধু সরকার ঝড়ের মতো খাজাঞ্চিখানায় এসে ঢুকলো। বললে—সরো দিকিনি সব, হট্টগোল করো না এখন—পরে এসো, এখন বলে মরবার ফুরসত নেই আমার—বলে চার পাঁচ দফা খাতা বই নিয়ে আবার উধাও। কাছাকোঁচার ঠিক নেই। দৌড়ুতে দৌড়ুতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—সরকারমশাই আমার বরফের পাওনাগণ্ডাটা বুঝিয়ে দিন না, ভোর থেকে বসে আছি।

বিধু সরকার রেগে লাল—বেয়াদব কোথাকার—বাবুদের পঞ্চায়েত বসেছে—এখন তাদের হুকুম তামিল করবো, না তোর হুকুম শুনবো রে? বাঁচি যদি তো পাবি সব কাল।

বেণীকে জিজ্ঞেস করলে ভূতনাথ—কীসের পঞ্চায়েত বাবুদের?

—তা জানিনে শালাবাবু।

বেণী জানে না। লোচনও জানে না। মধুসূদন জানলেও কি বলবে! সমস্ত দিনটা কেমন উদাস লাগে, কোথাও যেন কোনো আকর্ষণ নেই। ছোটবৌঠান এতক্ষণ তার নিজের ঘরে হয়তো নেশার ঘোরে ঝিমোচ্ছে। তার কাছে আজ হয়তো ভূতনাথের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। সেদিনের সেই মদের বোতল ভেঙে যাওয়ার পর আর যায়নি ভূতনাথ।

বংশী বললে—কী জানি বাবু কিসের পঞ্চায়েত।

—কে কে আছে নাচঘরে?

—দেখে এলাম, মেজবাবু, ছোটবাবু, ছুটুকবাবু, ছুটুকবাবুর শ্বশুর—এই চারজন, তা একে পঞ্চায়েত বলতে চান বলুন—আর আছে খাজাঞ্চিবাবু। খাজাঞ্চিবাবু নিয়ে পাঁচজন হলো—তা তিনি তো দাঁড়িয়েই কথার জবাব দিচ্ছেন।

এমন তো কখনও হয় না। যদিও বা হয়, তা-ও ক্বচিৎ কদাচিৎ। বছরের বর বছর একই বাড়িতে অবশ্য বাস করছে মেজবাবু, ছোটবাবু, ছুটুকবাবু। অথচ পরস্পরের কথা হওয়া দূরে থাক, মুখ দেখাদেখিও নেই। যে-যার নিজের নিজের ঘরে বসে আছেন। অথচ ঝগড়াও নেই কারো সঙ্গে।

—এই একটু আগে মধুসূদন বালকবাবুকে খবর দিতে গেল।

—বালকবাবু কে?

—আজ্ঞে, বড়বাড়ির উকিল—বউবাজারের বালক উকিল, দেখেননি?

বড়বাড়ির ইতিহাসে এ ঘটনা নতুন বৈকি। তবু তারপরে কতদিন কেটে গিয়েছে, ফলাফল কিছু জানা যায়নি। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা চলেছে। তারপর কখন সন্ধ্যেবেলা সবাই চলে গিয়েছে ভূতনাথ টের পায়নি। ভূতনাথ গিয়েছিল জবাদের বাড়ি। বাড়িতে ফিরে এসে বংশীকে জিজ্ঞেস করেছে—কিছু শুনলে নাকি, কী হলো?

—কীসের কী হলো শালাবাবু?

—এই কর্তাদের পঞ্চায়েত-এ।

—কে জানে শালাবাবু, ছোটবাবু এসে বললে—বরফ ভাঙ্। আমি বরফ ভেঙে দিলাম গেলাসে—ছোটবাবুকে যেন খুব ক্লান্ত মনে হলো, গম্ভীর গম্ভীর মুখ—কিছু কথা বললেন না—চুপ-চাপ শুয়ে পড়লেন পালঙ্-এর ওপর চিতপাত হয়ে—আমি পা টিপতে লাগলুম আজ্ঞে।

ওই ঘটনার পর থেকেই কেমন যেন সব চুপচাপ। বিধু সরকারের মেজাজ আরো রুক্ষ হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে। বলে—এ তোমার পোস্টাপিস নয় হে, এখানে আইনকানুন দেখিও না, যা পারো করে গে—এ মাসে কিছু মিলবে না, আসছে মাসে এসো।

—আজ্ঞে, পাঁচ মাস হয়ে গেল, বাইশটে মাত্তোর টাকা।

বিধু সরকার লাফিয়ে ওঠে—বাইশটে হোক আর বাষট্টিটেই হোক, পাবে না তো পাবে না, বলেছি যখন পাবে না, ব্যস। কাছারি আছে, আদালত আছে, যা পারো করো গে, যাও।

শীতকালে পৌষ-মাঘ মাসে একবার করে নান্নেবাঈ কলকাতায় আসে দল-বল নিয়ে। কাশীতে বাড়ী। ওই সময়টা বোধহয় সারা ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে মুজরো করতে বেরোয়। খাসা বাঁধুনি চেহারাটার। নাকে হীরের নাকছাবি। গলায় চন্দ্রহার। ডান কাঁধে শাড়ির আঁচলটা ঝুলিয়ে দেয়। কলকাতায় এলে দু'চারটে বাঁধা ঘরে গিয়ে সেলাম করে আসে। সেবারও এল। কোনোবার বাদ দেয়নি মেজবাবু। এ-সব ব্যাপারে বড়বাড়ির সুনাম আছে লক্ষ্ণৌ, কাশী, এলাহাবাদের বাঈজী মহলে।

সারেঙ্গীওয়ালা মুন্নালাল দলের সর্দার। তার কাজ মুজরো যোগাড় করা। রেশমী পাগড়ির ওপর জরির চুমকির কাজ। পায়ে আগ্রার নাগ্‌রা।

বিধু সরকার চিনতে পেরেছে। খাতা থেকে মাথা তুলে চশমাটার ওপর দিয়ে দেখলে একবার।

—সেলাম খাজাঞ্চিবাবু!

—কী মুন্নালাল, আবার এসে গিয়েছো!

—আজ্ঞে, দু'রোজ হলো কলকাতাতে এসেছি, কাল মুজরো ছিল হাটখোলার দত্তবাড়ির কোঠিতে, আজ আছে ঠনঠনিয়ার নটে দত্তবাবুর বাড়ি—মেজবাবুকে একবার সেলাম জানাতে এসেছি।

—নান্নেবাঈ কেমন আছে?

—হুজুর আপনাদের মেহেরবানি আর খোদার মরজি, মেজবাবু ফরমায়েশ করেন তো, একদিন এখানে নাচা-গানা করে যাই।

বিধু সরকার ছাড়লে না। বললে—তা অন্যবার কলকাতায় এলে আগে মেজবাবুকে সেলাম করে তবে ঠনঠনের দত্তবাড়িতে যাও—এবার এত পরে এলে কেন মুন্নালাল? মেজবাবু কি ও-বাড়ির থেকে বেশি মুজরো দেয় না?

—ছিয়া—ছিয়া—কি যে বলেন বাবুজী, এবার ননীবাবু নিজে ডেকে এনেছিলেন আমাদের, মেম-সাহেবদের খানাপিনা ছিল বাড়িতে, সেখান থেকে তিন দিন ছাড়া পেলাম না, এখানে আসবো আসবো করছি, নটেবাবু ধরলেন গিয়ে—আজকে একটু ফাঁক পেলাম, ভাবলাম সেলাম জানিয়ে আসি মেজবাবুকে—গোস্তাফি মাফ হয় হুজুর!

—ননীবাবু! ননীবাবুটা আবার কে! বিধু সরকার ভুরু কোঁচকাল।

—আজ্ঞে, পটলডাঙার ননীবাবু।

তবু চিনতে পারলো না বিধু সরকার। চুলোয় যাক! আজকাল তো সবাই বাবু। দুটো কাঁচা পয়সা হলেই বাবু। ছেনি দত্ত মারা যাওয়ার পরে নটে দত্তও টেক্কা দিতে শুরু করেছে।

—তা বোসো তুমি, মেজবাবু তো এখন ঘুমোচ্ছেন—উঠলে খবর দেবো।

বংশী দেখতে পেয়েই দৌড়ুতে দৌড়ুতে এল—কোথায় ছিলেন শালাবাবু চৌপর দিন, আপনাকে অত পই পই করে বললাম—সন্ধ্যেবেলা কোথাও বেরোবেন না, জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে থাকবেন—আর ছোটমা'র কাছে আমার যাচ্ছে-তাই হেনস্থা হলো।

—কী হলো কি?

—ছোটমা তৈরি হচ্ছে যে।

—কিন্তু আমি তো দেরি করিনি, তুমি ছোটবাবুর জন্যে কাপড় কোঁচাতে গেলে, আর আমিও ভাবলাম বসে কি করবো, একটু ঘুরে আসি—বেলা তো অনেক আছে।

—কোথায় গিয়েছিলেন শুনি?

—আর কোথায়, একটা চাকরির চেষ্টায় গিয়েছিলুম যেমন যাই আর কি।

কথাটা ঠিক সত্যি বলা হলো না। চাকরির চেষ্টাতেই যথারীতি বেরিয়েছিল ভূতনাথ, কিন্তু কোন্ ঘটনাচক্রে কোথা দিয়ে অমন করে জবাদের বাড়ি চলে যাবে কে জানতো! অথচ কি প্রয়োজন ছিল যাবার? তাকে কেউ যাবার জন্যে মাথার দিব্যি দেয়নি। আর তা ছাড়া না বেরোলে তো লোচনের সঙ্গে দেখা হতো না অমন জায়গায়।

বংশী বললে—আপনি বসুন গিয়ে আপনার ঘরে—আমি দেখি গিয়ে ছোটমা'র কদ্দুর।

নতুন একটা কোম্পানি হবার কথা আছে। কয়েকজন লোক নেবে খবর পাওয়া গিয়েছিল। দইয়েহাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে দর্মাহাটায়। টা-টা করছে রোদ্দুর। মিছিমিছি এতদূর আসা। কোথায় কোম্পানি, কোথায় কি! পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন হচ্ছে। এখনও কিছুই হয়নি।

একজন বললে—এখন কোথায় কি বাবু, আগে বাড়ি সারা হোক, তবে তো লোক নেওয়া।

—কতদিন লাগবে আরো?

—সে বাবু আরো ছ'মাসের ধাক্কা।

লোকটা বোধ হয় নতুন কোম্পানির দারোয়ান। টুলের ওপর বসে বসে খইনি টিপছিল। গলায় লম্বা পৈতে। কথা বলে আবার হাতের রামায়ণটা পড়তে লাগলো। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। পেঁচানো গলি। তবু ওই সরু গলিটার বাঁকের মুখেই একটা বিরাট বটগাছ। শেকড়টা প্রায় রাস্তা জুড়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও বসলে বেশ আরাম হতো। লোহার চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি ভর্তি মাল গড় গড় করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কুলীরা।

—এখানে কোনো চাকরি-বাকরি খালি আছে ভাইয়া—সামনে যাকে পাওয়া গেল তাকেই জিজ্ঞাসা করে বসলো ভূতনাথ—এই ধরো সাত-আট টাকা মাইনে, আর কাজ বলতে সবই পারবো।

এমনি করে কয়েকদিন ঘুরলে একটা না একটা চাকরি হবেই। চীনেবাজার, সুর্তিবাগান, রাধাবাজার, সোয়ালো লেন, লায়ন্স রেঞ্জ—এই-সব পাড়ায় আজকাল অনেক আপিস হয়েছে। পাথরের সাইনবোর্ডের ওপর সব নাম লেখা।

সুবিনয়বাবু বলতেন—বাঙালীরা আজকালই যা ব্যবসায় পেছনে হটে এসেছে, কিন্তু সেকালে সবই তো ছিল বাঙালীর। নকু ধর টাকা ধার না দিলে ইংরেজরা কোথায় থাকতো আজ ভূতনাথবাবু? মুর্শিদাবাদের নবাবদের কাছে জগৎশেঠ যা ছিলেন ইংরেজদের কাছে নকু ধরও ছিলেন তাই। এই কলকাতার প্রথম যৌবনে যাঁরা তার সেবা করেছিলেন তাঁরা তো বাঙালীই। দ্বারকানাথ ঠাকুর করেছিলেন 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'। রাজা সুখময়, তিনি ছিলেন স্যার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ান। 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে'র একমাত্র বাঙালী ডিরেক্টর। তারপর বিলিতি কোম্পানীর সব বেনিয়ানরা প্রায় সবই তো বাঙালী। ধরো আশুতোষ দে, গোরাচাঁদ দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ লাহা, শম্ভু মল্লিক।

কিন্তু ননীলাল বলে—এটা হলো কয়লাখনি লোহা আর স্টীম ইঞ্জিনের যুগ।

সেদিন ননীলালের বাড়িতে রাত্রে এই কথাই হচ্ছিলো।

ননীলালের বসবার ঘরখানায় কিন্তু ফরাশ পাতা নেই। গোটা কতক চেয়ার টেবিল বসিয়েছে।

ননী বললে—ও-সব বড় বড় লোকদের কথা ছেড়ে দে—ওরা ছিল ইংরেজদের পুষ্যিপুত্তুর, এটা নতুন দেশ, বিদেশ বিভুঁই—এখানে বাস করতে গেলে এখানকার কয়েকজন লোকের সাহায্য নিতে হবেই—তাই ওদের সব বেনিয়ান মুৎছুদ্দি করে নিয়েছিল আর কিছু কিছু সুবিধেও ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু কত জমিদারকে ভিটে-মাটি ছাড়া করেছে জানিস? সেকালে বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়িতে বন্দী করে রেখেছিল। দিনাজপুরের রাজবংশের সমস্ত সম্পত্তি ১৮০০ সালে নীলেম হয়ে যায়। নদীয়ারাজের তো সব গেল বাকি খাজনার দায়ে। রাজা শুধু লাখ টাকা করে ভাতা পেতো।

ভূতনাথ বললে—এবার রাত হলো বাড়ি যাই।

—যাবি, আর একটু বোস।

—তুই ভাত খাবি না—বউ কিছু বলে না?

ননী গেলাসটা শেষ করে বললে—মেয়েমানুষে আর নেশা নেই ভাই—ও যে-বিন্দী, সে-ই মিসেস গ্রিয়ারসন, সে-ই বউ—ও সবাই এক—এখন কেবল টাকা। এটা টাকার যুগ। আর সেই টাকার গোড়া হলো কয়লার খনি আর কলকারখানা। দেখবি তোকে বলে রাখছি, একদিন রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি আর হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, মানভূম, সিংভূম—এই সমস্ত জায়গাটা একেবারে সোনা হয়ে উঠবে—কলকাতার চেয়ে দশ গুণ বড় হয়ে উঠবে—আর সমস্ত কলকারখানা গড়ে উঠবে ওইখানেই।

—তুই স্বপ্ন দেখিস নাকি?

—স্বপ্ন দেখি বৈকি—কিন্তু জেগে জেগে—আমার আর কোনো স্বপ্ন নেই ভাই, কেবল ভাবি হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ লোক খাটছে আমার কারখানায়, মজুররা সার বেঁধে চলেছে কাজ করতে আর আমার গাড়িটার সামনে এলেই সেলাম করছে।

তারপর থেমে বললে—তাই তো সেদিন চূড়োকে বললাম—যদি টাকা করতে চাস তো কোলিয়ারি কিনে ফেল—কয়লা না হলে কিছু হবে না, আজকাল সব স্টীমের যুগ—স্টীমের জন্যে কয়লার দরকার—কিন্তু ওর কাকাদের তাতে মত নেই।

ভূতনাথ বললে—ছুটুকবাবু আজকাল খুব লেখাপড়ায় মন দিয়েছে। গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছে।

—আরে কিছুই হবে না ওর, আমাকে বলেছিল, জমিদারী থেকে তেমন আয় হচ্ছে না আর আগেকার মতন, সবাই চুরি-চামারি করতে আরম্ভ করেছে, প্রজারাও সব শহরে আসছে কলকারখানায় কাজ করতে, তাতে আয় বেশি। এবার ওর বিয়েতে মহাল থেকে কেউ কিছু নাকি পাঠায়নি—কেবল—খেয়ে গিয়েছে পেট পুরে—সেদিন দেখ না, ওর মেজকাকা গাড়িটা কিনলে, নগদ টাকা দিতে পারলে না বলে বেচে দিতে হলো—মাঝখান থেকে লোকসান হলো কিছু টাকা।

—কিন্তু নান্নেবাঈ তো সেদিন আবার এসেছিল নাচতে, শুনলাম—তিনশ' টাকা নিয়ে গেল।

—ওই যে, প্রেস্টিজ, আর কিছু নয়, আমি আনিয়েছিলুম নান্নেবাঈকে লক্ষ্ণৌ থেকে পাঁচশ' টাকা খরচ করে, সাহেব-মেমদের একটা পার্টি দিয়েছিলাম, বেটারা আমাদের দেশের গান শুনতে চেয়েছিল, তাই—কিন্তু তেমন পাঁচশ' টাকা খরচ করে যে পাঁচ হাজার টাকা উসুল করে নিয়েছি।

—সে কি রকম?

—ওই তো তফাত—চৌধুরীরা জানে টাকা জামাতে নয় জানে শুধু খরচ করতে—কিন্তু টাকার বাচ্চা পাড়াতে তো জানে না—চূড়োকে তাই তো বলেছিলাম। বললাম—যদি ব্যবসা করতে চাস তো আমার ফার্মে আয়, কিছু টাকা ঢাল, যাতায়াত কর দু'-চার দিন—ঘোরা-ফেরা কর—কেমন করে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে দ্যাখ শোন—তা তো করবে না। ওর কাকী সেদিন পুতুলের বিয়ে দিয়েছে শুনলুম তার ঝি-এর পুতুলের সঙ্গে। খুব নাকি খাওয়া দাওয়া হয়েছে—চূড়োই বলছিল।

সে এক কাণ্ড। ছুটুকবাবুর বিয়ের দু'দিন আগে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ নেমন্তন্ন হয়ে গেল ভূতনাথেরও। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ নেমন্তন্ন কিসের?

—আজ্ঞে, আজ মেজমা'র পুতুলের বিয়ে যে—গিরির মেয়ে আর মেজমা'র ছেলে।

গিরি বলে—আমার টাকা কোথায় মেজমা—মেয়েকে আমি গয়না-গাঁটি কিছু দিতে পারবো না।

মেজমা বলে—আমার ছেলের বউ, আমি গা সাজিয়ে দেবো—তুই বিয়ের যোগাড়-যন্তর কর।

তা যোগাড়-যন্তর কম হলো না। টাকা সব মেজমা'র। বলে—গরীবের মেয়ে বলে জাঁকজমক কম হলে চলবে না, যা টাকা লাগে আমি দেবো।

ন'বৎ বসলো দেউড়িতে। রীতিমতো ঘরে ঘরে নেমন্তন্ন হলো। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব পাঠালো মেজমা। দেখবার মতো জিনিস সব। কাঁচের চুড়ি, সোনার বেঁকি চুড়ি, পাটি হার, ছানার পুতুল, দশ চাঙাড়ি সাড়ি সেমিজ। দরজির দোকান থেকে তৈরি হয়ে এসেছে কনের জামা সেমিজ। যেমন হয় সাধারণ বিয়েতে। গিরিও পাঠালে ফুলশয্যা। সিঁদুরেপটি থেকে ফুল, ফুলের মালা এল। রূপলাল ঠাকুর সিধে পেলেন। রাত্রিবেলা সার বেঁধে বড়বাড়ির চাকর-বাকর, ঝি, ছিউরি, কর্মচারি সব খেতে বসলো। শাঁখ বাজলো। উলু দিলে মেয়েরা। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই।

গিরির মেয়ের বিয়েতে কিছু ধার-দেনা করতে হলো। মাঝখান থেকে হাজার বারোশ' টাকা খাজাঞ্চিখানা থেকে বেরিয়ে গেল মবলক।

ননী বললে—যুগ যে বদলে গিয়েছে সে খবর তো আর রাখে না ওরা। ওকে বললাম তো, আস্তে আস্তে জমিদারিটা গুটিয়ে আন, কালেক্টরিতে দরখাস্ত ক'র কিম্বা ভূমিস্বত্ব যা-কিছু আছে সব বেচে দে। কেনবার লোকের অভাব নেই, আমিই কিনে নিতে পারি, কিন্তু তার থেকে যে নগদ টাকা পাওয়া যাবে, সেইটে দিয়ে কিছু যদি নাও করিস, সব চেয়ে নিরাপদ কয়লার খনি কেনা, একটা খনি শেষ হতেই একটা পুরুষ কেটে যায়। তারপর সেখানে চুপ করে থাকলেই চলবে না, কয়লার খনি কেনো তারপর কারখানা চালাও। আজকাল তো লোহার যুগ—অঙ্ক কষে লাভ-লোকসান খতিয়ে সব দেখিয়ে দিলাম সেদিন।

—ছুটুকবাবু কী বললে?

—আসলে চুড়ো কী বলবে, হাবুল দত্তই তো ওকে চালাচ্ছে—দিনরাত জামাইকে পরামর্শ দিচ্ছে, এটা করো, সেটা করো। বিয়ের আগে হাবুল দত্ত আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—ছেলে কেমন। আমি বলেছিলুন—গোবর গণেশ ছেলে, ভালো-মন্দর বালাই নেই। মনটা ঝাড়া-ঝাপটা, আপনি চালিয়ে নিতে পারেন তো দিন মেয়ে। বনেদীঘর, তাতে তো আর কোনো সন্দেহ নেই, তবে আজকাল বনেদীর কোনো দাম নেই। এখন ও-সব সামন্তযুগ চলে গিয়েছে। এখন ক্যাপিট্যালিজম-এর যুগ। ক্যাপিট্যাল মানে মূলধন—যার আছে তারই খাতির। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেতে গিয়ে দু'হাতে টাকা ছড়ালেন, নুনের এজেন্ট প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ানী করলেন, নীলের ব্যবসা করলেন—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক করলেন, চিনির কল করলেন, কয়লার খনি করলেন, তাই করেই প্রিন্স হলেন—প্রিন্স দ্বারকানাথের মতো লোক ভারতবর্ষে আর দুটো জন্মালো না। লোকে সব নাম করে রামমোহনের, কিন্তু লোক তো প্রিন্স—

বেশ রাত হয়ে এসেছিল। ননীলাল ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে পা তুলে দিয়েছিল। পটলডাঙার এ বাড়িটাও বেশ বড়। দু'মহল। পুজোর দালান, দেউড়ি সবই বড়বাড়ির ছাঁদে। চারদিকে চেয়ে বোঝা যায়, এ বাড়ির মালিকও একদিন কলকাতার পত্তনের সময়ে ঐশ্বর্য আহরণ শুরু করেছিলেন। মালিক আজ নেই। ননীলালের শ্বশুর নেই। নাবালক শ্যালকরা সব ননীলালের তাঁবে। একদিন এই বাড়ির মালিকও যা কল্পনা করতে পারেননি, ননীলাল তাই সফল করেছে। বারবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠে এ-ঘরে আসতে হয়। খুব ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গরাই এখানে আসবার অনুমতি পায় বুঝি। খান কয়েক বিলিতি ছবি টাঙানো দেয়ালে। অর্ধ-অনাবৃত মেম-সাহেবদের চেহারা।

ননী বললে—ভাবছি একবার বিলেত যাবো।

—সেকি, বউ কিছু বলবে না?

—কারোর বলার তোয়াক্কা করলে আর চলে না, অনেকদিন ধরে সবাই যেতে লিখছে, অনেকগুলো নতুন মেসিন অর্ডার দিয়েছি, সেগুলো নিজে দেখে কেনবার ইচ্ছে আছে, তা ছাড়া ওই যে বললুম—প্রিন্স দ্বারকানাথ আমার আদর্শ।

হঠাৎ বাইরে দরজার কাছে যেন কার পায়ের শব্দ হলো।

ননী চিৎকার করে উঠলো—কে রে, বদরি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

—ক'টা বাজলো রে?

—হুজুর অনেক রাত হয়েছে—কী খাবেন আজকে?

—কী খাওয়াবি বল তো?

—হুজুরের মরজি হলে যা চাইবেন সব খাওয়াতে পারি।

—যা তুই এখন, যা খুশি তোর রাঁধ।

বদরি চলে গেল। চাপ-দাড়ি। মাথায় পাগড়ি। কোমরে তকমা আঁটা। খানসামার মতো চেহারা।

ননী বললে—ওর নাম বদরুদ্দিন, আমি ওকে হিন্দু বদরিনারায়ণ বানিয়ে দিয়েছি।

—মোছলমান নাকি?

—হ্যাঁ, কিন্তু চমৎকার রাঁধে, ওর ঠাকুরদা ছিল দ্বারকানাথের বাবুর্চি।

—বাড়ির রান্না খাস না?

—রাত্তিরের খাবারটা বদরিই রাঁধে! ঠিক নেই তো কখন খাবো না খাবো, তা ছাড়া আমাদের সরকারী রান্নাঘরের অনেক বাছ-বিচার, অন্দরমহলের বাসন বাইরে যদি আসে তো আর ভেতরে ঢুকতে পাবে না। আমার বাইরের জন্যে থালা বাসন সব আলাদা—আমি নিজে ভেতরে ঢুকলে কিছু আপত্তি নেই, কিন্তু বাইরের বাসন ঢুকলেই সব গোল্লায় যাবে।

ভূতনাথ এতক্ষণে বলি বলি করে এবার হঠাৎ বলে ফেললে—আমার সেই চাকরির কথাটা আর কিছু ভেবেছিলি?

ননীলাল বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ খুলে বললে—নিশ্চয়ই, আমি তো বলেইছি তোকে তোর চাকরি হবে—আমার ফার্মেই হবে—সে তো বলেই রেখেছি।

ভূতনাথ বললে—অনেক জায়গায় ঘুরছি কিনা—সবাই কেবল...

ননীলালের হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল। বললে—হ্যাঁ ভালো কথা, তোর সেই পার্টির কী হলো রে—অনেক টাকা আছে বলছিলি?

ভূতনাথ অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো। বললে—সুবিনয়বাবুর কথা? তা চাকরির ধান্দায় আর ওদিকে যেতে পারিনি ভাই। বড্ড ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে এ ক'দিন—কালই যাবো।

কিন্তু পরদিনই ঠিক যাওয়া হয়নি জবাদের বাড়ি। অনেক রকম সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়। কী অজুহাত নিয়ে যাবে, গিয়ে কী বলবে—এই-সব কথা ভাবতে ভাবতেই আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অথচ এত সঙ্কোচ থাকবার কী যে কারণ থাকতে পারে কে জানে।

ননীলালের বাড়ি থেকে বোরোতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল প্রকাশের সঙ্গে।

রাত্রের অন্ধকারেও প্রকাশকে চিনতে বিশেষ অসুবিধে হবার কথা নয়।

প্রকাশ অন্যমনস্ক ছিল। ভূতনাথকে দেখতেও পায়নি।

—প্রকাশ না!

চমকে উঠেছে প্রকাশ ময়রা—ঠাকুরমশাই, আপনি এখেনে?

—এই এসেছিলাম এদিকে। এত রাত্রে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

—এই তো সাহেবের বাড়ি আমাদের, সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করবো ভাবছি, রাত্তির করেই তো ফেরেন সাহেব—বাড়ি ঢোকবার সময় ধরবো পা জড়িয়ে—যা থাকে কপালে—হয় এস্পার নয় ওস্পার—কী বলেন আপনি?

—কী হয়েছে তোমার?

—আজ্ঞে, চাকরিটা চলে গেল।

—গেল কেন?

—আজ্ঞে, কপালের ফের—আর কী বলবো, আমি ভাবছিলাম আপনার কথাটা সাহেবকে বলবো একবার, তা আমার চাকরিটাই চলে গেল—দেখি একবার সাহেবকে ধরে—ক'দিন ধরে চেষ্টা করছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আজ ধরবো পা জড়িয়ে—কী বলেন?

প্রকাশের জন্যে কেমন যেন মায়া হয়েছিল ভূতনাথের সেদিন। লোকটা কোনো কিছুতে টিকে থাকতে পারলে না। হয়তো পারবেও না। কপালের ফেরই বটে। জিলিপীর ব্যবসা, ঘটকালি, চাকরি,

সবগুলোই ক্ষণস্থায়ী হয় ওর জীবনে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—তুমি দোষটা করেছিলে কী?

—আজ্ঞে, ঠাকুরমশাই, কোনো দোষ তো করিনি জ্ঞানত।

—আর কারো চাকরি গিয়েছে তোমার সঙ্গে?

—না আজ্ঞে।

তারপর একটু থেমে বললে—তবে হ্যাঁ, একদিন সাহেবের ঘরে গিয়ে মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিলাম বটে, বলেছিলাম—আট টাকা পাচ্ছি হুজুর, এতে কুলোতে পারছি না। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, কিছু দেনা হয়ে গিয়েছে বাজারে—এই-সব কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম—দু'এক টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিন হুজুর।

—তারপর?

—তারপর আর কি, চাকরি গেল—ম্যানেজারবাবু চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে হঠাৎ। আমি জানতেও পারিনি আগে—আগে জানলে বলতাম, দু'টাকা মাইনে বরং কমিয়ে দিন হুজুর, তবু চাকরিটা রাখুন দয়া করে।

মনে আছে প্রকাশ ময়রার কথা শুনে বেশ হাসি পেয়েছিল সেদিন। হাসিটা অবজ্ঞার নয়, ঠাট্টারও নয়। অনেকটা কান্নার মতো করুণ হাসি সেটা। জীবনে এমন হাসি অনেকবার হাসতে হয়েছে ভূতনাথকে। ননীলাল কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি দেয়নি তাকে। কিন্তু সে দোষ ঠিক ননীলালেরও নয়। ননীলালেরা অমন করেই থাকে সংসারের সব ভূতনাথদের সঙ্গে। তার জন্যে ভূতনাথ জীবনে কখনও অনুশোচনা করেনি। তবে দুঃখ কি হয়নি? হয়েছে, কিন্তু নিজের জন্যে নয়। ছোটবৌঠানের জন্যে এখন এই মুহূর্তেও কেমন ভারি হয়ে ওঠে গলা, ভিজে আসে চোখ দুটো।

জবা কিন্তু সেদিন সেই কথাই বললে। অবশ্য হাসতে হাসতেই বললে। বললে—আপনার নিজের অপমান করবার সাহস নেই বলে বুঝি ননীবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?

—কী বলছো তুমি? কোন্ ননীবাবু?

—আপনার বন্ধু ননীবাবু।

—সে এসেছিল নাকি?

কিন্তু গোড়া থেকেই সমস্তটা বলা ভালো। বহুদিন পরে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে যেদিন আবার গিয়ে ভূতনাথ 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, আজ ভাবলে মনে হয়, সে-দিন না গেলেই যেন ভালো হতো। অন্তত ঠিক এই সময়ে। বাড়িময় অত ব্যস্ততা। কিন্তু ভূতনাথের তো তখন সে-কথা জানবার নয়। সমস্ত বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গিয়েছে। সব ছবি নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। নানা জিনিস স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে চারিদিকে। এখানে ওখানে নোংরা। এখুনি যেন এ-বাড়িতে এসে উঠলো কেউ, কিংবা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এরা।

ভূতনাথ বললে—এ-সব কী জবা?

জবা বললে—আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—সে কি? কবে?

—আজই, এখুনি।

—কেন?

জবা শাড়িটাকে কোমরে জড়াচ্ছে। সমস্ত মুখময় ঘামের বিন্দুগুলো ফুটে উঠেছে। সকাল থেকে যেন অনেক কাজ করতে হচ্ছে তাকে। কথা বলতে বলতে এক ফাঁকে কোথায় চলে গেল একটা কাজের ছুঁতোয়। তারপর এসেই আবার বললে—আপনি তো বেশ লোক, পাঁচশ' টাকা নিয়ে সেই যে চলে গেলেন, আর দেখাই নেই—বাবা প্রায়ই আপনার নাম করেন।

—কেমন আছেন বাবা?

—দেখলেই বুঝতে পারবেন।

—কিন্তু আসতে আমি পারিনি সত্যি, চারদিকে চাকরির জন্যে ঘোরাফেরা করছি। সমস্ত দিন

ডালহৌসি স্কোয়ারে ঘুরি ফিরি, তারপর এমন ক্লান্ত হয়ে থাকি, এতদূর হাঁটতে ইচ্ছে করে না আর, কিন্তু মাঝখানে সুপবিত্রবাবুর সঙ্গে রাস্তায় একদিন দেখা হয়েছিল। খবর পেয়েছিলাম—বাবা ভালো আছেন—তা ছাড়া পরের বাড়িতে থাকি খাই, আর ওদের ওখানে বেশিদিন হয়তো থাকাও চলবে না—আর কী সূত্রেই বা থাকবো বলো না। ওরা খেতে দিচ্ছে এই তো যথেষ্ট।

জবা বললে—ততক্ষণ চলুন বাবার কাছে বসবেন—আমি হাতের কাজগুলো সেরেনি।

সুবিনয়বাবু বিছানার ওপর চুপ করে শুয়েছিলেন। বললেন—কে, ভূতনাথবাবু—এসো।

ভূতনাথ পাশে গিয়ে বসলো। এ-ঘরের সব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে অনেক। মনে আছে রাজারাণীর এক জোড়া মস্ত ছবি টাঙানো ছিল উত্তরের দেয়ালে। জমকালো ভেলভেটের পোশাক। আর তার ওপরে জবার মা'র ছুঁচের কাজ করা একটা ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটের ওপর লেখা "God save the King"। তারপর ছিল জবার মায়ের একটা অয়েল পেন্টিং। পা গুটিয়ে বসে আছেন আসনের ওপর। মাথায় আধ-ঘোমটা। লম্বা হাতা জামা। আস্তিনের ওপর সোনার চুড়ি অনেক গাছা করে। চওড়া পাড় ঢাকাই শাড়ি।

একদিন প্রথম এই ঘরে এসে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, তোমার কোনো ছবি দেখছিনে জবা—ছোটবেলার কোনো ছবি?

—আমি কি ছোটবেলায় মা'র কাছে ছিলুম যে আমার ছবি থাকবে। আমি তো কলকাতায় এসেছি যখন আমার বয়েস মাত্র আট-ন' বছর। তার আগে তো বলরামপুরেই থাকতাম।

—কোথায় থাকতে তুমি? বলরামপুরে?

জবা বললে—জানেন, বলরামপুরে আমার ঠাকুর্দাকে আমি বাবা বলতাম। ঠাকুর্দা পুজো করতেন—আমি একদিন নৈবিদ্যির ফলটল সব খেয়ে ফেলেছিলাম, চোখে তো তিনি ভালো দেখতে পেতেন না। শেষে ঠাকুরমা বললে—ওমা, তোমার নৈবিদ্যির কলা কি হলো?

ঠাকুর্দাও হাত দিয়ে দিয়ে দেখলেন তখন। বললেন—সত্যি তো কলা কে নিলে?

খোঁজ খোঁজ—কে কলা খেলে। আমি তখন পেছনের মকরতলার আমগাছে উঠে লুকিয়েছি। ঠাকুর্দা খাওয়া ছেড়ে উঠলেন। খাওয়া হলো না তাঁর। কোথায় গেল জবা! একবার খাওয়া ছেড়ে উঠলে আর তো হিন্দুদের খেতে নেই। খুঁজতে লাগলেন সব জায়গায়। আমি গাছে উঠে তখন সব দেখছি চুপটি করে। ভয় হলো তাঁর। কোথায় গেল! বললেন—বোধ হয় গুপী এসে নিয়ে গিয়েছে—বাবাকে তিনি গুপী বলে ডাকতেন কিনা। ঠাকুর্দা তো বাবার মুখ দেখতেন না, মারা যাওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা কখনো ভাঙেননি।

—তারপর?

—তারপর, ঠাকুর্দা তো ছিলেন অন্ধ, শনিবার সারাদিন উপোস করে রোববার সকালে হয়তো খেতে বসেছেন, আমাকে ঠাকুরমা পাতের কাছে বসিয়ে রেখেছে পাহারা দিতে, আমার তো খুব সুবিধা—পাত থেকে সব তুলে খাচ্ছি, কেউ দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ ঠাকুর্দার খেয়াল হয়েছে—বললেন—মাছ হয়নি আজ?

ঠাকুরমা বললে—সে কি? তবে বোধ হয় বেড়ালে নিয়ে গেল।

কিন্তু বেড়াল আসবে কী করে! আমি তো পাহারা দিচ্ছি।

ঠাকুরমা বললে—হয়েছে, বেড়াল নয়—ও জবাই খেয়ে নিয়েছে পাত থেকে।

—ওমা তাই নাকি! ঠাকুর্দা হাসলেন। ঠাকুর্দার একটা দাঁতও ছিল না। ফোগলা দাঁতে হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন—তুমি এত দুষ্টু হচ্ছো দিন দিন—তোমাকে এবার গুপীর কাছে ঠিক পাঠিয়ে দেবো—ও থাকুক গিয়ে কলকাতায়।

—তখন কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার নাম করলেই ভারি ভয় হতো আমার।

ভূতনাথ বলেছিল—কেন, ভয় হতো কেন?

—কী জানি, বয়েস তো বেশি ছিল না। শুনতুম সবাই বলতো বাবা মা নাকি ম্লেচ্ছো হয়ে গিয়েছে, বাবার কাছে গেলে জাত্ত যাবে, তখন জাত মানে কি তা বুঝতুম না—কিন্তু মনে হতো

জাত যাওয়াটা বুঝি একটা খুব ভীষণ ব্যাপার—বলে জবা হেসে উঠলো। তারপর আবার বললে—এখনও বলরামপুরের কথা মনে পড়লে কিন্তু খুব ভালো লাগে।

ভূতনাথ বললে—কতদিন পর্যন্ত কেটেছে তোমার সেখানে?

—আট-ন' বছর বয়েস পর্যন্ত তো ঠাকুর্দার কাছেই কাটিয়েছি। বাবা-মা'কে চোখেও কখনও দেখিনি—বাবা চিঠি লিখতেন ঠাকুরমাকে। ঠাকুরমা আবার সেই চিঠি নিয়ে পড়িয়ে আসতো পাড়ার লোকের কাছে। ঠাকুর্দা জানতে পারলে তো একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবেন।

ঠাকুরমা বলতেন—এই দ্যাখ্ তোর বাবা তোর কথা লিখেছে। যাবি তো তোর বাপের কাছে?

বলতাম—না, যাবো না, আমার যদি জাত যায়? তা আমি জন্মেছিলাম কিন্তু কলকাতায়—আশ্চর্য!

—এই বাড়িতে?

—না, তখন আমাদের বাড়ি ছিল বার-শিমলেয়। বাবা এ-বাড়ি নতুন করেছেন, আমার ভাই হবার পর—কিন্তু আমি শুনেছি জন্মের দু'মাস পরেই ঠাকুর্দা আমায় চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলরামপুরে।

—চুরি করে?

জবা বলেছিল একদিন সে গল্প। জবা বলে—আমি কি তা দেখেছি নাকি? আমি যা শুনেছি বাবার কাছে আর ঠাকুরমা'র কাছে, তা-ই জানি।

সে অনেককাল আগেকার কথা। সুবিনয়বাবুর বাবা রামহরি ভট্টাচার্য একবার গুণ্ডা লাগিয়েছিলেন। বিশ টাকা খরচও করেছিলেন। বলেছিলেন—গুপীকে গাঁয়ে দেখতে পেলে খুন করবি তোরা, যে ছেলে জাত খুইয়েছে সে আমার ছেলেই নয় জানবি, ওর মুখদর্শন করবো না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

বলরামপুর থেকে কলকাতা হাঁটাপথে দেড় দিনের পথ।

রামহরি ভট্টাচার্য বারোয়ারিতলার বটগাছের তলায় মাচার ওপর বসে থাকতেন সন্ধ্যেবেলা। গ্রীষ্মকালের দুপুরে ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতেন খেয়ে দেয়ে। তারপর একবার রথতলায় গিয়ে বসতেন দাবার আড্ডায়। সেইখানে খানিকক্ষণ খেলা দেখে উঠতেন। তারপর যেতেন বিলের ধারে কলমি শাকের চেষ্টায়। মল্লিকদের বাগানে কাঁঠাল পাকার খবর পেয়ে যেতেন সেখানে। বলতেন—গাছে তোমাদের কাঁঠাল পাকলো আর বামুনকে দিলে না যে! তারপর সন্ধ্যেবেলা এসে বসতেন নারাণ ময়রার দোকানের সামনের মাচায়। বলতেন—দাও তো নারাণ, বামুনের ঘটিতে একটু জল।

নারাণ ময়রা চিনির বাতাসা করতো। পালা-পার্বণে ছানার সন্দেশ করতো। আর করতো গজা। এমন গজা যে বুট জুতো দিয়ে মাড়ালে ভাঙবে না। সেই গজা চৈত্র সংক্রান্তির সময় দোকানে উঠতো। তারপর যে'কটা বিক্রি হতো না তা আবার রসে ফেলে দিয়ে টাটকা করে বেচতো আষাঢ় মাসে রথের দিন। তাতেও যদি বিক্রি না হতো তো ভাদ্র মাসের তালনবমীতে আবার সাজিয়ে রাখতো থালায়। তারপরেও যেগুলো পড়ে থাকতো সেগুলো বিক্রি হয়ে যেতো দুর্গাপূজোর বিজয়া-দশমীর দিন। কিন্তু নারাণ ময়রার সব চেয়ে বেশি নাম ছিল চিনির বাতাসায়। এমন হাল্কা, জলে ফেলে দিলে ভাসতো। তা রামহরি ভট্টাচার্য বলতেন—শুধু জল দিলি নারাণ, কেমন বাতাস করলি দেখি?

বাড়িতে এক-একদিন আনতেন। বাড়িতে ঢুকেই জবাকে ডাকতেন—কই রে?

একটি মাত্র বাতাসা। কিম্বা এক টুকরো পূজোর প্রসাদ। কলা কি বাতাবী লেবুর টুকরো। হয়তো চারখানা লুচি, একটু মোহনভোগ, সঙ্গে গোটাকয় বোঁদের টুকরো। দিয়ে বলতেন—খা, ফেলিসনে যেন মাটিতে—পেসাদ।

জবা বলে—আমার খুব ভালো লাগতো ঠাকুর্দাকে। সেই পাড়া গাঁ, সেই মল্লিকদের আমবাগান, সেই বোসেদের রথতলা—সে আনন্দ ছেড়ে কলকাতায় আসতে ভালো লাগতো না তখন মোটে।

রামহরি ভট্টাচার্য শেষের দিকে চোখে ভালো দেখতে পেতেন না। কিন্তু তবু ভাবলেই সে-দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে রাত্রিবেলা রেড়ির তেলের আলোয় বসে শব্দ করে শ্লোক পড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে তিনি কি আর বড়লোক হতে পারতেন না!

শুক্রবার ছিল 'মোহিনী-সিঁদুর' দেবার দিন। কত দূর দূর থেকে যে লোক আসতো ওই সিঁদুর নিতে। রামহরি ভট্টাচার্য কাউকে বলতেন—তোমার কী হয়েছে মা?

একটি করে পয়সা দক্ষিণা। মাত্র একটি পয়সা। তা-ও আবার সময় সময় দুটো আধলা জড়িয়ে একটা পয়সা হতো। গ্রামের লোকগুলো ছিল আরো গরীব। শাক, কলা, মূলো, আম, কাঁঠাল খেতে পেতো বটে। কিন্তু পয়সা দিতে গেলে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হতো তাদের।

—এই আমার মেয়ে ঠাকুরমশাই, জামাই একে নেয় না। একে আপনার সিঁদুর পরিয়ে দিন।

এমনি-সব অসংখ্য আবেদন। অসংখ্য দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী। শুনতে শুনতে অত যে শক্ত মানুষ, তাঁরও চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতো।

এক-একদিন রাত্রে জবার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। জেগে দেখে ঠাকুর্দা পাশে নেই। পাশেই ঠাকুরঘর। অন্ধকার রাত। অমাবস্যার অন্ধকারে চারদিক ঘুরঘুট্টি। মনে হলো ঠাকুরঘর থেকে যেন ঠাকুর্দার গলার আওয়াজ আসছে। স্তব পড়ছেন তিনি। কেমন ভয় ভয় করতো সে শব্দ শুনে। মনে হতো সমস্ত পৃথিবী যেন থর থর করে কেঁপে উঠছে। যেমন সেই বলরামপুরে ভূমিকম্প হয়েছিল সেবার, ঠিক সেইরকম।

রামহরি ভট্টাচার্য সেবার লোকমুখে শুনলেন গুপীর মেয়ে হয়েছে—সেই রাত্রেই আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলেন। ওস্তাদদের ডাকলেন গিয়ে মালোপাড়ায়। বললেন—এক কাজ করতে হবে তোদের।

—কী কাজ দাদাঠাকুর?

অত রাত্রে দাদাঠাকুরকে দেখে ওরাও কম অবাক হয়নি। সবে মাছ ধরে এসে খেয়ে দেয়ে তরজার আসর থেকে বাড়িতে এসেছে। তখন ঘুমোতে যাবে।

রামহরি বললেন—এই বিশটে টাকা নে।

বিশ টাকা! কালো তেল-চকচকে নধর চেহারাগুলো যেন কিলবিল করে উঠলো। বিশ টাকা পেলে যা-কিছু করা যায়। মানুষও খুন করা যায়। বিনা কারণে কত মানুষ খুন করেছে তারা। মন্বন্তরের সময় সব-কিছু করতে হয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদের। নিরীহ মানুষকে মাত্র একখানা গামছার লোভে খুন করতে পেছ-পা হয়নি তারা। রামহরি বললেন—খুনখারাপি নয়—চুরি করতে হবে।

—রাজী। কার কী চুরি, বলুন।

তারপর শেষ রাত্রের দিকে চুপি চুপি এসে রামহরি আবার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী টের পেয়ে গিয়েছে। বললে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

কথা বললেন না রামহরি।

কিন্তু দু'দিন পরে ভোর রাত্রে দরজায় টোকা পড়লো।

রামহরি উঠে দরজা খুলে দিতেই একটি দু'মাসের মেয়ে তাঁর কোলে তুলে দিলে তারা। তারপর নিঃশব্দে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন রামহরি ভট্টাচার্য।

ব্রাহ্মণী সকালবেলা কান্নার শব্দে জেগে উঠেছেন। বললেন—এ কে?

রামহরি বললেন—গুপীর মেয়ে।

—একে এখানে কে আনলো!

রামহরি বললেন—চুপ! ছেলে আমার মরে গিয়েছে জানি, কিন্তু নাতনির আমি জাত খোয়াতে দেবো না।

—তুমি ওই দু'মাসের মেয়েকে বাঁচাবে কী করে?

—মা আমার সহায়, আমি একে এখানে রাখবো, আমি এর ভরণপোষণ করবো—বিয়ে

দেবো—এর নাম দেবো আমি জবা—আমার মায়ের ফুলের নাম।

ব্রাহ্মণী কেঁদে ফেললেন—তুমি কী পাগল হয়েছো গো?

ব্রাহ্মণী গোপনে পত্র দিয়ে দিলেন কলকাতায় ছেলের কাছে। গুপীকে আসতে বারণ করে দিলেন। এলেই কর্তা আর আস্ত রাখবেন না। কর্তা বলেছেন—যে ছেলে বেম্ম হয়েছে, আমার বংশের নাম ডুবিয়েছে, তার আমি সর্বনাশ করে ছাড়বো। আরও জানালেন—মেয়ে ভালো আছে।

গুপী আসে। গ্রামের এক প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। খবর নিয়ে যায়। একবার দেখতে ইচ্ছে হয় সন্তানকে। জামাকাপড় পাঠিয়ে দেয় লোক-মারফত। পয়সা কড়িও।

রামহরির সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে—এত দুধ আসছে কোত্থেকে শুনি? পয়সা তো ছিল না বাক্সতে।

তারপর সেই মেয়ে বড়ো হলো। সুন্দরী হলো। এমনি করে দিন কাটলো, বছর কাটলো।

একদিন চিঠি লিখলে গুপীর স্ত্রী। গুপীর ভারি অসুখ। বাবা যদি দেখতে চান তো যেন শেষ দেখা দেখে যান। আর বেশি দিন বাকি নেই। ছেলে মৃত্যুশয্যায়।

ব্রাহ্মণী বললে—তুমি পাথর হতে পারো—কিন্তু আমার মায়ের প্রাণ, আমি যাবোই।

—যাবে কী করে?

—যেমন করে পারি যাবো, পায়ে হেঁটে যাবো, ছেলে যার মরো মরো, সে কি না গিয়ে থাকতে পারে?

রামহরি চাদরটা কাঁধে নিলেন। ব্রাহ্মণীর দু'গাছা তাগা ভোলা স্যাকরার কাছে বাঁধা রেখে নগদ পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পেছনে পেছনে ঘোমটা দিয়ে চললো ব্রাহ্মণী।

সুবিনয়বাবু বলতেন—তখন আমার খুব অসুখ, বুঝলে ভূতনাথবাবু, জবার মা পাশে বসে আছেন—হঠাৎ চোখ মেলে দেখি আমার মা—কতকাল পরে দেখা, কিন্তু মা'কে চিনতে কি ছেলের কষ্ট হয়—বললাম—মা—

মা সেই যে আমার বিছানার পাশে বসলেন, সাতদিন আর উঠলেন না। বললাম—বাবা আসেননি?

মা বললেন—তিনি বসে আছেন রাস্তার মোড়ে, ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সেখানেই বসে আছেন, এলেন না এখানে।

কী অদ্ভুত ছিল বাবার রাগ! তাঁর ভালোবাসাও যেমন, রাগও তেমনি। তাঁর রাগ ভালোবাসারই নামান্তর। তেমন করে যে রাগতে পারে, সে-ই যথার্থ ভালবাসতে পারে, উপনিষদের ঋষি বলেছেন...

সুবিনয়বাবু মাঝে মাঝে বলতেন—জবার যখন ন' বছর বয়েস তখন ও আমার কাছে এল, বাবার মৃত্যুর পর। নতুন করে ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলুম। বলরামপুরে থেকে তখন ও তো লেখাপড়া কিছু শেখেনি, কিন্তু জবার ভাই তখন মারা গিয়েছে। জবা যখন এল এ-বাড়িতে, জবার মা'র তখন শোক পেয়ে পেয়ে প্রায় শেষ অবস্থা—মেয়েকে চিনতে পারলেন না তিনি।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—তারপর আপনি আর দেশে যাননি?

—গিয়েছিলাম ভূতনাথবাবু, শেষকৃত্য আমি আর কোন্ অধিকারে করবো, আমার সে অধিকার নেই আর, কিন্তু তবু গিয়েছিলাম। আমার জন্মভূমি, ছোটবেলায় কত বছর কাটিয়েছি ওখানে, কতদিন প্রাণ কাঁদতো ওখানে যাবার জন্যে—কিন্তু বাবার শপথের কথা ভেবে যাইনি—তা দেশে গিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে চোখের জল আর আটকাতে পারিনি—

খানিক থামেন সুবিনয়বাবু। তারপর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলতেন—তখন আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ফাঁকা বাড়ি—হা হা করছে সমস্ত ঘরগুলো—একা একা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সমস্ত দিন। মনে হলো যেন বাবার সেই স্তোত্রপাঠ শুনতে পাচ্ছি নির্জন ঘরের মধ্যে—ত্বমেকং বিশ্বরূপম্ জগৎকারণম্—ত্বমেকং সাক্ষীরূপম্ জগৎকারণম্—

তারপর ভোরবেলা একটা গরুর গাড়ী ডেকে সব জিনিসপত্র তুললুম। বাবার স্মৃতিমাখানো

যত জিনিস ছিল সব সঙ্গে নিলাম। একটা পুরনো কাঠের বাক্স—ওই দেখো না ভূতনাথবাবু, ওরই ভেতর বাবার যত কাগজপত্র, হিসেব, দলিল, চিঠির স্তূপ—তাঁর হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর—সব সঙ্গে করে এনেছি।

ভূতনাথ দেখেছে—সুবিনয়বাবুর শোবার ঘরে আজও সেই কাঠের বাক্সটা রাখা আছে।

—দুঃখ এই, বাবার একটা ছবি পর্যন্ত নেই যে, তাঁর দিকে চেয়ে থাকি দু'দণ্ড। মাঝে মাঝে বড় দেখতে ইচ্ছে হয় তাঁকে। তা এক দিক থেকে আমার কাছে আদর্শ কে জানো ভূতনাথবাবু?

—কে?

—দু'জন, এক ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন আর আমার বাবা—অমন জ্বলন্ত নিষ্ঠা এ-যুগে আর কারো দেখতে পাই না এক ব্রহ্মানন্দ ছাড়া। আবার খানিক থেমে বলেন—ভাবো তো ভূতনাথবাবু ব্রহ্মানন্দ যেদিন ছোটবেলায় পরীক্ষার হল-এ খাতা দেখে নকল করছিলেন বলে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো—তারপর তাঁর সেই নিষ্ঠা, লেখাপড়া, শাস্ত্রচর্চা সব বিষয়ে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আর-একদিন, যেদিন ব্রহ্মানন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন বলে—তিনি সস্ত্রীক গিয়ে আশ্রয় নিলেন মহর্ষি দেবেন ঠাকুরের কাছে। ভাবতে পারো। তোমাদের ইয়ং ম্যান্‌দের মধ্যে এতখানি নিষ্ঠা ক'জনের আছে—ক'জন নারীর আছে?

ভূতনাথের মনে পড়ে আরও একজনের কথা। সেদিন ১৯০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। খুব কন্‌কনে শীত পড়েছে। ব্রজরাখাল এল সেই রাত্রে। গায়ে কিছু নেই। শুধু একটা চাদর।

ভূতনাথ তখন শোবার আয়োজন করছে। ব্রজরাখালকে দেখে বললে—এ কি, খালি গা যে?

ব্রজরাখাল তখন গুন গুন করে গাইছে—

আর তো ব্রজে যাবো না ভাই, যেতে প্রাণ আর নাহি চায়,
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়—

থেমে ব্রজরাখাল বললে—গান গাইলে আর শীত করে না। খুব যখন শীত করবে বড়কুটুম—গান গেয়ে দেখো—শীত পালিয়ে যাবে।

—তা জামা কোথায় ফেলে রেখে এলে ব্রজরাখাল?

ব্রজরাখাল ঢাকা ভাত খুলে তখন খেতে বসেছে। খেতে খেতে বললে ফুলদাসী মারা গেল।

ভূতনাথও চমকে উঠলো। মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

ব্রজরাখাল বললে—ওই ফুলদাসীকে কত কষ্টে বাঁচানো হয়েছে পাদ্রীদের হাত থেকে, পাদ্রীরা নিয়ে গিয়ে প্রায় খ্রীস্টান করে ফেলেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী খবর পেয়ে উদ্ধার করে আনেন—আর আজ কিনা... বলতে বলতে চুপ করলো ব্রজরাখাল। খুব তাড়াতাড়ি ভাত খেতে লাগলো। খাওয়া নয় গেলা! খাওয়াটা কোনো দিন ধীরে সুস্থে হলো না ব্রজরাখালের।

—আর দুটি ভাত দেবো ব্রজরাখাল? রয়েছে অনেক।

—দেখো মজাটা, কলেরা থেকে বাঁচালাম, প্লেগের হাত থেকে বাঁচালাম, গুণ্ডার হাত থেকেও একবার বাঁচিয়েছি, কিন্তু যে যাবার তাকে বাঁচাবে কে? দাও বড়কুটুম, ভাতই দাও, আরও দুটো গিলে নিই।

ব্রজরাখাল এমন কখনও ভাত চেয়ে খায় না। আজ যেন ওর কী হয়েছে।

খেতে খেতে বললে—এমনভাবে মরবে জানতেই পারিনি বড়কুটুম।

ভূতনাথ বললে—শ্মশানে গিয়েছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ, তাই তো জামা-কাপড় সব ডোমদের দিয়ে এলুম, কাপড়টা শুধু ভিজিয়েছিলুম গঙ্গার জলে—তাও এখন গায়ে লেগে লেগে শুকিয়ে গেল।

—কী অসুখ হয়েছিল?

অসুখ-বিসুখ কিছু নয়, ভালোই তো ছিল, বাড়ি ভাড়াটা চাঁদা করে দেওয়া হচ্ছিলো, আর খাওয়া-খরচটা দিতাম আমি, কিন্তু সইলো না ওর, খ্রীস্টান হবার পর তো আত্মীয়-স্বজন কেউ নিতো না। শিবনাথ শাস্ত্রীমশাইও অনেক দিন পর্যন্ত যোগাতেন সব।

—না খেতে পেয়েই মরলো বুঝি শেষে?

—না তাও নয়, খেয়েই মরলো।

—কী খেয়ে?

—বিষ! খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ব্রজরাখাল। তারপর বললে—পুলিশ থেকে লাশ ছাড়তে চায় না, পেটের মধ্যে ছেলে পাওয়া গিয়েছিল কিনা! কিন্তু আমি বলি বড়কুটুম, ও মরতে গেল কেন? মরে কি ও বাঁচতে পেরেছে? খাওয়া থামিয়ে ব্রজরাখাল উঠলো।

—এ কি, আর খেলে না?

—না, বড়কুটুম, জ্ঞানযোগের ওপর আমার বিশ্বাস চলে গেল আজ থেকে, দেখো গিরীশবাবু ঠিক বলতেন—নরেন কেবল বলে—জ্ঞানযোগ কর্মযোগ! ওই গিরীশবাবু, গিরীশ ঘোষকে চেনো তো—'চৈতন্যলীলা' লিখেছেন, তিনি একদিন বললেন নরেনকে—জ্ঞানযোগ জ্ঞানযোগ করো, সংসারের সব দুঃখ তুমি জ্ঞানযোগ দিয়ে দূর করতে পারবে? জ্ঞানযোগ কর্মযোগের একটা সীমা আছে, একটা জায়গায় গিয়ে আর তুমি এগুতে পারবে না—কিন্তু ভক্তি—'বিশ্বাসে মিলায়ে ভক্তি তর্কে বহুদূর'—আজ কেবল সকাল থেকে কথাটা আমার মাথায় ঘুরছে। শ্মশানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ফুলদাসীর মুখখানার দিকে চেয়ে তাই ভাবছিলাম। কই, এই-সব হতভাগিনীদের তো আমরা বাঁচাতে পারিনি—তর্কশাস্ত্র কি মীমাংসাশাস্ত্র দিয়ে তো এদের দুঃখ ঘুচবে না। কী জানি বড়কুটুম, প্লেগের সময় দিনরাত চোখের সামনে অনেক মৃত্যু দেখেছি, মা, বাপ, ছেলে, এক বছরের কোলের মেয়ে সকলকে এক বাড়িতে এক ঘরে এক শয্যায় মরতে দেখেছি, তবু মন আমার এতটা টলেনি!

আর ঠিক এই ঘটনার ক'দিন পরেই ব্রজরাখাল কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আজ এতদিন পরে সুবিনয়বাবুর ঘরে দাঁড়িয়ে ব্রজরাখালের কথাটা মনে পড়ার একটা কারণ আছে। সুবিনয়বাবুর দিকে চেয়ে বোঝা যায়—এ-মানুষটির অন্তরে কোথায় যেন ব্রজরাখালের মতো একটা বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে। অথচ সামনে সবসময় সদা-হাসি মুখ। সদাপ্রসন্ন, সদাসুখী। একদিন এ-বাড়িতেই ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যেও যেমন দেখেছে তাঁকে, আজ রোগকাতর ঐশ্বর্যরিক্ত অসহায় অবস্থাতেও যেন তার কোনো বৈলক্ষণ্য নেই। তেমনি প্রশান্ত দৃষ্টি, অবিচলিত নিষ্ঠা!

সমস্ত বাড়িটা ব্যস্ত-চঞ্চল, কর্মমুখর। যেখানকার যে-জিনিস, আজ সেখানে তা নেই। রাজা-রাণীর ছবি দুটো নামানো হয়েছে মেঝের ওপর।

সুবিনয়বাবু চিত্ হয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে শুয়েছিলেন। পাশ ফিরে বললেন—অনেকদিন দেখিনি তোমাকে—চাকরির কিছু সুবিধে হলো তোমার?

ভূতনাথ বললে—কই, কিছুই তো হলো না।

—আমি কয়েকখানা চিঠি লিখেছি কয়েকজনকে তোমার জন্যে, জবাব পেয়েছি অনেক জায়গা থেকে, আমি একটু সেরে উঠলে নিজে একবার চেষ্টা কববো। ব্রজরাখালবাবুর খবর কী ভূতনাথবাবু, কিছু খবর পেয়েছো? তারপর খানিকক্ষণ আবাব চুপচাপ। বললেন—বড় খুশি হলাম তোমাকে দেখে। জবার বিয়েতে তোমার কিন্তু আসা চাই-ই ভূতনাথবাবু, আসছে অঘ্রাণ মাসেই বিয়ে ঠিক করেছি।

ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে একবার দেখে নিয়ে বললে—কিন্তু বিয়েটার এত দেরি হচ্ছে কেন?

—খানিকটা ওদের ইচ্ছে আর তা ছাড়া আমার এ-অসুখটা না হলে ওটা তো আগেই হয়ে যেতো—কিন্তু এবার আমি বলেছি ভূতনাথবাবু, তোমাদের দু'জনের যখন অনুরাগ হয়েছে আর মিলনে যখন কোনো বাধা নেই, উভয়ে উভয়কে ভালো করে চিনেছো, পরস্পরকে তোমরা গ্রহণ করেছো মনে মনে, তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরেরও তাই অভিপ্রায়। কী বলো ভূতনাথবাবু, অন্যায় কিছু বলেছি আমি?

ভূতনাথ বললে—না, ঠিক কথাই বলেছেন আপনি।

—আমিও তাই বলি, অর্থটা অনেক সময়েই অনর্থের সৃষ্টি করে, আবার আমাদের সাংসারিক জীবনে অর্থের প্রয়োজনও অস্বীকার করবার নয়। আমার বাবা বলতেন—টাকা পয়সা হাতের

ময়লা—তাই বাবার মতো পুণ্যাত্মা মানুষ আজীবন শান্তিতে কাটিয়েছেন—কিন্তু আমি পারিনি ভূতনাথবাবু, প্রথম যৌবনে অর্থের নেশায় মেতেছিলাম, সঞ্চয়ের নেশায় ডুবেছিলাম, আজ আমি রিক্ত, সমস্ত অর্থ থেকেও আমি রিক্ত—কিন্তু আজ সমস্ত ত্যাগ করে, সর্বস্ব দান করেই আমি আবার আমার যথার্থ বিত্ত ফিরে পেলাম, এতদিন ধর্মচ্যুত ছিলাম এখন আবার স্বধর্মে আশ্রয় পেয়েছি—কী বলো ভূতনাথবাবু, ভুল করেছি আমি?

—না, ঠিকই করেছেন আপনি—ভূতনাথ বললে।

—এই দোখো না, আজ আমি এ-বাড়ি ত্যাগ করছি, হাসপাতাল হবে এখানে, জবা-মা'র বোধ হয় মনে মনে একটু দ্বিধা ছিল, কিন্তু যখন বুঝিয়ে দিলুম মাকে যে, এ ত্যাগ নয় মা, এ ভোগ, বিশ্বের সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একযোগে কাজ করা, উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—বললুম যে, এ-আমার শুধু অনুভূতি নয় উপলব্ধি, এ-আমার শুধু প্রিয়ই নয়—শ্রেয়ও—জবা-মা বুঝলো। বললে—বাবা তুমি কখনও অন্যায় করতে পারো না—তারপর খানিক থেমে সুবিনয়বাবু আবার বলতে লাগলেন—তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম—সুপবিত্রকে তুমি সমস্ত কথা খুলে বলেছো তো মা? বলেছো তো যে, সে তোমাকে গ্রহণ করলে তোমাকেই শুধু পাবে--'মোহিনী-সিঁদুরে'র অর্থের ওপর তার বা তোমার বা আমার কোনোই অধিকার নেই—বলেছো তো মা এ-কথা? জবা-মা বললে—বলেছি বাবা।

শুনে বড় শান্তি পেলাম ভূতনাথবাবু, তবু বললাম—তুমি যদি অনুমতি দাও মা তবে আমিও তাকে সব বিশদ করে বলতে পারি।

—জবা-মা বললে—অনুমতির কথা কেন বলছেন, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন বাবা। বললাম—তোমার তো মা নেই মা, আমিও বৃদ্ধ হয়েছি—তোমার মায়ের কর্তব্যটুকু আমাকেই করতে দিও মা। তোমার মা-ই মৃতুর শেষ দিনে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, তোমাকে মুক্তি দিতে—তোমার মায়ের ইচ্ছে আর আমারও ইচ্ছে তুমি মুক্তি পাও—সর্বরকমের মুক্তি, মিথ্যা থেকে, গ্লানি থেকে, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যও তো একটা বন্ধন—কী বলো ভূতনাথবাবু, তোমার কি মত? সুবিনয়বাবু কথা বলতে পেলে আর কিছু চান না।

ভূতনাথ বললে—আজকেই কি এই বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ, ভূতনাথবাবু, আজই—যত শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায় ততই তো ভালো। বাবার মৃত্যুর পর আমি এই 'মোহিনী-সিঁদুরে'র ব্যবসা শুরু করেছিলাম, তার আগে তুমি তো জানো আমি আইন ব্যবসা করতাম। সামান্য আয় হতো সে-কাজে, তবু সে-আয়টুকু রেখে আর সমস্ত আমি ত্যাগ করেছি। এ-বাড়ির ওপর আমার তো কোনো অধিকার নেই। সুবিনয়বাবু আবার বললেন—অন্যায় যা আমি করেছি, তার জন্যে অনেক অনুতাপও করেছি ভূতনাথবাবু, দুঃখ কষ্টও কম পাইনি। ভাবতে পারো, একদিন বাড়ি এসে শুনলাম, আমার একমাত্র সন্তানকে কারা হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, গেলাম পুলিশের কাছে, কত অনুসন্ধান করলাম—সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে আমরা সারারাত ঘুমোতে পারিনি—তা সেই কথাই বললাম সেদিন সুপবিত্রকে। বললাম—তুমি একাধারে জবার পিতা, মাতা, স্বামীর কর্তব্য করবে, জবা তার মায়ের স্নেহ পায়নি, আর আমার আয়ু তো ফুরিয়েই এসেছে।

—সুপবিত্র আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে—আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন সে-কর্তব্যে কোনোদিন অবহেলা না করি। সুপবিত্রর বাবা ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুপবিত্রকে আমি তার জন্ম থেকে জানি, সুপবিত্রর হাতে জবাকে তুলে দিয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবো—তা তোমাকে সংবাদ দেবো ভূতনাথবাবু—আসছে অঘ্রাণেই সমস্ত ব্যবস্থা হবে—তা ততদিনে আমি উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবো নিশ্চয়ই।

হঠাৎ জবা ঘরে ঢুকলো। বললে—বাবা আপনি আবার কথা বলছেন। আসুন ভূতনাথবাবু—কেবল গল্প আপনার—আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। এসেছেন যখন এ-বাড়িতে একটু খাটিয়ে নেবো। তারপর বাবার দিকে চেয়ে বললে—সেই পুরনো কথা সব বলছিলেন বুঝি!

—বলছিলাম মা, তোমার কথাই ভূতনাথবাবুকে বলছিলাম, এখন থেকে তোমার নিজের হাতে সব কাজ করতে হবে। কাজ করা তো তোমার অভ্যেস নেই মা।

—কেন বাবা, ঠাকুর চলে যাবার পর সেবার রাঁধিনি আমি?

—আমি কি তাই বলছি মা!

—থাক বাবা, এখন ও-সব কথা থাক—কত কাজ পড়ে রয়েছে জানেন। ভূতনাথবাবুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন তো। আসুন—বলে জবা আগে আগে চলতে লাগলো। ভূতনাথ দেখলে জবার সারা গায়ে ধুলো ময়লা লেগেছে। একেবারে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে থামলো জবা। বললে—কী দেখছেন অমন করে?

ভূতনাথ চোখ সরিয়ে নিলে।

জবা খিল খিল করে হাসতে লাগলো। বললে—অমন কবে তাকাতে লজ্জা করে না!

ভাঁড়ার ঘরটা বেশ অন্ধকার। এক রাশ কাঁসা আর পেতলের ·াসন নামানো রয়েছে একদিকে। অন্যান্য জিনিসও অগোছালো পড়ে আছে এদিক-ওদিক।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে ভূতনাথ সেইদিকে চেয়ে বললে—এগুলো কি যাবে তোমাদের সঙ্গে?

জবা বললে—এই ঝুড়িটার ভেতরে একে একে সব ভরে দিন দেখি।

ভূতনাথ কামিজের হাতাটা গুটিয়ে কাজে লাগতে যাচ্ছিলো।

জবা বললে—ভাববেন না আপনাকেই শুধু খাটাচ্ছি, সুপবিত্রকেও কাজে পাঠিয়েছি আমি। এই রোদে বাজারে গিয়েছে সে—সকাল থেকে ঘুরছে—একটু বসতে দিইনি। আর আপনিই শুধু আরাম করে বসে থাকবেন, তাই কি হয়!

বাসনের ঝুড়িটা সরাতে সরাতে ভূতনাথ শুধু বললে—আমি কি সে কথা বলেছি?

জবা শাড়ির আঁচলটা আর একবার ভালো করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বললে—মুখে হয়তো বলবেন না, কিন্তু মনে মনে হয়তো রাগ করবেন—গালাগালি দেবেন।

ভূতনাথ আর সহ্য করতে পারলে না। বললে—তুমি আমার কী এমন ক্ষতি করেছো যে—তোমাকে আমি গালাগালি দেবো? তোমার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক?

জবা পেছনে ফিরে কাজ করছিল। সেই অবস্থাতেই বললে—আপনি সব কথায় চিরকাল সম্পর্ক তুলে কথা বলেন কেন?

ভূতনাথ পেছন ফিরে যে-জবাবটা দিতে যাচ্ছিলো সেটা অনেক কষ্টে সম্বরণ করলে। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলে। বললে—এগুলো তো হলো—এবার আর কি কাজ আছে বলো।

জবা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ওই যে সিন্দুকটা দেখছেন, ওর ভেতর থেকে সব জিনিসপত্র বের করতে হবে—পারবেন একলা? যদি না পারেন তো সুপবিত্র আসুক।

সুপবিত্রর নাম শুনে ভূতনাথ কেমন যেন মরীয়া হয়ে উঠলো। বললে—দেখি, আমি একলাই পারবো।

জবা বললে—ঝি-চাকর কেউ-ই তো নেই, সব ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন থেকে সবই তো আমায় একলা করতে হবে।

ভূতনাথ বললে—একলা যে কী করে তুমি সব করবে তাই ভাবছি।

জবা বললে—ভগবান দুটো হাত দিয়েছেন শুধু ভাত খাবার জন্যে নয়। কাজ না করলে পা-ই বলুন আর হাত-ই বলুন সব অকেজো হয়ে যায়।

এরপর ভূতনাথের আর কোনো উত্তর দেওয়া চলে না। ভারি লোহার সিন্দুকটা এক হাতেই খোলবার চেষ্টা করতে লাগলো। খুব ভারি ডালাটা। তবু কে জানে কেন, যেন অসুরের মতো ক্ষমতা ফিরে এল গায়ে। তারপর দু'হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে চাড় দিতেই ডালাটা এক সময় খুলে গেল। কিন্তু ততক্ষণে দর দর করে ঘেমে নেয়ে উঠেছে ভূতনাথ।

জবাও কম বিস্মিত হয়নি। জবার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে ভূতনাথ হাসতে হাসতে বললে—অবাক হলে যে? আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে—তা ভুলে গিয়েছো নাকি?

জবা কিছু কথা বলতে পারলে না। তখনও যেন তার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

ভূতনাথ হাসতে হাসতেই বললে—অঘ্রাণ মাসে তোমার বিয়েতে যদি নেমন্তন্ন হয়, তো আরো দেখবে আমরা শুধু বেশি ভাতই যে খেতে পারি তা-ই নয়—ইচ্ছে করলে লুচিও খেতে পারি অনেক।

জবা কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইল। তারপর হাসলো। বললে—নেমন্তন্ন করবার মালিক আমি নই, নেমন্তন্ন করবেন বাবা—কিন্তু শুধু পেট ভরে লুচি খেতে পাওয়াটাই বুঝি আপনার লক্ষ্য?

ভূতনাথ তখন আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে। প্রকাণ্ড একটা ভারি জিনিস নামাতে নামাতে বললে—এ ছাড়া আমার আর কি লক্ষ্য থাকতে পারে বলো। আমরা বরপক্ষও নই, কন্যাপক্ষও নই, আমরা শুধু ইতরপক্ষ—একটু মিষ্টান্ন পেলেই খুশি হবো।

জবা হাসলো আবার—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় পড়েছেন তো?

—না পড়ে পার পাবার কি উপায় ছিল? শরৎ পণ্ডিতের বেত দেখোনি তো? সে যে কী কষ্ট করে লেখাপড়া শেখা, বর্ণপরিচয় আর নামতা তো মাটিতে লিখেছি, খাতা-কলম পাইনি—পিঠের শিরদাঁড়া ব্যথা হয়ে যেতো—যাক, আজ মনে হচ্ছে লেখাপড়া শেখাটা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

—কেন?

—লেখাপড়া শিখি আর না-শিখি শরৎ পণ্ডিতের বেত শরীরটাকে মজবুত করে দিয়েছে।

জবা বললে—আপনার তো ভারি অহঙ্কার।

—অহঙ্কারের কি দেখলে আমার?

—লোহার সিন্দুকটা খুলতে পেরেছেন বলে ভেবেছেন বুঝি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি আমি?

—তোমাকে আশ্চর্য করার স্পর্ধা যদি কখনও হয়ে থাকে আমার তো ধিক্ আমাকে—বলে ভূতনাথ আবার নিজের কাজে মন দেবার চেষ্টা করলে।

খানিক পরে জবা বললে—রাগ করলেন নাকি?

ভূতনাথ কাজ করতে করতে থামলো। বললে—আমাকে আগে কতদিন কতবার কত কী বলেছো তুমি—তখনও যদি রাগ না করে থাকি—এখনও করিনি।

জবা বললে—কিন্তু আমার এমনি কপাল ভূতনাথবাবু—আমাকে সবাই ভুল বোঝে।

ভূতনাথ সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো এতক্ষণে। জবা নিজের মনেই কাজ করে চলেছে। পরিশ্রমে সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। মাথার বেণীটা পিঠের ওপর দিয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরের সেই স্বল্প-অন্ধকার পরিবেশে যেন আজ নতুন করে আবিষ্কার করলো জবাকে।

ভূতনাথ বললে—সবাই-ই কি ভুল বুঝেছে তোমাকে?

—সবাই।

ভূতনাথ একটু দ্বিধা কাটিয়ে বললে—একজনও কি বাদ পড়ে না?

—একজনও না।

ভূতনাথ বললে—সকলের খবব রাখি না, নিজের কথা বলতে পারি এই যে... না, নিজের কথা আজ থাক—কিন্তু সুপবিত্রবাবু?

জবা বললে—সুপবিত্র? সুপবিত্র নিজেকেই বুঝতে পারে না তা বুঝবে আমাকে! আপনি এমন মানুষ দেখেছেন ভূতনাথবাবু, দিনের মধ্যে দশবাব যার চশমার খাপ হারিয়ে যায়, ভাত খেতে ভুলে যায় এক-একদিন, এমনি পাগল। ওর মা এখনও ঘুম পাড়িয়ে দেয় ওকে, বিশ্বাস করতে পারেন—ও যে কেমন করে বিয়ে করে সংসার করবে কে জানে—আমার তো এক-একসময়ে ভারি ভয় হয়—

ভূতনাথ কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। শেষে বললে—কাজের লোকরা হয়তো সংসার ভালো করে করতে পারে—কিন্তু ভালো স্বামী হওয়া তো অন্য জিনিস।

জবা বললে—কিন্তু সুপবিত্র যে বড় ছেলেমানুষ, এখনও ওর নিজের ইচ্ছে বলে কিছুই নেই—ও যে কী করে এম.এ. পাশ করলো, কে জানে। আমি যখন বললাম ওকে—চাকরি খোঁজো

একটা—চাকরি না করলে কী করবে? তখন চাকরির চেষ্টা করতে লাগলো—অথচ বিয়ের আগে যে সে-দিকটা ভাবতে হয় সে-জ্ঞানও নেই। জানেও না যে বিয়ে মানে দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া—অথচ আর মাত্র এক মাস বাকি।

ভূতনাথ চুপ করে রইল।

জবা বললে—কিন্তু প্রশংসা করতে হয় ওর একনিষ্ঠতার। আমাদের সমাজের আরো অনেক ছেলের সঙ্গেই তো মিশেছি, কেউ চেয়েছে আমার টাকা, কেউ চেয়েছে রূপ, কেউ কেউ বেশ সংসারী, জন্মদিনে উপহার দিয়েছে দামী দামী, কিন্তু সুপবিত্র গরীব, তবু কত কী বলেছি কতদিন, কতদিন রাগ করেছি ওর ওপর, জানেন, বাড়িতে ঢুকতে দিইনি কতবার, ও যতবার যা বলেছে, তার উল্টো করেছি আমি, সব বন্ধুবান্ধবদের সামনে ওকে অপদস্থ করেছি আমি, কিন্তু তবু দেখেছি কিচ্ছু বলেনি। এক-একদিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুপ করে চেয়ে থেকেছে আমাদের বাড়িটার দিকে। খানিক থেমে জবা আবার বললে—কী জানি এক-একবার মনে হয় ভুল করছি না তো—বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি—বাবা মত দিয়েছেন। বাবারও সুপবিত্রকেই পছন্দ—কিন্তু তবু ভয় করে এক-একবার।

তারপর হঠাৎ মাথা তুলে জবা বললে—এক-একবার ভাবি ভূতনাথবাবু, যদি হিন্দু হয়ে জন্মাতাম ভালো হতো। বাবা-মা যার সঙ্গে বিয়ে দিতো তাকেই স্বামী বলে গ্রহণ করতাম, এত সমস্যা থাকতো না তাতে—অন্তত নিজের ভাবনাটা ভাগ্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

ভূতনাথ এবারও কোনো উত্তর দিলে না। আর উত্তর দেবার ছিলই বা কী? সেদিন সেই ভাঁড়ার ঘরের ধুলো ময়লার মধ্যে জবা যে এমন-সব কথা বলবে এ যেন কল্পনাও করা যায়নি। অথচ সেকথা যে ভূতনাথকে লক্ষ্য করেই বলেছিল এমন ভুল ধারণাও করেনি ভূতনাথ। ওগুলো জবার স্বগতোক্তি বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল তার।

ভূতনাথ হঠাৎ বলেছিল—বেলা অনেক হলো—দেরি হচ্ছে না তো?

—দেখেছেন কাণ্ড—বলে জবা চমকে উঠেছিল। বলেছিল—ছি ছি—কোনো কাজই হলো না। শুধু গল্পই হলো—বলে উঠে পড়লো জবা। তারপর বললে—আপনাকে খুব খাটালাম আজকে—কিছু মনে করলেন না তো... কিন্তু এঃ, আপনার জামাকাপড়ের কী অবস্থা হয়েছে?

—তা হোক—ভূতনাথ বললে—কিন্তু একটা অনুরোধ করবো রাখবে?

—কী আবার আপনার অনুরোধ?

—রাখবে কিনা শুনি আগে, এমন-কিছু অন্যায় অনুরোধ করবো না আমি।

—রাখবো, বলুন।

—তোমার জীবনে যখনি কোনো প্রয়োজন হবে, আমাকে ডেকো, তোমার কিছু উপকার করতে পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

জবা হাসলো। বললে—আমার কাছ থেকে যদি কৃতজ্ঞতা না পান, তবু?

—হ্যাঁ, তবুও।

জবা বললে—কিন্তু কেন আপনার এ অদ্ভুত খেয়াল বলতে পারেন?

—খেয়াল নয়, এ আমার...

—এ আপনার কী? নেশা?

—নেশা হলে তো বাঁচতুম জবা, কারণ নেশা একদিন কাটলেও কাটতে পারে—কিন্তু এ আর যাবার নয়, বলতে পারো এ-ও একরকম ব্রত।

—তাতে আপনার লাভ?

—লাভ-লোকসান তো কখনো কষে দেখিনি আমি, দান-প্রতিদানের কথাও ভেবে দেখিনি, শুধু প্রাণ দিয়ে তোমার উপকার করবো প্রয়োজন হলে, আর কিছু নয়।

জবা যেন কি ভাবতে লাগলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে—কিন্তু আমি যদি কখনও ভুল করি, অন্যায় করি বা আঘাত করি আপনাকে?

—কিন্তু ভুল কি কখনও করোনি, না অন্যায়ও করোনি, না আঘাতও কখনও দাওনি আমাকে?

জবা এবার চোখ নামালো। বললে—দেখুন এই আমার কপাল—কেউ আমাকে বুঝলো না, বুঝতে চাইলোও না কোনোদিন।

ভূতনাথ কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। জবা হঠাৎ বললে—আপনিও শেষে আমায় ভুল বুঝলেন ভূতনাথবাবু, আট-ন' বছর বয়েস পর্যন্ত যার কেটেছে পাড়াগাঁয়ে অন্য এক সমাজে, যার লেখা-পড়া শেখবার অবকাশ হলো না, বাপ-মা'র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেল যাকে গুণ্ডার দল, তারপর হঠাৎ চলে এলাম আর-এক সমাজে, যেখানে এসে দেখলাম মা আমাকে চিনতে পারে না, এতদিন যে-সমাজে মানুষ হয়েছি সেখানে যা ছিল গুণ এখানে এসে তা হয়ে গেল দোষ, ঘষে-মেজে যাকে আবার সভ্য মানুষ করা হলো, তার তখন আর কী বাকি আছে? আপনারা সবাই আমার মুখের কথাটা সত্যি বলে মেনে নিলেন—বাইরের খোলসটাকেই আসল রূপ বলে ধরে নিলেন—অন্যায় যদি করেই থাকি, আঘাত যদি দিয়েই থাকি কোনো দিন তো আজকে অন্তত আমায় ক্ষমা করবেন। সুপবিত্রর মতো আপনি... বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল জবা।

ভূতনাথ চেয়ে দেখলে সুপবিত্র এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

জবা বললে—সব ঠিক করে এলে তো?

সুপবিত্র বললে—সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

—বাড়িটার ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়েছে?

সুপবিত্রর দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। আজকে আর আলপাকার কোট নয়। বেনিয়ান পরেছে একটা। চোখের মোটা চশমার নীচে চোখ দুটো কাঁপছে। দেখেই মনে হয় যেন সারা জীবন লেখা-পড়া নিয়ে কেটেছে তার। অন্তত জবার দিকে যে-দৃষ্টি নিয়ে দেখছে বই-এর পাতার দিকে সেই দৃষ্টি নিয়েই বুঝি দেখে সে। মনে হয় সুপবিত্রর কাছে মানুষ, সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত সংসার যেন একটা বিরাট গ্রন্থ। বই-এর বাইরে যে একটা পৃথিবী আছে তা যেন সে ভাবতে পারে না। ভাবলেও তা জোর করে ভুলে থাকতে চায়। অন্তত তাতে সুখ না থাক শান্তি আছে। তাতে ঝুঁকি কম। তাই জবাকেও সেই দৃষ্টি নিয়েই দেখছে। জবাও যেন তার কাছে একটা বই ছাড়া আর কিছু নয়। পড়বার আগে বা পরে হাত দিয়ে যেন স্পর্শ করতেও তৃপ্তি।

জবা আবার বললে—আর গাড়ি, গাড়ির কী বন্দোবস্ত করলে?

সুপবিত্র যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—যাঃ, গাড়ির কথাটা তো একেবারে ভুলে গিয়েছি। আমি এখন যাচ্ছি—বলে পেছন ফিরতে যাচ্ছিলো।

জবা বললে—থাক, আর গিয়ে কাজ নেই, রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে যা চেহারা হয়েছে তোমার।

সুপবিত্র তবু বললে—না, আমি যেতে পারবো, আমার কিছু কষ্ট হবে না—বলে সত্যিই চলে যেতে চাইছিল।

কিন্তু জবা সুপবিত্রর হাতটা ধরে ফেললে। বললে—সকাল থেকে ঘুরছো—আর যেতে হবে না। শেষে মা'র কাছে বকুনি খেতে হবে তো আমাকেই। ওপরে গিয়ে আয়নাতে মুখখানা একবার দেখো তো নিজের কী দশা হয়েছে চেহারার। এমনি ঘুরলেই স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকবে বটে। ভূতনাথবাবু আছেন, তোমায় আর কিচ্ছু করতে হবে না।

সত্যি এবার নিরস্ত হলো সুপবিত্র।

জবা বললে—ভূতনাথবাবু, একটা গাড়ি আনতে পারবেন?

ভূতনাথ বললে—কখন যাবে?

—এই বিকেলবেলা, সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ি একটা, বার-শিমলে যাবে, বারো আনার বেশি যেন ভাড়া বলবেন না।

ভূতনাথ বললে—বার-শিমলে যাবে তো বারো আনা কেন? আট আনা দিলেই তো যথেষ্ট।

শেষ পর্যন্ত আট আনাতেই সেদিন গাড়ি ঠিক করে এনেছিল ভূতনাথ। আস্তে আস্তে সমস্ত মাল-পত্র পাঠানো হলো গরুর গাড়িতে। বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। একদিন এই বাড়িতেই এসে উঠেছিলেন সুবিনয়বাবু স্ত্রীর হাত ধরে। সে অনেকদিন আগের কথা। এখানে এসেই তার নতুন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে একদিন। সেই শিশুর কান্নার শব্দে এ-বাড়ি একদিন মুখরিত হয়ে উঠেছে। আবার এখানেই সে-শিশু অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছে। সে-ও একদিন গিয়েছে। এখানেই জবার মা'র সুস্থ মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে তিলে তিলে শোকে দুঃখে নিঃসঙ্গতায়। একদিন এ-বাড়িতে সুবিনয়বাবু উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন বাবার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র। সঙ্গে করে এনেছেন জবাকে। এই বাড়িতেই জবার নতুন করে পুনর্জন্ম হয়েছে। হাতেখড়ি হয়েছে। এই বাড়িতেই কতদিন কত উৎসব, কত মাঘোৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছে। এইখানে এসেছেন বিদ্যাসাগরমশাই, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। এই বাড়িতেই বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন ১৮৬৫ সালে। যেবার কলকাতায় আশ্বিনে-ঝড় হয়েছিল খুব। 'দুর্গেশনন্দিনী' সেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। নিজের হাতে একখণ্ড বই উপহার দিয়ে গিয়েছেন সুবিনয়বাবুকে। এই বড় হল্‌ঘরটায় বসেই একদিন সুবিনয়বাবু জবাকে দীক্ষা দিয়েছেন।

সুবিনয়বাবু বললেন—যেবার কেশববাবু বিলেতে গেলেন, বোধ হয় ১৮৭০ সাল। যাবার আগে এখানে এসেছিলেন—ওই চেয়ারটায় বসেছিলেন তিনি। তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে কিছু বলেছিলেন, সব মনে নেই, কিছু কিছু মনে আছে, বলেছিলেন—মহাপুরুষরা যেন চশমা, চশমা যেমন চোখ আবরণ করে না, অথচ দৃষ্টির উজ্জ্বলতা বাড়ায়, মহাপুরুষরাও হলেন তেমনি—মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে তাঁরা কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন না, বরং ঈশ্বরদর্শনে সাহায্য করেন—আবার আর একটা উপমা দিয়েছিলেন মনে আছে। বলেছিলেন—মহাপুরুষরা যেন দারোয়ান—দারোয়ান যেমন আগন্তুককে প্রভুর কাছে নিয়ে যায়, আর তারপর আর কোনো কাজ থাকে না তার, মহাপুরুষরাও তেমনি ঈশ্বর-চরণে মানুষকে নিয়ে যান।

সুবিনয়বাবুর কথা আজ যেন আর শেষ হয় না।

জবা বলে—বাবা, সন্ধ্যে হয়ে আসছে এইবার চলুন।

সুবিনয়বাবু বললেন—আর একটু দাঁড়াও মা, এ-বাড়িতে তো আর আসা হবে না—আর একটু বলেনি মা। ভূতনাথবাবু তো সব কথা জানে না। সুপবিত্রবাবু, তোমার শুনতে খারাপ লাগছে না তো?

সুপবিত্র মাথা নিচু করলো।

—এই বাড়িতে কি কম ঘটনা ঘটে গিয়েছে! এখনও চোখ বুজলে সব দেখতে পাই। কেশববাবু তখন ফিরে এসেছেন বিলেত থেকে—কত কাজ আমাদের। Indian Reform Association নামে আমাদের সভা হলো একটা—তার প্রথম অধিবেশন হলো এইখানে। কত কী করবার ইচ্ছে ছিল তাঁর—Temperance, Education, Cheap literature, Technical education—কত বিভাগ হলো, শিবনাথ শাস্ত্রী বই লিখলেন 'মদ না গরল', তারপর 'সুলভ-সমাচার' নামে এক পয়সা দামের খবরের কাগজ বেরুলো—তাতেও আমি লিখতাম।

সুপবিত্রবাবু চুপ করে বসে বেনিয়ানের বোতামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। জবা সব কাজ শেষ করে এসেছে। সমস্ত বাড়িটা কাল সকালেই একটা হাসপাতালে পরিণত হবে। এখানে ঘরে ঘরে রোগীর শুশ্রূষা চলবে। সুবিনয়বাবুর বহুদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কিন্তু আজ এই বিকেলবেলার সন্ধিক্ষণে বাড়ির ঘরগুলোর দিকে চেয়ে যেন মনে হলো—সমস্ত মৃত আত্মারা হঠাৎ আবার বুঝি পদচারণা শুরু করেছে। কান পেতে শুনলে যেন অতীতের আত্মাদের কথা শুনতে পাওয়া যাবে। মনে পড়লো জবার মা'র কথা। ওইখানে একটা আরামকেদারায় বসে বসে পশম বুনছেন আর যেন আপন মনে কী ভেবে চলেছেন। আর সেই গান। 'তুমি ব্রহ্ম তুমি নিত্য'। ব্রজরাখালের সঙ্গে ভূতনাথ যেদিন প্রথম এ-বাড়িতে এসেছিল সেদিনের সে-ছবিটা যেন চোখের সামনে ভাসে।

সুবিনয়বাবু বলে চলেছেন, কিন্তু ভূতনাথের যেন কিছুই কানে যায় না। বড়বাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে এ-বাড়ির ইতিহাসের যেন কোনো মিল নেই। অথচ এত কাছাকাছি। এত সমসাময়িক। ভূমিপতি চৌধুরী যখন ইটালিয়ান শিল্পীর মেমকে নিয়ে ঘরে এনে তুললেন, তখন কলকাতার প্রথম আমল। সমাজ তখন ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু ভূমিপতি চৌধুরীর বংশধর বৈদূর্যমণি, হিরণ্যমণি, কৌস্তুভমণি, চূড়ামণি, ওরা তো নতুন যুগের মানুষ। তবু তারাও তখন পূর্বপুরুষের বনেদীয়ানার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে অচৈতন্য হয়ে। কিন্তু পাশাপাশি এই সুবিনয়বাবুর বাড়িতেই তখন অন্য ইতিহাস রচনা চলেছে। রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা করলেন—'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' নিয়ে। বিলেতের টাইমস পত্রিকায় সে-রিপোর্ট ছাপা হলো। রাজনারায়ণ বসু বললেন—ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই উন্নতরূপ। ব্রহ্মানন্দ বিলেত থেকে এসে 'ভারত-আশ্রম' করলেন। এখন যেখানে সিটি কলেজ ওইখানে ১৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের বাড়িতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলো। সুবিনয়বাবু গিয়ে উঠলেন একদিন 'ভারত-আশ্রমে'।

জবা আবার বললে—এবার চলুন বাবা।

—হ্যাঁ মা, কিন্তু চলে গেলে তো আর বলা হবে না, তোমার ভালো লাগছে তো সুপবিত্র?

জবা বললে—সুপবিত্রবাবুকে আজ অনেক খাটিয়েছি বাবা—ওঁর মা হয়তো খুব বকুনি দেবেন আমাকে।

—তাই নাকি মা? তবে তো দেরি করা উচিত নয়—কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গোড়াকার গল্পটা শুনবে না আজ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন করে...

—না বাবা, সে-গল্পটা আজ থাক—অনেক দেরি হয়ে যাবে—

—তবে চলো।

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি।

এবার শেষ যাত্রা। সন্ধ্যে হবো হবো। সমস্ত ঘরে তালা লাগিয়ে দিলো ভূতনাথ। পুব দিকের ঘরের কাছে আসতেই জবা পেছনে এসে দাঁড়ালো। বললে—একটু দাঁড়ান ভূতনাথবাবু।

চমকে উঠলো ভূতনাথ। এদিকটা অল্প-অল্প অন্ধকার। জিনিসপত্র খালি হয়ে যাবার পর এখন একটুখানি গলার শব্দ সমস্ত বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। খাঁ খাঁ করা আবহাওয়ার মধ্যে যেন দম আটকে আসে। ভূতনাথ তখন সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। হঠাৎ বলে উঠলো—কে?

জবা বললে—একটা কথা ছিল আমার।

জবার মুখখানা যেন রাগে কালো হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা না গেলেও অনুমান করে নিলে ভূতনাথ—যেন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে। বললে—বলো না?

জবা বললে—আর যদি কখনও দেখা না হয় আপনার সঙ্গে, তাই বলে রাখাই ভালো।

ভূতনাথ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—খুব জরুরী কথা কি?

—খুব জরুরী কথা না হলেও খুব দরকারী।

—সে কথা কি সকলের সামনে বলা যায় না?

—সকলের সামনে শুনতে চান তো তাও বলতে পারি—কিন্তু তাতে আপনার মর্যাদা বাড়বে না।

—তোমার কাছে আজ নতুন কথা শুনছি জবা, মর্যাদার কথা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না—কিন্তু যে-কথাই হোক—সেটা পরে বললেও তো চলতো—এখন তো তুমি খুব ব্যস্ত।

—যত ব্যস্ততাই থাক, আমি কাজের মধ্যে এতক্ষণ ভুলে ছিলুম—কিন্তু মনে পড়েছে এখন।

—কিছু অন্যায় করেছি আমি?

—আপনার নিজের সাহস নেই বলে বাবার কাছে ননীলালকে পাঠিয়েছিলেন কী বলে?

—কে, ননীলাল?

—শুধু তাই নয়, আপনার ছাড়পত্র না থাকলে এখানে ঢোকে সে কোন্ সাহসে? আপনি তাকে কেন বাবার কাছে পাঠিয়েছিলেন শুনি?

—বিশ্বাস করো...

—বাবার সমস্ত সম্পত্তি সে আত্মসাৎ করতে চায়—এই সহজ কথাটাই সে বলতে পারতো কিন্তু ব্যাঙ্কের নাম করে সে ঠকাতে চায় কেন? কেমন করে সে খবর পেলে যে, আমরা আমাদের সমস্ত সম্পত্তি সমাজে দিয়ে দিচ্ছি।

ভূতনাথ অপরাধীর মতো বললে—সেটা আমি বলেছিলুম।

—শুধু বলেননি, তাকে আবার পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে, সে তো আপনার নাম করেই কথাটা পাড়লে—নইলে ননীলালের এত সাহস হবে না যে, আমার সামনে সে মুখ দেখায়। সমাজের কোনো মেয়েদের সম্ভ্রম সে রাখতে পারেনি, কারো বিশ্বাস সে অর্জন করতে পারেনি, হতে পারে বড়লোক হয়েছে সে, বড় বড় জায়গায় তার খাতির হয়, কিন্তু আপনি তো জানেন আমরা সে-দলের নই। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব আলাদা, আমরা টাকা দিয়ে ঐশ্বর্য দিয়ে মানুষের বিচার করি না। মনুষ্যত্ব যার নেই, তাকে বাবা প্রশ্রয় দেন না, আমরা যে-সমাজের লোক সে-সমাজে সকলের চেয়ে বড় হলো মনুষ্যত্ব—বাবার কাছে এই শিক্ষাই আমি পেয়েছি এতদিন।

ভূতনাথ তালাচাবি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে—হয় তো আমি দোষীই জবা, কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তাকে এখানে পাঠাইনি।

জবা বললে—তা হলে সে এল কোন্ সাহসে?

ভূতনাথ বললে—সে আমি জানি না, আর ননীলালকে যদি তুমি ভালো করে চিনেই থাকো তো বুঝতে পারো যে আমার পাঠানোর ধার সে ধারে না।

—কিন্তু আপনি তার বন্ধু! ভাবতেই যে ঘেন্না হচ্ছে।

—বিশ্বাস করো জবা ..

হঠাৎ দূর থেকে সুবিনয়বাবুর গলা শোনা গেল—জবা—মা—

—আসি বাবা—বলে জবা চলে গেল—

ভূতনাথের শরীরের সমস্ত শক্তি এক নিমেষে যেন অন্তর্ধান করেছে। তালা নিয়ে খোলা দরজাটার সামনে যেন পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর অনেকক্ষণ পরে চাবির হিসেব করে যখন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। সুবিনয়বাবুকে মুখ দেখাতেও লজ্জা হলো তার। ননীলাল কেন অমন করলো? সে তো সঙ্গে করেই নিয়ে যাবে বলেছিল!

সুবিনয়বাবু সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামছিলেন। তাঁর হাত ধরে জবাও নামছিল। পেছনে পেছনে সুপবিত্র। সমাজের কয়েকজন ভদ্রলোকও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পাড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট লোকও ছিলেন। কয়েক্টা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। ভূতনাথ গিয়ে ধরলো সুবিনয়বাবুকে। ধরে আস্তে আস্তে নামিয়ে আনলে।

গাড়িতে প্রচুর জিনিস বোঝাই হয়েছে। ছাদের ওপর আর জায়গা নেই। কয়েকটা দামী জিনিস গাড়ির ভেতরে। পেছনেও বাঁধা রয়েছে কিছু মালপত্র। ধীরে ধীরে সুবিনয়বাবুকে গাড়িতে তুলে দিলে ভূতনাথ। বললে—একটু সাবধানে উঠবেন, মাথাটা বাঁচিয়ে।

তারপর জবা উঠলো। উঠে সামনের বেঞ্চিতে বসলো। সুবিনয়বাবু উপস্থিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে সুপবিত্রকে ডাকলে—উঠে এসো, আর দেরি নয়, রাত হচ্ছে।

ভূতনাথও সুপবিত্রকে বললে—উঠুন আপনি। নিঃশব্দে সুপবিত্রও গিয়ে উঠলো গাড়িতে। আর জায়গা নেই কোথাও।

সুবিনয়বাবু বললেন—ভূতনাথবাবু তুমিও উঠে এসো—ভূতনাথ বললে—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি যা হোক করবো'খন।

সুবিনয়বাবু যেন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—তা হলে মা, ভূতনাথবাবু কোথায় বসবেন?

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি বললে—আমি হেঁটেই যাবো'খন।

—ছাদে জায়গা নেই? নয় তো পেছনে?

—আমি হেঁটেই যাবো পেছন পেছন—আপনি ভাববেন না।

জবাও এতক্ষণে বললে—হ্যাঁ, উনি হেঁটেই যেতে পারবেন। ওঁর হাঁটা অভ্যেস আছে খুব।

ভূতনাথ বলে উঠলো—হ্যাঁ, আমার হাঁটা অভ্যেস আছে, গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দাও।

আর কেউ কিছু উচ্চবাচ্য করলো না। গাড়োয়ানও ছেড়ে দিলে গাড়ি। একটা টি টি শব্দ করলো মুখ দিয়ে। ঘোড়া দুটো প্রথমে একটু নড়ে উঠলো। তারপর কলকাতার খোয়ার রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির চাকার কর্কশ শব্দ কানে আসতে লাগলো শুধু। সুবিনয়বাবুর ইতিহাস চলতে লাগলো কর্কশ বন্ধুর পথ ধরে। সে ইতিহাস বড়বাড়ির মতো নিশ্চল স্থাণুর ইতিহাস নয়। অনেক পথ, অনেক ধাক্কা সামলাতে সামলাতে তাকে পৌঁছতে হবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দর ধারা ধরে ধরে এসে পৌঁছবে নতুন সভ্যতার সিংহদ্বারে।

ভূতনাথও হাঁফাতে হাঁফাতে চলতে লাগলো। গাড়ির পেছনে দুটো লাল আলোর বিন্দু দেখা যায়। সেই অন্ধকারে লাল দুটো বিন্দুকে নিশানা করে চলা। কোথায় বাগবাজার, কোথায় বার-শিমলে! তা হোক, সে তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে! সে ভাত খায় বেশি, তার হাঁটা অভ্যেস আছে। অভ্যেস নেই সুপবিত্রর। সে বড় ভালো মানুষ। ভাত খাবার কথা মনে থাকে না তার। এখনও তার মা তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কেমন করে সে সংসার করবে কে জানে! বেশি পরিশ্রম করলে সে বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মুখের চেহারা খারাপ হয়ে যায়। সে-ই বরং গাড়িতে যাক।

হাঁটতে হাঁটতে এক-একবার রাস্তার খোয়ায় হোঁচট লাগে ভূতনাথের। তা হোক। সুপবিত্র তো গাড়িতে চড়েছে। সুপবিত্র অত হাঁটতে পারবে কেন। সুপবিত্রকে অত হাঁটালে হয়তো তার মা রাগ করবে। রাগ করবে জবার ওপর।

সন্ধ্যে অনেকক্ষণ উৎরে গিয়েছে। কয়েকটা খোলার বাড়ি ট্রাম রাস্তার ধারে। এদিকে রাস্তায় গ্যাসের আলো হয়েছে। বাড়ির ভেতরে সব টিম টিম করে তেলের আলো জ্বলছে। একটা মোড় ঘুরতেই গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

বার-শিমলের পথে একলা হাঁটতে হাঁটতে ক'দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়লো ভূতনাথের।

হঠাৎ ভূতনাথের মনে হলো... তাই তো—এতক্ষণ মনে ছিল না—বংশী যে বার-বার করে বলে দিয়েছিল সকাল সকাল বাড়ি আসতে। ছোটবৌঠান হয়তো সেজেগুজে তৈরি হয়ে বসে থাকবে। মিয়াজান গাড়ি নিয়ে হাজির। হয় তো বংশী সারা বাড়ি খোঁজাখুঁজি চালিয়েছে। এখন আর বড়বাড়ির সে-জাঁক নেই। ছুটুকবাবুর গানের আসরই বসে না। সারা উঠোনটা এখন যেন খাঁ খাঁ করে। শুধু যেন শূন্য পুরীর সামনে ব্রিজ সিং বন্দুক নিয়ে ঝিমোয়। আগে পায়চারি করতো, এখন ঝিমোয়। হাবুল দত্ত এখন এসে সেই যে ঢোকে মেয়ে-জামাই-এর ঘরে আর বেরোয় সেই রাত্রে। কী ফুস-মন্তর দেয় কে জানে! মেজবাবু একাই চালিয়েছেন তাঁর নৈশ উৎসব। আজো হাসিনী আসে, মেজমাঠাকরুণ আসে, পানের ডিবে নিয়ে বড়মাঠাকরুণও আসে। সেদিন হঠাৎ নান্নেবাঈ-এর নাচগানও হয়ে গেল। কিন্তু তেমন জমলো না। বাঈজী এলে তিন দিন ধরে গানবাজনা চলতো আগে। একদিনে কখনও শেষ হয়নি আসর। নান্নেবাঈ গজল গেয়েছে, ঠুংরি গেয়েছে, কিন্তু তেমন বাহবা পায়নি যেন এবার। মেজবাবুর তেমন মেজাজ ছিল না। নাচতে নাচতে মোহর তুলে নিয়েছে ঠোঁট দিয়ে। কিন্তু ওই এক বারই। আর দ্বিতীয় বার মোহর পড়েনি রুপোর থালায়। এবার যাবার সময় বেনারসীর চমকদার ওড়নাও পেয়েছে। যেমন পায় অন্যবার। কিন্তু তেমন খুশি হয়নি যেন নান্নেবাঈ। মুন্নালাল তেমন করে সারেঙ্গী বাজাতে বাজাতে লুটিয়ে পড়েনি আসরের ওপর। নান্নেবাঈ-এর ঘোমটা ততটা ফাঁক হয়নি নাচতে নাচতে। তাল কেটে গিয়েছে বার বার! আসরের পর অনেক রাত্রে মেজবাবুর খাস-কামরায় ডাকও পড়েনি তার! এ যেন নেহাৎ নিয়মরক্ষা। আহা,

এসেছে আশা করে—ফিরে যাবে! এমনি ভাব।

আর ছোটবাবু! ছোটবাবু কেন আবার যাবে জানবাজারে! কিসের বিরোধ বাধলো বৌঠানের সঙ্গে! মদ কি খায়নি ভালো করে ছোটবৌঠান! কায়দা-কানুনে কিছু ত্রুটি ছিল কি? কিম্বা হয়তো ঠিক বিয়ে করা স্ত্রীকে দিয়ে তেমন ফুর্তি হয় না। যেমন করে চুনীদাসী আদর করে আপ্যায়ন করে ঠিক তেমনিটি হয়তো হয় না পটেশ্বরী বৌঠানের। কিন্তু চুনীদাসীকেও তো সেদিন ভালো করে দেখেছে ভূতনাথ। চুনীদাসী তাকে সেদিন 'ভালোমানুষবাবু' বলে ডেকেছিল। সত্যিই বাহাদুরি আছে চুনীদাসীর। বার-শিমলেয় যেতে যেতে সেদিনকার ঘটনাটা মনে পড়লো ভূতনাথের।

সেদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো ভূতনাথ, দেখতে পেয়েছে বৃন্দাবন। বললে—আমি চুনীদাসীকে বলেছিলাম আপনি আসবেন—তা চলুন এখন, এই তো দু'পা গেলেই আমাদের বাড়ি।

—না, না, তা হতে পারে না বৃন্দাবন, আমার অন্য কাজ আছে, বিশ্বাস করো।

টানাটানি। কিছুতেই ছাড়ে না।

ভূতনাথ বললে—আমার অনেক কাজ হাতে, জানো তো পরের বাড়িতে থাকি—সময়ে না খেলে...

—সে আমি শুনছি না শালাবাবু।

—আচ্ছা, যাবো একদিন কথা দিচ্ছি—কিন্তু আজ নয়।

—না শালাবাবু, সে হবে না।

শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো। আগে একদিন মাত্র ভূতনাথ এসেছিল বংশীর সঙ্গে। সেই দরজা পেরিয়েই সরু একফালি বারান্দা। তারপরেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি।

বৃন্দাবন আগে আগে চলতে লাগলো। বললে—চলে আসুন শালাবাবু। ওপরে গিয়ে বৃন্দাবন যেন কাকে লক্ষ্য করে বললে—দেখো গো কাকে নিয়ে এসেছি।

—কে রে? মেয়ে গলায় কে যেন সাড়া দেয়। মনে হলো যেন চুনীদাসীর গলার আওয়াজ।

—এই দেখো, চিনতে পারো?

ভূতনাথ একেবারে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক গা গয়না পরা চুনীদাসী বসে আছে তখন ফরাশের ওপর। সামনে পানের ডাবর। চুন, সুপুরী, লবঙ্গ, এলাচের কৌটো। মোটা হয়েছে যেন আরো। ফরসা টক টক করছে গায়ের রং। পাতাকাটা চুল। ভূতনাথকে দেখে বাঁ হাত দিয়ে একটু ঘোমটা উঠিয়ে দিলে মাথায়।

—ওমা, তাই বলি, এসো, এসো কী ভাগ্যি!

রীতিমতো আদর অভ্যর্থনা। বৃন্দাবন ফরাশের সামনেটা একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ করে দিলে। বললে—বসুন এখানে আয়েশ করে—তারপর তাকিয়াটাও একটু সরিয়ে দিলে ভূতনাথের দিকে।

বৃন্দাবন বললে—ভারি ভালোমানুষ এই আমাদের শালাবাবু, ছোটমা'র জন্যে কী কষ্টটাই না করে, জানলে চুনী।

সামনে দুটো পানের খিলি একটা রেকাবিতে করে এগিয়ে দিয়ে চুনীদাসী বললে—আহা, তা করবে না গা, যে ভালোমানুষ হয় তার সবই ভালো—খাও ভালোমানুষবাবু, পান খাও—ভাই।

ভূতনাথ যেন অবাক হয়ে গিয়েছে। দেয়ালের গায়ের তাকে থরে-থরে সাজানো বোতলের সারি। ওপাশে ঝালর দিয়ে ঢাকা একটা কী জিনিস। বোধ হয় হারমোনিয়াম। তার পাশেই উপুড় করা একজোড়া বাঁয়া তবলা। তারই পাশে একজোড়া ঘুঙুর। আর ঠিক মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে ঝুলছে একখানা তেল রং-এর ছবি। ছোটকর্তার।

বৃন্দাবন বললে—বেশ আয়েশ করে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসুন শালাবাবু—এমন আড়ষ্ট হয়ে আছেন কেন?

ভূতনাথ হেলান দিয়ে বসে বললে—কই, আড়ষ্ট হয়ে নেই তো।

—হ্যাঁ, দিব্যি গা এলিয়ে দিন, দিয়ে চুনীর সঙ্গে গল্প করুন। ক'দিন থেকে ভাবছি অত করে বলে এলুম শালাবাবুকে, একবার এলেন না। তা চুনী বলছিল আসবে নিশ্চয়ই, বলেছে যখন

ভালোমানুষবাবু, তখন নিশ্চয়ই আসবে।

চুনী পান চিবোতে চিবোতে বললে—সত্যি ভাই, ভালোমানষবাবু, বলছিলুম ক'দিন ধরে, বলি সেই গেল, এত করে আসতে বলে দিলাম, একদিন এল না। একবার ভাবলাম নিজেই আবার যাই... তা গাড়িটা বেচে দিয়েছি শুনেছো বোধ হয়—তা এত রোগা হয়ে গিয়েছেন কেন ভালোমানুষবাবু?

তারপর কী যেন ভেবে নিয়ে ডাকলে—ওরে বিন্দাবন—

ভূতনাথেরও হঠাৎ নজরে পড়লো বৃন্দাবন কোথাও নেই। অথচ এতক্ষণ এখানেই ছিল!

—যাই গো, বলে পাশের কোথা থেকে বৃন্দাবনের সাড়া এল।

—পাখীটাকে ছোলা দিয়েছিস? এই দ্যাখো না, এই এক জ্বালা হয়েছে, ক'দিন থেকে পাখীটা মুখে কিছু কাটছে না ভাই, সাত দিকে সাত ঝঞ্ঝাট হয়েছে আমার—ছোটবেলা থেকে পুষেছি কিনা, এখন মায়া পড়ে গিয়েছে এমন—

বৃন্দাবন এল। চুনীদাসী বললে—থাকোকে ডেকে দে তো।

ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো। ছোটবৌঠানের ঘরের সঙ্গে এ-ঘরের অনেক তফাৎ। কয়েকটা ছবি দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। বিলিতি ছবি বলে মনে হয়। শাড়ি খসে পড়েছে পরীদের গা থেকে। জলে স্নান করতে নেমেছে একজন পরী। পাহাড়ের ঝরনার ধারে একটা পরী নিজের শরীরটার ছায়া দেখছে আপন মনে। কোথাও তিনটে পরী অপরূপ ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছে। কাপড়-জামার বালাই নেই কারো।

ঘরের মধ্যে যেন একটা কিসের তীব্র গন্ধ। অথচ ছোটবৌঠানের ঘরে গেলেই সব সময় ধূপ-ধুনোর গন্ধ নাকে আসে। কিন্তু এখানে অন্যরকম। অচেনা একটা উত্তেজনা আসে আপনা থেকেই। বিছানাটা খুব পুরু। বসতেই আধ হাত গর্ত হয়ে যায়। মোটা-মোটা খান পাঁচ-ছয় তাকিয়া। বিছানার ওপরেই পানের রেকাবি, মশলার কৌটো। আর ঘরের এক কোণে একটা গড়গড়া। তলাটা রূপোর মতো ঝক ঝক করছে।

চুনীদাসী বললে—অমন আড়ষ্ট হয়ে বসে কেন ভালোমানুষবাবু, ভালো করে হেলান দাও না ভাই।

ভূতনাথ দেখলে চুনীদাসীর নাকেও একটা হীরের নাকছাবি। অনেকটা যেন বৌঠানের নকল। কিন্তু চুনীদাসী পান খায় বৌঠানের চেয়ে বেশি। সেদিন এই বিছানার ওপরেই ছোটকর্তা শুয়ে ছিল। কিন্তু সেদিন চুনীদাসীকে এত সুন্দর মনে হয়নি। আজ যেন বড় ভালো লাগতে লাগলো চুনীদাসীকে। চুনীদাসী খানিক পরে বললে—তামাক দিতে বলবো? তারপর ভূতনাথের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে—তোমার ভয় নেই ভালোমানুষবাবু, বামুনের হুঁকোও আছে।

তামাক খায় না শুনে চুনীদাসী কিন্তু অবাক হলো না। বললে—আমারও তামাক খেতে ভালো লাগে না—আর তেমন তামাক আনতেও পারে না বিন্দাবন, ছোটবাবু রাগ করে বিন্দাবনের ওপর, আগে ছোটবাবু তামাক খেতো, ঘর একেবারে গন্ধে ভরপুর হয়ে যেতো—সব জিনিসে আজকাল আগুন লেগেছে ভাই।

ভূতনাথ বললে—একটু জল বরং দাও—জল তেষ্টা পেয়েছে।

—জল কেন, সরবৎ দিক না।

—না, সরবৎ দরকার নেই, জলই যথেষ্ট।

—সরবৎ তো হচ্ছে—তৈরি হচ্ছে, হলেই দিয়ে যাবে। রোজই সরবৎ হয় আমার এখানে, ছোটকর্তা খেতো কিনা—ছোটকর্তা কেমন আছে আজকাল ভালোমানুষবাবু?

ভূতনাথ বললে—সেই রকমই—একবার ওঠেন, আবার পড়েন।

—কেউ দেখে না বুঝি? চুনীদাসী বলতে লাগলো—আমি কত সাবধানে রাখতাম তাকে—কোনোদিন যদি বেশি মদ খেয়ে ফেলতো বারণ করতাম, বকতাম। অথচ কারো সহ্য হলো না—ছোটকর্তা কি ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে?

ভূতনাথ বললে—আমি ঠিক জানি না, বংশী জানে।

—ওই একটা বদমাইস, ওই বংশী! আমাকে বলে কিনা বেবুশ্যে! শুনিছি সব, বড়বাড়ির কি আমিই প্রথম নাকি? মেজদি'র বাবার মেয়েমানুষ নেই? কলকাতার কোনো বাড়ির খবর জানতে তো আর বাকি নেই। এখানে সবাইকে আসতে হয়েছে, কালীপূজোর দিন ছোটবাবুকে কে বাঁচালো শুনি? নইলে আগুনে পুড়ে তো একাকার হয়ে যাচ্ছিলো। তা তো বংশী জানে না।

ভূতনাথের চোখে বিস্ময় দেখে চুনীদাসী বললে—সে খবর জানো না?

ভূতনাথ বললে—শুনিনি তো।

—ওই যে পাশের বাড়িটা দেখছো, ওর দক্ষিণে যে বাড়িটা, ওইখানে থাকে কতগুলো মাগী, বাজারের মেয়েমানুষ, তা সেবার কালীপুজোর সময় ও-বাড়ির বাবুরা তুবড়ি জ্বালাচ্ছে খুব, ছোটকর্তার সঙ্গে আমিও বাজি দেখতে উঠেছি ছাদের ওপর। একটা বাজি এসে পড়লো একেবারে আমার বাড়ির উঠোনে—আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে সুখী।

—সুখী কে?

—আমার আগে একটা টিয়াপাখী ছিল, তাঁর খাঁচার ওপর এসে পড়েছে একেবারে—আর চেঁচাচ্ছে খুব। মরতে মরতে নেমে এলুম নীচে, দেখি তখন সুখীর শেষ অবস্থা ভাই, কেঁদে তো আমি বাঁচিনে—তা ছোটকর্তাকে চেনো তো তুমি, রেগে গেলে ও-মানুষের জ্ঞান থাকে না, বললে—এখুনি তুবড়ি কিনে আনো—হাজার টাকার তুবড়ি।

—হাজার টাকার তুবড়ি?

—ছোটকর্তার তো হাজার ছাড়া কথা নেই—হাজার টাকা বলেই খালাস—তা বিন্দাবন গেল তুবড়ি কিনতে—কিন্তু হাজার টাকার তুবড়ি কি চাট্টিখানি কথা! তা যা পাওয়া গেল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে তখুনি নিয়ে এল কিনে।

ছোটকর্তা বলে—ছোঁড়ো সবাই ওদের দিকে।

তা সেদিন সবাই এসেছিল। মধুসূদন, লোচন, আমার দারোয়ান, চাকর সবাই।

—মধুসূদন কি এখানে আসে নাকি? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ, রোজই তো আসে। ওরা তো আমাদের দেশের লোক। রোজ সরবৎ খেয়ে যায়—তা তুমি জানতে না ভালোমানুষবাবু? মধুসূদন আসে, লোচন আসে, মাঝে মাঝে শ্যামসুন্দর, বেণী। তা—আগে শশীও আসতো, বিন্দাবন যে সরবৎটা তৈরি করে ভালো, ওর যে নাম-ডাক আছে কলকাতায়।

তারপর চেঁচিয়ে ডাকলো চুনীদাসী—হ্যাঁ রে, সরবৎ হলো তোদের? তা তারপর কী হলো বলি—শোনো ভাই।

চুনীদাসী আর একটা পান মুখে পুরে দিলে। তারপর বোঁটায় করে খানিকটা চুন। তারপর জর্দার কৌটো খুলে মুখে পুরে দিলে খানিকটা। একমুখ পান, রসে বোধ হয় সমস্ত মুখখানা ভরে উঠেছে। তারপর সরে গিয়ে ফরাশের বাইরে পিকদানিটায় খানিকটা পিক ফেলে'মুখ মুছতে মুছতে বললে—পান মুখে দিয়ে গল্প করতে পারিনে ভাই আমি।

ভূতনাথ বললে—তারপর কী হলো?

আবার মুখে রস জমে উঠেছে। চুনীদাসী আবার সরে গিয়ে পিক ফেললে। বললে—দূর হোক গে ছাই, মুখটা ধুয়েই ফেলি। জর্দা খেয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করতে জুত হচ্ছে না।

ডাকলে—থাকো, এক ঘটি জল দে তো মেয়ে।

চুনীদাসীর পান খাওয়া, দোক্তা খাওয়া, ওঠা-বসা সমস্ত দেখতে দেখতে ভূতনাথের কেমন যেন একটা অদ্ভুত কথা মনে হলো। এই মেয়েকে নাচলে কেমন দেখাবে, কে জানে। ছোটকর্তা তো অল্পে সন্তুষ্ট নয়! ছোটবাবুকে তৃপ্তি যে-সে দিতে পারে না। শুধু রূপ, আর রূপের বাহার থাকলেই চলবে না। সে-রূপের প্রকাশ চাই। অঙ্গভঙ্গী চাই। রূপকে বিকৃত করে বিশ্লেষণ করে তবে ছোটকর্তার শান্তি। এই ঘর। এই ঘরের মধ্যেই এতদিন ছোটকর্তা তার পরিতৃপ্তি খুঁজেছে এবং পেয়েছে। কিন্তু চুনীদাসীকে বাইরে থেকে দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। কোথায় এর বৈশিষ্ট্য?

কোথায় এর বৈচিত্র্য? এই মেয়েই হাসিতে, গানে, কথায়, নাচে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে ছোটকর্তাকে। এখন দেখলে কেমন অবাক লাগে! অথচ বড়বাড়িতে যারা পেশাদার নাচিয়ে গাইয়ে আসে, তাদের দেখেই বোঝা যায়। কজ্জনবাঈ, নান্নেবাঈ—তাদের চোখের চাউনি আলাদা। তাদের চোখও নাচে অনবরত। নান্নেবাঈ যখন গজল গাইছিল—'নয়না না মেরে—' তখন তা বোঝা যায়। হাসিনীকেও ধরা সহজ। বড়মাঠকরুণ বয়েসকালে নাচতে পারতো। পা দেখলে ধরা যায় এখনও। এক-একদিন গাড়িতে ওঠবার সময় পায়ের যেটুকু কাপড় সরে গিয়েছে তা দেখে বুঝেছে ভূতনাথ। বুড়ী হয়ে গেলেও আঁটোসাঁটো দেহ। কিন্তু এই চুনীদাসী যেন এক আশ্চর্য মেয়েমানুষ। ভূতনাথের এমন মেয়েমানুষের সঙ্গে এই প্রথম মুখোমুখি কথা বলা।

চুনীদাসী গল্প করে যায়। বলে—তুবড়ি ফাটছে দুম দাম শব্দে, ও-বাড়িতে ছাদের আলসের ওপর সার-সার চল্লিশটা তুবড়ি বসিয়ে চল্লিশটা মেয়ে একসঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। চল্লিশটা তুবড়ি অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ করে শোঁ শোঁ শব্দে ফুলের তোড়ার মতো উড়ে চলেছে। একসঙ্গে চল্লিশটা মেয়ের হুল্লোড়। আর তাদের একশ' বাবুরা। পাড়াটা মাত হয়ে উঠেছে। ছাদের ওপরেই মাদুর পেতে হারমোনিয়ম নিয়ে নাচ-গান চলেছে। একশ' বাবু একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

হঠাৎ এদিকে বিন্দাবনও ছুঁড়লো তুবড়ি। তুবড়ির ঝাঁক! ও-মা-গো—বলে ছিটকে পড়লো মেয়েদের দল! গান-বাজনা মাথায় উঠলো তাদের। শাড়িতে, সেমিজে আগুনের ফুল্‌কি লেগেছে। উদ্দাম হয়ে উঠেছে আসর। তারপর আরো তুবড়ির ঝাঁক গিয়ে পড়লো আবার।

ছোটকর্তা বললেন—দে বৃন্দাবন, সব মাগীদের পুড়িয়ে মার, পাঁচ গণ্ডা তুবড়ি নিয়ে বাজি পোড়াতে আসা।

নীচে ছিল মুসলমানদের হোটেল। সেখানে গিয়েও পড়লো কয়েকটা। রাস্তায় লোক জমে গেল। এক-একটা তুবড়ি শোঁ-শোঁ করতে করতে যায় আর ছাদের ওপর পড়ে ছত্রখানা হয়ে যায়। আগুনের ফোয়ারা ছোটে। কিলবিল করে ওঠে মাগীগুলো। মাগীরা বলে—এ কী কাণ্ড মা, পালিয়ে যাই নিচে।

কিন্তু বাবুরা ছাড়বে কেন? তারা পয়সা খরচ করে ফুর্তি করতে এসেছে, এত সহজে মাটি হবে সব! দু'-একটা মাগী মরলো কি গেল, তাতে তাদের কী। সারা বছরে যাদের বাবু জোটে না, কালীপুজোর দিন তাদের ঘরেও লোক আসে। দুটো ভালো-মন্দ জিনিস পেট ভরে খেতে পায়। মাংস হয়, ভালো ভালো মদ আসে—ভালো জামা-কাপড় পায়, সেদিনটা এমন করে নষ্ট হবে নাকি! গঙ্গায় গিয়ে দেখেছি, পানসির ভাড়া চৌডবল হয়ে গিয়েছে। কালীপুজো, কার্তিক পুজো—এগুলোই তো ওদের মরশুম। গল্প করতে করতে চুনীদাসী আবার ডাকলে—সরবৎ হলো তোর বিন্দাবন?

ভূতনাথ বললে—তারপর?

—তারপর একটা তুবড়ি এসে পড়লো একেবারে ছোটকর্তার গায়ের...

হঠাৎ বৃন্দাবন সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বললে—ধরুন শালাবাবু।

বিছানার পাশে রাখলো দু' গেলাস সরবৎ। রুপোর গেলাস। বেশ ঝকঝক করছে। ওপরে বৃন্দাবনী কাজ করা। একটাতে লেখা চুনীদাসীর নাম। আর একটাতে কৌস্তুভমণি চৌধুরীর। ছোটকর্তার গেলাসটা ভূতনাথের সামনে রাখলো বৃন্দাবন। আবার বললে—চোঁ-চোঁ করে মেরে দিন শালাবাবু, দেরি করবেন না।

বৃন্দাবন চলে গেল। ভূতনাথ বললে—কিসের সরবৎ এ?

—খেয়েই দেখো না ভালোমানুষবাবু, তেঁতুল দিয়ে বেশ করে গেলাস মেজে দিয়েছে, বামুনমানুষকে কি আমরা যা-তা জিনিসে খেতে দিতে পারি—নাকি আমাদের আক্কেল বিবেচনা নেই?

ভূতনাথ তবু দ্বিধা করতে লাগলো। সিদ্ধি নয় তো? সেবার ছুটুকবাবুর আসরে সিদ্ধি খেয়ে কী

কাণ্ড—প্রাণ যায় আর কি—মনে হয় বুঝি সমস্ত বাড়িটা উল্টে যাচ্ছে।

চুনীদাসী ততক্ষণে নিজের গেলাসটা নিয়ে চুমুক দিতে শুরু করেছে। সমস্তটা শেষ করে মুখ দিয়ে একটা শব্দ বার করলে—আঃ, বেশ হয়েছে সরবৎটা।

কিন্তু এদিকে আর-এক কাণ্ড ঘটে গেল। সরবৎ মুখে তুলে চুমুক দিতেই মাথাটা যেন হঠাৎ ঘুরে উঠলো ভূতনাথের। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত পিছলে গেলাসটা কাত হয়ে পড়েছে।

—ঐ যাঃ, কী হলো—চুনীদাসী হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে ধরতে গেল। কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গিয়েছে। সরবৎ গড়িয়ে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। একাকার হয়ে গিয়েছে সমস্ত জায়গাটা। চুনীদাসী বললে—পড়ে গেল? দেখি দেখি?

তখন বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে ভূতনাথ। তার নিজের জামা-কাপড়েও পড়েছে। বিছানাটাও নষ্ট হয়ে গেল।

চুনীদাসী এগিয়ে এসে নিজের শাড়ি দিয়ে ভূতনাথের হাত মুখ মুঁছিয়ে দিলে। ভূতনাথের দিকে চেয়ে যেন বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। ভূতনাতও অপ্রস্তুত হয়ে বললে—মাথাটা ঘুরে উঠলো কি না—

কিন্তু মনে হলো আর যেন বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারবে না ভূতনাথ।

—এখনো ঘুরছে মাথাটা?

ভূতনাথ বললে—সরবতে কী ছিল?

—থাকবে আবার কী ভালোমানুষবাবু, সবাই খেয়েছে, এই তো আমিও খেলাম!

—তা হলে এমন করছে কেন শরীরটা? ভূতনাথের মনে হলো সে বুঝি এখনি টলে পড়বে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সমস্ত শরীরে যেন একটা দোলানি। ছুটুকবাবুর আসরে সিদ্ধি খেয়ে যেমন হয়েছিল এ তেমন নয়। যেন বিষ খেয়েছে সে। বিষ কখনও খায়নি ভূতনাথ। বিষ খেলে কেমন হয় তাও জানবার কথা নয়। কিন্তু তবু যেন মনে হলো তাকে এরা বিষ খাইয়েছে সত্যিসত্যি। সমস্ত ঘরখানা যেন তার সঙ্গে দুলছে। দেয়াল, দেয়ালের ছবি, হারমোনিয়মের বাক্স। বাঁয়া তবলা জোড়া—

—মাথাট টিপে দেবো? চুনীদাসী ভূতনাথের মাথাটা নিয়ে নিজের কোলের ওপর রাখলো। বললে—একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো তো ভালোমানুষবাবু।

চুনীদাসীর কোলের ওপর শুয়ে কেমন যেন আরাম হলো। কেমন যেন এক অন্য ধরনের স্বস্তি। মাথার তলায় চুনীদাসীর নতুন শাড়িটা কেমন যেন খস খস করছে! চুনীদাসী কি আতর মেখেছে! আতরের গন্ধ বুক ভরে টানতে লাগলো ভূতনাথ। মনে হলো চুনীদাসী তার মাথার চুলের মধ্যে যেন আঙুল দিয়ে টিপে দিচ্ছে। কপালের কাছে হাতটা আসতেই যেমন আরাম লাগে। চুনীদাসীর আঙুলগুলো কী নরম!

চুনীদাসী বললে—একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকি ভালোমানুষবাবু!

ভূতনাথ বললে—তোমার কাপড়টা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—তা যাক, এখন মাথা ধরাটা সারলো একটু? বলে নিজের কাপড় দিয়ে ভূতনাথের মুখের ঘাম মুছিয়ে দিলে চুনীদাসী।

সত্যি যেন আরাম হচ্ছে বেশ। ভূতনাথ বললে—তোমাদের খুব কষ্ট দিলাম।

—কষ্ট! কষ্ট কিসের ভালোমানুষবাবু, আজ এলে গল্প করতে, তোমাকে আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, আর কী কাণ্ড বলো দিকি? তা তোমার কিছু ভাবনা নেই।

ভূতনাথ বললে—বংশী হয়তো খুঁজবে, আজ সকাল সকাল ফিরতে বলেছিল। কাজও ছিল একটা।

—একটু ঘুমোও, ঘুমিয়ে নাও, শরীরটা ভালো হলে তেমায় গাড়ি ডেকে পাঠিয়ে দেবো—কিচ্ছু ভেবো না।

আবার চোখ বুজতে চেষ্টা করলো ভূতনাথ। কিন্তু মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে যায়।

হঠাৎ একবার তন্দ্রা আসে আর মনে হয় ঘরে যেন অনেক লোকের ভিড় জমেছে। পুলিশ ঢুকেছে ঘরে। বললে—একে খুন করেছে কে? আবার যেন মনে হলো বৃন্দাবন ঘরে ঢুকে দাঁত বার করে হি-হি করে হাসছে! চুনীদাসী বলছে—এইবার একে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়, আর দরকার নেই। চুনীদাসীরও যেন অন্য রকম চেহারা। বোতল বার করে গেলাশে মদ ঢালছে। তারপর বললে—ডাক তো কাল্লুকে, তবলা বাজাবে। তন্দ্রার মধ্যে মনে হলো যেন চুনীদাসী শাড়ি খুলে ফেলেছে। চুলটা বেণী করে বেঁধে নিয়েছে। মাথায় দিয়েছে পাতলা জাফরানি ওড়না। আর মখমলের ঘাঘরা পরেছে। বুকে বেঁধেছে কাঁচুলী। তারপর ওধারে কারা তবলা বাজাচ্ছে। গান গাইছে! আর ঘুরে ফিরে নাচছে চুনীদাসী। চুনীদাসীর যেন আর সে-চেহারা নেই। মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অঙ্গভঙ্গী করছে। আসরে মদ উড়ছে, সিগারেটের ধোঁয়া জমেছে। আর ওধারে এক কোণে বসে আছে ছোটকর্তা! বসে বসে রুপোর গড়গড়া থেকে রঙীন রেশমী কাপড়ে মোড়া ফরসি মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে তামাক টানছে। ঘুমের মধ্যে মনে হলো—কখন সব এল এরা? তাকে কি কেউ দেখতে পাচ্ছে না? ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে চোখ মেলতেই সব দৃশ্য ছায়ার মতো যেন মিলিয়ে গেল।

চুনীদাসী ঠিক তেমনি করেই কোলে মাথাটা নিয়ে বসে আছে।

বৃন্দাবনও সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—ওই চোখ চেয়েছেন শালাবাবু।

চুনীদাসীও নিচু হয়ে কাছে মুখ এনে বললে—এখন একটু আরাম হচ্ছে ভালোমানুষবাবু?

ভূতনাথ বললে—ছোটকর্তা এসেছিল না?

—কোথায়! না তো—স্বপ্ন দেখছো তুমি। তুমি ঘুমোও, ঘুমোবার চেষ্টা করো।

বৃন্দাবন হঠাৎ বললে—আচ্ছা শালাবাবু, ছোটকর্তাকে একবার নিয়ে আসতে পারেন না এখানে, একদিন শুধু আসবে—এক বার।

ভূতনাথ অভিভূতের মতো হাঁ করে চেয়ে রইল বৃন্দাবনের দিকে।

বৃন্দাবন আবার বললে—একবার যদি নিয়ে আসতে পারেন শালাবাবু তো আপনার জীবনে খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না আর।

চুনীদাসীও বললে—এই দেখছো তো ভালোমানুষবাবু, এই ঘরবাড়ি, আমার গয়নাগাটি সব তোমার হবে।

বৃন্দাবন বললে—ছোটমা আপনাকে আর কী দিয়েছে শুনি? এত যে করেন তার জন্যে, ভালো করে তো খেতেও দেয় না শুনেছি। কেন ওখানে পড়ে আছেন—ওই যে ছোটমা'র সব সম্পত্তি, ও-সব নেবে বংশী, মদ তো ধরিয়েছে, এখন মদের মুখে বেহুঁশ করে সিন্দুক খুলে সব নেবে আজ্ঞে।

চুনীদাসী বললে—আর এক কাজ করতে পারো না, ছোটবৌঠানের সঙ্গে তো তোমার খুব ভাব—একদিন একটা কিছু খাইয়ে শেষ করে দেবে একেবারে—জন্মের মতো সাধ মিটে যাবে।

বৃন্দাবন বললে—তার দরকার নেই, আপনি একবার ছোটকর্তাকে আনবেন এখানে, আমি শুধু এক গেলাস সরবৎ খাওয়াবো তাকে। এবার নতুন একরকম সরবৎ—সে খেলে আর বাড়ি ফিরতে মন চাইবে না।

এত সব কথা। কথা আর প্রশ্ন। ভূতনাথের মাথাটা আবার ঘুরতে লাগলো। চোখ বুজতেই আবার সেই-সব দৃশ্য। চুনীদাসী এবার গায়ের ওড়না, ঘাগরা, কাঁচুলী সব খুলে ফেলেছে। পায়ে শুধু ঘুঙুর। ঘুরে ঘুরে উদ্দাম হয়ে নাচছে। ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার বেণীটা উঁচু হয়ে হয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ছোটকর্তা গড়গড়া থেকে মুখ নামিয়ে আর একবার গেলাসে চুমুক দিলে। এমন সময় যেন হুড়মুড় করে পুলিশের দল ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—ভূতনাথবাবুকে খুন করেছে কে? তারপর আবার যেন মনে হলো ছোটকর্তার হাতে হাতকড়া বাঁধা, সকলকে পুলিশে ধরেছে! হঠাৎ আবার চোখ খুললো ভূতনাথ। চুনীদাসী তখনও তার মাথাটা কোলে নিয়ে তেমনি বসে আছে।

আর বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে আছে মুখ গম্ভীর করে, আর তার পাশে রয়েছে মধুসূদন। বড়বাড়ির তোষাখানার সর্দার মধুসূদন। লোচন, শ্যামসুন্দর আর বেণী।

ভূতনাথ কেমন অবাক হয়ে গেল। ওরা এখানে কেন?

মধুসূদন বললে—যদি পারে কেউ তো শালাবাবুই পারে, শালাবাবুর সঙ্গে ছোটমা'র খুব মেলামেশা। এই তো ছুটুকবাবুর বিয়ের সময় ছোটমা'ই শালাবাবুকে কাপড়-জামা-জুতো দিয়েছে, অথচ দেখো না, আমরা এতদিন কাজ করেছি, আমাদের বেলায় শুধু একখানা করে ধুতি আর গামছা।

লোচন বললে—আমি বলার মধ্যে বলেছিলাম, দৈনিক একটা করে আধলা—আর রোজ বিনি পয়সায় তামাক খেয়ে যাবে—যেমন সবাই খায়—বড়লোকের পয়সা—কে হিসেব রাখে—তাই-ই রাজী হলেন না শালাবাবু, ছোটমা'র কাছে শুনেছি পাঁচশ' টাকা জমা রেখেছে, বংশী নিজে বলেছে আমাকে।

বৃন্দাবন বললে—আচ্ছা, মধুসূদনকাকা, ছোটমা'কে মদ ধরালে কে?

মধুসূদন বললে—ওই বংশী, বংশী আর ওর বোন চিন্তা—সর্বনাশ তো ওরা দু'জনেই করেছে।

লোচন বললে—সব্বনাশের আর বাকি আছে কি?

বৃন্দাবন বললে—তা গাড়ি কেন বেচে দিলে মেজবাবু?

বেণী বললে—ও-গাড়ি মেজবাবুর পছন্দ হলোনি যে, বিলেত থেকে নতুন গাড়ি আসছে যে বাবুর জন্যে।

মধুসূদন ধমক দেয়—তুই থাম, জানিস তো সব, এবার সুখচরের প্রেজারা বসিয়ে দিয়েছে একেবারে। ছুটুকবাবুর বিয়েতে কেউ নজর দিতে এল না, কত গিয়ে বললাম—ধন্না দিলাম দোরে দোরে, বললে—বিলের জল শুকিয়েছে আজ দশ সন, গেল বছরে বাঘ এসেছিল বাদায়, ধনে পেরাণে মরছি আমরা খেয়াল নেই তোমাদের, বলো গিয়ে নায়েববাবুকে পেয়াদার পো, আমরা বাঁচলি জমিদারের নাম।

মেজবাবু সব শুনে বললে—এবার আমি নিজে যাবো, চাবুক নিয়ে যাবো।

বৃন্দাবন বললে—যাবে নাকি মেজবাবু?

—মেজবাবু আর যেয়েছে! সরকারমশাই বললে—ও মেজবাবু গেলেও যা হবে, না গেলেও তাই হবে।

বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করে—কী হবে?

—কলা হবে—বলে বুড়ো আঙুল উঁচু করে দেখায়। বলে—আমার কি, আমি গিয়ে উঠবো নিজের ঘরে, সুখ-ভাত কপালে না থাকে দুখ-ভাতই খাবো। কলকাতার আর সে-সুখ নেই বিন্দাবন, আমার জ্যাঠা আসতো এখানে, রথের সময় ফিরে গিয়েছে চার কুড়ি পাঁচ কুড়ি টাকা নিয়ে। যে বার সেপাইরা ক্ষেপে উঠলো কলকাতায় বারাকপুরে, সেবার কত সস্তায় জমি-জমা কিনলে, পুকুর কাটলে, তুলসীমঞ্চ করে দিলে আমাদের গাঁয়ে, সাত দিন যজ্ঞি হলো বাড়িতে।

লোচন বললে—কেন, বড়বাড়িতেই কি কম সুখ ছিল নাকি—বড়বাবু তখন বেঁচে, সকালবেলা কুস্তিটুস্তি করে এসে সবে বসেছে নাচঘরে, আমি বেশ করে তামাক সেজে দিয়েছি গড়গড়ায়, মেজাজ ভালো ছিলো—সন্ধ্যেবেলা বখশিস হয়ে গেল এক টাকা—এখন শুধু শুখো মাইনে।

বৃন্দাবন হতাশ হয়ে যায়। বলে—চুনীদাসীকে তুই বুঝিয়ে বল্ তো—ও যে অত ছোটবাবু ছোটবাবু করে—ছোটবাবু ছাড়া কি আর বাবু নেই কলকাতা শহরে? এই তো ঠন্‌ঠনের ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্ত রয়েছে—আসবে বলেছে আমাকে—কিন্তু ও কেবল বলে—ছোটবাবু।

মধুসূদন বলে—ছোটবাবুতে আর শাঁস নেই রে, যেটুকু আছে বংশীই সব খেয়ে নেবে—দেখিস।

ভূতনাথ আবার চোখ বুজলো। যেন সব গোলমাল হয়ে যায় আবার। মনে হয় যেন সে স্বপ্ন দেখছে। যেন সে শুয়ে আছে ছোটবৌঠানের ঘরে। ছোটবৌঠানের তখন বেসামাল অবস্থা। টানছে কেবল ভূতনাথকে। বলে—ছোটকর্তা যদি জানবাজারে যায়—আমিও থাকবো না বাড়িতে। কোথায় যাবি বল্ তো ভূতনাথ, বরানগরের বাগানবাড়িতে যাবি? খড়দা'র রামলীলার মেলায়? গঙ্গায়

বেড়াবি পানসি চড়ে? তারপর হঠাৎ যেন খানিকটা আতর ঢেলে দিলে ভূতনাথের গায়ে। তারপর চিরুণী দিয়ে চুলটা আঁচড়ে দিলে! তারপর বোতল থেকে খানিকটা ঢেলে গেলাসটা বাড়িয়ে দিলে ভূতনাথের দিকে। বললে—খা, একটু চেখে দেখ্।

ভূতনাথ বললে—খাবো না আমি, বমি আসবে।

—কিচ্ছু হবে না, ওরকম আমারও হতো, একটু একটু অভ্যেস কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু কার ওপর রাগ করে নিজের এমন সব্বনাশ করছো বৌঠান?

—দূর, রাগ করতে যাবো কেন, দেখবি এ খেলে আর রাগ দুঃখ কিচ্ছু থাকে না, মনে হবে তোর সব আছে, মনে হবে তোর ছেলে আছে, সংসার আছে, স্বামী আছে—

হঠাৎ বাইরে যেন কার জুতোর মশ-মশ আওয়াজ হলো। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে! বৃন্দাবন এক মুহূর্তে বাইরে গিয়েই আবার দৌড়ে ফিরে এসেছে ঘরে।

চুনীদাসী জিজ্ঞেস করলে—কে? কে আসছে?

—ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্ত, পালাও মধুসূদনখুড়ো, যা লোচন, তোরা যা এ-ঘর থেকে—কালকে দত্তমশাইকে আসতে বলেছিলাম কিনা।

কথাটা শুনেই চুনীদাসী ভূতনাথের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দিলে। তারপর দু'হাত দিয়ে খোঁপাটা ঠিক করে নিতে নিতে বললে—ভালোমানুষকে ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যা তো বিন্দাবন!

নটে দত্তকে ভূতনাথের এই প্রথম দেখা। বেশ লম্বা চেহারা। ছোটবাবুর মতো অমন গায়ের রঙ নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো। বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চাইলে একবার ভূতনাথের দিকে। তারপর যেন বৃন্দাবনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—এ কে?

বৃন্দাবন কী বললে বোঝা গেল না।

চুনীদাসী যেন বিরক্ত হয়ে বললে—বিন্দাবন, একে সরিয়ে নিয়ে যা না তাড়াতাড়ি।

বৃন্দাবনকে আর সবাতে হলো না! ভূতনাথ নিজেই উঠলো। সমস্ত শরীর যেন টলছে। ওঠবার ক্ষমতাও যেন তখন আর নেই তার। তবুও উঠতে হয়। মধুসূদন, লোচন ওরা সব কখন এক ফাঁকে সরে পড়েছে। ভূতনাথ দরজার কাছে এল। বৃন্দাবন ধরতে এসেছিল। বললে—একা বাড়ি যেতে পারবেন শালাবাবু?

—তোমার ভয় নেই বৃন্দাবন, আমি ঠিক যেতে পারবো। কথাটা বললে বটে, কিন্তু যেন শক্তি নেই সত্যি সত্যি তার শরীরে। আস্তে আস্তে সিঁড়িটা বেয়ে নীচে নেমে এসেও যেন ঠিক হদিস পাওয়া গেল না কোন্ দিকে রাস্তা। পেছনে যেন কারা হো হো করে হেসে উঠলো। বিদ্রূপের হাসি। ভূতনাথের সেদিন মনে হয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করে তাদের হাসি যেন অকারণ। সে তো চুনীদাসীর কাছে নিজের ইচ্ছায় আসেনি। তবে সে নেশা করেছে বলে কি হেসেছে? অথচ নেশা তো সে করতে চায়নি। কিন্তু তাকে নেশা করিয়েই বা তাদের লাভ কী! তাকে দিয়ে তাদের কী উপকার হবে! ছোটকর্তাকে এখানে পাঠাবার মালিক নাকি সে! সে বললেই বা ছোটকর্তা আসতে যাবে কেন? আর তা ছাড়া ছোটবৌঠানই বা এ সব শুনলে কী বলবে!

রাস্তায় নেমে কোন্‌দিকে ভূতনাথ যাবে তা যেন হঠাৎ ঠিক করতে পারলে না। কলকাতার রাস্তায় তখন বেশ অন্ধকার। রাত হয়েছে বেশ। কয়েকটা দোকানে তখনও টিমটিম করে তেলের আলো জ্বলছে। বউবাজারের বড়বাড়ি লক্ষ্য করে চলতে চলতে ভূতনাথের একবার সন্দেহ হলো—ঠিক পথেই চলেছে তো সে! রাত্তির বেলা কলকাতার যেন অন্য এক রূপ। যেন আদিম কলকাতার এ এক অনাবৃত চেহারা। এই সুতানুটিতেই বুঝি ছিল পর্তুগীজদের লুকিয়ে থাকবার জায়গা। সপ্তগ্রামের বন্দরে জাহাজ লুট করে মেয়েদের এনে লুকিয়ে রাখতো এখানে। এই কলকাতার জঙ্গলে। ভূতনাথের মনে হলো এখন যেন আবার জঙ্গলের মতন বীভৎস মনে হচ্ছে এই কলকাতাকে। আর একটু এগোলেই যেন রতন সরকারের বাড়ি। ধোপা রতন সরকার।

সাহেবদের সঙ্গে মেয়েমানুষের দালালি করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ যেন বড় ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। বইতে পড়া সেই কলকাতার সঙ্গে যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে। সেই ডিহি কলকাতার পশ্চিমে ভাগীরথী। উত্তরে সূতানুটি, পূর্বে যতদূর যাও কেবল নোনা জমি। আর দক্ষিণ বরাবর গোবিন্দপুর। কলকাতার চারদিকে কাঠের বেড়া। ফ্যান্সি লেন-এর মোড় থেকে কাঠের বেড়া আরম্ভ। সেখান থেকে লারকিন্স লেন-এর ভেতর দিয়ে মিশেছে একেবারি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রীটে। তারপর বারোটা লেন, ম্যাঙ্গো লেন, মিশন রো। সেখান থেকে বরাবর লালবাজার, রাধাবাজার, এজরা স্ট্রীট, আমড়াতলা স্ট্রীট, আর্মানিয়ান স্ট্রীট, হামাম গলি, মুরগীহাটা, দর্মাহাটা, খেংরাপটি, বনফিল্ডস লেন, রাজা উডমণ্ড স্ট্রীট দিয়ে এসে একেবারে গঙ্গার ধারে মিশে ছিল। এই কয়লাঘাটা স্ট্রীট আর ফেয়ার্লি প্লেস-এর মধ্যে ছিল পুরনো কেল্লা। আর তার পেছনে ছিল মালগুদাম ঘর আর ছোট ডক। চার্চ লেন আর হেস্টিংস স্ট্রীট-এর মোড়ে মাটির বুরুজের ওপর কামান সাজানো থাকতো।

চলতে চলতে ভূতনাথ যেন আর এক যুগে এসে পৌঁছে গিয়েছে। নেশার ঘোরে যেন মনে হচ্ছে যা কিছু দেখছে ভূতনাথ সবই অচেনা। এ-সব নতুন জায়গা। কোথায় জানবাজার, কোথায় কসাইটোলা, কোথায় নাপতেহাটা, কলুটোলা, কোথায় কাঁসারিপটি, হোগলকুড়িয়া, পার্শিবাগান, উল্টোডাঙা, নারকেলডাঙা—ভূতনাথ যেন সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর্মানি পর্তুগীজ আর ওলন্দাজেরা যেন আবার এসে পড়েছে কলকাতা শহরে। মেটকাফ হল-এর কাছে যেন তাঁতীরা এসে আস্তানা করেছে আবার। ওলন্দাজেরা এসে উঠেছে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট-এর কাছে। ক্যানিং স্ট্রীট-এর ধারে এসে উঠেছে পর্তুগীজ আর আর্মানিরা। আর ওলন্দাজেরা খিদিরপুর থেকে শুরু করে সাঁকরেলের খাল পর্যন্ত বাণিজ্য জুড়ে দিয়েছে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে। আলুগুদামের ওপরেই যেন পর্তুগীজদের তুলোর গুদাম উঠেছে আবার।

চুনীদাসীর জানবাজারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত ভূতনাথের যেন দিক ভুল হয়ে গিয়েছে। এ কোথায় সে এল! এ তো তার চেনা কলকাতা নয়! কোথায় সেই মাধববাবুর বাজার। সেই বনমালী সরকার লেন! ভূতনাথের মনে হলো—সারা রাত যেন সে এমনি করেই সমস্ত কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানবাজারের ফিরিঙ্গী পাড়ায় তখনও কিছু কিছু লোক জেগে আছে। কিন্তু ওদিকে চৌরঙ্গীর রাস্তায় সব যেন নিঝুম। রাস্তার ফুটপাথের ওপর সকালের কুলী-কাবারিরা বেপরোয়া শুয়ে আছে। পথ বদলে আবার ভূতনাথ ফিরলো উত্তর দিকে। মোড়ের মসজিদটার সামনে তখন একটা ষাঁড় বসে বসে জাবর কাটছে. কয়েকজন কাফ্রি যেন জাহাজ থেকে নেমে তখনও কলকাতা দেখা শেষ করে উঠতে পারেনি। টলতে টলতে পাশাপাশি ছড়ি দোলাতে দোলাতে চলেছে। হল্লা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারপর একেবারে সোজা রাস্তা ধরে বৌবাজার। কিন্তু মেছুয়াবাজারের কাছে এসে যেন খেয়াল হলো। বনমালী সরকার লেন তো সে ছেড়ে এসেছে অনেক দূরে। এধারে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট আর ওধারে বুঝি চিৎপুর রোড। মাঝখানের গলিতে কয়েকটা খোলার বাড়ি। এক একটা দলে দু'তিন জন কাফ্রি যেন বসে বসে গল্প করছে চায়ের দোকানের সামনে। এ-পাড়ায় মদের দোকান যেন একটু বেশি। এখানে যেন এখনও বেশি রাত হয়নি। সন্ধ্যের মতো আবহাওয়া। ভূতনাথকে দেখেই যেন একদল কাফ্রি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। বড় ভয় হলো ভূতনাথের। এ-পাড়ায় এমন সময় তার আসা উচিত হয়নি। দিনের বেলা এদের এখানে দেখেছে ভূতনাথ। জাহাজ থেকে নেমে এরা দু'তিনজন লোক মিলে এক-একটা খোলার বাড়ি ভাড়া করে থাকে। তারপর গুণ্ডামি করে। অনেকবার লোক খুন হয়েছে এ-পাড়াতে। আগে 'সোমপ্রকাশে' প্রায়ই খুনোখুনির খবর থাকতো। এখানকার গলিগুলো সর্পিল। এক-একটা গলি কোথায় গিয়ে মিশবে কিছু বলা যায় না। এইরকম জায়গাতেই বুঝি ব্রজরাখাল একদিন গুণ্ডার হাতে পড়েছিল। ব্রজরাখালের ভয় ছিল না। গুণ্ডার দল সামনে আসতেই রুখে দাঁড়িয়েছিল ব্রজরাখাল। তারপর সে কী অলৌকিক সাহসের সঙ্গে সেদিন ব্রজরাখাল এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিল—তা ভূতনাথ শুনেছে।

ব্রজরাখাল বলে—গুণ্ডারা হলো ভীরুর জাত—প্রথমটা রুখে দাঁড়ালে আর কিছু ভয় নেই।

কিন্তু তেমন সাহস ভূতনাথের নেই। এক জায়গায় জন পঞ্চাশ কাফ্রি ভিড় করে বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। কালো কালো ভূতের মতন চেহারা সব। কোঁকড়ানো চুল। একজনের হাতে লাঠি। ভূতনাথ নিঃশব্দে সরে আসছে। হঠাৎ মনে হলো যেন তার সামনে আগে আগে একটা ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। লাল বাতি দুটো চেনা যায় অস্পষ্ট। এত রাত্রে এ-পাড়া দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি যায় কেন! ব্রজরাখাল এ-সব রাস্তা দিয়ে চলতেই বারণ করেছিল ভূতনাথকে! মিছিমিছি বিপদ ডেকে আনা। ঘোড়ার গাড়িটা দলের সামনে আসতেই কেমন যেন একটা মৃদু আলোড়ন শুরু হলো কাফ্রিদের মধ্যে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন উঠে গিয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়ালো।

ভূতনাথ থেমে গিয়েছে। লুঠপাট করবে নাকি ওরা? চোখের সামনেই খুনখারাপি হবে নাকি! খানিকক্ষণ দাঁড়ালো ভূতনাথ চুপ করে। তাকে কি কেউ দেখতে পায়নি? সারা মেছোবাজারের সব জায়গায় যেন এখন ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। ওদেরই আধিপত্য এখানে। এখানে এখন যদি তাকে কেউ খুন করেও ফেলে যায় তো কেউ ধরবার নেই। পুলিশের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই কোথাও। শুধু নিবিড় অন্ধকার আর সেই পটভূমিকায় ওই ক'টা কাফ্রি গুলজার করছে সমস্ত পাড়াটা। সত্যি-সত্যি ভূতনাথের মনে হলো এ কলকাতা শহর নয়, এ যেন আদিম জঙ্গল। সুন্দরবনের শেষ প্রান্ত! সমুদ্র থেকে চর উঠেছে। হোগলা বন আর গরান কাঠের জঙ্গল চারদিকে। পর্তুগীজরা বুঝি সাতগাঁ থেকে জাহাজ লুঠ করে একপাল মেয়েমানুষ ধরে এনেছে এই জঙ্গলে। চড়া দামে বেচবে ইংরেজদের কাছে। ইংরেজরা তো বউ আনে না এদেশে। মোগল নবাব বাদশারা ইংরেজ মেয়ে পেলে ভালো দাম দেয়। একটা সাদা চামড়ার মেয়ে দিলে সমস্ত হিন্দুস্থানটার পত্তনি লিখে দিতে পারে। তখন এমনি দর ওদের। কিন্তু তবু মেয়েমানুষের অভাব মিটিয়েছে ওলন্দাজরা। মেয়েরা ইংরেজী ভাষা জানে না। কথা বলতে, ভাব করতে অসুবিধে হয়। কিন্তু ধোপা রতন সরকার আছে। দো'ভাষী। এই দালালি করে করে ইংরেজীটা বলতে কইতে পারে। মেয়েমানুষ বেচে বেচে মোটা আয় তার।

রাত্রে যেন কলকাতার আদিম রূপ বেরিয়ে পড়ে শহরে। কত খুন হয় হ্যালিডে স্ট্রীট-এ, কত লুঠপাট জখম হয় খিদিরপুরের পুলের ওপর আর খুনখারাপি হয় মেছোবাজারে, দিনের কলকাতা তা জানতে পারে না। ল্যান্ডো গাড়ি চলেছে হয়তো টগবগ করতে করতে, হঠাৎ গলির ভেতর কোথা থেকে দৌড়ে আসে গুণ্ডারা। গাড়িতে উঠে মলমলের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে ঘড়ি, ঘড়ির চেন ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। সাঁইবাবার সাঞ্চিতে কত বাবু নিঃসন্দেহে ঢুকেছে চা খেতে, তারপর জুয়া খেলার প্রলোভনে পড়ে ধনপ্রাণ হারিয়ে চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ টেরও পায়নি। বেচারাম চাটুজ্জেমশাই আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন। থাকতেন বেহালায়। সমাজের সভার শেষে ঘোড়ার গাড়িতে ফিরছিলেন। খিদিরপুরের পুলের ওপর বলা নেই কওয়া নেই তাড়া করলো কাফ্রিরা। কিন্তু বেচারাম চাটুজ্জেমশাই মোটা লাঠি নিয়ে যাওয়া আসা করতেন। সেদিন একাই আটকালেন কাফ্রি গুণ্ডাদের ওই এক লাঠির জোরে। তারপর ছুটুকবাবুর আসরে আর-একদিন গান হচ্ছিলো। ভূতনাথ তবলা বাজাচ্ছিলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বিশ্বম্ভর হাজির।

—এত দেরি কেন রে বিশে? প্রশ্ন করলে সবাই। বিশ্বম্ভরের গজল গানের জন্যে আসর জমছিল না এতক্ষণ।

বিশ্বম্ভর তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—কম্বুলিটোলায় এক কাণ্ড হয়ে গেল। গুণ্ডারা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে লোহার সিন্ধুক নিয়ে উধাও!

ব্রজরাখাল যখন রাত্তির করে ফিরতো, কতদিন কত বিপদের কথা এসে বলেছে। দিনের বেলায় ততটা নয় কিন্তু রাত্রে এ-কলকাতা নরক হয়ে ওঠে। রামবাগনে যে সাহেব-বীণার ঘরে বৈদূর্যমণি যেতেন তাকেই কতবার থানায় যেতে হয়েছে খুনের দায়ে। ওই পাড়াটাতেই খুন-জখম হতো বেশি।

ভূতনাথ তখনও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। নিঝুম রাস্তার ওপর একটা ঘোড়ার গাড়ি। আর কাফ্রিরা তাকেই ঘেরাও করেছে। গাড়ির ভেতরে যদি কেউ থাকে! তা হলে চোখের সামনে

হয়তো খুনখারাপি হয়ে যাবে! হঠাৎ যেন একটা গোলমাল শুরু হলো। গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দৌড়ে বুঝি পালালো। তারপর শুরু হলো আক্রমণ। গাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু সামান্য আঘাতেই খুলে গেল সেটা। তারপর যে কাণ্ড হলো...

ভূতনাথের মাথায় যেন তখন নেশা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। চোখে অন্ধকার লাগলো সব। হঠাৎ যেন সব ঝাপসা হয়ে এল। আবার সব পরিষ্কার। মনে হলো কোথাও যেন কেউ নেই। সে যেন স্বপ্ন দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ যা দেখছিল সে, সব তার কল্পনা। আবার মনে হলো—না! জাহাজ এসেছে কলকাতায়। ঝড়-জল-বিদুৎ। মুন্সী নবকৃষ্ণ ছোট ছেলেটি তখন। দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার ধারে চাকরির চেষ্টায়। কোম্পানীর সাহেবরা নামলে একটা চাকরির তদ্বির করতে হবে। কখনও মনে হলো—কলকাতায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সিরাজউদ্দৌলা। পুড়ে ছারখার হচ্ছে ইংরেজদের কেল্লা। চার্চ লেন-এর মোড়ের কামানটা থেমে গিয়েছে। শুধু ধোঁয়া উঠছে অল্প-অল্প সামনের নল দিয়ে। সিরাজউদ্দৌলা ভারি খুশি। শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে আর হাসছে। আলীবর্দী খাঁ সত্যিই বলেছিল, ইংরেজদের না তাড়ালে তোমার রাজ্যে শান্তি আসবে না। সেই কলকাতার নাম বদলে রাখা হলো আলীনগর। চোখের সামনে আকাশের কালো মেঘের মতো সব দৃশ্য যেন ভেসে যায়। তারপর খানিকক্ষণের জন্যে মনে হয় সব ঠিক আছে। বড়বাড়ির চোরকুঠুরিতে যেন সে শুয়ে আছে। দেয়ালের গায়ে উড়ন্ত পরীরা যেন সজীব হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে মাঝ রাত্রে যেন কে দরজায় টোকা মারলো। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর জোরে, আরো জোরে, কিন্তু দরজা খুলতেই একটা দমকা বাতাস এসে সমস্ত ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল।

জবাদের ঘোড়ার গাড়ির পেছন চলতে চলতে সেদিনকার সব ঘটনা মনে পড়তে লাগলো ভূতনাথের। সত্যি সেদিন খুব নেশা হয়েছিল। একবার চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়েছিল ভূতনাথের। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিলেও যেন গলা দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বেরোবে না। কিন্তু ভালো করে চোখ মেলে চাইতেই যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ। সামনে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে একটা দশাসই মানুষ! মানুষটার গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠতে হয়েছে। মরা মানুষ! এখানে এমন করে মরলো কি করে লোকটা! পালাতে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে থেমে গেলে ভূতনাথ। মরা মানুষটা যেন হঠাৎ তাকে চোখ দিয়ে ডাকছে।

—এদিকে আয়, আয় এদিকে, ভয় নেই, আমি বদরিকাবাবু।

—বদরিকাবাবু! এতক্ষণে চেনা গেল। সেই তুলোর জামা গায়ে। মোটা-সোটা দীর্ঘ চেহারা। মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আবার হাসছেও সঙ্গে সঙ্গে।

বদরিকাবাবু বললে—আমি মরে গিয়েছি।

—কী করে মরলেন?

—ঘড়িতে দম দিতে গিয়ে পড়ে গেলাম উল্টে—ঘড়িও বন্ধ হয়ে গেল। আমার ট্যাঁক-ঘড়িটাও ভেঙে গিয়েছে, আমারও দম আটকে গিয়েছে।

ভূতনাথ যেন জিজ্ঞেস করলে—মারা গিয়েছেন তো কথা কইছেন কী করে?

—মারা গিয়ে যে ইতিহাস হয়ে গিয়েছি, আমার আর কোনো দুঃখ নেই। ঘড়ি আর চলবে না। বড়বাড়ির ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মোটরগাড়ি এসেছিল সেটা চলে গিয়েছে। এখন বাবুরা কয়লার খনি কিনছে। জমিদারি বেচে দিলে—এবার কলির পাঁচ পো, জানিস তো কলি কে? ক্রোধের ঔরসে হিংসের গর্ভে কলির জন্ম। বলে হো হো করে হাসতে লাগলো বদরিকাবাবু। দেখতে দেখতে বদরিকাবাবুর চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো। আগুনের ফুলকির মতো। সাদা আর সবুজ আলো সে চোখে। আর তারপর হঠাৎ রঙ বদলে গেল সে চোখের। লাল হয়ে এল দৃষ্টি। টকটকে লাল।

শেযে যেন দুটো স্থির বিন্দুর মতো। লাল বিন্দু দুটো আস্তে আস্তে যেন দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ।

অন্ধকার পরিবেশ। তার মধ্যে সেই লাল দুটি বিন্দু দেখে প্রথমে ভয় হলো ভূতনাথের মনে। তারপর সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মনে হলো কারা যেন কথা বলছে। জবার গলা। সুবিনয়বাবুর গলা। সুপবিত্রর গলা। একি, বার-শিমলে এসে গিয়েছে! এতক্ষণে খেয়াল হলো ভূতনাথের যে, সে জবাদের ঘোড়ার গাড়ির পেছন-পেছন বার-শিমলের দিকে চলতে চলতে ক'দিন আগের ঘটনাগুলো ভেবেছে শুধু। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করেছে।

জবার গলা কানে এল—হাঁ করে দেখছেন কি ভূতনাথবাবু—জিনিসপত্তোর নামাতে হবে না?

সুবিনয়বাবুও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলতে হবে।

ভূতনাথও এবার এগিয়ে গিয়ে বললে—আমি ধরছি, চলুন।

সুবিনয়বাবু বিছানায় বসে বললেন—এ-বাড়ি করেছিলাম প্রথম ওকালতির আয় থেকে। অনেকদিন পরে আবার এখানে আসছি, অথচ মনে হয় যেন সব সেদিনের কথা। যেবার কেশববাবু 'সাধন-কানন' খুললেন, সেইবার এই বাড়ি ছাড়ি আমি। কেশববাবুর মতো আমরাও ক'জন মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে সংসার পরিচালনা করতাম, কয়েক বছর ওঁর দেখাদেখি নিজের হাতে রান্না, বাসন মাজা করেছি, মাটির পাত্রে জল খেয়েছি। শেষকালে 'ভারত-সভার' প্রতিষ্ঠা হলো—সে-সভা হওয়ারও একটা ইতিহাস আছে ভূতনাথবাবু। আনন্দমোহন বসু বললেন—আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কোনো সভা-সমিতি নেই, তা ঠিক করলাম তাই-ই হবে—আমাদের আপিস হলো তিরেনব্বুই নম্বর হ্যারিসন রোডে—এলবার্ট হল্-এ এক মিটিংও হয়ে গেল—আর আমাদের দেখাদেখি শিশিরবাবু, ওই অমৃতবাজারের শিশিরবাবুও করলেন 'ইণ্ডিয়া লীগ'।

হঠাৎ জবা ঘরে ঢুকলো—বাবা, আপনি আবার গল্প করছেন?

—না মা, পুরনো কথা সব মনে পড়ছিল কিনা, তাই—তা সুপবিত্র কোথায়?

জবা বললে—সুপবিত্র তো সারাদিন খাটছে, তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম আমি—কিন্তু ভূতনাথবাবুকে ছেড়ে দিতে হবে বাবা, ওনার এখনও অনেক কাজ বাকি—নতুন বাড়িতে এসে—

—তা যাও না মা, ওকে নিয়ে যাও। পরে গল্প করবো—তোমার কাজটাই তো আগে মা!

অনেক দিনের পুরনো বাড়ি। নতুন করে এখানে বাস করবেন বলে আবার সব গোছানো হয়েছে। কিন্তু 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসের সে বাড়ির সঙ্গে যেন এর তুলনা হয় না। মধ্যেখানের একটা ঘর উপাসনার জন্যে রাখা হয়েছে। মাঝখানে শুধু একটা বেদী। কাঠের চৌকির ওপর আর তার চারপাশে শতরঞ্চি পাতা। দেয়ালে জবার মায়ের আর বাবার ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হলো। আর তার ওপরে রাজা-রাণীর ছবি। জবার মায়ের কার্পেটের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো লেখাটাও—'গড সেভ দি কিং'। ভাঁড়ার ঘরটাই জবার নিজস্ব। রামহরি ভট্টাচার্যের আমলের কিছু কিছু পেতলের বাসন—ঘড়া, কলসী, থালা। বাড়ির লাগোয়া রান্নাঘর। এক-একটা জিনিস নিজে বয়ে নিয়ে এসে সাজিয়ে দিলে ভূতনাথ। এই বাড়িতে বিয়ের পর জবার আর সুপবিত্রর সংসার পাততে হবে। সুবিনয়বাবুর অবর্তমানে সুপবিত্র এইখানে এসেই উঠবে। কাজ শেষ করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেল ভূতনাথের।

জবা বললে—অনেক রাত করে দিলাম আপনার—একলা যেতে পারবেন তো?

ভূতনাথ বললে—যাবার আগে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো জবা?

—বলুন।

—তুমি বিশ্বাস করো, ননীলালকে আমি পাঠাইনি, আমি শুধু বলেছিলাম ওকে সঙ্গে করে একদিন নিয়ে আসবো।

—আমি জানি, কিন্তু টাকার কথাটা ও জানলো কি করে?

—সেটা আমি বলেছি, ওর ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে অনেক সুদ পাওয়া যাবে, তাই বলেছিলাম—আর আমাকে ও চাকরিও করে দেবে বলেছে। সব জায়গায় দেখেছি ওর খুব খাতির, বড়বাড়ির বাবুরা পর্যন্ত, পাথুরেঘাটার হাবুল দত্ত, ছুটুকবাবুর শ্বশুর তিনিও তো ওর সঙ্গে ব্যবসা

করেন, গাড়ি কিনেছে, এই বয়েসেই জুট মিলের কত শেয়ার কিনেছে, কয়লার খনি করেছে, সায়েবরা পর্যন্ত ওকে টাকা দেয় বিশ্বাস করে, ওকে যদি তারা খারাপ লোকই জানতো তো এমন হয় কী করে! কলকাতায় ওর কী প্রভাব-প্রতিপত্তি জানো তুমি?

—সব জানি ভূতনাথবাবু, সব জানি, আপনাকে আর ননীলালকে চিনিয়ে দিতে হবে না।

—তা হলে আমার অপরাধটা পেলে কোথায়?

জবা বললে—ওকে যদি আর কখনও এ-বাড়িতে আনেন তো এ-বাড়িতে আপনারও প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। ওকে যে সেদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিইনি, সে শুধু আপনার জন্যে। আমি যখন কলকাতায় প্রথম এলাম, আমাকে পড়াতো মেমসাহেব, ছিলাম বলরামপুরে গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরে, হলাম একেবারে রাতারাতি মেমসাহেব, কিন্তু আমার সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার সব গোড়াপত্তন যে সেখানেই হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া বাবা যে আমাকে শিখিয়েছেন কাকে বলে মানুষ হওয়া, তাই আমি ননীলালের কথায় ভুলিনি।

—কিন্তু এখন তো দেখছি টাকারই সম্মান দেয় লোকে—কত হাজার টাকা ও চাঁদা দিয়েছে জানো চারদিকে?

জবা হাসলো। বললে—আপনার রাত হচ্ছে, আপনি বাড়ি যান। একথা বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ হবে না—মাঝে-মাঝে এসে দেখা করে যাবেন। নতুন বাড়িতে, নতুন পাড়ায় এসেছি—সামনে সুপবিত্রর পরীক্ষা, ও হয়তো সব সময় আসতেও পারবে না।

ভূতনাথ তখনও দাঁড়িয়ে রইল। শুধু বললে—আমাকে আসতে বলা মানে কিন্তু—কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো।

—আসবেন, যখন ইচ্ছে হবে, চলে আসবেন, বাবার স্বাস্থ্য খারাপ, আর তা ছাড়া বিয়ের সব কাজের ভার তো আপনাকেই নিতে হবে, সুপবিত্রও একলা সব পারবে না, আর আমিও না—হয়তো এমনি করে কষ্ট দেবো, খাটিয়ে নেবো রোজ।

—এমন খাটুনি খাটতে আমার কষ্ট নেই জবা।

জবা হাসলো। বললে—শেষে হয়তো একদিন আর দেখাই করবেন না ভয়ে। তারপর যখন একদিন আপনারও সংসার হবে, বিয়ে হবে তখন মনেও পড়বে না আর।

ভূতনাথ কী ভাবলো। তারপর বললে—আমার তো ওই দোষ, ভুলতে পারি না কাউকে—ভুলতে পারলে তো বেঁচে যেতাম। যারা আমাকে ভুলে গিয়েছে তাদেরও মন থেকে দূর করতে পারি না।

—কিন্তু মনে রাখবেন, মনে রাখার দায়িত্বটা যেখানে একজনেরই, সেখানেই সম্পর্কটা চিরস্থায়ী হয়।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু সে দায়িত্বটা দু'জনের হলে কত চমৎকার হতো।

—তেমন ভাগ্য সংসারে ক'জনের হয়?

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমিও বুঝি সেই হতভাগ্যদের মধ্যে একজন?

জবা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে—আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না। কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে। আপনার বাড়ি যেতে অসুবিধে হবে না তো?

ভূতনাথ এবার উঠলো। বললে—এবার আমি খুশি মনে বাড়ি যাবো জবা, কারণ আমার প্রশ্নের জবাব আমি পেয়ে গিয়েছি।

—ছাই জবাব পেয়েছেন—বলে জবা হাসতে লাগলো।

ভূতনাথ পেছন ফিরে দাঁড়ালো আবার। বললে—তবে কি ভুল হলো আমার?

জবা বললে—না, দেখছি আপনার বাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই মোটে।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু না শুনে যে যেতে পারছি না।

—আপনি অদ্ভুত মানুষ তো, সারাদিন এত খাটালুম, তবু আপনার ঘুম পায় না—দেখুন তো, এতক্ষণ বোধ হয় সুপবিত্র খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

—কিন্তু আমি তো অত ভাগ্যবান নই।

—যান, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করুন, আমি চললুম—আমার অনেক কাজ বাকি এখনও।

এর পর ভূতনাথ চলেই এসেছিল সেদিন। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসেনি তার। বাইরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। নিঝুম নিস্তব্ধ ঘর। মাঝরাতে শুধু গেট খোলার ঘড় ঘড় শব্দে বোঝা গিয়েছিল মেজবাবু ফিরেছে। ঘোড়া দুটো বার দুই ডেকে উঠেছিল। লোকজনের কথাবার্তা। গেট বন্ধ করার আওয়াজ। তারপর আস্তাবলবাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। দক্ষিণের পুকুরের দিকে একটা কী পাখী খানিকক্ষণের জন্যে একটানা ডেকে-ডেকে উড়ে গেল কোথায়। আর কোনো শব্দ নেই। তারপর থেকে অপরূপ এক স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতারও বুঝি এক মানে আছে। এই স্তব্ধতার মধ্যে ভূতনাথের নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো। প্রথমে মনে পড়ে রাধার কথা। রাধা একদিন বলেছিল—অমন করে নজর দিও না বলছি ভূতনাথদা’।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, নজর দিলে কী হয়?

রাধা বলেছিল—নজর দেওয়া বুঝি ভালো, আর আমি যদি নজর দিই?

ভূতনাথ বলেছিল—দে না, নজর দে, কোথায় নজর দিবি দে।

খানিকক্ষণ কী ভেবে রাধা বলেছিল—এখন তো নজর দেবো না, তোমার বউ আসুক, তখন নজর দেবো।

তা সে নজর দেবার সুযোগ পায়নি রাধা। পেটে ছেলে নিয়ে মারা গেল একদিন, তারপর আন্না। আন্নাও কত হাসিখুশি ছিল। যেখানে থাকতো সব সময়ে হেসে গল্প করে জমিয়ে রাখতো। ব্রজরাখালের বিয়ের দিন বাসরঘরে আন্না কী হাসিই না হেসেছিল। সেই আন্না! সেই আন্নার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হয়ে গিয়েছিল সেদিন! বড় অপ্রত্যাশিত সে দেখা! ভালো করে স্পষ্ট দেখা যায়নি, কথাও হয়নি কিছু। কিন্তু আন্নাকে দেখেও যেন কষ্ট হয়েছিল খুব ভূতনাথের।

কালীঘাটের দিকে যাচ্ছিলো ভূতনাথ। পোষ-কালী দেখতে বহুদিনের সাধ ছিল তার। ধর্মতলার ওদিকটা হাঁটতে হাঁটতে লম্বা রাস্তা ধরে যাওয়া।

বাঁ পাশে কিছুদূর সাহেব-মেমদের বাড়ি আর দোকান। আর ডানদিকটায় কেবল মাঠ। মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নেওয়া। ফিরিওয়ালারা বসে বসে আখ কেটে বিক্রি করছে। দাড়িগোঁফ, মাথার চুল কামিয়ে দিচ্ছে নাপিতরা। দলে দলে সব লোক হেঁটে চলেছে কালীঘাটে কিম্বা দর্শন করে ফিরে আসছে। কালীবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই একজনকে দেখে মনে হয়েছিল—আন্না না!

বার-বার চেয়ে দেখছিল ভূতনাথ। ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা। থান কাপড় পরনে। কোলে একটা এক বছরের মেয়ে সঙ্গে আরো চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে। সবাই ছোট ছোট। বয়েসে দু’এক বছরের তফাত সব। সঙ্গে সধবা শাশুড়ী বোধ হয়। জ্বল জ্বল করছে সিঁদুর সিঁথিতে। পাকা চুলের ওপর সিঁদুর পরেছেন শাশুড়ী। আন্না বোধ হয় নাকে নথও পরতো সধবা অবস্থায়। নাকে এখনও ফুটোর দাগ স্পষ্ট। বার-বার কেমন মনে হয়েছিল—ও আন্নাই, আর কেউ নয়। তারপর এক সময় ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল আন্না। কিন্তু ফিরে আসবার পথে আবার সেই দলটার সঙ্গে দেখা।

চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আন্নারা হেঁটে চলেছে চৌরঙ্গীর পাশের মেটে রাস্তা ধরে। সঙ্গে একজন কে পুরুষ আছে। আগে-আগে চলেছে। এক-একবার পেছনে ফিরে ডাকে—একটু পা চালাও—পা চালিয়ে এসো না গো...মশাই-এর বাড়ি কোথায়?

ভূতনাথ চেয়ে দেখলে ভদ্রলোকটি তাকেই প্রশ্ন করছে। বললে—আমার বাড়ি ফতেপুর—নদে জেলায়।

—মশাই-এর নাম?

—ভূতনাথ চক্রবর্তী।

ভদ্রলোক বললে—বেশ ভালোই, আমরাও নদে জেলার লোক।—ওগো, পা চালিয়ে এসো, রেল পাবো না—তা কী করা হয়?

ভূতনাথ একে-একে নিজের সবিস্তার পরিচয় দিয়ে গেল। দলটি তখন কাছে এসে পড়েছে—

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ গো, আমার বৌমার বাপের বাড়ি ফতেপুরে, না?

ভূতনাথ এক ফাঁকে চেয়ে দেখলে বিধবা মেয়েটি যেন লম্বা করে ঘোমটা টেনে দিলে। তবু সম্পূর্ণ ঢাকবার আগে যেন একটু দেখা গেল চোখটা। ভূতনাথের দিকেই চেয়ে আছে!

—অ বৌমা, একটু জোরে হাঁটো বাছা, রেল ছেড়ে দিলেই চিত্তির—

যেটুকু দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, তা-ও দমন করে নিলো ভূতনাথ। দলটা তখন জোরে জোরে পা চালিয়ে চলেছে। ভূতনাথ ইচ্ছে করেই পেছনে চলতে লাগলো। হয়তো আন্নাই হবে। আন্না যদি হয়, একবার পেছন ফিরে দেখবে নিশ্চয়ই। কিন্তু অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়েছিল ভূতনাথ। বিধবা মেয়েটি একবারও আর পেছন ফিরলো না। ছোট মেয়েকে কোলে করে আস্তে আস্তে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আসলে হয়তো ও আন্না নয়। কিম্বা হয়তো আন্নাই। কে জানে!

আর হরিদাসী! হরিদাসীর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি জীবনে। তা জীবনে সকলের সঙ্গে কি দেখা হয়! এক-একজন লোক জীবনে একরাত্রের অতিথি হয়েই আসে, তারপর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়। এই হয়তো নিয়ম এ-সংসারে।

মনে আছে চোরকুঠুরির ভেতর শুয়ে শুয়ে কেবল এই-সব চিন্তাতেই রাত পর্যন্ত কেটেছিল। তারপর বুঝি শেষ রাত্রের দিকে ঘুম এসেছে। সকাল হতেই আবার সেই ছক-বাঁধা জীবন। দাসু জমাদারের উঠোন ঝাঁট দেওয়ার শব্দ। মেজবাবুর গাড়ি ধোয়া-মোছা। ঘোড়ার ডলাই-মলাই আর আস্তাবলবাড়ির মাথায় হয় ব্রিজ সিং নয় তো নাথু সিং-এর ডন-কুস্তির হুম-হাম শব্দ। ভূতনাথের কিন্তু কোনো কাজ নেই।

বড়বাজারে গলির ভেতর দাঁড়িয়ে ভূতনাথ ভাবছিল—এবার কোথায় যাওয়া যায়। চাকরির জন্যে এমন ঘোরাঘুরি করতে করতে একদিন-না-একদিন লেগে যাবেই। এবার বড়বাড়ির দিকে ফিরলে হয়। আজ সকাল-সকাল বংশী ফিরতে বলেছে। ছোটবাবু আজ আবার জানবাজারে চুনীদাসীর কাছে যাবে। ছোটবাবু চুনীদাসীর কাছে চলে গেলেই ছোটবৌঠান তাকে নিয়ে বেরোবে। কোথায় যাবে কে জানে? কথাটা ভাবতেই যেন কেমন ভয় হলো ভূতনাথের। বড়বাড়ির আইনবিরুদ্ধ কাজ করবে বৌঠান। তার সঙ্গে ভূতনাথকে জড়ানো কেন? কিন্তু এবার ফিরতে হয়। ফিরতে গিয়ে হঠাৎ লোচনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

—লোচন এদিকে?

—আজ্ঞে, আপনি যে এখানে?

—আমি তো চাকরির চেষ্টায় রোজই আসি—কিন্তু তুমি? বাবুরা বাড়ি নেই আজ?

—তা আছে, চাকরি করি বলে কি আর বেরোতে নেই শালাবাবু? না, ওই মাইনেতে চলে! আর মাইনে-পত্তোরই নিয়ম মতো দেয় না বিধু সরকারমশাই, উপরি আয় তো উঠেই গেল শালাবাবু।

—কেন?

—কই, তামাক খাবার লোকই কমে যাচ্ছে, এখন বাডসাই চায় সবাই, মালও কমিয়ে দিয়েছে, নতুন করে আর ধরাতে পাচ্ছিনে কাউকে, নিজের পথ নিজে না দেখলে আর চলবে ক'দ্দিন, আপনাকে বললুম, একটা করে আধলা...

ভূতনাথ বললে—আমারই তো চাকরি নেই দেখছো লোচন, গরীব মানুষ, নেশা করে শেষে—

—ঠিক কথা শালাবাবু, তাই তো এদিকে রোজ একবার ঘোরাঘুরি করি, কিন্তু আর চাকরি

করবো না শালাবাবু।

—কেন?

—আজ্ঞে, চাকরিতে সে সুখ নেই আর, যা করে গেলাম বড়বাড়িতে এমন আর কোথাও পাবো না, ওই তো আমাদের দেশের এক লোক ঢুকেছে ননীবাবুর বাড়িতে, পটলডাঙ্গার ননীবাবুর বাড়িতে, কিন্তু ভারি জ্বালা তার!

—কোন্ ননীবাবু?

—আজ্ঞে, ওই যে ছুটুকবাবুর বন্ধু! এখন তো তিনি মস্ত লোক। আপিস খুলেছেন কত। তা সে কাজ করে বাড়িতে আর ফাই-ফরমাশ খাটে, পেয়ারের লোক, খরচার টাকাকড়িও হাতে পায়, কিন্তু হিসেব বড় কড়া ননীবাবুর! শুনি কিনা, রোজ সকাল সাতটার সময় হিসেব দিয়ে আসতে হয় সাহেবের কাছে, হিসেবে গোলমাল করলেই চাকরিটি যাবে। এ তো আর বড়বাড়ির ব্যাপার নয়, কে খাচ্ছে, কে চুরি করছে, কে অপচো নষ্ট করছে। কোনোদিন এখানে হিসেব বলে কিছু ছিল না আজ্ঞে। বেণী কাপড় কুঁচোচ্ছে, তার মধ্যে ক'খানা কাপড় বাইরে চলে গেল তা আর কেউ মনে রাখেনি, ফুরিয়ে গেল তো আবার নাও। এই তামাক-টিকের ব্যাপারটাই দেখুন না, কতখানি বাজার থেকে এল, কতটা খরচা হলো কেউ কোনো দিন দেখেছে?... আমিই সব—আমার জিম্মায় মাল ছেড়ে দিয়েই সরকারমশাই খালাস কিন্তু ননীবাবুর বাড়িতে একটা আধলার এদিক-ওদিক হোক দিকি—সাহেব তো মদ খেয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু পয়সার ব্যাপারে ভারি টনটনে। এদিকে যত রাত্তিরেই শুক ননীবাবু, ওদিকে ভোরবোল ওঠা চাই। আমাদের বড়বাড়ির মতো নয়—এমন চাকরি আর কোথায় পাবো শালাবাবু! তাই তো বলছিলাম আজ্ঞে, চাকরিতে যা সুখ করেছি—করেছি। এখন আর সে সুখ নেই, এখন নিজেই নিজের পথ দেখতে হবে, এখন তো দেশে ফিরে আর হালচায করতে পারবো না, মাঠের কাদামাটিও মাখতে পারবো না গায়ে।

—তা চাকরি না করতে চাও তো ব্যবসা করবে নাকি?

—আজ্ঞে, ব্যবসা কী করবো তাই তো ভাবছি, ক'টা ঠেলাগাড়ি নিয়েছিলাম আজ্ঞে—কিন্তু তাও টিকলো না, ঠিক মতো জমা পাই না—তারপরে মেরামতের খরচা আছে, তা এবার ভাবছি একটা যুৎসই ঘর পেলে পানের দোকান দেবো।

—পানের দোকান?

—আজ্ঞে, পানটা আমাদের জাতব্যবসা, দু'-একজন খুলেছে. তেমনি-তেমনি জায়গায় একটা ঘর পেলে ও-চাকরি ছেড়ে দেবো! কতদিন মাইনে না পেয়ে চলে বলুন তো—আর আমি না ছাড়লেও ওরাই আমায় ছাড়িয়ে দেবে। এমনিতেই বাবুদের দেনা হয়ে গিয়েছে শুনছি।

কোথায় শুনেছো?

—আজ্ঞে, মধুসূদন তো বলে। তা ধরন এবারে ছুটুকবাবুর শ্বশুরই তো সব বুদ্ধি দিচ্ছে—বাবুরা নাকি কয়লার খনি কিনবে জমিদারি বেচে দিয়ে, তা বাবুদের ধরুন অনেক টাকা আছে, এদিক থেকে লাখ টাকা গেল তো ওদিক থেকে লাখ টাকা এল—হরে-দরে বাবুরা পুষিয়ে নেবে—তা বলে এত চাকর-বাকর তো রাখবে না—আমার চাকরি তো আগে যাবে শালাবাবু।

ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—তুমি ভালোরকম শুনেছো?

—কীসের কথা?

—এই জমিদারি বেচে কয়লার খনি কেনা?

—আজ্ঞে, দেখেননি—বালকবাবু রোজ আসছেন, হাবুলবাবুতে আর ছুটুকবাবুতে দিনরাত পরামর্শ চলছে। মেজবাবু পর্যন্ত পায়রা ওড়ায়নি ক'দিন সকালবেলা, সেদিন বড়ো মেজো আর হাসিনী বউঠাকরুণরা এল বড়বাড়িতে। ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবুরাও যেমন আসে তেমনিই এসেছিল, মেজবাবুও বেরুচ্ছিলো, হঠাৎ বালকবাবু এসে পড়লো আর যাওয়া হলো না, তারপর নাচঘরে সেই যে বসলো সবাই, রাত তিনটে এস্তোক কথাবাত্রা চললো—তামাক দিতে-দিতে আমার হাত-পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে একেবারে।

—কী কী শুনলে?

—আমি মুখ্যু মানুষ, কথাবাত্রা কী বুঝতে পারি! সরকারমশাই ছিল সারা রাত, জিজ্ঞেস করবেন সরকারমশাইকে, উনি সব জানেন।

—বিধু সরকার আমাকে বলতে যাবে কেন?

—কিন্তু এতে আর সন্দেহ নেই শালাবাবু, সেদিন দেখলুম লোকজন এসে পুকুরটা মাপজোক করে গেল—শুনলুম পুকুরটা নাকি বোজানো হবে, বুজিয়ে ও জমিটা বেচা হবে—খদ্দের ঠিক হচ্ছে—ভেতরে ভেতরে কী যে সব হচ্ছে, কে আর জানতে পারবে বলুন, আমরা তো চাকর মানুষ।

—কিন্তু বংশী কিছু বলেনি তো আমাকে! সে জানে না?

—বংশী আজও ছোটমা'র মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে অ'ছে, এবার তো... বলতে বলতে যেন থেমে গেল লোচন।

—থামলে কেন, বলো।

—আজ্ঞে, অন্দরবাড়ির খবর, ও-সব কথা না বলাই ভালো, মেয়েছেলের কথা আমরা বারবাড়ির লোক কি তেমন জানতে পারবো—তবে যা শুনতে পাই...

—কী শুনতে পাও লোচন, শুনি না?

—আজ্ঞে, আপনি কাউকে বলবেন না বলুন—বললে আমার সব্বোনাশ হয়ে যাবে।

—আমি বলবো না, কথা দিচ্ছি।

গলা নামিয়ে লোচন বললে—বংশী ছোটমা'কে মদ ধরিয়েছে আজ্ঞে, আমরা গরীবগুর্বো লোক, আমাদের মেয়েছেলেদের এমন কাণ্ড বাপের আমলে শুনিনি কখনও শালাবাবু, কিন্তু বংশী এ-পাপের ফল ভুগবে—ভুগবে—ভুগবে, এই বিয্যুৎবারের বারবেলায় বলে রাখলুম—ও ভেবেছে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে ছোটমা'র গয়নাগাঁটি সব নেবে—কিন্তু ভগবান বলে একজন মানুষ মাথার ওপর আছে শালাবাবু, তার চোখ এড়াতে পারবে না কেউ—হ্যাঁ।

ভূতনাথ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না।

লোচন বললে—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আপনার—যদি বিশ্বাস না হয় তো মধুসূদন কাকাকে জিজ্ঞেস করবেন সত্যি কি না। তারপর থেমে আবার বলতে লাগলো—সেদিন পাল্কি-বেহারাদের জবাব হয়ে গেল শুনেছেন বোধ হয়—তা এদানি পাল্কি তো আর কেউ চড়তো না, বসে খেতো, কাজকম্ম কিচ্ছু ছিল না তাদের, কিন্তু যাবার সময় কী কান্না, হাউ-হাউ করে কান্না শালাবাবু। আজ তিন পুরুষ ধরে ওইখানে বাস করছে, আর তো কিছু কাজ জানে না, বিধু সরকারমশাই বকাঝকা শুরু করলে। বললে—মড়া-কান্না কাঁদিসনে দুপুরবেলা—যা, চলে যা।

বসন্ত বেয়ারা মাগ-ছেলে নিয়ে গলায় গামছা দিয়ে বললে—সরকারমশাই, যাবো কোথায় আমরা?

সরকারমশাই বললে—কুলীগিরি করে খে গে যা—যেখানে পারিস কর গে—বাবুদের কেন জ্বালাচ্ছিস? এমন মড়া-কান্না কাঁদলে বাবুদের ধম্মের সংসারে অমঙ্গল হবে যে।

তা একটা কাপড় নয়, গামছা নয়, বখশিস্ নয়—তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে সেই দুপুর রোদ্দুরে বেরিয়ে গেল তো! বাবুরা কেউ তো দেখতেও এল না। আমাদেরও ওই দশা হবে শালাবাবু! বাড়িটার দেখেন না, যেন সে ছিরি নেই। আগে আসছে-লোক, যাচ্ছে-লোক—কত বোলবোলা ছিল—আপনিও তো দেখেছেন হুজুর—সেবার সেই রাক্ষস এসেছিল মনে আছে আজ্ঞে? একটা আস্ত পাঁঠা খেয়ে ফেললে, হাড় মাংস ছাল কিছু ফেললে না, তারপর একবার রসগোল্লা খাওয়ার পব্ব হলো—ভৈরববাবুতে আর একজন লোকে! মেজবাবু বললে—যে দশ সের রসগোল্লা খেতে পারবে তাকে দশটা টাকা দেবে আর একটা গরদের জোড়—তারপর দোলের সময় দেখেছি, আবীরের ছড়াছড়ি—বনমালী সরকারের গলি লাল হয়ে যেতো আজ্ঞে—নাচ গান করতে আসতো বাঈজীরা, তিন দিন চার দিন ধরে নাচই হচ্ছে—হাজার হাজার কল্‌কে তামাক-টিকে পুড়তো—এই লোচন সব একহাতে করেছে—পূজোর সময় যেবার সেই এক পাগলা এসে বললে—পূজো

হয়নি—আপনি তো শুনেছেন সব আজ্ঞে? তাই বলছিলাম শালাবাবু, বড়বাড়ির মতো চাকরের সুখ আর কোথায় পাবো, আজকাল বাবুরাও সেয়ানা হয়েছে—সেই বড়বাড়িতেই এখন মাইনে বাকি পড়ে থাকে—খেটে যদি খেতেই হয়, কলকাতায় ব্যবসা করে খেটে খাওয়াই ভালো।

—তাতে দু' পয়সা হবে বলে মনে করো?

—কেন হবে না শালাবাবু, দেখতে দেখতে কী কলকাতা কী হলো দেখছেন না, এই বড়বাজারের কী ছিল কী হলো চোখের সামনেই তো দেখলুম—চোখের সামনে ঘোড়ার টেরাম থেকে কলের টেরাম হলো, হাওয়া-গাড়ি হলো, আগে পিলসুজে রেড়ির তেলের আলো জ্বলতো—এখন হলো দীপকের আলো।

ভূতনাথও দেখেছে পিলসুজের আলো। এখনও মনে আছে। বড়বাড়িতে যেবার প্রথম এল ভূতনাথ—তখন ছুটুকবাবুর ঘরে জ্বলতো গেলাসের আলো। শামাদানের ওপর একটা গেলাস বসানো। তাতে তিন ভাগ জল আর এক ইঞ্চি পুরু রেড়ির তেল। কেবল ছেলেদের পড়ার ঘরের বাতিতে থাকতো নারকোল তেল। নারকোল তেলের আলোটা একটু বেশি পরিষ্কার। তারপর সেই একটা খড়কে কাঠির মুখে একটুখানি তুলো তেলে ভিজিয়ে চকমকি পাথরে আগুন জ্বেলে ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু মোমের বাতিই ছিল সব চেয়ে ভালো। নাচঘরে মেজবাবু যখন পড়তে বসতো—মাথার ওপরে জ্বলতো মোমবাতির ঝাড় আর সামনে দু'দিকে দুটো মোমবাতি। পাছে বাতাসে নিভে যায়, তাই শামাদানের ওপর থাকতো একটা কাঁচের ফানুস আর ওপরে টিনের পাতে ফুটো করা একটা ঢাকা। তারপর এল কেরাসিন। কেরাসিনের হ্যারিকেন লণ্ঠন। আর 'ডুম'। ফানুসটা হয়ে গেল ডুম। কেরাসিনের রকমারি আলো বেরোতে না বেরোতে রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বললো। বড়বাড়িতেও এল গ্যাসের বাতি। নাচঘরে, পূজোর দালানে গ্যাসের বাতি—কিন্তু ঘরে ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন মোমবাতি আর রেড়ির তেলেব পিলসুজ তখনও চলছে। তারপর এল এসিটিলিন। ছুটুকবাবুর বিয়েতে এসেটিলিন গ্যাসের বাতির ঝাড় গিয়েছিল বরযাত্রীদের দু'ধারে সার বেঁধে। শেষে এল ইলেকট্রিক। তবু হঠাৎ যখন তার কেটে যায়, এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার জন্যে সব অন্ধকার। তখন আবার বেরোয় হ্যারিকেন লণ্ঠন, মোমবাতি!

দেখতে দেখতে কত কী বদলে গেল ভূতনাথের চোখের সামনে। অথচ মনে হয় যেন এই সেদিন!

লোচন বলে—জিনিসপত্তোরের দামই দেখুন না—আগে গয়ার মিঠেকড়া বালাখানা কিনেছি—সাত আনা 'সের মাংস, দশ পয়সার দুধ, বারো আনার ঘি, ছ' পয়সার ডাল, তিন আনার সরষের তেল আজ কোথায় এসে দাঁড়ালো! দিনকাল ক্রমেই খারাপ হতে চলেছে শালাবাবু।

ভূতনাথ বললে—এবার ফিরি লোচন—দেরি হয়ে গেল।

লোচন বললে—আমিও ফিরবো আজ্ঞে।

কিন্তু ফিরতে গিয়েও ফেবা গেল না। ওদিকে তখন ক'জন চিৎকার করে কী যেন বলছে। দোকানের সামনে গিয়ে সব দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। এক-একটা লোক দোকানের সামনে দাঁড়ায় আর খানিকক্ষণ যেন কী সব বলে। তারপর খানিকটা বক্তৃতা দেবার পরই গান ধরলো সবাই মিলে—

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক, এক হউক হে ভগবান—

গান গাইতে গাইতে ছেলেরা সামনে এসে পড়েছে। ছাপানো কাগজ বিলোচ্ছে সবাইকে। ভূতনাথও চেয়ে নিলে একটা ইস্তাহার।

লোচন জিজ্ঞেস করে—কীসের কথা লিখেছে শালাবাবু?

ভূতনাথ পড়তে লাগলো—'আগামী ৩০শে আশ্বিন বাঙলা দেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য এই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখীবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রা বর্ণের সুতা বাঁধিয়া

দিব। রাখীবন্ধনের মন্ত্রটি এই ঃ 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'। স্বাক্ষর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লোচন আবার জিজ্ঞেস করলে—কীসের লেখা শালাবাবু, বেহ্মজ্ঞানীদের?

ভূতনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু ছেলেরা চিৎকার করে উঠেছে—বন্দে মাতরম্—

একজন বক্তৃতা দিতে লাগলো—মনে রাখবেন ৩০শে আশ্বিন, ওই দিন লর্ড কার্জন বাঙলা দেশকে দু'ভাগে ভাগ করে দেবেন ঠিক করেছেন, আমরাও ঠিক করেছি তার প্রতিবাদ করবো। আমাদের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ সেইদিন জাতির নবজাগরণের পুরোহিতরূপে নগ্ন পদে দেশবাসীর পুরোভাগে রাজপথ দিয়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে যাবেন। আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারাও সেদিন এই ভারত-ভাগ্যবাহিনী ভাগীরথীকে সাক্ষী রেখে শপথ গ্রহণ করবেন—বিদেশী বর্জনের শপথ।

সকলে চিৎকার করে উঠলো—বন্দে মাতরম্—

—আর তারপর স্নান শেষে প্রত্যেকে প্রতেকের হাতে হলুদরঙা রাখী বেঁধে দেবেন। আর একটা অনুরোধ। ৩০শে আশ্বিন অরন্ধন, উপবাসের মধ্য দিয়ে আমাদের এই জাতীয় বেদনাকে চিহ্নিত করে রাখতে চাই। নিরস্ত্র জাতির শস্ত্রহীন প্রতিবাদ। দোকানি ভাইরা দোকান বন্ধ করবেন, গাড়োয়ান গাড়ি চালানো বন্ধ করবেন, কুলি মেথর মুটে মজুর সকলকেই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি—দেশবাসী সকলের সহযোগিতা চাই।

লোচন কিছু বুঝতে পারছিল না। বললে—দোকান কেন বন্ধ করতে বলছে শালাবাবু?

ভূতনাথ বললে—বাঙলা দেশকে জোড়া লাগাবার জন্যে।

তবু কিছু বুঝলো না লোচন। বললে—আমি যে পানের দোকান দেবো ঠিক করেছি শালাবাবু, করতে দেবে না নাকি?

ভূতনাথ বললে—দাঁড়াও, আগে শুনি কী বলছে ওরা।

তখনও বক্তৃতা চলছে—আর সেই ৩০শে আশ্বিন, বাঙলার দেশনায়করা ঠিক করেছেন বাঙলা দেশের রাজধানীতে গড়ে তুলবেন 'ফেডারেশন হল্', যেখানে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকের এক মহামিলন কেন্দ্র হবে। সেদিন বেলা তিনটের সময় সেই মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হবে। ভিত্তি স্থাপন করবেন অগ্রজ জননায়ক আনন্দমোহন বসু।

আবার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠলো। বোধ হয় গুটি পাঁচ ছয় ছেলে। দোকানদাররা কেউ বোধ হয় বুঝতে পারলে না ব্যাপারটা। দু'-একজন ভূতনাথকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—বাবুলোক কা বোলত্ হৈ বাবুজী?

ভূতনাথ বাঙলায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। দু'-একজন ভদ্রলোক দোকানদার বললে—তা বলে দোকান বন্ধ করে উপোস করতে হবে, এ কেমন আব্দার মশাই!

ছেলেরা তখন গান গাইতে গাইতে চলেছে—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,　　বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান—

ভূতনাথ বললে—চল লোচন বাড়ি যাই।

রাস্তায় একবার মনে হলো ভূতনাথের—এরা কারা! এদের মধ্যে চেনাশোনা কেউ তো নেই. সেই 'যুবক-সঙ্ঘে'র কদমদা'র দলের লোকেদের কেউ! নিবারণ নিশ্চয়ই চেনে ওদের। কিন্তু বাড়ির কাছে আসতে এ-কথা আর মনে রইল না। একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ঢুকতেই দেখলে ছোটবাবুর ল্যান্ডো জোতা রয়েছে গাড়ি-বারান্দার তলায়। খানিক পরে ছোটকর্তা নামলো সিঁড়ি দিয়ে। বংশী ছিল সঙ্গে। আব্বাস মিয়া ল্যান্ডোর সহিস। সামনের দরজাটা খুলে সেলাম করে দাঁড়ালো। পায়ের তলায় ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঘোড়া দুটোর যেন আর তর সয় না। মুখের ভেতর লাগামের শেকল চিবোচ্ছিলো। লাগামের টান পড়তেই দৌড়ে যাবে। হঠাৎ ছোটকর্তার যেন কী মনে পড়লো, ডাকলে—বংশী—

বংশী হাজির ছিল। বললে—হুজুর!

—আমার চাবুক।

বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল বংশী বাড়ির ভেতর। তারপর এক মুহূর্তে শঙ্কর মাছের ল্যাজের চাবুকটা এনে দিলে ছোটকর্তার হাতে। তারপর লাগামে হাত লাগাতে না লাগাতেই ঘোড়া দুটো জোরে একটা টান দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে গেট পেরিয়ে বনমালী সরকার লেন-এ গিয়ে পড়লো ছোটকর্তার ল্যান্ডোলেটখানা।

নাথু সিং তখনও চিৎকার করছে—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার হো—

বংশী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে এতক্ষণে।

ভূতনাথকে দেখে বললে—আপনি এসে গিয়েছেন—ওদিকে ছোটমাও তৈরি।

ভূতনাথ বললে—আমিও তো তৈরি।

—তা হলে আপনি চোরকুঠুরির দরজা দিয়ে আসুন, আমি মিয়াজানকে খবর দিই গে।

বংশী ঝড়ের মতন নিজের কাজে চলে গেল। ভূতনাথ আস্তে আস্তে গিয়ে চোরকুঠুরির বারান্দা দিয়ে ছোট দরজাটা খুললে। ওপাশে বড়মা'র গলা শোনা যাচ্ছে। সিন্ধুর সঙ্গে আজে-বাজে গল্প চলছে তার। মেজমা'র ঘরে গিরির গলাও শোনা যায়। বারান্দাটা জনশূন্য।

ভূতনাথ গিয়ে দাঁড়ালো বৌঠানের ঘরের সামনে। ভেতরে ছোটমা'র গলার শব্দ। চুড়ির টুং টাং।

ভূতনাথ ডাকলো—বৌঠান—

—ওই ভূতনাথ এসেছে, ডাক চিন্তা, ভেতরে ডাক তো।

ঘরে ঢুকতেই ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। বৌঠানকে সাজিয়ে দিচ্ছে চিন্তা। সাজানো তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু এত রূপ বৌঠানের!

খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে দেখতে লাগলো ভূতনাথ। খোঁপাটাকে বেড়ার মতন করে মাথার পেছন দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বেঁধেছে। আর তাতে কত রকম গয়না! হীরের বেলকুঁড়ি, মুক্তো বসানো একটা চিরুণী খোঁপার মধ্যিখানে—তাতে লেখা 'পতি পরম গুরু'। মাথার ওপর টায়রা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর একটা কী গয়না—নাম জানে না ভূতনাথ। বোধ হয় ঝাপটা। কানে হীরের কানফুল। সমস্ত কানদুটো সোনায় হীরেয় মুক্তায় মোড়া। গলায় পরেছে চিক। খোঁপার নীচে ফরসা ঘাড়ের ওপর টুকরো টুকরো চুল উড়ছে।

বৌঠান বললে—আর একটু দাঁড়া ভূতনাথ। তারপর চিন্তাকে বললে—আমার কঙ্কন দুটো দে, আর জড়োয়ার তাগা জোড়া—আর কয়েকটা আঙটি বের কর।

চিন্তা সিন্দুক খুলে এক-একটা গয়না বার করে পরাতে লাগলো বৌঠানকে। শেষে বেরুলো গোট। কোমরের তলা থেকে চারদিকে ঘিরে দু'ইঞ্চি চওড়া গোটছড়া জড়িয়ে রইল ছোটবৌঠানকে।

আয়নাতে নিজের মুখখানা শেষবারের মতো দেখে নিয়ে বৌঠান বললে—এবার চল ভূতনাথ।

চিন্তাকে বললে—চিন্তা খবর নে তো—ছোটকর্তা বেরিয়ে গিয়েছে কিনা?

চিন্তা চলে যাবার পর ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবে বৌঠান?

—যেখানে খুশি।

—আমাকেও যেতে হবে?

—হ্যাঁ, তুই আমার সঙ্গে যাবি।

—কিন্তু কাজটা কি ভালো দেখাবে? বড়বাড়ির ছোটবউ-এর সঙ্গে বাইরে যাবো, সেটা কি আমার পক্ষে ভালো কাজ?

বৌঠান বললে—আমার গাড়ি, আমার যেখানে খুশি যাবো, কার বলবার কী আছে—আর তুই তো যাচ্ছিস আমার হুকুমে।

—কিন্তু ছোটকর্তা টের পাবে তো, তখন?

—ছোটকর্তাকে আমি ভয় করি নাকি? ছোটকর্তা জানবাজারে যেতে পারে, আমি পারি না?

মেয়েমানুষ বলে কি আমি মানুষ নই?

ভূতনাথ বললে—কিন্তু তুমি তো বউমানুষ, পুরুষমানুষের সঙ্গে কি তোমার তুলনা?

ছোটবৌঠান রেগে গেল যেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমি কী করি না-করি, তার জন্যে তোর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে নাকি?

ভূতনাথ গলা নামিয়ে আনলো। বললে—রাগ করো না বৌঠান, কিন্তু নেশার ঝোঁকে একটা যা-তা করে বসবে শেষকালে—

—তার মানে? ছোটবৌঠান যেন ফণা তুলে উঠলো—আমি নেশা করেছি বলতে চাস? আজকে ষষ্ঠীর উপোস গিয়েছে জানিস না, সারাদিন জল পর্যন্ত খাইনি, আর নেশা যদি করেই থাকি, কার জন্যে করেছি শুনি? কার জন্যে নেশা করেছি, কে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে, তা আর কেউ না জানুক ঠাকুর তো জানে! আমার যশোদাদুলাল সাক্ষী আছে—কিন্তু তুই বলবার কে?

ভূতনাথ বললে—না, আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি বৌঠান।

—আমার ভালোর কথা কাউকে ভাবতে হবে না ভূতনাথ। তোর পায়ে পড়ি, তুই আর আমার ভালোর কথা ভাবিসনি, আমার ভালোর জন্যে সংসারে কাউকে ভাবতে হবে না, নিজের মানুষ যারা, তারাই কেউ ভাবলে না, আর তুই তো আমার পর।

—কিন্তু তবু একবার ভালো করে ভেবে দেখো বৌঠান।

—আমি খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি রে, এর চেয়ে ভালো করে ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। বিয়ে হবার পর সেই যে ঢুকেছি এ-বাড়িতে, আর একটি দিনের জন্যেও বেরোইনি কখনও। জানিস সংসারে যাবার জায়গা কোথাও নেই আমার, বাপের বাড়ি থাকে লোকের, আমার তা-ও নেই। এই ঘর আর এই বারান্দার বাইরে কোনোদিন চেয়ে দেখিনি চোখ মেলে। এর আষ্টেপৃষ্ঠে ঢাকা। কোথায় বরানগর, কোথায় জানবাজার তা-ও জানি না।

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা ভূতনাথ, বরানগর কোথায় জানিস?

ভূতনাথ বললে—জানি, ব্রজরাখালের বন্ধুবান্ধবরা তো আগে ওখানেই ছিল—কিন্তু বরানগরে কোথায় যাবে? তোমাদের বাগানবাড়িতে?

—না, কিন্তু যদি যাই-ই, তোর আপত্তি আছে?

—আমি যাবো না।

—কেন?

ভূতনাথ বললে—এটা বোঝো না, তুমি বড়বাড়ির বউ, আর আমি?... আমি কেউ না। তোমারও কেউ না, এ-বাড়িরও কেউ না, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া ভালো দেখায় না, তাতে তোমারই ক্ষতি হবে বৌঠান।

—আমার ক্ষতির কথা তুই ভাববার কে?

—কিন্তু একজন তো কেউ ভাববার চাই, তোমার যে কেউ নেই বৌঠান।

—আমার জন্যে তুই যদি এতই ভাবসি তো—সঙ্গে চল, আমার ভালোর জন্যেই চল।

—বরানগরে গিয়ে তোমার কী ভালোটা হবে শুনি?

—সব কথা তোকে বলবো কেন রে?

—তবে আমিও যাবো না—ভূতনাথ বেঁকে বসলো।

বৌঠান গম্ভীর গলায় এবার বললে—তুই যাবিনে তো?

—তুমি আমাকে যেতে বলো না।

বৌঠান বললে—কিন্তু তুই যদি না যাস, কে আমার সঙ্গে যাবে বল?

—কেন, বংশী কি চিন্তা।

—ওদের গেলে চলবে না, আমার এ-ঘর কে দেখবে? আর ছোটকর্তার কাজগুলো করবে কে?

কথাটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ভূতনাথ। তারপর বললে—যেতে পারি, কিন্তু তুমি

কথা দাও, আজ মদ খাবে না।

—কথা দিলাম, খাবো না। তা ছাড়া এবার থেকে আর বোধ হয় খাবার দরকারও হবে না, যার জন্যে খেতাম সেই ছোটকর্তাই তো আর রাত্তিরে বাড়ি থাকছে না।

এমন সময় চিন্তা এল। বললে—ছোটবাবু বেরিয়ে গিয়েছে মা।

বংশীও ঘরে ঢুকলো। বৌঠান জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, গাড়ি তৈরি?

বংশী বললে—হ্যাঁ, খিড়কিতে গাড়ি নিয়ে মিয়াজান দাঁড়িয়ে আছে।

বৌঠান বললে—তা হলে চল ভূতনাথ, আমরা যাই।

তারপর চিন্তাকে বললে—চিন্তা, তুই আমার ঘর-দোর দেখিস, সিন্দুকের চাবিটা তোর কাছেই রইল, এসে যেন দেখি সব ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলা ধূপ-ধুনো দিয়ে সন্ধ্যে দিবি। আর যশোদাদুলালকে ভোগ দিবি যেমন দিস রোজ—তারপর চলতে গিয়ে আবার থামলো। বললে—আর, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বলবি—আমি বরানগরে গিয়েছি।

বংশী হঠাৎ বললে—কখন ফিরবে তুমি ছোটমা?

—তা ফিরতে রাত্তির হবে আমার।

চিন্তা বললে—আজ রাত্তিরে খাবার কী বন্দোবস্ত করবো? তোমার পূজোর পেসাদ রয়েছে, রেখে দেবো?

বৌঠান কী যেন ভাবলে খানিকক্ষণ, একবার মাথার একটা বেলকুঁড়ি ভালো করে খোঁপায় গেঁথে দিলে। তারপর বললে—এই পেসাদই খাবো আজ, আর কিছু খাবো না—কিন্তু তোরা খেয়ে নিস, আমার জন্যে যেন বসে থাকিস নে—তারপর চলতে গিয়েও থেমে গেল বৌঠান। বললে—আর যদি না ফিরি তো...

—সে কি, ফিরবে না নাকি ছোটমা?

—বলা যায় না, রাস্তায় কতরকম বিপদ-আপদ হতে পারে—যদি না ফিরি তো তোরা...

—ও কথা বোলো না ছোটমা, তুমি না ফিরলে আমাদের কী হবে?

—সে ব্যবস্থা তোদের জন্যে করিনি ভেবেছিস? আমার যা-কিছু আছে সব রইল, তোরা সবাই নিবি, ভূতনাথ নেবে—কার জন্যে আমি রেখে যাবো বল।

বংশী আর চিন্তার চোখ ছল ছল করে উঠলো।

ছোটবৌঠান বললে—আর দেরি করা নয় ভূতনাথ, চল, যেতে আসতে অনেক দূরের পথ।

বৌঠান আগে আগে চললো। পেছনে ভূতনাথ। বংশী আর চিন্তাও এল সঙ্গে সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মনে হলো যেন মেজগিন্নী আর বড়বউ শব্দ পেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—ছোটবউ গেল না?

—কোথায় যাচ্ছিস ছোট?

ছোটবৌঠান বোধ হয় শুনতে পেলে না। ভূতনাথ পেছন ফিরে দেখলে গিরি আর সিন্ধু দাঁড়িয়ে দেখছে অবাক হয়ে। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো তার। সকলের চোখের ওপর দিয়ে যাওয়া। যদি কোনো কথা ওঠে! যদি কাল ছোটকর্তার কানে যায়! যদি বড়বাড়ির কর্তামহলে আলোচনা হয় এ নিয়ে! ছুটুকবাবু যদি শোনে! আজকাল ছুটুকবাবু তো আর একলা নয়। ছুটুকবাবুর শ্বশুর হাবুল দত্তও এ-বাড়ির একজন কর্তাব্যক্তি। সমস্ত পরিস্থিতিটা ভাবতে গিয়েই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ।

মিয়াজান গাড়ি নিয়ে তৈরিই ছিল। ইলিয়াস ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিল। দৌড়ে এসে দরজার পাল্লা খুলে দাঁড়ালো। বৌঠান তখন বেশ লম্বা করে ঘোমটা দিয়েছে। বৌঠান সামনে আসতেই ইলিয়াস সরে দাঁড়ালো দূরে। প্রথমে উঠলো বৌঠান, তারপর ভূতনাথ।

গাড়িতে উঠতেই বংশী গাড়ির জানলা দরজা বন্ধ করে দিলে। বললে—এবার ছাড়ো মিয়াজান।

ব্রিজ সিং গেট-এর চাবি খুলে দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই আবার বন্ধ করে দিলে।

একসঙ্গে এক গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি বসে যাওয়া। ভূতনাথ চেয়ে দেখলে—পটেশ্বরী বৌঠান এতক্ষণে ঘোমটা খুলে ফেলেছে। বনমালী সরকার লেন দিয়েই গাড়ি ছুটে চলেছে এখন, কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। ভেতরটা অন্ধকার। শুধু সামনের দিকের নীল কাঁচ দিয়ে একটু আলো আসছে। গাড়ির ছাদের তলায় রেশমী জাল টাঙানো। চারপাশেও রেশমের ঝালর। দেয়ালের গায়ে কাঠের ওপর ভেলভেটের ঢাকনা। কী মোলায়েম স্পর্শ! কোথাও শব্দ নেই। গাড়ি চলেছে পাল্কির মতন দুলে দুলে। ঘোড়ার গাড়িতে আগে অনেকবার চড়েছে ভূতনাথ। কিন্তু তাতে যেন বড় বেশি ঝাঁকুনি। বড় কর্কশ শব্দ। সমস্ত গাড়িটা যেন ঝর-ঝর করে কাঁপে। কিন্তু এ অন্যরকম। এ-গাড়িতে চড়ে অনেকদূর যাওয়া যায়। গায়ে ব্যথা হবে না। মাঝে মাঝে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠছে। পাশ দিয়ে সশব্দে ট্রাম চলে গেল। হয়তো গরুর গাড়ি চলছে নানারকম বিচিত্র শব্দ করতে করতে। প্রচুর মালপত্তোর নিয়ে গরুর গাড়ি চললে যেমন শব্দ হয়।

এখন গাড়ি ট্রাম-রাস্তা ধরে চলছে মনে হয়।

ভূতনাথ যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। পটেশ্বরী বৌঠান এত কাছাকাছি। বৌঠানের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে এক গাড়িতে যাওয়া তার এই প্রথম। বৌঠানের দিকে একবার চেয়ে দেখলো ভূতনাথ। যেন আপন মনে কী ভাবছে। যেন কোনো দিকে নজর নেই। বৌঠানের শাড়িটা খোঁপাটা দুলছে অল্প-অল্প। মাঝে মাঝে কাঁধ থেকে রেশমের শাড়িটা খসে পড়ে যাবার মতন হয়। ডান হাত দিয়ে বৌঠান আবার সেটা যথাস্থানে তুলে দেয়। সমস্ত গাড়ির ভেতরটা আতরের গন্ধে একেবারে ভুর ভুর করছে। কানের ফুলটা এই অন্ধকারেও চিক চিক করে ওঠে। বৌঠানের কপালে মস্ত বড় একটা টিপ। সিঁদুরের টিপ। বোধ হয় 'মোহিনী-সিঁদুরে'র। কিন্তু এখনও কেন বৌঠান 'মোহিনী-সিঁদুর' পরে? ও তো কোনো কাজেই লাগলো না।

ট্রাম-রাস্তা পার হবার সময় গাড়িটা একটু ঢিমে হয়ে এল। তারপর আবার সেই দুলতে দুলতে চলা!

কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল ভূতনাথের। কোনো কথাবার্তা নেই। চুপচাপ এতদূর যেতে হবে বৌঠানের সামনে বসে বসে। নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। অনেকদিন সাবান দেওয়া হয়নি ওগুলোতে। বড় ময়লা দেখাচ্ছে। বিশেষ করে বৌঠানের ওই সাজপোশাকের পাশে। ঠিক ভেতরে উঠে না বসলেও হতো! গাড়ির ওপরেই উঠতে যাচ্ছিলো তো সে। কিন্তু বৌঠানই তো তাকে ভেতরে বসতে বললে। কিন্তু যদি কোনো কথাই না বলবে তো ভেতরে কেন বসা। হঠাৎ ভূতনাথের নিজেকে যেন আজ বড় গরীব বলে মনে হলো। বড় গরীব সে। কেন সে বৌঠানের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করতে গেল? জবার সঙ্গেই বা তার অত মেলামেশার দরকার কী! কেন সে বার-বার ওরা ডাকলেই যায়? ওকে তো তারা নিচু চোখেই দেখে। সেদিন জবা কি তাকে গাড়িতে তুলে নিতে পারতো না? সবাই গেলো গাড়িতে চড়ে, অথচ সে-ই শুধু হেঁটে হেঁটে গিয়েছে বাগবাজার থেকে বার-শিমলে। গাড়ির ছাদে তার জন্যে একটু বসবার জায়গা হতোই। আর আজই বা সে চলেছে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে? সে কি বৌঠানের অনুরোধেই কেবল? এতটুকু যাবার ইচ্ছে কি ছিল না তার! কিম্বা যদি ইচ্ছেই ছিল তবে সে কী জন্যে! বৌঠানের একটু সান্নিধ্য! বৌঠানের সান্নিধ্যে কি তার এতই লোভ! এ লোভ তো তার হওয়া উচিত নয়। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো এ-জামা-কাপড় তো বৌঠানই দিয়েছে। এ না দিলে ভূতনাথ পরতো কী! কিন্তু জামা-কাপড় তো ওরা সকলকেই দিয়ে থাকে। পুতুলের বিয়েতে যারা হাজার বারোশ' টাকা খরচ করে এটুকু তাদের কাছে কী! এত সামান্যতেই ভূতনাথ কেন কৃতার্থ মনে করছে নিজেকে? ব্রজরাখাল তো আগেই বলেছিল—ওরা হলো সাহেব-বিবির জাত, আমরা হলাম গোলাম। সত্যিই তো গোলাম হিসেবেই দেখে তাকে পটেশ্বরী বৌঠান। হঠাৎ কেমন যেন ঘৃণা হতে লাগলো নিজের ওপর!

মনে হলো বৌঠানকে একবার জিজ্ঞেস করে—এ কোথায় চলেছো তুমি? কিন্তু বৌঠানের মুখের

দিকে চেয়ে কেমন যেন মুখ দিয়ে বেরুলো না কথাটা।

বৌঠান যেন তার মনের কথাটা ধরতে পেরেছে। বললে—কী, ভাবছিস কী রে ভূতনাথ?

ভূতনাথের চোখ দিয়ে কান্না ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগলো। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বললে—এমন জানলে আমি কিছুতেই আসতাম না।

বৌঠান হাসলো এবার। বললে—কেন, হলো কী তোর?

—তুমি একটাও কথা বলবে না, আমার বুঝি তা ভালো লাগে?

বৌঠান বললে—তা কথা বল না তুই, আমি কি বারণ করেছি?

—আর তুমি চুপচাপ শুনবে কেবল?

—আমার কথা যে আসছে না ভাই, সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। তুই কথা বল আমি শুনবো ঠিক।

—তার চেয়ে আমি নেমে যাই না এখানে।

বৌঠান বললে—তোর বড্ড অভিমান, পুরুষমানুষের এত অভিমান ভালো নয় রে, দেখিসনি ছোটকর্তা কারো মান-অভিমানের দাম দেয় না।

ভূতনাথ বললে—তুমি কি আমাকে ছোটকর্তার মতো হতে বলো?

হাসতে হাসতে বৌঠান বললে—সেই জন্যেই তো তোকে অত ভালো লাগে আমার, ছোটকর্তা যদি তোর মতন হতো—মানুষটা জানবাজারে গিয়ে কী করে জানি না, কত চেষ্টা করলাম আমি, মেয়েমানুষের যা সাধ্যিতে কুলোয় না তা-ও করে দেখলুম, তবু কিছুতে কিছু হলো না, একবার ইচ্ছে হয় জানবাজারে সেই রাক্ষুসীর কাছে গিয়ে দেখে আসি লুকিয়ে লুকিয়ে সে কী মন্ত্র জানে, কীসে সে ছোটকর্তাকে ভুলিয়ে রাখে অমন। রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ তার নাম করে ওঠে, আমাকে এক-একবার ভুলে 'চুনী' বলে ডেকে ওঠে। নেশার ঘোরে মানুষটা বেহুঁশ হয়ে আছে তখন, আমিও ভুল ভাঙাই না—কিন্তু বুকটা আমার ভেঙে যায় ভাই।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু তুমিই বা কীরকম মেয়ে বৌঠান—তোমার কাছে সে লাগে না, তোমার পায়ের যুগ্যি নয় সে, আমি তো দেখেছি।

বৌঠান বললে—আমিও তাই ভেবেছি, নিশ্চয়ই সে কিছু খাইয়েছে—তোকে যেমন খাইয়েছিল। কামিখ্যেয় শুনেছি সেখানকার মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া করে রাখে—হয়তো কিছু খাইয়ে দেয়।

ভূতনাথ বললে—তুমি যদি বলো বৌঠান তো আমি আর একবার জানবাজারে যেতে পারি। এবার কিছু খাবো না, শুধু দেখে আসবো সব, বৃন্দাবনের সঙ্গে ভাব করে সব দেখে শুনে আসবো।

—না, তোকে আর সেখানে যেতে দেবো না, শেষে তোকেও হয়তো কিছু তুক করবে। কিন্তু এবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো ভূতনাথ। এতেও যদি না হয় তো আর কিছুতেই হবে না।

—কীসের চেষ্টা?

—সেই জন্যেই তো বরানগর যাচ্ছি আজ।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কীসের চেষ্টায় যাচ্ছো?

—বরানগরে এক সাধুর কাছে। আমাদের নাপিত-বউ বলছিল, বছর-বছর তো ওর ছেলে হয় আর মরে যায়, ওই সাধুর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেই এবার বাঁচলো তো ছেলেটা! দেখিই না কী বলে। সব রকম ওষুধ নাকি দেয় সাধু। ওর কাছ থেকেই তো ঠিকানাটা নিয়ে এসেছি।

—কী ঠিকানা?

—তুই বারনগর চিনিস?

—একবার গিয়েছিলাম শুধু ব্রজরাখালের সঙ্গে। ওর গুরুভাইরা যখন বরানগরে ছিল, তখন দেখতে গিয়েছিলাম—ঠিকানাটা কী?

—তা তো জানি না, ও বলেছিল বরানগরে সবাই জানে তাঁকে, ওখানে গিয়ে খবর নিলে সবাই বলে দেবে।

—কিন্তু তার জন্যে তোমার নিজের আসার কী দরকার ছিল? আমি একাই তো গিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম।

—কিন্তু ও বললে আমাকে নিজেই যেতে হবে, আমার হাতে তাগা বেঁধে দেবে কিনা—আর নিজে গিয়ে সাধুকে যে সেবা দিতে হয়।

—কীসের সেবা?

বৌঠান যেন হঠাৎ চারদিকে কী একটা খুঁজতে লাগলো। বললে—ওই যাঃ, সর্বনাশ হয়েছে।

—কী হলো?

বৌঠান বললে—আসল জিনিসই যে আনতে ভুলে গিয়েছি রে!

—কীসের আসল জিনিস?

—পাঁচ পণ সুপুরি আর পাঁচ গোছ পান। সব যে বেঁধে রেখেছিলাম আমি। কী হবে এখন?

বৌঠান উতলা হয়ে উঠলো। বললে—আমি অত করে চিন্তাকে দিয়ে কিনিয়ে আনলাম—আর সেইটেই কিনা গোলমালে ফেলে এলাম? বৌঠান আরো বার কয়েক গাড়ির এদিক ওদিক দেখতে লাগলো—না, আসল জিনিসটাই ফেলে এসেছি। কী ভুলো মন হয়েছে বল তো!

—ওটা না হলে চলবে না?

—ওই সেবা দিলে তবে যে ওষুধ দেবে, নাপিত-বৌ বার বার করে বলে দিয়েছিল যে! বলেছিল—নির্ঘাৎ ওষুধ, কত লোকের কত কী উপকার হচ্ছে, আমি তো বলিনি যে আমি যাবো, তা হলে তো নাপিত-বৌকেই সঙ্গে করে আনতুম, নিজের কথা কি ওকে বলা যায়? সে কথা আবার তা হলে বড়দি মেজদি'র কানে উঠুক—হাসবে তো ওরা, এতেই হাসছে, ওদের কী, ওদের দুঃখ কীসের বল তো ভূতনাথ, বড়দি ছেলের বউ নিয়ে মেতে আছে, আর মেজদি'র ছেলেরা তো আদ্দেক দিন মামার বাড়িতেই থাকে, এ-বাড়িতে তাদের দেখতেই পাওয়া যায় না, আর দিনরাত কেবল গয়না গড়াচ্ছে আর বাঘবন্দি খেলছে। আমার দুঃখ ওদের বললে ওরা কী বুঝবে বল?

ভূতনাথ বললে—তা হলে আমি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসবো বৌঠান?

—তুই পারবি?

—খুব পারবো। বংশীকে বলবো খুঁজে বার করতে—কিন্তু কোথায় কতদূর এলাম দেখি।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভূতনাথ বাইরে দেখবার চেষ্টা করলে ভালো করে। বেশ সন্ধ্যে হয়ে এসেছে চারদিকে। একটা চৌরাস্তার মোড়ের কাছাকাছি। মনে হলো যেন শ্যামবাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বেলে দিয়েছে। রাস্তার গ্যাসের আলোগুলোও জ্বলছে।

তা হোক, এতদূর থেকে যেতে আসতে কতক্ষণ আর লাগবে! দৌড়ে যাবে আর দৌড়ে আসবে সে! ভূতনাথের মনে হলো পটেশ্বরী বৌঠানের জন্যে এটুকু করা যেন কিছু নয়। এ তো সামান্য! এর চেয়ে আরো ভীষণ কিছু করা যায় যেন। ভূতনাথ বললে—তা হলে আমি যাই বৌঠান।

বৌঠান বললে—আর আমি বুঝি একলা থাকবো এখানে?

সে-কথাও সত্যি। এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে ভূতনাথ কেবল নিজের কথাটাই ভেবেছে। পটেশ্বরী বৌঠানের কথাটা তো ভাবা হয়নি। এই সন্ধ্যেবেলা কলকাতা শহরে বৌঠানকে একলা রেখে কি যাওয়া উচিত? দিনের বেলাতেই কত রাহাজানি হয়ে যায় তো সন্ধ্যের অন্ধকারে কিছুই অসম্ভব নয়। আর বৌঠান আজ যে সাজগোজ করেছে। সারা গায়ে দামী দামী গয়না। হীরে মুক্তো সোনার ছড়াছড়ি। এই তো সেদিন ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে মেয়েদের গয়নাগাঁটি লুঠপাট করে নিয়ে গেল দিন-দুপুরে। পুলিশ-পাহারার টু-শব্দও পাওয়া গেল না। ভূতনাথ বললে—তা হলে ফিরেই যাবে?

—তাই ফিরে চল।

গাড়ি আবার ফিরলো। ভূতনাথ খড়খড়ি খুলে গলা বাড়িয়ে বললে—মিয়াজান, বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চল গাড়ি।

ঘোড়ার মুখ ঘুরলো। তারপর আবার সেই ট্রাম-রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়া। ওখান থেকে বৌবাজারে বড়বাড়িতে গিয়ে আবার সেই বরানগর। বরানগরেই বা কতক্ষণ দেরি হবে কে জানে।

ভূতনাথ বললে—যদি বরানগরেই যাবে তো একটু সকাল-সকাল বেরুলে না কেন?

বৌঠান বললে—ছোটকর্তা যে দেরি করে বেরুলো।

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা, ছোটকর্তা যদি জানতে পারে তুমি বেরিয়েছো?

—ছোটকর্তা জানতে পারবে কেন?

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আচ্ছা বৌঠান, শুনেছো, বড়বাড়ির দক্ষিণের পুকুরের জমিটা নাকি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে?

বৌঠান বললে—কে জানে, ও-সব দপ্তরখানার লোক জানে, মেয়েমহলে ও-সব খবর কেউ দেয় না।

—আরো শুনেছি, জমিদারি বেচে নাকি কোলিয়ারি কেনা হয়েছে।

বৌঠান বললে—কে জানে ভাই, জমিদারিও কখনো দেখিনি, এদের কোলিয়ারি হলেও দেখতে পাবো না। আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করতেও আসে না কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ। আমরা ও-সবের কী বুঝি, কর্তারা যা ভালো বোঝে করবে। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো শুধু নামে... অসুখ হলে ডাক্তার-বদ্যি আসে, আঁতুড় হলে দাই আসে আর খিদে পেলে খেতে দিতে আসে সেজখুড়ী।

—কিন্তু কর্তাদের বেলায়?

—আমার যশোদাদুলালকে তো তাই বলি, পরের জন্মে যেন পুরুষমানুষ হয়ে জন্মাই, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, সে বেশ কিন্তু ভাই, যখন ইচ্ছে বাড়িতে এলুম, কিম্বা সারা রাত এলুমই না, ইচ্ছে হলো বৌ-এর ওপর জুলুম করলুম—বকুনি দিলুম... পায়ে হাত দিয়ে মান ভাঙাতে হবে না।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু গরীব মানুষের পক্ষে পুরুষ হওয়াও যা মেয়ে হওয়াও তাই।

—কিন্তু তোর ওপরেও আমার হিংসে হয় ভূতনাথ।

ভূতনাথের হাসি পেলো। তার ওপরেও হিংসে! এতদিন পর্যন্ত নিজের বলতে একটা আশ্রয়স্থল হলো না। সংসার করা তো দূরের কথা। বড়বাড়ির গলগ্রহ সে! বিধু সরকারের দৃষ্টির সামনে পড়লেই এড়িয়ে চলতে হয়। ভাত খেতে গিয়েও যেন গলা দিয়ে নামে না। বড়বাড়িতে ঢুকতে বেরুতে পর্যন্ত লজ্জা করে। ব্রজরাখাল কবে চলে গিয়েছে। তার কাজটাও যদি তাকে দিতো। আজকাল মেজকর্তার ছেলেদেরও আর দেখা যায় না। তারা বুঝি মামার বাড়িতে থেকেই লেখা-পড়া করছে।

বৌঠান বললে—বড় আস্তে আস্তে যাচ্ছে যেন গাড়িটা।

ভূতনাথ গলা বাড়িয়ে বললে—মিয়াজান, জোরসে চালাও—বড়বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার বরানগরে যেতে হবে।

—জী হুজুর—বলে মিয়াজান ঘোড়ার গায়ে সপাং করে চাবুক মারলো, আর হাওয়ার বেগে ছুটতে লাগলো গাড়ি। এবার বৌঠানের সমস্ত শরীর দুলছে। ভূতনাথও দুলছে।

ভূতনাথ বললে—বৌঠান, গাড়িটা উল্টে না যায়।

বৌঠান বললে—উল্টে যাবে না, কিন্তু তা গেলেই বা দোষ কী?

ভূতনাথ বললে—তখন তুমি তো বেঁচে যাবে কিন্তু আমাকেই ধরবে সবাই। বলবে, ঘরের বউ নিয়ে পালাচ্ছিলো!

—আমাকেও কি রেহাই দেবে নাকি? লোক-জানাজানি হবার আগেই তো আমাকে পুঁতে ফেলবে মাটিতে, একেবারে বড়বাড়ির তলায়—নইলে যে বংশে কালি লাগবে। কোনো রকমে বেঁচে যাই তো ডাক্তার-বদ্যি ডাকবে, ওষুধ খাওয়াবে, কিন্তু মরে গেলে পুঁতবে ঠিক মাটিতে, দেখে নিস।

—কেন, পুঁতবে কেন?

বৌঠান বললে—বড়বাড়ি খুঁড়লে কত মানুষের হাড় পাওয়া যায় জানিস না, আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, একবার সুখচর থেকে এক প্রজা এসেছিল কর্তাদের কাছে নালিশ করতে, অন্য প্রজাদের হয়ে কথা বলতে, কর্তারা খাজনা কমাবে না, সে-ও ফিরে যাবে না, না খেয়ে পড়ে রইল ওই দেউড়িতে, দিনের পর দিন খায় না দায় না কিচ্ছু না। কর্তাদের বাইরে বেরুতে অসুবিধে, শেষে চাবুক মারা হলো, গা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো, অজ্ঞান হয়ে গেল, টেনে ফেলে দিয়ে এল বাইরে—তখনও নড়ে না। শেষে আর দেখা পাওয়া গেল না তার। গাঁ থেকে তার ছেলেমেয়ে বউ

এল খবর নিতে, দেশেও ফিরে যায়নি, কিন্তু শেষে শাশুড়ির কাছে শুনলুম—তাকে নাকি পুঁতে ফেলেছে।

—কোথায়?

—বড়বাড়ির খিড়কির দিকে যে-সিঁড়ি আছে, তার তলায়—যেখানে ফেলে দিলে কেউ জানতেও পারবে না—সেখানেই নাকি ফেলে দিয়েছে তাকে।

—কত বছর আগে?

—সে কি আজকের কথা রে, তখন ছোটকর্তা হয়নি, আমিও হইনি, তুইও হোসনি—আর এ কি এক বার?

—এখনও খুঁড়লে পাওয়া যায় তাদের হাড়?

—কে আর সেখানে দেখতে যাচ্ছে বল, ওপর থেকে তো বোঝবার উপায় নেই, কেউ তো আর তার সন্ধান জানে না, জানে শুধু খাজাঞ্চিবাবু আর বড়কর্তারা। প্রজারা বিদ্রোহ করলে যা করবার তা তো করতোই সুখচরে, আর যারা কলকাতা পর্যন্ত দৌড়ে আসতো তাদের জন্যেই ব্যবস্থা ওই বৈকুণ্ঠ। এ-সব আমার শাশুড়ির কাছ থেকে শোনা, শাশুড়ী আবার তাঁর শাশুড়ীর কাছে গল্প শুনেছেন—তাই তো যখন বেশি রাত্তিরে একলা-একলা জেগে থাকি, কিছুতে ঘুম আসতে চায় না, অনেক সময় কী সব শব্দ হয়—মনে হয় যেন কারা অনেক দূর থেকে সুর করে কাঁদছে—শকুনের গলার আওয়াজের মতো—এক-এক সময় বড় ভয় করে।

কথাটা শুনে ভূতনাথেরও মনে পড়লো—সে-ও যেন সে-কান্না শুনেছে একদিন। এই কলকাতা শহরের সব শব্দ যখন থেমে যায়, বড়বাড়ির সমস্ত কোলাহল যখন এক সময়ে ঝিমিয়ে আসে, তখন মনে হয় কোথায় যেন কে নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বড়বাড়ির চারদিকে, সে-শব্দ শুনে যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায় ভূতনাথ। ফতেপুরে গাঙে যাবার পথে শাঁড়া গাছতলায় দাঁড়িয়ে যেমন অনেকবার তার হয়েছে। হঠাৎ বাতাস ভারি হয়ে ওঠে, থেমে যায় গাছের মর্মর শব্দ, পাতার কাঁপুনি। যেন কে এসে কাছে দাঁড়ালো। বোঝা যায় না, দেখা যায় না তাকে। তবু মনে হয় কেউ যেন এল। এসে দাঁড়ালো একেবারে গা ঘেঁষে। তোমার দিকে চেয়ে আছে সে অপলক দৃষ্টিতে। তুমিও চেয়ে আছো। এখানেও আস্তাবলবাড়িতে ঘোড়ারা তখন আর পা ঠোকে না। তোষাখানায় শেষ চাকরটা পর্যন্ত আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে। দক্ষিণের বাগানের ধারে করবী গাছটায় একটা পাখী ডাকতে ডাকতে হঠাৎ আচমকা থেমে গেল। রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত নির্জীব হয়ে পড়েছে কিছুক্ষণের জন্যে। হয়তো ইব্রাহিমের ঘরের সামনের রেড়ির তেলের আলোটা তখন সারা রাত জ্বলে জ্বলে নিভে গিয়েছে। প্রথম রাত্রের দিকে দাসু জমাদারের ছেলের বাঁশিতে সেই 'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে'র সুর তখন থেমে গিয়েছে। ঠিক সেই সময়ে অনেকদিন ভূতনাথের মনে হয়েছে কে যেন বড়বাড়ির ইতিহাসের কালো পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল লোকালয়ে, এসে প্রদক্ষিণ শুরু করলো সারা বাড়িটা। দেউড়ি থেকে শুরু করে খিড়কি। নারকোল গাছটার পাশ দিয়ে দক্ষিণের পুকুরটা ঘুরে দাসু জমাদার আর ধোপাদের ঘরগুলো পেরিয়ে ইব্রাহিমের ঘরের সামনে দিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো একেবারে ঠিক উঠোনটার মাঝখানে। তারপরে আবার কোথায় বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই মনে হয় যেন ছাদের ওপর তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুরু হলো। সারা বড়বাড়ির ছাদের ওপর যেন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয়, ও যেন কিছু নয়। প্রেতাত্মা নয়, স্বপ্নও নয়, বুঝি বড়বাড়ির অভিশপ্ত আত্মা তার অশান্ত অতৃপ্ত কামনা নিয়ে অকারণ পদচারণা করে। বদরিকাবাবুর প্রলাপের মতন আপন চরিতার্থতা খোঁজে এই-সব বিনিদ্র রাত্রে। আর তার পরেই শুরু হয় সেই সুর। বাতাসের শিসের মতন মৃদু। কান্নার মতন করুণ। আশ্চর্য, এতদিন ভূতনাথের মনে হতো ও বুঝি তার নিজেরই কল্পনা, নিছক ভয়-বিলাস, কিন্তু বৌঠানও শুনেছে নাকি! বৌঠানও শুনেছে সেই ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিত।

বৌঠান বললে—একদিন কিন্তু দেখতে পেয়েছিলুম।

—কাকে?

বৌঠান বললে—তখন সবে বিয়ে হয়েছে আমার, সারা রাত ঘুম হয়নি, প্রথম রাত্রের দিকে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসেছি, মনে হলো মেজদি যেন বারান্দা দিয়ে বাইরে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। এখন বাইরে যায় কেন? সন্দেহ হলো। বললুম—কে? ডাকলুম আবার—কে?

—সাড়া নেই।

—আবার ডাকলুম—মেজদি! আমার ডাক শুনেই মেজদি যেন তাড়াতাড়ি সরে যেতে চাইলো। আমি আবার ডাকলুম—কে?

এবার আমার ডাক শুনেই পেছন ফিরে চাইলো মূর্তিটা। তার মুখখানা দেখেই চমকে উঠেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছে। আমার শাশুড়ী তখন বেঁচে। জ্ঞান হতে দেখি, শাশুড়ি মাথার কাছে বসে। বললেন—একলা রাত্রে বাইরে বেরিও না বৌমা—যখনি উঠবে চিন্তাকে সঙ্গে নিও।

ভূতনাথ বললে—আমিও একদিন দেখেছি বৌঠান।

—তুই আর আমিই শুধু দেখেছি—এ-বাড়ির আর কেউ দেখলে না।

সত্যি সত্যি, আর কেউ দেখলে তো এ-বাড়ির ইতিহাস অন্যরকম হতো। এই তো সেদিন হঠাৎ বড়বাড়ি আবার উৎসবের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছিল। এবার অনেক সাহেব, অনেক মারোয়াড়ী এসেছে। সকাল থেকেই হৈ-চৈ হট্টগোল। দেউড়িতে ব্রিজ সিং নতুন উর্দি পরে সেজেগুজে হাজির। সারা বাড়ি ধোয়া মাজা। সাহেবী হোটেল থেকে বিলিতি খানাও এল।

ভূতনাথ প্রথমে বুঝতে পারেনি। বংশীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কী বংশী?

বংশী বললে—কে জানে শালাবাবু, কিছুই তো শুনিনি।

লোচনের আজ বেশি কাজ নেই। এ বিলিতি ব্যাপার। এতে তামাক খাবার আয়োজন নেই। সাহেব-সুবো যারা আসবে সবাই খাবে সিগারেট। তবু নেহাত রাখতে হয়। কেউ যদি চেয়ে বসে। সে-ও তাই ধোয়া-মোছা করে তৈরি হয়ে থাকছে। বলে—বলা নেই কওয়া নেই—এ কী হুজ্জুৎ বলুন তো—আজকে আমার দোকানের বায়না হবার দিন।

—কীসের দোকান লোচন?

—আমার সেই পানের দোকান আজ্ঞে, আমি তো বাড়ি ছেড়ে যেতে পারিনে—হঠাৎ যদি ডাক পড়ে তখন? আমাকে কাল সকালে খবর দিলে সরকারমশাই।

—কী হবে এখানে!

—এই যেমন হয় মাঝে-মাঝে তেমনি আর কি, বাবুরা খাবে-দাবে, গল্প-গুজব করবে—তবে এদানি তো বাবুদের এ-সব বহুদিন ছিল না, আগে ঘন-ঘন হতো, আবার হয়তো খেয়াল হয়েছে—কে জানে!

—তা তামাক খাবে না কেউ? সব সিগারেট খাবে!

—আজ্ঞে, সরকারমশাই তো তাই বললে। আমি বললাম—তামাক আনিয়ে দিতে হবে, শুনে সরকারমশাই বললে—ওই যা-তামাক তোমার আছে ওতেই চালিয়ে নাও, আজ আর সাহেবরা কেউ তোমার তামাক খেতে আসবে না, সিগারেট-চুরোটের খদ্দের সব, বুঝলে।

জিজ্ঞেস করলাম—এ-সব কোন্ সাহেব?

সরকারমশাই বললেন—এ-সব বড় বড় সাহেব, ম্যাকফারলেন সাহেব আসবে কার্টার কোম্পানীর, ফার্গুসন সাহেব আসবে, নতুন এসেছে বিলেত থেকে, মেজবাবুর সব নতুন বন্ধু, আরো সব অনেক আসবে, বড়বাজারের গদি থেকে মারোয়াড়ী মহাজনরাও আসবে, সকলে ফর্সা জামা কাপড় পরবি, নোংরা হয়ে যেন কেউ না থাকে—এই তো শুনলুম শালাবাবু।

সন্ধ্যেবেলা মোটরগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়িতে ছেয়ে গেল বনমালী সরকার লেন। এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত। বিলিতি হোটেলের খানসামা বাবুর্চি গাড়ি করে খাবার-দাবার বয়ে নিয়ে এল। নাচঘরের ভোল গেল বদলে। ফরাস সরিয়ে চেয়ার টেবিল সার-সার সাজানো হলো। টেবিলের ওপর সাদা ধবধবে চাদর। তার ওপর ফুলদানীতে ফুলের তোড়া। গোলাপজল, আতর, ছাইদানী। সিগারেট

চুরোট, পান। আর মদ। বিলিতি হোটেলের খানসামারা বোতল খোলে আর ঢালে গেলাসে। নাচঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরের ব্যাপার বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না কিন্তু। মারোয়াড়ী মহাজন সাহেব-সুবো ছাড়া এবার এসেছে হাবুল দত্ত, ননীলাল। ছুটুকবাবুও এবার আসরে গিয়ে বসেছে। মেজবাবু একাই একশ'। ছোটকর্তা চুপচাপ।

দেখা হতেই ননীলাল মাথা নাড়লে। ভূতনাথ ভিড় ঠেলে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে অনেক সাহেব-মেম। বললে—তোর সঙ্গে পরে কথা হবে ভূতো—দেখা করিস।

তবু কৌতূহল চেপে রাখা শক্ত। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ব্যাপার কী?

ননীলাল বললে—ঝুলিয়ে দিলাম আর কি।

তবু ভূতনাথ বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে?

—শেষ পর্যন্ত কোলিয়ারিতে নামলো ছুটুক—কিন্তু সহজে কি নামতে চায়, বনেদী চালের বংশ তো, হঠাৎ কিছু করবে না, ভয় পায় কেবল, ভাবে সবাই ঠকিয়ে নেবে টাকাগুলো।

—মেজকর্তা রাজি হয়েছে?

—কর্তারাই তো রাজি হতে দেরি করলো—নইলে এতদিনে কবে কেনা হয়ে যেতো। আমি বোঝালাম, হাবুল দত্ত বোঝালে, মেজকর্তা কিছুতেই রাজি হতে চায় না। ঝুমুটমল মারোয়াড়ীকে দিয়ে বোঝালাম, ম্যাকফারলেন সাহেব নিজের কোলিয়ারির ব্যালেন্স শীট দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, টুয়েন্টিফাইভ পার্সেন্ট লাভ দেখেও বুঝতে চায় না। জমিদারীতে তো সেন্ট পার্সেন্ট লাভ পেয়ে আসছে কিনা।

—ম্যাকফারলেন সাহেব বোঝালো—কিন্তু জমিদারীতে চিরকাল এমন থাকবে কিনা গ্যারান্টি কোথায়?

মেজকর্তা বললে—জমিদারী আমাদের হলো লক্ষ্মী—ওইতেই আমাদের পূর্বপুরুষ খেয়ে পরে বাবুয়ানি করে মানুষ হয়ে গিয়েছে—বড়দা' বলে গিয়েছিলেন...

চুড়ো বললে—না কাকা, তোমরা যদি না কিনতে চাও তো আমার শেয়ার আমায় দিয়ে দাও—আমি কিনবো।

শেষে ক'দিন কাকা-ভাইপোতে মনকষাকষি চললো। কথাবার্তা বন্ধ। হাবুল দত্ত ছুটে এসেছে আমার কাছে। শেষে কি অত বড় সংসার ভেঙে যাবে! তা ভেঙে যাবারই মতন অবস্থা। হাবুল দত্তর নতুন জামাই, ভাবনা বেশি। ছোটকর্তা রেগে আগুন। মেজকর্তা আর ছোটকর্তা একদিকে আর অন্যদিকে চুড়ো আর তার শ্বশুর। শুনলাম—বালকবাবু, মানে ওদের উকিলকে ডেকে পরামর্শ হয়েছে আলাদা হবে কিনা। চুড়োর লেখা-পড়া হয় না। সারাদিন কেবল শ্বশুড়ের সঙ্গে ফিসফিস। ক'দিন কী ঝঞ্ঝাটই যে গিয়েছে!

ভূতনাথ বললে—তাই নাকি! আমি তো এ-সবের কিছুই জানতে পারিনি।

এখন সব মনে পড়তে লাগলো। তাই বাড়িময় কর্তাদের মুখে একটা থমথমে ভাব। ক'দিন বড়মাঠাকরুণ হাসিনী ওরা কেউ আসেনি। একলা লোচন তামাক দিয়ে এসেছে। আর মেজকর্তা নিজের মনে চুপচাপ নাচঘরে বসে কাটিয়েছেন। পায়রা উড়তে দেখেনি ভূতনাথ। মোটরগাড়িটা চলে যাবার পর থেকেই এমনি ভাব। সমস্ত বাড়িটা যেন নিঝুম নিস্তব্ধ। ছুটুকবাবুর গানের আসর তো অনেকদিন থেকেই বন্ধ ছিল। মাঝে-মাঝে যদিও বা একটু-আধটু বসতো—তা-ও বন্ধ একেবারে। সেদিন পুকুরের দিকে লোকজন এসে কী-সব মাপ-জোক করে গেল। চেন ফিতে সব নিয়ে এসেছিল ওরা। ভৈরববাবু ক'দিন এসে ফিরে গিয়েছে। চুপি চুপি এসেছে লোচনের ঘরে। তামাক খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেছে—মেজবাবু কী করছে লোচন?

লোচন নল পরিষ্কার করতে করতে বলে—একলা বসে বসে গড়গড়া টানছেন তো দেখে এলাম।

হুঁকোটা রেখে ঠোঁট মুছতে মুছতে ভৈরববাবু বলে—তবে যাই, দেখা করে আসি, কী বলো?

—আজ্ঞে, আমি কী বলবো, আপনার খুশি হয় আপনি যান।

—তবে তুমি কী বলছো, যাবো না?

—আজ্ঞে, আমি চাকর মনিষ্যি, আমার কথায় আপনি যাবেন না কেন?

—তোমাকে মেজবাবু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেনি আমার কথা?

—কই, মনে তো পড়ে না আজ্ঞে।

—কী রকম মেজাজ এখন দেখলে?

এখন সব মনে পড়ছে, কেন সেদিন পঞ্চায়েত বসেছিল নাচঘরে। কেন মোটরটা কেনা হবার পর আবার চলে গেল। কেন বালক উকিল ঘন-ঘন আসে এ-বাড়িতে। সমস্ত ঘটনার যেন একটা পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া গেল।

ননীলাল বললে—সেই কোলিয়ারিই কিনলে, কিন্তু কেনবার আগে আমাকে একবার বললে না—এমনি jealous—জানিস!

—তোকেও বলেনি? ভূতনাথও অবাক হয়ে গেল।

—অথচ ওদের মাথায় বুদ্ধিটা তো আমিই দিই—আমার কাছেই প্রথম আইডিয়াটা পায় চূড়ো, আর শেষকালে আমাকেই জানালে না। ভাবলে পাছে আমি কিছু কমিশন মারি—অনেক টাকার তো কারবার।

—শেষকালে কার কাছে কিনলে?

—লাভ যা-কিছু পেলে ঝুমুটমল। আমি তো সেই কথাই বলেছিলুম চূড়োকে, চূড়ো বললে—আমার তো একার সম্পত্তি নয়, কাকারা আছে এর মধ্যে। মেজকর্তার বন্ধুবান্ধব আছে, তারাই পরামর্শ দিয়েছে।

—ছুটুকবাবুর শ্বশুর কিছু জানতে পারেনি?

—হাবুল দত্ত? হাবুল দত্তকে পর্যন্ত জানায়নি কিছু। যা করবার সব করেছে মেজকর্তা, মেজকর্তা বাড়ির বড়, কে তার ওপরে কথা বলবে? কিন্তু চূড়ো মনে মনে রেগে আছে।

—আর ছোটকর্তা?

—ছোটকর্তা কোনোকালে কোনো দিকেই নেই, টাকা এলেই হলো তার। টাকা যতক্ষণ হাতে পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ কিছু বলবে না। এই যে এত উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার হলো, কোর্ট-ঘর হলো, ছোটকর্তা তো কিছুতে নেই। দলিলে সই দিয়েই খালাস, ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকতে চায় না ছোটকর্তা। আজকেও যে এত লোকজন আসছে, খানা-পিনা ডিনার-ড্রিঙ্ক চলছে, ছোটকর্তা খানিক থেকেই সরে পড়েছে—বেশি কথা বলে না কখনও, কিন্তু মনে মনে সব বোঝে।

তারপর সে-উৎসব শেষ হলো অনেক রাত্রে। কখন সভা ভেঙেছে, কখন লোকজন চলে গিয়েছে, ননীলাল চলে গিয়েছে, ফুর্তি হয়েছে, নাচ-গান হয়েছে, ভূতনাথ টের পায়নি। যে-বাড়িতে পুতুলের বিয়েতে হাজার বারোশ' টাকা খরচ হয়ে যায়, সেখানে নতুন ব্যবসায়ে নামার আগে এমন উদ্বোধন-উৎসব হবে তাতে আর বিচিত্র কী! কোথায় আসানসোল না বেহারে কয়লার খনি, মাটির গর্ভে রত্ন লুকোনো আছে, কতখানি তার পরিধি, কেমন তার চেহারা, কাগজ-পত্রে তার চূড়ান্ত চুলচেরা হিসেব লেখা আছে। বড়বাড়ির সিন্দুকে সে দলিল চাবি-বন্ধ হয়ে গেল। আর ওদিকে সুখচরের বিলের জলে আর হয়তো শালুক ফোটে না, সেখানে মাছ ধরে না জেলেরা, শুকিয়ে ডাঙা হয়ে গেল বিল, বাদায় বাঘ এলে তাড়াবার ভার নেবে না কেউ, তবু অজন্মা হলে খাজনার টাকা কেউ মকুব করবে না তা বলে। সুখচরের কাছারিবাড়িতে নতুন নায়েব, নতুন গোমস্তা, নতুন পাইক বরকন্দাজ। সকালবেলা প্রজা-পাঠকরা অবাক হয়ে দেখবে আর এক চেহারা, আর এক মনিব। সুখচর হয়তো তেমনিই থাকবে, শুধু রাতারাতি যে হাত-বদল হয়ে গেল প্রজারা তা টেরও পেলে না। ভূমিপতি চৌধুরীর পূর্বপুরুষ একদিন মোগল বাদশা'র কাছে সনদ পেয়েছিল, পেয়েছিল কোতল-কচ্ছলের অধিকার, সাতটা হাতী রাখবার স্বাধীনতা। তারপর কালের চক্রান্তে সে-মোগল বাদশারা চলে গিয়েছে, এসেছে ইংরেজ। ইংরেজ আমলে ভূমিপতি চৌধুরী পেয়েছেন নুনের আর সোরার বেনিয়ানি। সুখচর আর কলকাতা, মাঝখানে একটা অদৃশ্য সেতু রচনা হয়েছিল বহুদিন থেকে। গ্রাম থেকে লোক আসতো বিয়ে শ্রাদ্ধে, কাজকর্মে সেলামী দিতে, নজরানা দিতে, বেগার খাটতে। এবার

থেকে তা-ও ছিন্ন হয়ে গেল! চৌদ্দ পুরুষের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল একদিনে। এবার বড়বাড়ির চৌধুরীরাও বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করবেন। এবার কল-কারখানা খুলবেন সাহেবদের মতো। মেশিন চলবে, কুলী-মজুর খাটবে, টাকা বাচ্চা পাড়বে, লেনদেন হবে। এ-উৎসবে সেই আগামী বৃহত্তর সম্ভাবনার, অনাগত প্রচুরতম ঐশ্বর্যের। তখন এমন বড়বাড়ির মতো আরো দশটা বাড়ি উঠবে কলকাতা শহরে। আস্তাবল মোটরে ভরে যাবে। আরো চাকর, আরো ঝি, আরো মদ, আরো মেয়েমানুষ। আরো বিলাস, আরো বিশ্রাম, আরো অবসর আর আরো অপচয়। রাজাবাহাদুর হয়েছে বৈদুর্যমণি, এবার 'নাইট' হবেন হিরণ্যমণি! টাকা উপায়ের জন্যে ছুটুকবাবুকে এটর্নিশিপ পরীক্ষা দিতে হবে না। সকলের ওপর টেক্কা দিতে পারবে এরা। খনি যদি তেমন চালু হয় তো ট্যাক্স বাদ দিয়েও ঘরে যা উঠবে তাতেই লাল। প্রজাদের বিদ্রোহ করবার ভয় নেই, অজন্মা হওয়ার আশঙ্কা নেই, দুর্ভিক্ষ প্লাবন মহামারী কিছুরই পরোয়া করবার দরকার নেই। সমস্ত দুনিয়া কয়লা চায়। নতুন কাপড়ের কল হবে, কয়লা চাই তাদের। রেল চলবে, কয়লা চাই তাদের। কাগজ কল, পাট কল, জলের কল—সকলেরই চাই কয়লা।

এত কথা প্রথমে বুঝিয়েছিল ছুটুকবাবুকে ননীলাল।

তারপর বুঝিয়েছে ঝুমুটমল মারোয়াড়ী। শেষ পর্যন্ত ঝুমুটমল-এরই জয় হয়েছে।

—সেলাম হুজুর—

ভূতনাথ চমকে উঠেছে। ইলিয়াস দরজা খুলে সরে দাঁড়িয়েছে পাশের দিকে।

বৌঠান বললে—নামতে হবে ভূতনাথ, বংশীকে বল গিয়ে—পুঁটলিটা আমার পালঙ-এর ওপর রাখা আছে।

ভূতনাথ যেন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেলে। গাড়ি থেকে নেমে বললে—মিয়াজান, গাড়ি যেন তুলে ফেলো না, আবার যেতে হবে বরানগরে।

ব্রিজ সিং খবর পেয়েই খিড়কির চাবি খুলে দিতে এসেছিল। ব্রিজ সিংকে দেখে বৌঠান মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে। গাড়ি খিড়কির দরজায় গিয়ে ঠেকলো। সেই নারকোল গাছটার নীচে এসে দাঁড়ালো ভূতনাথ। এরই কাছে সেই সিঁড়ির তলায় কোথায় সেই ঘরখানা। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। সেই সুরটা বুঝি এখান থেকেই ওঠে। বৌঠান বললে—কী দেখছিস, বংশীকে ডাক।

কিন্তু ততক্ষণে চিন্তা গাড়ির শব্দ পেয়েই নেমে এসেছে। চোখে মুখে তার ব্যস্ততা। ফিস ফিস করে গাড়ির কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—ছোটমা, ছোটবাবু এসেছে।

—ছোটবাবু?

ছোটকর্তা! এই তো বিকেলবেলা ল্যান্ডোলেট নিয়ে চলে গেল বংশীর কাছ থেকে চাবুক চেয়ে নিয়ে। আজ তো জানবাজারের চুনীদাসীর কাছে তার রাত কাটাবার কথা। এখনি ফিরে এলেন যে!

বৌঠান বললে—বংশী কোথায়?

—সে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, তুমি একটিবার নামো ছোটমা।

—কেন, কী হয়েছে বল তো খোলসা করে।

—তোমাকে নামতে হবে ছোটমা, সব বলছি—ছোটবাবুর শরীর ভালো নেই।

—সে কি! বৌঠান এবার নামলো গাড়ি থেকে। তারপর লম্বা ঘোমটার আড়াল দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল চিন্তার আগে আগে। ভূতনাথ একবার দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ সেইখানেই। বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ দেরি হবে বৌঠানের কে জানে! ছোটকর্তার আবার কী অসুখ হলো!

মিয়াজান বললে—গাড়ি এখানে থাকবে শালাবাবু?

—রাখো গাড়ি, আমি গিয়ে দেখে আসছি।

খিড়কির গেট পেরিয়ে আবার সদর গেট দিয়ে বারবাড়িতে ঢুকলো ভূতনাথ। সত্যি-সত্যি আস্তাবলে ছোটবাবুর ল্যান্ডোলেট তখন দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন সন্দেহ হলো। এমন তো হবার কথা নয়। কোথা থেকে যেন এই দুর্ঘটনা এসে হঠাৎ সমস্ত গোলমাল করে দিলে। অথচ বংশীরও দেখা নেই। ছুটুকবাবুর বৈঠকখানা ঘরটা আজও অন্ধকার। চলতে চলতে তোষাখানার দিকে গেল ভূতনাথ। লোচন তখন কাজ করছিল আপন মনে। ভূতনাথকে দেখতে পায়নি। না পাক, এখন দেখতে পেলে আবার অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করে দেবে। বংশী বোধ হয় তোষাখানাতেই আছে। নয় তো ছোটবাবুর তদ্বির-তদারকে গিয়েছে।

উঠোনের মধ্যে একবার খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালো ভূতনাথ।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ির ঘণ্টার শব্দে যেন চমক ভাঙলো। মেজকর্তা ঢুকছে নাকি! কিন্তু এমন সময় মেজবাবুই বা আসবে কেন!

—হটো, হট যাও—বাবুজী!

এক পাশে সরে দাঁড়ালো ভূতনাথ। গাড়ি গিয়ে থামলো গাড়িবারান্দার তলায়। ভূতনাথ ভালো করে দেখলো। এ তো অচেনা গাড়ি। ঘোড়া দুটোও যেন রোগা-রোগা। বড়বাড়ির ঘোড়ার মতো চেহারা নয় এদের। গাড়ি থেকে প্রথমে নামলো বিধু সরকার। তার পেছনে পেছনে নামলো শশী ডাক্তার। বৌবাজারের শশী ডাক্তার। এ বাড়িতে শক্ত অসুখ-বিসুখ হলে শশী ডাক্তার মাঝে মাঝে আসে বটে। কিন্তু কার আবার অসুখ হলো? বিধু সরকারের একটু তটস্থ ভাব। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমেই ওষুধের বাক্সটা হাতে তুলে নিলে। সামনে কে যেন পড়তেই খেঁকিয়ে উঠলো—সরো দিকি সামনে থেকে—পায়ে পায়ে ঘোরা দেখতে পারিনে।

যে সামনে এসেছিল সে একলাফে সরে পড়েছে।

বিধু সরকার বললে—আসুন ডাক্তারবাবু—চলে আসুন।

শশী ডাক্তারকে নিয়ে বিধু সরকার ভেতরে ঢুকে গেল।

ভূতনাথ তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আজ যেন সমস্ত বড়বাড়িটা বড় নিঝুম নিঃসঙ্গ মনে হলো। কই, কারো তো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথায় সব?

হঠাৎ লোচন এদিকেই আসছিল। ভূতনাথকে দেখেই হাউ-মাউ করে উঠলো—আজ্ঞে—শালাবাবু আপনি এখানে? কোথায় ছিলেন সন্ধ্যেবেলা?

লোচনের মুখের ভাব-ভঙ্গী দেখে কেমন যেন ভয় হলো ভূতনাথের। বললে—কেন কি হয়েছে?

—আজ্ঞে, ছোটবাবু যে খুন হয়ে গিয়েছে।

—খুন! ভূতনাথ যেন সামনে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলো।

—আজ্ঞে, রক্তে ছোটবাবুর কাপড় চোপড় ভেসে গিয়েছে একেবারে। ওই তো শশী ডাক্তার এল—দেখি গিয়ে কী বলে।

কথা বলতে বলতে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে চলে যাচ্ছিলো লোচন।

—শোনো, শোনো—ও লোচন—শুনে যাও!

লোচন চলতে গিয়ে থেমে দাঁড়ালো আবার। বললে—যাই, শশী ডাক্তারকে তামাক দিয়ে আসি, ডাক্তারবাবু আমার তামাকের খুব তারিফ করেন আজ্ঞে, আমাদের বাড়ি এলে আমার হাতের তামাক না খেয়ে নড়বেন না। সেবার অত বড় অসুখটা হলো মেজবাবুর...

ভূতনাথ থামিয়ে দিলে। বললে—থামো, সে কথা পরে হবে। কী হয়েছে ছোটবাবুর খুলে বলো দিকি আগে।

লোচন বললে—যান না, বংশীর কাছে সব শুনবেন যান।

—বংশী কোথায়?

—বংশী কি আর দাঁড়াতে পারছে আজ্ঞে, তোষাখানায় যান, দেখুন গিয়ে কী কাণ্ড হয়েছে তার।

—বংশীর আবার কী কাণ্ড হলো?

লোচন বললে—বংশীরই তো দোষ আজ্ঞে, আমি বলবো বংশীরই দোষ—হাজার বার বলবো বংশীর দোষ, এদিকে ছোটবাবুর সর্ব্বাঙ্গ রক্তারক্তি, তার ওপর বাড়িতে ঢুকে বাবুর দেখা নেই, ওদিকে ছোটবাবু বাড়িতে নেই তো ও যেন সাপের পঞ্চাশ পা দেখেছে। তাস খেলছিল বসে-বসে তোষাখানায়—অন্যায় তো বংশীরই আজ্ঞে—বেশ করেছে মেরেছে ছোটবাবু।

—কে মেরেছে বললে?

লোচনের এক হাতে গড়গড়া আর-এক হাতে কল্‌কের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বললে—মেরেছে বেশ করেছে—আলবাৎ মারবে, ছোটবাবু বলে তাই চাবুক দিয়ে মেরেছে—মেজবাবু হলে ওকে আজ খুন করে ফেলতো হুজুর। রাগে লোচন জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগলো কল্‌কের মাথায়। বললে—খুব করেছে মেরেছে—ওর কেবল ছোটমা আর ছোটমা। আরে ছোটমা যেন তোর মনিব—খাওয়ায় পরায় কে তোকে? সত্যি কথা বলুন তো, আপনি তো বিজ্ঞ লোক, মাইনে দেয় ছোটমা, না ছোটবাবু? বলুন আপনি।

চুলোয় যাক বাজে কথা। ভূতনাথের রাগে গা গিস গিস করতে লাগলো।

লোচন বললে—বাড়ির মালিক তো ছোটমা নয়, মালিক হলেন ছোটবাবু—নাকি বলুন, আজ্ঞে। যাই, আমি আগে তামাকটা দিয়ে আসি আজ্ঞে। টিকে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল এদিকে।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ছোটবাবুর রক্তারক্তি কেন হলো জানো কিছু?

লোচন বললে—আমিও তো তাই বলি—ছোটবাবুকে দেখলাম গাড়ি হাঁকিয়ে গেল, হাতে চাবুক নিয়ে, আমি তখন মেজবাবুর জন্যে তামাক সেজে নিয়ে যাচ্ছি কিনা—আমার তখন মাথার ঠিক নেই শালাবাবু। এদিকে নতুন তামাক এসেছে আজ একেবারে ভুষো মাল, যতবার সাজি ততবার আঠার মতো আঙুলে আটকে যায়, তামাক হবে ঠিক যেন পুরনো খেজুরের গুড়—পুরনো খেজুরের গুড় দেখেছেন? তা নয়, এ যেন বটের আঠা একেবারে, হাতে লাগলে...

ভূতনাথ বিরক্ত হয়ে সোজা চলে এল তোষাখানায়। তোষাখানার চারদিকে তখন বেশ ভিড় জমেছে। মধুসূদন দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামসুন্দর, বেণী সবাই আছে। নাথু সিংও দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে।

ভূতনাথ ভিড় ঠেলে একেবারে বংশীর সামনে গিয়ে হাজির।

বংশীর মাথায়, পিঠে তখন জলপটি।

ভূতনাথকে দেখেই বংশী হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো।

ভূতনাথ কাছে গিয়ে বসে বললে—কাঁদিসনে বংশী—থাম।

বংশী বললে—আপনি এসে গিয়েছেন শালাবাবু, ছোটমা এসেছে?

—এসেছে, এসেছে—কিন্তু এ কী হলো তোর বংশী?

বংশী তবু হাউ-মাউ করে কাঁদে। মুখ দিয়ে ভালো করে কথা বোরোয় না কান্নার চোটে।

ভূতনাথ বললে—কী হয়েছে তাই ভালো করে বল না আমায়।

বেণী বললে—আমার কাছে শুনুন তবে শালাবাবু, ছোটবাবু ওকে খুব পেটান পিটিয়েছেন চাবুক দিয়ে, দেখছেন না সারা গায়ে মুখে দাগড়া-দাগড়া দাগ বেরিয়েছে?

ভূতনাথ মুখ ঘুরিয়ে বেণীর দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু কেন, মারলে কেন ছোটবাবু হঠাৎ?

—আজ্ঞে, গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে গাড়িবারান্দায়—ছোটবাবু ডেকেছেন কয়েকবার, সাড়া পাননি—কে ধরবে, কে ধরে নামাবে। বংশী তখন ভেবেছে ছোটবাবু নেই বাড়িতে, তাস খেলছে এখেনে বসে বসে—ওদিকে হুঁশ নেই। তারপর আমি যাচ্ছিলুম, দেখি ছোটবাবুর জামায় কাপড়ে রক্ত—কপালে মাথায় রক্ত—রক্তে ভাসাভাসি—আমি তো দেখেই ধরলুম গিয়ে।

—তারপর?

—তারপর যখন আমি ধরে নামিয়েছি, তখন দৌড়ুতে দৌড়ুতে বংশী গিয়েছে সামনে। আর যাঁহাতক বংশীকে দেখা, আর শঙ্কর মাছের ল্যাজের চাবুক ছিল হাতে, তাই দিয়ে বংশীকে শপাং শপাং করে মার—এক বার, দু' বার, তিন বার... পঞ্চাশ বার—মারতে মারতে ছোটবাবু পড়ে গেলেন

আজ্ঞে মাটিতে।

—তারপর?

—তারপর বংশী আবার ধরে তুললে ছোটবাবুকে। ছোটবাবু উঠেই আবার মার, দৌড়ে এল সব লোক, যে-যেখানে ছিল, আমার তো তখন শরীর থর থর করে কাঁপছে শালাবাবু। বংশী মার খাচ্ছে আর জোরে জোরে জাপটে ধরছে ছোটবাবুকে—যাতে ছোটবাবু আবার না পড়ে যায়—শেষে—

বংশী হাউ-হাউ করে কাঁদছিল আর বলছিল—ছোটবাবুর যদি চেহারা দেখতেন শালাবাবু—রক্তে একেবারে ভেসে গিয়েছে গা—কী যে হবে শালাবাবু!

মধুসূদন এক ধমক দিলে—থাম তুই বংশী—কাঁদিসনে পাগলের মতন।

ধমক খেয়ে চুপ করে গেল বংশী।

বেণী বললে—কিন্তু সেই অবস্থায়ও বংশী ছোটবাবুকে ধরে তুলে নিয়ে গেল ঘরে। তারপর তো এই অবস্থা—এখন জলপটি দিচ্ছি। আমাকে যেবার মেজবাবু মেরেছিল—মনে আছে কাকা? সেবার তো জলপটি দিয়ে দিয়েই সারলো—রাগলে তো মাতাল মানুষদের জ্ঞান থাকে না।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ছোটবাবুর রক্তারক্তি কেন হলো—কিছু জানো?

উত্তর দিলে বংশী। বললে—উঃ, ছোটবাবুর কী কষ্টটাই যে হচ্ছে শালাবাবু—আপনি দেখলে আপনার চোখ দিয়ে নিঘ্যাৎ জল গড়াতো আজ্ঞে।

মধুসূদন ধমক দিলো—থাম দিকি তুই, লজ্জা করে না তোর কথা বলতে!

—আমার লজ্জা হবে কেন কাকা, আমি দোষ করেছি তাই মার খেয়েছি—কী বলেন শালাবাবু? কিন্তু ছোটবাবুর কষ্টটার কথা তোমরা একবার ভাবো দিকিনি।

ভূতনাথ কিন্তু তখনও ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারেনি। বললে—কিন্তু ছোটবাবুর রক্তারক্তি হলো কিসে বেণী?

বেণী বললে—আজ্ঞে, গাড়ি বোধ হয় উল্টে গিয়েছিল—নেশা করা তো ছিলই—ঠিক ঠাহর হয়নি হয়তো রাস্তা।

বংশী কাঁদতে কাঁদতে বলে—এখন কেমন আছে ছোটবাবু? শশী ডাক্তার এসেছে?

মধুসূদন ধমকে উঠলো—তুই থাম তো বংশী, তোর নিজের ঘা সামলা আগে—বলে, মরে যাসনি এই ঢের, যে-মার খেয়েছিলিস!

লোচন দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। হাঁফাচ্ছে। বললে—সব্বনাশ হয়েছে কাকা, পুলিশ এসেছে।

পুলিশ! একসঙ্গে যেন সবাই বলে উঠলো। পুলিশ কেন! লোচন বললে—দেখো গে গিয়ে, বারবাড়ির উঠোন একেবারে ছেয়ে গিয়েছে লোকে। দারোগা সাহেব কথা বলছে সরকারমশাই-এর সঙ্গে।

বেণী, শ্যামসুন্দর, মধুসূদন—সবাই দৌড়ুলো। শুধু দাঁড়িয়ে রইল লোচন। বংশী ভূতনাথের দিকে চেয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠলো আবার। ভূতনাথ বললে—কাঁদিস কেন রে? খুব কষ্ট হচ্ছে?

—শালাবাবু, কী হবে?

—কীসের কী হবে?

—পুলিশ যদি ছোটবাবুকে ধরে?

—ছোটবাবুকে ধরবে কেন? ছোটবাবু কী করেছে যে, ধরতে যাবে তাকে?

—তবে পুলিশ এল কেন?

—আরে, পুলিশ তো দু'বেলা আসছে বাড়িতে, দারোগা তো মেজবাবুর বন্ধু।

বংশী তাতেও যেন সান্ত্বনা পেলে না। বললে—আজ যে ছোটবাবু রক্তারক্তি করেছে।

ভূতনাথ বললে—দূর, গাড়ি উল্টে পড়ে গিয়েছে তা রক্ত পড়বে না—ছড়ে গিয়েছে হয়তো হাত-

পা।

—না শালাবাবু, লোচন কাছে সরে এল। গলা নিচু করে বললে—না শালাবাবু, তা না।

লোচনের ভাব-ভঙ্গি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো ভূতনাথের। বললে—কী হয়েছে তবে?

—আজ্ঞে কাউকে বলবেন না—বলে লোচন একবার চারদিকে দেখে নিলে।

—না, কাউকে বলবো না, বল।

—ছোটবাবু খুন করেছে।

—কাকে?

কিন্তু কাকে খুন করেছে সে-উত্তর আর দেওয়া হলো না। ভীষণ গোলমাল হচ্ছে। যেন অনেক লোক জমায়েত হয়েছে বড়বাড়ির উঠোনে। লোচন সেই দিকেই ছুটলো।

ভূতনাথ বললে—দেখে আসি বংশী, কী হচ্ছে বাইরে।

বংশী বললে—যাবেন না শালাবাবু, পুলিশের হাঙ্গামা ওখানে। তারপরে বললে—ছোটমা ফিরে এসেছে শালাবাবু?

—ফিরে এসেছে।

—ছোটমা শুনেছে সব?

—কি জানি, তা যাবো একবার বৌঠানের সঙ্গে দেখা করতে?

—আপনি বরং ছোটবাবুকে একবার দেখে আসুন শালাবাবু, ছোটবাবুর জন্যে মনটা কেমন করছে আমার। আচ্ছা শালাবাবু, ছোটবাবু বাঁচবে তো!

বাইরে যেন আবার গোলমাল শোনা গেল। ভূতনাথ উঠলো এবার। বললে—আসছি আমি বংশী। কী হচ্ছে ওদিকে, দেখে আসি একবার।

তোষাখানার বাইরে এসে দাঁড়ালো ভূতনাথ। চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে। শশী ডাক্তারের গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি-বারান্দার তলায়। ইব্রাহিম দোতলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াসিনও দাঁড়িয়ে দেখছে। মিয়াজান, আব্বাস, ইলিয়াস তারাও উঠোনে ভিড় করেছে। লাল পাগড়ি পরা দু'চারটে পুলিশ গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে লাঠি। খাজাঞ্চিখানার ভেতর আলো জ্বলছে। দরজার সামনে—সেখানেও ভিড় জমেছে। দারোগা সাহেব বোধ হয় ওখানে ঢুকেছে। সারা বাড়িতে যেন একটা চাপা চাঞ্চল্য। ভূতনাথ আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে এল।

কে যেন সামনে আসছিল। সামনে আসতেই চেনা গেল। মধুসূদন।

—কী খবর মধুসূদন?

—সব্বনাশ হয়ে গিয়েছে শালাবাবু!

—কী হলো?

—চুনীদাসী খুন হয়ে গিয়েছে শুনছি। আমি যাচ্ছি সেখানে।

—চুনীদাসী!

—শুনছি তো। কী জানি, কী ব্যাপার।

—কে খুন করলে?

মধুসূদন বললে—শুনছি ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্তর সঙ্গে নাকি মারামারি হয়েছে ছোটবাবুর।

—নটে দত্ত?

—আজ্ঞে, ছোটবাবু আজ জানবাজারে গিয়ে দেখে নটে দত্ত নাকি চুনীদাসীর ঘরে বসে আছে—দেখে বোধ হয় আর রাগ সামলাতে পারেনি। তারপর মারামারি হয়েছে দু'জনে। ও-পাড়ার গুণ্ডারা তো সব নটে দত্তর হাতের মুঠোয়, এদিকে ছোটবাবু তো একলা—তা ছেনি দত্তদের সঙ্গে এ-বাড়ির ঝগড়া তো আজকের নয়। সেই দেখলেন না ছুটুকবাবুর বিয়ের সময় কী কাণ্ডটা হলো!

—কিন্তু খুনটা করলে কে?

—কে করলে, কে জানে, হয় নটে দত্ত, নয় ছোটবাবু।

ভূতনাথ বললে—চুনীদাসী কি মারা গিয়েছে?

মধুসূদন বললে—শুনছি তো এখনও জ্ঞান আছে—যাই, তাড়াতাড়ি একবার দেখে আসি গিয়ে। বড় ভালোমানুষ ছিল আজ্ঞে—বলে মধুসূদন চলে গেল।

ভূতনাথ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। একবার মনে পড়লো চুনীদাসীর কথা। সেদিনকার সেই দেখা, তারপরেই এ কী কাণ্ড! চুনীদাসীকে সেদিন সত্যি-সত্যি বিশেষ খারাপ লাগেনি তার। কী চমৎকার ব্যবহার। খাতির করেছে খুব। কীসে ভূতনাথের সুবিধে হয় সেই কথাই বলেছে বার বার। তামাক খাবার কথা বলেছে। জল চেয়েছিল, দিয়েছে সরবৎ। তা সরবতে কী দোষ থাকতে পারে। হয়তো সিদ্ধি মেশানো ছিল সামান্য। যারা সিদ্ধি খায় তাদের নেশা হয় না। কিন্তু ভূতনাথের তো অভ্যেস নেই। হয়তো মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল। কিন্তু তারপরে চুনীদাসী নিজে তার মাথাটা কোলে করে নিয়ে কত যত্ন করেছে। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিয়েছে। কে অমন করে! ভূতনাথকে আদর-যত্ন করে তাদের কী লাভ? আর তারপর যদি নটে দত্ত আসার জন্যে তাকে ঘর থেকে বাইরে চলে যেতে বলেই থাকে তো এমন-কিছু অন্যায় করেনি। ছোটবাবু যাওয়া বন্ধ করলে ওদের চলে কী করে? সংসার তো চলা চাই। অত চাকর, ঝি, নিজে, আবার একটা পাখী! খরচ কি কম! গাড়িটা পর্যন্ত বেচে দিতে হলো!

আস্তে আস্তে ভূতনাথ একেবারে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

ছুটুকবাবু তখন বাড়িতেই ছিল। খবর পেয়ে নিচে এসে গিয়েছে। হাবুল দত্ত রোজকার মতো বড়বাড়িতে এসেছিল। পেছন পেছন সে-ও এসে দাঁড়ালো।

দারোগা সাহেবের সঙ্গে ছুটুকবাবুর কী সব কথা হচ্ছে।

এমন সময় হৈ চৈ শুরু হলো।—হটো, সব ভিড় ছাড়ো—

একটা সোরগোল উঠলো। ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণে যেন একটা আশার সঞ্চার হলো হঠাৎ! মেজবাবু এসে গিয়েছে!—ওই মেজবাবু এসে গিয়েছে, মেজবাবু এসে গিয়েছে!

এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো সকলের। মেজবাবু থাকলে কি এতক্ষণ পুলিশের সঙ্গে এত কথা কাটাকাটি হয়! কতবার কত কাণ্ড হয়ে গিয়েছে আগে। সুখচরে খুন হয়েছে প্রজাপাঠক, প্রজারা কাছারিবাড়িতে এসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই বাড়িতেই যেবার দুর্গাপূজোর সময়ে নবমীর রাত্রে মেজমা'র পুরনো ঝি বিলাসীবালা গলায় দড়ি দিয়েছে, অন্দরমহলের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে শরীরটা—সেদিনও অনেক পুলিশ-থানার হেফাজত থেকে বাঁচিয়েছে এই মেজবাবুই। মেজবাবু এসে পড়াতে ভূতনাথও অনেকখানি স্বস্তি পেলো যেন। যাক, মেজবাবু এসেছে, বাঁচা গিয়েছে।

মেজবাবুর গাড়ি গড়গড় করে একেবারে গাড়ি-বারান্দার তলায় শশী ডাক্তারের গাড়ির পেছনে এসে থামলো। দারোগা সাহেব খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছে। মেজবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। পেছনে ভৈরববাবু। দারোগা সাহেব সামনে এসে সেলাম করলো একবার। মেজবাবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা ওপরে উঠে গেলেন। ভৈরববাবুকে বললেন—ছোটবাবু কেমন আছে আগে দেখে আসি।

ভৈরববাবু বললে—কী হয়েছে দারোগা সাহেব?

দারোগা সাহেব বললে—জানবাজারে খুন হয়েছে সন্ধ্যেবেলা।

ভৈরববাবু বললে—খুন হয়েছে জানবাজারে, তা এখানে কেন?

—কৌস্তুভমণি চৌধুরীর স্টেটমেন্ট নেবো।

—খুন করেছে কে?

—সেই ইনভেস্টিগেশন করতেই তো এসেছি।

খানিক পরেই ডাক এল। বেণী এল। দারোগা সাহেবকে বললে—আপনাকে মেজবাবু ওপরে ডাকছেন।

দারোগা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত ঘটনার ওপর একটা যবনিকা পড়ে যায়। যে যার জায়গায় চলে যায় একে একে। এবার আর কোনো ভয় নেই। মেজবাবু দারোগা সাহেবকে ওপরে

ডেকে নিয়ে গিয়েছে। দারোগা সাহেবই আসুক আর লাটসাহেবই আসুক, একবার নাচঘরে গিয়ে বসলে জলের মতো সোজা হয়ে যাবে সব। কতবার সব সমস্যার সমাধান ওইখানে হয়ে গিয়েছে নিঃশব্দে। কতদিন সব সন্দেহের নিরসন হয়ে গিয়েছে ওই ঘরের নির্জনে।

আবার আস্তে আস্তে উঠোনটা নিরিবিলি হয়ে এল। আবার নির্জন হয়ে এল বড়বাড়ি। টিমটিম করে ইব্রাহিমের ঘরের সামনের বাতিটা তেমনি জ্বলতে লাগলো। রাত নেমে এল ঘন হয়ে। শশী ডাক্তার কিন্তু তখনও যায়নি। ঘোড়াটা মাথা নিচু করে ঘাস খেতে খেতে এক-একবার পা ঠোকে। ইঁটের দাগরাজি করা মেঝের ওপর তার পা-ঠোকার শব্দ যেন অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আর পুলিশ ক'টা তখনও দাঁড়িয়ে আছে গেট-এর কাছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খৈনি খাচ্ছে।

একা একা নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় ভূতনাথের। এত দুর্ঘটনা, এত উত্তেজনার মধ্যেও কেন নিজেকে এত দুর্বল মনে হয় কে জানে। যেন কোথাও কেউ নেই। এত বড় বাড়ি—তবু যেন মনে হয় এখানে অরণ্যের স্তব্ধতা। সেই আদিম কলকাতার প্রাগৈতিহাসিক চেহারা যেন ফিরে এসেছে। ভূমিপতি চৌধুরী এ-বাড়ি তৈরি করবার আগেকার চেহারা। যেন ডোবা-পুকুর, চারপাশে ব্যাঙ ডাকছে নির্ভয়ে। দু'একটা হিজল আর হোগলা গাছের ঝোপ-ঝাড়। তাঁতিদের কুঁড়েঘর কয়েকটা। সন্ধ্যে হতে-না-হতে বাঘের ভয়ে ঘরের ভেতর সেঁধিয়েছে সবাই। অথচ ভূতনাথের চোখের ওপরেই তো এই শহর বেড়ে চলেছে। হ্যারিসন রোডটা চোখের সামনে গড়ে উঠলো। কলের জল, বড় বড় রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, কলের ট্রাম—ধনে-জনে কলকাতায় কত ভিড় বাড়লো, বস্তি ভেঙে নতুন নতুন বাড়ি হলো, পুকুর ডোবা, খানা-খন্দ বুজিয়ে খেলার মাঠ হলো। বেড়াবার পার্ক হলো। তবু এই রাত্রিবেলা বড়বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সে যেন কলকাতা শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে অনেক পেছনে চলে গিয়েছে। শহর, সভ্যতা, সমাজ, পরিচিত অপরিচিত সকলের চোখের আড়ালে অন্য এক দেশে। অথচ প্রথম যেদিন এখানে এসেছিল ভূতনাথ, কত আশা ছিল মনে। এই বড়বাড়িকে কত ঈর্ষা করতো! কত উদগ্র কৌতূহল ছিল এই বড়বাড়িকে ঘিরে। কত রাত জেগে জেগে শুনেছে এ-বাড়ির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি শব্দ। ভেতর-বাড়িতে ঝন-ঝন করে হয়তো কারো হাত থেকে কাঁসার থালা-বাসন পড়ে গেল, ছাদের কোণ থেকে পায়রার বক্‌বকম্ শব্দ, দাসু জমাদারের উঠোন ঝাঁট দেওয়ার শব্দটা পর্যন্ত ভালো লাগতো তার। যদুর মা শিল নোড়া নিয়ে বাটনা বেটে চলেছে, সৌদামিনী আনাজ কুটতে কুটতে বক-বক করে গালাগালি দিয়ে চলেছে—পেছনের বাগানে দাসু জমাদারের ছেলের বাঁশিতে 'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে'র সুর, এমনকি পুকুরের ধারে আমলকী গাছে একটা অচেনা পাখীর ডাক—সমস্ত, সমস্ত ভালো লেগেছে। আরো ভালো লেগেছে যখন অনেক রাতে ঘড়-ঘড় শব্দে গেট খুলে যেতো, আর তারপর মেজবাবুর গাড়ি ঢুকতো উঠোনে। যেন অলৌকিক সব ব্যাপার। আর ভোরবেলা নাথু সিং-এর সেই ডন-বৈঠকের আওয়াজ আর নিচে একতলায় আস্তাবলবাড়িতে ঘোড়ার ডলাই-মলাই-এর ক্লপ-ক্লপ, হিস-হিস—থাপ্পড় মারার শব্দ। কিন্তু এ-সমস্ত শব্দতরঙ্গ ছাপিয়ে আর-এক শব্দ উঠতো এক-একদিন। সে কোথাকার শব্দ কে জানে। সেই সুর, সেই শিসের মতো মৃদু আওয়াজ ঘুরে-ঘুরে বেড়াতো সারা বাড়িময়। উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে। সে সুর কেউ শুনতে পায়নি। খিড়কির দিকের একতলার সিঁড়ির নিচে থেকে হয়তো উঠতো। আর শুনতো বুঝি মাত্র দু'জন। একজন ভূতনাথ। আর একজন এ-বাড়িরই লোক—সে পটেশ্বরী বৌঠান!

কিন্তু ওখানে অন্যরকম। ওই জবাদের বাড়িতে। ওখানে গেলেই মনে হয়, জীবনের পথ যেন এখনও অনেকখানি বাকি। যৌবনের যেন শুরু হলো এইমাত্র। ঐশ্বর্য যখন ছিল সুবিনয়বাবুর, তখনও যেন আড়ম্বর ছিল না কোথাও। প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু এমন অপচয় ছিল না। তা ছাড়া আজকাল রাস্তায়, ঘাটে, বাজারেও যেন নতুন জীবন ফিরে এসেছে। কোথায় যেন ভেতরে-ভেতরে কোন্ আন্দোলনের শিখা অনির্বাণ হয়ে জ্বলছে। মাঝে-মাঝে তার প্রকাশ চোখে পড়ে। সিস্টার নিবেদিতা বাগবাজারে স্কুল খুলেছেন। কোন্ এক বিদেশী মেয়ের এ কী বিচিত্র খেয়াল! কিন্তু শুধুই কি খেয়াল? সেদিন বড়বাজারে যারা গান গেয়ে-গেয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলো, তাদেরও কি শুধু খেয়াল? আর-কিছু

নয়? নিবারণরা শুধু কি অকারণেই ভেতরে-ভেতরে অমন জ্বলবার জন্যে তৈরি হচ্ছে?

শশী ডাক্তার বুঝি এবার নামলো। বিধু সরকার ওষুধের বাক্সটা গাড়িতে তুলে দিলো।

একবার মনে হলো বিধু সরকারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—সরকারমশাই, কেমন আছেন ছোটবাবু—কিন্তু ভয় হলো। দরকার কী! লোকটা বিশেষ সুবিধের নয়। সেদিন বদরিকাবাবু খুব জব্দ করেছে বিধু সরকারকে। নিচেই বৈঠকখানা। এদিকে তো এত কাণ্ড, কিন্তু বদরিকাবাবু কী করছে এখন কে জানে! জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে ভূতনাথ।

হঠাৎ সারা কলকাতা কাঁপিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ হলো। রাত ন'টা বাজলো বুঝি। তোপ পড়লো কেল্লায়। চিৎপাত হয়ে শুয়েছিল বদরিকাবাবু। শব্দটা কানে যেতেই চিৎকার করে উঠলো—ব্যোম কালী কলকাত্তাওয়ালী—বলে উঠে বসলো। তারপর ট্যাক থেকে ঘড়িটা বার করে মিলিয়ে নিলো সেটা। তারপর দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকেও একবার তাকালে। সেটাতেও ঢং ঢং করে ন'টা বাজছে তখন। ভূতনাথকে দেখতে পেয়ে ডাকলে—শোন—আয় এদিকে।

ভূতনাথ গিয়ে বসলো তক্তপোশের ওপর। খানিক পরে বললে—শুনেছেন, কী হয়েছে?

বদরিকাবাবু নির্লিপ্তের ভঙ্গিতে বললে—আমি জানতাম।

—আর শুনেছেন, বংশীও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মার খেয়ে!

—আমি জানতাম এ হবে।

—আর চুনীদাসী খুন হয়েছে!

—তাও হবে জানতাম।

বদরিকাবাবু কেমন করে সব জানতো কে জানে!

বদরিকাবাবু আবার বললে—আরো কী কী হবে তাও বলে দিতে পারি, শুনবি?

ভূতনাথের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বদরিকাবাবু বলতে লাগলো—দেখবি, একদিন এই কড়িকাঠ ভেঙে পড়বে, এই বাড়ি গুঁড়ো হয়ে যাবে, বড়বাড়ির ভিটেতে ঘুঘু চরবে, পায়রাগুলো না খেতে পেয়ে মরবে, চাকর-বাকর সবাই পালাবে, যদি না পালায় তো সবাই ইঁট চাপা পড়ে মরবে দেখে নিস—তারপর এই বাড়ি ভেঙে মাটি সমান হবে একদিন, সেই মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে কুলী-মজুরদের, শেষে মাটি খুঁড়ে...

বদরিকাবাবু থামলো।

ভূতনাথ বললে—তারপর? মাটি খুঁড়ে...?

—মাটি খুঁড়ে স্ফটিক পাথর পাওয়া যাবে একটা।

—স্ফটিক-পাথর?

—হ্যাঁ রে, স্ফটিক-পাথর, বিশ্বাস হচ্ছে না?

—স্ফটিক-পাথর কেন?

—সব বলবো না এখন, তুই ভয় পেয়ে যাবি, কিন্তু তুইও রেহাই পাবি না তা বলে, তোকেও ভুগতে হবে, মাথাটা ফেটে তোর রক্ত ঝরবে, তোর সময় হয়ে এসেছে যে, তখন এক গেলাস জলের জন্যে ছটফট করবি, কেউ জল দেবে না, এ-বংশের রক্তের সঙ্গে তোর রক্তের ছোঁয়া লেগেছে কিনা। দর্পনারায়ণের অভিশাপ কি বৃথা যাবে ভেবেছিস, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পায়নি শেষকালে। মুর্শিদকুলি খাঁ'র 'বৈকুণ্ঠে' বসে তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে, আর মরবার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কেবল শাপ দিয়ে গিয়েছে যে—কথা বলতে বলতে বদরিকাবাবুর মুখ চোখের ভাব-ভঙ্গি কেমন যেন ভয়াবহ হয়ে উঠলো। ফুলে উঠলো চোখ দুটো। ভূতনাথ নিঃশব্দে উঠে এল ঘর থেকে। যেন মারমুখী হয়ে উঠেছে আজ বদরিকাবাবু! সর্বক্ষণ ঘড়ি ধরে-ধরে যেন শাপ দিয়ে চলেছে নিজের অন্নদাতাকে! অথচ কিসের এ ক্ষোভ! কেন এ অভিযোগ! কিন্তু কে জানতো বদরিকাবাবুর কথাগুলো এমন বর্ণে-বর্ণে ফলে যাবে শেষ পর্যন্ত!

বংশীর ঘরে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে একবার দেখলে ভূতনাথ জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে তার।

হঠাৎ মধুসূদন ঘরে ঢুকলো। ভূতনাথ বললে—কী দেখে এলে মধুসূদন?

মধুসূদন বললে—হাসপাতালে গিয়েছিলাম শালাবাবু, চুনীদাসীকে চাঁদনীর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

—কেমন আছে এখন?

মধুসূদন বললে—জ্ঞান হয়েছে একটু।

—কথা বলছে?

—কথা বলছে না, তবে আমায় দেখে চিনতে পারলে আজ্ঞে, চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, কিন্তু ডাক্তার বললে, ভয় নেই, বেঁচে যাবে, , তবে সময় লাগবে অনেক।

—কী হয়েছিল?

—কে জানে শালাবাবু, কেউ বলতে পারছে না, নটে দত্ত আর ছোটবাবুতে মারামারি হয়েছিল, ছোটবাবুর হাতে তো ছিল চাবুক, আর নটে দত্তর গুণ্ডার দল তৈরিই ছিল ও পাড়ায়, ঠিক যে আসলে কী হয়েছিল কেউ বলতে পারছে না।

আস্তে আস্তে ভূতনাথ নিজের চোরকুঠুরিতে এসে উঠলো। আজ বংশী নেই, কে আর খেতে ডাকতে আসবে! নিজের বিছানাটা পেতে নিয়ে চিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই শুয়ে পড়লো ভূতনাথ। অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়া মূর্তি যেন নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে বলে মনে হলো। কোথায় যেন কত যুগের পরপার থেকে সেই ইটালিয়ান শিল্পী ফিরে এসেছে আবার তার স্ত্রীর শয্যার পাশে। ভূমিপতি চৌধুরীকে যেন আজ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে সে। আবার যেন আজ নতুন করে প্রতিশোধ নেবে। আজ আর পিস্তলের গুলি ফস্কে যাবে না তার। অনেক সমুদ্র অনেক নদী পার হয়ে আবার ভারতবর্ষে এসেছে হারানো স্ত্রীর খোঁজে। দেয়ালের গায়ের অস্পষ্ট ছবিগুলো যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছে। উড়ন্ত পরীদের আবার নতুন পাখা গজিয়েছে। নতুন করে যেন অভিসার হবে এই ঘরে।

হঠাৎ যেন দরজার পাশ থেকে কার গলার আওয়াজ এল। ডাকছে—শালাবাবু, শালাবাবু—

অতি মৃদু ডাক। আওয়াজ শুনে বোঝা যায় না কার গলা। তবু বোঝা গেল যেন মেয়েমানুষের গলার শব্দ। দরজা খুলে ভূতনাথ বাইরে আসতেই দেখলে পাশে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিন্তা। হাতে একটা হ্যারিকেনের আলো। থান কাপড় পরা। অন্যদিকে মুখ ফেরানো। ভূতনাথ বললে—আমায় ডাকছিলে? ভূতনাথ আর যে কী বলবে ভেবে পেলে না।

চিন্তা তেমনি ঘোমটা ঢেকেই বললে—আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে শালাবাবু।

ভূতনাথ বললে—চলো, আমি যাচ্ছি।

আগে আগে চললো চিন্তা। পেছনে ভূতনাথও চলতে লাগলো। গলি-ঘুঁজির মতো রাস্তা। বড়বাড়ির এ-দিকটা রান্নাবাড়ির গায়ে। রান্নাবাড়ির পাশেই ভাঁড়ার ঘর। তারপর একটা শুধু দেয়ালের ব্যবধান। আর দেয়ালের গা দিয়ে রান্নাবাড়ির রাস্তা। সারা দেয়ালে ধোঁয়াব দাগ। বহুদিনের ব্যবহারে মেঝেটার জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট উঠে গিয়েছে। থালা সোজা হয়ে বসে না। ঘরের কোণে একটা আরশোলা চুপচাপ বসে শুঁড় নাড়াচ্ছে।

ভূতনাথ ভাত খেতে খেতে একবার আরশোলাটার দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হলো যেন আরশোলাটাও তার দিকে চেয়ে দেখছে। অদ্ভুত বাদামি রং। চোখের চারপাশে গোল পাঁশুটে দাগ। কী মতলব করছে বসে বসে কে জানে। হয়তো আলো দেখে বিব্রত হয়েছে। কিংবা হয়তো ভাত খাওয়া শেষ হবার পর এঁটো বাসন চাটবার লোভে অপেক্ষা করছে। কী খেয়ে ওরা বাঁচে কে জানে! কতটুকু প্রাণ ওদের! কোথায় থাকে! এই ঘরের মধ্যেই হয়তো কোনো গর্ত আছে। সেখানে ডিম পাড়ে আর এঁটো খেয়ে জীবন ধারণ করে। আরশোলাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত সব চিন্তা মাথায় এল ভূতনাথের। ও-ও তো এ-বাড়িতে আশ্রিত। তার সঙ্গে আরশোলাটার তফাত কী?

হঠাৎ মনে হলো যেন আরশোলাটা নড়তে শুরু করেছে। ঠিক তার ভাতের থালাটা লক্ষ্য করে যে আসছে তা নয়, কিন্তু সেইটেই যেন লক্ষ্য! প্রথমে উত্তর দিকে চলতে লাগলো, তারপর অকারণেই হঠাৎ পূব দিকে মুখ ফেরালো। তারপর এদিক-ওদিক দেখে একবার শুঁড় নাড়তে লাগলো। তারপর

আর নড়ে না। মনে হলো যেন এদিকে আর আসবে না।

ভূতনাথ নিজের মনেই ভাত খেতে লাগলো এবার। না, আর সে ওদিকে দেখবে না। সমস্ত শরীর যেন তার শির-শির করে উঠছে। কত অদ্ভুত সব সৃষ্টি। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, ওই আরশোলাটাও তো সেই তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু এমন বিপরীত সৃষ্টি একই হাতে কী করে সম্ভব! একবার অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ আবার ভূতনাথের চোখ গিয়ে পড়লো আরশোলাটার ওপর। এবার মনে হলো, আস্তে আস্তে আরশোলাটা যেন তার দিকেই আসছে!

আরো কাছে এল। আরো কাছে। এবার খুব সন্তর্পণে কাছে এসে ঠিক তার থালায় মুখ দিতেই...

—দাদা কেমন আছেন, জানেন?

ভূতনাথের যেন চমক ভাঙলো এবার। ঘরে কেউ নেই। প্রশ্নটা এল দরজার আড়াল থেকে।

—কে বংশী? বংশীর কথা বলছো?

—হ্যাঁ।

—দেখে এলাম তো, জ্বর হয়েছে খুব।

—আজ কিছু খাবে দাদা?

—আজ আর কিছু খাবার নেই, আজ রাতটা উপোসই থাক।

হঠাৎ মনে হলো আরশোলাটা যেন থালার ধারে মুখ লাগিয়ে কী খাচ্ছে। মুখ নড়ছে না। শরীর নড়ছে না। শুধু শুঁড়টা যেন অল্প-অল্প হেলছে দুলছে। ভূতনাথ থালাটা একবার নাড়িয়ে দিলে। যদি ভয় পেয়ে চলে যায় তো যাক। কিন্তু অদ্ভুত নির্ভীক এই আরশোলাটা! নড়ে না চড়ে না। কাঠ হয়ে লেগে রইল থালার গায়ে। ভূতনাথের শরীর আবার শির-শির করতে লাগলো।

—ছোটমা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, জানেন?

ভূতনাথ খেতে খেতে মুখ তুললে। বললে—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কেন?

দরজার আড়াল থেকে আবার সেই গলা।—বাড়িতে এসেই ছোটবাবুর খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

—তারপর?

—মাথায় বরফ দিয়ে দিয়ে এখন জ্ঞান হয়েছে একটু—আপনার কথা বলছিলেন।

—আমায় ডাকছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ, আমি ডাকতে গিয়েছিলাম, আপনাকে পেলাম না ঘরে। আমার বড় ভয় করছিল। চোখ দেখে মনে হচ্ছিলো ছোটমা বুঝি বাঁচবে না, একলা তখন কী যে করি, মেজমাকে খবর দিলাম, বড়মাকে খবর দিলাম, শেষে বরফ আনিয়ে মাথায় দিতেই—

—এখন কেমন আছেন?

—এখন একটু ভালো, সারাদিন তো উপোস দিয়েছেন, পেটে কিছুই পড়েনি, আমি ছোটবাবুর পা-ছোঁয়া জল আনতে পাঠিয়েছিলাম, দাদা তো নেই, বেণী বললে—ছোটবাবু পা ছুঁড়ে জলের বাটি ফেলে দিলেন, পাথরের বাটি তো, বাটিটাও ভেঙে গিয়েছে। ছোটমা'র কিছু খাওয়া হয়নি, এখন একটু ওষুধ খেতে চাইছিলেন।

—ওষুধ? কী ওষুধ?

—যে ওষুধ খান রোজ।

প্রথমটা বুঝতে পারেনি ভূতনাথ। তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো। তাই তো! ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—ওটা কি এখনও রোজ খান?

—হ্যাঁ, রোজই তো খান।

রোজই খায় বৌঠান! কেমন যেন লাগলো ভূতনাথের। খাওয়ার পরে উঠে আসতে গিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে একবার দেখলে ভূতনাথ। আরশোলাটা এবার তার থালার ওপরে একেবারে উঠে বসেছে। কেমন ঘিন-ঘিন করতে লাগলো সারা শরীরটা।

তারপর বিছানায় শুয়েও অন্ধকারের মধ্যে মনে হলো যেন অতিকায় একটা আরশোলা তার দিকে মিট মিট করে চাইছে। তারপরেই মনে হলো, ওটা আরশোলা নয়, তারই বিকৃত মন কুৎসিত জীবের রূপ নিয়ে তাকে গ্রাস করতে আসছে বুঝি। চোখের চারদিকে তেমনি পাঁশুটে দাগ, লম্বা লম্বা শুঁড়, অনিশ্চিত গতি। তেমনি বিবর্ণ, কুৎসিত। তেমনি বীভৎস!

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। আর রাত গড়িয়ে সকাল। কিন্তু তবু অন্যদিনের সকালের চেয়ে আজকের সকালের যেন অনেক তফাত। আজ দাসু জমাদারের ঝাঁটার শব্দ যেন অন্যদিনের চেয়ে মৃদু। আজ চিৎকার কম। সবাই যেন সন্ত্রস্ত। সচকিত। ভেতর-বাড়িতে সৌদামিনীর গলায় ঝাঁঝ নেই তেমন। আজও ঘোড়ার ডলাই-মলাই চলছে আস্তাবলে। কিন্তু চাঁড়গুলো যেন একটু আস্তে। ঘোড়াগুলোও যেন বুঝতে পেরেছে। তারাও পা ঠোকে আস্তে-আস্তে।

তোষাখানায় বংশীর কাছে গেল ভূতনাথ। জ্বরটা কমেছে একটু। কিন্তু চিৎপাত হয়ে তেমনি শুয়ে আছে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আজ খেতে ইচ্ছে করছে কিছু?

বংশী বললে—ছোটবাবু কেমন আছে আগে তাই বলুন শালাবাবু, সারারাত ছোটবাবুকে স্বপ্ন দেখেছি আজ্ঞে।

মধুসূদন বললে—শশী ডাক্তারকে তো আবার ডাকতে গিয়েছে সরকারমশাই।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ছোটবাবু কেমন আছে জানো তুমি?

মধুসূদন বললে—শশী ডাক্তারের ওষুধে কাজ হবে না! কী বলেন, শালাবাবু?

সত্যিই শশী ডাক্তার ধন্বন্তরি বটে! বুড়োমানুষ, কিন্তু কাল রাতে ঘণ্টা তিনেক নিজে রোগীর পাশে থেকে চাঙা করে দিয়ে গিয়েছেন ছোটবাবুকে! গায়ের ব্যথা এখন অনেক কম।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আর পুলিশ কখন গেল?

মধুসূদন বললে—শেষকালে পুলিশের বড়সাহেব কাল এল।

—কখন?

রাত তখন প্রায় তিনটে। মেজবাবু ডেকে পাঠালেন। সারা রাত্তির আমরা কেউ ঘুমোইনি হুজুর, লোচন নাগাড়ে তামাক সেজে গিয়েছে, আমি আর বিধু সরকার ঠায় দাঁড়িয়ে, ভেতরে হাসি-গল্প হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, সেই রাত্তিরে গাড়ি বেরুলো—সরকারমশাই সেই রাত্তিরে আবার খাজাঞ্চিখানার দরজা খোলে।

কেন?

—টাকাকড়ি তো নেয় ওরা। হয়তো সিধে নিয়ে গেল কিছু... শুনলুম যখন, তখন গঙ্গাযাত্রীদের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, সরকারমশাই-এর আর শোয়া হলো না, ভোরবেলাই বাজারে চলে গেল মাছ আনতে, থানায় সিধে পাঠাতে হবে। মেজবাবু তখন এসে বললে—আলমারি খোলো।

ভূতনাথ চলে আসছিল। হঠাৎ মনে পড়লো আর-একটা কথা। বললে—চুনীদাসীর খবর কিছু জানো মধুসূদন?

—সে জানবার আর সময় পেলাম কই শালাবাবু। এখন যাচ্ছি—বাজারে যাবো, অমনি চাঁদনীটা টপ করে ঘুরে দেখে আসবো।

মধুসূদন চলে যেতেই বংশী বললে—ছোটমা কী বললে শালাবাবু?

পটেশ্বরী বৌঠানের কথা ভূতনাথেরও অনেকবার মনে হয়েছে। কাল অমন করে বরানগর যেতে যেতেও যাওয়া হলো না, তারপর আর-একবার দেখা হওয়া উচিত ছিল। চিন্তার কাছে শুনেছিল আবার নাকি সেই ছাইভস্ম খেয়েছে। এখন সারারাত উপোস করার পর কেমন আছে কে জানে!

চোরকুঠুরির ধারে গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিল ভূতনাথ। ছোটদরজাটার ও-পাশের বারান্দায় তখন সিন্ধু আর গিরির গলার শব্দ আসছে। কেমন যেন লজ্জা সঙ্কোচ হয়। ভর-সকালবেলা। পূবমুখো

বারান্দা। রোদ একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। এমন সময় কখনও যায়নি ভূতনাথ। অতগুলো চোখের সামনে দিয়ে হুট হুট করে ছোটবৌঠানের ঘরে যাওয়া। কে কী বলবে! তা ছাড়া বংশী নেই আজ। বংশী থাকলে সে ঠিক সময়-সুযোগ বুঝে টুপ্‌ করে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেয় বৌঠানের ঘরে। আশেপাশে চিন্তারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বংশী বললে—আজকে কী খাবো শালাবাবু?

ভূতনাথ বললে—জল-সাবু খালি। আমি কাল চিন্তাকে বলে দিয়েছি।

—দেখুন তো, কে এ-সব করে, ওদিকে ছোটবাবুর অসুখ, ছোটমা'র কী অবস্থা কে জানে, আর আমি রইলাম পড়ে, আমার আবার জল-সাবু হ্যান্‌-ত্যান্‌—মাস্টারবাবু থাকলে একটা বড়ি দিয়ে দিতেন আর সব সেরে যেতো আজ্ঞে এক দণ্ডে।

ভূতনাথ বললে—কপালের গেরো বংশী—তুই আর কি করবি বল?

বংশী বললে—আপনি আজকের দিনটা কোথাও বেরোবেন না শালাবাবু—ছোটমা কখন কী করে।

ভূতনাথ তা জানতো। তবু না বেরিয়েও উপায় ছিল না।

বংশী বললে—যদি বেরোন তো শীগগির-শীগগির কিন্তু বাড়ি ফিরবেন হুজুর।

—যাবো আর আসবো। বার-শিমলেয় যেতে কতটুকু আর পথ। হেঁটে গেলেও বেশি সময় লাগবার কথা নয়। সুবিনয়বাবুর চিঠি পেয়ে না-যাওয়াটা উচিত নয়। লিখেছিলেন—চাকরির একটা সন্ধান হয়েছে। এসে একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে। ঠিকেদারের কাছে কাজ। বাড়ি তৈরির ঠিকেদার। সেই কাজ তদারক করা, দেখা, লোকজন খাটানো। হিসেবপত্তর রাখা। এই-সব।

কিন্তু আজও মনে আছে সেদিন সুবিনয়বাবুর মুখে যে উল্লাস দেখতে পেয়েছিল ভূতনাথ, তা আর কখনও দেখেনি। মুমূর্ষু সুবিনয়বাবু। চুপচাপ শুয়ে থাকেন। শহরের প্রান্তে এসে বসবাস করছেন। চাকর-বাকর, কর্মচারি, সমস্ত ঐশ্বর্য-আড়ম্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও যেন এতটুকু দুঃখ নেই। মাঝে মাঝে গান করেন। হয় একলা, নয় তো জবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

জবা গান গাইতে গাইতেই হঠাৎ থেমে যায়। বলে—বাবা ভাত চড়িয়ে এসেছি, পুড়ে গেল বোধ হয়, দেখে আসি।

সুবিনয়বাবু বলে—দু'জন লোকের খাওয়া, অত ব্যস্ত হয়ো না মা।

জবা বলে—বা রে, দু'জন লোক বলেই তো ভালো করে রান্না করা দরকার।

সুবিনয়বাবু বলেন—বাবা-মা'র কাছে বলরামপুরে মানুষ হয়েছে কিনা, আর আমার মাও খুব ভালো রাঁধতে ভালোবাসতেন, বুঝলে ভূতনাথবাবু। বলরামপুরে যখন ছোটবেলায় ছিলাম, কত রকম রান্না যে খেয়েছি, বাবা ছিলেন ভোজনরসিক—জবাকে নিজের হাতে সব শিখিয়েছিলেন আমার মা।

মাঝারি বাড়ি। তবু পরিপাটি করে সমস্ত গুছিয়ে রেখেছে জবা। রাতারাতি এতখানি ঐশ্বর্য থেকে এমন মধ্যবিত্ত পর্যায়ে নেমে আসতে জবারও যেন কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। কত সহজ করে নিয়েছে নিজেকে। সাবান দিয়ে কাপড় কেচে শুকোতে দেয় উঠোনের দড়িতে। ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ঘরগুলো।

জবা বলে—অমন হাঁ করে দেখছেন কী, নিন এগুলো নিঙড়ে মেলে দিন দড়িতে।

বাইরের কাজ করবার জন্যে একজন ঝি আছে শুধু বাড়িতে। বাজারটা করে নিয়ে আসে। ফাইফরমাশ খাটে। তারপর সন্ধ্যে হবার আগেই সে নিজের বাড়ি চলে যায়। একদিন নিজের জলটা যে নিজে গড়িয়ে খেতে পারতো না, তার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সুবিনয়বাবু বলেন—মা, এবার উপাসনার ব্যবস্থা করো, পাঁচটা বাজতে চললো যে।

উপাসনা-ঘরে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে এসে বসাতে হয় সুবিনয়বাবুকে। এই ঘরটাই বড়। মাঝখানে বেদীর ওপর গালচে পাতা হয়। ধূপ-ধুনো জ্বেলে দেয় জবা। তারপর সুপবিত্র গিয়ে বসে একধারে। মাঝখানে জবা। আর তার পাশে ভূতনাথ। সুবিনয়বাবুর ইঙ্গিতে জবা গান ধরে—

তাঁর নাম পরশ রতন, পাপী-হৃদয় তাপ হরণ—
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপে, ভকত হৃদয়ে জাগে—

তারপর সুবিনয়বাবু প্রার্থনা শুরু করেন—নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। সেই সুখকরকে নমস্কার করি। কল্যাণকরকে নমস্কার করি। কিন্তু কল্যাণকর শুধু সুখকর নন, তিনি যে দুখঃকর। দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়। যিনি সুখকর, তাঁকে প্রণাম করো এবং যিনি দুঃখকর তাকেও প্রণাম করো—তাহলেই যিনি শিব, যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে...

শুনতে শুনতে এক-একবার চোখ খুলে দেখে ভূতনাথ। সুপবিত্র চোখ বুজে আছে। জবারও চোখ বোজা। কেমন যেন লজ্জা হয়। ভূতনাথও চোখ দুটো বুজে নির্বিকার হয়ে শোনে তখন।

তারপর উপাসনার শেষে জবা বলে—সুপবিত্র, এবার তুমি বাড়ি যাও।

সুপবিত্রর বোধ হয় যাবার ইচ্ছে হয় না। বলে—এখনও তো রাত হয়নি বেশি—আর একটু থাকি না?

জবা বলে—তা হোক, বেশি রাত করো না, তোমার শরীর ভালো নেই।

সুপবিত্র বলে—আজকাল তো আমি একটু ভালোই আছি।

—কই ভালো আছো, দিন-দিন চেহারা কী হচ্ছে দেখেছো? আয়নাতে চেহারাটা ভালো করে দেখো একবার।

আর বাক্যব্যয় না করে সুপবিত্র চলে যায় অবশেষে।

কিন্তু চলে যাবার পরেই যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় জবা। মুখ দেখে বোঝা যায় কেমন যেন চিন্তিত। বলে—এত রাত্রে সুপবিত্রকে একলা ছেড়ে দেওয়া উচিত হলো না—যা ভুলো মন!

ভূতনাথ বলে—একবার দেখে আসবো বাড়ি পৌঁচেছে কিনা?

জবা যেন এই প্রশ্নটাই চাইছিল। বলে—দেখে আসুন না, বেশি দূর তো নয়, চট করে যাবেন আর আসবেন, শুধু জিজ্ঞেস করবেন বাড়িতে পৌঁচেছে কিনা।

সুবিনয়বাবু হঠাৎ ডাকেন—মা—

জবা তাড়াতাড়ি ছুটে আসে—আমাকে ডাকছিলেন বাবা?

—রাত হয়ে যাচ্ছে, ভূতনাথবাবুকে তুমি এখনও ছাড়লে না মা?

জবা হেসে ওঠে—রাত কোথায় বাবা, ভূতনাথবাবু পাড়াগাঁয়ের ছেলে, অন্ধকারে বেড়ানো ওঁর অভ্যেস আছে।

ভূতনাথ বলে—না, রাত তো বেশি হয়নি।

জবা ডাকে। বলে—আসুন তো আমার সঙ্গে।

ঘরের বাইরে এসে বলে—আপনি তো আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—তবে বাবার কাছে বসে থাকেন যে দিনরাত? চলে আসুন।

তারপর জবা নিয়ে আসে তার নিজের ঘরে। বলে—শুধু শুধু বসে থাকলে চলবে না—এই কাপড়টা ধরুন তো।

জবা নিজের বিয়ের জন্যে জামা তৈরি করেছে। কাপড় কিনেছে। জামাগুলো নিজের হাতে তৈরি করেছে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে—আর বাকি রইল কী কী?

জবা বলে—সুপবিত্রর জন্যে বাবা যা যা দেবে সব তো হয়ে গিয়েছে। তা ওর তো পছন্দ বলে কোনো জিনিসই নেই, আমাকেই সব করতে হয়েছে—কিন্তু আমার জিনিসগুলোই এখনও হয়ে উঠলো না সব।

—কিন্তু আর তো মাত্র মাস দু'-এক বাকি!

জবা বললে—আর একটা কাজ বাকি—বাবা সব নাম-ঠিকানা দিয়েছেন—সেইটে দেখে একটা লিস্ট করতে হবে—আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে নেমন্তন্ন করে আসা। ওটা আপনাকেই করতে হবে কিন্তু।

ভূতনাথ বললে—আমাকে তো দিলেই আমি করি।

—সব কাজ কি আপনার মুখের কাছে এগিয়ে দিতে হবে নাকি? সারাদিনই তো আপনার ছুটি, সকালে খেয়ে-দেয়ে চলে আসলেই পারেন?

—আমাকে তো এতদিন বলোনি?

—সব কাজের কথা বলতে হবে আমাকে? নিজেরই তো আপনার বোঝা উচিত। আমি কোন্ কাজটা কখন করি বলুন তো? সারাদিন দেখছেন তো সংসার নিয়ে ব্যস্ত, তারপর বাবারও কত কাজ করতে হয় আমাকে—এগুলোও যদি আপনি না করেন, তা হলে আমার আর কি উপকার হলো?

ভূতনাথ বললে—এতদিন স্পষ্ট করে বলোনি তো—আমার এ-বাড়িতে ঘন ঘন আসাটা তোমার ভালো লাগবে কিনা তাই-ই তো জানতাম না।

—লাগবে, লাগবে, লাগবে, ভালো লাগবে। গলা বাড়িয়ে এ-কথাটা না বললে যেন বোঝেন না আপনি! এদিকে এত সেয়ানা হয়েছেন আর এটা বুঝতে পারেন না?

—এবার থেকে জানা রইল।

—হ্যাঁ, জেনে রাখুন, আর ভুলে যাবেন না যেন কখনও, আপনি এলে কত কাজ করিয়ে নিই দেখেন না, সুপবিত্র তো ওই রকম, বাবাও তো দেখছেন অসুস্থ, অন্য একটা লোক নেই যে সাহায্য করে। আপনি এলে উপকার হয়, এ তো সহজ কথা।

—আমি তো বলেই রেখেছিলাম, আমাকে দিয়ে তোমার কখনও কোনো উপকার হলে আমি ধন্য হয়ে যাবো।

কিন্তু সেটা কি আমাকে চিৎকার করে বলতে হবে—ওগো আমার একটা উপকার করে দিয়ে যান আপনি।

—না বললে আমি বুঝবো কী করে?

—না বলতে তো আমার অনেক কথাই বুঝেছিলেন—আর এটা বুঝবেন না?

—তবু মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগে তো!

জবা বললে—এই তো সেদিন, সুপবিত্রর তিন দিন দেখা নেই, ভাবছিলুম অসুখ-বিসুখ হলো নাকি—এমন তো কখনও করে না, একবার করে রোজ আসেই উপাসনার সময়টা। আমি একলাই বা কার সঙ্গে যাই—কই, আপনার তো দেখে আসা উচিত ছিল।

ভূতনাথ চুপ করে রইল। তারপর বললে—তা একবার শুধু মুখ ফুটে বলতেই পারতে।

—আমি বলবো কেন, আপনার তো বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

—কিন্তু সকলের বুদ্ধি কি সমান হয় জবা, নইলে সবাই তো এম-এ. পাশ করে ল' পাশ করতে পারতো সুপবিত্রবাবুর মতন! আর তোমার মতন স্ত্রী পেতো! বলে হো হো করে হেসে উঠলো ভূতনাথ।

জবা কিন্তু হাসতে পারলো না। জামা সেলাই করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে বললে—আমি কি সুপবিত্রর তুলনা করেছি?

ভূতনাথ বললে—তুমি করবে কেন, তুলনা করছি আমিই—কথাটা হঠাৎ মনে এল কিনা!

জবা বললে—হঠাৎ এমন ধারা কথা মনে আসাও তো ভালো নয় আপনার।

ভূতনাথ বললে—ঠিক বলেছো জবা, কিন্তু মন তো বোঝে না।

জবা আবার সেলাই-এর দিকে মন দিয়ে বললে—মনকে বশ করতে শিখুন—ভালো হবে তাতে।

ভূতনাথ বললে—আমার ভালো হয়ে আর দরকার নেই জবা, আর তা ছাড়া এ-সংসারে সকলেরই যদি ভালো হয় তো খারাপ হবে কার?

—খারাপ বুঝি কারো-না কারোর হতেই হবে?

ভূতনাথ বললে—নিশ্চয়ই, নইলে ভালোরও তো একটা শেষ আছে। সব ভালোগুলো সবাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নেবার পর, কারোর ভাগ্যে তো খারাপগুলোই পড়ে থাকবে—আমি সেই দলে।

জবা আবার হাসলো। বললে—ভালো মেয়ে শুধু আমি একলাই নই ভূতনাথবাবু, খুঁজলে আমার মতো অনেক মেয়েই পাবেন।

ভূতনাথ বললে—যখন বুঝতেই পেরেছো কথাটা, তখন বলি—ততো ভালোতে আমার দরকার নেই।

জবা প্রথমটায় কিছু বললে না। তারপর খানিক থেমে বললে—আপনি সত্যিই একটা বিয়ে করে ফেলুন ভূতনাথবাবু।

ভূতনাথ বললে—আর যে-জন্যেই আসি, উপদেশ শোনবার জন্যে তোমার কাছে আসি না কিন্তু জবা।

জবা বললে—কিন্তু তা ছাড়া তো আর উপায়ও দেখছি না কোনো।

ভূতনাথ এবার জোরে হেসে উঠলো। বললে—উপায় খুঁজতে যেন তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছি আমি।

জবা কিন্তু হাসলো না। বললে—তবে আপনাকে খুলেই বলি ভূতনাথবাবু, সুপবিত্রকে বাইরে থেকে যা বোঝেন ও তা নয়, সব বোঝে। শুধু কথা বলে কম, কিন্তু অত প্রখর অনুভূতি বুঝি কম মানুষেরই আছে। আপনাকে যা বললাম ওকেও যদি তাই বলতাম—ও বোধ হয় আত্মহত্যা করতো—কিম্বা হয়তো সন্ন্যাসী হয়ে যেত—কিম্বা পাগল—ওকে আপনি জানেন না ঠিক—

ভূতনাথ এবার চুপ করে রইল।

কিন্তু সুপবিত্রর কথা বলতে গিয়ে জবাও যেন আত্মহারা হয়ে যায়। হাতের ছুঁচ আপনিই কখন থেমে আসে। মনে হয় যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলে চলেছে জবা। সামনে ভূতনাথ রয়েছে এ-জ্ঞান আর নেই তখন। বলে—একদিন ওর সঙ্গে ভালো করে কথা বলিনি বলে ও তিন রাত ঘুমোয়নি জানেন, ওর মা'র কাছে শুনেছি সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কেউ জানে না, তিন দিন খায়নি পর্যন্ত—শেষে যখন ডেকে পাঠালুম, তখন দেখি উস্কোখুস্কো চুল, চোখ লাল। বললাম—এতদিন আসোনি কেন? ও কিছু বললে না। বললাম—এমন পাগলামি করলে কি সংসারে বেঁচে থাকা চলে? দুঃখ সইতে হবে, কষ্ট করতে হবে তবে তো জীবন! জীবন সুন্দর বটে, কিন্তু জীবন তো আবার নিষ্ঠুরও—এত অল্পে মন-খারাপ করলে চলবে কেন? বিশেষ করে পুরুষ-মানুষ না তুমি?

—তবু ওব মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।

জবা আবার বলে—ও এমনি, ঠিক এমন ধরনের পুরুষমানুষ আজকালকার যুগে অচল, তবু এমন নিষ্ঠাও কারো দেখিনি। এমন করে সত্যিকারের ভালোবাসা, এমন একাগ্রতা কার আছে ভূতনাথবাবু?

ভূতনাথও দেখেছে। অনেকদিন হঠাৎ সুবিনয়বাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখেছে—সুবিনয়বাবু হয়তো নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। আর ওদিকে জবা নিজের সেলাই নিয়ে ব্যস্ত, আর সুপবিত্র একমনে জবার মুখের দিকে চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে। কোনো দিকে খেয়াল নেই। যেন বাইরের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কথা নেই বার্তা নেই। একজন শুধু চুপচাপ কাজ করে চলেছে আব-একজন একমনে তাকে দেখছে।

জবা বলে—এ ওর স্বভাব, ভালোবাসা বোধ হয় এক-এক জনের স্বভাব থাকে, ওরও তাই।

ভূতনাথ বললে—সুপবিত্রকে তো বুঝলুম—কিন্তু তোমার কথা! তুমিও কি...

জবা হঠাৎ বলে—ওই যাঃ, তরকারি চাপিয়ে এসেছি উনুনে, দেখে আসুন তো কড়ায় জল আছে কিনা, জল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে তো একটু জল দিয়ে আসবেন।

আজ কিন্তু ভূতনাথকে দেখেই জবা বললে—বাবার চিঠি পেয়েছিলেন তো?

ভূতনাথ বললে—হ্যাঁ, তাই তো এলাম।

জবা বললে—ওপরে যান, বাবা আপনার একটা চাকরি না করে দিয়ে আর ছাড়বেন না।

সুবিনয়বাবুর ঘরে যেতেই ভূতনাথ দেখলে তিনি তারই প্রতীক্ষা করছেন। বললেন—এসে গিয়েছো ভূতনাথবাবু, এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সুবিনয়বাবু খানিক থেমে বললেন—আমার চিঠি পেয়েছিলে তো ভূতনাথবাবু? রূপচাঁদবাবু নিজে এসেছিলেন এখানে। বলছিলেন—লোক আমার এখনি চাই—বড় সদাশয় লোক, তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

ভূতনাথ বললে—কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, আমার বড় অভাব চলছিল।

—সে কি ভূতনাথবাবু, তোমাকে কাজ খুঁজে দেওয়া আমার কর্তব্য যে—ব্রজরাখালবাবুকে আমি নিজে কথা দিয়েছিলাম। তা ছাড়া—আমার কাছে এতদিন তুমি একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলে! আর এ-কাজও বিশেষ শক্ত নয়, তবে বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হবে, বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেই সব তদারক, চুন-সুরকির হিসেব রাখা—কখনও এ-সব কাজ করেছো ভূতনাথবাবু?

—না, আপনার কাছেই আমার প্রথম চাকরি।

—করতে পারবে তো? হিসেব রাখতে হবে রাজ-মিস্ত্রীদের কাজের। আর বাড়িও তো একটা নয়, চারিদিকেই বাড়ি তৈরি হচ্ছে।

—আপিসটা কোথায়?

—কাজ তোমার ভবানীপুরেই করতে হবে, ওই-সব অঞ্চলেই বাড়ি তৈরি হচ্ছে কিনা, আগে তো ও-সব অঞ্চল বাদা-জঙ্গল ছিল, এখন দেখবে কেবল সব উকিল-ব্যারিস্টারদের বাড়ি। চেনা যাবে না কিছু, নতুন-নতুন রাস্তা হচ্ছে, শহর বাড়ছে যে, লোকও কত বাড়ছে দেখো না কলকাতার, তা ছাড়া ট্রাম হয়ে যাতায়াতেরও সুবিধে হয়েছে। তা এ কাজ পারবে তো তুমি?

—আমি আপনার আশীর্বাদে সব কাজই পারবো।

—তা হলে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি নিয়ে যাও।

জবা এল।

সুবিনয়বাবু বললেন—দুটো জিনিস সম্বন্ধে আমার শেষ কর্তব্য ছিল মা, একটা ভূতনাথবাবুর চাকরি, সেটা হলো—আর বাকি রইল তোমার বিয়েটা—তা সেটারও আর দেরি নেই। তারপরে আমার সংসারের ওপর আর কোনো কর্তব্য নেই—তখন আমি ছুটি নেবো মা। এবারের মাঘোৎসবই হয়তো আমার জীবনের শেষ উৎসব।

জবা বললে—বাবা—

রাস্তায় বেরিয়ে ভূতনাথ একবার ভাবলে আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা। আজ হয়তো না যাওয়াই ভালো। কাল সকালে গেলেই চলবে। সেই কোথায় ভবানীপুর। সে তো কাছে নয়।

ওদিকে কলকাতা আর এদিকে ভবানীপুর। নতুন শহব গড়ছে এদিকে। সব বাড়ি নতুন। সব রাস্তা নতুন। শহর যেন আর-এক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে এখানে। বিংশ শতাব্দীর নবজাতক এ। এদিকের গঙ্গার ধারে লম্বা-লম্বা চিমনিওয়ালা যত কল-কারখানার সঙ্গে এ শহরের যেন কোথায় যোগ আছে। এইখানেই যেন রাত্রে বিশ্রাম করতে আসে ওপারের ধূলি-ধূসর ভাবনাগুলো। আর হাইকোর্টের কূট-বিচার শেষ করে নথিপত্রগুলো এখানে এসে বুঝি জিরিয়ে নেয় একটু। বাড়ির সামনে নেমপ্লেট-এ মালিকদের নাম-ধাম পরিচয়টীকা। কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার। কেউ নতুন ব্যবসায়ী, কেউ দালাল। বড় গঙ্গার জেটিগুলো জাহাজে জাহাজে ভর-ভরাট। পাট আর ধান, গালা আর তুলো সব এসে জমেছে জাহাজে। খাজাঞ্চিখানার কেরানীদের কলমের আব কামাই নেই বুঝি। মনে হয়—খাজাঞ্চিখানাগুলো বড়বাজারেরই থাক আর যেখানেই থাক, তার চাবিগুলো যেন আজকাল আসে এখানে। এই ভবানীপুরে। ভবানীপুরের নতুন পাড়ায়।

কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই গোবিন্দপুরকে! কোথাকার কে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী! কে তার

গোসাই ভবানী দাস! সেই ভবানীদাসই বুঝি কালীঘাটের সেবায়েত হালদারদের পূর্বপুরুষ। আজ সেই ভবানীদাস এলেও হয়তো চিনতে পারবে না তার নামের এই জায়গাকে।

ভূতনাথ বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে এক-একটা অসমাপ্ত বাড়ির মাথায় উঠে এক-একবার চেয়ে দেখে। যেদিন প্রথম এখানে এসেছিল তার সঙ্গেও এ শহরের আজ কোনো মিল নেই। দিনের বেলায় এ-পাড়ায় ইঞ্জিনীয়ারের গজ ফিতে, কন্ট্রাক্টরের হিসেব আর কুলী-মজুরের গাঁইতি—আর রাত্রে অর্ধসমাপ্ত ভবানীপুর যেন একটা স্বপ্নের মতন। সাইকেল-এ চড়ে সন্ধ্যেবেলা ফেরবার সময় ওদিকে চাইতে চাইতে যায় ভূতনাথ। বৌবাজারের বনেদীয়ানা নেই এখানে, কিন্তু শৃঙ্খলা আছে। মেদ নেই, স্বাস্থ্য আছে। এ-পাড়ার বাড়িগুলোর মতো বাড়ির অধিবাসীরাও যেন অন্যরকম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফর্সা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে। পুরুষরা কেউ পরে চাপকান, কোটপ্যান্ট। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ সব। রাস্তার নতুন টেলিফোন-টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো পর্যন্ত যেন সভ্যভব্য। বনেদীয়ানা না থাক, কিন্তু সুরুচি তো আছে। বেশ ভালো লাগে ভূতনাথের।

রূপচাঁদবাবু লোক ভালো। বলেছিলেন—মাইনের সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেছেন সুবিনয়বাবু?

ভূতনাথ বলেছিল—আমার কাজ দেখে যা-খুশি দেবেন। খুশিই হয়েছিলেন রূপচাঁদবাবু। ইঁট-চুন-সুরকির হিসেব রাখা, রাজমিস্ত্রীদের হাজরে রাখা, কাজ তদারক করা—এই-সব কাজ। কোথা থেকে কোথায়! ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর, তারই মধ্যে হেঁটে হেঁটে শহর পাড়ি দেওয়া। তবু জীবিকার জন্যে সব করতে হয়।

খুশি নিশ্চয়ই হয়েছিলেন রূপচাঁদবাবু। নইলে সাইকেল কিনে দিলেন কেন? বললেন—সাইকেলটা শিখে নিন, এতে কাজের সুবিধে হবে।

দু'চাকার গাড়ি। কিন্তু যেন বিশ্বজয় করা যায় দুটো চাকার দৌলতে। সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে ভূতনাথ বড়বাড়ি থেকে। তারপর দুপুরবেলা শুধু খেতে যাওয়া। আবার দুটো মুখে দিয়েই চলে আসা ভবানীপুরে। তারপর সন্ধ্যেবেলা গড়াতে গড়াতে কোনদিন বা যায় জবাদের বাড়ি—বার-শিমলেয়। তখন শরীরটা একটু ক্লান্ত হয় বটে, কিন্তু তবু বেশ লাগে। পুরুষমানুষ, কাজ না করতে পেলে কেমন যেন আরো বেশি ক্লান্ত মনে হয়।

সেদিন এক কাণ্ড ঘটে গেল।

বড়বাড়িতে ঢুকছে এমন সময় ব্রিজ সিং বললে—শালাবাবু, মাস্টারবাবু আ গিয়া।

—মাস্টারবাবু? যেন বিশ্বাস হয়নি ভূতনাথের। বললে—ব্রজরাখাল?

সত্যিই ব্রজরাখাল। আস্তাবলবাড়ির ওপরের ঘরটা খোলা। ভেতরের আলো জ্বলছে তো! তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সামনে যেতেই দেখলে—এ আর-এক ব্রজরাখাল।

ব্রজরাখাল তখন আরো অনেকের সঙ্গে কথা বলছে। সেই কদমদা রয়েছে, নিবারণ রয়েছে, শিবনাথ রয়েছে। ভূতনাথকে দেখে শুধু একবার বললে—এসো বড়কুটুম—বলে আবার সামনের ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

ভূতনাথ দেখতে লাগলো—ক'বছরে আগেকার ব্রজরাখালের সঙ্গে আর যেন কোনো মিল নেই। আরো উজ্জ্বল হয়েছে গায়ের রং। সমস্ত মাথার চুল কামানো। একটা বাসন্তী রং-এর মোটা পাঞ্জাবী পরা। মোটা কাপড়।

কদমদা'কে বলছে—আমার দ্বারা তোমাদের কী কাজ হবে বলো?

কদমদা বললে—দেশের লোকের মনের অবস্থা যা হয়েছে, তা তো আপনাকে বললাম। লর্ড কার্জনের সেই বক্তৃতা থেকেই শুরু বলা চলে—এখন ওঁরা যা করতে চান, তা তো বুঝেছেন, একটা 'ফেডারেশন হল্' তৈরি করবেন, ন্যাশনাল কংগ্রেসও ওই পথেই পা দিয়েছেন, কিন্তু অনুশীলন-পার্টির মতে অন্য পথ ধরতে হবে—সশস্ত্র বিপ্লব।

ব্রজরাখাল বললে—আমি ওতে রাজী নই কদম। সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। তোমরা যদি সেই আশাতে ডেকে নিয়ে এসে থাকো তো ভুল করেছো, রাজনীতিতে আমি থাকবো না—বরং তোমাদের ক্লাব থেকে আমার নামটা কেটেই দিও।

কদম চুপ করে রইল।

ব্রজরাখাল বললে—রাজনীতি ছাড়া কি আর কাজ নেই? বোমা আর পিস্তলের মধ্যেই কি মোক্ষ লুকিয়ে আছে কদম? শেষ পর্যন্ত তুমিও কি ওই পথ ধরবে? মনে নেই তোমাদের সে কাহিনী? বাগবাজারে যেবার প্লেগ হলো, সিস্টার নিজে নামলেন রাস্তার নর্দমা পরিষ্কার করতে! বস্তির মধ্যে ছেলেমেয়েরা মরছে। একটা আট বছরের ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় সিস্টারের কাপড় ধরে কেঁদে উঠলো—'মা, মা, মাতাজী গো—'। সিস্টার আর ধরে রাখতে পারলেন না নিজেকে। স্বামী সদানন্দ ছিলেন কাছে, তিনি ছিনিয়ে নিয়ে এলেন সিস্টারকে। কিন্তু সিস্টারের কেবল মনে হতে লাগলো কেন তাকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না! তাঁর কি ভালোবাসার কিছু অভাব ছিল? ভালোবাসা দিয়ে কি তবে মৃত্যুকে জয় করা যায় না! সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প কি তবে মিথ্যে?

কথা বলতে বলতে ব্রজরাখালের চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো। বলতে লাগলো ব্রজরাখাল—একদিন আমারও এমনি হয়েছিল কদম। ফুলদাসীর মৃত্যুর কথা তোমার মনে আছে—আমিও ঠিক এই কথাই ভেবেছিলাম। ভেবে কূল-কিনারা না পেয়ে লোকালয় ছেড়ে আলমোড়ায় চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে এই প্রশ্নই কেবল করেছি অন্তর্যামীকে। কিন্তু আজ আমাকে এর উত্তর দিলেন সিস্টার নিবেদিতা নিজে। সিস্টার নিবেদিতারও এমনিই হয়েছিল সেদিন সেই ১৮৯৯ সালে।

নিবারণ বললে—কী বললেন তিনি?

ব্রজরাখাল বললে—তিনি যা বললেন, তোমাদের তা মনে লাগবে না ভাই, তবু বলি—সেদিন সিস্টার দিক খুঁজে না পেয়ে এই প্রশ্নই করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে—কী সে ত্যাগের মন্ত্র? কোন্ ত্যাগ জীবন-ত্যাগের চেয়েও বড়? সুযোগ বুঝে বিবেকানন্দ বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে—'ভালোবাসার ঊর্ধ্বে যে কর্ম তাকে চিনতে শেখো, সৃষ্টির আনন্দে নির্ঝরিত স্রষ্টার যে প্রেম, তাই-ই তাঁর কর্ম'—তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ নিবেদিতা বললেন—আমাকে সেই ব্রতেই দীক্ষা দিন আপনি।

ব্রজরাখালের কথার শব্দ যেন গান হয়ে ভাসতে লাগলো বাতাসে। ভূতনাথ চুপ করে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। কান পেতে শুনতে লাগলো সে গানের সুর।

—তারপর সেই দীক্ষা, কী কঠোর সে ব্রত! অতি প্রত্যূষে ওঠা, দিনে একবার আহার, আরো কত কী! তারপর এল দীক্ষা নেবার দিন! নিবেদিতাক অপরিগ্রহ, শৌচ আর ব্রতনিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করতে হবে! আজীবন রক্ষা করতে হবে সে ব্রত। হোমের আগুনে সর্বস্ব তাঁর আহুতি দিতে হবে। হোমের আগুনে ঘি, ফুল-ফল বেলপাতা, দুধ সব আহুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপাঠ হলো—'যিনি সমস্ত বাসনা কামনা ত্যাগ করেছেন, যিনি বীতক্রোধ, অদ্বেষ্টা, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী, দান, শৌচ, সত্য আর অহিংসাই যাঁর জীবন, তিনিই ধন্য, তিনি ঈশ্বরে লগ্নচিত্ত, তাঁর সমস্তই ঈশ্বরে অর্পিত...'। তারপর নিবেদিতা সাষ্টাঙ্গে গুরুকে প্রণাম করলেন। বিবেকানন্দ তাঁর কপালে ভস্মতিলক পরিয়ে দিলেন। সে তো ভস্ম নয়, সে বুঝি নিবেদিতারই জীবনের দগ্ধাবশেষ। তারপর গান হলো—'হে অগ্নি, হে পাবক, হে অমৃত, হে বনস্পতি, হে প্রাণ, নৈঃশব্দের সাক্ষী হে দ্যুলোক, হে গুরু, এই দেখো আমার পার্থিব যা কিছু এই অগ্নিতে আহুতি দিলাম, আহুতি দিলাম আমার অহংকে। হে অগ্নি আমায় গ্রাস করো—হরি ওম্ তৎসৎ, হরি ওম্ তৎসৎ...'

কথা শেষ করে ব্রজরাখাল বললে—আজই সিস্টার নিবেদিতার মুখে এই গল্প শুনে আসছি কদম। এই রকম দশ-বারোটা ছেলে হলেই চলবে—তা হলেই একটা নেশন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

তারপর হঠাৎ বললে—আজ তা হলে তোমরা এসো কদম—রাত হচ্ছে।

—কখন আবার তা হলে দেখা হচ্ছে বড়দা?

ব্রজরাখাল বললে—দেখা করার কি আর দরকার আছে আমার সঙ্গে?

কদম বললে—তবু যদি কিছু প্রয়োজন হয়?

—তা হলে বেলুড়ে যেও, এ ক'দিন তো আছিই, তারপর কোথায় থাকবো জানি না।

উঠলো সবাই। সবার চোখ যেন ছল ছল করছে। আস্তে আস্তে সবাই ব্রজরাখালের পায়ের ধূলো নিয়ে চলে গেল। সবাই চলে যাবার পর ব্রজরাখাল একবার চাইলে ভূতনাথের দিকে। এতক্ষণ ভূতনাথ অভিভূতের মতন চেয়ে ছিল। কথা বলার সাহস হচ্ছিলো না। ভূতনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় মেরে হেসে উঠলো ব্রজরাখাল—তারপর কী খবর তোমার বড়কুটুম?

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। এতদিন যার জন্যে অপেক্ষা করে আছে ভূতনাথ, আর শেষে এই তার পরিণাম!

ব্রজরাখাল জুতো পায়ে দিয়ে বললে—কথা বলছো না যে বড়কুটুম—হলো কী?

ভূতনাথ শুধু বলতে পারলো—তুমি চললে নাকি?

—হ্যাঁ বড়কুটুম, চললুম।

—থাকবে কোথায়? খাবে কোথায়?

ব্রজরাখাল বললে—এখানে থাকতে তো আসিনি, আর খাবো বেলুড়েই।

—আবার কবে আসবে ব্রজরাখাল?

—আর তো আসবো না আমি—বলে সেই সৌম্য হাসি হাসতে লাগলো ব্রজরাখাল।

—তা হলে, বেলুড়ে তোমার দেখা পাওয়া যাবে?

—দেখা করতে যেও না তুমি বড়কুটুম—দেখা হয়তো পাবে না আর।

—কেন?

—এতদিন পরে দীক্ষা নিলুন বড়কুটুম, আগে নিইনি, কিন্তু এখন কেন নিয়েছি তা তো শুনলে।

গেট পর্যন্ত চলতে চলতে আর কোনো কথা বললে না ব্রজরাখাল। ভূতনাথও চলতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে।

গেট-এর কাছে আসতেই ব্রিজ সিং সেলাম করলে ব্রজরাখালকে। স্মিত হাসি দিয়ে ব্রজরাখাল তাকে আপ্যায়ন করলো। তারপর রাস্তায় পড়েই ব্রজরাখাল বললে—এবার তুমি ফেরো বড়কুটুম।

ভূতনাথ তবু একটু যেন দ্বিধা করতে লাগলো। ব্রজরাখাল আস্তে আস্তে চলতে লাগলো সামনের দিকে। তার যেন কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। পেছন ফিরে একবার তাকালেও না সে।

ভূতনাথের চোখ ফেটে কান্না আসতে লাগলো। ব্রজরাখাল এমন নিষ্ঠুর হতে পারলো কেমন করে! কোথা থেকে কোন্ শক্তি সে আহরণ করেছে! কোন্ মন্ত্র সে পেয়েছে! ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই তার কাছে! না কি ভালোবাসার ওপরে, অনেক ওপরে, ভালোবাসাকে ছাপিয়ে যে পরম কর্মচেতনা—তাকে চিনতে পেরেছে। সিস্টার নিবেদিতা যা পেরেছিলেন?

. ভূতনাথ দৌড়ে গিয়ে আবার ব্রজরাখালকে ধরলে।

—কী? আবার কী চাও বড়কুটুম?

—আমায় তো কিছু বলে গেলে না?

—কী বলবো তোমাকে? কী শুনতে চাও? থামলো ব্রজরাখাল একবার।

—যা তোমার খুশি।

—কী বললে খুশি হবে?

—যা হোক কিছু, আমার পাথেয় হয়ে থাকবে।

—তবে বলি—আশীর্বাদ করি—তোমার কল্যাণ হোক।

ভূতনাথ চুপ করে রইল। ব্রজরাখাল বললে—খুশি তো?

মাথা নাড়লে ভূতনাথ। তারপর ব্রজরাখাল আবার বনমালী সরকার লেন দিয়ে তেমনি ধীর মন্থর গতিতে চলতে লাগলো। একবার পেছন ফিরে তাকালো না পর্যন্ত।

ব্রজরাখাল সেদিন 'কল্যাণ হোক' বলে আশীর্বাদ করেছিল বটে কিন্তু সত্যি কি ভূতনাথের কল্যাণ হয়েছিল? এক-একবার সন্দেহ হয় ভূতনাথের। আবার মনে হয়, কল্যাণই তো হয়েছে। ব্রজরাখালের

আশীর্বাদ তো তার জীবনে সফলই হয়েছে। সমস্ত পাপ, সমস্ত প্রলোভন, সমস্ত কামনাকে যে সে ত্যাগ করতে পেরেছে, সে-ও কল্যাণ বৈকি। জবা তার জীবনে যে-ঝড় বইয়ে দিয়েছিল, কেমন করে সে-ঝড়কে সে সেদিন প্রশমিত করতে পেরেছে? আর ছোটবৌঠানের অত নিবিড় সান্নিধ্যও তো তাকে... কিন্তু সে-কথা এখন থাক!

সাইকেলে চড়ে পটলডাঙায় তাগাদায় যেতে যেতে ননীলালের কথা মনে হলো হঠাৎ। অনেকদিন ননীলালের সঙ্গে দেখা নেই। তা ছাড়া ননীলাল সেদিন তাকে না বলে জবাদের বাড়ি কেনই বা গিয়েছিল তাও জানা হয়নি।

পুরনো বাড়িটার সামনে আসতেই দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে—সাহেব হ্যায়?

দারোয়ান বললে—সাহেব ভবানীপুরের নয়াকুঠিতে আছে।

—নয়া কুঠি? ভূতনাথ বুঝতে পারলে না। আবার বললে—ননীলাল সাহেব আপিস থেকে ফিরেছে আজ?

এবার দারোয়ান ভালো করে বুঝিয়ে দিলে। সাহেব নতুন বাড়ি তৈরি করেছে ভবানীপুরে, সেখানেই থাকে আজকাল। এ-বাড়িতে শুধু ননীলালের শ্যালকরা থাকে। নাবালকদের নিয়ে ননীলাল সেখানে গিয়ে উঠেছে। তাও বেশি দিন নয়, মাত্র মাস খানেক হয়েছে। এখানে আসে বটে মাঝে মাঝে। এ-বাড়িটা তো শ্বশুরবাড়ি। এখানে তার থাকাও উচিত নয়। তা ছাড়া এ-পাড়াটাও নাকি সাহেবের পছন্দ হচ্ছিলো না। বড় মোটরগাড়ি রাস্তায় ঢোকে না। সাহেব-মেমদের আসতে-যেতে অসুবিধে। তাই ভবানীপুরে নতুন রাস্তা হয়েছে এখন এলগিন রোড—সেখানে নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েছে। ননীলালের বিধবা শাশুড়ি থাকেন এ-বাড়িতে বড়ছেলের সঙ্গে, আর ননীলাল এলগিন রোড-এর বাড়িতে উঠে গিয়েছে মেমসাহেবকে নিয়ে।

—কত নম্বর?

পকেট থেকে নোট বইটা বার করে বাড়ির নম্বরটা টুকে রাখলে ভূতনাথ। বিলের টাকা, ইঁট, চুন, সুরকির ভাউচার, রাজমিস্ত্রীদের হাজরে-খাতা সব সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হয় রোজ। সরকার সেটা বড় খাতায় তুলবে তবে ছুটি। কিন্তু এক-একদিন এই ছুটি হতেই রাত সাতটা-আটটা বেজে যায়। রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে এক-একদিন দেখা হয়ে যায়। একটা ছোট নমস্কার করে ভূতনাথ। যেদিন ব্যস্ত থাকেন রূপচাঁদবাবু, সেদিন দেখতেই পান না ভূতনাথকে। সামনের উঠোনে সার-বন্দি হয়ে বসে থাকে কুলী, মিস্ত্রী, কারিগরের দল। হপ্তায়-হপ্তায় তাদের পেমেন্ট। রূপচাঁদবাবুর সামনে বিড়ি খায় না তারা আর বাবু এলেই সব গোলমাল থেমে যায়। তার আগে পর্যন্ত যত ঝগড়া, বকাবকি।

মিস্ত্রীরা বললে—বাবু তো ভালো লোক হুজুর—ওই সরকারটাই পাজী।

কতখানি কাজ হলো, তার মাপজোক নেয় ইঞ্জিনীয়ার-ওভারসিয়ারবাবু। তাঁদের মাপজোকের হিসেবও বড়খাতায় উঠে যায়। দামী দামী মাল কিনতে যায় ওভারসিয়াববাবুরা। ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে ওভারসিয়ারবাবুদের সড় থাকে। মোটা মাল কেনবার সময় কমিশন রেখে দেয় ওদের জন্যে। সে-কমিশন আবার ভাগ হয় ওদের মধ্যে আড়ালে।

বুড়ো মিস্ত্রী ইদ্রিস বলে—এ মাসে কত পেলেন বাবু?

—বারো টাকা—যা বরাবর পাই।

—তা বলছিনে, দস্তুরি কত পেলেন?

অবাক হয়ে যায় ভূতনাথ—কিসের দস্তুরি?

—আপনাকে দেয় না বুঝি?

ইদ্রিসের কাছেই প্রথম জানতে পারে ভূতনাথ।

আপনি এবার চাইবেন হুজুর, না চাইলে দেবে কেন?

—থাক গে, আমার ওতে দরকার নেই—ভূতনাথ কেমন যেন ভয় পায়।

—তা বলে আপনার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবেন না? অন্য বিল্‌বাবুরা যে পায়।

—থাক ইদ্রিস, বাবুর কানে গেলে আবার এত কষ্টের চাকরিটা আমার শেষকালে হয়তো চলে যাবে।

ইদ্রিস বলে—চাকরি যাবে কেন, বাবুর তো তাতে লোকসান নেই, দস্তুরি তো দেয় দোকানদারেরা।

তা হোক, তবু ও-সব পথে না যাওয়াই ভালো। কী এমন তার ক্ষতি হচ্ছে? আগে পেতো সাত টাকা 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে, এখন বারো টাকা। তা ছাড়া ট্রাম ভাড়ার খরচা নেই।

সরকার বলে—আপনার কথা আলাদা মশাই, আপনার সঙ্গে কার তুলনা?

—কেন?

—আপনি হলেন বাবুর পেয়ারের লোক, এই দেখুন না, সব বিল্‌বাবুরা পায় সাত টাকা করে, আপনি ভর্তিই হলেন বারো টাকায়, আপনাকে কে ঠেকায়?

—কেন ওকথা বলছেন সরকারমশাই, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি যদি থাকে তো অনেক ভাগ্যি বলতে হবে। কত জায়গায় পুজো দিচ্ছি, কালীঘাটে কতদিন গিয়ে কত মানত করে এসেছি।

সরকারমশাই-এর হাতের কাজ বোধ হয় সেদিন কম ছিল। মুখে পান পুরে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে—আপনাকে ঠেকায় কে মশাই? দেখবেন তবে, আমাদের চাকরিটা যেন থাকে।

—সে কি বলছেন?

—ঠিকই বলছি, এই বলে রাখলুম, মনে রাখবেন, আপনি কি আর বেশিদিন বিলবাবু থাকবেন, ওভারসিয়ার হলেন বলে!

কথাটা জানাজানি হয়েছে তা হলে। সুবিনয়বাবুর বিশেষ সুপারিশেই তার চাকরি। সব কর্মচারীই যেন তাকে বেশ সম্ভ্রম করে কথা বলে।

ইদ্রিস বলে—যদি দস্তুরি না দেয় তো বাবুকে বলে দিন।

সাইকেল চালিয়ে বড়বাড়ির দিকে আসতে আসতে ভূতনাথ সেই কথাই ভাবছিল—সব চাকরিতেই ওই রেষারেষি 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসেও সেই ঠাকুর নিয়ে কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল!

ওদিকে রাস্তায় সেই দলটা আবার বেরিয়েছে—'৩০শে আশ্বিন দোকানপাট সব বন্ধ থাকবে। দোকানী দোকান বন্ধ করবেন, কেরানীরা আপিসে যাবেন না, সেদিন অরন্ধন, আমাদের জাতীয় ঐক্যকে স্মরণ করবার জন্যে আমরা পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দেবো—ভাই ভাই এক ঠাঁই—' আর তারপর সেদিন বেলা তিনটের সময় পার্শিবাগানে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হবে, বাঙলা দেশের রাজধানীতে দেশবাসীরা গড়ে তুলবেন 'ফেডারেশন হল্‌', সেই মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করবেন জাতির অগ্রজ শ্রীআনন্দমোহন বসু—'বন্দে মাতরম্‌—'। তারপর সমবেত সঙ্গীত করতে-করতে চললো সবাই—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান—

গুটি চার-পাঁচ ছেলে। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে ওদের উপস্থিতি নজরেই পড়ে না বিশেষ। তবু কী উৎসাহ নিয়েই না বলে চলেছে! কী অদম্য উৎসাহ! রোজই এমনি করে। অথচ লোকে যে খুব উৎসাহ দেখায় তা নয়।

সাইকেল ঘুরিয়ে ভূতনাথ বনমালী সরকার লেন-এ ঢুকলো এবার। বড়বাড়িতে আজকাল আর তেমন যেন জাঁকজমক নেই। তবু দিনের শেষে এখানে আসবার জন্যে ভূতনাথের ছটফটানির আর অন্ত থাকে না। ব্রিজ সিং এখন একাই ডিউটি করে।

একদিন ভূতনাত জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার দোস্তভাই—নাথু সিং কোথায় গেল?

—ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে এক মাসভি হলো, আর আসছে না শালাবাবু।

—তা বলো না কেন সরকারবাবুকে, আর একজন রাখতে—একা দিনরাত পাহারা দিতে পারবে কেন?

তা পাহারাও আজকাল সেই রকমই দেয় ব্রিজ সিং। বন্দুকটা পাশে রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খৈনি ঘষে। উর্দির আর সে-বাহার নেই। শুধু গাড়ি-টাড়ি এলে-গেলে চিৎকার করে ওঠে—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার হো—

এদানি ইব্রাহিমের ঘরের সামনে রেড়ির তেলের বাক্স-বাতিটা আর জ্বলে না। একদিন ঝড়ে পড়ে গিয়েছে উঠোনের ওপর। তারপর থেকেই অন্ধকার। সন্ধ্যাবেলা থেকেই উঠোনটা অন্ধকার। আস্তাবল বাড়িটাতে তেমন গাড়ি-ঘোড়ার আসা-যাওয়া নেই। ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেটখানা সেই যে সেদিন জানবাজার থেকে এসে ঢুকেছে ওখানে আর বোধ হয় বেরোয়নি। ভালো করে ধোয়ামোছাও হয় না আজকাল।

—কেমন আছো আজকাল বংশী?

আস্তে আস্তে হাঁটে বংশী। এখনও দুর্বল। তেমন করে ছোটাছুটি করতে পারে না। বলে—এখন একটু ভালো আছি শালাবাবু।

—ছোটমা তোমার কেমন আছে?

—কেউ ভালো নেই শালাবাবু, কেউ ভালো নেই, সেই যে ছোটবাবু পড়েছে, আজও উঠতে পারলো না, আমি তো উঠে হেঁটে দিব্যি বেড়াচ্ছি। আজও শশী ডাক্তার এসেছিল, বললে—এখনও সময় লাগবে। শশী ডাক্তার মদ খেতে একেবারে মানা করে দিয়েছে আজ্ঞে।

ভূতনাথ বললে—তা বলে ছোটবাবু কি আর সত্যি-সত্যি মদ ছাড়তে পারবে?

বংশী বলে—না শালাবাবু, তাই তো আশ্চর্য হয়েছি, ছোটবাবু আর মদ ছোঁয় না, বলে—আমার সামনে ও-বিষ আর আনবি না, আমি খেতে চাইলেও দিবিনে আমাকে।

—সত্যি?

—আজ্ঞে, মা কালীর দিব্যি বলছি, একদিনও খায় না, আমার হাতেই তো মদের আলমারির চাবি ছিল, সব ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছি—চাইলেও আর পাবে না কেউ।

—সে কি? ভূতনাথও কম অবাক হয়নি। এ-ও কি সম্ভব?

—চেহারা যদি দেখেন ছোটবাবুর তো আপনি আরো অবাক হয়ে যাবেন। এই এমনি হয়ে গিয়েছে—বলে হাতের কড়ে আঙুলটা উঁচু করে দেখায়।

—হ্যাঁ শালাবাবু, এই এমনি রোগা হয়ে গিয়েছে। উঠতে হাঁটতে তো পারে না, কেবল শুয়ে পড়ে আছে—খুব যখন খেতে ইচ্ছে করে, তখন সোডা খায় কেবল, আস্তে আস্তে ধরে তুলে পিঠে বালিশ দিয়ে বসিয়ে দিই দিনের বেলা, আবার শুইয়ে দিই খানিক পরেই, বলে—পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছে একনাগাড়ে শুয়ে শুয়ে—আমি না হলে ছোটবাবুর একদণ্ড চলে না আজকাল। একলা মানুষ কোন্ দিকে দেখি বলুন তো হুজুর।

—আর সব কোথায় গেল?

—এখন বাজার করতেও আমি, তামাক সাজতেও আমি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই একা।

—কেন, লোচন কোথায় গেল?

—কেন, আপনি জানেন না কিছু?

—আমি তো বেরোই সেই সকালবেলা, তারপর দুপুরবেলা ভাত খেতে আসি আধঘণ্টার জন্যে, তারপর সেই আসতে যার নাম রাত্তির হয়ে যায়।

—তা তো জানিই। লোচন তো সেই পান-বিড়ির দোকান করেছে বড়বাজারে না কোথায়, কিন্তু মধুসূদন সেই যে দেশে গেল আর আসবার নামটি নেই হুজুর, কী নেমকহারাম দেখুন, এই বড়বাড়ির নুন খেয়ে আমরা সাতপুরুষ মানুষ হয়েছি, তোর এই সময়ে যাওয়া ভালো হলো—হ্যাঁ, না হয় বুঝলুম মাইনে পায়নি ক'মাস, আরে মাইনেটাই বড় হলো, এই যে আমরা ভাইবোনে সাত মাস

মাইনে পাইনি—কিছু বলেছি?

মেজবাবু রোজ গাড়ি নিয়ে বেরোয় না আজকাল। যেদিন বেরোয় দেরি করে, সেদিন দেখা হয়ে যায়। সেই বড়মাঠাকরুণ, মেজমাঠাকরুণ থাকে সঙ্গে। আর থাকে হাসিনী। পানের ডিবে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে ওঠে। ভৈরববাবু আজকাল নিয়ম করে রোজ আসতে পারে না। বয়েস তো বাড়ছে। আর তেমন ফূর্তিও নাকি হয় না আজকাল। রাত বারোটা না-বাজতেই আবার মেজবাবু ফিরে আসে। ঘুমের মধ্যে গেট-এর ঘড়ঘড় শব্দ কানে আসে। আস্তাবলবাড়িতে ঘোড়া এসে ঢোকে। অন্ধকার উঠোন। তারই মধ্যে পা ঠুকে-ঠুকে ইব্রাহিম গিয়ে ওঠে নিজের ঘরে।

বিধু সরকারের ঘরের সামনেও আজকাল বেশি ভিড়।

শুধু বরফওয়ালা নয়, মুদিখানার লোক আসে, কাপড়ওয়ালা আসে, গয়লা আসে, মিস্ত্রীমজুর আসে। বিধু সরকারের মেজাজ আরো উগ্র হয়েছে। বলে—খ্যাচ খ্যাচ করিস কিসের জন্যে শুনি? পাওনা কি কখনও পাসনি? তবে এত হেনস্তা কেন? পাবি, পাবি, পাবি, ব্যাস্ এই বলে রাখলাম। বাবুদের ধর্মের পয়সা, অধর্ম বাবুরা করবে না—তোদের দুটো পয়সা মেরে বাবুরা বড়লোক হবে নাকি!

কিন্তু রাত্রে যেন সেই সুরটা আজকাল বড় ঘন-ঘন শোনা যায়। খিড়কির দিকের সেই নারকোল গাছটার গোড়ায় একতলার সিঁড়ির নীচে থেকে প্রথমে মৃদু একটা সুর ওঠে। তারপর তার ব্যাপ্তি বাড়ে। প্রদক্ষিণ করে সমস্ত বাড়িটা। দক্ষিণের বাগানটা ঘুরে এসে যেন দাঁড়ায় একেবারে বড়বাড়ির অন্ধকার উঠোনে। চায় এদিক-ওদিক একবার। তারপর ওঠে ছাদের ওপর। তখন সে-সুরটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। আকাশে-বাতাসে সেই তীব্র সুর সমস্ত অন্তরীক্ষ ছাপিয়ে একটা আর্তনাদের মতো আওয়াজ করে। সে-আর্তনাদে বড়বাড়ির ভিত্ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। তারপর ভোরের দিকে যখন দক্ষিণের বাগানের আমলকি গাছটার ডাল থেকে সেই অদ্ভুত পাখীটা ডাকতে ডাকতে কোথায় হঠাৎ উড়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে থেমে আসে সে-সুর! তখন বুঝি আবার গিয়ে ঢুকে পড়ে সেই অন্ধকূপ কোঠরে। দিনের আলোয় লোকালয়ে বুঝি এর বেরোনো নিষেধ।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে গিয়েও যেন আলস্য ধরে ভূতনাথের। সারা শরীর যেন ব্যথা করে। আর মন? মন কি ব্যথা করে না? কে জানে মনের খবর! নিজের মন নিয়ে কখনও মাথা ঘামাবার তো সময় হয়নি। একবার এক জায়গায় হয়তো একটু সময় হয়েছিল—কিন্তু সে কথা তো ভুলে যাওয়াই ভালো। এক-একবার মনে পড়ে, পটেশ্বরী বৌঠানের কথা। ভাবলেই কেমন যেন ভয় করে। অত যার রূপ, অতখানি যে স্নেহ করে, ভালোবাসে, তাকে এতখানি ভয় করা যেন অন্যায়। তবু মুখ দেখাতেই কেমন যেন ভয় হয়। কেমন করে মুখ দেখাবে সে! বৌঠানের মুখখানা যদি কালো দেখে, যদি দেখে সে-মুখেও হাসি নেই—তা হলে? তা হলে সহ্য করবে কী করে ভূতনাথ? যদি দেখে, বৌঠানও শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অত্যাচারে, রাত জাগায়, হতাশায় আর দীর্ঘশ্বাসে? তার চেয়ে না দেখা করাই ভালো। বার বার চোরকুঠুরির বারান্দায় দরজাটার সামনে গিয়েও কতদিন দাঁড়িয়েছে। খিলটা খুলতে গিয়ে আবার থেমেছে। কী দেখবে সে! কী শুনবে সে!

কিন্তু রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে এক-একবার সে যায় পটেশ্বরী বৌঠানের ঘরে। বৌঠানের চেহারা দেখে ভূতনাথ চমকে যায়। এ কি চেহারা হয়েছে? কোথায় গেল সেই রূপ! কোথায় গেল সেই লাবণ্য! সেই স্তিমিত-ভাস্বর চোখ। আর সেই চোখের চাউনি?

বৌঠান বলে—ভূতনাথ, তুই বেইমান।

ভূতনাথ অপরাধীর মতো চুপ করে থাকে। বৌঠান বলে—তোকে খাওয়ালুম, পরালুম, আর আমার কাছে তুই একবারও আসিস নে, আমি তোর কী সর্বনাশ করেছি?

ভূতনাথ অনেকক্ষণ পরে বলে—তোমার কেন এমন হলো বৌঠান, তোমাকে তো আমি এমন করে দেখতে চাইনি!

বৌঠান বলে—কেন, আমার তো কিছুই হয়নি, আমি তো এখন সুখী ভূতনাথ, ছোটকর্তা তো এখন বাড়িতে থাকে রে আজকাল। আমার তো আর কোনো দুঃখ নেই—কেন তুই ভাবছিস?

ভূতনাথ বলে—তোমার চেহারা তবে কেন এমন হলো?

—কই, কী হয়েছে চেহারার?

—তা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে না যে—তুমি হাসো না যে আগের মতো।

—এই তো হাসছি—এই দ্যাখ—কত হাসছি—বলে হো-হো করে হাসতে লাগলো বৌঠান। হাসতে হাসতে হঠাৎ সে-হাসি যেন কান্নায় পরিণত হয়। গলা চিরে যায় বৌঠানের। সেই কান্নার শব্দে হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায় ভূতনাথ। চারিদিকে চেয়ে দেখে—কেউ কোথাও নেই। শুধু অন্ধকার চোরকুঠুরি। ভূমিপতি চৌধুরীর অভিসার-কক্ষ! সমস্ত কলকাতা নিঃশব্দ, নিঝুম, নিশুতি। নিচে আস্তাবলে ঘোড়াদের পা ঠোকার শব্দ পর্যন্ত নেই, সেই রাতজাগা পাখীটা পর্যন্ত আর ডাকে না বাগানের আমলকী গাছটা থেকে। মনে হয় এ-যেন বড়বাড়ি নয়—এ প্রেতপুরী।

কিন্তু ভবানীপুরে গিয়ে দাঁড়ালে রাত্রের স্বপ্ন আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। সার-সার বাড়ি তৈরি হচ্ছে রূপচাঁদবাবুর। ইঁট, কাঠ, লোহা, চুন, সুরকি, ছাদ পেটানোর সুর। কলকাতা এখানে আবার যেন যৌবন ফিরে পেয়েছে। ছাদের পর ছাদ উঠছে। এক-একটা বাড়ি শেষ হয়, আর নতুন লোকজন আসে গাড়ি করে। খাট, টেবিল, চেয়ার, আসবাবপত্র এসে নামে। ভরে যায় লোক শহরে। দু'দিনেই চেহারা ফিরে যায় রাস্তার।

ইদ্রিস বলে—দস্তুরির কথা বলেছিলেন বাবুকে?

—না, বলিনি ইদ্রিস।

—তা যদি বলেন তো আমিই বলতে পারি আপনার হয়ে।

—না, তোমাকে আর বলতে হবে না ইদ্রিস।

—আমি ওভারসিয়ারবাবুদের বলবো। আপনার ন্যায্য পাওনা কেন দেবে না হুজুর?

ইদ্রিসের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে ইদ্রিসই থাক, ভূতনাথের তাতে দরকার নেই। ব্রজরাখাল তাকে আশীর্বাদ করে গিয়েছে, তার কল্যাণ হবে। ব্রজরাখালের কথা কি মিথ্যে হবে! কিন্তু জীবনে এর বেশি কিছু তো চায়নি ভূতনাথ। ফতেপুরে মঙ্গলচণ্ডীতলায় প্রণাম করে ভূতনাথ ছোটবেলায় একদিন যা কামনা করেছে, বনমালী সরকার লেন-এর নরহরি মহাপাত্রের দেবতামণ্ডলীর সামনে প্রণাম করেও সেই একই প্রার্থনা তো সে করেছে। যেন কল্যাণ হয়। কল্যাণ শুধু নিজের নয়। সকলের কল্যাণ। ব্রজরাখালের কল্যাণ, ছোটবৌঠানের কল্যাণ, জবার কল্যাণ, বংশীর কল্যাণ—সকলের, সকলের। কাউকে বাদ দিয়ে তার নিজের কল্যাণে দরকার নেই!

সেদিন হঠাৎ ভবানীপুর দিয়ে চলতে চলতে এলগিন রোড-এর সামনে এসেই থমকে দাঁড়ালো ভূতনাথ। ননীলালের সঙ্গে একবার দেখা করলে হয় না! পকেট থেকে ঠিকানা লেখা নোট বইটা বের করে একবার দেখলে বাড়িগুলোর সামনে। আশ্চর্য! সামনের বাড়িটাই ননীলালের। কী বিরাট বাড়ি! প্রাসাদ বললেও চলে। সাইকেল থেকে নেমে পড়লো ভূতনাথ।

—ননীবাবু আছে? ননীলালবাবু? সামনের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে হলো।

দারোয়ান ভুল শুধরে দিলে—বাবু নেই—সাহেব আছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে ভূতনাথ আবার বললে—সাহেব বাড়িতে আছে?

দারোয়ান বললে—সাহেব বেরিয়ে গিয়েছে।

—কখন ফিরবে?

—কিছু ঠিক নেই।

দারোয়ানের উত্তরগুলো শুনতে ভালো লাগলো না অবশ্য। হয়তো তার চেহারা দেখে ঠিক অনুমান করতে পারছে না, সাহেবের সঙ্গে তার আত্মীয়তা কতখানি। তবু দারোয়ানের কথায় মন খারাপ করা বোকামি। আবার জিজ্ঞেস করলে—কালকে সন্ধ্যাবেলা এলে দেখা হবে?

—না।

—পরশু সকালবেলা?

—না।

—তারপর দিন?

—না বাবু, না। সাহেব বিলাইত চলে যাবে কাল।

বিলেত? ননীলাল বিলেত যাবে! আবার জিজ্ঞেস করলে—কালই যাবে?

—হ্যাঁ বাবুজী।

ভূতনাথ অগত্যা সাইকেল-এ উঠলো। কালকেই ননীলাল বিলেত যাচ্ছে। একবার তার আগে দেখা করা যায় না? একসঙ্গে পড়েছে দু'জনে, এক ইস্কুলে, একই ক্লাশে। কী ভালোই যে লাগতো তখন ননীলালকে। তার হাতের চিঠিটা বোধ হয় আজও টিনের স্যুটকেসের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে। কোথা থেকে মানুষের কী হয়ে যায়! বাড়িখানার দিকে আবার পেছন ফিরে দেখলে ভূতনাথ। কত বড় বাড়ি। বড়বাড়ির চেয়েও বড়। উত্তরমুখো। কিন্তু সমস্ত রা স্তা জুড়ে রয়েছে সামনের দিকটা। দক্ষিণ দিকেও কতদূর পর্যন্ত প্রসার কে জানে। সবটা এখান থেকে দেখা যায় না। জানলায়-জানলায় পর্দা। তামার প্লেট-এর ওপর ননীলালের পুরো নামটা লেখা। কেমন করে এ হলো? ও-দিকে বড়বাড়ির চৌধুরীরা কেন পড়ে যাচ্ছে, আর এদিকে এরা ওঠে কী করে? ওদের তো অনেক টাকা। ননীলালেরই তো টাকা ছিল না। কত দিন টাকা ধার করে নিয়ে গিয়েছে ছুটুকবাবুর কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত সে-টাকা তো শোধই দিলে না। তবে কেন এমন হয়? ননীলাল অবশ্য বলেছিল একদিন—ওরা যে বসে-বসে খায়।

কিন্তু ননীলালও তো বসে খায়। কী এমন পরিশ্রম করে সে? গাড়িতে করে শুধু তো ঘুরে বেড়ায়। টাকা ওড়ায় দু'হাতে। মেয়েমানুষ তো ননীলালও রাখে। কত কাণ্ডই করেছে ননী জীবনে! ছুটুকবাবুকে ওই ননীলালই তো নিয়ে গিয়েছিল মতিয়া বাঈজীর বাড়িতে! তবে?

আর ওই তো রূপচাঁদবাবু। কী নিষ্ঠা নিয়ে ব্যবসা করছেন। মাসে-মাসে মাইনে দিয়ে যাচ্ছেন ঠিক। এতগুলো ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, বিল্‌বাবু, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী খাটছে। নতুন শহর গড়ে তুলছেন ভবানীপুরে। লোহা, কাঠ, ইঁট দিয়ে স্বপ্ন গড়ছেন মানুযের, ভবিষ্যৎ পাকা করে তুলছেন নিজের, পরের, সকলের।

রূপচাঁদবাবু বলেন—ভাঙা-গড়াই নিয়ম—নদীর যখন এ-পার ভাঙে, তখন ও-পার গড়ে ওঠে।

ভবানীপুরের নতুন পাড়ার ছেলেরা খেলা করে পার্কে। ফুটবল খেলে, গান গায়। ওরা গড়ে উঠছে বুঝি। কিন্তু একদিকে গড়ে তুলতে গেলে আর-একদিক কি ভাঙতেই হবে?

সেদিন ইদ্রিস কাজে আসেনি। কাজকর্ম বন্ধ হবার যোগাড়।

পরদিন আসতেই প্রশ্ন। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, ওভারসিয়ারবাবুও রেগে আগুন। ওভারসিয়ার বলে—ফুরনের কাজ আমাদের—তুমি কী বলে কামাই করলে? একটা আক্কেল নেই তোমার?

ইদ্রিস বলে—আমারই না-হয় রোজটা নষ্ট হলো—আপনাদের কী ক্ষতিটা হলো শুনি?

—আমাদের আবার ক্ষতি কী? কিন্তু বাবুকে তো খেসারত দিতে হবে।

—কীসের খেসারত? আর যদি খেসারত দিতেই হয় তো দিন না, কত দিক থেকে লাভ তো হচ্ছে বাবুদের—একটু না-হয় ক্ষতিই হলো!

—ওই কথা বাবুকে গিয়ে বলবো আমি?

—বলুন গে আপনি, আমরা কাজের ভয় করি না, যেখানে যাবো, সেইখানেই কাজ মিলবে আমাদের, কাজের কি অভাব আছে ওভারসিয়ারবাবু, কাজের অভাব নেই আজকাল। তামাম ভবানীপুর পড়ে আছে, সব বাড়ি হবে—আমাদের ডাকতেই হবে।

—নাও, নাও, কাজ করো, কেবল কথা—ওভারসিয়ারবাবু গজগজ করতে করতে চলে যায়।

তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে ইদ্রিস বলে—দেখুন তো বিল্‌বাবু, খামকা ঝগড়া করে—ভারি ভদ্রলোক হয়েছে আমার! আমাদের চটালে আমরাও ফাঁকি দিতে জানি, এমন বাড়ি বানাবো, দু'দিনে দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে... উঠে যাবে কোম্পানী।

ভূতনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বলে—চুপ করো ইদ্রিস, কেন ঝামেলা বাড়াও, তা সত্যি কালকে আসোনি

কেন?

ইদ্রিস বলে—আসবো কী করে বিল্‌বাবু—যে-বস্তিতে ছিলাম, সেখান থেকে কাল ঘরদোর সব তুলে নিয়ে যেতে হলো যে।

—কেন?

—আমাদের বস্তিতেও বাড়ি হবে যে, পাঁচশ' লোকের বাস, রাতারাতি উঠতে পারা যায়? বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে আবার এক জায়গায় আস্তানা পেলে তবে তো!

—তোমাদের বস্তিতেও বাড়ি হচ্ছে বুঝি?

—হ্যাঁ বিল্‌বাবু, বাড়ি হলেই তো ভালো আমাদের, কাজ পাবো, তা বুঝি—কিন্তু নিজেদের তো আর থাকা হবে না!

ভূতনাথ ভাবলে—এ তো বেশ মজার।

ইদ্রিস বলে—তাই তো ভাবি—বাড়ি করবো আমরা, থাকবে অন্য লোক। এই দেখুন না, ভবানীপুরের বস্তিতে ছিলাম, এখন উঠে গেলাম বালীগঞ্জের ধোপাপাড়ায়, তারপর যখন আবার বালীগঞ্জে শহর তুলবে, তখন যাবো বেহালায়।

পরদিন ননীলাল সেই কথাই বলেছিল।

ভোরবেলাই সেদিন বেরিয়ে পড়েছিল ভূতনাথ। অল্প-অল্প কুয়াশা চারদিকে। রাত থাকতে থাকতে উঠতে হয়েছে। চাকর-বাকর কমে গিয়েছে আজকাল বড়বাড়িতে। সব সময় জল থাকে না ভিস্তিখানায়। অত সকালে কলেও জল আসে না। কেউ দেখবার আগেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে। রাস্তা তখন নির্জন। যখন এলগিন রোড-এ এসে পড়লো তখন বেশ ফর্সা হয়েছে। ননীলাল বরাবরই ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে। দেখা করবার এইটেই সময়। তবু এরই মধ্যে ননীলালের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আরও অনেক লোক জড়ো হয়েছে। দারোয়ান যে-ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল, সে-ঘরটার ভেতর চার-পাঁচটা বেঞ্চি। আরো ক'জন বসে আছে। কিন্তু বসে বসে ক্লান্তি ধরে গেল ভূতনাথের।

পাশের লোকটি হঠাৎ বললে—আপনি কোত্থেকে আসছেন স্যার?

ভূতনাথ চেয়ে দেখলে লোকটার দিকে। গরীব লোক। বেঞ্চির ওপর একটা পা তুলে বসে আছে। ভূতনাথ বললে—বৌবাজার থেকে।

—চাকরির জন্যে বুঝি?

—না।

—তবে কি দালালি?

—না।

অন্য লোকগুলো তাদের কথা শুনছিল। কেউ-কেউ ভদ্র চেহারার, একজন শুধু কোট-প্যান্ট পরা সাহেব। সবাই প্রতীক্ষমান। নতুন বাড়ি। নতুন দেয়াল। দেয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে—'গোলমাল করিবেন না'।

আগের লোকটি এবার বললে—আমি আসছি মশাই বরানগর থেকে।

—সে তো অনেক দূর।

—তা অনেক দূর বললে তো চলবে না, পেটের দায়ে লোকে কাঁহা কাঁহা যায়, এ তো সামান্য। সেই রাত থাকতে বেরিয়েছি, শুনলুম কিনা সাহেব চলে যাবে আজ।

ভূতনাথ বললে—আমিও শুনেছি।

—তবে তো ঠিকই বলেছে হরিহরদা—হরিহরদা কাজ করে কিনা সাহেবের আপিসে, আমাকে বলেছে—সাহেবের পা গিয়ে জড়িয়ে ধর—একটা হিল্লে হয়ে যাবেই। কী বলেন স্যার, হবে না?

কোট-প্যান্ট পরা লোকটি তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে। সিগারেট খেতে-খেতে একবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। কে জানে কী কাজ ওর। হয়তো চাকরির জন্যেই এসেছে।

এমন সময় হঠাৎ সকলের যেন একটু সন্ত্রস্তভাব দেখা গেল। পাশের ঘরে যেন শব্দ হলো একটু। কোট-প্যান্ট পরা লোকটি হাতের সিগারেট ফেলে দিলে।

দারোয়ান এসে পড়লো। বললে—আপনাদের নাম-ঠিকানা সব এই কাগজে লিখে দিন।

কোট-প্যান্ট পরা লোকটি আগে লিখে দিলে—এস. আর. মিটার।

পাশের লোকটি বললে—আমি তো লিখতে জানিনে স্যার, আপনি একটু লিখে দেবেন?

ভূতনাথ সকলের শেষে লিখলে—ভূতনাথ চক্রবর্তী, বড়বাড়ি, বৌবাজার।

দারোয়ান কাগজ নিয়ে চলে গেল। সব ক'জন লোকই যেন একটু তটস্থ হয়ে বসেছে। এখনি এক-এক করে ডাক আসবে। ভূতনাথও কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। এত লোকের মধ্যে তার নামটাই অদ্ভুত। অমন নাম পিসীমা কেন যে রেখেছিল! বাবার দেওয়া নাম 'অতুলই' তো ছিল ভালো। পিসীমা বলতো—বউ-এর ছেলে হয় আর মরে যায়, শেষে পঞ্চানন্দের দোর ধরে এই ছেলে হলো—সতীশ বললে এর নাম রাখো 'অতুল'—আমি বললাম—পঞ্চানন্দের দোর ধরে হয়েছে, এর নাম থাক ভূতনাথ, তা ভূতনাথ তো ভূতনাথ—ভোলানাথ আমার, খেতে ভুলে যায়, ঘুমোতে ভুলে যায়, এমন ছেলে কোথাও দেখেছো মা তোমরা? ভূতনাথের মনে হয়—কেন, অতুল নাম থাকলেই তো ভালো হতো। অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী। বাবা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন অতুল বলেই কিন্তু ডাকতো তাকে। দারোয়ান হঠাৎ এল আবার। ডাকলে—ভূতনাথবাবু—

এত লোক থাকতে তাকেই প্রথম ডাকা! ভূতনাথ তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

—কী খবর ভূতো, তুই?

ভূতনাথ কী বলে প্রথম কথা বলবে ভাবতে পারলে না। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটলো। সময় পাওয়া গেল না মোটে। আর ননীলালের চেহারাটা কেমন হয়ে গিয়েছে যেন। যেন আরো বয়েস বেড়ে গিয়েছে। ভয় হয় দেখলে। বিরাট একটা টেবিল। চারদিকে কাগজপত্র। একটা কাগজে কী যেন লিখছিল। হাতে তখনও কলমটা রয়েছে। মুখে সিগারেট। চোখে চশমা।

—বোস, তোর চাকরিটা খালি পড়ে রয়েছে—আর দেখাই করলি না তুই—আছিস কোথায়? এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে গেল ননীলাল।

ভূতনাথ বললে—সেই বড়বাড়িতে, আবার কোথায় থাকবো?

—এখনও ওখানে আছিস... কিন্তু চাকরি?

—চাকরি তো একটা করছি রূপচাঁদবাবুর কোম্পানীতে। বিল্ সরকারের কাজ পেয়েছি একটা।

—ভালোই হয়েছে, আমিও চলে যাচ্ছি আজ।

—কোথায়?

—তোকে তো বলেছিলাম, একবার বেড়াতে যাবো—আজই যাচ্ছি—শুধু দেরি হলো চূড়োর জন্যে।

—ছুটুকবাবু? ছুটুকবাবুর জন্যে?

ননীলাল আর একটা সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—হ্যাঁ, ওদের বড়বাড়িটা আমার কাছে বাঁধা রাখলে কিনা—আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না।

বাঁধা! বন্ধক! বড়বাড়ি! কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সমস্ত। ননীলাল এ বলছে কী!

ননীলাল বললে—আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না ভাই, নিজেদের মধ্যে, এতদিনের জানাশোনা, তা ছাড়া ছোটবেলা থেকে ওদের বাড়িতে যাচ্ছি, কত খাওয়া-দাওয়া করেছি ও-বাড়িতে, চূড়োর কাছে কতবার কত টাকা নিয়েছি, শোধ করিনি, তুই তো জানিস কতদিনের আলাপ ওদের সঙ্গে—অথচ তাই-ই করতে হলো—বড় সঙ্কোচ লাগছিল নিজের মনে।

ভূতনাথের মন তখন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। যা শুনছে সব সত্যি! সেই আস্তাবল-বাড়ি, খাজাঞ্চিখানা, তোষাখানা, ভিস্তিখানা, পূজোবাড়ি, বৈদূর্যমণি, হিরণ্যমণি, কৌস্তুভমণি, ছুটুকবাবু, ভূতনাথের জীবনের অর্ধেকের সঙ্গে ও-বাড়ির সমস্তটা জড়িয়ে আছে যে। সেই ভৈরববাবু! ছুটুকবাবুর বিয়ে! আর সকলের চেয়ে সেই পটেশ্বরী বৌঠান। পটেশ্বরী বৌঠানের কী হবে!

বৌঠান বলেছিল—ও-সব কর্তাদের ব্যাপার, আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই না।

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন এমন হলো?

ননীলাল বলতে লাগলো—প্রথমে আমার ইচ্ছে ছিল না, অত বড় বংশ, বনেদী বাড়ি, আমার কাছে যখন চূড়ো প্রস্তাব করলে, তখন আমি বললুম—আমার দ্বারা হবে না ভাই, বলিস তো ও-টাকার জন্যে অন্য লোক যোগাড় করে দিচ্ছি।

চূড়ো বললে—আর কেউ হলে জানাজানি হতে পারে, ওটা তুই-ই দিয়ে দে। আমরা শোধ করে দেবো বছর দু'-একের মধ্যে। সুদ যা বলবি তাই-ই দেব।

শেষে রাজি হলাম—কিন্তু জানি ও আর শোধ হবে না, টাকাও ওদের যোগাড় হবে না, ও-বাড়িও ওদের ছাড়তে হবে।

—বাড়ি ছাড়তে হবে? ভূতনাথ যেন নিজের কানে নিজের ফাঁসির হুকুম শুনছে।

—ছাড়তে হবে বৈকি! টাকা তো আমার একলার নয়, আমাদের ফ্যামিলির টাকা, আমার নাবালক শালারা রয়েছে, আমার শাশুড়ি রয়েছে, তারা সুদই বা ছাড়বে কেন? আর টাকা দিয়ে বন্দকি বাড়িই বা হাতছাড়া করবে কেন! শেষ পর্যন্ত তেমন হলে বাড়িও খালি করতে হবে বৈকি!

—তা হলে যাবে কোথায় ওরা? এতদিনের বংশ, এত লোকজন চাকর-বাকর, পূজো-পার্বণ, বিগ্রহ—সকলকে নিয়ে, সব তুলে নিয়ে—সে কি সম্ভব?

ননীলাল বললে—চূড়ো তো এটর্নিশিপ পাশ করতে পারলে না জানিস—তা বিয়ের পর কেউ এগজামিনে পাশ করতে পারে?

—কী করবে তা হলে?

—বলছিল আর একবার পরীক্ষা দেবে, কিন্তু ও আর পাশ করতে পারবে না, দেখে নিস। এখন ওর মাথায় কেবল ওই-সব চিন্তা, স্বপ্ন দেখছে কেবল সম্পত্তি ফিরে পাবার, ব্যাঙ্কটাও ওদের ফেল মারলো। জমিদারী যেটুকু আছে, তাতে কিছুই চলে না, এদিকে কোলিয়ারি কিনলো তাতেও ওই...

—তাতে কী? কোলিয়ারি চললো না কেন?

ননীলাল আর একটা সিগারেট ধরালো এবার। বললে—ওদের কপালই খারাপ, যেমন প্রথমে আমাকে কিছু বললে না, জিজ্ঞেসও করলে না, ভাবলে এত টাকার কারবার, আমি বোধ হয় দালালি মারবো। তাই বিশ্বাস করে ঝুমুটমলকেই ডাকলে—এখন বুঝতে পেরেছে। এতখানি নেমকহারামি আমি অন্তত করতে পারতুম না—অনেক খেয়েছি রে ওদের বাড়িতে, অনেকদিন চূড়োর পয়সায় বাবুয়ানি করেছি, ওর অনেক পয়সা ধার নিয়ে শোধ দিইনি আজ পর্যন্ত—একটু কৃতজ্ঞতা অন্তত পেতো আমার কাছে। এখন ছুটুককে তাই বললুম—মারোয়াড়ীকেই তুই বেশি বিশ্বাস করলি!

চূড়ো বললে—কাকারা যা করতো তাতে তো আগে আমি কিছু বলতে পারতুম না।

ননীলাল আবার বলতে লাগলো—তা শেষকালে দেখা গেল শুধু ওপরটাই কয়লা, নিচে সমস্ত পাথর—ভালো করে এক্সপার্ট দিয়ে দেখালে না পর্যন্ত, অত সময়ই ওদের নেই—যা করে বিধু সরকার আর ঝুমুটমল। ননীলাল এবার হাতঘড়িটা দেখলে।

ভূতনাথ বললে—আমি এবার উঠি ননীলাল—দেরি হয়ে যাচ্ছে হয়তো তোর।

রাস্তায় বেরিয়ে কান্না পেতে লাগলো ভূতনাথের। মনে হলো এখনি সে দৌড়ে যাবে বড়বাড়িতে। পটেশ্বরী বৌঠানের কাছে না যেতে পারলে যেন তার স্বস্তি হচ্ছে না। বড়বাড়ির সমস্ত প্রাণীর জন্যে যেন মায়া হতে লাগলো তার। সেই ছুটুকবাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু, বৌঠান, বংশী, চিন্তা, ইব্রাহিম, ইয়াসিন, সবাই। এমনকি সেই রান্নাবাড়ির আরশোলাটা পর্যন্ত। কেন এমন হলো! কোথায় যাবে সব! এর হাত থেকে বাঁচবার কি কোনো পথ নেই? নিজের জন্যে তার চিন্তা নেই। কিন্তু বৌঠান! আর ছোটবাবু যে উঠতে পারে না—তাকে যে উঠে বসিয়ে ধরে খাওয়াতে হয়, স্নান করাতে হয়। ছোটবাবু কোথায় যাবে! বনেদী বংশ, কখনও নিজের হাতে এক গেলাস জল গড়িয়ে পর্যন্ত খায়নি। কখনও নিজের কাপড়টার হিসেব পর্যন্ত রাখেনি। কোথায় যাবে ওবা! কোথায় ওরা যাবে!

সন্ধ্যেবেলা রূপচাঁদবাবুর বাড়িতে যেতেই সরকারবাবু ডাকলে—এই যে ভূতনাথবাবু, বাবু একবার খুঁজছিলেন আপনাকে।

—আমাকে? কেন? যেন ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। কাজের কোথাও কোনো গাফিলতি হয়েছে নাকি? কিম্বা কোনো ত্রুটি?

সরকারবাবু বললে—আর কি, আপনার তো হয়ে গেল, মেরে দিলেন আপনি।

—কী হয়ে গেল?

—বাবু তো অকারণে ডাকেনি, আর কাউকে তো ডাকে না, আপনার ওপর একটু নেক-নজর আছে ভূতনাথবাবু, যাই বলুন আর তাই বলুন। হা হা করে দাঁত বের করে নির্বোধের মতো হাসতে লাগলো সরকারবাবু। হাসি থামিয়ে সরকারবাবু বললে—আপনাকে বাবু বসতে বলে গিয়েছেন—এখনি বেরোবেন।

ভূতনাথের মনে হলো—কী এমন কাজ যার জন্যে এমন অপেক্ষা করতে হবে। কোনো দোষ হয়েছে তার, কোনো গাফিলতি কিম্বা কোনো অপরাধ?

সরকারবাবু বললে—ভয় নেই আপনার, আপনার ক্ষতি হবে না কিছু।

—কীসে বুঝলেন?

—আরে এতদিন কাজ করছি বুঝি না, আর কাউকে তো এমন করে কই ডাকে না, আপনার উন্নতি এই হলো বলে, দেখে নেবেন।

—কখন আসবেন?

—এই তো এখনি আসবেন বলে গিয়েছেন, গাড়িও তো তৈরি হয়ে রয়েছে।

ভূতনাথ দেখলে উঠোনের পাশে রূপচাঁদবাবুর গাড়ি সত্যিই তৈরি। ঘোড়া দুটো অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।

সরকারবাবু ভাউচারগুলো নিয়ে পাকা খাতায় তুলতে লাগলো। একে-একে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেব দিতে হয়। রূপচাঁদবাবুর কোম্পানীর কাজ খুব পাকা। হিসেবের খুব কড়াকড়ি। প্রত্যেক দিনের হিসেব প্রত্যেক দিন খাতায় ওঠে। তারপর পাওনাদারদের হিসেব মেটানো হবে সেই খাতা দেখে। কোথায় সুরকি গেল দু'গাড়ি, ইঁট গেল কত হাজার, চুন ডেলিভারি ক'বস্তা, সব লিখতে হবে। যা-যা দরকার সব ইঞ্জিনীয়ার ওভারসিয়ারদের অর্ডার মাফিক বিল্‌বাবুকে সাপ্লাই দিতে হবে দোকান থেকে। দোকানে গিয়ে মাল লোডিং থেকে ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত সব বিল্‌বাবুর কাজ। এমন করে কাজ শিখতে-শিখতে একদিন ওভারসিয়ার হওয়া। মাপজোক করতে শেখা, নক্সা করতে শেখা, কতগুলো ঘর করতে কত ইঁট চুন সুরকি লাগে তার হিসেব জানা।

এই ক'মাসেই ভূতনাথ বেশ পাকা হয়ে গিয়েছে বৈকি। এখন একলাই ফিতে ধরে হিসেব করতে পারে। চুরি ধরতে পারে। চারিদিকে যখন এত বাড়ি উঠছে, ওভারসিয়ার-এর সংখ্যাও বাড়বে। রূপচাঁদবাবুর কোম্পানীও আগেকার চেয়ে এখন অনেক বড় হয়েছে। নতুন শহর গড়ছে, বস্তি ভেঙে নতুন বাড়ি, নতুন সমাজ তৈরি হচ্ছে—নতুন সভ্যতা। এখানে সবাই যেন নতুন। নতুন মানুষ, নতুন সমাজ, নতুন বাড়ি, নতুন প্রাণ! উকিল ব্যারিস্টার কত নতুন নতুন হচ্ছে। একটু পয়সা হলেই ভবানীপুরে বাড়ি করা চাই।

এই তো সেদিনের কথা। ৩০শে আশ্বিন। ভূতনাথ প্রথমে ভেবেছিল কিছু হবে না। কিন্তু সেই দিন রাখী বাঁধার কী হিড়িক! ইদ্রিস বলে—হাত দেখি বিল্‌বাবু।

—কেন?

—হাত বাড়ান না।

ওভারসিয়ার আর ইঞ্জিনীয়ারবাবুরাও বাদ গেল না। রূপচাঁদবাবু প্রথমে কিছু বলেননি। কিন্তু ভূতনাথই গিয়ে সাহস করে সামনে দাঁড়ালো।

—ও আবার কী? ও—বুঝতে পেরেছি, রাখী বুঝি, বাঁধুন, বেঁধে দিন—বলে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

বিল্ কালেকশন করতে গিয়ে বিকেলবেলা ভিড় দেখে একবার সাইকেল থেকে নামলো ভূতনাথ। মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। কিন্তু তবু অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। সকালে বাড়িতে-বাড়িতে অরন্ধন ছিল। উপোস করেছে লোকে। বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে ভলান্টিয়াররা বলেছে—একটা দিন না হয় না-খেলেন—কী হয় তাতে। ভবানীপুরের পাড়াতে অনেকে রান্নাই করেনি। দোকানপাটও অনেক বন্ধ ছিল। এ-এক ধরনের অভিজ্ঞতা।

বড়বাড়িতে মেজবাবু হুকুম দিয়েছিল—কাউকে ঢুকতে দেবে না—যত সব বদমাইস-এর দল।

তা বড়বাড়িতে কে-ই বা ঢুকতে সাহস করবে! ভূতনাথেরও মনে হয়েছিল খাবে না সে। সত্যিই তো একটা দিন না খেলে কী হয়। ভিস্তিখানাতে গিয়ে স্নান সেরে নিয়ে আবার সাইকেল-এ উঠতে যাবে, এমন সময় বংশী এসে গেল। বললে—যাচ্ছেন যে শালাবাবু, খাবেন না আজ?

—রান্না হয়েছে আজকে?

—রান্না হবে না কেন?

—অরন্ধন হয়নি আজ? ভলান্টিয়াররা আসেনি?

—কে সাহস করে ঢুকবে আজ্ঞে, মেজবাবু ব্রিজ সিংকে গেট বন্ধ করতে বলে দিয়েছেন।

—বাজার খোলা ছিল?

—কিছু-কিছু খোলা ছিল হুজুর, বাজার বন্ধ হবে কোন্ দুঃখে। মাছ এল, তরকারি এল, বিধু সরকারমশাই আজকাল নিজে বাজার করে কিনা, মধুসূদন চলে যাওয়া এস্তোক...

ভূতনাথের মনে হয়েছিল এক বড়বাড়ি ছাড়া সেদিন সব বাড়িতেই বুঝি সমান অবস্থা। অন্তত ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকজনদের মুখের দিকে চেয়ে তাই মনে হলো। এমনি আর একটা ভিড়ের কথা মনে পড়লো ভূতনাথের। সে কিন্তু শীতকাল ছিল। ভোরবেলা সেদিন শেয়ালদা' স্টেশনে স্বামী বিবেকানন্দ এসে নেমেছিলেন। সে কয়েক বছর আগেকার কথা।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন বললে—প্রেসিডেন্ট আসছেন না আজ জানেন তো—আনন্দমোহন বস অসুস্থ।

আর-একজন বললে—আসছেন তিনি, স্ট্রেচারে করে তিনি আসছেন—খবর এসেছে এইমাত্র।

শেষকালে সত্যিই তিনি এসে পড়লেন। সমস্ত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো। বন্দে মাতরম্। বহুদিন থেকে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। আজ তিনি মুমূর্ষু! কিন্তু এমন মুহূর্ত তো তাঁর জীবনে আর ফিরে আসবে না। চারদিকের জনতা সেই অগ্রজ জননায়কের কথা শোনবার জন্যে অধীর আগ্রহে চুপ করে আছে।

সব মনে নেই ভূতনাথের। তবু কিছু-কিছু মনে আছে। সেদিন কলকাতার সেই জনসমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূতনাথের মনে হয়েছিল সত্যিই একটা জাতির মহা-অভ্যুদয় যেন সে প্রত্যক্ষ করছে।

শুয়ে-শুয়েই আনন্দমোহন বসু বললেন—আমার সামনে সেইদিন উপস্থিত যেদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করতে হবে, আজ এই যে আপনাদের দেখলাম, হয়তো এই আমার শেষ দেখা... আমি ঋষি নই, কোনো ঋষির পদধূলি গ্রহণেরও যোগ্য নই, তবু যিনি সকলের পিতা, ভারতবাসী ও ইংরেজের পিতা, তাঁকে আজ আমি আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্যে যে, তিনি আমাকে এইদিন পর্যন্ত জীবিত রেখেছেন, আমি যাবার আগে দেখে যেতে পারলাম এই এক জাতির অভ্যুদয়। এই যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি আজ প্রতিষ্ঠিত হলো, এই অখণ্ড বঙ্গভবন, এর ভিত্তি আমাদের সকলের অশ্রু-ধৌত আর্দ্র হৃদয়ের ওপর—এই শোণিতহীন নবতর সংগ্রামক্ষেত্রে আজ দেবতারা এসেছেন ঊর্ধ্ব থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে...

আনন্দমোহন বসুর পাশে শিখ নেতা কুঁয়ার সিং, কৃপাণধারী শিখ অনুচরদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বাংলার পক্ষ থেকে সুরেন বাঁড়ুজ্জে উঠে নিজে তাঁর হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। বললেন—বাংলার আর পাঞ্জাবের প্রেমবন্ধন অটুক হোক।

সভায় তুমুল হাততালি পড়লো।

তারপর উঠলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি ঘোষণা করলেন—'যেহেতু বাঙালী জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, অতএব আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে আমরা সমগ্র বাঙালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব, বিধাতা আমাদের সহায় হউন।'

শুনতে-শুনতে ভূতনাথের বুকটাও কেঁপে উঠলো থর-থর করে। সেই নিবারণের কাছে একদিন শুনেছিল ব্রিটিশ অত্যাচারের কাহিনী। কেমন করে মিথ্যা দিয়ে, ছলনা দিয়ে ভারতবর্ষ একদিন জয় করে নিয়েছিল তারা! আর শুনেছিল আর-একজনের কাছে। সে বদরিকাবাবু। বৈদূর্যমণি যেবার রাজাবাহাদুর হয়েছিলেন, সেবার বদরিকাবাবু বলেছিলেন—রাজাবাহাদুর তো নয়—রাজসাপ হয়েছে বড়বাবু। বলে গড়-গড় করে সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসটা মুখস্থ বলে গিয়েছিল।

আজও কান পাতলে ভূতনাথ যেন সেদিনের সব কথা শুনতে পায়। ভবানীপুরের অর্ধসমাপ্ত বাড়ির ভারার ওপর দাঁড়িয়ে যখন কাজ তদারক করে তখন মাঝে-মাঝে কারা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে যায়—

দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে
এসো চণ্ডী যুগান্তরে—
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে
অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে...

চারদিক থেকে চিৎকার ওঠে—বন্দে মাতরম্—

দুটি শব্দ। সমুদ্রতরঙ্গের অবিশ্রান্ত গর্জনের মতো সারা দেশের অন্তর থেকে এই শব্দ দুটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সহস্র কণ্ঠের সংস্পর্শে দুটি শব্দ হয়ে উঠলো একটা জাতির মর্মসঙ্গীত। মহাকালের ইঙ্গিতে ওই দুটি শব্দই একদিন জাতির জাগ্রত চেতনার মতো অক্ষয় হয়ে রইল।

সভার শেষে বড়বাড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ যেন বিমর্ষ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। বংশী এখনও ছোটবাবুর কাছে। তার দেখা পাওয়া গেল না। আস্তে আস্তে সাইকেলটা আস্তাবলবাড়িতে রেখে নিজের চোরাকুঠুরিতে গিয়ে ঢুকলো। তারপর মনে পড়লো পটেশ্বরী বৌঠানের কথা। তখনও একটা রাখী আছে। বৌঠানের হাতে তো রাখী বাঁধা হয়নি।

অন্ধকার বারান্দা আজ। মেজবৌঠান হয়তো বাঘবন্দি খেলছে গিরির সঙ্গে নিজের ঘরে বসে। ওদিকে বড়বৌঠান চৌষট্টিটা সাবানের টুকরো নিয়ে হাত ধুতে ব্যস্ত বোধ হয়। এখানে নতুন সমাজের শব্দ এসে পৌঁছোয় না বুঝি। দারোয়ান, দেউড়ি, সদর, অন্দরমহল পেরিয়ে এখানে আসতে বুঝি ভয় পায় তারা।

আস্তে আস্তে ছোটবৌঠানের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চুপি-চুপি ডেকেছিল—বৌঠান—

ভেতর থেকে বৌঠানের গলার শব্দ এল—কে? ভূতনাথ? আয়—আয়।

ঘরে ঢোকবার আগে কেমন যেন ভয় করছিল ভূতনাথের। অনেকদিন দেখা হয়নি বৌঠানের সঙ্গে। যদি গিয়ে দেখে বৌঠানের মুখে সে হাসি নেই, চোখের সে দীপ্তি নেই আর! স্বপ্নে দেখা বৌঠানকে দেখতে যেন ভয় করে। ভয় হয়—বড়বাড়ির চেহারা দেখলে যেমন আজকাল মায়া হয়, তার বৌঠানকে দেখেও যদি তাই হয়! পটেশ্বরী বৌঠান তার ধ্যানের জিনিস। তার আত্মার সম্পদ। পটেশ্বরী বৌঠানের কোনো ক্ষতি কোনো লোকসান যেন সহ্য করতে পারবে না ভূতনাথ।

কিন্তু না। সব ঠিক তেমনিই আছে। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি। এমনকি বৌঠানের যশোদাদুলাল পর্যন্ত। আলমারির সেই ঘাগরা-পরা মেম-পুতুলটি পর্যন্ত। আর বৌঠান! বৌঠানের দিকে চাইলে ঠিক আগের মতোই চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

বৌঠান শুয়ে ছিল। বললে—আমি কিন্তু তোর ওপর রাগ করেছি ভূতনাথ।

ভূতনাথ আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে গেল। বললে—তুমিও তো আর-একবার ডেকে পাঠাওনি।

—আমি দেখছিলুম, আমি না ডাকলে তুই আসিস কি না।

ভূতনাথ বললে—একটা চাকরি করছি বৌঠান আজকাল, সময় পাই না আর আগেকার মতন।

—তাও শুনেছি বংশীর কাছে, বংশী বলছিল—শালাবাবুকে ডাকবো? আমি বললাম—তোর শালাবাবুর বিবেচনাটা কী রকম দেখি না... তা সবাই তো একে-একে চলে যাচ্ছে, তুই-ই বা আর আছিস কেন? তুইও চলে যা, ছোটকর্তার অসুখ, চাকর-বাকররা শুনছি আজকাল মাইনে পায় না নিয়ম করে, বড়বাড়ির বিপদের দিনে তো কেউ থাকবে না জানা কথা, তোরা সুখের পায়রা, তুই-ই বা কেন থাকবি, চলে যা।

ভূতনাথের বুক ফেটে কান্না পেতে লাগলো। বললে—তুমিও আমাকে এই কথা বলছো বৌঠান?

বৌঠান হাসতে লাগলো। বললে—তোর সঙ্গে বড়বাড়ির কীসের সম্পর্ক রে ভূতনাথ, তুই এ-বাড়িতে একদিন এসেছিলি হঠাৎ, আবার হঠাৎ চলে যাবি, তুই আমার কে বল না যে, তোকে জোর করে ধরে রাখতে পারবো, আমার ভাই-ও নেই, বোন-ও নেই, বাবা-ও নেই, মা-ও নেই—আবার না-হয় মনে করবো আমি একলা। ছোটকর্তা যতদিন আছে ততদিন আমিও আছি—তারপর যা করে আমার যশোদাদুলাল—বলে হাসতে লাগলো বৌঠান। অদ্ভুত এক ধরনের হাসি।

ভূতনাথ বললে—আমারই বা কে আছে বলো?

—তুই পুরুষমানুষ, তোর সব আছে ভূতনাথ।

—না, বৌঠান তুমি তো জানো না, আমার কেউ নেই, সংসারে নিজের বলতে আর কেউ নেই, এক তুমি ছাড়া।

বৌঠান এবার উঠে বসলো। কানে হীরের দুল দুটো ঝক-ঝক করে উঠলো। হাতের চুড়ি গায়ের গয়না বেজে উঠলো টুং-টাং করে। বললে—আমাকে সত্যি তুই নিজের মতন মনে করিস ভূতনাথ?

ভূতনাথ মেঝের ওপরই বসে পড়লো। বললে—সত্যিই বিশ্বাস করো বৌঠান, তোমার মতো আপনার আমার আর কেউ নেই সংসারে। আজ যদি বড়বাড়ি থেকে আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দাও, আমার কোনো যাবার জায়গাও নেই।

বৌঠান এবার উঠলো। বললে—তুই আমাকে আজ কিন্তু বকতে পারবিনে ভূতনাথ—আজ আমি একটু খাবোই—বলে আলমারির মধ্যে থেকে একটা বোতল আর একটা গেলাস নিয়ে এল।

—এখনও ওটা খাও তুমি বৌঠান?

—রোজ খাই না, কিন্তু এক-একদিন না খেলে বড় কষ্ট হয় ভূতনাথ, না খেয়ে আর পারিনে।

ভূতনাথ বললে—তবে যে শুনলুম ছোটকর্তা ছেড়ে দিয়েছে একেবারে।

—ছোটকর্তা সত্যিই ছেড়ে দিয়েছে, যার জন্যে শুরু করলুম তিনি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আমি ছাড়তে পারছিনে আর।

—নেশা হয়ে গিয়েছে নাকি তোমার?

বৌঠান গেলাসটা মুখে উপুড় করে বললে—হ্যাঁ, ভাই, নেশাই হয়ে গিয়েছে বোধ হয়, তোর কাছে আর বলতে লজ্জা নেই, একদিন স্বামীকে ফেরাবার জন্যেই ধরেছিলাম, প্রথম-প্রথম কত গা ঘিন-ঘিন করতো, বমি-বমি হতো, আজ কিন্তু আর না হলে চলে না। তুই আজ আর বারণ করিসনে আমায়—আজ প্রাণ ভরে খাবো।

—কিন্তু না খেলেই কি নয়?

বৌঠান সে-কথার উত্তর দিলে না। বোতলটা হাতে নিয়ে একবার ভালো করে দেখলে। আর সামান্য মাত্র বাকি আছে। বললে—একটা কাজ করতে পারবি ভূতনাথ?

—কী?

—আর একটা বোতল না হলে আমার চলবে না।

—তার আমি কী করবো?

—ছোটকর্তা তো খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আর কোথাও নেই, যে-ক'টা বোতল বাকি ছিল সব

শেষ হয়ে গেল আজ, আর একটা বোতল এনে দিতে হবে তোকে।

—তুমি কি পাগল হয়েছো বৌঠান?

বৌঠান বললে—পাগলামি নয় রে ভূতনাথ, আমার খুব টনটনে জ্ঞান রয়েছে, ছোটকর্তাকে সেদিন তো তাই বলছিলাম, ও-মানুষটাই বা কী করবেন, একদিন আমাকে ধরিয়েছিলেন উনিই, সেদিন বললেন—ছাড়ো, ওটা ছেড়ে দাও ছোটবউ, ও বড় সর্বনাশা নেশা, পুরুষদের ধরলে তবু ছাড়ে, মেয়েদের একবার ধরলে আর রক্ষে নেই।

ভূতনাথ খানিকক্ষণ পাথরের মতন চুপ করে চেয়ে রইল বৌঠানের দিকে।

বৌঠানের চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো। বললে—সেই শেষকালে আমি স্বামীকে পেলুম ভূতনাথ কিন্তু এমন করে পেতে কি চেয়েছিলাম?

বৌঠানকে এমন করে কাঁদতে কখনও দেখেনি ভূতনাথ। চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপ-টপ করে যেন এক-একটা হীরের টুকরো। বললে—এক-একবার যাই ছোটকর্তার ঘরে, ভারি কষ্ট হয় দেখে। নড়তে পারে না, সমস্ত অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। অমন রূপ, অমন স্বাস্থ্য, অমন মন, ওই অসুখ, তবু ওঁর চোখে জল নেই রে একটু, আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিলুম পায়ের ওপর মাথা রেখে, আমার যশোদাদুলালকে তো তাই বলছিলাম, এ তুমি কী করলে ঠাকুর, আমার মানুষকে আমার কাছে ফিরিয়েই দিলে যদি, তবে এমন করে তার সব কেড়ে নিলে কেন? আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি, এ তোমার কেমন বিচার ঠাকুর?

ছোটকর্তা আমার কান্না দেখে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলেন। জানিস ভূতনাথ, একটা কথা পর্যন্ত বললেন না। আজ তাঁর বলবার মতো মুখও নেই বুঝি।

ভূতনাথ বললে—আর-একদিন যাবে বৌঠান?

—কোথায় রে?

—সেই যে সেখানে, বরানগরে?

বৌঠান বললে—যেতে চাস চল কিন্তু আমার সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি ভূতনাথ, আমার মনে হয় এমন করে যশোদাদুলালকে মিনতি করলাম, এত পূজো, এত উপোস, এত ব্রত করলাম, আমার যা সাধ্য সব করলাম, এতেও যখন হলো না তখন আর কিছুতেই হবে না। মানুষের ওপর, দেবতার ওপর, এমনকি নিজের ওপরও আর বিশ্বাস নেই। নিজের মনের ওপরও আর যেন জোর নেই।

ভূতনাথ বললে—একটা কথা শুনবে বৌঠান, সমস্ত ফিরে পাবে তুমি, শুধু মদটা খেয়ো না।

বৌঠান বললে—আমারও কি খেতে সাধ ভাই, কিন্তু ওই যে বললুম নিজের ওপরেও আর বিশ্বাস নেই—কতবার ঠিক করি খাবো না, স্বামী যার রোগশয্যায় শুয়ে আছে, তার এ খাওয়া উচিত নয়, প্রতিজ্ঞা করি আর আমি ছোঁবো না, যশোদাদুলালের পা ছুঁয়ে কতবার দিব্যি করলুম, কই, রাখতে তো পারিনি আমার প্রতিজ্ঞা—আমি পারবো ভূতনাথ। আজকের মতো তুই এনে দে লক্ষ্মীটি।

ভূতনাথ উঠলো এবার। বললে—আজ আমি আনছি—কিন্তু আর কখনও আমাকে বলো না।

বৌঠান বললে—আর যদি কখনও খাই, তুই আমাকে শাপ দিস ভূতনাথ, তুই বামুনের ছেলে, তুই শাপ দিস আমাকে—তুই শাপ দিলে নির্ঘাৎ ফলবে।

ভূতনাথ হাসলো—তোমাকে শাপ দিলে সে-শাপ বুঝি আমার গায়ে লাগবে না ভেবেছো!

বৌঠান বললে—তোকে সত্যি কথাই বলি ভূতনাথ, আমার বাঁচতে সাধ নেই, বেঁচে তো দেখলাম অনেকদিন, এবার দেখবো মরে কত সুখ।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আমারও আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না বৌঠান।

—তুই কোন্ দুঃখে মরবি ভূতনাথ, তোর আমি কোনো অভাব রাখবো না, আমার যা-কিছু আছে যাবার আগে সব তোকে দিয়ে যাবো, আমার শাশুড়ীর যত গয়না, সব আমাকে দিয়ে গিয়েছেন, আমি ছোটবউ ছিলাম, বড় আদরের বউ ছিলাম রে এ-বাড়ির, আমার সব তোকে দেবো।

বোতলের শেষটুকু গেলাসে ঢেলে নিয়ে সেটুকুও মুখে ঢেলে দিলে বৌঠান। তারপর বললে—এবার যা, আর একটা বোতল নিয়ে আয় তুই, কাল থেকে আর আমি খাবো না—কথা

দিচ্ছি—বলে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো বৌঠান। ভূতনাথের পা দুটো ছুঁয়ে বললে—এই কথা দিচ্ছি তোকে ভূতনাথ।

তাড়াতাড়ি নিজের পা দুটো সরিয়ে নিয়ে ভূতনাথ দুটো হাত চেপে ধরলো বৌঠানের। বললে—করলে কি—ছিঃ—ছিঃ—নেশা হলে মানুষের আর জ্ঞান থাকে না।

বৌঠান হাত দুটো মাথায় ঠেকিয়ে বললে—না রে, তুই বামুন, নিলে দোষ নেই।

ভূতনাথ রেগে গেল। বললে—এরকম আর কখনও করো না বৌঠান—যদি করো আর কখনও তোমার কাছে আসবো না।

বৌঠান তখন অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছে। চুপ করে বসে চোখ বুজে আছে। আর দুই গাল বেয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। ভূতনাথ তখনও দুই হাতে ধরে রয়েছে বৌঠানকে। হাত দুটো ছেড়ে দিলেই যেন বৌঠান পড়ে যাবে। যেন অবশ হয়ে গিয়েছে বৌঠানের সারা শরীর। বললে—আর একদিন সত্যি যাবো ভূতনাথ বরানগরে।

ভূতনাথ বললে—কবে যাবে বৌঠান?

বৌঠান বললে—ছোটবাবু একটু ভালো হোক, এখন বড় ভয় করে... ছোটকর্তার কী হয়—সারাদিন ও-মানুষ রোগে কাতর হয়ে পড়ে থাকে, মনটা কেমন যেন করে—মাঝে কখনও যদি ডাকেন... আজকাল বড় ডাকেন আমাকে, অনেক কথা বলেন।

আমি বলি—কিছু ভয় নেই, তুমি আবার সেরে উঠবে।

ছোটকর্তা বলেন—আমি হয়তো আর সারবো না ছোটবউ!

আমি বুঝিয়ে বলি—তোমাকে যে সেরে উঠতেই হবে, নইলে আমার পূজো-উপোস-ব্রত সব মিথ্যে হবে যে!

এক-একদিন যখন আমার মুখে গন্ধ পান, তখন ওঁর চোখ দুটো কঠোর হয়ে আসে, বলেন—তুমি এখনও ওটা ছাড়তে পারোনি।

আমি বলি—কী করে ছাড়বো তুমি বলে দাও।

—নিজের মনের জোরেই ছাড়তে হবে, তোমার ইচ্ছে না হলে কেউ ছাড়াতে পারবে না।

সেদিন থেকে চেষ্টা করি কতরকমভাবে। বার-বার যশোদাদুলালের পায়ে লুটিয়ে পড়ি, কত কাঁদি, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ি, পোড়া চোখে ঘুমও তো আসে না আমার, কিন্তু আবার এক সময় সব প্রতিজ্ঞা, সব কল্পনা ধুয়ে-মুছে যায়, তখন স্বামী, সংসার, আমার যশোদাদুলাল সকলের কথা ভুলে যাই। মনে হয়, যেন কতদিন ঘুমোইনি, কতকাল খাইনি, তখন নিজেই বোতলটা পেড়ে নিয়ে একটু খাই—আবার কাঁদি, আবার অনুতাপ হয়।

বৌঠান আবার বললে—যা ভূতনাথ, ওই সিন্দুক খুলে টাকা নিয়ে যা। আজকের মতো শেষবার খাবো, কাল থেকে আর ও ছোঁবো না—কথা দিচ্ছি তোকে।

কিন্তু সিন্দুক খুলে ভূতনাথ সেদিন কম অবাক হয়নি। আর একদিন এমনি নিজের হাতে ভূতনাথ সিন্দুক খুলে সুবিনয়বাবুর দেওয়া পাঁচশ' টাকা রেখে দিয়েছিল। সেদিন সে-সিন্দুকের ভেতর কত ঐশ্বর্য দেখে চোখ ঝলসে গিয়েছিল ভূতনাথের। কত গয়না, কত মোহর অগোছালো ভাবে ছড়ানো ছিল চারিদিকে। আজ যেন মনে হলো অনেকটা খালি। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না। তবু অনেক খুঁজেও যেন কোথাও টাকা পাওয়া গেল না।

ভূতনাথ বললে—টাকা তো নেই বৌঠান এখানে!

—নেই? বলে বৌঠান নিজেই এবার নেমে এল পালঙ্ক থেকে। বললে—সামনেই রয়েছে আর দেখতে পাসনে তুই ভূতনাথ—কিন্তু নিতে গিয়ে বৌঠানও যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—কোথায় গেল বল তো! এই রূপোর বাটিতেই তো থাকতো। বৌঠানও অনেক খুঁজলো। শেষে বললে—থাক গে, দরকার নেই, রাত হয়ে যাচ্ছে, এইটে নিয়ে যা। কানের একটা মুক্তোর ফুল দিয়ে বললে—এইটেই নিয়ে যা তুই।

—ওই মুক্তোর ফুল? ওর যে অনেক দাম বৌঠান?

—তা হোক, ওরকম কত আছে, বেঁচে থাকলে আরো কত হবে তুই আর 'না' করিসনি ভূতনাথ, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ভূতনাথ বিস্ময়ে অবাকই হয়েছিল সেদিন। কিন্তু বৌঠানের আদেশ অমান্য করবার সাহস তার ছিল না। সেই রাত্রে স্যাকরার দোকানে কেমন করে ফুলটা বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছিল তা আজও মনে আছে। বৌঠানের ঘরে বোতলটা দিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন রাত বেশ গভীর হয়েছে।

আস্তে-আস্তে বাইরে পা দিতেই কে যেন পেছন থেকে বলে উঠলো—কে?

মেজবাবুর গলার মতন আওয়াজ।

এক নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ভূতনাথ চোরাকুঠুরির মধ্যে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু মেজবাবু তখনও হাঁক-ডাক দিচ্ছে—কে গেল ওদিকে? কে?

চোরাকুঠুরির মধ্যে ঢুকেও যেন বুকের সে অস্থিরতা থামেনি ভূতনাথের সেদিন। যদি এখনি ধরা পড়ে যেতো? যদি কেউ দেখতে পেতো! সর্বনাশটার সবটুকু কল্পনা করতে গিয়ে বারে-বারে বিছানায় শুয়েও শিউরে উঠেছিল ভূতনাথ। কিন্তু মেজবাবু এমন সময়ে বাড়ির অন্দরমহলে আসবে সেদিন, কে জানতো! এমন তো কখনও আসে না। রাত বারোটার আগে মেজবাবুর গাড়ি কখনও ঢোকেনি বাড়িতে। মেজবাবু এলে বাড়িতে সোরগোল পড়ে যায়, পাড়ার লোক টের পায়। দারোয়ান থেকে বেণী, চাকর-বাকর সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শুধু মেজগিন্নীই একা অঘোরে ঘুমিয়ে থাকে নিজের ঘরে।

পরের দিন বংশী বললে—খুব বেঁচে গিয়েছেন কাল আপনি শালাবাবু।

—মেজবাবু খুঁজেছিলেন বুঝি?

বংশী বললে—আমাকে ডাকলে মেজবাবু, বললে—কে গেল রে ওখান দিয়ে?

—তুমি কী বললে?

—আমি বললাম—আমিই তো বেরোলাম ছোটমা'র ঘর থেকে, ছোটমা ডেকেছিল আমাকে। মেজবাবু তবু ছাড়ে না, বলে—বারান্দাটা অন্ধকার করে রাখিস কেন, লোক চেনা যায় না।

—তোমার ছোটমা কী বললে?

বংশী বললে—ছোটমা শুনে বললে—যদি এর পরে কেউ জিজ্ঞেস করে কোনো দিন ভূতনাথের কথা, বলবি আমার গুরুভাই। তা ভাগ্যিস সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল আজ্ঞে, নইলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেতো। মেজবাবুর মেজাজ যে রাশভারী, যখন ভালো তো ভালো, একবার রাগলে ঠিক ছোটবাবুর মতন হুজুর, আর জ্ঞান থাকে না।

—তা মেজবাবু কাল অত সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে যে?

—মেজবাবু তো কাল বেরোয়নি, ভৈরববাবু এল তখন সন্ধ্যে, হাসিনী মাঠাকরুণ, ওঁনারাও এলেন, একে-একে সবাই ফিরে গেল, মেজবাবু কারোর সঙ্গে দেখা করলেন না, কাল কেবল তামাক খেয়েছেন বসে-বসে নাচঘরেব ভেতর, মেজাজ ভালো যাচ্ছে না এ ক'দিন—আর ছোটবাবুরও অসুখ, বাড়িতে শান্তি নেই কারো মনে।

—কিন্তু কেন এমন হলো রে বংশী?

বংশী বললে—সত্যি মিথ্যে জানিনে শালাবাবু, শুনছি তো বাবুদের কয়লার ব্যবসা ফেল পড়েছে, কে জানে, ওদিকে খাজাঞ্চিখানায় পাওনাদারের ভিড় দেখেন না—দিনরাত হা-পিত্যেশ করে লোক ধন্যে দিচ্ছে। শুনছি নাকি বাবুরা বাড়ি বিক্রি করে দেবে—সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন।

—কিন্তু তা হলে যাবে কোথায় সব? এতগুলো লোক, দুটো দশটা তো নয়।

বংশী যেন হতাশায় হাত দুটো চিত করে ফেললে। বললে—ছুটুকবাবু তো পাথুরেঘাটায় গিয়ে উঠবে, এই বলে রাখছি আপনাকে শালাবাবু, দিনরাত তো দত্তমশাই আসছে সেই বিয়ে হওয়া এস্তোক, ছুটুকবাবুও শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে এক-একদিন রাত কাটিয়ে আসে, এমন তো কখনো দেখিনি বড়বাড়িতে, এত বছর কাটিয়ে দিলাম এখানে—তা ছুটুকবাবুই কয়লার ব্যবসা ধরালে, শেষকালে ওই ব্যবসাতেই গেল তো—মেজবাবু-ছোটবাবুর তো ইচ্ছে ছিল না আজ্ঞে।

—তুমি ঠিক ভালোরকম জানো, কয়লার ব্যবসা ফেল হয়েছে?

—লোকে তো বলে আজ্ঞে।

—কোন্ লোক?

—আমাদের আর জানতে কি কিছু বাকি থাকে শালাবাবু, বালকবাবু যখন অত ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছে তখনই বুঝেছি একটা কিছু অনত্থ বাধবে, তারপর সেদিন অত খাওয়া-দাওয়া হলো! মারোয়াড়ীবাবুরা আসছে যাচ্ছে, আর তো কই আসতে দেখি না, ভৈরববাবু তো তেমন আসে না আজকাল, আজকাল তেমন পায়রাও ওড়ায় না মেজবাবু।

—তা মেজবাবু কোথায় যাবে?

—আজ্ঞে, মেজবাবুর ভাবনা কী? মেজবাবুর শ্বশুরের তিরিশখানা বাড়ি কলকাতায়, ছেলে নেই তো, মেজমা'ই একমাত্র মেয়ে, তাই দেখেন না, নাতিরা সারা বছরই দাদামশাই-এর কাছে থাকে, আজকাল তো সেখানেই লেখাপড়া করছে, সেখানেই থাকে, শ্বশুরের সম্পত্তি সবই তো মেজবাবু পাবে। ভাবনা তো ছোটবাবু আর ছোটমা'র জন্যে শালাবাবু, কোনো কিছুতেই নেই, অথচ যত দুখ্যু-কষ্ট সব ছোটবাবুরই। তাই তো দেখি—ছোটবাবু দিনরাত শুয়ে পড়ে আছে, কাছে গিয়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিই আর মানুষটাকে দেখে চোখ ফেটে জল পড়ে, কী বাবুই ছিল আজ্ঞে, একখানা কাপড় দু'বার পরতো না কখনও, একখানা পাঞ্জাবী দু'বার গায়ে দিতো না, সেই মানুষের এখন কোনো দিকে নজর নেই, ময়লা ময়লাই সই, আগে ভালো গিলে না হলে আমায় জুতো-পেটা করতো ধরে। সেই মানুষকে একবার দেখে আসুন গিয়ে, শুয়ে আছে যেন শিব একেবারে, সাক্ষাৎ শিবের মতন শুয়ে পড়ে আছে। তাই তো পা দুটো মাথায় ঠেকিয়ে এক-একবার হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলি—আর থাকতে পারিনে আজ্ঞে।

ভূতনাথেরও তাই মনে হয়, এ আর ক'দিন! যখন সবাই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে! কিন্তু একমনে কাকে লক্ষ্য করে যেন ভূতনাথ তার একান্ত প্রার্থনা জানায়—তেমন ঘটনা যেন চোখে না দেখতে হয়—তেমন দৃশ্য দেখবার আগে যেন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে সে। সে বড় মর্মান্তিক যে!

সেদিন আরো মর্মান্তিক লাগলো আর একটা ঘটনায়। ঠিক মৌলালির কাছে। সামনে একটা গাড়ি আসছিল। সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াতেই যেন অবাক লাগলো। সন্ধ্যেবেলা ভালো করে অন্ধকার হয়নি। মোড়ের একটা পান-বিড়ির দোকানে দেশলাই কেনবার জন্যে দাঁড়ালো গিয়ে।

পেছন থেকে কে যেন হঠাৎ এসে ডাকলে—শালাবাবু!

পেছন ফিরে চেহারা দেখেই অবাক হবার কথা! অথচ এমন চেহারা চিনতে না পারাই তো উচিত। সে-চেহারাই বদলে গিয়েছে বৃন্দাবনের। ছোট বড় করে চুল ছাঁটা। মুখে পান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কামানো মুখ।

ভূতনাথ বললে—তুমি? বৃন্দাবন?

—আজ্ঞে, যাচ্ছিলাম রাস্তা দিয়ে, দেখলাম আপনাকে, চুনীদাসী বললে—ভালোমানুষবাবু না?

ভূতনাথ বললে—চুনীদাসী কোথায়?

—ওই তো।

ভূতনাথ এদিক-ওদিকে চেয়ে কোথাও দেখতে পেলে না চুনীদাসীকে।

—ওই যে শালাবাবু, গাড়িতে বসে আছে।

এতক্ষণে দেখা গেল। নীল রং-এর একটা মোটরগাড়ি। তারই এক কোণে বসে আছে।

—চলুন, আপনাকে ডাকছে যে চুনীদাসী।

সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে ভূতনাথ মোটরের কাছে গেল। চুনীদাসীকে দেখেও অবাক হয়ে গেল ভূতনাথ। এত গয়না, এত তো ছিল না আগে! মোটরগাড়ি আবার কিনলে কবে! বৃন্দাবনের পোশাক পরিচ্ছদেরও বাহার বেড়েছে!

চুনীদাসীর হাতে রূপোর পানের ডিবে। গাল ভরা পান। মুখ বাড়িয়ে পানের খানিকটা পিক ফেলে হাসতে-হাসতে বললে—হ্যাঁ গা ভালোমানুষবাবু, আমাদের চিনতে পারো?

ভূতনাথ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুখে একটা হাসি আনবার চেষ্টা করতে গিয়েও যেন কেমন বিকৃত হয়ে গেল মুখটা।

—আমি তো মরে গিয়েছিলুম একেবারে ভালোমানুষবাবু, মাস দুই হাসপাতালে ছিলুম, এখন ক'দিন হলো উঠতে পেরেছি। ডাক্তার বলে একটু করে গঙ্গার হাওয়া খেতে, তাই বেড়াতে গিয়েছিলাম—তা সেই যে গিয়েছিলে আমার বাড়ি—বলি আর একবার কি আসতে নেই?

ভূতনাথ আমতা-আমতা করে বললে—একেবারে সময় পাওয়া যায় না... বড় খাটুনির চাকরি।

বৃন্দাবন বলে—আগে তবু বড়বাড়ির খবর-টবর পেতাম মধুসূদন খুড়োর কাছে, কি লোচনের কাছে—তা এখন তো তারও উপায় নেই। মধুসূদন খুড়ো আর আসছে না দেশ থেকে।

—লোচন তো পানের দোকান করেছে বড়বাজারে।

—তা করবে না কেন শালাবাবু, কাজ গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে সে—তা এখন কে কাজ করছে ওদের জায়গায়?

—বিনা লোকেই চলছে।

বৃন্দাবন হা হা করে হাসতে লাগলো—তখনই চুনীকে বলেছিলাম, ছোটবাবু-ছোটবাবু করেছিলে এখন দেখ—দত্তমশাই সত্যি কথাই বলে।

—কে দত্তমশাই?

—নটেবাবু, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, চুনীর তো প্রাণ নিয়েই টানাটানি, হাজার-হাজার টাকা ওষুধেই খরচ হয়ে গেল, আমরা তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, ছোটবাবু তো একবার দেখতেও এল না।

বাধা দিয়ে চুনীদাসী হঠাৎ বললে—ছোটকর্তা এখন কেমন আছে ভালোমানুষবাবু?

হেলান দিয়ে বসেছিল চুনীদাসী। শান্তিপুরী শাড়ির জরির আঁচলটা বুকের ওপর লোটাচ্ছে। এতক্ষণে ভালো করে দেখে ভূতনাথের মনে হলো যেন একটু দুর্বলই দেখাচ্ছে চুনীদাসীকে। নাকের হীরের নাকছাবি, পাউডার আর গয়নার জলুসে এতক্ষণ বোঝা যায়নি ভালো করে। জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তার কি বলে?

—বলে আর সারবে না।

—সে কি কথা ভালোমানুষবাবু, দেখে না বুঝি কেউ? ছোটবৌ কি সেবা-যত্ন করে না ভালো মতন?

চুনীদাসীর চোখ দুটো যেন করুণ হয়ে উঠলো। বললে—অন্যবার অসুখের সময় আমার কাছে এলেই সেরে উঠতো। তা আমি আর কী করবো, ভালোমানুষবাবু—আমার এমন করে হাত-পা বাঁধা না থাকলে একবার গিয়ে নিয়ে আসতাম আমার বাড়িতে।

বৃন্দাবন ঝাঁজিয়ে উঠলো—তুমি আর বকো না চুনী, দত্তমশাই কি সাধ করে বলে—দত্তমশাই ছিল বলে এ-যাত্রা বেঁচেছো, মনে থাকে যেন।

সে-কথায় কান না দিয়ে চুনীদাসী বললে—রোগ শুধু ওষুধে সারে না ভালোমানুষবাবু, সেবা চাই, যত্ন চাই। বড়বাড়িতে সেবা যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি, আমি তো ওখানে ছিলাম, সব জানি। দিনের বেলা বউদের দেখা করবার হুকুম নেই। যা করে সেই বদমাইশ বংশীটা—ওটাকে দেখতে পারিনে দু'চক্ষে।

বৃন্দাবন বললে—এই দেখুন না শালাবাবু, দত্তমশাই ছিল বলেই না আবার আমার চুনীর গাড়ি হয়েছে—গয়না হয়েছে, ছোটবাবুর ওপর ভরসা করে থাকলেই হয়েছিল আর কি! চলো চুনী, দত্তমশাই বোধ হয় এতক্ষণ এসে গিয়েছে।

চুনীদাসী বললে—একটা কাজ করবে ভালোমানুষবাবু!

—কী কাজ?

—ছোটবাবু যখন মদ খাবে, তখন একটা ওষুধ খেতে দেবো মদের সঙ্গে—বরাবর খেতো সেইটে ছোটকর্তা।

ভূতনাথ বললে—মদ তো আর খায় না ছোটকর্তা, ছেড়ে দিয়েছে।

—ছেড়ে দিয়েছে?

বৃন্দাবনও অবাক হয়ে গেল—ছেড়ে দিয়েছে?

—হ্যাঁ, ছোটবাবু মদ ছোঁয় না পর্যন্ত—ডাক্তার বারণ করেছে, বলেছে যে—মদ খেলে আর বাঁচবে না।

কথাটা শুনে দু'জনেই যেন কিছুক্ষণের জন্যে কথা বলতে পারলে না। যেন মনে হলো মর্মান্তিক আঘাত পেলে। বৃন্দাবন বললে—তা হলে শিবের বাবার সাধ্যি নেই এ-রোগ সারায়।

চুনীদাসী কিছুই বললে না।

বৃন্দাবন বললে—চলো, চলো, দত্তমশাই বোধ হয় হা-পিত্যেশ করে বসে আছে এখন।

যাবার সময় চুনীদাসী একটা কথাও বললে না। যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছে খবরটা শুনে। গাড়িটা হুশ করে চলে গেল ধোঁয়া ছড়িয়ে। অথচ সেবারে দেখা হলে বারবার করে আসতে বলেছিল ভূতনাথকে। না-আসতে বলেছে ভালোই হয়েছে। সেদিনকার সেই নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় কী করে যে শেষ পর্যন্ত বড়বাড়িতে এসে পৌঁছেছিল ভূতনাথ, তাই একটা আশ্চর্য ঘটনা। সমস্ত কলকাতাময় যেন ঘুরে বেড়িয়েছে সে। সমস্ত ইতিহাসটা যেন প্রদক্ষিণ করেছে। শেযে মেছোবাজারের সেই গুণ্ডাপাড়ার কাছে এসে যখন নিশানা পেয়েছিল তখনই ফিরে এসেছিল বড়বাড়িতে। বাড়িতে যখন এসে পৌঁছেছিল তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেজবাবুর গাড়ি তার আগেই এসে পৌঁছে গিয়েছে। ছোটবাবু তখনও আসেনি। ব্রিজ সিং গেট-এ দাঁড়িয়ে ঢুলছিল। সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কৌন্ হ্যায়?

বংশী এসে সব দেখে-শুনে মাথায় বরফ দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছিল। বললে—কী সব্বনাশ করেছিলেন আজ্ঞে, বলুন তো?

ভূতনাথ বললে—ওরা পালিয়েছে?

—কারা?

—যারা আসছিল পেছন-পেছন—গুণ্ডারা?

—কেউ তো আসেনি!

ভূতনাথের যেন তখনও মনে হচ্ছিলো মেছোবাজারের কাফ্রি গুণ্ডারা সেই রাত্রে তখনো পেছন-পেছন আসছে। যেন তাদের পায়ের শব্দ বাজছে কানে। তাদের ফিস-ফিস আওয়াজ, গুজ-গুজ, ফুস-ফুস। সমস্ত রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরগুলো তখন যেন থম-থম করছে থেকে-থেকে। বুকের ধড়ফড়ানি থামেনি তখনও।

এ-সব বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু সেই বড়বাড়ি দেখতে দেখতে কী হয়ে গেল! কেন যে কার পরামর্শ শুনে কয়লার খনি কিনতে গেল চৌধুরীবাবুরা! মধুসূদন তখন ছিল। যেবার কয়লার খনি কেনা হলো সেবার খনি দেখতে গিয়েছিল সে।

মেজবাবু বলেছিল—এখনও তো কিছুই হয়নি, সবে খুঁড়ছে।

মধুসূদন বললে—তাই-ই দেখবো হুজুর, কেমনভাবে কয়লা ওঠে—এই সব।

তা শেষ পর্যন্ত ছুটি নিয়ে গেল মধুসূদন। ফিরে এল একদিন পরেই। বললে—কিচ্ছু হয়নি শালাবাবু, এখন শুধু আপিস বসেছে, মাপ-জোক হচ্ছে চারিদিকে, জল তুলে ফেলছে নলে করে আর হাজার হাজার কুলি মাটি খুঁড়ছে কেবল—আর চারিদিকে শুধু মাঠ, ধোঁয়া আর কালো-কালো ধুলো।

—ধোঁয়া কেন?

—কাঁচা কয়লা পোড়াচ্ছে যে চারদিকে—সেই কয়লায় রান্না হবে।

—তোরা কোথায় খাওয়া-দাওয়া করলি?

—রান্না করলুম মাঠের ধারে, একবেলা তো ছিলুম শুধু, কপিকল বসবে, ইঞ্জিন চলবে, এখন অনেক দেরি, মাটির ভেতর কুলীরা সব নামবে—নেমে কাজ করবে, ওখানে দিনরাত কাজ হয় কি না!

মধুসূদন সুখচরে আগে গিয়েছে, এখন আবার বাবুদের কয়লার খনিও দেখে এল। তা সেই কয়লার খনি তারপর যে এমন করে ফেল মারবে কে ভাবতে পেরেছিল! কত লক্ষ টাকা জলে চলে গেল শুধু-শুধু। ঘরে এল না একটা পয়সা।

ভাবতে-ভাবতে অনেক দেরি হয়ে গেল। সরকারবাবু হঠাৎ বললে—ওই বাবু এসে গিয়েছেন।

—কই?

—গাড়ির বাজনা শুনছেন না!

সত্যিই রূপচাঁদবাবু এলেন। গাড়ি থেকে নেমে বললেন—ভূতনাথবাবু কই?

—আজ্ঞে, আমাকে ডাকছিলেন?

রূপচাঁদবাবু থমকে দাঁড়ালেন—এই তো, আপনাকে খুঁজছিলুম, শুনেছেন সুবিনয়বাবুর অসুখ!

—সুবিনয়বাবুর অসুখ? আমি তো কালকেও গিয়েছিলাম, কোনো খারাপ কিছু দেখিনি তো তখন?

—হ্যাঁ, এইমাত্র খবর পেলাম, অবস্থা বড় খারাপ, আমাদের সমাজের সবাই গিয়েছেন, আমি যাচ্ছি এখন, আপনি যাবেন নাকি?

সুবিনয়বাবুর অসুখের খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে জবার কথাটা মনে পড়লো ভূতনাথের। বললে—আমার তো একটু দেরি হবে, একটু বাকি আছে, ভাউচারগুলো বুঝিয়ে দিয়েই যাচ্ছি।

—তবে আমি যাই, আপনি আসুন।

রূপচাঁদবাবু চলে গেলেন। ভূতনাথের কেমন ভয় করতে লাগলো। আর মাত্র ক'দিন বাকি ছিল জবার বিয়ের। প্রায় সব তোড়জোড় হয়ে গিয়েছে। বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পর্যন্ত তৈরি। ঠিক এই সময়ে সুবিনয়বাবুর অসুখ! ভাউচার মিলিয়ে হিসেব বুঝিয়ে দিতেও দেরি হলো অনেক। টাকা-কড়ির ব্যাপার, অত তাড়াহুড়ো করলে চলে না।

সরকারবাবু বলে—আপনাদের কী মশাই, আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়েই খালাস, কিন্তু আমার এখনও বসে বসে সব মিলিয়ে তবে ছুটি। রাত্রে বাড়ি গিয়েও এক-একদিন ভালো ঘুম হয় না।

ভূতনাথের তখন অত কথা ভাববার সময় নেই। জবার কথাই বার বার মনে পড়ছিল। যদি ভালোয় ভালোয় এখন অসুখটা সেরে যায় শীগগির, তবেই বিয়েটা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবে। জবার বিয়েতে ভূতনাথেরই কি কম দায়িত্ব! বাইরের কাজগুলো তো সব ভূতনাথকেই করতে হবে।

সুবিনয়বাবু বলেছিলেন—তোমাকেই সব ভার নিতে হবে ভূতনাথবাবু।

জবা বলেছিল—ছুটির জন্যে আপনি ভাববেন না, বাবা রূপচাঁদবাবুকে বলে দেবেন।

তা সত্যি কথা। ছুটির জন্যে বিশেষ ভাবনা তারও ছিল না। সুবিনয়বাবুর কথাতেই মাত্র তার মাইনে বারো টাকা। আর সব বিল্ ক্লার্ক তো সাত টাকা করেই পায়।

সুবিনয়বাবুর বাড়িতে এই প্রথম বিয়ে। তাঁর অনেক দিনের সাধ। উৎসব অনেকবার সুবিনয়বাবু করেছেন। প্রত্যেক বছরেই মাঘোৎসব হয়। সেদিন জবাই সমস্ত করে। সমাজের প্রত্যেকটি লোকই সেদিন আসে। অত লোকের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন, আপ্যায়ন করা আর উপাসনা। কতদিন ভূতনাথ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটিয়েছে জবাদের বাড়ি। দলে দলে ছেলেরা আসে, মেয়েরা আসে। কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েরা ঘোমটা না দিয়ে আসে। কোথাও আড়ষ্টতা নেই। ভূতনাথের বরং লজ্জা করে তাদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতে। দামী দামী শাড়ি পরা, ব্লাউজ পরা। মাথায় সিঁদুর নেই। সেদিন ফুল-দেবদারু পাতা দিয়ে সাজানো হতো বড় হল্-ঘরটা। ফলাহারী পাঠক তখন ছিল। 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিস সেদিন বন্ধ থাকতো। চাকর-দারোয়ানদের নিয়ে ভূতনাথ বাড়ি সাজাবার ভারটা নিতো। ঢালোয়া খিচুড়ি রান্না হতো সকলের জন্যে। গান হতো কত রকমের। একবার একটা গান হয়েছিল। সবটা বেশ মুখস্থ আছে এখনও।

ভুবন হইতে ভুবনবাসী এসো আপন হৃদয়ে।
হৃদয় মাঝে হৃদয়নাথ, আছে নিত্য সাথ-সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবারাত, হের তাঁহারে অভয়ে।
হেথা চির আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম, নিভৃত অমৃত আলয়ে।

সুরটাও বেশ চমৎকার। জবা সামনে বসে সকলের সঙ্গে গাইছিল।

ভূতনাথ পরে জিজ্ঞেস করেছিল—এটা কী সুর জবা, শুনতে বেশ চমৎকার তো!

জবার কাছেই শুনেছিল, সুরটা নাকি—বড়হংস সারঙ্গ।

আর একটা গান ছিল—আশা ভৈঁরো—

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু, পুণ্য-প্রভাতে আজি;
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা;
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি।...

শেষটা আর মনে নেই ও গানটার। এবারেও মাঘোৎসব হবার কথা ছিল জবার বিয়ের পর। কিন্তু অসুখ হয়ে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। এখন কোথায় রইল জবার বিয়ে। সেবারও অসুখ হয়েছিল সুবিনয়বাবুর। সারতে কিছুদিন সময় লেগেছিল, এবারের অসুখটায় যদি তেমনি অতদিন সময় লাগে তো জবার বিয়ে নিশ্চয়ই পেছিয়ে যাবে।

কোথায় ভবানীপুর আর কোথায় বার-শিমলে!

সাইকেল করে যেতে যেতে ভূতনাথের অনেক কথাই মনে পড়ে। এতক্ষণ রূপচাঁদবাবু নিশ্চয়ই পৌঁছে গিয়েছেন। সেবার সুপবিত্র ডাক্তার আনতে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভূতনাথকেই করতে হয়েছিল সব। এবারও করতে হবে নিশ্চয়ই। বাড়ির আত্মীয়স্বজন বলতে তো আর কেউ নেই কোথাও। এক সুপবিত্র আছে। তা সে-ও একটু নিরীহ প্রকৃতির, বেশি কথা বলে না। চুপচাপ শোনে সব। কাজ করবার আগ্রহও আছে তার, কিন্তু একটু লাজুক। এতদিনের প্রতীক্ষার পর তা-ও যদিই বা সমস্ত স্থির, এই সময়ে এমন বাধা।

গলি-ঘুঁজি দিয়ে চলতে চলতে এক-এক জায়গায় নেমে দাঁড়াতে হয়। দু'পাশে নর্দমা, রাস্তার মাঝখানে টিম-টিমে আলো জ্বেলে একটা গরুর গাড়ি হয়তো দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের সামনে মাল নামাচ্ছে। এ-পাশে একটা বাঁয়া-তবলার দোকান, তার পাশে হরিণের চামড়া, বাঘের চামড়া, ভালুকের চামড়া ঝোলানো। রাস্তার ওপরেই লোহার উনুন জ্বেলে কেউ রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। অত রাত্রেও রাস্তার কলের জলের সামনে ভিড় কমেনি। কোনো জায়গায় গ্যাসের আলোর তলায় বসে দাবা খেলা জুড়ে দিয়েছে বুড়োরা। আরো পঞ্চাশজন ঘিরে তাদের হার-জিত লক্ষ্য করছে। খেলার সমালোচনা করছে। দাঁড়িয়েছে রাস্তা জুড়ে, চলবারই উপায় রাখেনি।

সাইকেল-এর ঘণ্টা বাজিয়ে সাবধানে চলতে হয়।

কেল্লায় তোপ পড়লো একটা। তবে তো বেশি রাত হয়নি। কিন্তু এখনও যে অনেক দূর। সাইকেল চালাতে চালাতে পা ব্যথা করে আসে ভূতনাথের। এই সাইকেলই যখন প্রথম উঠলো—হাঁ করে দেখতো লোকে। অবাকও হতো। দুটো চাকার ওপর দিয়ে চালানো, মনে হতো পড়ে তো যায় না। শাঁ-শাঁ করে চলতো সব। সাইকেল দেখে ভয়ে দু'পাশে সরে যেতো লোক। ধাক্কা দিয়ে চাপা দিলে আর রক্ষে থাকবে না। ক্রিং-ক্রিং ঘণ্টার বাজনা। শব্দ শুনে বাড়ির ছেলেমেয়েরা কাজকর্ম ফেলে জানলায় এসে দাঁড়াতো একদিন। এখন বদলে গিয়েছে সব। এখন কেউ ফিরেও চায় না।

বৌবাজারের কাছে আসতেই শিয়ালদার মোড়। এখানটায় আলো, লোকজনের চলাচল বেশি। প্রথম যেদিন কলকাতায় এসেছিল ভূতনাথ, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। তখন হ্যারিসন রোড হয়নি, এই রাস্তাটায় ভিড় ছিল বেশি। কলকাতা শহরের মধ্যেই কত পুকুর ছিল চারদিকে। সব একে-একে বুজিয়ে ফেলছে এখন। যত সব জঞ্জাল এনে ফেলে

পুকুরের জলে। আর গন্ধে চলা দায় তার ধার-কাছ দিয়ে। মাছিগুলো টানাপাখার দড়িতে এসে বসে। একেবারে মাছিতে ঢেকে যায় সব। কালো হয়ে যায়। তারপর চোত্-বোশেখের ঝড়ে সেই ময়লা-ধুলো উড়ে এসে ঘরময় ছড়িয়ে যায়।

বার-শিমলের রাস্তায় পড়ে ভূতনাথ সাইকেল থেকে নামলো। এ-রাস্তাটায় এখনো আলো হয়নি। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তবু কিছু দূরে হেঁটে গিয়েই মনে হলো যেন কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে জবাদের বাড়ির সামনে। খবর পেয়ে সবাই বুঝি এসেছে।

দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতরে একটা থমথমে ভাব। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই নাকে যেন ওষুধের গন্ধ পাওয়া গেল। তীব্র একটা গন্ধ। বড়বাড়িতে ছোটবাবুর ঘরের কাছে গেলেও এই রকম গন্ধ বেরোয় আজকাল। উপাসনা-ঘরের ভেতর ফরাশের ওপর অনেক ভদ্রলোক বসে আছেন। সবার মুখেই দাড়ি। সবাই বেশি বয়সের লোক। চুপি-চুপি গলা নিচু করে কথা বলছেন। রূপচাঁদবাবুকেও দেখা গেল—একজন ডাক্তারের সঙ্গে কী যেন কথা বলছেন।

আর সুবিনয়বাবুর ঘরে...

ভূতনাথ একবার সুবিনয়বাবুর শোবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে। জবা বসে আছে সুবিনয়বাবুর বিছানার পাশে। মাথার দিকে। তার পাশেই সুপবিত্র। সে-ও যেন আজ উদ্বিগ্ন। আর একজন ডাক্তার সুবিনয়বাবুর নাড়ী পরীক্ষা করছেন। সুবিনয়বাবু চিত হয়ে শুয়ে আছেন বিছানার ওপর। চোখ দুটি বোজানো। টিপি-টিপি পায় ভূতনাথ ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়ালো। জবা যেন তার দিকে একবার চাইলে। সুপবিত্রও চাইলে একবার। কিন্তু কথা বেরুলো না কারো মুখ দিয়ে।

মৃত্যু!

মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ভূতনাথের আছে। কঠিন, শাদা, স্পষ্ট মৃত্যু। এত স্পষ্ট করে ভূতনাথ মৃত্যুকে দেখেছে যে, একবার দেখলে আর চিনতে ভুল হয় না তার। চেনা যায় তার পুরনো রূপ। পুরনো পদধ্বনি। অন্ধকারের অস্পষ্ট আবহাওয়ায় কোথায় যেন আলোড়ন শুরু হয় প্রথমে। তারপর ঘন হয়ে আসে অন্ধকার। সেই ঘন অন্ধকারে তখন স্পষ্ট হয়ে আসে তার চেহারা। ধীরে-ধীরে শ্বাপদ-সতর্ক পায়ে সে নামে এখানে। এখানের এই অবসাদগ্রস্ত ঘরে। তারপর চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে নেয়। সেবারত মানুষের মস্তিষ্কের কোষে-কোষে সে বিষ ঢুকিয়ে দেয় অজ্ঞাতে। অন্ধ করে দেয় দৃষ্টি। সুস্থ মস্তিষ্ক করে তোলে অসুস্থ। কান্নায় কাতর হয়ে যখন সকলের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, সকলের চিন্তাশক্তি যখন অগোছালো, তখন সেই সুযোগে সে এসে কাছে বসে। অতি সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে দেয় মুমূর্ষুর গায়ে। ঠাণ্ডা বরফ-শীতল সে স্পর্শ। আস্তে আস্তে হিম হয়ে আসে দেহ! কণ্ঠরোধ হয়ে আসে ধীরে ধীরে। কথা বলতে চেষ্টা করে সে। চোখ মেলতে চেষ্টা করে সে। দু'হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরতে চেষ্টা করে সে। চেষ্টার অবধি থাকে না তার। চোখ দুটো বার বার লক্ষ্যহীন হয়ে আসে। অনুভূতির তীব্র আবেগে সে চিৎকার করতে চেষ্টাও করে কিন্তু সব চেষ্টা তখন নিষ্ফল। সব চেতনা তখন নিস্তেজ।

প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা তার সেই পোষা বেজিটার কাছে।

অবলা জানোয়ার। কিন্তু শেষকালে সে-ও যেন কথা বলতে চেষ্টা করেছিল। স্পষ্ট ভাষায় যেন জানাতে চেয়েছিল তার বেদনার কথা। দাঁত দিয়ে কামড়ে দিয়ে জানাতে চেয়েছিল তার শেষ ভালোবাসা। কিন্তু নিস্তেজ হয়ে এল ক্রমে। মানুষের কাছে তার নিবেদন ব্যর্থ হলো একটু শক্তির অভাবে।

আর তারপর তার পিসীমা। প্রথম দিনটি থেকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পদক্ষেপ সে শুনেছে। প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাস পতনে মৃত্যুর পরোক্ষ স্পর্শ সে পেয়েছে। কেমন করে শিথিল হয়ে আসে শিরা-উপশিরা, কেমন করে আলো নিবে আসে চোখের, কেমন করে এ জগতের সমস্ত চেতনা অনুভূতি একে-একে লুপ্ত হয়ে যায়, তার হিসেব ভূতনাথের মুখস্থ! বেজিটার মতন পিসীমা'র দেহও তার হাতের ওপর একদিন ঠাণ্ডা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই হাতের স্পর্শে এখনও সে-অনুভূতি খুঁজলে পাওয়া যাবে বুঝি। মানুষের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আবেদন-নিবেদন মানুষের সমস্ত ভালোবাসা এক

সময়ে কেমন করে মূল্যহীন হয়ে যায় ভূতনাথের তা কণ্ঠস্থ।

তা ছাড়া আর একটা অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা নয়, অনুভূতি।

সে রাধার মৃত্যু! মৃত্যু নয়, মৃত্যুর সংবাদ। মৃত্যুর সংবাদ এমন করে যে অসাড় করে দিতে পারে মনকে, সে-ও এক বিচিত্র অনুভূতি। সেদিন মনে হয়েছিল সমস্ত বুকটা যেন খালি ঠেকছে, সমস্ত আবেগ যেন নিথর হয়ে গিয়েছে, সমস্ত জীবন যেন নিঃশেষ।

আজ সুবিনয়বাবুর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে লোকজন, ডাক্তার, বরফ, ওষুধের তীব্র গন্ধের মধ্যেও যেন সেই পুরনো স্মৃতি ফিরে পেলে ভূতনাথ। সেই কঠিন, শাদা, স্পষ্ট আর নিষ্ঠুর মৃত্যু! অভিযোগহীন, প্রতিকারহীন, অবধারিত এক দুর্ঘটনা।

ক্রমে রাত অনেক হলো। একে-একে কখন সবাই চলে গিয়েছেন। ডাক্তারও নিজের কর্তব্যের শেষটুকু সমাধা করে খানিকক্ষণের জন্যে বিদায় নিয়েছেন। সুপবিত্র আর জবা পাথরের মূর্তির মতো ওপাশে বসে আছে। ভূতনাথ একমনে সুবিনয়বাবুর মাথায় বরফ দিচ্ছিলো। হাতে কাজ করে চলেছে ভূতনাথ, কিন্তু কোথায় যেন রাত্রের অন্ধকারে এক অশরীরী মূর্তির আবির্ভাবের আশঙ্কায় কম্পমান। একটু অসতর্ক হলেই যেন সে আসবে। সমস্ত চেষ্টাকে শিথিল করে দিয়ে চলে যাবে এক মুহূর্তে!

হঠাৎ সুবিনয়বাবুর যেন চেতনা হলো। বললেন—কে?

অতি ক্ষীণ শব্দ। ভূতনাথ মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বললে—আমি ভূতনাথ।

—জবা, জবা কোথায়?

—বাবা! জবার গলা কান্নায় বড় করুণ শোনালো। ভূতনাথ উঠে দাঁড়ালো। সামনে এসে বসলো জবা।

—মা!

সুবিনয়বাবু যেন আর-দু'জনের দিকে চাইলেন একবার।

—কিছু বলবেন বাবা?

তবু যেন মুমূর্ষু-দৃষ্টিতে কেমন দ্বিধা প্রকাশ করলেন। এক বার চোখ বুজলেন। আবার চোখ খুললেন। চাইলেন সুপবিত্রর দিকে। চোখ দিয়ে তাঁর স্নেহ উথলে উঠলো যেন। কিছু কথা বলতে চেষ্টা করতে গিয়ে যেন থেমে গেলেন এক বার।

জবা নিচু হয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—কিছু বলবেন আমাকে?

সুবিনয়বাবু যেন অপরাধীর মতো এক বার চাইলেন জবার দিকে।

—মা!

—বড় কষ্ট হচ্ছে?

—না। সুবিনয়বাবুর চোখ দুটো জলে ভরে এল। এবারও যেন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। চাইলেন আবার সুপবিত্রর দিকে।

সুপবিত্রও এক বার নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কিছু বললেন আমাকে?

সুবিনয়বাবু হাত নাড়লেন—না।

ভূতনাথ ইঙ্গিতে সুপবিত্রকে ডাকলো একবার। জবাকে বললে—আমরা পাশের ঘরে আছি, দরকার হলে ডেকো জবা।

সুবিনয়বাবু এবার যেন খানিকটা স্বস্তি পেলেন। চোখের দৃষ্টি সামান্য সহজ হয়ে এল। চোখ দিয়ে ভূতনাথকে আর সুপবিত্রকে একদৃষ্টে অনুসরণ করতে লাগলেন।

জবা তখনও বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

ভোর তখনও হয়নি ভালো করে। বার-শিমলের বসতি-বিরল পাড়ায় তখনও অন্ধকার জমাট। শুধু জানলা দিয়ে পুব আকাশের দিকে চাইলে দেখা যায় যেখানটায় আকাশ মাটি ছুঁয়েছে, ওখানে যেন অন্ধকার কিছু তরল হয়ে আসছে। ভূতনাথ আবার কান পেতে শুনতে লাগলো। পাশের সুবিনয়বাবুর ঘর থেকে কোনো শব্দ কোনো চেতনার আলোড়ন কানে আসে কি না।

জবার ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলো ভূতনাথ। জবার টেবিলের ওপর সুপবিত্রর একটা ছবি। প্রত্যেকটি বই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিপাটি করে সাজানো। দেয়ালের আলনায় জবার শাড়িগুলো পর্যন্ত কুঁচিয়ে রাখা। কোথাও এতটুকু অপব্যয় নেই। সমস্ত রাত বসে বসে ভূতনাথের যেন ক্লান্তি এসেছে। ভূতনাথ সুপবিত্রর দিকে চেয়ে দেখলে একবার। জবার বিছানার ওপর জবার বালিশেই মাথা রেখে সুপবিত্র অকাতরে ঘুমোচ্ছে তখন থেকে। ঘুমোলে সুপবিত্রকে জেগে থাকবার মতোই কেমন অসহায় দেখায়। কেমন নিশ্চিন্ত মানুষ সুপবিত্র। এই অবস্থার মধ্যেও ঘুমোতে পারলো!

ঘড়িতে একটার পর একটা বেজে চলেছে। ভূতনাথের মনে হলো কতক্ষণে রাত শেষ হবে কে জানে! প্রতীক্ষার আলস্যে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে ভূতনাথ।

ভোরের দিকে হঠাৎ জবা এল।

দরজা খোলাই ছিল। চেহারা দেখে ভূতনাথ যেন চমকে উঠেছে। এ-জবাকে যেন চেনা যায় না আর। সমস্ত রাতের জাগরণের পর জবার যেন হঠাৎ দশ বছর বয়েস বেড়ে গিয়েছে।

ভূতনাথ অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলে—বাবা এখন কেমন আছেন জবা?

জবা কিন্তু সে-প্রশ্নের জবাব দিলে না। বললে—ডাক্তারবাবু এসে গিয়েছেন—কিন্তু সুপবিত্র! সুপবিত্র কই?

—ঘুমোচ্ছেন।

—আপনি এক কাজ করুন ভূতনাথবাবু—সুপবিত্রকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুন।

—নাই-বা গেলেন, থাকুন না, এখন তো ঘুমোচ্ছেন, আর বাড়িতে ওঁর মাকে তো খবর দিয়েই এসেছি।

—না, তবু আপনি ওকে জাগান।

জবার গলার আওয়াজ শুনে ভূতনাথও যেন কেমন ভয় পেলো। এমন সুরে তো কখনও কথা বলে না জবা! রাত্রে এমন কী ঘটনা ঘটলো! সুবিনয়বাবু একান্তে জবাকে কী বলতে চেয়েছিলেন!

ভূতনাথ আবার একবার অনুনয় করবার চেষ্টা করলে। বললে—কিন্তু জাগিয়ে লাভ কি জবা—ঘুমোচ্ছেন ঘুমোন না—মিছিমিছি—

জবা যেন এবার কর্কশ হয়ে উঠলো। বললে—যা বলছি আপনি করবেন কিনা?

ভূতনাথ এবার অনুরোধের ভঙ্গীতে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো। বললে—সুপবিত্রবাবুর তো শরীর খারাপ হচ্ছে না, আর তা ছাড়া উনিও কি এই সময়ে তোমাকে একলা ছেড়ে যেতে চাইবেন?

জবা বললে—অত কথা বলবার আমার সময় নেই ভূতনাথবাবু—যেতে না চাইলেও ওকে যেতেই হবে।

—কেন? ও-কথা বলছো কেন জবা? ওঁরও তো একটা কর্তব্য আছে।

জবা এবার যেন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে চাইলো। কিন্তু কান্নার আবেগে গলাটা বুজে এল তার। বললে—না, না, না—ওর কোনো কর্তব্য নেই।

—সে কি?

জবা এবার বাবার ঘরের দিকে চলেই যাচ্ছিলো। কিন্তু এক বার ফিরে দাঁড়ালো। বললে—ভূতনাথবাবু, আপনি আর এ-সময় তর্ক করবেন না। আমার সব গোলমাল লাগছে—ওর আর কোনো কর্তব্যই নেই আমার ওপর, আমারও ওর সঙ্গে মেলামেশা ঠিক নয়।

—কেন?

জবা যেন পাগলের মতো ছটফট করতে লাগলো। বললে—ভূতনাথবাবু, দয়া করে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসুন। ওকে বলবেন—ও যেন আর কখনও এ-বাড়িতে না আসে—কখনও না আসে।

কথাটা শুনে ভূতনাথ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ততক্ষণে জবা পাগলের মতোই আবার গিয়ে সুবিনয়বাবুর ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ভূতনাথ পেছন-পেছন গেল। সমস্ত হিসেবটা যেন গোলমাল হয়ে গেল তার হঠাৎ। জবার মুখে যেন এক অস্বাভাবিক কাঠিন্য। অথচ চোখে যেন সেই আর্দ্রতা। নিজেকে যেন অনেক কষ্টে চেপে রেখেছে সে।

সুবিনয়বাবুর ঘরে তখন নিঃশব্দ ভয়াবহতা। ডাক্তার চুপ করে বসে আছেন সুবিনয়বাবুর দিকে মুখ করে। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন চরম মুহূর্তের জন্যে। যেন এখনি শুরু হবে অবশ্যম্ভাবী পদসঞ্চার। ছায়া-ছায়া ভোর। নীলচে অন্ধকার। ভূতনাথ ডাক্তারের দিকে উন্মুখ আগ্রহে চেয়ে দেখলে। সে-মুখে কোথাও কোনো বিরক্তি নেই, ব্যতিক্রম নেই।

আর সুবিনয়বাবু! সুবিনয়বাবুর স্তিমিত চোখ যেন এ-পৃথিবীর উর্ধ্বে অন্য এক লোকে নিবদ্ধ হয়ে আছে। সেখানে জীবন নেই, মৃত্যু নেই, অবাঙ্‌মানসগোচর এক অলৌকিক স্বাদ। সুবিনয়বাবুর মুখে যেন সূক্ষ্ম একটা হাসির ক্ষীণ রেখা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভূতনাথের অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো। একদিন সুবিনয়বাবু বলেছিলেন—আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যে জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এটা খুব সহজ কথা ভূতনাথবাবু, কিন্তু এর চেয়ে শক্ত কথাও আর কিছু নেই। যেমন দেখো একটা অতি সহজ কথা—স্বার্থত্যাগ করে সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললেই মানুষের মুক্তি হয়—এই সামান্য সহজ কথাটার জন্যেই একটি রাজপুত্রকে রাজ্য ত্যাগ করে পথে-পথে ফিরতে হয়েছে।

আর-একদিন মাঘোৎসবের শেষে বলেছিলেন—নদী যখন চলে তখন দুই কূলে কেবল পেতে পেতেই চলে, পাওয়াই তার সাধনা, কিন্তু যখন সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছোয় তখন তার দেবার পালা—দেওয়াই হয় তার ধ্যান। কিন্তু আপনার সমস্তকে দিতে-দিতে সেই যে অন্তহীন দান, সেই তো পরিপূর্ণ পাওয়া, তখন রিক্ত হয়েও আর লোকসান হয় না—আপনাকে ক্ষয় করেই সেই অক্ষয়কে উপলব্ধি করতে পারে। এইজন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে। মৃত্যু আছে বলেই অমৃতকে জানতে পারি, ক্ষয় আছে বলেই অক্ষয়কে বুঝতে পারি।

আজ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও যেন তাই সুবিনয়বাবুর মুখ থেকে হাসি মুছে যায়নি।

ভূতনাথ জবার দিকে চেয়ে দেখলে। জবাকে যেন একফালি চাঁদের মতো দেখাচ্ছে। তেজ নেই। কিন্তু তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি ছায়া-শীতল। সারারাত জেগেছে। চেহারায় যেন একরাশ বিষণ্ণতা। ঠিক ওমনি করে ওই জায়গায় সারারাত বসে বসে কাটিয়েছে সে। কাছে গিয়ে ভূতনাথ বললে—তুমি একটু শোও গিয়ে জবা, আমি তো আছি।

কোনো উত্তর দিল না জবা।

বাইরে আস্তে আস্তে পূব আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে। ভূতনাথ দোতলার বারান্দাতেই খানিকক্ষণ দাঁড়ালো। আজ জবার সংসার যেন সকাল থেকেই অলস হয়ে পড়ে আছে। কোথাও কোনো শব্দের আড়ম্বর নেই। এখানে আজ মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। তাই সমস্ত পৃথিবী যেন মুহ্যমান। সমস্ত নিখিল বিশৃঙ্খল।

পাশের ঘরে সুপবিত্র তখনও ঘুমোচ্ছিল।

ভূতনাথ কাছে গিয়ে ডাকতে লাগলো—সুপবিত্রবাবু, সুপবিত্রবাবু—

অসহায় শিশুর মতো সুপবিত্র অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। ডাকাডাকিতে ধড়ফড় করে উঠে বসলো। চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে অবস্থাটা মনে পড়লো যেন। চোখ মুছতে মুছতে বললে—বাবা এখন কেমন আছেন?

ভূতনাথ বললে—ডাক্তারবাবু এসেছেন—তেমনি অবস্থা এখনও।

যেন খানিকটা লজ্জিত হলো সুপবিত্র মনে মনে। জামাটা পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিছানার দিকে নজর পড়তেই বললে—আর—আর—

—জবার কথা বলছেন? সে-ও ওখানেই আছে।

—ক'টা বাজলো?

কিছুক্ষণ আগে বলা জবার কথাটা কেমন করে বলবে আর বলবে কি না, সেই কথাটাই ভাবতে গিয়ে ভূতনাথ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। সুপবিত্র তখন নিজের জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়েছে। জবার চিরুনিটা নিয়ে চুল আঁচড়ে নিচ্ছিলো। এই ঘরে এই বাড়িতে একদিন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে সুপবিত্র। এখনও যে পর, দু'দিন পরেই সে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে।

সুপবিত্র বললে—আমাকে আগে ডেকে দেননি কেন ভূতনাথবাবু?

ভূতনাথের জবাব দেবার আগেই জবা এসে ঘরে ঢুকলো।

ভূতনাথ যেন জবাকে দেখে ভালো করে চিনতে পারলে না। ঘুমোতে ঘুমোতে কি হাঁটা যায়? মনে হলো জবার দীর্ঘ দেহটা এখনি অবশ হয়ে পড়বে। যেন ছায়া-শরীর। রক্ত-মাংস-হীন স্পর্শ-গন্ধ-বর্ণহীন একরাশ বিবর্ণতা।

জবা বললে—ভূতনাথবাবু—

জবার গলার আওয়াজ পেয়ে সুপবিত্রও এবার পেছন ফিরেছে।

বললে—বাবা এখন কেমন আছেন?

ছায়া-শরীর এবার যেন ঈষৎ স্পন্দিত হলো। বললে—সুপবিত্র, তুমি এখনও যাওনি?

সুপবিত্র হঠাৎ এই প্রশ্নে যেন একটু বিচলিত হলো। কী উত্তর দেবে হঠাৎ বুঝতে পারলে না।

জবা আবার বললে—তুমি এবার বাড়ি যাও সুপবিত্র।

—বাড়ি যাবো?

সুপবিত্র বুঝি এ-প্রশ্নের জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত ছিল না।

—হ্যাঁ, বাড়ি যাবে।

—কিন্তু আমার তো কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

না হোক, তুমি বাড়ি যাও সুপবিত্র—আর এ-বাড়িতে কখনও এসো না। যদি পারো তো আমার কথা ভুলতে চেষ্টা করো—আর ভূতনাথবাবু, আপনি এবার আসুন—বাবা নেই!

আজও মনে আছে স্পষ্ট। মনে আছে বৈকি! বড়বাড়ির ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে সে-কথাও কি ভোলবার! জীবনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে, তাদের ভুললে নিজেকেও ভুলতে হয় যে। সেদিন সেই অল্প অল্প ভোরের আবছায়াতে জবার সেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ উক্তি যেন আজও কানে শুনতে পাচ্ছে ভূতনাথ। বাবা নেই!

অনেকেই আজ আর নেই সত্যি। সেদিনকার সে-মানুষগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই নেই আর আজ। কোথায় সব হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। কোথায় ননীলাল! কোথায় বংশী! কোথায় চিন্তা! কোথায় গেল ছুটুকবাবু! কোথায় গেল বিধু সরকার, ইব্রাহিম আর বদরিকাবাবু! আর কোথায়ই-বা গেল পটেশ্বরী বৌঠান! বড়বাড়ির সঙ্গে ভূতনাথের যে-পরিচ্ছেদের যতি পড়েছিল, সমাপ্তির ছেদ পড়েছিল যেন জবার সঙ্গে সঙ্গে!

আজও সে-রাস্তাটা দিয়ে চলতে চলতে ওপর দিকে চাইলে দেখা যায়। দেখা যায় অন্য এক চেহারা। সমস্ত বাড়িটা নতুন রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো রাস্তার ঠিক মোড়ের ওপর। ওপরে জানলা খোলা থাকে। আলো জ্বলে ভেতরে। মাঝে মাঝে গানের সুর ভেসে আসে। ভেতরে অর্গ্যান বাজিয়ে বুঝি জবারই মেয়ে গান গায়। ঠিক সেই রকমই গলার সুর। খানিক দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। শুনতে ইচ্ছে করে দু'দণ্ড। লোভ হয় ভেতরে ঢোকবার, চলতে-চলতে গানের কথাগুলো যেন তাকে অনুসরণ করে—

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!

তব নন্দন-গন্ধ-নন্দিত ফিরি সুন্দর ভুবনে
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো—

জবার মেয়েও ঠিক জবার মতোই গান শিখেছে। আর সুপবিত্র? কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

সেদিন বড়বাড়িতে ফিরে সেখানেও আর-এক পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। ও-বাড়িতেও রাজমিস্ত্রী এসেছে দলে দলে। ইঁটের পাহাড় জমেছে উঠোনের ওপর। চুন সুরকি ঢালা রয়েছে আস্তাবলবাড়ির সামনে। নোংরা চারিদিকে। বালকবাবু বেরিয়ে গেল নাচঘর থেকে নথিপত্র নিয়ে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতন ক'দিনের বড়বাড়ি এক অভাবনীয় পরিণতি পেয়েছে।

বংশী এসে দাঁড়ালো—শালাবাবু—কোথায় ছিলেন ক'দিন?

উঠোনের মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি পাঁচিল উঠছে। ওধারে-এধারে সুতো পড়েছে। পনেরো ইঞ্চি মোটা দেয়াল। মাঝখানে একটা ছ'ফুট উঁচু দরজা। ইঁটের ওপর বালির কাজ হবে। আর দাসু জমাদারের ঘরের দিকটাতেও লম্বা সীমানা টানা হয়েছে। মাঝখানে দেয়াল উঠেছে সেখানেও। চারদিকে হৈ চৈ হট্টগোল।

বংশী বললে—বাবুরা আলাদা হচ্ছে শালাবাবু, হাঁড়িও আলাদা হয়ে গিয়েছে।

ক'দিনের মধ্যে এত পরিবর্তন হয়ে গেল! কুলীরা মাথায় ইঁটের বোঝা নিয়ে চিৎকার করে—খবরদার—আর সঙ্গে সঙ্গে কাঠের ভারার ওপর ঝপাং করে শব্দ হয়। ওদিক থেকে একজন মিস্ত্রী সুতো ধরে, আর এ-সীমানায় সে-সুতোর শেষ দিকটা আর একজন টান করে ধরে। ওলোন ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে বার-বার। বাঁকাচোরা না হয়। খাড়াই ইঁটের পাঁচিল মাথা ছাড়িয়ে উঠবে। ও-বাড়ির লোককে এ-বাড়ির লোক দেখতে না পায়। আস্তাবলবাড়িটাও তিন ভাগ হয়েছে। এক ভাগ হিরণ্যমণির, এক ভাগ কৌস্তুভমণির আর-এক ভাগ চূড়ামণির।

বংশী বলে—সব পাল্টে গেল হুজুর—বড়বাড়িতে আর মন টেকে না আমার।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে—ছোটমা কেমন আছে বংশী?

—ভালো নেই শালাবাবু।

—একবার দেখা করতাম, অনেকদিন দেখা হয়নি।

বংশীর মুখে-চোখে যেন কেমন এক রকমের দ্বিধা ফুটে উঠলো।

ভূতনাথ বললে—আজকে সন্ধ্যেবেলা যাবো'খন, খবর দিয়ে রাখিস বৌঠানকে।

বংশী বললে—কিন্তু দেখা আপনি না-ই বা করলেন শালাবাবু!

—কেন, শরীর খরাপ?

বংশী বললে—শরীর তো বৌঠানের ক'দিন থেকেই খারাপ চলছে, কাল একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়-যায় অবস্থা হয়ে উঠেছিল।

—আজ্ঞে, ক'দিন থেকে কিছু খাচ্ছেন না, তার ওপর খালিপেটে ওইগুলো গেলা, ছাইভস্মগুলো পেটে গেলে আর কত সইতে পারে মানুষ, রাত্তিরে চিন্তা আমাকে ডাকতে এসেছে, আমি আবার যাই, বরফ ছিল না বাড়িতে, মেজবাবুর বাড়ি থেকে বেণীর কাছে ধার করে বরফ এনে আবার মাথায় দিই, কিন্তু সে কি থামে, শেষে সেবারে যা করেছিলাম, খানিকটা তেঁতুল-গোলা জল গিলিয়ে দিলাম জোর করে, তখন ঘুমোলেন, নইলে সে কী ছটফটানি! হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল, চোখ উল্টে গিয়েছিল একেবারে।

—তুমি কেন আর ও-সব দাও বৌঠানকে?

বংশী বললে—আমি কেন দিতে যাবো শালাবাবু, আমাকে আনতে বললে আমি 'না' বলে দেই, কত বকুনি তাই জন্যে আমার ওপর, বলে—তুই আজকাল আমাকে অমান্য করিস, টাকা না থাকলে হাতের সোনার চুড়ি কানের গয়না খুলে দিতে আসে আজ্ঞে। একে-একে এমনি করে কত দিকে যে কত টাকা-পয়সা ছোটমা খোয়ালে কী বলবো—কোত্থেকে এ-সব আসে বলুন তো শালাবাবু!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ছোটবাবু কিছু বলে না?

—আজ্ঞে ছোটবাবু তো নিজে ও-সব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু পই পই করে বারণ করেছে—মদ যেন কেউ না দেয় ছোটমাকে, ছোটমাও যখন ভালো থাকে, বলে—আমি খেতে চাইলে দিবিনে আমাকে, কিন্তু এক-এক সময় যা করে ধরে, হাত দুটো ধরে বলে—নিয়ে আয় একটা বোতল, এই শেষবার, আর খাবো না কখ্খনো। জ্ঞান থাকলে অত ভালো মানুষ, আবার যখন অবুঝ হয় তখন হাতে-পায়ে ধরতে আসে, দেখে কী কষ্ট যে হয় মনে—খানিক থেমে বংশী আবার বলে—এই তো সেদিন—সেজখুড়ি তো এখন ছোটবাবুর ভাগে, ওই যে রান্না করতো আগে বড়বাড়িতে, তার থেকে টাকা ধার নিয়ে মদ আনিয়েছে।

—কে আনলে?

—আজ্ঞে বেণী, এখন তো বেণী মেজবাবুর তরফে, সে কেন আমাদের হয়ে টানবে, পরই তো হলো ওরা। সেই খেয়েই সেদিন ওই কাণ্ড, হাত-পা খিঁচে লাগলো, চোখ উল্টে গেল, গায়ে কী শক্তি শালাবাবু, আমি আর চিন্তা দু'হাতে ধরে ঠাণ্ডা করতে পারিনে। মুখ দিয়ে গেঁজাল উঠে প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কি—তা বেণীকে আমি বললাম খুব, খুব শুনিয়ে দিলাম আজ্ঞে—বললাম, আজ না হয় তোরা আলাদা, কিন্তু নুন তো খেয়েছিস ছোটবাবুর, ছোটবাবু আর মেজবাবু কি আলাদা? এক ভাই-ই তো, মায়ের পেটেরই তো ভাই।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ বংশী বললে—ওই যাঃ—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী?

বংশী বললে—কত কাজ আমার পড়ে আছে আর এদিকে আপনার সঙ্গে গল্প করছি আমি! ছোটবাবু সাবু খাবে আজ, বাজারে যেতে হবে এখুনি।

ভূতনাথ বললে—বাজারে কি আজকাল তুমিই যাও নাকি?

—শুধু কি বাজার? এই এক হাতে সব করতে হয় হুজুর। বাজার করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কেউ-ই তো নেই আজ্ঞে, মধুসূদনকাকা সেই যে দেশে গেল আর তো ফিরলো না, আর লোচন তো জানেন পান-বিড়ির দোকান করেছে। বেণী আর শ্যামসুন্দর গিয়েছে ওদের তরফে, আর ছুটুকবাবু সব চাকর তাড়িয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোক রেখেছে—শুধু পুরনোদের মধ্যে আছে বড়মা'র সিন্ধু। আমাদের রান্না করে সেজখুড়ি, তা রান্নার কাজ ছাড়া সবই তো করতে হয় আমাকে—

কথা বলতে বলতে হঠাৎ হাত ধরে টান দিয়ে বংশী বললে—চলে আসুন শালাবাবু, শীগগির চলে আসুন।

কেন যে এত ব্যস্ততা বংশীর, ভূতনাথ তা বুঝতে পারলে না। বললে—কী হলো—বলে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো ভূতনাথ।

—বিধু সরকারমশাই আসছে, সরে আসুন, আজ্ঞে এখান থেকে।

—কেন? বিধু সরকার কি করবে আমার?

—চলে আসুন আগে, বলছি—লোক তো ভালো নয় আজ্ঞে। চোরকুঠুরির ধারে এসে বংশী বললে—আপনি কাজে যাবেন তো আজ? আপনার খাবার চাল নিতে বলি তাহলে?

—না, আমার তো ছুটি এখন ক'দিন—বেলায় যাবো—কিন্তু বিধু সরকার কি খাতা থেকে নাম কেটে দিয়েছে নাকি আমার?

বংশী বললে—আপনি তো আমাদের তরফে আজ্ঞে, বিধু সরকার কী করতে পারে, কিন্তু লোকটা তো ভালো নয়, পরের নামে মিথ্যে রটিয়ে বেড়ায়, আপনার কথা তো সব মেজবাবুকে বলেছে কিনা।

—কী বলেছে, কী?

—যত সব মিথ্যে কথা হুজুর, সেদিন আপনি বৌঠানের ঘরে থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, মেজবাবু দেখেছে, কিন্তু চিনতে পারেনি আজ্ঞে; আমাকে জিজ্ঞেস করলে—কে রে ওখানে? আমি বললাম—আমি। তখন মেজবাবু জিজ্ঞেস করলে—বারান্দা অন্ধকার কেন—আলো জ্বালা থাকবে সব সময়। তা সে ব্যাপার তো সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিধু সরকার মেজবাবুকে

আপনার নাম বলে দিয়েছে আজ্ঞে। বলেছে—ওই লোকটা ছোটবউ-এর কাছে রোজ রাত্রে যায়, বাড়ির বউ-এর সঙ্গে মেশে, গাড়িতে তুলে নিয়ে বাইরে যায়। সেই যে আপনি ছোটমা'র সঙ্গে একদিন বাইরে গিয়েছিলেন না?

—তারপর?

—তারপর সেই নিয়ে হুলুস্থূল, মেজবাবু বলে—কোথায় সে? তা ভাগ্যিস আপনি তখন বাড়িতে আসেননি! মেজমাও তো কম নয়, গিরি বললে—হ্যাঁ, আমি দেখেছি। ছোটমা তখন বললে—সে আমার গুরুভাই, আসে আমার কাছে, তাতে হবে কি? বড়মাও টিপ্পনি কাটলো... সে আমি বলতে পারবো না সব হুজুর। মেজমা, বড়মা মিলে ছোটমাকে না-হোক কথা শোনালে। কী ঝগড়া ক'দিন। সে-সব কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয় হুজুর—তা আপনি এখানে বসুন, আমি একটু বাজারটা ঘুরে আসছি।

সব শুনে ভূতনাথের কেমন যেন ভয় হতে লাগলো। বললে বংশী, এর পর কি আমার এ-বাড়িতে থাকা ভালো হবে রে?

বংশী চলে যাচ্ছিলো। কথা শুনে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। বললে—সে কি শালাবাবু, সে-ব্যাপার তো মিটে গিয়েছে—এখন তো আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছি।

—কিন্তু ছোটবাবু সব শুনেছে তো?

ছোটবাবু কি আর মানুষ আছে আজ্ঞে, শুয়ে পড়ে আছেন, ধরে খাইয়ে দিতে হয়, আবার ধরে শুইয়ে দিতে হয়, সাতেও নেই পাঁচেও নেই কারো। দুটো হাত আর দুটো পা একেবারে পড়ে গিয়েছে, অসাড়, সে আর মানুষ নামের যুগ্যি নয়, কিন্তু ছোটমা না বললে আমি তো আপনাকে চলে যেতে দিতে পারিনে।

—আজকে একবার ছোটমা'র সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতো পারে? বংশী, একটিবার শুধু।

—তা হলে অনেক রাতে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তখন।

—আমাকে তুমি ডেকে নিয়ে যাবে, আমি জেগে থাকবো, কেমন?

—সে পরে যা হয় ঠিক করবো, আপনি বসুন, আমি আসছি, পালিয়ে যাবেন না আজ্ঞে—বংশী দুম-দাম করে চলে গেল।

বিছানাটায় চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে ভূতনাথ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো অনেকক্ষণ। এ-বাড়ি থেকে তাকে চলে যেতে হবে ভাবলেই যেন কেমন কষ্ট হয়। এখানে শুধু কি তার আশ্রয়! শুধু কি আশ্রয়েরই লোভ? চারটে দেয়াল আর একটা নিরাপদ ছাদের প্রলোভন! আর খাওয়া! শুধুই কি তাই? আর কিছু নয়? সারাদিন ভূতের মতন পরিশ্রম করে এখানে এসে এই বিছানায় শুয়ে শান্তি পাওয়া যায় কেন? স্পষ্ট করে হয়তো যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না। কিন্তু যদি বৌঠানের আকর্ষণই একমাত্র কারণ হয়, তো বৌঠানই বা তার কে? কিসের সম্পর্ক! কি রকম সম্পর্ক! বৌঠানকে কতবার ভালো করবার চেষ্টা করেছে সে। বৌঠানও তাকে কতবার কতরকমভাবে যা-তা বলেছে। বেইমান বলেছে। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। বৌঠানকে সেদিন দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে কি সারা শরীরে রোমাঞ্চ অনুভব করেনি? স্বপ্ন দেখেনি বৌঠানকে? জবা অবশ্য তার নাগালের বাইরে। কোনোদিন জবাকে পাওয়ার স্বপ্নও সে দেখতে সাহস করেনি। কিন্তু বৌঠানের বেলায় কি সেকথা বর্ণে বর্ণে সত্যি! যাক, ভালোই হলো, সমস্ত প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত স্নেহ-ভালোবাসার আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে অন্য কোথাও চলে যাবে। নতুন করে আবার শুরু হবে তার দিন। নতুন করে দিনযাপন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে জবার গাওয়া গানটা মনে পড়লো। কোথাও যদি কখনও কোনো অন্যায় করে থাকি, আমায় ক্ষমা করো না, তুমি আমার বিচার করো। তুমি নিজের হাতে আমার বিচার করো। সমস্ত নিখিল সংসারে যত লোকের সঙ্গে ভূতনাথ মিশেছে, যাদের ভালোবেসেছে, যারা ভালোবাসেনি, আজ সকলে তারা চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালো। আন্না, রাধা, হরিদাসী, জবা, বৌঠান—কেউ বাদ গেল না। আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম। হয়তো তোমাদের সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না। কিন্তু আমার বিচার করো তোমরা।

আমি যদি দোষ করে থাকি আমায় ক্ষমা করো না—আমায় শাস্তি দিও—সে-শাস্তি আমি মাথা পেতে নেবো।

মনে আছে—সেবার মাঘোৎসবে জবা গেয়েছিল—

আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে,
আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ
-পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে, ...
আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।

চলে আসবার দিন জবাকে জিজ্ঞেস করেছিল ভূতনাথ—সুপবিত্রকে তো তাড়িয়ে দিলে জবা—আমাকেও কি আসতে বারণ করছো?

সমস্ত বাড়িতে যেন বৈধব্যের মতো এক অকরুণ নিঃসঙ্গতা। জবার প্রাখর্য যেন হারিয়ে গিয়েছে। সেই কর্মব্যস্ততা, সেই উন্মুখর চাঞ্চল্য নেই চলায়-বলায়। সুবিনয়বাবুর অনুপস্থিতি যেন প্রত্যেক পদপাতে প্রখর হয়ে উঠছে।

জবা এতক্ষণ একটা কথারও জবাব দেয়নি। আপন মনে বসে ছিল। এত সেলাই-এর আয়োজন, অত প্রতীক্ষা, সব যেন তার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। অতিথি ঘরে আসার আগেই নিবে-যাওয়া প্রদীপের মতো অপার শূন্যতা যেন ছেয়ে ফেলেছে জবাকে। অথচ জবার এ ব্যবহার যেমন আকস্মিক তেমনি যুক্তিহীন। এই ফাঁকা বাড়িতে কে দেখবে জবাকে? কার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাবে? কার সেবা করে দিনযাপন করবে সে? সে প্রশ্নের উত্তর যেন জবার দেবার কথা নয়।

ভূতনাথ নিজেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত। ঝিকে ডেকে বলেছে—যতদিন না কিছু ব্যবস্থা হয়, ততদিন তোমায় বাছা দিদিমণির কাছে দিনরাত থাকতে হবে।

রাজী হয়েছে ঝি। বলেছে—দিদিমণির বিয়ের সময় আমাকে নতুন কাপড় একটা দিতে হবে কিন্তু।

ভূতনাথ আরো বলেছে—সে যখন হবে, তখন হবে, এখন একটু সাবধানে থাকবে, দরজা যেন খোলা পড়ে না থাকে—দেখেছো তো বাড়িতে তো কোনো পুরুষমানুষ নেই, নিজের সংসার মনে করে থাকবে, কাজ করবে, দিদিমণির কেউ নেই জানো তো।

জবা এ ব্যবস্থায় সম্মতিও দেয়নি, প্রতিবাদও করেনি। চুপ করে বোবার মতো সমস্ত শুনেছে কেবল।

সমাজের আচার্য ধর্মদাসবাবু এসেছিলেন। বলে গেলেন—মা, যখনি তোমার কোনো প্রয়োজন হবে, আমাকে খবর দিও, আমি তোমার পিতার মতন—দ্বিধা করো না।

উপদেশ দিয়ে গেলেন—মা, তুমি তো সবই জানো, তোমাকে আর কী বোঝাবো, জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নতুনকে প্রকাশ করা—সংসারের শুরু শিশুকে নিয়ে, তারপর সেই সংসারই তাকে একদিন বৃদ্ধ করে ছেড়ে দেয়। তাই উপনিষদের মৈত্রেয়ী বলেছিলেন—যে নাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্—

রূপচাঁদবাবুও এসেছিলেন। বললেন—আমার মেয়েরা তোমারই বয়সী মা, যদি মনে করো এখানে কষ্ট হবে, আমার বাড়িতে যেতে পারো। দুটো বাড়িই তোমার রইল, এখন যা ইচ্ছে হয় তোমার।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু জবা, সুপবিত্রকে তো তাড়িয়েই দিলে—জীবনটাকে কি এমনি করেই

কাটাবে ভেবেছো?

জবা বলেছে—ভূতনাথবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একটু একলা থাকতে দিন।

ভূতনাথ জবার ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। সুবিনয়বাবুকে যখন ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে তখনও এক ফোঁটা চোখের জল পড়েনি। কথা বলেনি একটাও। কান্না দূরে থাক, নিজেকে এতখানি সংযম দিয়ে বাঁধতে পারবে একথা ভাবাও যায়নি।

সুপবিত্র তবু এসেছিল। শেষ-কৃত্যের সময় সুপবিত্র সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিল একান্তে। কিছু করেনি সে, কিন্তু কোথায় যেন একটা সঙ্কোচ একটা অপরাধবোধ ছিল মুখে চোখে। যখন একে-একে সবাই চলে গিয়েছে, সুপবিত্রও চলে যাচ্ছিলো, যেন আর তার করণীয় কিছুই নেই।

ভূতনাথের কেমন যেন দুঃখ হলো। বললে—আপনিও যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ—বলে ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে সুপবিত্র।

ভূতনাথ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ধরলো। বললে—এ সময় আপনিও যেন অবুঝ হবেন না। এখন থেকে জবাকে দেখবার লোক কেউ নেই, সেটা ভুলে যাবেন না সুপবিত্রবাবু!

সুপবিত্র একবার থমকে দাঁড়ালো। তারপর আবার চলতে লাগলো পায়ে পায়ে।

ভূতনাথ আবার বললে—অভিমান করে জবা কি বলেছে, তাই শুনে যদি আপনিও অভিমান করেন, তাহলে কেমন করে চলে বলুন তো?

তখন চারিদিকে বেশ সন্ধ্যে। একে একে গলির গ্যাসগুলোতে আলো জ্বালা হচ্ছে। সুপবিত্রর মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু বললে—এর পরেও আমাকে আসতে বলেন?

ভূতনাথ সান্ত্বনার সুরে বললে—আপনাকে আর কি এমন বলেছে! জবাকে আমি এইটুকু বেলা থেকে জানি, ওর কথায় রাগ করবেন না, ওর স্বভাবই ওইরকম, কী বলে তা নিজেও জানে না। মায়ের ভালোবাসা পায়নি, তার ওপর আট-ন' বছর পর্যন্ত পাড়াগাঁয়ে মানুষ। আমাকে কতদিন কত কী বলেছে, আমি কি না এসে পেরেছি, না রাগ করেছি।

—রাগ? সুপবিত্র যেন হাসলো। ঠিক হাসি না অভিমান, অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না।—রাগ তো করিনি, রাগ করতে যাবো কেন মিছিমিছি ভূতনাথবাবু?

অনেকখানি কথা একসঙ্গে বলে সুপবিত্র যেন হাঁপিয়ে উঠলো।

ভূতনাথ বললে—তা হলে কাল আসছেন তো?

সুপবিত্র বললে—আমার তো আসা নিষেধ।

—এই দেখুন আপনি নিশ্চয় রাগ করেছেন?

সুপবিত্র বললে—বিশ্বাস করুন ভূতনাথবাবু, আমি রাগ করিনি, সত্যি আমার আসা নিষেধ।

ভূতনাথ বললে—রাগের বশে কী বলেছে জবা, সেইটেই বড় করে দেখছেন কেন সুপবিত্রবাবু? এখনও যে অনেক কিছুর আয়োজন করতে হবে।

সুপবিত্র আবার থমকে দাঁড়ালো। যেন কিছু বলতে গেল।—কিন্তু...

—ও কিন্তু-টিন্তু নয় আর, ও-সব ওজর শুনছিনে, আপনি আসুন কাল, আমি সব বিবাদ মিটিয়ে দেবো।

সুপবিত্রর চোখ দুটো তখন যেন জ্বলছে। একটা গ্যাসের আলোর তলায় ভূতনাথ তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলে। সুপবিত্র মুখ নিচু করলে। তারপর বললে—আপনি হয়তো শোনেননি, কিন্তু জবার কাছে যে আর যাবার আমার পথও নেই।

—সে কি! সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ভূতনাথের মনে এল।

কিন্তু সুপবিত্র তখন হন-হন করে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। বজ্রাহতের মতন ভূতনাথ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতন কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল সুপবিত্রর দিকে। তারপর আবার ফিরে এল জবাদের বাড়িতে।

জবা তখনও একমনে বসে আছে উপাসনার ঘরের ভেতর। যেমনভাবে বসে ছিল বিকেল থেকে, ঠিক তেমনিভাবেই। এতটুকু নড়েনি। যে মানুষের সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটে, কাজের মধ্যে ডুবে

থাকে যে, এ-ঘর থেকে ও-ঘর করে বেড়ায়, কথায় গানে মেতে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত, তার এই রূপান্তর সত্যিই চোখে ঠেকে। দেয়ালের গায়ে সুবিনয়বাবুর ফটোটা রাজা-রাণীর ছবির নিচে ঝুলছে। সেদিকেও দৃষ্টি নেই জবার। ভূতনাথকে দেখেও যেন দেখতে পায়নি।

ভূতনাথ বললে—সারাদিন কিছু খাওনি জবা, কিছু খেলে হতো।

জবা বললে—আপনি বরং কিছু খান—বলে জবা সত্যিই উঠতে যাচ্ছিলো।

ভূতনাথ বাধা দিলে। বললে—থাক, তোমায় আর উঠতে হবে না। আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত আমি নিজেই করতে পারবো—কিন্তু একটা কথা তার আগে তোমায় আমি জিজ্ঞেস করবো জবা?

জবা মুখ তুলে ভূতনাথের চোখে চোখ রাখলো। তবু ভূতনাথের মুখ থেকে কোনো প্রশ্ন না আসাতে বললে—বলুন।

ভূতনাথ বললে—বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল তোমার ভার সুপবিত্রই নেবে—কিন্তু তাকে তো তুমি শেষ পর্যন্ত তাড়িয়েই দিলে!

জবা মুখ নিচু করে বললে—সুপবিত্র জানে কেন তাকে আমি... আর বলতে পারলে না জবা।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু সুপবিত্রকে জানালেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তোমার নিজের ভবিষ্যৎ, সুপবিত্রর ভবিষ্যৎ—কিছুই তো ভাবলে না তুমি?

জবা চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে—সুপবিত্রকে আসতে বারণ করে আমিই কি খুব সুখে আছি বলতে চান?

—তুমিও যদি সুখে না থাকো, সুপবিত্রও যদি দুঃখ পায়, তা হলে কেন এ দুর্ভোগ?

জবা বললে—তা কি আমি জানিনা ভূতনাথবাবু, জানি, সুপবিত্র বাড়ি যাবার পথে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে অনেকক্ষণ, এ ক'দিন হয়তো ঘুমোয়ইনি মোটে। শুধু কি তাই—আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেবে হয়তো চিরকাল—তবু ওকে আমি এখানে আসতে বলতে পারি না ভূতনাথবাবু—এখানে আসা ওর উচিত নয়।

—কিন্তু কেন?

জবা কাঁদতে লাগলো। সুবিনয়বাবুর মৃত্যুতে যে কঠিন পাথরের মতো শক্ত হতে পেরেছিল, তার এই শৈথিল্যে কেমন যেন অবাক লাগার কথা।

অনেকক্ষণ পরে ভূতনাথ বললে—আমারই হয়েছে মুশকিল, তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে আমিই কি চলে যেতে পারি?

জবা থেমে বললে—আপনি কিছু ভাববেন না ভূতনাথবাবু, আমি নিজের পথ বেছে নেবো।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু পথ বেছে নেওয়ার আগে পর্যন্ত যে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে।

জবা আবার মুখ তুললো। কান্নায় ভারি হয়ে গিয়েছে চোখের পাতা। বললে—ভূতনাথবাবু, আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।

—ঋণ শোধের কথা না-ই বা তুললে জবা, সংসারে কার ঋণ কে শোধ করতে পারে, এত বড় অহঙ্কার করবার ক্ষমতা কারই বা আছে সংসারে?

—না, আজ মনে হয়, কত অন্যায়ই করেছি আপনার ওপর।

—ন্যায়-অন্যায়ের কথা আজ থাক জবা, তোমাকে তো বলেছিলাম একদিন এ-আমার নেশা নয়, কর্তব্য—কর্তব্যই শুধু নয় ব্রত। তোমার কোনো উপকার করতে পারলে আমি কৃতার্থ মনে করবো নিজেকে—আমি তো প্রতিদান চাইনি কখনও।

জবা মুখ নিচু করে বললে—কিন্তু ভাগ্য যার বিরূপ, তার কাছে প্রতিদান চাওয়া যে বিড়ম্বনা ভূতনাথবাবু!

—তুমিও শেষে ভাগ্যের কথা তুললে জবা?

—ভাগ্যের বিড়ম্বনা যাকে সইতে হয়েছে সে-ই ভাগ্যের কথা তোলে।

ভূতনাথ বললে—ভেবেছিলাম দুর্ভাগ্যটা বুঝি আমারই একচেটে—কিন্তু সে-কথা থাক, নিজের পথটা তুমি তাড়াতাড়ি বেছে নিলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

জবা বললে—আমাকে আর একটু সময় দিন, আমি দু-'একদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলবো।

—সঙ্কল্পটা আমাকে জানাতে তোমার কোনো বাধা আছে?

জবা বললে—আমি হাসপাতালে কাজ করবো।

—কোথায়?

—বাবা যে হাসপাতাল করে দিয়েছেন বাগবাজারে আমাদের বাড়িতে, সেখানেই ঠিক করে ফেলেছি। শুধু একটু ভেবে দেখছি—আর ক'টা দিন সময় দিন আপনি আমাকে।

ভূতনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো তোমাকে—স্পষ্ট করে তার উত্তর দেবে তুমি?

—বলুন।

—সুপবিত্রর সঙ্গে বিয়েতে তোমার বাধাটা কোথায়?

জবা মুখ তুললো এবার। বড় অসহায়ের মতো চাইলো। তারপর আবার মুখ নিচু করে বললে—জানি না, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা, কিন্তু অনেক সময় মানুষের জীবনে যা ঘটে তাতে তার নিজের কোনো হাত থাকে না, বাবার মৃত্যুর দিনের কথা আপনার মনে আছে? আপনারা সবাই ও-ঘরে চলে গেলেন, আমি বাবার কাছে রইলাম—বলে জবা থামলো।

ভূতনাথ বললে—তারপর?

—তারপর কী ঘটলো, সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়—সে স্বপ্ন বলরামপুরের। ক'বছরই বা কাটিয়েছি সেখানে, ঠাকুর্দা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বাবার মুখ দেখবেন না, হিন্দু হয়ে বাবার ব্রাহ্ম হওয়া তিনি ক্ষমা করেননি—মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত ক্ষমা করেনও নি—কিন্তু তখন আমার নাকি মাত্র দু'মাস বয়েস... সেই সময়ে...

ঝি হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। বললে—একজন বাবু এসেছেন দিদিমণি।

ভূতনাথ বললে—কে বাবু?

—তা জানিনে।

ভূতনাথ নিচে গিয়ে দেখলে—ধর্মদাসবাবু। ভূতনাথ বললে—আসুন—ওপরে আসুন।

ধর্মদাসবাবু জিজ্ঞেস করেন—আমার জবা-মা কেমন আছে বাবা?

ধর্মদাসবাবু একবার করে রোজই আসেন। সুবিনয়বাবুর পুরনো বন্ধু। যখন আসেন অনেক উপদেশ দিয়ে যান। ধর্মদাসবাবু বলেন—পিতা-মাতা সকলের চিরদিন থাকে না মা—কিন্তু পরম-আত্মীয়ের মৃত্যুতেই আমরা যথার্থ উপলব্ধি করি যে, যাকেই পিতা বলে ডাকি না কেন, তিনিই আমাদের একমাত্র পিতা—তাই উপনিষদে আছে 'পিতা নোহসি'—পিতার মধ্যে পিতারূপে যে সত্য সেও সেই তিনি—সেই নিরাকার পরম পিতা। মাতার মধ্যে মাতারূপে যে সত্য সেও সেই তিনি, সেই পরম পিতা। ধর্মদাসবাবু আরো বলেন—সেই পরম পিতাকে উপলব্ধি করো মা।—সেই পরম সত্যকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করো—সেই পরম শুচিকে আপন চিত্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করো।

জবা জিজ্ঞেস করে—আমাকে আপনি একটা কথা বুঝিয়ে দিন—যা আমার ভালো লাগে তা সঞ্চয় আর ভোগ করার মধ্যে কোনো কিছু অন্যায় আছে কি?

ধর্মদাসবাবু বলেন—খারাপ তো কিছুই নেই মা, যে জিনিস আমাদের স্পর্শ-দৃষ্টি-শ্রুতি-বোধকে তৃপ্ত করে, তাদের মধ্যে তো নিন্দে করবার কিচ্ছু নেই মা, খারাপটা রয়েছে আমাদেরই মধ্যে যে—যখন আমি সব ত্যাগ করে আমাকেই ভরণ করি, তখনই সেটা অশুচিকর হয়ে ওঠে মা—এই স্বার্থপরতার দিকটাই অসত্য, তাই সেটা অপবিত্র। অন্নকে যদি গায়ে মাখি, তবে সেটা অপবিত্র, কিন্তু যদি খাই, তাতে অশুচিতা নেই, কারণ গায়ে মাখাটা যে অন্নের সত্য ব্যবহার নয়।

জবা আবার জিজ্ঞেস করে—আর-একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি—অতীতটা সত্য, না বর্তমান সত্য আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?

ধর্মদাসবাবু বললেন—এ কথার উত্তর তো কঠিন মা, যখন তুমি শোক থেকে শোকের ঊর্ধ্বে উঠবে, তখন বুঝতে পারবে—সত্য চিরকালের—সত্যের তো অতীত বর্তমান নেই মা।

জবা বলে—কিন্তু যে-সত্য ঘটে গিয়েছে আমার অজ্ঞাতে, আমার জ্ঞানের অগোচরে, ধরুন আমার যখন বয়েস দু'মাস—সে সত্যকেও কি পরম সত্য বলে মানতে হবে?

ধর্মদাসবাবু বললেন—ওই একই কথা হলো মা, যতদিন আগেই ঘটুক, আর যে বয়সেই ঘটুক, আমার দিকটা যখন একান্ত হয় তখনই সে অসত্য হয়—এইজন্যেই সে অপবিত্র হয়ে ওঠে। কেন না, কেবলমাত্র আমার মধ্যে তো আমি সত্য নই। সেইজন্যে যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে দিই, তখনই আত্মা অসত্য হয়ে ওঠে, সে শুচিতা হারায়। খানিক থেমে নিয়ে ধর্মদাসবাবু আবার বললেন—আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো—তার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়ে সত্য হয়, তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা—তার সেই স্বামী সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন—'এষাস্য পরমাগতিঃ, এযাস্য পরমা-সম্পৎ, এযোহস্য পরমো লোকঃ, এযোহস্য পরমো আনন্দঃ'—ইনিই তার পরম গতি, ইনিই তার পরম সম্পদ, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আনন্দ।

ধর্মদাসবাবু চলে যাবার পরই হঠাৎ জবা উঠলো। উঠে কোনো কথা না বলে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

ভূতনাথ একবার শুধু বললে—কিছু খাবে না জবা?

সে-কথার উত্তরও দিলে না জবা। কিন্তু যেটুকু দেখা গেল, তাতে মনে হলো শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তখন জবার মুখে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বিছানায় গিয়ে যেন এখনি সে উপুড় হয়ে কাঁদতে শুরু করবে।

চোরকুঠুরির ভেতর শুয়েশুয়ে এই কথাগুলোই ভাবছিল ভূতনাথ। রাত্রের নির্জনতা নেমে এসেছে বড়বাড়িতে। কিন্তু আগের চেয়েও যেন চারিদিক আরো নিস্তব্ধ। দক্ষিণের বাগানের দিক থেকে সেই শব্দগুলো আর আসে না। দাসু জমাদারের ছেলের বাঁশিতে—'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে'র সুর আজ আর শোনা গেল না। সেই অদৃশ্য পাখীটা আর ডেকে উঠলো না বাগানের আমলকী গাছটার ডাল থেকে। রাত অনেক হলো আস্তে আস্তে। কিন্তু বংশী তো এখনও এল না!

বংশী বলে গিয়েছিল—খুব সাবধানে থাকবেন শালাবাবু, মেজবাবু খুব রেগে গিয়েছে সব শুনে—বলেছে, বাড়ির বউ-এর সঙ্গে বাইরের পুরুষ দেখা করে, এ কেমন কথা!

ভূতনাথ বলেছিল—তবে আমার আর এখানে থাকা কেন বংশী—কালই চলে যাই এখান থেকে।

বংশী বলেছিল—ছোটমা যদ্দিন আছে, তদ্দিন থাকুন শালাবাবু, এখন তো হাঁড়ি আলাদা... তারপর আমিও আর থাকছি না আজ্ঞে—কার জন্যেই বা থাকা।

সত্যিই তো! ভেবে দেখতে গেলে বড়বাড়ির ঐশ্বর্যের আকর্ষণ আর ভূতনাথের নেই। সে ছিল প্রথম-প্রথম। বড়বাড়িতে গাড়ি, ঘোড়া, চাকর-বাকর, বিয়ে, পূজো—সমস্তর সঙ্গে ভূতনাথ একদিন একাত্ম করে দিয়েছিল নিজেকে। সকলের সঙ্গে তারও জামা-জুতো-কাপড় আসতো। আর সকলের সঙ্গে ভূতনাথও নিজেকে এ-বাড়ির একজন বলে ভাবতো।

বংশী বলেছিল—এবার বোধ হয় পূজোও বন্ধ হবে—ভাগের পূজো, কে ভার নেবে বলুন তো?

তা সত্যিই তাই হলো। এতদিনকার পূজো, এত স্মৃতি জড়ানো! এতগুলো মানুষের কল্যাণকে জলাঞ্জলি দিয়ে পূর্বপুরুষের পূজো বন্ধ রইল—এ যেমন অভাবনীয় তেমনি মর্মান্তিক! কলকাতার সমাজে বদনাম হয়েছে এবার চৌধুরীবাবুদের। নটে দত্ত ছোটবাবুর চুনীদাসীকে নিয়ে আছে। গাড়ি নাকি কিনে দিয়েছে তাকে। বড়বাড়ির এত বড় পরাজয়কে চোখের সামনে দেখেও সম্বিত ফিরলো না কারো! আর ননীলাল! সেই ননীলালের কাছেই এখন এত বড় বাড়ি, অবশিষ্ট যা-কিছু সব দাসখত লিখে দিতেও বাধলো না চৌধুরীবাবুদের আত্মমর্যাদায়। মাসে মাসে সুদ নিতে আসে ননীলালের বাড়ির লোক। এ কেমন করে রক্ষা পাবে! অনিবার্য ধ্বংস কেমন করে নিবারণ করবে এরা!

মাঝ রাত্রে দরজায় টোকা পড়লো।—শালাবাবু!

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিয়েছে ভূতনাথ। বললে—এসেছো বংশী? আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি।

—চলুন, কিন্তু মেজবাবু আজকে মেজমা'র ঘরে শুয়েছে।

—বৌঠানকে খবর দিয়ে রেখেছো তো তুমি?

—দিয়েছি, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে যাবেন হুজুর,- দেয়াল উঠে গিয়েছে বারান্দার মধ্যে, কিন্তু গলার শব্দ ও-পাশ থেকেও শোনা যায় কিনা।

টিপি-টিপি পায়ে আবার বৌঠানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ভূতনাথ। বৌঠান বোধ হয় ঘুমোচ্ছিলো। ভূতনাথের খবর পেয়ে উঠে বসেছে। কিন্তু তখনও জড়ানো চোখ। ভূতনাথকে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—কোথায় ছিলি এতদিন ভূতনাথ?

ভূতনাথ বললে—রাগ করো না বৌঠান, আমি ছিলাম না এখানে, আজ এসেছি—রাত্তির ছাড়া তো তোমার কাছে আসা যায় না।

বৌঠান বললে—যেখানে ছিলি সেইখানেই থাকলে পারতিস, আর আসা কেন—কী দেখতে এসেছিস?

ভূতনাথ ভালো করে চেয়ে দেখলে। বৌঠানের গায়ের গয়নাগুলো যেন কম-কম। নাকের নাকছাবিটা কোথায় গেল? হীরের সে কান-ফুলটা নেই। অন্য একটা সোনার দুল রয়েছে সেখানে।

ভূতনাথ বললে—তুমি সেই বরানগরে যাবে বলেছিলে সেদিন, তার জন্যে এসেছি বলতে—যাবে বৌঠান একদিন?

—আমাকে সত্যিই নিয়ে যাবি ভূতনাথ? বৌঠান যেন এক নিমেষে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে—ছোটকর্তার কী দশা হয়েছে ভূতনাথ—চোখে দেখা যায় না মানুষটাকে, দিন দিন আরো রোগ বাড়ছে। আর সারবে না বোধ হয়—শশী ডাক্তার দেখছে, টাকাও নিয়ে যাচ্ছে মুঠো-মুঠো—আমি শুধু বলবো গিয়ে—ছোটকর্তা যেন ভালো হয়ে ওঠে—আর আমার কোন মানত নেই।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—তুমি মদ খাওয়া ছেড়েছো বৌঠান?

—ছাড়তে পারলুম কই রে ভূতনাথ, লুকিয়ে-লুকিয়ে এখনও আনাই, বংশী আজকাল আর কথা শোনে না আমার—কেউ কথা শোনে না—তবু না খেয়েও পারি না—অথচ ছোটকর্তা কেমন করে না খেয়ে থাকে কে জানে—বৌঠান তাকিয়ায় হেলান দিলে এবার।

ভূতনাথ বললে—আমিও তোমার জন্যে মানত করবো বৌঠান, তুমি যেন ভালো হয়ে যাও—তোমার সঙ্গে আমারও পাঁচ পণ পান-সুপুরী যোগাড় করে রেখে দিও।

—তা হলে কবে যাবি? বৌঠান জিজ্ঞেস করলো।

ভূতনাথ উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ বাইরে যেন কিসের গোলমাল শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মতন বংশী ঘরে ঢুকেছে—শালাবাবু, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—চলে আসুন।

—কী হয়েছে রে বংশী?

বৌঠানের কথার জবাব দিলে না বংশী। শুধু বললে—তুমি বেরিও না ছোটমা—আমি আসছি।

বাইরে এসে বংশী বললে—আপনি চোরকুঠুরিতে ঢুকে পড়ুন। আজ্ঞে—ওদিকে বৈঠকখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

আগুন? ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—কে?

বংশী বললে—আপনি ঘর থেকে বেরোবেন না আজ্ঞে। সবাই জড়ো হয়েছে উঠোনে, মেজবাবুকে ডাকতে গিয়েছে বেণী।

—কে আগুন দিলে বংশী?

বংশী চলতে চলতে বললে—বদরিকাবাবু।

—বদরিকাবাবু! কেন?

ভূতনাথের যেন বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। বদরিকাবাবু এত জিনিস থাকতে শেষে কিনা আগুন জ্বালালে?

বংশী বললে—এদানি ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা।

—মাথা খারাপ হল আবার কবে?

—আজ্ঞে মেজবাবু সেদিন বকেছিল যে ওকে খুব, বাড়িতে পনেরোটা ঘড়ি, একটাও ঠিক সময় দেয় না—দিনরাত কেবল চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকে। তাই মেজবাবু তাড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। বিধু সরকারমশাই বলেছিল—আর দরকার নেই লোকের—ঘড়ির দম নিজেরাই দিয়ে নেবো। একটা লোকের খেতে কি কম খরচ!

বংশী চলে যেতেই চোরকুঠুরি থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে একান্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ দেখতে লাগলো। অন্ধকার উঠোনের সামনে আলোর লাল আভা ফুটে উঠেছে। সবাই জড়ো হয়ে ঘড়া ঘড়া জল ঢালছে বৈঠকখানার দিকে। এ কেমন প্রতিশোধ নেওয়া! বংশী সকলের সঙ্গে ঘড়ায় করে জল নিয়ে ঢালছে। জলে জলে ভেসে গেল উঠোনটা। ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। একটা চিমসে পোড়া গন্ধ সমস্ত বাতাসকে যেন কলুষিত করে দিয়েছে। নাকে কাপড় দিলে ভূতনাথ।

ততক্ষণে দেখা গেল যেন সবাই বৈঠকখানা ঘর থেকে কাকে টেনে বার করছে। অন্ধকারে লোকজনকে ছায়ামূর্তির মতো মনে হয়। স্পষ্ট চেনা যায় না। আকাশটা ঘোলাটে। কোথাও চাঁদের চিহ্নমাত্র নেই। ভয়ার্ত রাত যেন হঠাৎ আরো ভয়াল হয়ে উঠলো।

বংশী আবার এল। বললে—আপনি ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকুন আজ্ঞে। ওখানে মেজবাবু এসেছে—আপনাকে দেখতে পাবে।

ভূতনাথ বললে—কাকে ঘর থেকে টেনে বার করলে বংশী?

—আজ্ঞে, বদরিকাবাবুকে, পুড়ে একেবারে বেগুনপোড়া হয়ে গিয়েছে শালাবাবু—এখনও একটু-একটু জ্ঞান আছে, চিঁ-চিঁ করছে।

—কী করে হলো?

বংশী বললে—বাড়িতে আর একটাও ঘড়ি নেই হুজুর, পনেরোটা বড়-বড় ঘড়ি, সব জড়ো করেছে বৈঠকখানায়, তার ওপর নিজের জামা-কাপড় চাপিয়ে, তার ভেতরে নিজে ঢুকে আগুন দিয়ে দিয়েছিল। কী সহ্যি ক্ষেমতা বলুন—কখন যে সব বসে-বসে তোড়জোড় করেছে, কেউ টের পায়নি আজ্ঞে—বলেই বংশী আবার দৌড়ে ওদিকে চলে গেল।

এতক্ষণে দমকল এল বুঝি। ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে ঢুকে পড়লো বড়বাড়ির ভেতর। তার সঙ্গে পাড়ার লোকের চিৎকারে ছায়াচ্ছন্ন বাত কলমুখর হয়ে উঠলো। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। আশে-পাশের বাড়ির ছাদে লোকজন জড় হয়েছে। আগুনের শিখা নিবে যাবার পরেও ধোঁয়ায় আর চোখ মেলা যায় না। চোখ জ্বালা করতে লাগলো ভূতনাথের। দমকল এসে শাঁ-শাঁ করে জল ছিটিয়ে সমস্ত বাড়িটা ভিজিয়ে একেবারে একসা করে দিলে। সমস্ত ঠাণ্ডা হলো যেন এতক্ষণে। ভূতনাথ চোরকুঠুরির ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে আবার, দরকার কী! মেজবাবু হয়তো দেখে ফেলবে তাকে। কাল অনেক কাজ—ভোর রাত্রে উঠেই জবাদের বাড়িতে যেতে হবে। তারপর বিকেলবেলা বৌঠানকে নিয়ে আবার বেরোতে হবে বরানগরে। আজ আর রাত বুঝি বেশি নেই। একটু চোখ বোজবার চেষ্টা করলে ভূতনাথ।

কিন্তু তবু অন্ধকারের মধ্যেই যেন বদরিকাবাবুর চেহারাটা ভেসে ওঠে বিনিদ্র চোখের সামনে। কিন্তু ঘড়িগুলোর ওপর অত রাগ কেন বদরিকাবাবুর? যে লোক প্রতিদিন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ঘড়ি মিলিয়ে রাখতো, সময়ের পদধ্বনি শোনবার আশায় সঙ্গে ট্যাকঘড়ি রাখতো দিনরাত, তার এ কী কাণ্ড! তবে কি বদরিকাবাবু সময়ের গলা টিপে মারতে চেয়েছিল? কিম্বা সময় বুঝি বদরিকাবাবুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শেষ পর্যন্ত। কে জানে!

এ এক আশ্চর্য রাত। ঘুমও ঠিক নয় আবার জাগরণও নয়। ঘুম আর জাগরণের মধ্যেই মনে হলো যেন বদরিকাবাবুর আত্মা বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। যেন বদরিকাবাবু ঘুরে-ঘুরে আজ প্রত্যেক ঘরে দেখতে এসেছে নিজে। সব ঘড়িগুলো পুড়েছে তো শেষ পর্যন্ত! পনেরোটা ঘড়ি। ওয়াল ক্লক! এতকাল সঠিক সময় দিয়ে এসেছে কালের সঙ্গে দুলে-দুলে। ভূমিপতি চৌধুরীর আমল থেকে প্রত্যেক পদে-পদে তারা কেল্লার তোপের সঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়েছে। বার্তা শুনিয়েছে জয় ঘোষণার। কাহিনী শুনিয়েছে বিজয়-গৌরবের। তাই আজ যেন বদরিকাবাবু হঠাৎ ধমক দিয়ে বললেন—থাম, থাম মিথ্যেবাদীর দল।

বংশী বলেছে—মেজবাবু খুব বকুনি দিয়েছিল যে আজ্ঞে।

—কেন?

—দেখতে পায় তো সবাই, কোনো কাজ করে না, চুপচাপ শুধু শুয়ে থাকে চিৎপাত হয়ে। মেজবাবু শুধু বলেছিল—ঘড়িগুলোতে ধুলো জমেছে, কালি জমেছে, দেখতে পাও না?

বদরিকাবাবু বলেছিল—ও ধুলো নয় স্যার পাপ, পাপ জমেছে সব।

—পাপ? কিসের পাপ? মেজবাবু হেঁয়ালি বুঝতে পারেনি।

বদরিকাবাবু বলেছিল—সব রকমের পাপ স্যার, অত্যাচার, অন্যায়, অপব্যয়ের পাপ, কুঁড়েমির পাপ—পাপের কি আর শেষ আছে এ-বাড়িতে?

মেজবাবু তবু বুঝতে পারেনি। বিধু সরকারকে গিয়ে বলেছিল—ঘড়িবাবু কি পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি বিধু?

বিধু সরকারের তো রাগ ছিলই বহুদিনের। সেই যেদিন মোটর এসেছিল বাড়িতে—ইব্রাহিমের ছেলেটা থুতু দিয়েছিল মুখে। সব মনে ছিল তার। বললে—ও তো বরাবরই পাগল মেজবাবু, আপনি তো দেখেন না কোনো দিকে, কেবল খাবার কুমীর, রোজ চার সের চালের ভাত খায় একলা, অথচ কী-ই বা কাজ, আমি নিজেই দম দিতে পারি ঘড়িতে, ও আবার একটা কাজ নাকি?

মেজবাবু বলেছিল—তা হলে দাও ওকে তাড়িয়ে।

তা সেই তাড়িয়ে দেবার কথা শুনেই এই কাণ্ড! কখন যে সব ঘড়িগুলো দেয়াল থেকে নামিয়েছে, কখন জড়ো করেছে ঘরে, কখন আগুন জ্বালিয়েছে কেউ টের পায়নি। আর তা ছাড়া কে-ই বা ও-ঘরের দিকে যায়!

ভূতনাথের মনে হলো—সময় যেন সব একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বদবিকাবাবু চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বড়বাড়িতে যেন আর চলছে না কিছু। অচল হয়ে গিয়েছে সব। যেন কালের চাকা ভেঙ্গে গিয়েছে। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে যদিই বা একটু চলেছে তা-ও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার জন্যেই। দম আটকে আসছে সংসারের। তিনটে সংসারের তিন-চারে বারোটা দেয়ালের মধ্যে বড়বাড়ির আত্মা যেন অসাড় মুমূর্ষু। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ব্রিজ সিং আজও দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় বটে। মেজবাবুর গাড়ি ক্বচিৎ-কদাচিৎ যখন বেরোয় তখন চিৎকার করে—হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার হো—। কিন্তু গলাটা যেন ভাঙা-ভাঙা। গাড়ি বেরিয়ে গেলেই সামনে ফেরিওয়ালাকে ডেকে বসে-বসে গল্প জোড়ে। খইনি খায়। আগের মতন তেমন খাতির করে না কেউ আর। আবার সব দিন পাগড়ি পরতেও মনে থাকে না। গেট-এর গা দিয়ে একটা অশ্বত্থ গাছের চারা গজিয়েছিল বহুদিন আগে, সেটা এখন ডাল পালায় ছেয়ে ফেলেছে মাথাটা। তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে ব্রিজ সিং বলে—এ ভুখন ভাই, কা খবর মুলুক কা—

ভুখন আসে। দু'দণ্ড গল্প করে। খইনি দেয়। আবার চলেও যায় নিজের কাজে।

উঠোনের মাঝখান দিয়ে যে-পাঁচিলটা উঠেছিল, তার মাথাতে শ্যাওলা জমেছে। শীতকালের দুপুরবেলা একদল কাক এসে বসে তার ওপর। এঁটো ভাত-তরকারি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কাড়াকাড়িতে সে-ভাত-তরকারি উঠোনময় ছড়াছড়ি। দাসু জমাদার আগে দু'বার করে ঝাঁট দিতো

উঠোন। এখন সেই এঁটো তিন দিন ধরে শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে যায়। শুধু হাঁটা-পথটা মানুষের পায়ে পায়ে পরিষ্কার থাকে। সৌদামিনী বাঁ হাতে ঘোমটা টানতে টানতে বাইরের উঠোনের দরজায় আসে। তারপর উঁকি মেরে এদিক-ওদিক দেখে ভাতের এঁটো মাছের কাঁটাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাঁচিল ডিঙিয়ে।

যদি হঠাৎ সদুর-মা দেখতে পায়, বলে—তোর আক্কেলখানা কী লা—মাছের আঁশ যে বাড়িময় করলি—এখন কি নোংরা ছুঁয়ে চান করবো এই বারবেলায়?

বিধু সরকার আসে একবার সকালবেলা। ক্যাশ-বাক্সয় ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে লেখাপড়া করে কিছুক্ষণ। দু'একজন যদি আসে তো বলে—আজ হবে না হে, আজ বিষ্যুৎবার, বিষ্যুৎবারের বারবেলা। কলিকাল বলে কি ধম্মকম্মও উল্টে গেল নাকি সব?

তারপর দুপুরবেলা খাজাঞ্চিখানায় তালাচাবি লাগিয়ে বেরিয়ে যায় আদালতে। মামলা-মকর্দমার তদ্বির-তদারক করতে হয়। অনেকগুলো মামলা একসঙ্গে থাকে। নথিপত্র নিয়ে সারাদিন ঘুরে বড়বাড়িতে যখন এসে পৌঁছোয় তখন সন্ধ্যে। তখন মেজবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ হয়।

বিধু সরকার বলে—আজ আবার দিন পড়লো হুজুর।

মেজবাবুর তখনও তামাক ভালো করে ধরেনি। বেণী কলকেতে ফুঁ দিচ্ছিলো পাশে বসে। বলে—নটে দত্ত কী বললে বিধু?

বিধু সরকার বলে—বড়বাবুর অংশটা পেলে তবে মামলা তুলে নেবে বলেছে।

মেজবাবু বলে—তুমি একবার ননীবাবুর পটলডাঙার বাড়িতে যাও তো বিধু।

—আজ্ঞে, ননীবাবু তো বিলেতে।

—তা হোক, তার সম্বন্ধীরা আছে, শাশুড়ি আছে—সবাই আছে। বলে এসো, এ-মাসের বাকিটা একসঙ্গে ও মাসেই দিয়ে দেবো—নইলে কবে আবার মামলা করে বসবে।

বিধু সরকার ধুলো-পায়ে আবার বেরিয়ে পড়ে। মেজবাবু বসে বসে তামাক টানতে টানতে একবার বেণীকে ডাকে। বেণী তখন সংসারের অন্য কাজ করছে। রান্নাবাড়ির উঠোন ঝাঁট দেয় আর বলে—কালই আমি দেশে চলে যাবো গিরি।

গিরি মেজমা'র জন্যে পান সাজতে এসেছিল। বলে... যাস, যাস—ভয় দেখাচ্ছিস কাকে শুনি—ওই তো ওদের বংশী এক বচ্ছর মাইনে পায়নি—কাজ করছে না? কাজ করতে ভয় করি নাকি আমি? যা না তুই চলে, তা বলে গেরস্তবাড়ির কাজ বন্ধ থাকবে ভেবেছিস?

তা কাজ কি আর বন্ধ থাকে? কোথা থেকে সব জিনিসপত্তর আসে কে জানে! মেজবাবুর জন্যে সময় মতো তামাকও আসে। মদও আসে। আর আসে হাসিনী, বড়মাঠাকরুণ, মেজমাঠাকরুণ। নাচঘরে বসে সবাই আজকাল। মাঝে মাঝে ঘুঙুরের শব্দও শোনা যায় ভেতর থেকে। গানের শব্দ ভেসে আসে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক দিয়ে আসে বেণী। কোনো দিন রাত বারোটা বাজে। কোনোও দিন বা একটা।

আবার আর একদিন মুন্নালাল এল। পায়ে নাগ্‌রা, মাথায় মুরেঠা। বললে—কোথায়, সরকার সাহেব কোথায়?

বিধু সরকারের তালাচাবি লাগানো খাজাঞ্চিখানা। মুন্নালালও যে অবাক হয়ে গিয়েছে সব দেখে-শুনে। এই উঠোনেই কতবার এসে দাঁড়িয়েছে সে। কতবার বিধু সরকারের ঘরে গিয়ে বসেছে। কিন্তু এ যেন অন্য চেহারা। উঠোনের মধ্যে এবার একটা পাঁচিলের ব্যবধান দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো তার।

বেণী যাচ্ছিলো। বললে—কী সাহেব, কী খবর? নান্নেবাঈ এসেছে নাকি?

—বাবুসাহেব কোথায়?

মেজবাবুকে খবর দিলে বেণী। মেজবাবু বললে—নিয়ে আয় তাঁকে এখানে।

নাচঘরে ঢুকে আভূমি নিচু হয়ে মুন্নালাল সেলাম করে বললে—হুজৌর খোদাবন্দ—

—কী রে মুন্নালাল, বেটা এসেছিস—নান্নেবাঈ কোথায়?

—একদিন গান-বাজনা হবে না হুজুর?

—জরুর হবে, আলবাৎ হবে—কে বললে—হবে না, কোন্ আহাম্মক বলেছে? মেজবাবুর মেজাজ রঙিন ছিল তখন।

মুন্নালালের কথায় যেন নবাবী মেজাজে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললে—লে আও নান্নেবাঈকো—

—যো হুকুম খোদাবন্দ্—

তা এল নান্নেবাঈ। বড়বাড়ি যেন বহুদিন পরে আবার হেসে উঠলো। আবার ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলে উঠলো নাচঘরে। আবার মোহর পড়লো রুপোর থালায়। সারেঙ্গীওয়ালা মাথা হেলিয়ে বাজায় আর নান্নেবাঈ-এর ঘাগরা ওড়ে। আতরদান থেকে আতরের ফোয়ারা ছোটে। ভৈরববাবু আজ নেই, তারকবাবু, মতিবাবু কেউ-ই নেই, তবু তাতে মেজবাবুর কিছু আসে যায় না। মেজবাবু একাই একশ'। পায়ের পাম্‌শু কোথায় খুলে পড়ে গেল তার। পরনের কাপড় গেল খসে। অনেকদিন পর আবার জমে উঠেছে নাচঘর। রূপের আর রুপোর বাহার খুলেছে বহুদিন বাদে।

মেজবাবু চিৎকার করে উঠলো—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

নান্নেবাঈ তখন মেজবাবুর চোখে চোখ রেখে গাইছে—

'নয়না না মেরে রাজা
ঘুঙ্‌ঘুট ঘটপট খোলে—'

হঠাৎ যেন সারেঙ্গীর তার ছিঁড়ে গেল।

মেজবাবু হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে তাকিয়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে। নান্নেবাঈ ভয় পেয়ে গান থামিয়ে দিয়েছে। সারেঙ্গীওয়ালা থামিয়ে দিয়েছে হাতের ছড়ি।

বেণী কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলো—বাবু, মেজবাবু ও মেজবাবু—

ভূতনাথের এ-সব শোনা ঘটনা। রোজ ভোরবেলা বেরিয়ে যায় ভূতনাথ। আর আসে সেই রাত্রে। মেজবাবুর দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলতে হয়। শুধু কি মেজবাবু! বিধু সরকারই কি কম! দু'জনেই যেন যমের মতন খর-দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে। একটা-কিছু ব্যবস্থা হয়ে গেলে বড়বাড়ি ছেড়ে দেবে ভূতনাথ। কিন্তু মনে হয়—এই সময় বৌঠানকে ছেড়ে চলে যাওয়াই কি উচিত হবে!

ছোটকর্তার তরফে এক-একদিন রান্না হতে দেরি হয়ে যায়। সেজখুড়ি সকালে উনুনে আগুন দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। বাজার তখনও আসেনি। ছোটকর্তার বিছানা সাফ করে তাকে ওষুধ খাইয়ে তার মুখ ধুইয়ে ছুটি পেতে বেলা হয়ে যায় বংশীর। তখন বাজারে যায়।

এক-একদিন টাকার বদলে সোনার দুল নিয়েই বাজার করতে যেতে হয়। দুল ভাঙিয়ে বাজারও আসে, ছোটমা'র একটা বোতলও আসে। ওটা বৌঠানের চাই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে না পেলে কেমন যেন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ছোটমা'র। হাই ওঠে। ঘুম ভেঙে যেন গা ম্যাজ-ম্যাজ করে।

ছোটমা বলে—এত দেরি কেন রে তোর বংশী?

বংশী বলে—শুনুন, কথা শুনুন, একা মানুষ কত দিকে দেখি বলুন তো—হাত তো দুটো।

ছোটমা বলে—আগে বোতলটা এনে দিয়ে তারপর বাজারে গেলে পারতিস।

এদিকে সেজখুড়ি ওদিকে রাঙাঠাকমা। রাঙাঠাকমা এতদিন ভাঁড়ারের কাজ করে এসেছে। বুড়ো বয়েসে রান্নার কাজ করতে অসুবিধে হয় বৈকি! ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে একদিন হাতে পায়ে গরম ফ্যান পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোস্কা উঠলো। কিন্তু তাই নিয়েই কাজ করতে হয়। বলে—কাজের কথা আর বলো না মা, কাজ কি একটা? লোকই কমছে, কাজ তো আর তা বলে কমছে না—আমি যে কবে ছাড়া পাবো এই জেলখানা থেকে ভগবান জানে!

সৌদামিনী বলে—মুখে আগুন ভগবানের, ঝাঁটা মারি অমন ভগবানকে। ভোলার বাপ বলতো, ফুলবউ, চোখ থাকতে থাকতে তিভুবন চিনে নাও—তা সেই ভোলার বাপ থাকলে আজ আর

আমার ভাবনা—ভগবানের কি আক্কেলগম্যি আছে মা, নইলে আমি পিদিম দিচ্ছি কার-না-কার ভিটেয়, আর আমার সোয়ামীর ভিটে আজ অন্ধকার ঘুরঘুট্টি।

সদুরমা পাঁচিলের ও-পাশ থেকে বলে—হ্যাঁ লা সদু, গেরণ কখন লাগছে লা?

সৌদামিনী সলতে পাকাতে পাকাতে বলে—তুই তো বাঁজা বিধবা, গেরণের খোঁজ তোর ক্যান লা! যখন একত্তোর ছিল বউমনিরা, তখন তোর হাতের জল তো খেতো না কেউ—এখন তুইও সতী হলি—কালে-কালে কতই দেখবো মা!

রাঙাঠাকমা ওদিক থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে—আজ কি রাঁধলি সেজখুড়ি?

সেজখুড়ি বলে—দুটো তো মানুষ ভারি, তার আবার রান্না, তাও ছোটবাবু তো ভাত মুখে দেয় নাম মাত্তোর—আর ছোটমা'র পালা-পাব্বণ তো লেগেই আছে সারা বছর।

বেশি-বেশি রান্নার হাত, অল্প রান্নায় মন বসে না সেজখুড়ি'র। বেশি নুন উঠে আসে হাতে! বেশি মশলা, বেশি চিনি, বেশি বাটনা।

ছোটবাবুকে খাইয়ে দিতে হয়। তবু মুখের স্বাদ আছে। বলে—থুঃ—থুঃ—। মুখে যেন লাগে না আর আগেকার মতো। ছোটবাবু যখন খেতে বসতো আগে, চারপাশে সার সার বাটি পড়তো গোল হয়ে। খেতো যে খুব তা নয়। সব জিনিস একটু করে চেখে দেখতো বটে! তারিফ করতো রান্নার। রসিক মানুষ, কদর বুঝতো। কিন্তু আজকাল কিছুই ভালো লাগে না।

সেজখুড়ি বলে—এ কী রে বংশী—নুনে পুড়ে গিয়েছে যে?

এই-সব দেখে শুনে হাবুল দত্ত মেয়েকে বলে—এখানে থাকলে তোর শরীর খারাপ হয়ে যাবে মা, পাথুরেঘাটাতেই চল সবাই মিলে।

মেয়ে বললে—আমার শাশুড়ীর কি হবে, তার যে ছুঁচিবাই।

ছুটুকবাবু সেবারও ফেল করেছে পরীক্ষায়! বার বার পরীক্ষা দিয়ে আর ফেল করে ছুটুকবাবু যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে। আগেকার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই যেন বিচ্ছিন্ন। কোলিয়ারিতে লোকসান হওয়াতে যেন ঘা খেয়েছে আরো বেশি। তারই আগ্রহ ছিল সব চেয়ে বেশি। কাকাদের সে-ই বলে কয়ে নামিয়েছিল। এখন যেন লজ্জা করে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা, কথা বলতে লজ্জা। কোথাও যে আশা নেই। চারিদিকেই শুধু দুঃসংবাদ। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করাও ছেড়ে দিয়েছে। পুরনো বন্ধু-মোসাহেবরা প্রথম-প্রথম চেষ্টা করেছিল। সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসে দাঁড়াতো উঠোনে। বলে পাঠাতো—খবর দাও তো—বিশ্বম্ভর এসেছে।

ওপর থেকে খবর পাঠাতো ছুটুকবাবু—এখন নামবো না আমি—বল গে যা ওদের।

এমনি করেই চলছিল। কিন্তু নান্নেবাঈ-এর নাচগানের দিন যেদিন পেটে হঠাৎ একটা ব্যথা উঠলো মেজবাবুর, সেদিন রাজী হয়ে গেল ছুটুকবাবু।

পরদিন সকালবেলাই চার-পাঁচখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো বড়বাড়ির উঠোনে। মাল-পত্তোর উঠলো গাড়িতে। ছুটুকবাবু উঠলো। ছুটুকবাবুর বউ উঠলো। আর উঠলো বড়মা। সিন্ধুর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বড়মা উঠলো গিয়ে গাড়িতে। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতেও বললে—গাড়ি যেন রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে যায়, বলে দিস ছুটুক—নইলে অপথ-কুপথ দিয়ে যাবে ওরা, অবেলায় চান করে মরতে হবে।

বেনারসীর থানের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বিদায় নিলেন এ-বাড়ির গৃহলক্ষ্মী। এ-বাড়ির বড়বউ। পাড়ার লোকজন, বউ-ঝি সবাই জানলার খড়খড়ি তুলে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। মেজবাবু নাচঘরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে ছিল।

বেণী গিয়ে বললে—বড়মা চলে যাচ্ছেন আজকে।

তামাক খেতে লাগলো একমনে মেজবাবু। যেন শুনতেই পায়নি কথাটা। বেণী আর-একবার বলতে যাচ্ছিলো কথাটা।

মেজবাবু চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলো—চোপরাও হারামজাদা—

এ-সব ঘটনা বংশীর কাছে শোনা। এরকম যে হবে তা যেন ভূতনাথের জানা ছিল। কিছুই যেন

অবিশ্বাস্য নয়। অপ্রত্যাশিত নয়। ভূতনাথ যেন প্রতীক্ষার আশঙ্কায় জর্জরিত হয়ে গিয়েছে। ওই উঠোনের ইঁটের ফাঁক দিয়ে ঘাস গজাতে শুরু করেছে। আস্তাবলবাড়ির দেয়ালে ঝুল জমেছে। মিয়াজান নেই, ইয়াসিন নেই, আব্বাসও নেই। ইব্রাহিম টিম টিম করে টিকে আছে বটে কিন্তু তাই বা আর ক'দিন!

বংশী সেদিন হঠাৎ বললে—জানেন—শালাবাবু, কাল মেজবাবুও চলে যাচ্ছে।

—কোথায়?

—গরাণহাটায়। মেজবাবুর শ্বশুরের বাড়িতে।

পরদিন ভোরবেলা থেকেই ঠেলাগাড়ি এল অনেকগুলো। বিধু সরকার নিজে তদারক করছে।

—উঁহু, হলো না, অমন করে তুললে কাঠের জিনিসে দাগ লাগবে যে।

আগাগোড়া হাতির দাঁতের কাজ করা পালঙ একখানা আর তার সঙ্গে মিলিয়ে মশারি টাঙাবার ছত্রি। বড় দামী দামী জিনিস। সাবধানে নিতে হয়। বাক্স, প্যাঁটরা, সিন্দুক, আলমারি, মেজগিন্নীর পুতুলের বাক্স, পায়রার খোপ, মেজবাবুর গরু-বাছুর, বিছানা-বালিশ, ভাঁড়ারের বাসন, কেঠো, কুলো, ডালা। সবই তো ভাগ হয়ে গিয়েছিল আগে। কত যে জিনিস! জিনিসের আর শেষ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঠেলাগাড়ি আসছে, মাল তুলছে আর চলে যাচ্ছে। বিধু সরকারেরও সকাল থেকে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, নাগাড়ে খেটে চলেছে।

বিকেল নাগাদ ইব্রাহিম গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়ালো গাড়িবারান্দার তলায়। আজ সে আবার উর্দি পরেছে, তকমা এঁটেছে গায়ে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে এক বার।

মেজবাবু মলমলের পাঞ্জাবী চড়ালে। কানে আতর লাগিয়ে দিলে বেণী। পাম্‌শু বেরোলো। চুনোট করা চাদর বেরোলো। তারপর মেজবাবু বললে—ছড়িটা দে আমার।

মেজবাবু ছড়ি নিয়ে গট গট করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে যেন কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ান। তারপর দোতলার বারান্দা দিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ান ছোটকর্তার ঘরের সামনে। কত বছর পরে আবার এ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান মেজবাবু মনেই পড়ে না। আগে যখন ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছে দু'জনে তখন যেন সত্যিকারের আপনার ছিল। বড় হবার পর, বিশেষ করে বিয়ে করার পর আর কখনও কথা বলার প্রয়োজন হয়নি। সুখচর থেকে খাজনা এসেছে, জমা হয়েছে খাজাঞ্চিখানার খাতায়, জমিদারির আয় পাহাড় হয়ে জমেছে সিন্দুকের ভেতর। যে-যার নিজের নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কারো প্রতিবন্ধক হয়নি, কারো জন্যে কারো আটকায়ওনি কিছু, অনায়াস গতিতে সংসার চলে এসেছিল। কিন্তু আজ মেজবাবু অনেক কথা বলবার জন্যেই প্রস্তুত ছিল বুঝি।

বংশীই প্রথমে দেখতে পেয়েছে। বললে—ছোটবাবু ঘুমোচ্ছে আজ্ঞে।

ঘুমোচ্ছে! খানিক কী ভেবে নিয়ে মেজবাবু বললে—তবে থাক।

বংশী বললে—না মেজবাবু, আমি ডেকে দিচ্ছি—বসুন।

বংশী ছোটবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগলো—ছোটবাবু, ও ছোটবাবু—

ছোটবাবুর পালঙটাও হাতির দাঁতের কাজ করা। তার ওপর মিনে করিয়ে নিয়েছিল ছোটবাবু পরে। কাপড়-চোপড়গুলো সামলে দিলো বংশী। ক'দিন দাড়ি কামাতে আসেনি বুঝি নাপিত। মেঝের ওপর একটা পিকদানি। মালিশের শিশি। পাথরের খল।

ছোটবাবু হঠাৎ চোখ মেললে। সামনে চোখ চেয়েই দেখলে মেজদাদামণি! কেমন যেন ভাসা ভাসা চাউনি ছোটবাবুর।

মেজবাবু কী বলবে বুঝতে না পেরে একবার ঘুরিয়ে বললে—চললুম রে মিঠু!

এতদিন পরে নিজের ডাক-নামটা শুনে ছোটবাবুর কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সব। কিন্তু ভালো করে দৃষ্টি দিতেই দেখলে মেজদাদামণি তখন চলে গিয়েছে।

খিড়কির দরজা দিয়ে নামবে মেজগিন্নী। জিনিসপত্র সবই চলে গিয়েছে। বাঘবন্দির ছককাটা জায়গাটার ওপর দাঁড়িয়েছিল মেজগিন্নী। গিরি বললে—চলো মেজমা, বেণী ডাকছে ওদিকে—

মেজগিন্নী পায়ে পায়ে গিয়ে দেয়ালের দরজাটা খুলে ডাকলে—ছুটি, কী করছিস?

চিন্তা দেখতে পেয়ে বললে—ছোটমা, বাইরে এসো তো একবার।

ছোটমা ঘুমোচ্ছিলো বুঝি। চোখ মুছতে মুছতে মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়ালো।

মেজগিন্নী ছোটমা'র চিবুকে হাত দিলে—সাবধানে থাকিস ছুটি—কি আর বলবো তোকে।

—চললে মেজদি?

—কী আর করি বল, বড়দি-ই রইলেন না, বাড়ি যেন খাঁ খাঁ করছে—আর থাকা যায় এখানে?

—আমি কিন্তু থাকবো মেজদি, আমি আর কোন্ চুলোয় যাবো—বলে খিল খিল করে হেসে উঠলো ছোটমা।

মেজগিন্নী বললে—তোর মেজভাসুরেরও তো অসুখের শরীর। তাই বাবা আর ছাড়লে না। তারপর চিন্তার দিকে চেয়ে বললে—দেখিস তোর ছোটমাকে—কী আর বলবো—চলি।

চিন্তা হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়ে দু'হাত দূরে মাটিতে টিপ করে একটা প্রণাম করলে।

তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুলো মেজগিন্নীর গাড়ি আর সদর-গেট দিয়ে বেরুলো মেজবাবুর। একে-একে বেণীও গেল। রাঙাঠাকমাও গেল। সৌদামিনীও গেল।

বংশী বললে—এবার?

ফাঁকা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন কান্না পেতে লাগলো ভূতনাথের। ভাঙনের পালা যখন শুরু হয়েছে, তখন এর শেষ কেমন করে হবে কে বলতে পারে। একবার মনে হলো পালিয়েই যাবে সে। কাউকে বলবে না। বংশীকেও না, বৌঠানকেও না। কেউ জানবে না। কাকেও তার ঠিকানা জানাবে না। একেবারে এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে। শুধু জবার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তার যেন সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। ভবানীপুরেই সে একটা বাসা করবে। ওখানে গেলে আর এ-সব কথা মনে পড়বে না। নতুন করে শুরু করবে তার শহরবাস। আজও মনে পড়ে—সেদিন বড়বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল—সব মিথ্যে। স্নেহ, ভালোবাসা, প্রেম, আত্মীয়তা, স্বার্থত্যাগ, সব মিথ্যে। কোনো-কিছুর মূল্য নেই মানুষের সংসারে। এত বড় বাড়ির ভেতরে তেতলার এককোণে কেবল একটি প্রাণী, আর দোতলার একটি ঘরে শুধু আর একটি মুমূর্ষু। এখানে কেমন করে বাস করবে সে!

বংশী বললে—ছোটমা'র একটা ব্যবস্থা হলে আমিও চিন্তাকে নিয়ে দেশে চলে যাবো হুজুর।

ভূতনাথ বললে—ছোটবাবু—ছোটবাবুকে কে দেখবে?

—ওই মুখেই শুধু বলি শালাবাবু, সত্যি কি আর যেতে পারবো শেষ পর্যন্ত!

ভূতনাথের যেন সেই একই সমস্যা। বদরিকাবাবু প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিল। তখনই কোথাও চলে গেলে ভালো হতো। কিন্তু কোথায়ই-বা সে যেতো। তখন একটামাত্র উপায় ছিল—নিবারণদের আড্ডা। ওদের সঙ্গে মিশে গেলে হয়তো জীবনটা অন্য দিকে মোড় ঘুরে যেতো। যে-কলকাতার আদি ইতিহাস শুনেছে সে বদরিকাবাবুর কাছে, সে-কলকাতা আবার নতুন করে দেখতে পেতো। যে-কলকাতার দেওয়ান ছিল গোবিন্দরাম মিত্র, সেই কলকাতা এখন ভারতবর্ষের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সে দৃশ্য দেখেছে ভূতনাথ। একদিন কিংসফোর্ড সাহেব রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছে। সঙ্গে আছে দু'জন বডিগার্ড।

পেছন থেকে কারা যেন বলে উঠলো—বন্দে মাতরম্—

কিংসফোর্ড সাহেব থেমে দাঁড়ায়।—কৌন্ হ্যায়—কৌন্ হ্যায়—

কিন্তু যারা চেঁচিয়েছিল, তারা তখন পালিয়েছে। সাহেব রাগে বিড় বিড় করে গালাগালি দেয়—শালা নেটিভ রাসকেল—

হঠাৎ ওপাশ থেকে দু'জন ছোট ছোট ছেলে আবার চেঁচিয়ে ওঠে—বন্দে মাতরম্—

সাহেব এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে। বলে—পাকড়ো—পাকড়ো রাসকেল লোগকো—কিন্তু ধরতে পারা যায় না কাউকেই।

সঙ্গে একজন বডিগার্ড বলে—সাহেব, ঘর চলিয়ে।

সাহেব চিৎকার করে ওঠে—চোপরাও—

এমন সময় একজন ছেলে সামনে এসে বললে—সাহেব সেলাম।

সাহেব পকেট থেকে চকলেট বার করে বলে—গুড বয়।

চকলেটটা নিয়েই ছেলেটি কিন্তু আবার বলে ওঠে—বন্‌ডে মাটরম্—

সাহেব ছড়ি নিয়ে মারতে ছোটে—রাসকেল—ইমপ্... ছেলেটা তখন দৌড়ে পালিয়েছে। সাহেব বলে—This horrible Bande-mataram will make me mad—

নিবারণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল একদিন। বড় ব্যস্ত ভাব। বললে—ভূতনাথবাবু না?

ভূতনাথ তখন সাইকেল-এ চড়ে আপিস থেকে ফিরছিল। নেমে পড়লো। বললে—কি খবর তোমাদের নিবারণ?

নিবারণ বললে—আমাদের কাজ তো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, দেখেননি?

দেখেছে বৈকি ভূতনাথ। খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে ভূতনাথের। বড় বড় অক্ষরে কোনো দিন লেখা থাকে—'ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন সাহেবের উপর গুলি।' কখনও থাকে—'বাংলাদেশে স্বদেশী ডাকাতের উৎপাত।' আবার কখনও থাকে—'ছোটলাট সাহেবের ট্রেনে বোমা।'

নিবারণের গায়ে সর্বদা দেশি কাপড় জামা। বিলিতি কাপড় কেনা বয়কট করেছে অনেকে। সেদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভূতনাথ গান শুনেছিল—'বলিহারি পাড়ের বাহার স্বদেশী শাড়ি।'

নিবারণ বললে—বরিশালে কনফারেন্স হয়েছিল—জানেন?

—শুনেছি।

—রসুল সাহেব প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, কেম্প সাহেবকে জব্দ করা হয়েছে খুব।

—কেম্প সাহেব কে?

—পুলিশের কর্তা—আর এমার্সন সাহেব ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। বলেছিল—কেউ 'বন্দে মাতরম্' বলতে পারবে না। সুরেন বাঁড়ুজ্জে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন—'বন্দে মাতরম্'—সে-সব অনেক কাণ্ড, খবরের কাগজে সব তো বেরোয়নি, আমি নিজের চোখে সে-সব দেখে এসেছিলাম—তাই নিয়ে গান বেঁধেছেন কাব্যবিশারদ, শোনেননি?

—কোন্ গানটা?

নিবারণ বললে—গান তো অনেক বেঁধেছেন—কিন্তু এই গানটাই সব চেয়ে ভালো—

আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়
ওই যে মায়ের জয় গেয়ে যায়।
রক্ত বইছে শতধার, নাইকো শক্তি চলিবার
এরা, মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না,
সহে অত্যাচার!
এত পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির
তবু হাত তোলে না কারু গায়।

সেদিন বেশি সময় ছিল না। নিবারণও বুঝি কাজে ব্যস্ত ছিল কিন্তু বড়বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে নিবারণের কথাটাও মনে পড়লো ভূতনাথের। সামান্য পুঁজি, সামান্য কামনা, কোনোদিন বড়-কিছুর স্বপ্ন দেখেনি সে। কেমন যেন ভয় করে। মৃত্যুর ভয় নয়। কিন্তু সে কি পারবে? ব্রজরাখাল তো তাকে বলেনি ও-পথে যেতে। তার নিজেরও তো অন্য পথ। তবে কোন্‌টা সঠিক পথ, কে বলে দেবে!

একবার নিবারণকে ওরই ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল ভূতনাথ—ব্রজরাখালবাবুর খবর কিছু জানো নিবারণ?

—না।

—কিন্তু আমার এক-একবার মনে হয় তোমাদের দলে ঢুকি।

নিবারণ বললে—একদিন তো বলেছিলাম আপনাকে আসতে—সেদিন এলেন না।

—আজ কিন্তু আমি বদলে গিয়েছি—বিবেকানন্দর পথ আমার বড় শক্ত লাগে, কিন্তু তোমাদের কাজ আমি পারবো।

নিবারণ বললে—স্বামী বিবেকানন্দ তো উল্টো কিছু বলেননি—আপনি অরবিন্দ ঘোষের লেখা পড়েছেন?

ভূতনাথ বললে—ওই 'বন্দে মাতরম্' কাগজে যা লেখেন পড়েছি—কিন্তু...

—পড়ে দেখবেন, অরবিন্দ ঘোষ যা বলেন স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাই বলেছিলেন চার-পাঁচ বছর আগে—পড়ে দেখবেন আপনি, আমি আপনাকে বই দেবো।

কিন্তু ভূতনাথ রূপচাঁদবাবুর লাইব্রেরীতে খোঁজ করে সে-বই পড়েছিল। তখন খুব পড়ার নেশা ছিল ভূতনাথের। বড়বাড়ির লাইব্রেরী-ঘরে কতদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বই মুখে দিয়েই কেটে গিয়েছে তার। রূপচাঁদবাবুর লাইব্রেরীতেও কত দামী দামী বই ছিল। অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন—

Vivekananda was a very lion among men. We perceive his influence still working gigantically. We know not well how, we know not where, in something not yet formed, something leonine, grant intuitive upheaving that has entered the soul of India and we say Behold! Vivekananda still lives, in the soul of the mother and in the souls of the children.

ভূতনাথ আর একটা প্রশ্ন করেছিল নিবারণকে—আচ্ছা, বঙ্গভঙ্গ যে হলো—তা কি আর রদ হবে ভাবছো?

নিবারণ পায়ের জুতোটা মাটিতে ঠুকে বলেছিল—রদ করতেই হবে, স্বামীজি বলেছেন—সাধনা করলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য। আমাদের এও তো সাধনা—কদমদা'কে, শিবনাথকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে—কিন্তু আমরা তো দমিনি—আমাদের 'যুবক-সঙেঘ'র এখন কত মেম্বার জানেন—পাঁচশ একত্রিশ জন—অথচ প্রথমে তো মোটে তিন-চারজনে মিলে আরম্ভ করেছিলাম।

ভূতনাথের মনে পড়লো—সেই বড়বাজারের চাকরির চেষ্টায় যখন ঘুরতো রোজ, সেই সময়েই প্রথম শুনেছিল। সেই দোকান-পাট বন্ধ হওয়া। অরন্ধন, রাখী বেঁধে দেওয়া। অথচ মেজবাবু কিছু মানেনি। গেট বন্ধ করে দিয়েছিল পাছে ভলান্টিয়াররা এসে বাড়ি চড়াও করে। সেই দিন ভূতনাথেরও যেন মনে হয়েছিল—এ-সব করে কী হবে! বিলিতি কাপড় পোড়ানো! দিশি জিনিস কেনা! সব মিছে। ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, স্বামী বিবেকানন্দকে তা হলে তোমরা মানো?

—মানি মানে, স্বামী বিবেকানন্দই তো আমাদের গুরু, আমাদের সঙেঘ কেউ মেম্বার হলে তাকে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দর বই-ই তো পড়তে দিই, ওঁকে মানবো না—কী যে বলেন আপনি?

—আচ্ছা, তা হলে ব্রজরাখালও তো বিবেকানন্দের ভক্ত, সে কেন তোমাদের কাজে যোগ দিলে না?

নিবারণ হাসলো। বললে—বড় শক্ত প্রশ্ন তুললেন আপনি ভূতনাথবাবু, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি এর আলোচনা হয়? একদিন আসবেন আমাদের ওখানে—কেমন?

কিন্তু যেদিন প্রথম খবরের কাগজে বেরুলো সেই মুরারীপুকুরের খবর। মনে আছে, ৩২ নম্বর মুরারীপুকুর রোড, কী ভয়ানক কাণ্ড!

নিবারণের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পর রাস্তায় আসতে আসতে হঠাৎ মনে হলো যেন আর-একজন কে তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সে-ও সাইকেল-এ চড়ে আসছে। তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে চলে আসবার চেষ্টা করলো ভূতনাথ। অনেক ঘোরা পথ দিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছলো যখন ভূতনাথ, তখন আর তাকে দেখা যায় নি। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যেবেলা বড়বাড়ির সামনেই গলির ওপর যেন সেই লোকটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল আবার। কমলালেবু রং-এর একটা আলোয়ান গায়ে। মুখে যেন বসন্তের দাগ। সেই স্পষ্ট সেদিনকার চেহারা।

একদিন বংশীকে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—ও লোকটা কে বংশী, দাঁড়িয়ে থাকে আর রোজ

আমার পেছন পেছন ঘোরে?

বংশী খানিকক্ষণ দেখলে ভালো করে। তারপর বললে—কে আর, এমনি রাস্তার লোক হবে।

—রাস্তার লোক তা আমার পেছন-পেছন যায় কেন?

যেখানে গিয়েছে ভূতনাথ ক'দিন, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। তারপর যখন ছুটুকবাবু, মেজবাবু সবাই বড়বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, ফাঁকা বাড়ি, খাঁ খাঁ করছে উঠোন, গেট-এ কেউ পাহারায় নেই—তখনও মনে হয় যেন চট করে কে যেন তাকে দেখে সরে গেল সামনে থেকে। উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে সেদিন আবার ভূতনাথ বললে—ওই যে বংশী, সেই লোকটা!

বংশী বললে—কই, কোন্‌দিকে? বংশী হাঁ করে অন্ধকার গেট-এর দিকে চেয়ে দেখতে থাকে।

আজকাল কিন্তু সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে গেট-এ তালা বন্ধ করে দেয়। আর তো কেউ যাবার আসবার নেই। সন্ধ্যেবেলাই বড়বাড়ি নিঝুম হয়ে যায়। আলোগুলো নিবিয়ে রাখে বংশী। মিছিমিছি আলো জ্বাললেই তো পয়সা খরচ। আর ছোটবাবুও তো বাইরে যায় না। কে আর রাত ভোর করে বাড়ি ফিরবে। ভূতনাথের যখন দেরি হয় ফিরতে, তার কাছে চাবি থাকে আলাদা। একলা চাবি খুলে ঢোকে, তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে চোরকুঠুরিতে গিয়ে শোয়। চোরকুঠুরিতে যদি অসুবিধে হয়, অন্য অনেক ঘর পড়ে আছে, যেখানে খুশি গিয়ে শোও। বৈঠকখানাটা সেইদিন থেকে বন্ধই থাকে। সেই বদরিকাবাবু আত্মহত্যা করবার পরদিন থেকে। ও-ঘরে কেউ ঢোকে না। ঢোকবার প্রয়োজনও হয় না কারো। বদরিকাবাবু হাসপাতালে যাবার পথেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। তবু মনে হয়, এখানের এই ঘরটার মধ্যেই যেন তার আত্মা কোথাও লুকিয়ে আছে। কোথাও কোনো অভিসন্ধি নিয়ে ঘুরে-ফিরে বেড়ায় এখানে। ভয় করে সকলের।

সেদিন কিন্তু বনমালী সরকার লেন-এর ওপর তেমনি আর-একজন কে এসে দাঁড়ালো।

ভূতনাথ বলে—ওই—

—কই? কে?

—ওই, ওই যে—

কিন্তু এবার বংশী দেখতে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তালা খুলে দেয়। বলে—এ যে ননীবাবুর ম্যানেজার আজ্ঞে।

বেশ বয়েস হয়েছে ম্যানেজারের। হাতে ক্যাম্বিশের পেটফোলা ব্যাগ। রোগা-রোগা চেহারা। ছুঁচলো একজোড়া গোঁফ মুখের দু'পাশে। অন্ধকারে যেন সেই আলোয়ান-গায়ে লোকটার মতোই দেখাচ্ছিলো। ভেতরে ঢুকে লোকটা বলে—মেজবাবু কোথায়—মেজবাবু?

বংশী বলে—মেজবাবু তো আর এ-বাড়িতে থাকে না।

—থাকে না? দেখো দিকিনি কী গেরো! কোথায় থাকে তবে?

—গরাণহাটায়।

লোকটা যেন একটু ভাবল!

বংশী বললে—আজ রাত্তিরবেলা কেন ম্যানেজারবাবু?

—আরে বেরিয়েছি সেই সকালবেলায়, সারা কলকাতা চষছি, চযতে-চযতে এই এখন এলাম বৌবাজার, তারপর এখন আবার যাবো পটলডাঙা, সেখান থেকে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে তবে ঘর—তা এখেনে আজকাল থাকে কে?

বংশী বললে—আর ছুটুকবাবুও চলে গেল পাথুরেঘাটায়, থাকে এক ছোটবাবু, তা ছোটবাবু তো রোগে ভুগছে—উঠতেই পারে না বিছানা ছেড়ে।

ম্যানেজার বলে—তা হলে টাকা দেবে কে? তিন মাস যে বাকি পড়লো, সেটা কে দেখবে—হুজ্জতে ফেললে দেখছি গো।

তারপর পেটফোলা ব্যাগটা খুলে কী যেন খুঁজতে লাগলো ম্যানেজার। বললে—আলোটা জ্বালো দিকিনি, খুঁজে পাচ্ছিনে কাগজটা। আলোর তলায় এসে একখানা ভাঁজ করা কাগজ তুলে ম্যানেজার দিলে বংশীর হাতে।

—কীসের কাগজ ম্যানেজারবাবু?

—এ কাগজটা দিও দিকি তোমার ছোটবাবুকে, বাবু পড়লেই বুঝতে পারবেন, সাপও নেই, ব্যাঙও নেই, সোজা করে লেখা আছে।

বংশী বললে—কী আছে খুলেই বলুন না?

ম্যানেজার যেন বিরক্ত হলো। বললে—আরে বাবা, নোটিশ, নোটিশ। বাড়ি ছাড়ার নোটিশ! সব জিনিস চাকর মানুষের জানা কী দরকার! যাই আবার সেই পটলডাঙায়, না মলে আর পাপ ঘুচবে না। তারা ব্রহ্মময়ী—

ম্যানেজার চলে গেল। বংশী বললে—দেখুন তো শালাবাবু, কী লিখেছে?

ভূতনাথ কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলো। এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে... ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্ধকী সম্পত্তির বাবদ একুনে এতটাকা পাওনা হইয়াছে, গত তিন মাস যাবৎ কোনো টাকা না পাওয়াতে বাড়ি ছাড়িয়া দিবার নোটিশ দেওয়া যাইতেছে, অন্যথা আদালতের সাহায্যে দখলকারীদের উৎখাত করা হইবেক।

বংশী বললে—বাড়ি ছাড়তে হবে নাকি শালাবাবু?

—সেই রকমই তো লিখেছে।

—সে কী করে হবে শালাবাবু, বাড়ি ছেড়ে অমনি গেলেই হলো?

ভূতনাথও যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। সত্যি কি শেষ পর্যন্ত তাই হবে! ভূতনাথ বললে—ম্যানেজার কি চলে গেল?

—ডাকবো শালাবাবু?

—ডাক, ডাক তো একবার।

বংশী সেইখানে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—ও ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজার বোধ হয় ততক্ষণে অনেক দূর চলে গিয়েছে। বংশী দৌড়ে গেল পেছন-পেছন। বনমালী সরকার লেন-এ তখন বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দু'একটা দোকানে শুধু আলো জ্বালিয়েছে ওদিকে। বড়বাড়িতে উঠোনটা কিন্তু সকলের চেয়ে যেন বেশি নির্জন। বিমূঢ়ের মতন এখানে দাঁড়িয়ে একটু একটু ভয় করে ভূতনাথের। মেজবাবুর পায়রার খোপগুলো খালি পড়ে ছিল কয়েকটা। তারই মধ্যে কয়েক জোড়া গোলা পায়রা এসে বাসা বেঁধেছে। অন্ধকার রাত্রে এক-এক সময়ে তারা বক্-বক্-বকম্ করে ওঠে আচমকা। ঝটাপট শব্দ হয় হঠাৎ! তারপর আবার চুপ হয়ে যায় সব। ইব্রাহিমের ঘরের ছাদের সামনে বাক্সবাতিটা ঝুলে আছে তো ঝুলেই আছে, অন্ধকারে মনে হয় বুঝি একটা বাদুড়। বাদুড়ের মতোই নিঃশব্দে ঝোলে আর বাতাস পেলেই দোলে। একটা ইঁদুর উঠোনের এ-কোণ থেকে ও-কোণ দৌড়ে যাবার সময় পায়ে শুকনো পাতা লাগলে খড়-খড় শব্দ ওঠে। শুধু ভূতনাথ নয়, যেন ইঁদুরটাও চমকে ওঠে নিজে। রান্নাবাড়ির পেছনে যখন বংশী বসে বসে হাতুড়ি দিয়ে কয়লা ভাঙে, সমস্ত বড়বাড়িতে সে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফাঁকা ফাঁকা ঘরগুলো গুম-গুম করে ওঠে। ঝন-ঝন করে লোহার শেকল আর কড়াগুলো বেজে ওঠে। ভূতনাথের মনে হয় বদরিকাবাবু যেন বলে—কেমন, বলেছিলাম কিনা, কেমন!

দেউড়িতে আর কেউ ঘণ্টা বাজায় না আগেকার মতো। ঘণ্টাটা তো ঝুলছে, কিন্তু বাজাবে কে? ঘড়িগুলো তো সব বদরিকাবাবু আগুনে পুড়িয়েছে কিন্তু সময় কি থেমেছে সে-জন্যে? সময় জানবার অবশ্য দরকার হয় না আর কারো। কেউ ইস্কুলেও যায় না, কেউ আপিসেও যায় না। সময় বেঁধে ঘুম থেকে উঠে রান্না চড়াবার দরকার নেই আর। দারোয়ান নেই যে, ডিউটি বদল হবে ঘড়ি দেখে। ছুটুকবাবু নেই যে, পরীক্ষার পড়া করবে ঘড়ি দেখে, কিম্বা ঘড়ি দেখে রাগ-রাগিণী শুরু হবে আর গানের আসর জমবে। ঘড়ি দেখে ঘোড়ার ডলাই-মলাই আর দানা খাওয়ানোর দরকার নেই। এখন সূর্য মাথার ওপর উঠলে বুঝতে হয় বারোটা বেজেছে, সূর্য ডুবে গেলে বুঝতে হয় সন্ধ্যে হলো। ঘড়ি নেই কিন্তু তবু সময় কি থেমে থেকেছে? বদরিকাবাবু বড়বাড়ির সব ঘড়ি না হয় পুড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু সূর্য কি উঠছে না?

ভূতনাথ বেশ বুঝতে পারে, বড়বাড়ির সূর্য যদিই বা ডুবেছে কিন্তু সূর্য উঠেছে আর-এক জায়গায়, উদয় হচ্ছে আর-এক পাড়ায়। সেখানে রূপচাঁদবাবুর বাড়ি উঠছে হাজারে হাজারে। সেখানে আর-এক মানুষের দল আর-এক সভ্যতার পত্তন করছে। সে মানুষেরা হয়তো এত বড় নয়, এত অভিজাত নয়, তাদের বাড়িতে ঘরে-ঘরে হয়তো এত ঘোড়া, পাল্কি, মেয়েমানুষ, ব্রুহাম, ল্যান্ডোলেট নেই, তাদের বউরা হয়তো হীরের নাকছাবি পরে না, পুতুলের বিয়েতে বারো হাজার টাকা ওড়ায় না, একটা চীনে অর্কিড গাছের চারা তিনশ' টাকা দরে নীলেমে কিনে বিলিয়ে দেয় না, পুরুষরা রায়বাহাদুর খেতাব পায় না—তবু রাত্রে তারা বাড়িতে ঘুমোয়, ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে, পরের পরিশ্রমের আয়ের ওপর ভাগ বসায় না। তারা হেঁটে আপিসে যায়, বৃষ্টি হলে মাথায় ছাতা দেয়, তারা খেটে খায়। সবাই তারা ননীলালের মতো বড়লোক হয়তো নয়, কিন্তু কেউ স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কেউ বা উকিল, ব্যারিস্টার, আপিস-কেরানী, মুহুরী, ব্যাঙ্কার।

ভাবতে ভাবতে ভাবনায় তলিয়ে যায় ভূতনাথ। সে কোন্ ১৩৪৫ সালের কথা। কোন্-এক গির্জার ঘড়িতে বুঝি প্রথম বেজে উঠেছিল যন্ত্রযুগের আগমনী। কিন্তু কে জানতো একদিন সেই ঘড়িই মধ্যযুগের সেই মহাকালের কল্পনা-সৌধ ধূলিসাৎ করে দেবে? ঘণ্টা, মিনিট আর সেকেণ্ডে মহাকালকে খণ্ড-খণ্ড করে সময়ের অক্ষয় ইতিহাস রচনা করবে? মহাকালকে টুকরো টুকরো করে কেটে অভিজাতের আভিজাত্য হরণ করবে? এই ঘড়িই বুঝি মহাকালের কল্পনা ধ্বংস করে প্রথম জানিয়ে দিলে—গগনচুম্বী গির্জার গম্বুজ, মসজিদের মিনার আর মন্দিরের চূড়ো শাশ্বতও নয়, সনাতনও নয়। সে বললে—ধর্ম, দেবতা আর বামুনদের প্রভাব-প্রতিপত্তি উপদেশ সমস্ত কল্পনা—সমস্ত ছলনা, সত্যি শুধু পায়ের তলার মাটি। আর এই ভালোয়-মন্দে-মেশা মানুষ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—একথা চণ্ডীদাসের বহু আগে বলে গিয়েছে ঘড়ি। বলে গিয়েছে—মানুষই কেবল সত্যি নয়, তার চব্বিশটা ঘণ্টা সত্যি, চৌদ্দশ' চল্লিশ মিনিট সত্যি, ছিয়াশি হাজার চারশ' সেকেণ্ড সত্যি। আরো বলেছে—হিসেবের গণ্ডি দিয়ে সময়কে মেপে মেপে চলতে হবে, আরো সব জিনিসের মতো সময়েরও মূল্য আছে। বৈদুর্যমণি, হিরণ্যমণি আর কৌস্তুভমণি চৌধুরীদেব মতো সময়ের অপব্যয় করলে সে তার প্রতিশোধ নেবেই।

বদরিকাবাবুর কাছে শোনা কথাগুলো এই বড়বাড়িতে অন্ধকার আবহাওয়ায় যেন মুখর হয়ে ওঠে আজকাল। বদরিকাবাবু বলতো—Time is money

আর ননীলাল বলতো—God is money.

সত্যিই সময় তো থেমে থাকেনি। বদরিকাবাবু ঘড়ি পুড়িয়ে দিয়ে কি তার নিজের ওপরেই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল? কিন্তু সময় তো তার নিজের পথেই এগিয়ে গিয়েছে। কারোর মুখের দিকে চায়নি সে। যেমন চায়নি চৌধুরীদের মুখ, তেমনি চায়নি লর্ড কার্জনের।

১৮৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী লর্ড কার্জন এল বড়লাট হয়ে।

যে-কার্জনের পরিকল্পনায় বাঙলাদেশ দু'ভাগ হয়ে গেল, সেই কার্জনকেই আবার শেষ পর্যন্ত সময়ের ফেরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যেতে হলো নিজের দেশে। সে-তারিখটাও মনে আছে ভূতনাথের। ১২ই আগস্ট, ১৯০৫ সাল। কিন্তু সময় তা বলে চুপ করে বসে থাকেনি। গ্রামে গ্রামে 'অনুশীলন-সমিতি' গড়ে উঠেছে তখন। নিবারণদের দল বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছে, বোমা ফেলেছে, লাঠি খেলেছে। ভাবতে গিয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গায়ে। সে দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি। আধো অন্ধকার ঘরের ভেতর ভালো করে সব নজরে পড়ে না। ঘরের মধ্যে এক সঙ্গে বসে আছেন তিন জন। অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিক আর পি. মিত্তির। আর ঘরের চারপাশে বসে আছে আরো ক'জন। বারীন ঘোষ বসে আছে তাদের মধ্যে এক পাশে।

হঠাৎ বারীন উঠে বললে—কিংসফোর্ড সাহেবের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে—আপনারা বিচার করুন এর—এর বিহিত করুন।

পি. মিত্তির নড়ে উঠলেন—Yes, Kingsford must die!

অরবিন্দ ঘোষ বললেন—I concur.

রাজা সুবোধ মল্লিক বললেন—I concur.

ঘরের অন্ধকার হঠাৎ আরো যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

এ-ঘটনার অনেক বছর পরে নিবারণের মুখেই এ-সব শোনা। কিন্তু সে বোধ হয় ১৯১১ সালের পরের কথা। সেই বছরই দরবার হলো দিল্লীতে। বাঙলাদেশ জোড়া লাগলো আবার। আর কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে গেল দিল্লীতে। সেই ১২ই ডিসেম্বরের রাত্রেই রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল নিবারণের সঙ্গে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

ম্যানেজারের সঙ্গে আর-একদিন দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। বার-শিমলেয় যাবার পথে ম্যানেজারও আসছিল ওদিক থেকে। হাতে সেই পেটফোলা ব্যাগ। রোগা-রোগা চেহারা। মুখের দু'পাশে ছুঁচলো গোঁফ। ভূতনাথ ডাকলে—ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজার হঠাৎ ডাক শুনে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো।

—কে ডাকলে আমাকে? কে গো?

ভূতনাথ বললে—আজ্ঞে আমি, বড়বাড়িতে থাকি।

যেন চিনতে পারলে ম্যানেজার। বললে—তা ভালোই হলো, দেখা হয়ে গেল, আজই তো কোর্টে দরখাস্ত করে দিলাম, জানো না বোধ হয়। এবার কোর্টে গিয়েই বাবুরা জবাব দিক—বাড়িও ছাড়বো না, টাকাও মিটোবো না—এ তো বড় আব্দার কম নয়!

ভূতনাথ বললে—ছোটবাবু যে মরো-মরো—বাড়ি ছাড়ে কেমন করে!

—তা হলে টাকা ফেলে রাখে কেন চৌধুরীবাবুরা? বলে হন-হন করে চলেই যাচ্ছিলো ম্যানেজার।

ভূতনাথ বললে—শুনুন, শুনুন, শুনে যান, অত ব্যস্ত কেন?

ফিরে দাঁড়ালো ম্যানেজার—বলুন, ঝপ করে বলুন, আমার অনেক কাজ।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ননীবাবু কবে ফিরবে বলতে পারেন?

—সাহেবের তো ফেরবার কথা ছিল, তা-ও ছ'মাস হয়ে গেল। কবে ফিরবে কে জানে—কিন্তু সাহেবের খোঁজ কেন শুনি?

—না, এমনিই জিজ্ঞেস্ করছি।

—ও সাহেবকে ধরলে কিছুই হবে না বলে রাখছি তোমাকে, সাহেবের কাছে হাতে-পায়ে ধরলেও একটি পয়সা মাফ নেই। সাহেব তো সাহেব ননীসাহেব, সাহেবের এক কথা, দান-খয়রাত করবে দরকার হলে, কিন্তু সুদ ছাড়বে না একটি আধলা, সাহেবের আশা ছেড়ে দাও ভাই—তারা ব্রহ্মময়ী—

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—সাহেবের ঠিকানটা একবার দিতে পারেন?

—কোথাকার ঠিকানা!

—বিলেতের।

—ওরে বাবাঃ—বলে দশ হাত পেছিয়ে গেল ম্যানেজার। বললে—চাকরিটা আমার খেতে চাও তোমরা পাঁচজনে। তার চেয়ে এক কাজ করো না, গলাটা বাড়িয়ে দিচ্ছি, একটা কোপ বসিয়ে দাও না কাটারির।

ম্যানেজার চলে গেল লম্বা-লম্বা পা ফেলে। ভূতনাথ একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে। সারাদিন ঘুরে-ঘুরে কত দিকে তাগাদা-তদ্বির করে বেড়ায়। আশ্চর্য, অথচ ননীলাল একদিন নিজেই টাকার চেষ্টায় ধারের আশায় ওমনি করে ঘুরে বেড়িয়েছে। ওমনি করে কত ফিকিরে সারা কলকাতা চষেছে। কোথাও যখন মেলেনি, তখন ছুটুকবাবুর কাছে এসে হাত পেতেছে। আর আজ তার অবস্থা দেখো! যে-লোকটা ভগবানে পর্যন্ত বিশ্বাস করতো না, তারই ওপর ভগবানের আশীর্বাদের বহরটা দেখো!

কোথায় বৌবাজার আর কোথায় বার-শিমলে! রোজ রোজ এই যাওয়া-আসা আর পোষায় না। ক'দিন পরে ছুটি ফুরিয়ে গেলে তখন কি আর এই দেখাশোনা করা যাবে! শেষ যখন হয়েই গিয়েছে,

তখন সেই শেষের জেরটুকু যেন আর কাটতে চায় না। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয়—নিজের মনের গোপন ইচ্ছেটা সংসারের কাছে যেন বরাবর গোপনই থাকে। সে-কথা কাউকে জানাবার নয়, বলবারও নয়। লোকে হাসবে তা শুনে।

জবা অনেক আগে একদিন বলেছিল—আচ্ছা, আপনি যে এতদূরে রোজ আসেন—কীসের আশায় আসেন, বলতে পারেন! একঘেয়ে লাগে না?

ভূতনাথ কিছু উত্তর দিতে পারেনি চট করে।

জবা বলেছিল—আমারই লজ্জা করে যে এক-এক সময়ে।

ভূতনাথ শুধু বলেছিল—ওটা বোধ হয় আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে জবা। এখন তুমি আসতে বারণ না করা পর্যন্ত আর আমার আসা বন্ধ হবে না।

তারপর জবা বলেছিল—আপনি সত্যি যেন তা বলে আসা বন্ধ করবেন না ভূতনাথবাবু!

কিন্তু তবু ভূতনাথের ভয় হয়। ভয় হয় যদি কোনো কারণে একদিন তার এখানে আসা বন্ধ হয়ে যায় অনিবার্যভাবে! উপাসনাঘরে যখন উপাসনা করতে বসে জবা, তখন এক-একদিন ভূতনাথও যোগ দেয় তার সঙ্গে। যতক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকে ভূতনাথ, চোখের সামনে কেবল ভেসে ওঠে জবার মুখ। ভূতনাথ জানে। নিজের অধিকারবোধের সীমা সম্বন্ধে সচেতন সে। কিন্তু মনে হয় সেখানে যেন কেউ নেই আর। ফতেপুরের বারোয়ারিতলার মঙ্গলচণ্ডী, বাগবাজারেব শীতলা, সমস্ত দেবতাকে স্মরণ করে সে যেন ভুলতে চেষ্টা করে। মুছে ফেলতে চেষ্টা করে জীবন থেকে। বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায় সব স্মৃতি। ভূতনাথ বোঝে—এ তার অনধিকারচর্চা। এখানে তার সম্পর্ক শুধু কর্তব্য আর পরোপকারের। তাদের সম্বন্ধ শুধু উপকারক আর উপকৃতের। দাতা আর গ্রহীতার। মনিব আর ভৃত্যের। বহুদিন আগে যেদিন জবার বিয়ের কথা প্রথম কানে এসেছিল, সেদিন একটা অজ্ঞাত ব্যথাবোধ সমস্ত চেতনাকে নিঃসাড় করে দিয়েছিল মনে আছে। মনে আছে, মনের কান মলে দিয়ে বার-বার ভূতনাথ বলেছিল—এ অপরাধ, এ অপরাধ! যখনই সজ্ঞান মনে কথাটা উদয় হতো—ধমকে দিতো নিজেকে। আর নিজের আশা-আকাঙক্ষার বাড়াবাড়ি দেখে নিজেরই লজ্জা হতো। কাউকে বলবার কথা দূরে থাক, নিজেই নিজের অপরাধ মনে মনে শাস্তি গ্রহণ করেছে কতবার।

কিন্তু তবু কি ভূতনাথ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, এ শুধু তার স্বভাবই, আর কিছু নয়!

সেদিন বার-শিমলের বাড়িতে ঢুকতেই ঝি বললে—আমি আর এখানে কাজ করতে পারবো না দাদাবাবু।

—কেন, কী হলো আবার তোমার?

ঝি কিছু উত্তর দিলে না।

—দিদিমণি তোমায় বলেছে কিছু?

ঝি বললে—না।

—তবে?

—রোজ-রোজ এ আর ভালো লাগে না আমার, রান্না করবো আর ফেলা যাবে, তা হলে এ কার সংসার—কার জন্যে খেটে মরি!

ভূতনাথ আবাক হলো। বললে—কেন, দিদিমণি ভাত খায় না?

—কোথায় খায়! দুটিখানি দাঁতে চিবিয়ে যেমন ভাত তেমনি ফেলে রাখে। যদি তাই হয় তো কেন আমি রান্না করি, আমি তো বিধবা মানুষ, আমার খাওয়ার জন্যে অত ঘটা করে মাছ-তরকারি রেঁধে লাভ কী?

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা, আমি দিদিমণিকে বলবো'খন, তুমি দরজা বন্ধ করে দাও।

জবা সেদিনও তেমনি সুবিনয়বাবুর ছবির নীচে চুপ করে বসেছিল।

ভূতনাথ বলেছিল—আচ্ছা জবা, এ-সব তোমার কী শুনছি, তুমি নাকি উপোস করে কাটাচ্ছো?

জবা মুখ তুলে চাইলে। শান্ত দৃষ্টি। কোনো অভিযোগ, কোনো অনুরাগ, এমনকি কোনো প্রশ্নও নেই সে-দৃষ্টিতে। যেন চোখ চাওয়া ভদ্রতা, তাই চোখ মেলেছে আর কিছু নয়।

ভূতনাথ বললে—আজকে তোমাকে খাইয়ে তবে আমি যাবো, যত রাত্তিরই হোক। আমার সামনে তুমি খেতে বসবে আজ।

জবা তবু কোনো কথা বলে না। ভূতনাথ বললে—তুমি কি ভেবেছো, এমন করে থাকলে বাবার আত্মা শান্তি পাবে... তোমরা পরজন্ম মানো কিনা জানি না, কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারি, যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর এতে কষ্ট হয়। স্বর্গে গিয়েও তিনি কষ্ট পাচ্ছেন তোমার জন্যে।

জবা খানিক পরে বললে—আমি আর ভাবতে পারিনে ভূতনাথবাবু—বলে আস্তে-আস্তে উঠে সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো।

রোজ এমনিই হয়। একটা কথা উঠে যখন চরম জবাবদিহির সময় আসে, তখন জবা নিজের ঘরে গিয়ে খিল বন্ধ করে দেয়।

সেদিন কিন্তু ব্যতিক্রম হলো। রোজকার মতো ভূতনাথ অন্ধকার গলিটাতে ঢুকে জবাদের বাড়িতে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ মনে হলো পাশ দিয়ে যেন কে টুপ করে চলে গেল। চেনা-চেনা মুখ। কিন্তু গ্যাসের আলোটার তলায় আসতেই এক ঝলক আলো মুখের ওপর পড়েছে। এবার স্পষ্ট দেখা গেল—সুপবিত্র! সুপবিত্র হন-হন করে চলে যাচ্ছে। ভূতনাথও অবাক হয়েছে খুব। একবার চিৎকার করে সুপবিত্রকে ডাকতে যাচ্ছিলো। কিন্তু থমকে দাঁড়ালো তখনই। সুপবিত্র কি জবার বাড়ি থেকেই বেরুলো! কিন্তু জবার বাড়িতেই বা এমন সময়ে কেন এসেছিল!

ঠিক একই জায়গায় জবা চুপ করে বসে ছিল সেদিনও।

ভূতনাথ গিয়েই জিজ্ঞেস করলে—সুপবিত্র এসেছিল নাকি এখানে?

সুপবিত্রর নাম শুনে জবা যেন একটু বিচলিত হলো।

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—সুপবিত্রকে দেখলাম, এসেছিল বুঝি তোমার কাছে?

জবা শুধু মুখ নিচু করে বললে—না।

—তবে এই গলিতেই যেন দেখলাম, ভাবলাম তোমার কাছে এসেছিল বুঝি!

জবা তেমনি মুখ নিচু করে বললে—ও তো রোজই আসে।

—রোজই আসে? তোমার কাছে?

—আমার কাছে নয়, আমার কাছে ও আসবে না—কিন্তু এ-রাস্তায় সুপবিত্র আসে।

—এ-রাস্তায় কী করতে আসে?

জবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমি জানতুম ও থাকতে পারবে না, কিন্তু ভেতরে তো আসতে পারে না, তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, রাস্তা থেকে জানলার দিকে চেয়ে দেখে।

ভূতনাথ বললে—তুমি দেখেছো?

জবা বললে—দু'তিন দিন দেখেছিলুম, কিন্তু এখন আর দেখি না, ও জানলাটা তাই আর খুলি না, বন্ধ করে দিয়েছি।

ভূতনাথ দেখলে রাস্তার ধারের জানলাটা বন্ধই রয়েছে। বললে—বার বার তোমায় জিজ্ঞেস করেও অবশ্য উত্তর পাইনি, তবু জিজ্ঞেস করছি, এ দুর্ভোগ কেন তোমার, বলতে পারো?

জবা চুপ করে রইল। ভূতনাথ বললে—দোহাই তোমার জবা, আজও যেন উত্তর এড়াবার জন্যে ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিও না। আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।

জবা মুখ তুললে এতক্ষণে। বললে—আমার ভালোর চেষ্টা করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ ভূতনাথবাবু—কিন্তু কষ্ট কি আমারই হয় না—সুপবিত্রকে কষ্ট দিয়ে আমিই কি সুখে আছি বলতে চান? বলতে বলতে জবার চোখ সজল হয়ে এল।

ভূতনাথ চুপ করে রইল।

জবা খানিক পরে বললে—আপনি যদি আমার ভালো চান, তো একটা উপকার করবেন?

—বলো

—আপনি ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে বলে আসবেন ও যেন এমন করে আমার বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা না করে—তাতেও আমি কষ্ট পাই।

ভূতনাথ বললে—তা যেন বললুম—কিন্তু তোমার এ অকারণ জেদ-এর পক্ষে যদি ও কোনো যুক্তি চায় তখন কী জবাব দেবো?

জবা বললে—সুপবিত্র তা জানে, ওকে আমি বলেছি সব কথা।

ভূতনাথ বললে—আমার কি তা জানতে নেই?

জবা করুণভাবে আর-একবার ভূতনাথের দিকে চেয়ে চোখ নামালে। তারপর বললে—আপনিও তো সব জানেন, সেদিন তো ধর্মদাসবাবু আপনার সামনে সবই বলে গেলেন, পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্যই হচ্ছে একনিষ্ঠতা, এযাস্য পরমা গতিঃ, এযোহস্য পরমো আনন্দঃ, এযাস্য পরম-সম্পৎ।

ভূতনাথ তবুও কিছু বুঝতে পারলে না যেন। বললে—পতিব্রতা স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক জবা?

জবা চোখ নামিয়ে বললে—আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে ভূতনাথবাবু!

ভূতনাথ বললে—সে কি?

জবা তেমনি মুখ নিচু করেই বললে—হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে আর-কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

ভূতনাথ অভিভূতের মতন আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। এতদিনের আয়োজন, এত প্রতীক্ষা সবই কি তবে ব্যর্থ! যদি বিয়েই হয়েছে, তবে এতদিন পরে সে-কথা কে জানাতে এল জবাকে! দু'মাস বয়েসে যে-বিয়ে তার কথা এতদিন পর্যন্ত গোপন ছিল কেন? জবার দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। জবাকে যেন হঠাৎ তপস্বিনীর মতো মনে হলো। মুখ নিচু করে তেমনি নির্বিকার বসে আছে তার প্রতিদিনের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। ভূতনাথের আরো মনে হলো—জবার শরীর মন যেন এক আশ্চর্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, যে-অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, যে-অনুভূতির মধ্যে দিয়ে আলোক-তরঙ্গ লোক থেকে লোকান্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। শোকের আকস্মিক আঘাত সামলে নিয়ে যেন সে শোকের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কার কাছে শুনলে এ-কথা এতদিন পরে?

জবা বললে—বাবার কাছে।

ভূতনাথ আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—তা-ই যদি সত্যি হয় তো সুপবিত্রকে তিনি আশীর্বাদ করে গেলেন কেমন করে? তিনি কি তোমার এ-বিয়েতে অমত করেছিলেন?

—না।

ভূতনাথ তবু বুঝতে পারলে না। বললে—তাঁর কি মত ছিল তবে?

—বাবার মত ছিল ভূতনাথবাবু—কিন্তু আমার মত নেই। এক নারীর স্বামী থাকতে দ্বিতীয় বার আর বিয়ে হতে নেই।

—তোমার স্বামী আছে?

জবা বললে—আছে।

—কিন্তু এ কেমন করে ঘটলো জবা? তা হলে সুপবিত্রকেই-বা এতদিন তিনি প্রশ্রয় দিলেন কেন?

জবা মুখ তুললো এবার। বললে—বাবা তো একে সংস্কার বলতেন ভূতনাথবাবু, তাঁর তো এতে বিশ্বাস ছিল না। এতদিন ঠাকুর্দার কৃতকর্মের জন্যে তিনি অনুতাপ করেছেন, শুধু প্রকাশ করেননি কিছু।

ভূতনাথ বললে—তিনি কি জানতেন সব?

জবা বললে—হ্যাঁ, জানতেন তিনি, কিন্তু স্বীকার করেননি।

—স্বীকার করেননি তিনি? তা হলে কেন তিনি প্রকাশ করে গেলেন শেষকালে?

জবা বললে—স্বীকার তিনি করতেন না, কিন্তু মৃত্যুর আগের দিন তিনি যখন প্রকাশ করলেন আমাকে সব ঘটনা, তখন বললেন—তুমি ধর্মান্তর গ্রহণ করেছো মা, তোমার সে-বিবাহ মিথ্যে—আমি তোমাকে সম্মতি দিচ্ছি—তোমার কোনো সঙ্কোচ করার প্রয়োজন নেই। তারপর আমাকে তিনি চিঠি দেখালেন।

—চিঠি?

জবা বললে—হ্যাঁ, ঠাকুমা যে-চিঠি লিখেছিলেন বাবাকে।

জবা আবার বললে—বাবা বললেন—তোমাকে এতদিন বলিনি মা, সংসারের কাউকেই আমি বলিনি—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করো এখন কেন বলছি, তার উত্তরে বলবো—জীবনে কোনো দিন জ্ঞানত কোনো মিথ্যাচার করিনি আমি, এতদিন অনেক দ্বিধা ছিল মনে, অনেক সঙ্কোচ ছিল, ভেবেছিলাম, তুমি মনে খুব আঘাত পাবে, কিন্তু তবু তা জেনেও আজ প্রকাশ না করে পারছি না মা, আমার ঈশ্বর বলছেন—এ মিথ্যাচার, এ অন্যায়, না বললে মুক্তি পাবো না আমি... আর তা ছাড়া তোমার সে-বিবাহে আমার সমর্থন ছিল না, বাল্যবিবাহে আমার সমর্থন নেই তা তো তুমি জানো, কিন্তু এ শৈশব-বিবাহ—তোমার জ্ঞানোদয় হবার আগেই ঘটেছে।

ভূতনাথের মনে পড়লো সে রাত্রের কথা। বোধ হয় মাঝরাত হবে। হঠাৎ সুবিনয়বাবু যেন একবার চোখ খুললেন। তারপর ডাকলেন—মা—

ভূতনাথ সুপবিত্রকে নিয়ে ওদিকে পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করছে। আর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বহুকালের সঞ্চিত গোপনীয়তা জবার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন সুবিনয়বাবু। জবা একে-একে সমস্ত ঘটনা বলে গেল সেদিনকার।

সুবিনয়বাবু বলেছিলেন—মা, আমার জন্ম ঝড়ের লগ্নে, সে এক চরম দুর্যোগ সেদিন—সারা জীবনটা সেই ঝড়ের মতোই কেটে গেল, কিন্তু ভেবেছিলাম তোমাকে আমি ঝড়-ঝাপটা থেকে দূরেই রাখবো—কিন্তু জন্মের এক মাস পরেই তোমাকে হারিয়েছিলাম। ফিরে যখন পেলাম তার আগেই চরম দুর্দৈব ঘটে গিয়েছে তোমার জীবনে।

জবার কাছে শোনা সেদিনকার ঘটনাগুলো আজও সমস্ত মনে পড়ে। সে কত বছর আগের ঘটনা। রামহরি ভট্টাচার্য সেদিন সবে জবাকে নিয়ে গিয়ে উঠেছেন বলরামপুরে।

গৃহিণী বললেন—একে যে মা'র কোল-ছাড়া করে নিয়ে এলে—মানুষ করবে কী করে?

রামহরি বললেন—তুমি মানুষ করবে! একটা ছেলেকে মানুষ করেছিলে যেমন করে আবার তেমনি করে করবে।

—কিন্তু এ যে এখনও মায়ের দুধ ছাড়েনি।

—তা দুধের বন্দোবস্ত আমি করছি—বলে চাদরটা নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। সারা গাঁয়েই প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর। রামহরি পাঁজি দেখে বলে দিলে তবে জমিদারের বাড়িতে শুভ কাজ শুরু হয়। রামহরির কথায় সন্ধিপুজোর ঢাক বেজে ওঠে, ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়, কনে-বউ শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করে। একটা কথার শুধু তোয়াক্কা। রামহরি ভট্টাচার্যিকে গাছের প্রথম ফলটা দিয়ে তবে যজমানরা খায়। গাছের বেগুন, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ... এ-সব ভটচার্যিমশাই-এর আগে খাওয়া পাপ যেন।

সূর্যি পায়রাপোড়া সকাল থেকে বসেছিল দাওয়ায়। ঠাকুর গিয়েছেন বাগানে। তা বাগানে যাওয়া মানে, বাগান থেকে দশটা বাড়ি ঘুরে দশটা ভালো-মন্দ জিনিস নিয়ে ফিরতে-ফিরতে বেলা হয়ে যায়। তারপর এসে তামাক খেয়ে দাওয়ায় বসে বসে পুঁথিগুলো খুলে এক-এক করে বিছিয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়, ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে পুজোর ঘর পবিত্র করা। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই বললেন—কে রে ওখানে বসে? সূর্যি না?

সূর্যি পায়রাপোড়া সেখান থেকেই মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। বলে—এসেছিলাম

ঠাকুরমশাই-এর কাছে—ছেলেটার জন্যে। পাঠশালায় ভর্তি করাবো মনে করছি—একটা দিন দেখে দ্যান যদি।

—তোর গলায় দড়ি জোটে না সূর্যি—গয়লা মানুষ, দুধ বেচতে শেখাবি ছেলেকে, তা নয় লেখাপড়া! লেখাপড়া শিখিয়ে কি বেহ্ম করতে চাস ছেলেকে?

—আমরা মুখ্যু মানুষ বলে কি ছেলেটাকেও মুখ্যু করবো ঠাকুরমশাই, আজকাল সবাই শিখছে যে?

—তবে তাই কর, আমার গুপী যেমন বেহ্ম হয়ে গো-মাংস খেতে শিখেছে—তোর ছেলেও তাই করুক, তোরা আমাকে দুষিস নে—কিন্তু দক্ষিণে কী দিবি?

—আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদেই সব হয়েছে, আপনি নেবেন সে আর বড় কথা কি?

পাঁজি-পুঁথি খুলে বসলেন রামহরি ভট্টাচার্য। বললেন—তোর একটা বিয়েন-গাই দিয়ে যাস দিকিনি—দুধ খেতে হবে।

—তা সের চারেক দুধই না হয় দিয়ে যাবো ঠাকুরের প্রেণামী বলে।

—না, না, ওতে হবে না, আমার কাজ ফুরিয়ে গেলে তোর গরু তোকেই ফিরিয়ে দেবো। নাতনী আমার দুধ খাবে বলে তাই নেওয়া।

—নাতনী? সূর্যি পায়রাপোড়াও অবাক হয়ে যায়।

—হ্যাঁ রে, নাতনী, আমার গুপীর মেয়ে।

পরদিন দেখা হয়ে গেল নারাণ ময়রার সঙ্গে। প্রাতঃপ্রণাম সেরে নারাণ ময়রা বলে—আপনার নাতনীকে এনেছেন নাকি বাড়িতে—শুনলাম?

—হ্যাঁ, তা এনেছি, ছেলে না হয় বেহ্ম হয়েছে, নাতনী কী দোষ করলো শুনি। বয়সে তো এক মাস—আমারই তো রক্ত ওর নাড়িতে, বংশ তো লোপ হয়নি রে, খাঁটি ব্রহ্মতেজ এখনও আছে রক্তের মধ্যে—বলে পৈতে ধরে কটমট করে তাকান নারাণ ময়রার দিকে।

তারপর একে-একে সবাই জিজ্ঞেস করে। সবাই অবাক হয় যায়। ছেলে যখন ব্রহ্মজ্ঞানী, ছেলের সন্তানও ব্রাহ্ম! ছেলে যদি গো-মাংস খেয়ে থাকে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে থাকে, ভগবান না মানে, তার সন্তানেও সে-পাপ অর্সায়।

রামহরি বলেন—না রে, না—যত সব অর্বাচীন! বলেন—দু'মাস বয়েস পর্যন্ত শিশু নিষ্পাপ—সর্বস্পর্শদোষমুক্ত। ওর এখন কোনো জাতই নেই—আমাব কালীও যা ও-ও তাই—ওই বেটির মতোই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।

—কিন্তু যখন ও বড় হবে?

রামহরি ভট্টাচার্য বলেন—তার আগেই আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেবো হিন্দুপাত্রের সঙ্গে।

দু'মাস তখনও পূর্ণ হয়নি জবার। বোশেখ মাস। সন্ধ্যে থেকেই কাল-বোশেখীর ঝড়-ঝাপটা আরম্ভ হয়েছে। রাত হবার আগেই গৃহিণী দরজা-জানলা বন্ধ করে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছেন। নিজের বিছানায় দু'মাসের নাতনীকে নিয়ে শুয়ে আছেন। মাঝ রাত্রে কর্তার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। গৃহিণী দেখলেন—ঘরে প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কর্তা। বাইরে যেন চণ্ডীমণ্ডপের কাছে গলার আওয়াজ পেলেন অনেক লোকের। বললেন—কী হলো? কখন এলে তুমি? ও শব্দ কীসের?

রামহরি বললেন—লোকজন এসে গিয়েছে—জবাকে দাও।

—কেন? জবাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

রামহরির এক হাতে আলো। আর একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—দেরি হয়ে যাচ্ছে, লগ্ন বয়ে যাবে।

গৃহিণী কাঁদতে লাগলেন—কীসের লগ্ন গো? লগ্ন কীসের?

রামহরি ভট্টাচার্যের তখন সময় নেই। গৃহিণীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিলেন জবাকে। বললেন—জবার বিয়ে।

—হ্যাঁ গো, জবার বিয়ে, তা ওর বাপকে একবার খবর দিলে না—তার মেয়ে আর তাকেই...

রামহরি ভট্টাচার্য চলেই যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে বললেন—আমার গুপী মরে গিয়েছে মনে করো।

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে আঁতকে উঠলেন গৃহিণী। বললেন—কার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছো?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, জাত, কুল, বংশ দেখে তবে কাজ করছি।

—পাত্রকে দেখেছো তো ভালো করে? আমার যে ভয় করছে গো?

বাইরে যেন তখন হঠাৎ ঝড়ের গর্জন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু হলো। রামহরি ভট্টাচার্য সেই ঝড় উপেক্ষা করেই বেরিয়ে গেলেন। বাইরে শাঁখের শব্দ হলো। ঘণ্টা বাজলো। মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ এল। মহা আশঙ্কার মধ্যে ব্রাহ্মণী রাত কাটালেন। শেষ রাত্রের দিকে ফিরে এলেন রামহরি ভট্টাচার্য। জবাকে কোলে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তার সিঁথিতে সিঁদুর। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে এতটুকু কাঁদেনি। সমস্ত অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত মেয়ে চুপ করে ঘুমিয়ে ছিল রামহরির কোলে।

তারপর দিন কোথায় গেল পাত্র! আর কোনো সংবাদ নেই কারো।

রামহরি বলতেন—আমি আমার কর্তব্য করেছি—আমার নাতনীকে তো আমি বেম্মর হাতে তুলে দিতে পারিনে।

গল্প শুনতে শুনতে ভূতনাথ অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বললে—তারপর?

জবা বললে—তারপর আর নেই। বাবা বললেন—এ ঘটনার কথা ঠাকুমা বাবাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন—কিন্তু বাবার তখন আর কিছু করবার নেই। বাবা বললেন—সে-বিবাহ অসিদ্ধ বলেই আমি মনে করি, তোমার অনুমতি গ্রহণ না করে যে-বিবাহ, তা কখনও সিদ্ধ হতে পারে না।

ভূতনাথ বললে—তারপর?

বার-শিমলের রাস্তায় তখন আরো অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। শেয়ালদা স্টেশনের দিকে একটা মালগাড়ি বুঝি ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তারস্বরে হুইশিল দিচ্ছে বার বার। সমস্ত পটভূমিকার শুচিতা বুঝি খান-খান করে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। ভূতনাথের মনে হলো—লক্ষ যোজন দূরের একটি ঘুমহারা তীর যেন রুদ্ধনিঃশ্বাসে ছুটে আসছে বর্তমানকে লক্ষ্য করে। জবার সমস্ত শান্তি নষ্ট করবে সে। কোন্ অলক্ষ্য তীরন্দাজের অব্যর্থ লক্ষ্য বুঝি আর ব্যর্থ হবে না। ভূতনাথের সমস্ত শক্তিকে অগ্রাহ্য করে সে সর্বনাশের শেষ পর্যায়ে নামিয়ে দেবে জবাকে।

জবা বললে—বাবা আরো বললেন—আজ যাবার দিন আর গোপন রাখতে পারলাম না মা, আমার সত্য-বিশ্বাস-বোধে অনেকদিন এ-কথা বেধেছে, তাই কাউকেই বলিনি—কারোর কাছেই প্রকাশ করিনি—তোমার মাকেও না, তিনি তো বললেও বুঝতে পারতেন না—কিন্তু তোমাকে শেষ পর্যন্ত না বলে পারলাম না, তোমার বয়েস হয়েছে, তুমিও নিজের বুদ্ধি দিয়েই বুঝবে মা যে, এ মিথ্যা—এ অসিদ্ধ।

জবা আবার বলতে লাগলো—শুনে আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন—তুমি সুপবিত্রকেই গ্রহণ করো মা—আমি আশীর্বাদ করছি।

আমি তবু কোনো কথা বললাম না। বাবার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে এল। তিনি অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। আমি তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। তিনি স্তিমিত হয়ে এলেন খানিকক্ষণের জন্যে। রাত শেষ হয়ে আসছিল। তারপর একবার আবার চোখ তুললেন। বললেন—সুপবিত্রকে তুমি গ্রহণ করবে তো মা?

বললাম—না।

বাবার চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে। আমার উত্তর শুনে হঠাৎ কিছু মুখ দিয়ে বেরোলো না তাঁর। তারপর বললেন—কিন্তু আমাকে তো তুমি ক্ষমা করবে মা?

আমি আর থাকতে পারলাম না। তাঁর বুকের ওপর মুখ রেখে চোখ মুছে নিলাম অজ্ঞাতে। আমার সেই তখনকার অবস্থার কথা আমি আজ আর বলতে পারবো না ভূতনাথবাবু, মনে হয়েছিল—মাথার ওপর সারা আকাশটা ভেঙে পড়লেও সে-যন্ত্রণা বুঝি এমন দুর্বিষহ নয়। কিন্তু তখন আমি সে-কথা কাকে বলবো, কে আমাকে বুঝবে? মনে হলো—সুপবিত্রকে আর আমার বাড়িতে আসতে দেওয়া উচিত নয়, যাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছি, তাকেই আজ দূর করে দিতে হবে—এ যে কী কষ্টের, কেমন করে বোঝাবো আপনাকে! বাবার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রইলাম। বাবা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও আর কিছু বললেন না আমাকে। খানিক পরে তাঁর বুকের মধ্যে যেন এক অস্বাভাবিক আলোড়ন শুরু হলো। বাবা ধীরে ধীরে তখন বলছেন—অসতো মা সদ্‌গময়ঃ, তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মৃত্যোর্মামৃতম্ গময়ঃ—ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ—হরি ওঁঃ!

—তারপর?

বার-শিমলের আকাশে তখন ট্রেনের আর্তনাদ কর্কশ হয়ে বাজছে, কোথায় বুঝি ট্রেনটা থেমে গিয়েছে মাঝপথে। স্টেশনে আসবার অনুমতি মেলেনি। বার-বার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে করুণ আবেদন জানাচ্ছে আর্তনাদ করে। ভূতনাথ চুপ করে রইল। তারও যেন সমস্ত যুক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। তবু জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

জবা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—সুপবিত্রর সঙ্গে যদি দেখা হয় আপনার, আপনি বলে দেবেন ওকে—ও যেন এ-রাস্তায় আর না আসে। আমার বাড়ির সামনে যেন অমন করে আর দাঁড়িয়ে না থাকে। আমি কষ্ট পাই—আমি ওকে ভুলতেই চেষ্টা করি।

—কিন্তু কেন? তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো, সে-বিয়ে তোমার সিদ্ধ?

জবা বললে--সে-কথার উত্তর তো বাবাকে আমি দিয়েছি ভূতনাথবাবু!

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখো তুমি।

—ভালো করে ভেবে দেখেছি ভূতনাথবাবু, দিনরাত ভেবেছি, এক-একবার মনে হয়েছে, সব বুঝি স্বপ্ন, স্বপ্নের মতো সব মিথ্যে, কিন্তু যখনি মনে পড়ে বাবার কথা তখনি আর অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিতে পারি না।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু তুমি তো ব্রাহ্ম! তুমিও কি হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করো?

—কিন্তু আমার ব্রাহ্ম হওয়াও যে পুরোপুরি সত্য নয় ভূতনাথবাবু, আমি মনেপ্রাণে যে হিন্দুই, হিন্দু-ঘরে আমার বিয়ে হয়েছে, আমি যদি আগে জানতে পারতাম এ-কথা, তা হলে অন্তত সুপবিত্রকে আর আসতে দিতাম না আমার বাড়িতে।

—আর তোমার স্বামী?

জবা বললে—তাঁর কথা আমি আর জানিনে, বড় হবার আগেই ঠাকুর্দা মারা গেলেন, ঠাকুমাও আগেই মারা গিয়েছেন. বাবা এখানে নিয়ে এলেন আমাকে, তারপর আর তাঁর খবর রাখা প্রয়োজন মনে করেননি বাবা।

—কিন্তু কোথায় তাঁর দেশ? কী তাঁর নাম, কোনো পরিচয়ই পাবার উপায় নেই আর?

—সে পরিচয় আছে, কিন্তু সে কথা ভাবতেও ভয় করে ভূতনাথবাবু, নতুন করে আবার জীবনকে শুরু করতে হবে। আমার সমস্ত আদর্শের সঙ্গে সংঘাত বাধবে পদে-পদে।

—কিন্তু তবে সে-পথে কেন পা বাড়াচ্ছো?

জবা বললে—কী জানি, কেন যেন মনে হয়, সেখানেই আমার সত্যিকারের পরিচয়, সেখানেই আমার সত্যিকারের আশ্রয়, আমার সংস্কার, আমার শিক্ষা, আমার মুক্তি আমার স্বামীর কাছে, বিধাতার সেই ইচ্ছেই বোধ হয় ছিল নইলে...

ভূতনাথ তবু বললে—যাকে জানো না, যাকে চেনো না, যার অবস্থার সঙ্গে তোমার অবস্থার, তোমার শিক্ষার হয়তো কোনো সঙ্গতি নেই—তাকে গ্রহণ করে সুখী হতে পারবে তো?

—আমার মন বলছে, সঙ্গতি না হোক, সামঞ্জস্য না থাক, তবু তাতেই আমার মঙ্গল, তাতেই আমার কল্যাণ। বাবার মুখেই শুনেছি—স্বাচ্ছন্দ্যটা বড় কথা নয়, কল্যাণটাই বড়। বাবা বলতেন—তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী কিন্তু মানুষ আপ্রাণ চেষ্টায় তবে মানুষ—এতদিন তো আরামই চেয়ে এসেছি ভূতনাথবাবু, পেলাম কই? এবার কল্যাণ চেয়ে দেখি পাই কি না।

—কিন্তু সত্যিই কি তুমি মনে করো জবা এ কল্যাণেরই পথ? মঙ্গলেরই পথ?

জবা বললে—এইটুকু জানি যে, শুধু আরামের মধ্যে কল্যাণ নেই। বাবা তাই তাঁর সমস্ত আরাম ত্যাগ করে কল্যাণের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু আরো একটা দিকের কথা ভেবে দেখেছো কি?

—কোন্ দিক?

—ধরো, তোমার স্বামী যদি ইতিমধ্যে আর একটা বিয়ে করে থাকেন—হতেও তো পারে, তোমার ধর্মান্তর গ্রহণের খবর পেয়ে তিনি হয়তো তোমার আশা ত্যাগ করেছেন।

জবা বললে—তা-ও যদি হয় তবু তাকেই আমি গ্রহণ করবো। যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁকে স্বীকার করতেই হবে—ততদিন তিনিই আমার স্বামী।

—তারপরও তুমি সুপবিত্রকে গ্রহণ করতে পারবে না?

—না, পারবো না। আমার সংস্কার, আমার শিক্ষা আমাকে বলে যে, বিয়েটা ধর্ম, ধর্মেরই অঙ্গ। বিয়েটা তুচ্ছ বিলাসিতাও নয়, লোকাচারও নয়।

—কিম্বা যদি দেখো তোমার স্বামী দরিদ্র কিম্বা লম্পট।

—তবু তিনি তো আমার স্বামী।

—কিন্তু যদি তাঁর অকালেই মৃত্যু হয়ে থাকে?

জবা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বললে—হিন্দুধর্মের বিধান ছিল সে-ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে, কিন্তু কুলীনের ঘরে নয়, মৌলিকের সঙ্গে। সে-মেয়েকে বলা হয়... কিন্তু আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি তো সব অবস্থার জন্যেই তৈরি হয়ে আছি ভূতনাথবাবু!

ভূতনাথ বললে—তবু তো খোঁজ নেওয়া দরকার।

—আপনি খোঁজ করবেন?

ভূতনাথ বললে—আমি তোমায় বলেছিলাম জবা, তোমার যদি কোনোদিন কোনো উপকার করতে পারি, তা হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো—আজ আমার সেই সুযোগ এসেছে।

জবার চোখ দুটো সজল হয়ে এল। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল তেমনি করে। তারপর ধীরে ধীরে বললে—আপনার ঋণ জীবনে শোধ হবে না ভূতনাথবাবু।

ভূতনাথ বললে—সে কথা থাক, আমাকে তাদের ঠিকানাটা দিতে পারো?

জবা বললে—সে অনেক দূর ভূতনাথবাবু। কলকাতার বাইরে, কোন্ এক গ্রামে।

ভূতনাথ বললে—যতদূরেই হোক, আমি নিজে গিয়ে খবর নিয়ে আসবো—কিন্তু তাঁরা কি আর কোনো দিন তোমার খবর নেননি?

জবা বললে—বাবা বলেছিলেন পাত্রপক্ষের অমতে ঠাকুর্দা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বোধ হয় শুনেছিলেন আমরা ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছি, তখন আর খবর রাখবার প্রয়োজন মনে করেননি।

ভূতনাথ বললে—তবে কেন তুমি এত বিচলিত হয়েছো, এমন তো হতে পারে তারাই তোমাকে গ্রহণ করবেন না—তুমি বিধর্মী বলে।

জবা বললে—তবু তিনিই আমার স্বামী যে—স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ না করলেও স্ত্রীর যে অন্য কোনো গতি নেই।

ভূতনাথ বললে—তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবো না আমি, কিন্তু আমাকে তাদের ঠিকানাটা দাও।

জবা এবার উঠলো। উঠে ঘরের একপাশে কাঠের সিন্দুকটা খুলে একটা কাগজের টুকরো বার করলে। ভূতনাথের কাছে এসে বললে—এতেই ঠিকানা লেখা আছে, এ-চিঠি ঠাকুমা লুকিয়ে বাবাকে লিখেছিলেন।

অনেক বছর আগের চিঠি। ভাঁজে-ভাঁজে ছিঁড়ে গিয়েছে। শাদা কাগজ কালো হয়ে এসেছে। তবু স্পষ্ট বাঁকা-চোরা অক্ষর ডিঙিয়ে ভূতনাথ সমস্তটার পাঠোদ্ধার করলো। যে-ঘটনা এতক্ষণ বলেছে হুবহু সেই কাহিনী। শেষে পাত্রের নাম ঠিকানা লেখা। ভূতনাথ পড়লে—পাত্রের নাম—শ্রীঅতুল চক্রবর্তী, পিতার নাম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বভাব কুলীন—নিবাস ফতেপুর, পোস্টাপিস—গাজনা, জেলা—নদীয়া। পড়তে পড়তে ভূতনাথের হাতটা হিম হয়ে এল। মনে হলো—এ কার কাহিনী শুনছে সে! তাদেরই গ্রাম, তাদেরই পোস্টাপিস, তারই বাবার নাম। আর তার বাবার দেওয়া নাম—অতুল। বাবা মারা গিয়েছেন তার জ্ঞান হবার আগে। অল্প-অল্প মনে পড়ে বাবার কথা। বাবার সঙ্গে ঘুরতো সে। পিসীমা'র কাছেও শুনেছে। জমিদারির কাছারিতে কাজ করতেন বাবা আর ঘুরতেন গ্রামে-গ্রামে। তার বেশি আর কিছু মনে নেই। কিন্তু এ-ঘটনা কেমন করে তার জীবনে ঘটে গিয়েছে কেউ তো বলেনি। অথচ ভূতনাথ ছাড়া যে এ আর কেউ, সে-সন্দেহও করবার কারণ নেই। ও ঠিকানায় আর কে থাকবে! বাবার যে একমাত্র ছেলে সে!

আশ্চর্য হবার শক্তিও যেন চলে গিয়েছে ভূতনাথের। বিস্ময়ও নয়, আনন্দও নয়, দুঃখও নয়, অবসাদও নয়। এ-এক অপূর্ব অনুভূতি। কোথায় কেমন করে এ-সংবাদ এতদিন লুকিয়েছিল কে জানে! কোথায় কী ভাবে কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে সে এখানে এসে হাজির হয়েছিল, কে বলবে। কে বলবে এ সুসংবাদ না দুঃসংবাদ! সে কি অকপটে স্বীকার করবে নিজের পরিচয়! সে কি দাবি করবে তার ন্যায্য পাওনা! যা ছিল স্বপ্নের জিনিস তা-ই যখন সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে, তখন কি ত্যাগের মহিমা দেখিয়ে বিড়ম্বিত হবে সারা জীবন! অযাচিত এমন দান সে কি গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে! সে কি জবার সামনে এখনি স্বীকার করবে—এ নাম আমারই! এ ঠিকানা আমার—এ আমারই বাবার নাম! আমিই সেই অতুল! আমার বাবার দেওয়া নাম অতুল আর পিসীমা নাম দিয়েছিল ভূতনাথ।

জবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। সে-মুখে যেন কোনো বৈলক্ষণ্য নেই। কিন্তু আজ মনে হলো জবা যেন অনেক সুন্দরী। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন ওই মুখে এসে আশ্রয় নিয়েছে আজ। এতদিনের দেখা জবাকে যেন নতুন ঠেকছে আজ এই মুহূর্তে। এখন এ-জবা তার নিজের। এখনি জবাকে সে নিজের বলে দাবি করতে পারে। জবার ওপর তার যেন বহুদিনের অধিকার। শুধু অধিকার নয়। অধিকারের চেয়েও বেশি কিছু। জন্মজন্মান্তরের পরিচয়ে তাদের দু'জনের যেন হৃদয় বিনিময় হয়ে গিয়েছে। যেন বহুযুগ ধরে জবাই তার সঙ্গিনী হয়ে বার-বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে! আরো বহু যুগ ধরে বার-বার জন্মগ্রহণ করবে।

বড় ভালো লাগলো ভূতনাথের। ভালো লাগলো জবার সান্নিধ্য। আজ এ সান্নিধ্যে যেন কোনো অন্যায় নেই, কোনো অনুতাপ নেই। এই ভালো লাগা আজ আর অপরাধ নয়। এতদিন মনের যে প্রবণতাকে সে সযত্নে গোপন করে এসেছে, তার শিক্ষা, তার ধর্ম দিয়ে তাকে অগোচরে রেখেছে, আর তার প্রয়োজন নেই। সে-প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। আজ সে সগৌরবে বিশ্বসংসারকে তা জানিয়ে দিতে পারে, ঘোষণা করতে পারে ছাদের চূড়োয় উঠে নিজের সৌভাগ্যের কাহিনী।

কখন যে ভূতনাথ বার-শিমলে থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিল তার খেয়াল ছিল না। সমস্ত অন্ধকার রাস্তাটাতে সে নিজের এই অবস্থার কথাতেই মগ্ন ছিল।

বেরোবার সময় জবা বলেছিল—আবার কবে আসবেন?

ভূতনাথ বলেছিল—এ খবরটা নিয়ে আসবো একদিন।

—আপনি কি ওদের দেশে যাবেন?

—ও তো আমাদেরই দেশ।

জবাও যেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এক আশ্চর্য কৌতূহলে সমস্ত মুখখানা ভাস্বর হয়ে উঠেছে যেন। বলেছে—আপনাদের বাড়িও কি ওখানে?

—শুধু বাড়ি নয়, এক দেশ, এক পোস্টাপিস, এক গ্রাম, এক পাড়া—একই... বলতে গিয়েছিল—একই নাম। বলতে গিয়েছিল—ভূতনাথ আর অতুল নাম একই লোকের। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে ভূতনাথ ঠিক সময়ে। হঠাৎ তাড়াতাড়ি কিছু করে ফেলা ভালো নয়। একটু ভাববে সে। নিরিবিলিতে তার চোরকুঠুরির তক্তপোশটার ওপর শুয়ে-শুয়ে সে ভাববে। ভাববে—এ কেমন করে সম্ভব হলো, কোথা থেকে কোন্ অদৃশ্য ঈশ্বরের ইঙ্গিতে এ সম্ভব হলো তার জীবনে! এ তাঁর আশীর্বাদ না অভিসম্পাত।

কলকাতার রাস্তা তখন জনহীন। শুধু এক বার যেন মনে হলো সেই আলোয়ান-গায়ে লোকটা দূর থেকে তার পেছনে পেছনে আসছে। তাকে অনুসরণ করছে। অদ্ভুত লোকটা। যেখানে গিয়েছে ভূতনাথ, সেখানেই তাকে অনুসরণ করে। কিন্তু হঠাৎ সোজা হয়ে থমকে দাঁড়ালো ভূতনাথ। আজ যেন তার সাহস ফিরে এল। আজ—কি জানি কেন—তার যেন বিশ্বসংসারে কাউকে আর ভয় করবার কথা নয়। আজ যেন সে যে-কোনো বিপদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

বনমালী সরকার লেন-এর মুখে এসে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ একবারে সোজাসুজি লোকটার দিকে মুখোমুখি হয়ে রইল। কাছে এলেই ভূতনাথ জিজ্ঞেস করবে—কে তুমি? কি চাও? কেন আমার পেছনে ঘোর দিনরাত? কী তোমার মতলব?

কিন্তু আশ্চর্য! লোকটা তাকে থামতে দেখেই পাশের একটা গলির ভেতর আত্মগোপন করে গিয়েছে।

ভূতনাথ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে তেমনি ভাবে। নরহরি মহাপাত্রের দেবতাগুলো যেখানে ছিল সেখানে সেই অশ্বত্থ গাছটা আর নেই এখন। একদিন ঝড়ে বেদীসুদ্ধ শেকড় উপড়ে পড়ে গিয়েছিল। ভূতনাথ গলির ভেতর ঢুকে সেইখানে দাঁড়িয়ে আবার পেছন ফিরে দাঁড়ালো। লোকটা যেন গলির মুখে এসে দাঁড়ালো এক বার। তারপর ভূতনাথকে দেখেই সরে পড়লো আবার। ভূতনাথ ভাবলে—দূর হোক ছাই—ও নিশ্চয়ই স্পাই।

নিবারণ বলতো টিকটিকি। তা টিকটিকিই বটে। কয়েকবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু নিবারণের সঙ্গে কথা বলেছে ভূতনাথ। তাতেই তার ওপর সন্দেহ। নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে গুলী করে মারার পরদিন থেকেই ওদের যেন দৌরাত্ম্য বেড়েছে। রাস্তায় বাড়িতে কোথাও শান্তি নেই।

নিবারণ বলেছিল—ম্যাট্রিকুলেশনে ব্রিটিশ-হিস্ট্রি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে জানেন?

ভূতনাথ জানতো না। বললে—কেন, আমাদের সময়ে তো পড়েছি?

নিবারণ বললে—বেকার সাহেব আর ফুলার সাহেব ভাবলে ওই ব্রিটিশ-হিস্ট্রি পড়েই বুঝি আমাদের মাথা বিগড়ে গিয়েছে। ম্যাগনা কার্টা, স্টুয়ার্ট রাজাদের কাণ্ড, হ্যাম্পডেন, ক্রমওয়েল, চার্লস ফার্স্ট এ-সব কথা হিস্ট্রি পড়েই তো জেনেছি—কিন্তু হলে কী হবে, বন্ধ করার পর থেকে যারা হয়তো কখনও পড়তো না, তারাও পড়তে আরম্ভ করেছে।

ভূতনাথের মনে আছে অত কাণ্ড করেও তবু কিছু সুরাহা হয়নি। কালীঘাটে যেদিন কেওড়াতলাতে পোড়াতে নিয়ে এসেছিল কানাই দত্তকে, সে কী ভিড়! পঞ্চাশ হাজার লোক রাস্তায় ভিড় করে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটু দেখবে বলে। নরেন গোঁসাইকে খুন করার জন্যে ফাঁসি হয়েছিল দু'জনের—কানাই দত্ত আর সত্যেন বোস। ভিড়ের ভয়ে সত্যেন বোসকে জেলের মধ্যেই পোড়ানো হয়েছিল। অত ভিড় এক জায়গায় জীবনে কখনও দেখেনি ভূতনাথ। স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন সেই একদিন শেয়ালদা স্টেশনে, সে ছিল এক ভিড়, তারপর পার্শিবাগানে সেই আনন্দমোহন বোসের সভার ভিড়, আর তারপর এই ভিড়। এ-ভিড়

যেন সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

পাশের কোন্ বাড়িতে ঢং-ঢং করে অনেকগুলো বেজে গেল। রাত অনেক হয়েছে। আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই। পকেট থেকে চাবি বার করে বড়বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লে ভূতনাথ।

সকালবেলা দুম-দুম করে কে যেন দরজা ঠেলছে। দরজা খুলে ভূতনাথ দেখলে—বংশী।

—কাল আপনি কত রাত্তিরে এলেন শালাবাবু, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার পায়ে ব্যথা ধরে গেল। একি আপনার চোখ যে লাল হয়ে রয়েছে। ঘুম হয়নি বুঝি?

ঘরের কোণে এঁটো বাসনগুলো এক হাতে তুলে নিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিলে বংশী। বললে—কাল বড় ভাবনায় পড়েছিলাম আজ্ঞে, আদালতের সমন এসেছিল, ছোটবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম, ছোটবাবু পড়ে বললে—মেজবাবুর কাছে নিয়ে যা—তা এক হাতে সব কাজ তো করতে হয়, সব কাজ সেরে মরতে-মরতে গেলাম গরাণহাটায়—গিয়ে দেখালাম মেজবাবুকে—মেজবাবুর কী মেজাজ কী বলবো, বলে—আমার দেখার কী দরকার, বাড়ি আমি ছেড়ে দিয়েছি, ওরা যা ইচ্ছে করুক—বাড়ি আমার চাইনে।

আমি বললাম—ছোটবাবু যে আপনার কাছে আনতে বললে হুজুর?

মেজবাবু বললে—তা আমার কাছে এনে কী হবে? আমি কি বাড়িতে বাস করি?

মেজবাবুর পায়ে হাত দিয়ে বললাম—তা ছোটবাবুর তো এই অবস্থা, এখন কেমন করে বাড়ি ছাড়ে?... বিবেচনাটা দেখুন একবার মেজবাবুর।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

—তারপর গেলাম সেই পাথুরেঘাটায়। ছুটুকবাবু তো ননীলালবাবুর বন্ধু ছিল। ননীবাবুকে এক কালে কত আসতে দেখেছি এ-বাড়িতে। ছুটুকবাবুর কথায় যদি ননীবাবু কিছু করে! তা গিয়ে দেখা হলো না—ছুটুকবাবু কাজে বেরিয়েছে।

—কী কাজ? ছুটুকবাবু আবার কি কাজ করছে আজকাল?

বংশী বললে—আমি তার কি খবর রাখি কিছু? ওদের সরকারই বলেছে ছুটুকবাবু নাকি উকিল হয়েছে। আদালতে যায় রোজ।

—ছুটুকবাবু উকিল হয়েছে? শেষকালে কি উকিল হলো নাকি?

বংশী বললে—তাই আপনাকে খুঁজছিলাম আজ্ঞে, আপনি যদি ছুটুকবাবুকে গিয়ে ধরেন, তো ননীবাবুকে বলে মামলা তুলিয়ে নেয়। মামলা হলো বড়বাড়ির বাবুদের নামে, তা বাবুরা তো সবাই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, শুধু ছোটবাবু আর ছোটমা আছে, কী করে বাড়ি ছাড়ে হুজুর, শরীরের যা অবস্থা তাতে কোথায়ই বা যাবে, এখনও ধরে বসিয়ে মুখ তুলে খাওয়াতে হয় যে!

ভূতনাথ আবার চুপ করে রইল। খানিক পরে বললে—আমি যে কাল দেশে যাচ্ছি রে!

—দেশে? দেশ-এর কথা শুনে বংশীও অবাক হয়ে গিয়েছে। শালাবাবুও দেশ-এ যাবে!

—দেশ-এ যে কেউ নেই বলেছিলেন?

—তবু যাবো একবার দেশে, পুরনো বাড়িটা তো আছে, এতদিনে হয়তো জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে, হয়তো বাঘ এসে উঠেছে ভিটেয়।

বংশী ভয়ে চোখ বড়-বড় করে রইল। বললে—এ-সময়ে আপনি গেলে চলবে কী করে শালাবাবু, দু'দিন পরে গেলে চলে না?

—না। মামলা কবে?

বংশী বললে—কাল।

ভূতনাথ চুপ করে রইল। বংশী আবার বললে—কাল না হয় না-ই গেলেন শালাবাবু।

ভূতনাথ এবারও চুপ করে রইল। কী-ই বা সে করতে পারে!

বংশী আবার বললে—আমি কিন্তু আপনার কথা বলেছি ছোটবাবুকে।

—ছোটবাবুকে? কেন?

—আজ্ঞে, ছোটবাবু বড় মুষড়ে পড়েছে, আমি কাল ছুটুকবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে বললাম—কিছু ভাববেন না ছোটবাবু, শালাবাবু লেখাপড়া জানা লোক, সব তিনি করবেন। তা আপনি একবার যাবেন আজ দেখা করতে ছোটবাবুর সঙ্গে?

—ছোটবাবুর সঙ্গে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দোষ কী, যে-বিপদে পড়েছেন, আমরা না দেখলে কে দেখবে বলুন তো!

ভূতনাথের তেমন ইচ্ছে ছিল না। তবু বললে—তা চল।

বংশী বললে—আপনি একটু সবুর করুন, আমি সকড়ি বাসন ক'টা রেখে আসি।

আজও মনে আছে দুপুরবেলার বড়বাড়ির সেই বিগত-শ্রী চেহারা দেখে চোখে তার জল এসেছিল সেদিন। ছাদের ওপর অসংখ্য পায়রা এসে বাসা করেছে। কে তাদের খেতে দেয়, কে তাদের দেখাশোনা করে কে জানে। একদিন এই পায়রা নিয়েই কত মামলা হয়ে গিয়েছে ঠন্‌ঠনের ছেনি দত্তর সঙ্গে। কত পয়সা খরচ হয়েছে এদের খাওয়াতে, পুষতে। ভৈরববাবু ভালো শিস্ দিতে পারতো। সেই শিস্ শুনে কলকাতার আকাশে মেজবাবুর পায়রা একদিন বুক ফুলিয়ে উড়েছে।

সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। বাড়িটা তিন ভাগে ভাগ হচ্ছিলো। ভালো করে ভাগ হওয়ার আগেই সবাই আলাদা আলাদা হয়ে গেল। পাঁচিলগুলো পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। বালির কাজ হয়নি শেষ পর্যন্ত। ইটের ফাঁকে-ফাঁকে শ্যাওলা গজিয়েছে। কতরকম বুনো গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ফাটলে-ফাটলে। কতরকম ফুল ফুটেছে গাছগুলোতে। বিচিত্র বুনো ফুল। হলদে, লাল, নীল। রান্নাবাড়ির এঁটো-কাঁটা এসে জমে পাঁচিলের কোণে। বংশী একা সব ঝাঁট দিতে পারে না।

একটা চিল হয়তো নির্মেঘ আকাশে গোল হয়ে ওড়ে। মাঝে-মাঝে কর্কশ ডাক ছাড়ে। সে-শব্দ এখান থেকে শোনা যায়। তারপর কখন বেলা পড়ে আসে, ছায়াটা আস্তে-আস্তে বড় হয়, আর তারপর এক সময় রোদের শেষ আভাটুকু পর্যন্ত মুছে যায় পৃথিবী থেকে। তখন শশীডাক্তারের গাড়িটা এসে হয়তো লাগে গাড়ি-বারান্দার নিচে। শশীডাক্তার লাঠিতে ভর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় ওপরে। বংশী পেছন-পেছন ওষুধের বাক্সটা বয়ে নিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

আজও মনে আছে ছোটবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে ভূতনাথ সেদিন খুব চমকে উঠেছিল। প্রথমে ইচ্ছেই ছিল না ভূতনাথের। কখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা তো বলেনি ছোটবাবুর সঙ্গে। কিন্তু বংশীর পীড়াপীড়িতে আর না বলতে পারেনি।

বংশী বলেছিল—আপনি বলবেন শালাবাবু যে, আপনি সব ব্যবস্থা করবেন—কোর্টে-কাছারিতে ঘোরাঘুরি আপনিই করবেন, ছোটবাবু যেন কিছু না ভাবেন।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু আমি যে দেশে যাচ্ছি কাল।

—সে কথা আর বলবেন না হুজুরকে, মনে বড় কষ্ট পাবেন।

ভূতনাথ বললে—আমাকে কি চেনেন ছোটবাবু?

—চেনেন না, কিন্তু আমি বলেছি আপনার কথা, বলেছি যে মাস্টারবাবুর শালা, এ-বাড়িতে অনেকদিন আছেন। শুনে চুপ করে রইলেন, বেশি তো কথা বলেন না আজ্ঞে, বেশি কথা কোনোদিনই বলতেন না, এদানি তা-ও ছেড়ে দিয়েছেন। চুপচাপ বসে চোখ বুজে কেবল ভাবেন, কী যে মাথা-মুণ্ডু ভাবেন কে জানে?

ঘরের সামনে গিয়ে প্রথমে বংশী এগিয়ে গেল। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে হাতছানি দিয়ে একবার ডাকলে ভূতনাথকে। ভূতনাথ সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

হাতির দাঁতের কাজ করা একটা পালঙ। মোটা পুরু গদীর ওপর বিছানা পাতা। সামনে শ্বেত-পাথরের ছোট টেবিলের ওপর ওষুধের শিশি-বোতল। পাথরের খল-নুড়ি। ঘরময় একটা বিষণ্ণতা। অনেকদিন ওষুধ আর অসুখের গন্ধ জমে-জমে ঘরের হাওয়া যেন বিষিয়ে উঠেছে। ঘরে ঢোকবার মুখে একটা তীব্র কটু গন্ধ নাকে লাগে। দেয়ালের পঙ্খের-কাজ-করা ফুল লতাপাতাগুলো পর্যন্ত

ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে গিয়েছে।

ছোটকর্তার গায়ে মলমলের পাঞ্জাবী একটা। কিন্তু ভাঁজে-ভাঁজে আগেকার সে-বাহার নেই আর। ময়লা হয়ে গিয়েছে পরে-পরে। অনেকদিন দাড়ি কামানো হয়নি। দেয়ালের গায়ে বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসেছিলেন ছোটকর্তা। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন।

ভূতনাথ যেতেই বংশী বললে—এই যে শালাবাবু এসেছেন—যার কথা বলছিলাম ছোটবাবু।

ছোটকর্তা ঘাড় ফেরালেন। ভূতনাথ দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করলে।

ভূতনাথের মনে হলো—সেই ছোটবাবু, যার সামনে বেরোতে ভয় করতো। কী বিরাট চেহারা ছিল! রাশভারী মানুষ। বংশীকে মারতে-মারতে একদিন প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন। কেমন যেন মায়া হলো ভূতনাথের। অনেকদিন আগেকার একটা বটগাছের কথা মনে পড়লো ভূতনাথের। মঙ্গলচণ্ডীতলার পাশে একটা বিরাট বটগাছ ছিল ফতেপুরে। চার-পাঁচ পুরুষের গাছ। ডালপালা বেড়ে-বেড়ে সমস্ত বারোয়ারিতলাটা একেবারে ছেয়ে ফেলেছিল। একদিন ঝড়ের রাত্রে সেই গাছটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল। গাঁ সুদ্ধ লোক ভোরবেলা ভিড় করে দেখতে গেল। বিরাট গাছ প্রায় এক কাঠা জমি উপড়ে নিয়ে পড়েছে। কাছে গিয়ে কিন্তু সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে। গাছ নয় তো বিরাট বনস্পতি বললেই চলে।

তারক স্যাকরা একটা কুড়ুল নিয়ে কোপ মারতে যাচ্ছিলো। নন্দজ্যাঠা থামিয়ে দিলে। বললে—খবরদার—

ভূষণকাকাও বললে—কেউ কাটতে পারবে না—মা মঙ্গলচণ্ডীর গাছ।

মল্লিকদের তারাপদ বললে—ও গাছ নদীতে ফেলে আসাই ভালো কাকা।

নন্দজ্যাঠা প্রবীণ লোক। বললে—না, যেমন আছে তেমনি থাক। মায়ের গাছ, মা যা ইচ্ছে করবেন তাই হবে।

মঙ্গলচণ্ডীর কী ইচ্ছে হলো কে জানে! সেই গাছ সেখানেই পড়ে রইল। লোকে মায়ের পুজো দিতে এসে ভাঙা গুঁড়িটাতেও সিঁদুর লাগিয়ে দিয়ে যায়। ষষ্ঠীপুজোর দিন দলে দলে মেয়েরা আসে। পুজো দেয় মাকে। আর জল ঢালে গুঁড়িটার ওপর। কতকাল এমনি করে কেটে যায়। ফাটলের গর্ততে ক্রমে মাটি জমে তার ওপর আগাছা জন্মালো। সেই আগাছাই বড়-বড় হয়ে একদিন ঢেকে দিলে সমস্ত গুঁড়িটাকে। চড়কের মেলার সময় সেখানটা ঘিরে জলসত্র হতো। আবার মেলার শেষে অন্ধকার রাত্রিতে কেউ মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দিতে এসে গুঁড়িটাকেও প্রণাম করে যেতো। কিন্তু ভূতনাথের বড় ভয় করতো গুঁড়িটাকে দেখলে। মনে হতো ওখানে যত রাজ্যের সাপ-খোপ যেন বাসা বেঁধে আছে।

কিন্তু মনে আছে বহুদিন পরে যেবার বাঘের উপদ্রবের ভয়ে জঙ্গল কাটার হিড়িক পড়লো ফতেপুরে, দেখা গেল, সে-বটগাছের চিহ্নও নেই। কবে মাটি হয়ে সব শেষ হয়ে গিয়েছে, শুধু বড়-বড় গাছ সেই জায়গায় জন্মে এতদিন আড়াল করে রেখেছিল সেটাকে।

ছোটবাবুর দিকে চেয়ে দেখতে-দেখতে সেই কথাই ভূতনাথের মনে পড়লো প্রথমে।

বংশী বললে—শালাবাবু রয়েছেন, আদালতে যাওয়া, তদ্বির-তদারক করা, সবই করবেন উনি। আপনি ভেবে-ভেবে শরীর খারাপ করবেন না আজ্ঞে।

ছোটবাবু শুনে কিছু বললেন না। শুধু মুখ দিয়ে শব্দ করলেন—হুম!

কী গম্ভীর শব্দ। মনে হলো যেন সঙ্গে-সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়লো তাঁর।

বেরিয়ে এসে বংশী বললে—দেখলেন তো শালাবাবু, কী মানুষ কী হয়েছে!

ভূতনাথ কিন্তু কিছুই শোনেনি। শুধু দেখেছে ছোটকর্তাকে। আর মনে পড়েছে ফতেপুরের সেই বটগাছটার কথা! একদিন কত পাখী আশ্রয় নিয়েছিল তার ডালে-ডালে। বর্ষাকালে কত রকম পাখী আসত ফল খেতে। তারপর যখন টলে পড়লো তখনও যেন সজীব। গাছে আগাছায় ভরে যখন জায়গাটা আবার ঢেকে গেল, তখনও যেন ভূতনাথ বটগাছটার কথা ভুলতে পারেনি।

বংশী বলেছিল—ছোটমা আপনার ওপর খুব রাগ করেছেন আজ্ঞে।

—কেন রে?

বংশী বললে—আপনি বলেছিলেন, বরানগরে নাকি একদিন যাবেন সঙ্গে করে। ভূতনাথ থমকে দাঁড়ালো একবার। বললে—আজ আর যাবো না রে, দেশ থেকে ফিরে একদিন নিয়ে যাবো, বলিস ছোটমাকে।

বংশী বললে—কিন্তু ছুটুকবাবুর কাছে একবার যাবেন না?

দুপুরবেলা ছুটুকবাবু কোর্টে যায়। কোর্ট থেকে ফিরতে রাত হয় নিশ্চয়ই। ছুটুকবাবুর একটা চিঠি নিয়ে গেলে হয়তো কাজ হতে পারে। ম্যানেজারের কাছে শোনা ছিল সেদিন। এলগিন রোড-এর বাড়িতে কেউ থাকে না আজকাল। ননীলালের শাশুড়ি থাকেন পটলডাঙায়। তাকে যদি কোনো রকমে ধরা যায় তবে কাজ হতে পারে?

ভালোই হয়েছে। ভূতনাথের একবার মনে হয়—হয়তো ভালোই হয়েছে। এরও হয়তো প্রয়োজন ছিল। যখন দক্ষিণ দিক থেকে ঝাপ্‌টা এসে জানলা-দরজায় লাগে, একটা অদ্ভুত শব্দ হয় বাতাসের! থর-থর করে কেঁপে ওঠে সমস্ত। মনে হয় বদরিকাবাবু যেন আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে। ভূতনাথ দুই হাত দিয়ে কান দুটো বন্ধ করে। বড় কষ্ট হয় শুনতে। বদরিকাবাবুর হাসিতে যেন পৈশাচিক একরকম উল্লাস আছে। মনে হয়, ও শুনতে না পেলেই যেন ভালো। এক-একদিন আর সহ্য হয় না। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ভূতনাথ। দোকানপাট আলো লোকজন দেখে সব আবার ভুলে যেতে চেষ্টা করে।

তবু পটলডাঙায় ননীলালের বাড়ির সামনে গিয়ে কেমন সঙ্কোচ হতে লাগলো। কাল দেশে চলে যাবে ভূতনাথ। আজকে একবার শেষ চেষ্টা করা দরকার।

এ-বাড়িতে ননীলালের সঙ্গে আগে অনেকবার এসেছে। কিন্তু ননীলাল ছাড়া আর কারো সঙ্গে তো পরিচয় নেই তার। কাকে ডাকবে? কার কাছে আবেদন-নিবেদন জানাবে তার?

ছুটুকবাবুর কাছেও গিয়েছিল ভূতনাথ। এমন চেহারা দেখবে ছুটুকবাবুর ভাবতে পারা যায়নি। কালো কোট গায়ে। পুরোপুরি উকিলের পোশাক। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলো।

—এই যে ভূতনাথবাবু, রেওয়াজ কেমন চলছে আজকাল?

ছুটুকবাবুর গালে যেন আরো মাংস লেগেছে। পা-ও ভারি হয়ে গিয়েছে। হাঁটতে কষ্ট হয় বেশ। এসে ধপাস করে বসে পড়লো চৌকির ওপর। সব শুনে বললে—সে হলে তো খুব ভালোই হতো—কিন্তু হচ্ছে কী করে?

ভূতনাথ বললে—ননীলালকে যদি একটা চিঠি লিখে দেন আপনি, তা হলে সে আর 'না' করতে পারবে না।

—ননীলাল!

ভূতনাথ বললে—ননীলালই তো মালিক—সে বললে সব হবে।

ছুটুকবাবু বললে—কিন্তু ননীলাল তো আর কলকাতায় নেই এখন, সে তো বাইরে।

—তা সেখানেই একটা চিঠি লিখে দিন।

ছুটুকবাবু কী যেন ভাবলে একবার। তারপর বললে—মামলা তো কাল। ওদিকে চিঠি যেতে এক মাস, আর আসতে এক মাস—সে কি এখেনে? দু'মাসের আগে তো আর তার উত্তর আসছে না।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ননীলাল আসছে না কেন?

ছুটুকবাবু বললে—সে তো আর ফিরে আসবে না, জানেন না বুঝি?

—ফিরে আসবে না, সে কী?

—না, সে সেখানে মেম বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে, সে আর আসবে

না—এখানে খবরও দিয়েছে। সেখানেও ব্যবসা-ট্যাবসা শুরু করে দিয়েছে নাকি শুনেছি। তুখোড় ছেলে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিল ওর আদর্শ—বর্ণে-বর্ণে সব তাকেই 'ফলো' করছে।

ভূতনাথ কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল খানিকক্ষণ। কোথায় সেই কেষ্টগঞ্জের ডাক্তারের ছেলে ননীলাল! তার সেই চিঠিখানা বোধ হয় এখনও আছে ভূতনাথের টিনের বাক্সে। শেষ পর্যন্ত যে ননীলালের এমন পরিণতি হবে, কে জানতো! অবাক লাগে ভাবতে। এখানেই তো সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতো। অত বড় বাড়ি করেছিল এলগিন রোড-এ। অত জুট মিল! অত কয়লার খনি! অত লোক-জন, অত আয়, অত খাতির! এতেও বুঝি তৃপ্তি হলো না তার। ননীলালদের বুঝি কিছুতেই তৃপ্তি নেই।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ওর এখানকার কারবার কে দেখছে তাহলে?

—ওর শালারা, চালু করে দিয়েছিল ননীলাল। এখন চলবে না কেন? না-চলবার কী আছে?

কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যায় কে বলতে পারে। ননীলালের খবর শুনে ঠিক অবিমিশ্র আনন্দ যেন হয় না। কোথায় যেন একটু বেদনা লুকিয়ে থাকে। ঠিক প্রকাশ করে বলা যায় না কেন অমন হয়। অথচ ননীলালের এ-গৌরবে ভূতনাথের তো আনন্দ হবারই কথা।

ছুটুকবাবুর কাছ থেকে কোনো সাহায্যের আভাস না পেয়ে ভূতনাথ নিজেই এসে পটলডাঙার বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছে। বাড়িটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখলে। কোথাও কারোও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। দারোয়ানকে ডেকে বললে—বাড়িতে বাবুরা আছে?

—কোন্ বাবু? ছোটবাবু না বড়বাবু?

—যে-কোনো বাবু।

দারোয়ান বললে—এই কাগজটাতে নাম-ঠিকানা দিখে দিন, ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখাবো বাবুদের।

কাগজে ভূতনাথ নিজের নাম আর বড়বাড়ির ঠিকানা লিখে দিলে।

দারোয়ান কাগজ নিয়ে ভেতরে চলে গেল। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ভূতনাথকে। মনে হলো—বৌঠানের জন্যেই এই চেষ্টা। নইলে বড়বাড়ির জন্যে ভূতনাথের কিসের মাথাব্যথা? আজ যদি মামলার ফলে বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়, কোথায় যাবে বৌঠান! অথচ আশ্চর্য, বৌঠান বোধ হয় সে-কথা একবার ভাবেও না। বংশীর কাছে শুনেছে আজও নাকি তেমনি তেতলার ঘরখানার মধ্যে পালঙে বসে বৌঠান যশোদাদুলালের পুজো দেয়, আলতা পরে, ঘুমোয়, চিন্তার সঙ্গে গল্প করে আর একটা-একটা করে গয়না তুলে দেয় বংশীর হাতে।

বংশী বললে—সমস্ত সিন্দুক প্রায় খালি হয়ে গিয়েছে শালাবাবু!

ভূতনাথ বলেছিল—তুই কেন এনে দিস বংশী?

বংশী বলে—ভুবন স্যাকরা তো সন্দেহ করে আমাকে, জানেন, ভাবে বুঝি চোরাইমাল৷ সেদিন আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছিলো হুজুর। আমি বললাম—চোরাইমাল যদি হবে তো রোজ রোজ এত চুরি করবো কোত্থেকে?

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—এখন কতখানি করে খায় রোজ?

বংশী বলে—বাড়ছে হুজুর, দিন-দিনই নেশা বাড়ছে যেন, এখন সকালে একবোতল আনি দেখি বিকেলের মধ্যে সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে—আবার আজকাল দামী-দামী মদ আনতে বলেন—আমি প্রথম-প্রথম আনতুম না আজ্ঞে, কিন্তু বুঝতে পারি, বড় কষ্ট হয় ছোটমা'র, না-খেলে শরীর খারাপ হয়, কিছু খেতে পারে না, ঝিমোয় সারাদিন—ঝিম মেরে থাকেন। আমার নিজেরই তখন কষ্ট হয়, ভাবি নেশা করে ফেলেছেন—ছোটমা'রই বা কী দোষ?

বংশী আবার বলে—সেজখুড়ি গজ-গজ করে সারাদিন, বলে—খাবে না যদি কেউ তো রান্না কিসের জন্যে—এত ভাত নষ্ট হলে গেরস্থের অকল্যাণ হয় যে। তা নেই-নেই যে এত—তার মধ্যেও কত কী যে রান্না হয় কী বলবো—ছোটবাবুর মুখের কাছে সব দিতে হবে। তেতো, ভাজা,

ডালনা, ডাল, ঝোল, অম্বল, সেই আগেকার মতন—দেখেছেন তো, কিন্তু মুখে পুরেই বলে—থুঃ থুঃ।

অথচ দেখুন মুদির দোকানে দেনা হয়েছে। সেদিন তাগাদা করছিল। ছ'মাস হয়ে গিয়েছে, এখনও শোধ হলো না, ওরা বলবেই তো—ছোটমাকে বললেই—সিন্দুক খুলে একটা কিছু-না-কিছু গয়না বার করে দিয়ে বলে—দিগে যা শোধ করে।

ননীলালের বাড়ির সামনে তা প্রায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হলো।

দারোয়ান এক সময়ে ফিরে এসে বললে—দেখা হবে না। বাবুদের সময় হবে না এখন।

ভূতনাথ কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। তারপর জিজ্ঞেস করলে—বাবুরা বাড়িতে আছেন?

দারোয়ান বললে—আছে, লেকিন মোলাকাত হবে না।

হবে না তো হবে না। বড়লোকদের বাড়িতে নিয়মই আলাদা। হয়তো বসে গল্প করছে নয় তো শুয়ে আছে। দেখা করলে কী এমন অসুবিধে হতো! দুটো মাত্র কথা। কতটুকু সময়ই বা লাগতো। কিন্তু দরকার নেই। যাদের সময়ের এত দাম, একদিন তারাই আবার সময় কাটাবার পথ খুঁজে পাবে না। একদিন চৌধুরীবাবুদের কী হাঁক-ডাক কম ছিল! সবাই তটস্থ। কোথায় গেল সব। দেখতে দেখতে কর্পূরের মতো উবে গেল তো! সুবিনয়বাবু বলতেন—ভোগই মৃত্যু, ত্যাগই হচ্ছে জীবন—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগ করে ভোগ করতে শেখা, এ ভারতবর্ষের নিজস্ব উপলব্ধি—এ আর কোনো দেশে খুঁজে পাবে না ভূতনাথবাবু।

কিন্তু ননীলাল কি চৌধুরীবাবুরা কেউ তো সে কথা মানেনি। আর ব্রজরাখালের কথাই তো আলাদা।

রাস্তায় বেরিয়ে সেদিন হঠাৎ বহুদিন বাদে প্রকাশ ময়রার দেখা হয়ে গেল। কাঁধে নতুন গামছা। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। চেহারাটাও যেন ভালো হয়েছে।

ভূতনাথকে দেখেই বললে—পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই।

ভূতনাথ বললে—তুমি এত রাত্রে কোথায় প্রকাশ?

—আরে ঠাকুরমশাই, ব্যবসাই বলুন, চাকরিই বলুন, পোষালো না, শেষকালে সেই ঘটকালি নিয়েই আছি এখন। কাল আপনাদের দেশে যাচ্ছি, একটা বিয়ে আছে, যাবেন নাকি?

ভূতনাথের কেমন যেন একটা প্রশ্ন উঠলো মনের ভেতর।

—আচ্ছা, প্রকাশ তুমি তো এ পর্যন্ত অনেক বিয়ে দিয়েছো কী বলো?

—তা দিয়েছি ঠাকুরমশাই, এই খাতাখানা খুললে পাকা হিসেব বলতে পারি আপনাকে।

হিসেব দেখতে সেদিন চায়নি ভূতনাথ। হিসেবের দরকারও ছিল না তার। শুধু বলেছিল—ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের বিয়ে কখনও দিয়েছো তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো সেদিন শ্রাবণ মাসে বেগমপুরের বিধু গাঙ্গুলীর ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলাম—মাত্র দু'বছর বয়েস।

—দু'বছর?

প্রকাশ দাস গল্প পেলে আর থামতে চায় না। বলে—দু'বছর তো ভালো আপনার দু'মাস বয়েসে বিয়ে দিয়েছি।

—দু'মাস বয়েস কনের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'মাস মাত্তোর—বাঁড়ুজ্জেমশাই বলেছিলেন, আমার দু'বছরের ছেলের জন্যে একটা পাত্রী দেখে দিতে পারো প্রকাশ? আমি বললাম—প্রেকাশের হাতে সব রকম পাত্তোর পাবেন বাঁড়ুজ্জেমশাই। তা তাই খুঁজে দিলাম, বাঁড়ুজ্জেমশাই খুব খুশি। খুব আয়োজন করেছিলেন আজ্ঞে, তিন রকমের মিষ্টি। চার রকমের মাছ, দু'রকমের ডাল, পাকা ফলার, কাঁচা কলা—সব রকমের ব্যবস্থা ছিল। বাঁড়ুজ্জেমশাইকে চেনেন না আপনি? —আপনাদেরই জেলার লোক তো?

প্রকাশ ময়রা সেই বিয়েরই গল্প করতে লাগলো। বলে—তবে শুনুন ব্যাপারটা—ভারি এক

মজার কাণ্ড—বলরামপুরের কালী মুখুজ্জের দুই মেয়ে ছিল, জানেন?

—বলরামপুর? বলরামপুর চেনো নাকি? ভূতনাথ সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছে।

—খুব চিনি। বলরামপুরে কালী মুখুজ্জের ছোট মেয়ের বিয়ে দিলাম আমি—তারই কাণ্ড তো বলছি।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বলরামপুরের রামহরি ভট্টাচার্যের নাম শুনেছো?

—রামহরি ভট্টাচার্যি? দাঁড়ান, খাতা খুলতে হবে—বলে সত্যি-সত্যিই খাতা খুলতে গেল প্রকাশ।

ভূতনাথ বললে—না, না, খাতা খুলতে হবে না এখন, তার বংশের কেউ আছে এখন জানো?

প্রকাশ বলে—খাতা না দেখে সে কি বলতে পারি ঠাকুরমশাই। আর এ-খাতায় যদি না থাকে তো অন্য খাতা দেখতে হবে, বংশতালিকা না রাখলে চলবে কেন আমাদের, যে-ব্যবসার যা নিয়ম, এ-খাতাতে আপনারও পূর্বপুরুষের নাম-ধাম মিলে যেতে পারে, তেমন করে খাতা রাখতে পারলে কত উপকার দেয়, এই দেখুন না, কালী মুখুজ্জের মেয়ের মাত্তর দু'মাস বয়েস সবে, বললেন—পাত্তোর খুঁজে দিতে হবে—কুলীন পাত্তোর—পারবে?

আমি বললাম—এ আর বেশি কথা কি—তা তিনি একটা টাকা দিলেন রাহা-খরচা।

—দু'মাসের কনে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রথম মেয়ের বিয়ে নিয়ে এক কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল কিনা—মেয়ের যখন পাঁচ বছর বয়েস সেই সময় চুরি হয়ে গিয়েছিল মেয়ে—এক ভঙ্গ কুলীন চুরি করে নিয়ে গিয়ে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল কিনা—সেই ভয়েই এই মেয়েরও বয়েস বাড়ার আগেই বিয়ে দিচ্ছেন।

প্রকাশ বেশ জমিয়ে গল্প বলতে পারে, কিন্তু রাত হয়ে গিয়েছে। বড়বাড়িতে ফিরতে হবে। এতক্ষণ হয়তো বংশী অপেক্ষা করে-করে শুয়ে পড়েছে। ভাত ঢাকা আছে চোরকুঠুরিতে। গেট-এর চাবি খুলে অন্ধকারে ঢুকতে হবে। আজকাল ও-বাড়িকে বাইরের থেকে যেন অন্ধকার ভূতের বাড়ি মনে হয়। কিন্তু একবার চোরকুঠুরির ভেতর ঢুকতে পারলে আর কিছু মনে থাকবে না। আজকাল সমস্ত মনটা জুড়ে বসে আছে জবা। জবাকে নিজের ঘরের মধ্যে কল্পনা করে নিয়ে অনেক সম্ভব-অসম্ভব ঘটনা ঘটানো যায়। মনে করে নেওয়া যায়—সেই জবা তার এই চোরকুঠুরিতে এসেছে। এসে হয়তো তারই বিছানায় বসেছে। এক সময়ের মনিব, আজ তার স্ত্রী—ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে সমস্ত শরীর। কতদিন কতভাবে কত অপ্রিয় কথা বলেছে। পাড়াগেঁয়ে বলে কত ঠাট্টা করেছে তাকে। জবার ছোঁয়া হাতের রান্না পর্যন্ত কখনও খায়নি ভূতনাথ। অথচ...

অন্ধকার রাত্রে মনে হয় যেন জবার শাড়ির খস্-খস্ শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। যেন জবার চুলের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভাসছে।

তারপর সত্যি-সত্যিই ভূতনাথ চোরকুঠুরির শক্ত তক্তপোশটার ওপর চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করে। সমস্ত রাত্রিটা একরকম অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটে। মাথার মধ্যে সমস্ত যেন গোলমাল হয়ে যায়। মনে হয় সমস্ত ঘটনাটা যেন স্বপ্ন। স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অলৌকিক।

পরদিন বংশীও অবাক হয়ে গিয়েছে। বংশী বলে—এ কি, আপনি যে বললেন আজ দেশে যাবেন?

ভূতনাথ বললে—যাওয়া আর হলো কই? মামলার দিন পড়লো কাল। ছুটুকবাবুর কাছে গিয়েছিলাম—সমস্ত দিন তাইতেই নষ্ট হলো।

—কী হলো মামলার?

ভূতনাথ বলে—আমি কেঁদে গিয়ে পড়লাম ছুটুকবাবুর কাছে। বললাম আপনি 'দিন' নিয়ে

নিন, নইলে বড়বাড়িরই বদনাম, যদি ওরা পুলিশ-পেয়াদা দিয়ে বাড়ি দখল করে সে কি তখন ভালো হবে?

—দিন পড়লো কবে?

ভূতনাথ বললে—সে আবার শুনানি হবে, তখন যা হয় ভাবা যাবে। এখন তো টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে ননীলালের কাছে। ছুটুকবাবুর পুরনো বন্ধু, এ-কথাটা কি আর রাখবে না তার! কত টাকাকড়ি নিয়েছে এককালে ছুটুকবাবুর কাছে। মনে আছে তার নিশ্চয়ই।

বংশী বললে—যাই, খবরটা একবার দিয়ে আসি ছোটবাবুকে ঝপ করে। বড় ভাবছিলেন ক'দিন আজ্ঞে।

—কিছু বলেন নাকি?

—না, বলেন না কিছু, কেবল আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে ভাবেন সারাদিন, আমি তো বুঝতে পারি সব—শুনলে খুশি হবেন খুব।

—আর ছোটমা, ছোটমা ভাবছেন না?

বংশী বলে—ছোটমা'র ওসব ভাবনা নেই শালাবাবু, ছোটমা'র কেবল ঠাকুরপূজো আর ওই...

—মদ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন আর কামাই দেন না আজ্ঞে, যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে যেন, কেন যে এমন দশা হলো, ভগবান জানে।

ভূতনাথও আর যেন ভেবে ঠিক করতে পারে না। কেন এমন হয়! তবু সুবিনয়বাবুর কথাগুলো বার-বার মনে পড়ে—তিনি বলতেন—নিজেকে ছোট বলে ভাবছি তাই, ছোট চিন্তায়, ছোট বাসনায়, মৃত্যুর বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকছি বলেই হয়তো জীবনের অমৃতরূপ প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। তাই বুঝি শরীরে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কাজে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই। জগৎ-জোড়া নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্যের সঙ্গে মিল হচ্ছে না কারো। মনে হয়—তাই বুঝি মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলে ধারণা করি। শ্রম বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি কিন্তু সত্যকে বাঁচিয়ে চলি না, ধর্মকে বাঁচিয়ে চলি না, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলি না। অথচ চোখের সামনে ব্রজরাখালকে দেখেছে, সুবিনয়বাবুকে দেখেছে—তবু তাদের মতন প্রাণমন খুলে কেন বলতে পারে না—আমি ধ্বংসকে স্বীকার করবো না, এই মৃত্যুকে মানবো না—আমি অমৃতকে চাই—নমস্তেহস্তু!

সেদিন রূপচাঁদবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন—ওদিকে আর গিয়েছিলেন নাকি, সুবিনয়বাবুর বাড়ি? জবা-মা কেমন আছে?

ভূতনাথ বললে—দু'তিন দিন যাইনি—তবে ভালোই আছেন।

রূপচাঁদবাবু বললেন—আমি যাবো-যাবো করেও যেতে পারছি না, কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, কোনো অসুবিধে হলে আমায় বলবেন, লজ্জা করবেন না যেন—জবা-মা'র হয়তো বলতে লজ্জা হতে পারে।

সেদিন সরকারবাবু বললে—আসুন, আসুন ভূতনাথবাবু, কী কপালই করে এসেছিলেন—একেবারে দশা-সই কপাল মশাই!

—কেন, কী হলো?

—আর কী হবে, নিন, এখানে সই করুন।

—এ কী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার থেকে ওভারসিয়ারদের খাতায় আপনার নাম উঠেছে। বলেছিলাম না আপনাকে, আপনি কি আর বেশি দিন বিল্‌বাবু থাকবেন? তা এমন কপাল দেখলেও আনন্দ হয় মশাই! বাবুর নিজের হুকুম—দেখছেন কি, সই করুন।

বারো টাকা থেকে একেবারে কুড়ি টাকা! সমস্ত শরীরে কেমন রোমাঞ্চ হয় ভূতনাথের।

সরকারবাবু বললে—কালীঘাটে গিয়ে মায়ের পুজো দিয়ে আসবেন আগে, ওই বিপিনবাবু, বিজয়বাবু আজ তিন বচ্ছর বিল্‌বাবুই রয়ে গেলেন, একটি পয়সা মাইনে বাড়লো না। আর আপনার তো পোয়াবারো!

সরকারবাবুর কথাগুলো ঠিক নিছক উল্লাস প্রকাশ নয়। তবু সব সহ্য করাই ভালো।

ভূতনাথ বললে—আমার সেই ছুটির দরখাস্তখানা কী হলো?

—ছুটি তো আপনার হয়ে গিয়েছে। সাত দিনের তো—কবে থেকে যাচ্ছেন? আপনার হলো গিয়ে সবই স্পেশ্যাল ব্যাপার—আপনার ছুটি আটকায় কে, বলুন?

ইদ্রিসও খুব খুশি হয়েছে। বলে—তা হোক ওভারসিয়ারবাবু, এবারে যেন আর আপনার দস্তুরি ছাড়বেন না তা বলে—ইঞ্জিনীয়ারবাবুরা পর্যন্ত নেয়, আর আপনার নিলেই দোষ! বলে—মাসে যদি পাঁচ টাকাও হয় তো বছরে কত হলো ইয়ে হিসেব করুন।

ভূতনাথ বলে—চাকরিটা থাকলেই বাঁচি ইদ্রিস, কত কষ্টের চাকরি তা তুমি জানবে কী করে!

অথচ এই কলকাতায় আসবার জন্যে একদিন ছোটবেলায় মিত্তিরদের টিপ-চালতে গাছের ডগায় উঠেছিল ভূতনাথ। কিন্তু সেই স্বপ্নের কলকাতার সঙ্গে তার চোখে-দেখা কলকাতা কি মিলেছে? হয়তো মিলেছে কিম্বা হয়তো মেলেনি। কিন্তু মনে হয় এখানে না এলে সে বুঝি মানুষের মহাযাত্রার মিছিল এমন স্পষ্ট করে দেখতে পেতো না। সেই ব্রাহ্মসমাজ, সেই ভারত-সভা, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দিয়ে আজ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে মহাযাত্রা শুরু হয়েছে তার পরিচয় পেতো না। জানতে পেতো না কেমন করে ধীরে ধীরে মানসলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের সমন্বয় সাধন হয়। কেমন করে সনাতন শাশ্বত ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আজ ভূতনাথ জানতে পেরেছে মানুষে মানুষে কোনো বিচ্ছেদ নেই। সমস্ত মানুষ এক জাত। তাই একের পাপের শাস্তি অন্যকে গ্রহণ করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। এক জনের পাপের ফল সকলকে ভাগ করে নিতে হয়। অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে, হৃদয়ে-হৃদয়ে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন। এ-ও কি কম শিক্ষা! তাই সুবিনয়বাবু বলতেন—'বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব'। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজও ভূতনাথ তাই তার মেসের ঘরটার মধ্যে ভাঙা তক্তপোশের ওপর শুয়ে প্রার্থনা জানায়—যে-দেবতা সকল মানুষের দুঃখ গ্রহণ করেছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, যাঁর ভালোবাসারও অন্ত নেই, তাঁর ভালোবাসার বেদনা যেন সমস্ত মানবসন্তান মিলে গ্রহণ করি। তাই তো মনে হয় যেখানে প্রেম সব চেয়ে গভীর, আঘাত বুঝি সেইখানেই সব চেয়ে নিষ্ঠুর হয়ে বাজে। যার হৃদয় কোমল, তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে। যাদের গায়ে পুলিশের লাঠি লাগে তাদের বেদনা তত কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের কোণের পটেশ্বরী বৌঠানের আঘাতই যেন সব চেয়ে করুণ, সব চেয়ে কঠিন। শহরে না এলে কি এমন করে এই পরম সত্যকে কখনো জানতে পারতো ভূতনাথ!

ছোটবৌঠান সেদিন কী রাগই করেছিল যে। বললে—একদিন তুই 'মোহিনী-সিঁদুর' কিনে দিয়েছিলি তাই ছোটকর্তাকে ফিরে পেয়েছি—কিন্তু আর কোনোদিন কোনো জিনিস চেয়েছি তোর কাছে?

ভূতনাথ অপরাধীর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বৌঠান আবার বললে—শুধু তোর কাছে কেন, কারো কাছেই আর কোনোও দিন কিছু চাইবো না ভূতনাথ—চাওয়ার দিন আমার ফুরিয়ে গিয়েছে, এবার ছোটকর্তার অসুখটা ভালো হয়ে গেলেই আমি সুখী, আর কিছু কামনা নেই আমার, তোরা সবাই বেইমান।

ভূতনাথ তবু চুপ করে রইল।

তারপর বৌঠান আবার বলেছিল—তোর যদি কোনো কষ্ট হয়ে থাকে, আমাকে বলিসনি

কেন? এখানে খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধে হচ্ছে? শোয়া-থাকার কোনো অসুবিধে?

ভূতনাথ তবু চুপ করে রইল! আজ বৌঠানের মুখের যেন বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। চোখ দুটো লাল জবাফুলের মতো। সারাদিন ধরে বোধ হয় মদ খেয়েছে। বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। পায়ে আলতা পরেছে। এখনি এই বিকেলবেলা বুঝি খোঁপা বেঁধেছে। পাতা কেটেছে। কপালে সিঁদুরের টিপ লাগিয়েছে। নাকে হীরের নাকছাবি। বৌঠানের সুডৌল শরীর যেন টলোমলো করছে নেশার ঘোরে।

অথচ কী এমন বলেছিল ভূতনাথ! ভূতনাথ শুধু বলতে এসেছিল—সে দেশে যাবে।

কেন দেশে যাবে, ক'দিনের জন্যে যাবে তা না জেনেই অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিলে বৌঠান।

বৌঠান বললে—কেউ তোকে কিছু বলেছে? আমি যতদিন আছি কেউ তোকে কিছু বলুক দিকি! দারোয়ান দিয়ে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবো না এখনি—এ বাড়িতে হাজারগণ্ডা লোক রয়েছে কী জন্যে? বসে-বসে তো সব মাইনে খাচ্ছে—বড়বাড়ির কর্তারা কি মরেছে? তারপর চিৎকার করে ডাকলে—বংশী—

বৌঠানের চিৎকার সমস্ত ফাঁকা বাড়িটায় যেন একবার প্রতিধ্বনি তুললে।

বংশী এল। বৌঠান বললে—সরকারমশাইকে বলগে যা, ভূতনাথের জন্যে জামা-কাপড় যা দরকার যেন সরকারী তহবিল থেকে দেয়, আর আমার নামে খরচার খাতায় লিখে রাখে।

—আমি এখুনি যাচ্ছি ছোটমা।

—আর শোন!

বংশী থমকে দাঁড়ালো আবার।

—মিয়াজানকে গাড়ি জুত্তে বল!—আমি বেরোবো।

—তুমি বেরোবে ছোটমা?

—হ্যাঁ, বেরোবো, বসে-বসে সব মাইনে খাচ্ছে, কোনো কাজ নেই, এতগুলো লোক কী করে সারাদিন, আমি হিসেব চাই, ছোটকর্তার অসুখ বলে সবাই ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে নাকি?

তারপর ভূতনাথকে ডেকে বললে—সেজেগুজে তৈরি হয়ে নে—আমার সঙ্গে যাবি তুই ভূতনাথ।

ভূতনাথের কেমন ভয় করতে লাগলো। বললে—কোথায়?

—বরানগরে।

ভূতনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু বংশী চুপি চুপি বললে—বলুন—বলুন—হ্যাঁ, যাবো।

বাইরে এসে ভূতনাথ বললে—বৌঠান কি কিচ্ছু জানে না বংশী? বাড়ি বিক্রি হবার কথাও শোনেনি নাকি?

বংশী বললে—নেশা হলে আজ্ঞে কিছু মনে থাকে না ছোটমা'র। ওই যে গাড়ি বার করতে বললে আমাকে—তা কোথায় গাড়ি, বাড়ি যে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, বিধু সরকার মেজবাবুর সঙ্গে যে কবে চলে গিয়েছে গরাণহাটায়, ছোটমা'র কিছু আর খেয়াল নেই শালাবাবু।

ভূতনাথ বললে—যদি আমাকে ডাকে আবার?

বংশী বললে—আর ডাকবে না শালাবাবু, ঘুমিয়ে পড়লেই সব ভুলে যাবে, কোনো খেয়াল থাকবে না, দেখলেন না সে-রকম সাজ-গোজেরও বাহার নেই, কোথায় কী গয়না টাকাকড়ি আছে, তাও মনে থাকে না, ওই চিন্তা আলতা পরিয়ে চুল বেঁধে দিয়েছে, গা ধুইয়ে দিয়েছে তাই অমন দেখছেন—কিন্তু নিজের কিছু খেয়াল নেই।

ভূতনাথের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে চায়। বৌঠান জানেও না বড়বাড়ির সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। জানতে চায়ও না বোধ হয়। মনে হয়—সব তেমনি আছে বুঝি। তেমনি একান্নবর্তী পরিবার, তেমনি লোকজন, চাকর, ঝি, গাড়ি, ঘোড়া, পাল্কি, বেহারা, বাগান সব আছে। অন্দর-

মহলের পর্দার আড়ালে থেকে-থেকে বাইরের জগতের কোনো খবরই রাখবার প্রয়োজন মনে করে না। ভাবে এখনও বুঝি দেউড়িতে পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজ সিং বন্দুক নিয়ে। এখনও সুখচর থেকে টাকা আসে। এখনও হুকুম করলেই তামিল করবার লোক এসে হাজির হবে।

বংশী বললে—আমরা দুই ভাই বোনে দু'জনকে দেখছি শালাবাবু, আমি দেখি ছোটবাবুকে আর চিন্তা দেখে ছোটমাকে। নেশার ঘোরে মাঝে-মাঝে কত বকে চিন্তাকে, বলে—আজকাল সবাই ফাঁকি দিচ্ছে কাজে—তা জানে না তো আমরা মাইনের লোভে কাজ করছি না এখানে—মাইনে যে কতদিন পাইনি তার তো হিসেব নেই।

—মাইনে না পেয়ে এ-রকম কতদিন চালাবে বংশী?

—আর জন্মে বোধ হয় ছোটবাবুর কাছে দেনা করেছিলাম আজ্ঞে। তাই শোধ করছি খেটে, দেশে যে কী করে সব চালাচ্ছে ভগবান জানে। বিয়ে করে এস্তোক কত বছর যে আর দেশে যাইনি, আমার শ্বশুর যেতে লিখেছে বার-বার, কী করে এ-অবস্থায় যাই বলুন তো। তা ছোটমাও আর বেশিদিন বাঁচবে না হুজুর, ওই নেশার ঘোরেই একদিন অজ্ঞান হয়ে দম বেরিয়ে যাবে, দেখবেন।

ভোরবেলা ট্রেন! সকাল-সকাল উঠতে হবে। ছোট টিনের বাক্সটা গুছিয়ে রেখেছে ভূতনাথ। বৌঠানের দেওয়া কাপড়-জামা সব। বাক্সটা পরিষ্কার করতে গিয়ে ননীলালের সেই পুরনো চিঠিটা তলায় এক কোণে পড়ে রয়েছে দেখলে। আশ্চর্য! সেই ননীলালই-বা কোথায় আজ! ধাপে-ধাপে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। নিজের দেশ, সমাজ ছেড়ে, স্ত্রী, আত্মীয়, স্বজন পরিত্যাগ করে কত দূরে গিয়ে রইল। কিন্তু কিসের আকর্ষণে? প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হতে পেরেছে কি শেষ পর্যন্ত! দ্বারকানাথ যেমন নীল আর রেশমের কুঠি করেছিলেন, ননীলাল কি তেমনি পাট আর কয়লার সঙ্গে জীবনকে জড়িয়ে দিয়েছিল? আর তারপর? তারপরের পথ কি ননীলালের জানা আছে? ননীলালই বলেছিল—এ যুগের খৃষ্ট, চৈতন্য আর বুদ্ধ হচ্ছে শেঠ, শীল আর মল্লিক। ভূতনাথ ভাবতে চেষ্টা করে—ননীলাল কি তার ইষ্টদেবতার সন্ধান আজ পেয়েছে? সে তো মেম সাহেবদের রূপের মোহে ভোলবার ছেলে নয়! সে তো বলেছিল একবার—মেয়েমানুষের নেশা এখন কেটে গিয়েছে ভাই, ও যে-বিন্দী, সেই-ই মিসেস গ্রিয়ারসন—এখন কেবল চাই টাকা! টাকার নেশা কি তার মিটেছে? সে কি তৃপ্তি পেয়েছে? শান্তি পেয়েছে?

আবার মনে হয় হঠাৎ যেন জবা এসে ঘরে ঢুকেছে। ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা যেন গন্ধে ভবে গেল। মাঘোৎসবের দিন যেমন করে সাজতো জবার তেমনি সাজ। শুধু মাথায় ঘোমটা সিঁথিতে সিঁদুর। এইটুকু কেবল তফাত! দবজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। হাতে এক গেলাস জল।

জবা বলে—আমায় ক্ষমা করো তুমি।

ভূতনাথ বললে—আমিই কি জানতুম?

—ছি, ছি, আমায় কিন্তু ক্ষমা করো তুমি।

ভূতনাথ বললে—কেন তুমি আমার সংসারে এলে?

জবা বললে—সে উত্তর তো দিয়েছি আমি।

—শুধু সংস্কার, শুধু দুটো মন্ত্র আর একটা যড়যন্ত্রের জন্যেই তোমার দুর্ভোগ, নইলে তোমার জীবন তো অন্য রকম হতো—তাতে তুমি সত্যিকারের সুখী হতে হযতো।

জবা বলে—বার বার তুমি কেন একথা বলো?

ভূতনাথ বলে—সত্যি বলছো জবা?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে? মিথ্যে তো বলি না আমি, তুমি আমায় বিশ্বাস করো, কোনো

দুঃখ নেই আমার।

—কিন্তু এ-কথা তোমায় কে বলতে শেখালে জবা?

—এ-কথা আমি জ্ঞান হওয়া থেকেই শিখে এসেছি যে, ঠাকুমা'র সঙ্গে কত শিব পুজো, কত ব্রত করেছি, কত ঠাকুরপ্রণাম করেছি, ঠাকুমা যে আমায় সব শেখাতো।

—কিন্তু সুপবিত্র, তাকে ভুলতে পারবে তো?

সঙ্গে সঙ্গে জবার হাত থেকে জলের গেলাসটা ঝনাৎ করে মাটিতে পড়ে ছত্রখান হয়ে গেল। সে-শব্দে ভূতনাথেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছে। চোরকুঠুরির মধ্যে চোখ মেলে ভূতনাথ দেখে সে একলা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে। কেউ কোথাও নেই। শেষ রাতের নিস্তব্ধ কলকাতা শহর। রাস্তায় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি চলবার শব্দ শুধু। আর রাস্তায় বুঝি জল দেওয়া হচ্ছে। দু'-একজন বুঝি জাগছে। ওপাশে অনেক দূর থেকে গঙ্গার বুকের ওপর একটা জাহাজের বাঁশি বেজে উঠলো। হয়তো জাহাজের বাঁশি নয়, জুটমিলের। কারখানা হয়েছে অনেক ওদিকে। হয়তো বা ননীলালেরই জুটমিল। কে জানে!

সমস্ত স্বপ্নটা আবার পুরোপুরি ভেবে দেখতে লাগলো ভূতনাথ। সত্যি এ কেমন করে হয়! ভূতনাথেরই মনগড়া কথাগুলো জবার মুখ দিয়ে যেন বলিয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু আশ্চর্য কথা—আট-ন' বছর পর্যন্ত জবা ছিল বলরামপুরে, তার মধ্যে একবার জানতেও পারলো না।

সুবিনয়বাবুকে জবার ঠাকুমা পরে আর একটা চিঠিতে লিখেছেন—'তোমাকে লুকাইয়া এ চিঠি লিখিতেছি, উনি জানিতে পারিলে অনর্থ বাধাইবেন। কিন্তু এখানে কাহাকেও জানানো হয় নাই। কেবল পাত্রপক্ষ জানে আর পুরোহিতমশাই জানেন। জানি না জবার কপালে কত দুঃখ আছে। উনি সদা-সর্বদা জবাকে চোখে-চোখে রাখেন, বাড়ির বাহিরে যাইতে দেন না, পাছে তুমি বা তোমার লোক হরণ করিয়া লইয়া যাও। জবার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আর একদিনও আসে নাই, নিতান্ত অনিচ্ছার বিবাহ বলিয়া তাঁহারাও আর খোঁজ করেন না। আমরা লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম পাত্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে—বাড়িতে একমাত্র পিসীমা আছে।'

পরে আর-একটা চিঠিতে লিখেছেন—'বাবা, তোমার পত্র পাইলাম, অনেকদিন সংবাদ না পাইয়া বড় মনোকষ্টে ছিলাম, আমার কপালে অনেক দুঃখ ছিল তাই তোমার মতন সন্তান পাইয়াও নিকটে থাকিতে পারি না, জবা ভালো আছে, জবার শরীরও ভালো আছে—জবাকে আশীর্বাদ করিতেছি সে সুখী হইবে। মায়ের ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে, তাহার তো আর নড়-চড় নাই—সুতরাং সকলই তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া জানিবে...'

এইরকম অনেকগুলো চিঠি লিখেছেন সুবিনয়বাবুর মা। নিজে লিখতে জানেন না তাই গোপনে পাড়ার কোনো লোককে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। আর সুবিনয়বাবু সমস্ত চিঠিগুলো সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন আজ পর্যন্ত।

আর একটা চিঠিতে একবার ঠাকুরমা লিখেছেন—'শুনিলাম পাত্রপক্ষ সংবাদ পাইয়াছে জবা আমার নাতনী হইলেও, হিন্দু-কন্যা নহে। এই সংবাদ লোকমুখে পাইবার পর তাঁহারা বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন আমরা ঠকাইয়া জবার সহিত হিন্দু পাত্রের বিবাহ দিয়াছি... শুনিতেছি তাঁহারা নাকি আবার পুত্রের বিবাহ দিবেন... শুনিয়া অবধি মন খারাপ হইয়া আছে, কিছুই ভালো-মন্দ বুঝিতে পারিতেছি না। এখন মায়ের ইচ্ছার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে, আমরা অবোধ মনুষ্য মাত্র, মায়ের লীলা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই—অহরহ মাকে ডাকিতেছি, এখন মা যা করেন।'

ভোরবেলা ট্রেন। সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠেই রওনা দিয়েছে ভূতনাথ।

বংশী বলেছিল—কবে আসছেন আবার?

ভূতনাথ বলেছিল—কাল, নয় তো পরশু ঠিক।

তা শেয়ালদা স্টেশনে যখন পৌঁচেছে ভূতনাথ তখন বেশ সকাল। ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে।

ধীরে-সুস্থে টিকিট কেটে ট্রেনে গিয়ে বসার সময় আছে। চারদিকে ঝাঁট দেওয়া চলছে। ট্রেন গিয়ে পৌঁছুবে মাজদে'তে সেই বিকেল নাগাদ। তারপর ফতেপুর। সোজা হাঁটা রাস্তা। মাঝখানে শুধু ইছামতী নদী পার হওয়া। তা নদীতে খেয়া আছে। গ্রামে পৌঁছুতে সেই যার নাম রাত। সন্ধ্যে হতে-না-হতে নিশুতি রাত হয়ে যাবে সব।

বড়জোর বারোয়ারিতলায় নিতাই ঘোষের দোকানে টিম-টিম করে রেড়ির তেলের দেয়ালগিরিটা তখনও জ্বলছে। রাস্তায় অত রাতে পায়ের শব্দ পেয়ে নিতাই হয়তো চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করবে—কেডা যায় গো?

—আমি নিতাই, আমি—বলবে ভূতনাথ।

—আমি কেডা, বাড়ি কনে?

—ওরে, আমি ভূতো।

—ওমা ভুতোদা—কী সর্বনাশ—কবে ফিরলে?

নন্দজ্যাঠাও খুব অবাক হয়ে যাবে বৈকি! উঠোনের ধারে সেই আতা গাছটার কাছে গিয়ে ডাকবে—জ্যাঠাইমা—ও জ্যাঠাইমা—

নন্দজ্যাঠা হয়তো তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে আটচালায়। জ্যাঠাইমা অত সকালে শোয় না। তখনও হয়তো কাঁথা সেলাই করছে, নয় তো সলতে পাকাচ্ছে পিদিমের। ডাক শুনে সেখান থেকেই বলবে—কে ডাকে গা—কে তুমি?

—আমি ভূতো, জ্যাঠাইমা।

—ওমা, ভূতো, কোত্থেকে—বলেই মরি-বাঁচি করে ছুটে আসবে পিদিম হাতে নিয়ে। বলবে—ওমা, দেখোদিকি, একটা খপর দিতে হয় তো। আয়—পা ধো এখেনে, এই জলচৌকিতে বোস, ঘটিতে জল আছে। থাক-থাক, হয়েছে, ভালো আছিস তো?

জ্যাঠাইমা'র পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাবে ভূতনাথ। তারপর জিজ্ঞেস করবে—জ্যাঠা কোথায়? ঘুমুচ্ছে বুঝি?

হাত পা মুখ ধুয়ে ভূতনাথ বসবে রোয়াকে। ওই বাঁধানো রোয়াকে বসেই কতদিন রাধার সঙ্গে গল্প হয়েছে ছোটবেলায়। কতদিন গল্প করতে করতে রোয়াকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শেষে জ্যাঠাইমা এসে ডেকে দিয়েছে।—ওরে ভূতো, তোর পিসী ডাকছে, ঘরে গিয়ে শুগে যা।

সে কতকাল আগের কথা! সমস্ত গ্রামটা যেন চোখের ওপর ছবির মতন ভেসে ওঠে। গাঙে যাবার পথে বটগাছের ঝুরি ধরে কতদিন দোল খেয়েছে ভূতনাথ। আম কুড়িয়েছে কত বাদলের রাতে। কত যে আম! ধামা ধামা। কাঁচা আমগুলো মাটিতে পড়ে ফেটে চৌ-চাকলা হয়ে যেতো। সে-আম পাতা পেতে তক্তপোশের তলায় সাজিয়ে রাখতো পিসীমা। বলতো—বোঁটাওলা আমগুলো আমায় দে—দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

রাত্তিরবেলায় বাঁশঝাড়ের সেই মড়-মড় শব্দ। চারদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মড়-মড়-মড় শব্দে একটা বাঁশ দুলে উঠলো আগা-পাশতলা। পিসীমা বলতো—ও ভূতের বাঁশ—বাঁশে ভর দিয়ে ভূত মাটিতে নামলো।

সন্ধ্যেবেলা রান্নাঘরের দিকে যেতে কী যে ছম-ছম করতো গা'টা! কিন্তু সকালবেলা আবার যে-কে সেই। মধু কেরষাণ গরু-বাছুর চরাতে তারই তলা দিয়ে মাঠে চলেছে। হাতে লাঠি। সেই রকম একটা তেলালো লাঠির জন্যে কত খোশামোদ করেছে মধু কেরষাণকে। অথচ কত সামান্য জিনিস।

পিসীমা বলতো—তোর যখন বিয়ে হবে, তখন ওই রকম লাঠি গড়িয়ে দেবো।

বিয়ের সঙ্গে লাঠির যে কী সম্বন্ধ তা ভূতনাথ বুঝতে পারতো না।

পিসীমা বলতো—তোর শ্বশুর তো ওমনি-ওমনি খেতে দেবে না, কাজ করতে হবে, হয়তো গরু চরাতে বলবে—তখন? তখন লাঠি কোথায় পাবি?

শুনে যেন কেমন ভয় হতো মনের ভেতর। দুর-দুর করতো বুক। ভূতনাথ বলতো—তবে আমি বিয়ে করবো না পিসীমা।

পিসীমা বলতো—বিয়ে করবি না তো ভাত রেঁধে দেবে কে? আমি তো মরে যাবো একদিন।

পিসীমা মরে যাবে শুনলেই কেমন যেন ভয় করতো। বেজিটা কেমন করে মরে গিয়েছে তা তখনও মনে আছে ভূতনাথের। চোখে জল আসতো। হঠাৎ পিসীমা'র কোলের ভেতর মুখ লুকিয়ে ফেলতো ভূতনাথ। পিসীমা'র তখন সান্ত্বনা দেবার পালা। মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলতো—আচ্ছা, আচ্ছা, বিয়ে দেবো না তোর, হলো তো!

নন্দজ্যাঠা মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বাইরে-বাইরে ঘোরে। বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন হয়তো মুটের মাথায় মাল-পত্তোর নিয়ে বাড়ি এসে হাজির। কাঁঠাল দুটো, এক বোরা নারকোল, এক বাণ্ডিল ঝাঁটার কাঠি, কেষ্টগঞ্জের কদমা, ভাজামুগের ডাল, কেরোসিন তেল। বলতো—ছেলেমেয়েরা সব দূরে সরে যাও—কেরোসিন তেল আছে ওতে।

কেরোসিন তেল-এর নামে তখন কী ভয়ই যে ছিল। মনে হতো হাতে লাগলেই বুঝি হাত জ্বলে-পুড়ে যাবে। কিন্তু মাল-পত্তোর খোলা হলে জ্যাঠা বলতো—ভূতোর আর রাধার হাতে দুটো করে কদমা দিও তো!

নন্দজ্যাঠা বলতো—তোর বাবা কদমা খেতে ভালোবাসতো খুব। তা সেবার ছিন্নাথপুরে গাজনের মেলায় গিয়ে বললে—দাদা, কদমা খেতে হবে... আমার তখন কাজ পড়ে রয়েছে—সতীশেরও কাজ, কিন্তু খিদে পেলে কাজের কথার খেয়াল থাকতো না। সতীশ বললে—রেলবাজারের শাদা চিঁড়ে, মামারাকপুরের দই, কলের চিনি, কেষ্ট ময়রার কাঁচাগোল্লা আর কেষ্টগঞ্জের কদমা দিয়ে ফলার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে দাদা... হ্যাঁ রে, বাপকে তোর মনে পড়ে অতুল?

ভূতনাথের কিছুই মনে পড়ে না।

নন্দজ্যাঠা বলে—সেই, মনে নেই, তোকে সঙ্গে নিয়ে টুণ্ডিতে গিয়ে কি হয়রানি? রাত্তিরবেলা বিছানার মধ্যে সাপ, সাপের গুষ্টি—তুই অঘোরে ঘুমোচ্ছিস—আর ওদিকে...

খানিক থেমে নন্দজ্যাঠা আবার বলে—তবে ধন্যি ছেলে বটে তুই, পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে—কি হাঁটাটাই হাঁটতে পারতিস! তোর বাবা বলতো—ওকে বড় হলে ডাকপিওন করে দেবো দাদা।

শেয়ালদা স্টেশনের কলকোলাহল বাড়ছে। ওদিক থেকে কয়েকটা ট্রেন হুশ-হুশ করে আসে। আর গিজ গিজ করে লোক নামে।

একজনকে জিজ্ঞেস করলে—আর কত দেরি মশাই পোড়াদ'র ট্রেনের?

নন্দজ্যাঠাই ঠিক লোক। তাকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে। বাবার সঙ্গে নন্দজ্যাঠাও ঘুরতো গ্রামে-গ্রামে। নন্দজ্যাঠা ছিল বাবুদের নায়েব, আর বাবা ছিল গোমস্তা। জমিদারির কাজে অনেক জায়গায় কাছারি করেছে। আদায়-পত্তোর করতে, মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করতে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। আর মা-মরা ছেলেটাকে কোনো কোনো বার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে বিশেষ পীড়াপীড়িতে।

হঠাৎ পেছন থেকে যেন কে ডাকলে—ঠাকুরমশাই?

—আরে, প্রকাশ! কোত্থেকে ফিরছো? ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে।

প্রকাশ বললে—এই তো ফিরে এলাম ফতেপুর থেকে আজ্ঞে। গিয়ে শুনি পাত্তোরের দাদামশাই আবার এখানে এসেছে, আর ওদিকে আমি ওখানে গিয়ে হাজির। এখন মিছিমিছি দুনো খরচ... তা আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

—দেশে।

—দেশে! তা সন্ধ্যেবেলার গাড়িতে চলুন না কেন, একসঙ্গে যাবো, পাত্তোরের দাদামশাইও যাবে আমার সঙ্গে, আপনাদের গাঁয়েরই লোক, আহা, ভারি ভদ্দরলোক, মাটির মানুষটি। আমি মেয়ের মাকেও তাই বলেছি—এমন দাদাশ্বশুর কারো হয় না, বৌমাকে আদর-আত্তি

করবে—মাথায় তুলে রাখবে একেবারে...

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আমাদেরই গাঁয়ের লোক? নামটা কী বলো তো?

—নন্দ চক্কোত্তি।

—নন্দজ্যাঠা?

প্রকাশ বললে—তা হবে, শুনলাম বাবুদের খালের ধারের পাটের আড়তে উঠেছে, চেনেন নাকি?

ভূতনাথ বললে—খুব চিনি, তার সঙ্গে দেখা করতেই তো যাচ্ছিলাম দেশে, বিশেষ জরুরী দরকার ছিল একটা।

—তা বেশ তো, চলুন—আমিও যাচ্ছি।

এমন অনায়াসে যে সমস্ত ঘটনার নিষ্পত্তি হতে পারে ভাবা যায়নি। নন্দজ্যাঠা নিশ্চয়ই জানে। বাবার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নন্দজ্যাঠাকে না জানিয়ে কোনো কাজ করতেন না বাবা।

ভূতনাথ বললে—তা হলে তাই চলো—আমারও খরচা বেঁচে গেল—সময় বেঁচে গেল।

প্রকাশ বললে—ভালোই হলো ঠাকুরমশাই, তা হলে একসঙ্গে সন্ধ্যেবেলার ট্রেনে সবাই মিলে যাওয়া যাবে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—নন্দজ্যাঠার কার বিয়ে?

—ওঁর নাতির, বিধবা যে এক মেয়ে আছে, তারই ছেলে—তা জামাই দেখে চোখ ফেরাতে পারবে না কনের বাড়ির লোক—তা আমি আগেই বলে রেখেছি ওদের।

আজও মনে আছে ভূতনাথের। সেদিন নন্দজ্যাঠাকে দেখে ভূতনাথ যতখানি অবাক হয়েছিল, ভূতনাথকে দেখে নন্দজ্যাঠাও ঠিক ততখানি অবাক। কিন্তু নন্দজ্যাঠাকে চিনিয়ে না দিলে চেনা যেতো না। সে-চেহারা নেই আর। বাবুদের পাটের আড়তের একধারে লোকজনদের থাকবার জায়গা। নৌকো থেকে নেমে আড়তে ওঠে পাটের গাঁট। সোজা চালান আসে নদী ধরে-ধরে। এখানে ওজন হয়, বাছাই হয়। তারপর বিক্রি হয় ব্যাপারীদের কাছে।

খালের জলে দেদার নৌকোর ভিড়। এক-এক গাঁট পাট নামে আর বাবুদের লোক গুণতি করে।

একটা গাঁট নামে আর চিৎকার করে গুণতি হয়—রামে রাম—

আবার নামে গাঁট।

—দুই-এ দুই—

তারপর আড়তের ভেতরে লম্বা গুদাম। সেখানে সামনেই কাঁটায় ফেলে ওজন করে কয়াল। বলে—লেখো, এক মণ সাঁইত্রিশ সের তিন কাঁচ্চা—

এক পাশে রান্না চড়িয়েছে একজন লোক। বড়-বড় কই মাছ। আস্ত আস্ত ভাজছে লোহার কড়ায়। গামছা পরে রান্না করছে। আর বাঁ হাতে ডাবা হুঁকো। বলে—ও ভূষণ, কাঁচা নঙ্কা দিতে পারো?

ভূষণ বলে—কাঁচা নঙ্কা কোথায় পাবো, এ কি ফতেপুর পেয়েছো, এখানে বাজার থেকে কিনতি হয় সব।

—তবে ঝালও তেমনি হবে, কাঁচা নঙ্কা না দিলি কইমাছের ঝাল হয়?

এদিকে যে এত পাটের আড়ত হয়েছে তা ভূতনাথের জানা ছিল না। এই-সব পাটই বুঝি ননীলালের কলে গিয়ে উঠবে। তারপর সেখান থেকে জাহাজে ভর্তি হয়ে বিলেতে যাবে। কী সব ব্যবসাই হলো! কতরকম ব্যবসাই করছে লোকেরা। আর বড়বাড়ির চৌধুরীবাবুরা কিছুই করলে না। আর যা-ও বা কয়লার ব্যবসায় নামতে গেল, তা-ও টিকলো না। কপালের ফের বৈ-কি!

প্রকাশকে দেখেই নন্দজ্যাঠা খাপ্পা। বলে—এই তোমার কথার ঠিক, আর ওদিকে... তারপর

হঠাৎ ভূতনাথকে দেখেই যেন চিনতে পেরেছে। একেবারে রাতারাতি মুখের ভাব বদলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখতে লাগলো। বললে—আমাদের অতুল না?

ভূতনাথ একেবারে সোজাসুজি পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল জ্যাঠামশাই।

একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে নন্দজ্যাঠা। বললে—ওরে অতুল আমার—সেই যে দেশ থেকে গেলি একটা খবর পর্যন্ত দিলিনি। তোদের বাড়িটা জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, দেখি আর ভাবি সতীশের কত সাধের বাড়ি। আসল সেগুন কাঠ দিয়ে কড়ি-বরগা করেছিল... সেই বাড়ির কাছে ঘেঁষতে আজ গা ছম-ছম করে।

নন্দজ্যাঠার চোখও বুঝি সজল হয়ে এল।—কী করছিস আজকাল? সতীশ বলতো—ডাকপিওন করে দেবো অতুলকে—তা ডাকপিওন হতে পেরেছিস অতুল?

ভূতনাথ মাথা নিচু করে বললে—ওভারসিয়ারী করছি এখন—বিল্‌বাবু ছিলাম, এই ক'দিন হলো ওভারসিয়ার হয়েছি—এক বাঙালীবাবুর আপিসে...

নন্দজ্যাঠা যেন শুনে ভারি খুশি হলো। বললে—যাক, সতীশের ছেলে মানুষ হলো তা হলে। তোর বাপ দেখে যেতে পারলে খুশি হতো—তা হ্যাঁ রে, কত বেতন পাচ্ছিস?

—এই মাস থেকে কুড়ি টাকা হলো আর কি।

—তা বাপু, এইবার গাঁয়ের বাড়িটা সারিয়ে-সুরিয়ে তোল, জঙ্গল সাফ করাও—বিয়ে-থা করো, আমরা বুড়োরা যাবার আগে দেখে যাই—তা যাক, তুই তবু গাঁ ছেড়ে বেরিয়েছিলি বলে মানুষ হলি। তারাপদ সেই পাঠশালার পণ্ডিত হয়েছে, আর সব কেউ কিছু করে না, কেবল বিড়ি টানে বসে-বসে বারোয়ারিতলার মাচায়—আর পূজোর সময় একবার করে যাত্রা করে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—জ্যাঠাইমা ভালো আছেন?

—আর ভালো, রোগ-ভোগ হয়ে সে-ফতেপুর আর নেই আমাদের। ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়েছে, ভদ্দরলোকদের আর থাকা চলবে না ওখানে। ক'ঘর বামুন-কায়েত ছিল, মরে-ঝরে এখন কমে আসছে, বামুনকে ভক্তি নেই—ছোটলোকদের প্রতিপত্তি বাড়ছে কেবল দিন-দিন।

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো নন্দজ্যাঠা। অনেক অভিযোগ। নন্দজ্যাঠাও যেন সামঞ্জস্য করতে পারছে না সময়ের সঙ্গে। ওখানেও 'বন্দে মাতরম্' হয়েছে। কী যে সব করে! স্বদেশী করছে। তাঁত করছে। বলে—ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে। শুনি আর হাসি। যে রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—ভূগোলে পড়েছি—তাদের সঙ্গে বিরোধ! ইংরেজরা এসেছে বলে তবু সুখে খেতে-পরতে পারছি। আগে কী অরাজক অবস্থা ছিল তোরা কি জানবি! ডাকাতির জ্বালায় রাস্তায় বেরোনো যেতো না। সতীদাহ দেখেছি। আমার মায়ের ঠাকুরমাকে পেছমোড়া করে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছিল শুনিছি। তা ওই ইংরেজরাই এসে তো সব বন্ধ করলে। আর এখন সেই ইংরেজই আবার খারাপ হয়ে গেল!

ভূতনাথ চুপ করে শুনতে লাগলো। সেই নন্দজ্যাঠা! ঘুণাক্ষরেও একবার রাধার উল্লেখ করলে না! বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে। অথচ ভূতনাথ তো ভুলতে পারেনি রাধাকে।

বেলা হয়ে যাচ্ছিলো। নন্দজ্যাঠা বললে—তা এবার তো বিয়ের একটা প্রস্তাব করি অতুল—কি বল—ভালো মেয়ে আছে স্বরূপগঞ্জের ভুবন চৌধুরীর, দেবে থোবে ভালো, শহুরে জামাইও খুঁজছে। আমাকে বলে রেখেছে অনেক দিন থেকে।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—ওই সম্বন্ধেই কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—কী কথা? বিয়ের কথা?

তবু বলতে যেন লজ্জা করতে লাগলো ভূতনাথের। হাজার হোক, গুরুজন তো!

—বল না, লজ্জা কিসের?

ভূতনাথ সঙ্কোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, আপনি কি জানেন, আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল?

নন্দজ্যাঠা যেন আকাশ থেকে পড়লো। প্রথমটা কিছু হাঁ-না বলতে পারলে না। তারপর বললে—কিন্তু তুই কী করে জানলি, কার কাছে শুনলি?

ভূতনাথ বললে—আমি জেনেছি, সত্যি কি না বলুন?

নন্দজ্যাঠা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। আড়তের টিনের চালের তলায়, চারদিকের পাটের গুদামের মধ্যে যেন দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। কোঁচার খুঁটটা দিয়ে বুকটা মুছতে লাগলো বার কয়েক। তারপর বললে—কিন্তু তোর তো জানবার কথা নয় অতুল—তোর তখন চার-পাঁচ কি ছ'বছর বয়েস।

—সে কি বলরামপুরে?

নন্দজ্যাঠা বললে—হ্যাঁ, বলরামপুরে, সেবার বাবুদের নতুন মহল কেনা হলো ওখানে। তাই তোর বাপকে নিয়ে গিয়েছিলাম প্রজাবিলি করতে... তুইও সঙ্গে ছিলি।

—সে কি রামহরি ভট্টাচার্যের নাতনীর সঙ্গে?

—হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তো প্রথমে বুঝতে পারিনি...

—সে মেয়ের কি বয়েস তখন দু'মাস?

—হ্যাঁ, কিন্তু... নন্দজ্যাঠা আরো অবাক আরো অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

—সে পাত্রীর নাম কি জবাময়ী?

—হ্যাঁ—কিন্তু আমরা তো প্রথমে বুঝতে পারিনি, অত বড় পণ্ডিত লোক, বলরামপুরে ওদের অত নাম-ধাম, নৈয়াকিক পণ্ডিত, যেবার সেই শোভাবাজারেব রাজবাড়িতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ থেকে সব লোক এসেছিল, দাক্ষিণাত্য থেকে পর্যন্ত পণ্ডিতরা এসে বিচারে বসেছিল, রামহরি ভট্টাচার্যির ঠাকুর্দাও সেখানে হাজির ছিল, বিচারে তারই শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল শুনেছি—তা সেই অত বড় পণ্ডিত মানুষ যে আমাদের ঠকাবে কে জানতো বল!

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস কবলে—তাঁরা আর কোনো দিন আমাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন?

—নিয়েছে বৈকি, লোক পাঠিয়েছিল, তখন তোর বাপ গত হয়েছে, আমার কাছে আসতেই সাফ বলে দিলাম—ও বিয়ে অসিদ্ধ।

—কেন, অসিদ্ধ কেন?

নন্দজ্যাঠা বললে—সেই কথাই তো বলছি, তোর বাপ তো বড় ভালোমানুষ ছিল, ভট্‌চায্যিমশাই ধরলে এসে—তা তখন তুইও সেবার গিয়েছিলি আমাদের সঙ্গে। আমাকে সতীশ বললে—ভারি পণ্ডিত মানুষ, এমন বংশে বিয়ে দিতে আপত্তি কি দাদা, শরীরের যা গতিক, কবে আছি কবে নেই—বিয়েটা দিয়েই কাজ সেরে নিই—তা এরকম বিয়ে তো হতো তখন—এই দেখ না আমারই তো যখন ছ'বছর বয়েস তোর জ্যাঠাইমা'র তখন এক বছরও বয়েস হয়নি, বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—যখন ঘর করতে এল তোর জ্যাঠাইমা তখন বাবার কোলে চড়ে বেড়াতো দিনরাত... আমার এখনও মনে পড়ে—আর আমার ঠাকুমা যখন শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল তখন মা'র কাছে শুনেছি কোমরে নাকি কাপড় থাকতো না—তা ঠাকুরমা'র শাশুড়ী কোমরে দড়ি দিয়ে কাপড়টা বেঁধে দিতো—খানিক থেমে নন্দজ্যাঠা আবার বলতে লাগলো—তা সতীশের কথায় আমিও ভাবলাম—দেখাই যাক মেয়ে। তা মেয়ে আর দেখবো কি, দু'মাস তো বয়েস, তবু চোখ নাক মুখ দেখে ভালোই মনে হলো। বললাম—আমরা রাজী। রামহরি ধরে বসলেন—আজই ভালো দিন আছে—আজই হয়ে যাক—শুভস্য শীঘ্রম্। পাঁজি দেখে একেবারে পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

ভূতনাথ উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে—তারপর?

—তারপর সেদিন কী ঝড়বৃষ্টি বাবাবে বাবা! সতীশ বললে—ছেলের বিয়ে তো দেবো, টাকা-কড়ি কিছু হাতে নিয়ে আসিনি। আমি বললুম—ত'বিল আমার কাছে, আমি দেবো'খন—তা বিয়ে না বিয়ে! রাত দেড়টার পর লগ্ন। সেই ঝড়ের মধ্যেই ঘুম থেকে তোকে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম, গরুর গাড়ি বলে রেখেছিলাম একটা আগে থেকেই।

—তারপর?

—তারপর আর কি? পরদিনই ফিরে এলাম ফতেপুরে! সতীশ বলেছিল কাউকে খবরটা দিও না দাদা। টাকার যোগাড়-যন্তর করে একেবারে খাওয়া-দাওয়ার দিন জানিয়ে দেবো—কিন্তু তার আগেই সংবাদ এসে গেল—সর্বনাশ কাণ্ড!

—কিসের সর্বনাশ?

—রামহরি ভট্‌চার্যি আমাদের ঠকিয়েছে, মেয়ের বাপ হিন্দু নয়, ব্রহ্মজ্ঞানী, ভট্‌চার্যিমশাই-এর ছেলে কলকাতায় গিয়ে কেশব সেন-এর দলে মিশে ধর্ম-ত্যাগ করেছে, পৈতে খুলে ফেলেছে, গায়ত্রী জপ করে না, মুরগী খায়, গরু খায়, শোর খায়, বিধর্মীকে বিয়ে করেছে—সেই ছেলেরই মেয়ে এ—শুনে তো আমাদের চক্ষুস্থির!

—তারপর?

—তারপর সব শুনে সতীশের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সতীশ বললে—দাদা একথা আর কাউকে জানিয়ে কাজ নেই, আমাদের মেয়ে নয় তাই রক্ষে। এখন চুপ-চাপ করে যাও। আমিও বললাম তাই ঠিক। শেষে যেবার বারুণীর মেলা হলো, সেবার তোকে নিয়ে গিয়ে খানিকটা গোবর খাইয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে নিলাম, যা হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে, কথায় বলে—মনের অজান্তে পাপ নেই... তা সে-সব অনেক দিনের কথা, তুই জানলি কী করে?

ভূতনাথ সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—রামহরি ভট্‌চার্যির ছেলের নাম কি সুবিনয়বাবু?

—তা হবে, অত-শত মনে নেই বাপু—সে কি আজকের কথা রে?

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আমি এবার উঠি তাহলে জ্যাঠামশাই—বলে আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

নন্দজ্যাঠা বললে—সে কি রে, এই কথা জানতেই কি এসেছিলি নাকি?

ভূতনাথ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে দেখা না হলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আজ দেশেই যাচ্ছিলাম।

—কিন্তু, কী ব্যাপার, খুলে বল তো?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে ভূতনাথ সোজা আড়তের বাইরে বেরিয়ে এল। এতদিন যদিও-বা একটু সন্দেহ ছিল, আজ তারও সমাধান হয়ে গেল। খালের ধারে তখন ব্যাপারীদের নৌকোয় হৈ-চৈ চলেছে। ভারে-ভারে পাট, তিসি, সরষে, কাঠ নামছে। নৌকো থেকে সোজা লম্বা একটা করে কাঠের পাটা পেতে দিয়েছে। তার ওপর দিয়ে মাথায় করে মাল নিয়ে আসে মুটেরা। চারদিকে বেলা হয়েছে বেশ। রোদের তেজ বেড়েছে। খালের ধারের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভূতনাথের কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। হাতের টিনের বাক্স ভারি মনে হলো খুব।

কিন্তু এখন সে কোথায় যাবে? সাত দিনের ছুটি নিয়েছে আপিস থেকে। আপিস না গেলে আজ আর কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না বটে। তা ছাড়া রূপচাঁদবাবু তাকে একটু প্রীতির চোখেই দেখেন।

সেদিন রূপচাঁদবাবু বলেছিলেন—আমার এখানে আর আপনার কতই বা উন্নতি হবে—আমার সামর্থ্যই বা কতটুকু।

ভূতনাথ বলেছিল—আমার ওপর আপনার অসীম অনুগ্রহ।

রূপচাঁদবাবু বলেছিলেন—অনুগ্রহ-নিগ্রহের কথা নয় ভূতনাথবাবু, ঈশ্বরের তেমন ইচ্ছে হলে কী না হয়—তাঁকে ধন্যবাদ দিন—তা হলেই কাজ হবে। তারপর বলেছিলেন—আর একটা নতুন আপিস হবার কথা হচ্ছে, দেখি সেখানে যদি হয় তো আপনাকে ঢুকিয়ে দেবো—অবশ্য দেরি আছে। সেখানে ঢুকতে পারলে আপনার উন্নতি হবে ভবিষ্যতে।

—কোন্ আপিস?

—ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট হবার কথা হচ্ছে কলকাতায়, এই রাস্তা-ঘাট তৈরি করবে, পুরনো, সরু রাস্তা ভেঙে চওড়া করবে, বস্তি ভেঙে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে—শহর বড় করবে আর কি।

খালের ধারে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে ভূতনাথ টিনের বাক্সটা রাখলে। তারপর তার ওপরেই বসে পড়লো। খালের ওপর দিয়ে মালপত্র বোঝাই নৌকো চলেছে। বড়-বড় বাঁশের লগি দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে ডোঙা চলেছে। ওরা কত দূর-দূরান্ত থেকে আসছে কে জানে। শহরে এসে কাঁচামাল বিক্রি করবে। ফেরবার সময় কেরোসিন, দেশলাই, নুন, কলের কাপড় কিনে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবে আবার। অলস দৃষ্টিতে সব দেখতে দেখতে ভূতনাথের কেমন মনে হলো—কেন সে এখানে বসে আছে। তার কি যাবার জায়গার অভাব? এখনি সে বড়বাড়িতে যেতে পারে। তার চোরকুঠুরিতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় বাঁধা। বৌঠানকে নিয়ে বরানগরে একবার যাবার কথা আছে। সেখানে গিয়ে ভূতনাথ নিজেও একবার মানত করে আসবে পাঁচ পণ সুপুরী আর পাঁচ গোছ পান দিয়ে।

আবার উঠলো ভূতনাথ। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো সোজা রাস্তা ধরে। বংশী তাকে দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে বটে! বলবে—এ কি, ফিরে এলেন যে—দেশে যাননি শালাবাবু?

ভূতনাথ বলবে—না রে বংশী, তোদের ছেড়ে যেতে চাইল না মন। ফিরেই এলাম তাই—আর ক'টাই বা দিন। তারপরে তো বড়বাড়ি খালি করতেই হবে! তখন?

কিন্তু এক জনের কথা যেন জোর করেই ভুলে থাকতে চেষ্টা করলো ভূতনাথ। সে কি করে সম্ভব! ভালোবাসার প্রশ্ন নয়। চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নও নয়। কিন্তু সে কেমন করে গিয়ে বলবে তাকে—আমিই সেই! আমার অধিকারের দাবি নিয়ে আমি এসেছি—আমাকে গ্রহণ করো। শুধু দুটো মন্ত্র আর এক রাত্রির ষড়যন্ত্রের পরিণামফল! জবার জীবনে সে-রাত্রিটা কি চিরকাল একটা বিড়ম্বনা হয়েই থাকবে? জবার সেই বিড়ম্বনাই কি ভূতনাথ চেয়েছিল?

ভাবতে ভাবতে এক সময় ভূতনাথ আবার চলতে আরম্ভ করেছে। হাতে টিনের বাক্সটা যেন ক্রমেই ভারি ঠেকছে। মনে হলো—পথ চলা যেন তার শেষ হবে না। কোথায়ই বা যাবে! কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে সে? রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল, মোটর সমস্ত চলছে। হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো—সংসারে কেউ তো স্থির হয়ে নেই। কিন্তু যাচ্ছে কোথায় সবাই? সবাই কি উদর পূরণের অন্ন খুঁজছে? নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারিদিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে?

বহুদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো ভূতনাথের। ফতেপুরে নদীর ধারে একদিন এক বাউল এসে উঠেছিল। তখন সবে তার পিসীমা মারা গিয়েছে। কিছুই ভালো লাগে না। একদিন বেড়াতে-বেড়াতে গিয়েছিল ভূতনাথ সেখানে। ছোট খাঁচার মধ্যে একটা ময়না পাখী, একটা ঝোলা আর একটা একতারা—এই ছিল তার সম্বল। কিন্তু সেই একতারার মধ্যে দিয়েই সেদিন কী সুন্দর সব সুর যে বেরিয়ে এসেছিল! কত ভালো ভালো গান যে সেদিন শুনেছিল তার মুখে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস কবেছিল—হ্যাঁ গো ঠাকুর, তোমরা কি জাত?

বাউল উত্তর দিয়েছিল—আমরা বাউল বাবা।

—তোমরা আমাদের মতো হিন্দু তো?

বাউল বলেছিল—না বাবা, আমরা বাউল।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—তোমরা আমাদের মতো ঠাকুর পুজো করো? ভগবান মানো?

—তা মানি বৈকি বাবা!

—তবে তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাত কোথায়?

বাউল উত্তর দিয়েছিল—তফাত তো বাইরে নয় বাবা, ভেতরে। হিন্দুরা মন্দির গড়ে, প্রচার করে—আমরা প্রচার করিনে, মন্দিরও গড়িনে। হিন্দুরা বাইরে ছড়ায়, আমরা ভেতরে গুটোই। আমাদের গুরুর উপদেশ হলো প্রথমে নিজেকে জানতে হয়, নিজেকে জানলে তবেই নিজের মধ্যে ভগবানকে পাওয়া যায়।

—কিন্তু সে কথা তোমবা দশজনকে জানাও না কেন? না জানালে লোকে তোমাদের কাছে আসবে কেন?

বাউল হেসেছিল। কল্‌কেতে টান দিতে দিতে বলেছিল—আসবে বাবা আসবে, একদিন নিশ্চয়ই আসবে।

আজ এতদিন পরে ভূতনাথ যেন বাউলের সে-কথাটার মানে বুঝতে পারলে। মনে হলো সবাই যেন নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যেই বেরিয়ে পড়েছে। নিজেকে না পেলে নিজের চেয়ে যে বড়ো তাকে পাবার ... কোনো উপায় নেই। মনে হলো—ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকটি মানুষ যেন সেই একটি লক্ষ্য ধরে ছুটে চলেছে। মানুষের নিজের গড়া আচার-অনুষ্ঠানই তাকে কেবল মনে করিয়ে দেয়—এই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এর সমাপ্তি নেই। প্রাত্যহিক উদর পূরণ আর সামাজিকতা রক্ষার মধ্যে তার পূর্ণচ্ছেদ নয়। সে এমন এক আত্মসত্তাকে খুঁজছে যে, তার বর্তমানকে, তার অতীতকে, তার প্রবৃত্তিকে, তাব বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর-দূরান্তে চলে গিয়েছে।

মনে পড়লো—সুবিনয়বাবুও সেই কথাই বলতে"। আত্মানং বিদ্ধিঃ। আপনাকে জানো। মনে পড়লো—এই আপনাকে জানার সাধনাই করে গিয়েছেন সুবিনয়বাবু। এই আপনাকে জানার সিদ্ধিলাভ করতেই ব্রজরাখাল দীক্ষা গ্রহণ করেছে। পটেশ্বরী বৌঠান আপনাকেই জানতে চাইছে এতদিন ধরে। ছোটকর্তা, ছুট্টুকবাবু, ননীলাল, চুনীদাসী, বংশী, বিধু সরকার সবাই যেন সেই আপনাকেই জানার সাধনা করে আসছে।

সকাল পেরিয়ে দুপুর হতে চললো। রোদের তেজ বাড়ছে। কিন্তু তবু যেন কষ্ট হলো না ভূতনাথের। হাতের টিনের বাক্সটা যেন ক্রমশ বড় হাল্কা হয়ে গিয়েছে। হাল্কা হয়ে গিয়েছে শরীর।

ভূতনাথ আবার একটা জায়গা দেখে বসে রইল কিছুক্ষণ। মনে পড়লো—আর-একদিনের কথা। সুবিনয়বাবু বলেছিলেন—একদিন এ কলকাতা ছিল না, এ ভারতবর্ষ ছিল না, এ পৃথিবীও ছিল না। শুধু ছিল বাষ্প। বাষ্পের পরমাণুগুলো তাপের বেগে চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার না ছিল সার্থকতা, না ছিল সৌন্দর্য। তারপর যখন সে সংহত হয়ে এক হলো, তখন গড়ে উঠলো এই পৃথিবী। ভূতনাথেরও মনে হলো—এতদিন সে-ও যেন প্রবৃত্তির তাপে, বাসনা-কামনার বেগে ছড়িয়ে ছিল চারিদিকে। কিছু দেয়ওনি। পায়ওনি কিছু। হঠাৎ যেন বড় সংযত হয়ে এসেছে মন। যেন সমস্ত বিচ্ছিন্ন-জানা একটি পরমপ্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়ে এসেছে। সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বাসনা একটি পরম প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নিজের মনের গভীরে দৃষ্টিপাত করে দেখলে ভূতনাথ। সেখানে জবা নেই।

কিন্তু পরমাশ্চর্যের ব্যাপার হলো—যা আপাতবিচ্ছেদ বলে মনে হবার কথা—তা যেন পরম পাওয়া বলে মনে হলো তার। মনে হলো—জবা আছে। এতদিন সে কাকে চেয়ে এসেছিল কে জানে। কিন্তু যাকেই সে চেয়ে আসুক—কখনও বা ভুল করে, আবার কখনও বা ভুল ভেঙে—আসলে সে-ও বুঝি সেই নিজেকেই জানার সাধনাই করে এসেছে। ছোটকর্তা বুঝি আজীবন নিজেকেই চেয়ে আসছে, চুনীদাসীও তাই, বৌঠানও তাই, সবাই তাই। সবাই যেন বলছে—সেই এককে জানো—জানো সেই নিজের আত্মাকে!

বনমালী সরকার লেন-এর সামনে এসেই কেমন যেন ধাঁধা লাগলো।

বড়বাড়ির সামনে যেন অনেক ভিড়। অনেক লাল পাগড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। ভিড় করে আছে চারপাশে আরো দশ-বিশজন লোক। বাড়ির গেট খোলা! বাড়ির ভেতরের অনেক জিনিস উঠোনে এনে নামিয়েছে। পাহাড় হয়ে জমে আছে বাক্স, বালতি, বাসন, কাঠের সরঞ্জাম—সমস্ত।

ভূতনাথ একজনকে জিজ্ঞেস করলে—এ-সব কী?

একজন বললে—পটলডাঙার বাবুরা বাড়ি দখল নিচ্ছে।

—দখল নিচ্ছে কেন? পরোয়ানা আছে?

—আজ্ঞে, আদালত থেকে পরোয়ানা নিয়ে তবে এসেছে, পটলডাঙার বাবুরা কি কাঁচা লোক নাকি?

—তোমাদের সেই ম্যানেজার কই?

ম্যানেজারকে দূরে কাছে কোথাও দেখা গেল না।

হঠাৎ দূর থেকে বংশী ভূতনাথকে দেখতে পেয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে দৌড়ে এসেছে।—শালাবাবু, কী হবে, কী হবে শালাবাবু?

ভূতনাথ বললে—এ-সব কী হচ্ছে? ছোটকর্তার হুকুম নিয়েছে? মাল বার করতে কার হুকুম নিয়েছে এরা?

—কার আবার হুকুম নেবে শালাবাবু?

—কেন, যার বাড়ি তার?

—হুকুম তো নেয়নি?

—তবে কেন মাল বার করতে দিলি তুই?

পুলিশগুলো দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। আর পটলডাঙার বাবুদের লোক ঘাড়ে করে, মাথায় করে ভারি-ভারি মাল নামাচ্ছে উঠোনের ওপর।

বংশী বললে—আমি এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে উঠবো কেন, শালাবাবু?

ভূতনাথ যেন কী ভাবলে খানিকক্ষণ! তারপর বললে—বৌঠান কি করছে রে?

বংশী তখনও কাঁদছিল। গলা নিচু করে বললে—আজ সকাল থেকে নেশায় একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে শালাবাবু—আজ যেন বড় বাড়িয়েছে ছোটমা।

—আর ছোটকর্তা?

—ছোটকর্তা কিছু বলছে না আজ্ঞে, চুপ করে শুধু জানলার বাইরে চেয়ে আছে ঠায়, একটা কথারও উত্তর দিলে না আমার—এত বললুম—এত বোঝালুম!

ভূতনাথ বললে—আমার সাইকেলটা একবার দে তো রে বংশী?

বংশী চোবকুঠুরি থেকে সাইকেলটা বার করে এনে দিলে।

ভূতনাথ বললে—তুই দেখিস তো—ছোটবৌঠান, ছোটকর্তা কেউ যেন কিছুতেই ঘর থেকে না বেরোয়। আমি আসছি এখুনি—বলে সাইকেল-এ উঠে সোজা বাইরে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

সেদিন ভূতনাথের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—বৌঠানকে এই অবমাননা থেকে বাঁচাতে হবে। বড়বাড়ির অতীত গৌরবের অবমাননা নয়। বিংশ-শতাব্দীর নতুন সভ্যতার সঙ্গে যারা খাপ খাওয়াতে পারলে না নিজেদের, তাদের অবমাননা নয়। অপমানটা বৌঠানের ব্যক্তিগত। কেমন যেন ভূতনাথ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল বৌঠানের ভালো-মন্দর সঙ্গে। এ শুধু কৃতজ্ঞতা নয়। শুধু করুণার ঋণশোধের ব্যর্থ চেষ্টা নয়। শুকনো কর্তব্যও নয়। এ যেন পরমাত্মীয়কে রক্ষা। পরমাত্মীয়ের চেয়েও যদি বড় কেউ থাকে, তাকে।

বৌঠান বলেছিল—আমি যদি মরে যাই, তুই একটি বারের জন্য কাঁদিস ভূতনাথ। আমার জন্যে কেউ কাঁদবে, এটা ভাবতেও বড় ভালো লাগে রে!

কিন্তু কাঁদবার অবশ্য প্রয়োজন হয়নি শেষ পর্যন্ত। তেমন দিন সত্যিই যখন এসেছিল—তখন ভূতনাথ নতুন এক উপলব্ধির সন্ধান পেয়েছে। নতুন আত্মানুভূতি। ভূতনাথ তখন নিজেকে জানতে পেরেছে। সুবিনয়বাবুর ভাষায়—আত্মানং বিদ্ধিঃ। পৃথিবীতে কারোর জন্যে কাঁদবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গিয়েছে তখন।

প্রথম-প্রথম জবার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ভেতরে যাবার লোভও হয়েছে। জবার মেয়ের গানের শব্দ শুনে অনেকবার দ্বন্দ্ব উদয় হয়েছে মনে। কিন্তু তারপর সে জয় করেছে নিজেকে। সকলকে হারিয়ে সে যে পৃথিবীকে পেয়েছে। নিজেকে জেনে সে যে বিশ্বকে জেনেছে।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

সেদিন মনে হয়েছিল যেমন করে হোক সে পটলডাঙায় গিয়ে আদালতের পরোয়ানা বাতিল

করে আনবেই। সে পা জড়িয়ে ধরবে বাবুদের। বললে—আপনাদের যেমন করেই হোক এ হুকুম প্রত্যাহার করতেই হবে।

দারোয়ান হয়তো ভেতরে ঢুকতে দেবে না। বাবুরা হয়তো বাড়িতে থাকবে না। কিন্তু তবু ভূতনাথ সেই সদর দরজার সামনেই বসে পড়ে থাকবে। প্রত্যাহারের আদেশ না নিয়ে সে ফিরবে না। না প্রত্যাহার হলে সে-ও ফিরবে না এখানে। দিনের-পর-দিন সে ওইখানেই পড়ে থাকবে। দরজার সামনে অভুক্ত থাকবে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত।

সাইকেল-এ চড়ে যেতে যেতে আবার মনে হলো—কেন সে যাচ্ছে! এও সেই আত্মবোধের তাড়নাতেই বুঝি সে ছুটে চলেছে। এই আত্মবোধের তাগিদেই সে বৌঠানকে বাঁচাচ্ছে। বৌঠানকে বাঁচানো তার নিজেকে বাঁচানোরই নামান্তর।

কিন্তু বনমালী সরকার লেন তখনও পার হয়নি। হঠাৎ মনে হলো যেন ম্যানেজার আসছে ওই দিক থেকে। ভূতনাথ থামলো। নামলো সাইকেল থেকে। ডাকলে—ম্যানেজারবাবু...

ম্যানেজারও হন-হন করে আসছিল। হন-হন করে হাঁটাই তার অভ্যেস। আস্তে হাঁটতে যেন পারে না ম্যানেজার। ব্যস্ত না হলে যেন বাঁচতে পারে না লোকটা।

আবার ডাকলে ভূতনাথ—ও ম্যানেজারবাবু...

এবার ফিরে দাঁড়ালো। চাইলে ভূতনাথের দিকে একবার। কিন্তু চিনতে পারলে না। হাঁ করে ভূতনাথের মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমায় ডাকলে যেন কে?

—আমিই ডাকছিলাম।

—কেন? কে তুমি?

হাতে সেই পেটফোলা ব্যাগ। ছুঁচলো গোঁফ। চিনতে ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু কিছুই সহজে চিনতে পারার লোক নয় বুঝি ম্যানেজার। সহজে কাউকে চিনতে পারা বোধ হয় দুর্বলতার লক্ষণ। ননীবাবুর ম্যানেজার হাজারটা কাজের লোক। হাজারটা লোক তার পায়ে ধর্না দিয়ে বেড়ায়। এত সহজে চিনতে পারলে চলবে কেন তার?

ভূতনাথ বললে—আমি বড়বাড়ির লোক—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে।

ম্যানেজার এতক্ষণে বললে—ও, তা ভালোই হলো—আমিও তো ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিলাম বড়বাড়িতে—সেই সকালবেলা বেরিয়েছি, আর এই দুপুরবেলা সবে এসেছি ফিরে, এমন সময় হুকুম হলো যাও বউবাজার—হুজ্জতের কাজ হয়েছে বটে।

ভূতনাথ বললে—বাবুরা আছে নাকি কেউ বাড়িতে?

—কেন? বাড়িতে যাবে কেন! সকাল থেকে হাজার জন লোক বাড়িতে দেখা করতে ছোটে, বাবুরা পই-পই করে বারণ করে দিয়েছে, কাল সবাইকে খেদিয়ে দিয়েছি, সারাদিন কাজের পর একটু জিরোবে, গল্প করবে, তা না রাত্তির পর্যন্ত লোকের আর কামাই নেই মশাই।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু পুলিশ-পেয়াদা এনে বাড়ি চড়াও হয়ে এই যে হলো—এতদিনের বংশ, তা ছাড়া ধরুন রুগী মানুষ—বাবুদের একটু দয়ামায় নেই? আর ননীবাবুকে তো টেলিগ্রাম করাই হয়েছে, জবাবটা কী আসে না-দেখেই—

ম্যানেজার হঠাৎ বললে—সেই টেলিগ্রামেই তো এত কাণ্ড—রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো ম্যানেজার। বলেছিলাম খবর দিও না সেখানে, খবর পেলে সাহেব চটে উঠবে, বলিনি তোমাদের, মনে করে দেখো দিকিনি—বলেছিলাম কিনা? শুধু-শুধু এতগুলো টাকা লোকশান—আমার কী, আমার হুকুম তামিল করা কাজ, বাবুদের লোকশান হয় বাবুরা বুঝবে—আমি কেন মাঝখানে কথা বলতে গেলাম।

তারপর ব্যাগটা খুলে—ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাগজপত্র ঘাটতে লাগলো ম্যানেজার। বললে—সেই সকাল থেকে রোদ্দুরে তেতেপুড়ে এখন আবার ছোটো বৌবাজার—বাবুদের আমি দেবো দু'কথা শুনিয়ে, তা হলে মিছিমিছি মামলা-মোকদ্দমা আদালত-কাছারি করে এত কষ্ট

দেওয়াই বা কেন আর এই বুড়ো লোকটার মিছিমিছি হয়রানি।

অনেক কষ্টে বুঝি পাওয়া গেল কাগজটা। রাগের মাথায় কাগজটা নিয়ে বললে—চলো, এখন এই কাগজটির জন্যেই এই হয়রানি।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কীসের কাগজ?

ম্যানেজার তখন আবার হন-হন করে চলতে শুরু করেছে। ভূতনাথও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। ম্যানেজার বললে—এতক্ষণ বোধ হয় সব মালপত্তোর নামিয়ে ফেলেছে, কি বলো?

ভূতনাথ বললে—তা নামিয়েছে বৈকি! মাল তো আর একটা নয়!

—কিন্তু, যা নামিয়েছে, আর নামাবে না, কিন্তু ওঠাতে হবে তোমাদের লোক দিয়ে—তা বলে রাখছি। আমরা নামাবো আবার ওঠাবোও, তা হবে না। লোকশানের ওপর লোকশান কেবল—কথা বলতে বলতে বড়বাড়ির দিকেই চলতে লাগলো ম্যানেজার।

ভূতনাথও চলতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে। বললে—মালপত্তোর তা হলে কি আর নামাবে না ওরা?

—আরে বাপু, না, না—নামাবে না তো বললুম—এক কথা একশ'বার—হুজ্জতের কাজ হয়েছে দেখছি। বড়বাড়ির ভেতরে এসে ম্যানেজার ডাকলে—ওরে—এ—ই—ই, কী নাম যেন ওর—কৈলাশ...

কৈলাশ যেন ওদিকে ছিল। মালপত্তোর নামানোতে তারই উৎসাহ বেশি। হাঁক-ডাক হৈ-চৈ করে সে-ই এতক্ষণ সব তদ্বির-তদারক করেছে। সকাল থেকে এসে লোকজন পুলিশ-পেয়াদা-সেপাই নিয়ে কাজে লেগে গিয়েছিল।

ম্যানেজার বললে—হাতের কাজ সব বন্ধ করতে বল।

—সে কি ম্যানেজারবাবু?

—যা বলছি তাই কর, আমরা হুকুমের চাকর।

—আর এ মালপত্তোর?

—এ-সব থাকবে, যেমন আছে, যাদের মাল তারা ওঠাক—আমার একবার ওঠাবো, একবার নামাবো, লোকশানের কপাল হয়েছে তাই—নইলে হাতীবাগানের সবকারবাড়িতে এক রাত্তিরে মাল নামিয়ে, সেইখানেই বসে মাল আবার নীলেমে বেচে তবে উঠেছিলুম—কিন্তু এমন করলে আর বন্ধকী কারবার চলবে না তাও বলে রাখছি।

ভূতনাথ বললে—তা হলে কি ছোটবাবুরা এখন বড়বাড়িতে থাকতে পাবে ম্যানেজারবাবু?

ম্যানেজার বললে—তা ছাড়া আর কি, সাহেব বিলেত থেকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে। এর আর নড়চড় হবার উপায় নেই—সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করেই যত গোল করলে তোমরা।

—বরাবর থাকতে পাবে তো?

—বরাবর কেন? এই তো হুকুম-নামা রয়েছে। দেখো না—বলে হাতের কাগজখানা দেখালে।

—যদ্দিন কর্তারা বেঁচে থাকবে, তদ্দিন ভোগদখল করবে এই পর্যন্ত—তারপর...

বংশীও পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বললে —তাহলে শালাবাবু, ছোটবাবুকে থাকতে দেবে?

উত্তর দেবার আগেই একটা গাড়ি ঢুকলো সদর দিয়ে। ওপরে কোচবাক্সে বসে ইব্রাহিম গাড়ি চালাচ্ছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজালে পা ঠুকে। মেজবাবু গাড়ি থেকে নামলো।

বংশী গিয়ে নিচু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

মেজবাবু যেন আরো কালো হয়ে গিয়েছে এদানি। অনেকদিন পরে দেখা। শরীর ভেঙে গিয়েছে আরো। তবু কোঁচানো ধুতি মাটিতে লুটোচ্ছে। পামশু পায়ে। মাথায় বাবড়ি চুলের ফাঁকে যেন একটু-একটু টাক পড়েছে। গায়ে এসেন্সের গন্ধ। ভুর-ভুর করতে লাগলো জায়গাটা।

—পটলডাঙার লোক কোথায় গেল রে?

ম্যানেজার সামনে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে প্রণাম করলে।

মেজবাবু বললে—কে তুমি? নাম কি তোমার?

মেজবাবুর সামনে ম্যানেজার যেন হঠাৎ ফণা গুটিয়ে নিয়েছে। ছুঁচলো গোঁফ দুটো যেন হঠাৎ বড় ঝুলে এল। মিন-মিন করে নিজের নাম বললে ম্যানেজার।

মেজবাবু বললে—বেশ, বেশ, তোমাদের কাছেও টেলিগ্রাম এসেছে, আমাকেও করেছে টেলিগ্রাম, ননীবাবু লোকটি ভালো, তা এবার তোমাদের আর কাজ কি—যেতে পারো এখন।

মেজবাবুর সঙ্গে বেণীও এসেছিল। বেণীর শরীরটাও খারাপ হয়ে গিয়েছে। ইব্রাহিমেরও গায়ে আর সে উর্দি নেই। মাথার বাবড়ি কিন্তু পরিপাটি। কাঠের চিরুণী দিয়ে আঁট করে বাঁধা। আর মোম লাগানো গোঁফ।

মেজবাবু বললে—চল তোর ছোটকর্তাকে দেখে আসি, কেমন আছে আজকাল?

তারপর ইব্রাহিম, বেণী, বংশী সবাই মিলে আবার সেই সব মালপত্তোর ওঠানো। ভারি-ভারি মাল সব। সেকালের সামগ্রী। ভারি না হলে যেন মানাতো না। এক-একটা কাঠের পিঁড়ি চারজনে ধরে তবে নড়াতে পারা যায়। এক-একটা শিল, বাসন, কাটারি, জলচৌকি, তোষক, গদি, সিন্দুক একলা নড়ায় কার সাধ্যি! কোম্পানীর আমলের জিনিস সব। সস্তাগণ্ডার দিন ছিল তখন। কোম্পানী বাহাদুরের আমলে চল্লিশ মণ চালের দাম ছিল পঁচাত্তোর টাকা। পাঁচ মন ঘি সাতাত্তোর টাকা, পাঁচ মণ সরষের তেল একান্ন টাকা। এ-সব জিনিস বড়বাড়িতে মণ-মণ আসতো। খেতও এবেলা-ওবেলা অনেক লোক। ইংরেজ আমলেই প্রথম এল গোল-আলু। তা তাও সস্তা হলো ক্রমে। শুধু যা বাঁধাকপিটাই ছিল একটু আক্রা। ওটা খেতো সাহেব-সুবোরা।

মালপত্তোর উঠতে বিকেল হয়ে গেল। সারাদিন কারোর খাওয়া হয়নি। রান্নার পাট হয়নি সকাল থেকে। যে-কাণ্ড চলেছে বাড়িতে। মাথার ঠিক ছিল না কারো। উনুনে আগুন পড়লো তখন। সেজখুড়ি ভাত চড়ালো। বংশী বাজারে গেল মাছ তরকারি আনতে। যাবার সময় বললে—আপনি যেন বেরোবেন না আজ্ঞে—একেবারে খেয়ে-দেয়ে তবে বেরোবেন।

ভূতনাথ বললে—আমার যে একবার বার-শিমলেয় কাজ আছে বংশী।

—না, না, শালাবাবু, না খেয়ে যাবেন না, ছোটমা জানলে রাগ করবে হুজুর।

—ছোটমা-ও কি না খেয়ে আছে বংশী?

—ছোটমা'র খাওয়ার কথা আর বলবেন না শালাবাবু, আজ যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, কোনোদিকে খেয়াল নেই তার। জানতেও পারলে না কিছু। সকালবেলাই এক বোতল খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। সকাল থেকে বায়না ধরেছিল চান করবেন না, তারপর চিন্তা বলে-কয়ে চান-টান করিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছে—তা আমি যখন গিয়ে বললুম—ছোটমা, আজ ভাত হতে দেরি আছে—এই জলখাবারটুকু খেয়ে নাও ততক্ষণ। ছোটমা প্রথমে শুনতে পেলে না। চোখ বুজে শুয়ে পড়ে রইল। আবার যখন বললুম, তখন বললে—খাবো না আমি, নিয়ে যা আমার সামনে থেকে।

বললাম—না খেলে কী করে বাঁচবে—শুধু মদ খেলে পেট ভরবে? ছোটমা বোধ হয় রেগে গেল। চোখ খুলে আমার দিকে তাকালে খানিকক্ষণ। আমি ভাবলাম—তাহলে বোধ হয় রাগ থেমেছে। পাথরের রেকাবিটা সামনে এগিয়ে দিলাম আজ্ঞে—তা সঙ্গে-সঙ্গে ছোটমা পা দিয়ে পাথরখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—মেঝের ওপর পড়ে সেখনা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল শালাবাবু।

মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরুলো না আমার। কোথায় আমার মাথায় ভাবনা, সেই ভোর এস্তোক ওরা এসে জ্বালাচ্ছে, মালপত্তোর নামাচ্ছে, ঘর খালি করতে বলছে, এত করে ঝাঁট দিলুম ঘর, সব ধুলো-কাদায় একসা করেছে—তার ওপর এই কাণ্ড, পাথর-বাটি ভাঙা কি ভালো শালাবাবু, গেরস্তর অকল্যাণ হয় যে—তা আমি আর থাকতে পারলুম না. আজ্ঞে, মুখ বুজে থেকে থেকে আমার বুকের ভেতরটা একেবারে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে যে।

—তা, কী বললে তুমি?

বংশী বললে—মুখে যা না-আসে, তাই বলে ফেললাম আজ্ঞে, আমার মুখের রাশ আলগা করে দিলাম একেবারে। আমার তো আর জ্ঞানগম্যি ছিল না তখন, রাগের ঝোঁকে কী বলেছি, তা কি আর মনে আছে ছাই আমার?—তা দেখি ছোটমা কাঁদছে হুজুর।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কাঁদছিল বৌঠান?

বংশীর চোখ দিয়েও হঠাৎ ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো। কাপড়ের খুঁট দিয়ে জলটা মুছে নিয়ে বংশী বললে—দেখে তো আমার জ্ঞান ফিরে এল—ভাবলাম করছি কী! ছোটমা'র না-হয় জ্ঞান নেই, নেশার ঘোরে যা তা করছে—কিন্তু আমি করছি কী! আমার অন্নদাতা মা'কে আমি নাহাতক গালাগালি দিলাম এমন করে! আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না—তা সেখানেই বসে পড়ে ঠাস-ঠাস করে আমার গালে চড়াতে লাগলাম আজ্ঞে—কিন্তু তাতেও যেন প্রাচিত্তির হলো না আমার, দেয়ালের গায়ে কপালটা ঠুকতে ঠুকতে বললাম—আমার মিত্যু হোক—আমার মিত্যু হোক—আমার মিত্যু হোক—আমার মিত্যু হয় না কেন রে—সেইখানে দাঁড়িয়েই আবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো বংশী।

বংশী চোখটা কাপড় দিয়ে মুছে নিলে। তারপর বললে—যাই আবার একবার বাজারের দিকে। এ-বেলায় বোতল নেই—শা-মশাই-এর দোকান থেকে আবার আনতে হবে একটা—যদি আনতে ভুলে যাই, তাহলেই চিত্তির!

তারপর থেমে বললে—আমার হয়েছে এই জ্বালা শালাবাবু—কাকেই-বা বলবো—কে-ই বা বুঝবে। ওদিকে চিন্তা ছোটমাকে দেখেই খালাস, সেজখুড়ির রান্না করেই কাজ শেষ—আর বাকি সব কাজ—ছোটবাবুর ময়লা-মুক্ত থেকে ভেতর-বাইরের সব কাজ, এই বংশীকে করতে হবে—আমি তো মানুষ বটে।

ভূতনাথ বললে—এক বার ছোটমা'র সঙ্গে এখন দেখা কবিয়ে দেবে বংশী? বার-শিমলেয় যাবার আগে এক বার শুধু দেখা করতাম—দুটো কথা বলতাম।

বংশী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—আপনি আর ছোটমা'র সঙ্গে দেখা করবেন না হুজুর।

—কেন?

—আজ্ঞে, আপনার ভালোর জন্যেই বলছি—দেখা করবেন না কখনও।

—কেন, ও-কথা কেন বলছো?

বংশী রেগে গেল—ওই আপনার এক দোষ, বড় একগুঁয়ে, বলছি দেখা আর করবেন না, আপনার নিজের ভালোর জন্যেই না বলছি আমি।

ভূতনাথের কেমন যেন রোখ চেপে গেল। বললে—দেখা আমি করবোই।

—তবে করুন, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন তাহলে? আমি বলছি দেখা করলে আপনার ভালো হবে না—ভালো হবে না—ভালো হবে না—এই বলে দিলাম তিন বার।

ভূতনাথ বংশীর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। বংশী তার দৃষ্টি তখন অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছে। বললে—কিন্তু কেন দেখা করবো না, আমাকে তা বলবে তো? আমার ভালোটা না-হয় আমাকেই জানালে?

বংশী বললে—সব কথায় আপনার কান দেওয়া চাই—না শুনলেই ভালো করতেন। যা হোক, এই এখনই বেণী এসেছিল, সে-ই সমস্ত আমাকে বলে গেল।

—কী বলে গেল?

—আপনি যেন আবার কাউকে বলবেন না, বেণী আমাকে চুপি চুপি বলে গেল—মেজবাবু সব খপর পেয়েছে এ-বাড়ির, আপনাকে মারবার জন্যে গুণ্ডা রেখেছে আজ্ঞে।

ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। বললে—আমাকে মারবার জন্যে গুণ্ডা রেখেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মেজবাবুকে তো আপনি চেনেন না, গুণ্ডা কি আজ থেকে আছে? সেকাল থেকে দেখে আসছি মেজবাবু গুণ্ডা পোযে, মেয়েমানুষ মদ যারা করে, তাদের গুণ্ডাও রাখতে হয়, আজ্ঞে, ও বরাবর আছে। ছোটবাবুর গুণ্ডার দল ছিল জানবাজারে, ছেনি দত্তর ছিল, ও

সকলেই রাখে, নইলে অত রাত্তিরবেলা ঘোরাফেরা করে, গুণ্ডা না রাখলে কলকাতা শহরে চলবে কেন?

—তা গুণ্ডা আমাকে মারবে কেন?

—ওই যে আপনাকে দেখেছিল সেবার ছোটমা'র ঘরে, তারপর খপর তো সব পায়, গরাণহাটায় চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু খপর সব রাখে এ-বাড়ির। কী দিয়ে আমরা ভাত খাই, কী করি, সব খপর যায় গরাণহাটায়।

—কী করে যায়?

—শুধু কি গরাণহাটায়? পাথুরেঘাটায়, ছুটুকবাবুর শ্বশুরবাড়িতে পর্যন্ত এ-বাড়ির রোজকার খপর চলে যায়, আবার গরাণহাটা, পাথুরেঘাটার খপর আমরা জানি। ঝি-চাকর থাকলে এমন খপর-চালাচালি তো হবেই শালাবাবু।

—কিন্তু আমাকে গুণ্ডা দিয়ে কেন মারবে বংশী?

—আমি তো জানি না কিচ্ছু, বেণী এসে আমায় যা বললে তাই বললাম। বললে—শালাবাবু নাকি ছোটমা'র ঘরে যায় রাত্তিরবেলা, মদ খায় দু'জনে, বাইরে বেরোয় গাড়ি করে—এটা তো ভালো নয়। মেজবাবু বলে—আমাদের বংশে বউরা কখনও সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখেনি। তা কথাটা সত্যি শালাবাবু, আমার মনে আছে, সেকালে আমরা চাকররা পর্যন্ত অন্দরে ঢুকতে পেতুম না। ঝি-এর মারফৎ ফরমাশ আসতো আর হুকুম তামিল করতাম আমরা—তা একালে তো সব বেহ্ম হয়ে গিয়েছে। সাহেব-সুবো এসে খানা খাচ্ছে—রাস্তায় ঘাটে মেয়েছেলেরা বেড়াচ্ছে—তা তাই মেজবাবুর রাগ আপনার ওপর, বলে দিয়েছে—রাস্তায় বেরোলে ফাঁক পেলেই একেবারে খুন করে ফেলতে।

ভূতনাথ শুনে চুপ করে রইল। বংশী বললে—একা-একা রাত-বিরেতে রাস্তায় না-ই বেরোলেন, গুণ্ডার কাণ্ড তো, কখন কী করে বসে।

ভূতনাথ খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—নিজের জন্যে আমার কোনো ভয় নেই বংশী, আমি তো দেখেছি, আমার পেছন-পেছন লোক ঘোরাঘুরি করে—যখন যেখানে যাই, সেখানে যায়। একদিন ভাবলাম জিজ্ঞেস করবো—তা সরে গেল তাই।

—ওই—ওই—ওই, ও ঠিক মেজবাবুর লোক।

—কিন্তু সে তো ভাবছি না আমি, আমি ভাবছি বৌঠানের জন্যে। আমার জন্যে কি বৌঠানের বদনাম হবে—বিপদ হবে—তার চেয়ে আমি চলেই যাই না কেন এখান থেকে—মিছিমিছি আমি অন্ন ধ্বংস করছি এ-বাড়ির।

বংশী বললে—এমন কথা বলবেন না হুজুর—আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি—ছোটমা পর্যন্ত জানেনা—কিন্তু আপনার টাকাতেই তো এখনও—

ভূতনাথ বললে—ও-কথা থাক, ওই গুণ্ডার কথা যা বললে, ওটা আর কেউ জানে?

—না, কেউ জানে না হুজুর, কিন্তু বেণী সাবধান করার জন্যেই বললে আমাকে।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু একবার বৌঠানকে নিয়ে বরানগরে যেতেই হবে।

—বরানগরে আপনারা কোথায় যান বলুন তো শালাবাবু?

—সে—এক সাধুর কাছে, বৌঠান ছোটকর্তার অসুখের জন্যে পূজো দেবে, আমিও বৌঠানের ভালোর জন্যে পূজো দেবো—বাজারেই তো যাচ্ছো, আমাদের দু'জনের জন্যে পাঁচ গোছ পান আর পাঁচ পণ করে সুপুরী আনতে পারো?

—তা পারবো না কেন শালাবাবু?

—আনতে পারলে আজই যাই, এই পয়সাটা রাখো।

বংশী বললে—পয়সা আর দেবেন না হুজুর, কত পয়সা আপনি পাবেন আমার কাছে, তারই হিসেব করুন আগে।

ভূতনাথ বললে—আমাকে তবে একবার বৌঠানের ঘরে পৌঁছে দাও বংশী।

সকালবেলার গণ্ডগোল শেষ হতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। সকাল থেকে খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। মেজবাবু এসে ছোটকর্তার সঙ্গে এক মিনিট দেখা করে আবার যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গিয়েছে। ইব্রাহিম গাড়ি চালিয়ে গিয়েছে একলাই। ইয়াসিন বোধ হয় বরখাস্ত। কিন্তু আজ আর ব্রিজ সিং নেই যে, গাড়ির ঘণ্টা শুনেই গেট খুলে চিৎকার করে উঠবে—হুঁশিয়ার হো! আজ আর আস্তাবলবাড়িতে ঘোড়ার ডলাই-মলাই নেই, আজ আর পেটা-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজানো নেই, আজ আর ঐশ্বর্য, বিলাস, বাবুয়ানি, মোসাহেব, কিছুই নেই। সেই পেটের ব্যথাটা হবার পর থেকেই নাকি মেজবাবু মদ ছেড়ে দিয়েছে। আশ্চর্য! মেজবাবু, ছোটবাবু সবাই মদ ছাড়তে পারলো। বৌঠানই পারল না শুধু, এ কেমন কথা!

বৌঠানের ঘরের কাছে যেতেই চিন্তা বললে—ছোটমা পূজো করছে। তারপর ঘোমটার আড়াল থেকে চিন্তা আবার বললে—আপনি ভেতরে যান—এইবার উঠবে ছোটমা।

যশোদাদুলালের গায়ে তখনও সোনা মোড়া। সোনার বাঁশি। সোনার মুকুট। হীরের চোখ। বৌঠান ঠাকুরের দিকে মুখ করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তখনও একমনে প্রণাম করছে, বৌঠানের ঠাকুর-প্রণাম যেন আর শেষ হয় না। শাড়ির আঁচলটা গলায় জড়ানো। মস্তবড় খোঁপাটা মাথার সঙ্গে আঁটা। তার ওপরে সোনার চিরুনি। চিরুনিতে মীনে-করা ছবি। লতা পাতা ফুল। মাঝখানে বড়-বড় করে লেখা—'পতি পরম গুরু'। বৌঠান বার-বার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। এইবার বুঝি শেষ হলো পুজো। ভূতনাথ অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়ালো বৌঠান।

ভূতনাথ দেখতে লাগলো! কী অপূর্ব যে লাগলো দেখতে। এত যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বড়বাড়ির—সে ঐশ্বর্য নেই, সে নাম-ডাক নেই, নেই সেই ভোগ, কিন্তু আশ্চর্য, বৌঠানের রূপের যেন পরিবর্তন হতে নেই। প্রথম যেদিন বৌঠানকে দেখেছিল এই ঘরে আজ এত বছর পরেও সে রূপ যেন তেমনি আছে! তেমনি অটুট, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মাথাভরা চুল। তেমনি দুধ-সোনা রং। তেমনি গড়ন, তেমনি স্বাস্থ্য। সত্যি জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ। যে বলেছিল—সে এক তিল বাড়িয়ে বলেনি। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটু কি কোনো খুঁত থাকতে নেই! ভগবান মানুষকে এমন নিখুঁত করে এই বুঝি প্রথম গড়েছে। মনে হয়—আজকাল যেন বয়েস আরো কমে এসেছে বৌঠানের, রূপ যেন আরো ফেটে পড়ছে শরীরে। দুঃখে কষ্টে রূপ যেন খুলছে বৌঠানের আরো।

ভূতনাথ বললে—আমি এসেছি বৌঠান।

—ওমা, তুই? হঠাৎ চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বৌঠান।

ভূতনাথ এমন সুস্থ অবস্থায় অনেকদিন দেখেনি বৌঠানকে।

—দেশে যাসনি ভূতনাথ?

ভূতনাথ বললে—না।

—তবে যে বললি যেতেই হবে, না গেলে চলবে না—বলে বৌঠান মেঝের ওপর বসলো।

ভূতনাথও বসলো সামনে। বললে—দেশে যাবার কাজ এখানেই মিটে গেল, তাই আর গেলাম না—কিন্তু আমি আর-একটা কথা বলতে এসেছি বৌঠান। এবার ভাবছি এখান থেকে চলে যাবো—অনেকদিন তো রইলুম তোমাদের গলগ্রহ হয়ে।

বৌঠান কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—যাবি? কোথায় যাবি?

ভূতনাথ বললে—কোথায় যাবো তা ঠিক করিনি এখনও—কিন্তু যাবো—অনেক দিন কষ্ট দিলুম তোমাদের।

বৌঠান রেগে গেল। বললে—মিথ্যে কথা বলতে তোর মুখে বাধলো না ভূতনাথ?

—মিথ্যে নয় বৌঠান—আর এখানে থাকা ভালো দেখায় না।

বৌঠান কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—নিজের সংসার-ধর্ম করতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?

ভূতনাথ মুখ নিচু করে বললে—যদি হয়, তাতে কিছু অন্যায় আছে কি?

—অন্যায় কিছু নেই, কিন্তু সংসার-ধর্ম এ-বাড়িতে থেকেও তো হয়, এ-বাড়িতে এত ঘর পড়ে আছে, বিয়ে করে এখানেই থাকবি, আমি তোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিয়ে করতে পাঠাবো, আমার বাড়ির বউ আসবে, দুধে আলতায় পা ঠেকিয়ে বউকে বরণ করে ঘরে তুলবো, এ যে আমার বহুদিনের সাধ রে ভূতনাথ!

—কিন্তু তোমার এ-সাধ কোনো দিন পূর্ণ হবে না বৌঠান।

—কেন?

—হবে না, তোমার ভাগ্যে নেই বলে। কিন্তু সে কথা থাক, আমি যাবোই, আমাকে আর তুমি ঠেকিও না বৌঠান, হাসিমুখে আমাকে যেতে দিও, নইলে আমার আর যাওয়া হবে না। তোমাকে কাঁদিয়ে আমি বোধ হয় স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবো না।

বৌঠান হাসতে লাগলো। বললে—কিন্তু তোকে যদি আমি যেতে না দিই ভূতনাথ?

ভূতনাথ বললে—ঠিক জানি না বৌঠান, কিন্তু তুমি যেতে না দিলে আমার বোধ হয় আর যাওয়াই হবে না।

বৌঠান বললে—তবে আর যাস নে ভাই, তবু জানবো মরবার সময় আমার জন্যে এক জন লোকও কাঁদবে। গুরুদেব বলেছিলেন—পট্টু সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে মরবে, তাই যদি হয় তো ভালো, কিন্তু তা কি হবে? আমার কপালে তা কি সইবে! দিনরাত তো তাই আমার যশোদাদুলালকে বলি যেন ছোটকর্তাকে রেখে আমি আগে যেতে পারি। তোকে বলে রাখলুম, সেদিন তুই আমায় তোর মনের মতো করে সাজিয়ে দিস ভূতনাথ, আমার সিঁথিতে জবজবে করে সিঁদুর লাগিয়ে দিবি, পায়ে আলতা পরিয়ে দিবি, আমার প্যাঁটরা থেকে বিয়ের দিনের বেনারসীটা বের করে পরিয়ে দিবি, গয়নাগাঁটি সর্বাঙ্গে পরিয়ে দিয়ে আমায় সোনায় মুড়ে দিবি। লোকে যেন বলে—সতীলক্ষ্মী বউ গেল।

ভূতনাথ চুপ করে শুনতে লাগলো। তারপর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আমি যাবো না বৌঠান, কিন্তু...

—কিন্তু কী রে?

—কিন্তু বলছিলাম, যদি আমি ব্রাহ্ম বউ নিয়ে আসি, তাকে ঘরে নেবে তুমি?

—ব্রাহ্ম? কেন রে?

—ধরো যদি তাই-ই হয়, তুমি ঘরে নেবে না তাকে?

—কেন নেবো না, আমার বউকে আমি ঘরে নেবো তাতে কে কী বলবে? তুই বিয়ে করতে পারবি, আর আমি ঘরে নিতে পারবো না—এ তুই কী বলছিস রে?

—তবে আমি বউ আনবো বৌঠান।

—সত্যি তুই বিয়ে করবি ভূতনাথ?

—বিয়ে আমি করেছি বৌঠান।

—করেছিস? কবে রে? আমায় বলিসনি তো?

—তোমায় বলবো কি বৌঠান, আমি নিজেই জানতাম না, আমার তখন পাঁচ-ছ' বছর বয়েস... বলে সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া বলে গেল ভূতনাথ। সমস্ত। সমস্ত। কিছু বাদ দিলে না। সেই 'মোহিনী-সিঁদুরে'র আপিসে চাকরির পর থেকে কেমন করে পরিচয়, তারপর ঘনিষ্ঠতা, সুবিনয়বাবুর মৃত্যু। তারপর কেমন করে নন্দজ্যাঠার কাছ থেকে সমস্ত জানতে পারা।

বৌঠান বললে—তবে আন, আজকেই নিয়ে আয় ভূতনাথ, আমার বহুদিনের সাধ যে রে,

বড়দি'র মতো আমিও বউ ঘরে আনবো। তা হলে বংশীকে বল—জিনিসপত্তোর যোগাড় করুক, ধান, দুর্বো, মিষ্টি, কাপড়, গয়না—এখন নতুন করে কখন আর গয়না গড়াবো, আমার শাশুড়ীর সেই জড়োয়া চিকটা দিয়ে তা হলে বউ-এর মুখ দেখবো—কী বলিস—ওরে চিন্তা—

ভূতনাথ বললে—কিন্তু বৌঠান, আজ বউ না এনে একবার বরানগরে গেলে হয় না?

—না, বরানগরে যাওয়া থাক, আজ আমি আমার বউ-এর মুখ দেখবো ভূতনাথ।

সেদিন চাঁদনীর হাসপাতালে শুয়ে ভূতনাথ আবার এই-সব কথাই ভেবেছিল। হয়তো বৌঠান নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল সেদিন। ভূমিপতি চৌধুরীর আমল থেকে বংশপরম্পরায় যে-পাপ জমে-জমে পাহাড় হয়ে উঠেছিল, তার বুঝি সন্ধান রাখতো না বৌঠান। ১৮২৫ সালে প্রথম যেদিন কলের জাহাজ এসেছিল, প্রথম রেল-লাইন পাতা হয়েছিল দেশের মাটিতে, সেই নতুন যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলে না বলে একটা বংশ এমন করে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছিল। তখন বুঝি আর তার ওঠবার উপায় নেই। বৌঠান একা চেষ্টা করে কী করবে! হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে সমস্ত ইতিহাসটা আলোচনা করতে গিয়ে বার-বার কেবল পটেশ্বরী বৌঠানের মুখটি মনে পড়তো! অমন করে এত ভালোবাসা ভূতনাথ আর কারোর কাছ থেকে জীবনে পায়নি। কোথায় কেমন করে কবে সে বৌঠানের মনের কোণে একটু ঠাঁই করে নিতে পেরেছিল তা আজ আর মনে নেই। তার জন্যে যতটুকু কৃতিত্ব তা পুরোপুরি বৌঠানেরই। ভূতনাথ তার সামান্যতম অংশও দাবি করতে পারে না যেন।

আজও মনে আছে সেদিন পথ দেখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিই বুঝি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন—আমাদের জাতির, আমাদের ইতিহাসের, আমাদের সভ্যতার সমস্ত ব্যর্থতা আর অভাব। তিনিই নতুন করে আবিষ্কার করলেন গীতাকে। নতুন ব্যাখ্যা দিলেন গীতার। চারিদিকে নৈরাশ্য আর পরাধীনতার গ্লানির মধ্যে গীতার শ্লোকে সবাই দেখতে পেলে জয়ের আশ্বাস। কবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গিয়েছে, তবু তাব মন্ত্র বুঝি সজীব হয়ে আবার তরুণ মনে শক্তির আশ্বাস এনে দিলে। শ্রীকৃষ্ণের সে বাণী আত্মবোধের বাণী, নিজেকে চেনবার বাণী। শ্রীঅরবিন্দ এই গীতাকেই তুলে ধরলেন নতুন করে। তিনি শোনালেন—এই যুদ্ধ, এই মৃত্যু, এই অস্ত্র, এই ধর্ম, এই তীর আর এই ধনুক এ-ও ঈশ্বরের সৃষ্টি। তিনি বললেন—'**We do not want to develop a nation of women who know only how to weep and how not to strike.**'

তারপর আলিপুর বোমার মামলার সময় অরবিন্দ বুঝি তাঁর মহা-জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন—'**Man shall attain his Godhead.**'

জানলার পাশেই ছিল ভূতনাথের খাটিয়া। ওখানে শুয়ে শুয়ে খোলা আকাশটা দেখা যেতো। সেইখানে শুয়ে শুয়েই আকাশ-পাতাল কত কী ভেবেছিল। সেইদিকে চেয়ে-চেয়ে অনেকদিন ভেবেছে ভূতনাথ কোথায়ই বা গেল বৌঠান! কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে রইল এতদিন! আকাশের নীলের মধ্যে বার-বার প্রশ্ন করেও সে-উত্তর পাওয়া যায়নি সেদিন।

তবু সেদিন বার-শিমলেয় যাবার সময় বংশী ধরেছিল—খেয়ে যাবেন না শালাবাবু?

ভূতনাথ বলেছিল—আজ আর খাওয়ার সময় নেই আমার।

—রান্না হয়ে এসেছে, আর বেশি দেরি নেই কিন্তু, ঝোলটা নামলেই দিয়ে দেবো।

—তা হোক, আমি বরং ফিরে এসে খাবো।

অগত্যা বংশীকে রাজী হতেই হয়েছিল। কিন্তু বার বার বলেছিল—যেন রাত করবেন না শালাবাবু, বেণীর কথা শোনবার পর থেকে আমার বড় ভয় করে আজ্ঞে।

—কীসের ভয়?

বংশী বলেছিল—বলা তো যায় না, মেজবাবু গুণ্ডা লাগিয়েছে শুনেছি, গুণ্ডা দিয়ে মেজবাবু সেকালে কত কাণ্ড করেছে দেখেছি, নটে দত্ত দেখলেন না সেবার ছোটবাবুকে কী কাণ্ড করলে। সেই থেকে ছোটবাবু তো আর উঠতে পারলে না।

—না রে বংশী, ভয় পাসনে, আমার কিছু হবে না, তুই আমাদের পান আর সুপুরি এনেছিস তো?

—তা এনেছি, কিন্তু আজকে আর কখন যাবেন বরানগরে, বেলা পড়ে এল যে?

—তা আজ যদি না হয় তো কালই যাবো।

বংশী বললে—সেই ভালো শালাবাবু, আজ সারাদিন যে-হুজ্জত গেল সকাল থেকে, ভাবুন তো একবার, যাক, তবু হাঙ্গামা যে চুকলো এই ভালো, বড় ভাবনায় ছিলাম আজ্ঞে। ননীবাবু যে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন এইটেই ভাল—কতদিন থেকে যে মহাপ্রভুর কাছে মানত করে রেখেছি—এবার দেশে গেলে পূজো দিয়ে আসবো।

সেদিন বড়বাড়ি থেকে বেরিয়েও যেন পা আর চলতে চায়নি ভূতনাথের। জবাকে সে কেমন করে তার দাবি-জানাবে! কেমন করে সে জানাবে—সে-ই তার স্বামী! কেমন করে জানাবে—অতুল আর কেউ নয়—ভূতনাথের আর একটি নাম। বাবার দেওয়া নাম। যে-নামে এক নন্দজ্যাঠা ছাড়া এখন আর কেউ তাকে ডাকে না! বাবার মৃত্যুর পর সে নীলমণি পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু সে তো ভূতনাথ নামে। এত কথা জানানোর মধ্যে কোথায় যেন একটা ভিক্ষুক-বৃত্তি লুকিয়ে আছে। কেমন করে জবা তাকে গ্রহণ করবে কে জানে! এ ক'দিনের মধ্যে জবার যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে গিয়ে থাকে!

বাড়ির সামনে গিয়েও দ্বিধা যেন কাটতে চায় না ভূতনাথের। সেদিন বেলগাছিয়ার খালের ধারে মনের যে সংযম সঞ্চয় করেছিল ভূতনাথ, আজ যেন তা হারিয়ে গিয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে যেন জানতে পারলে ভালো হতো—ভেতরে জবা কেমন আছে! কী করছে!

চারিদিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ—সুপবিত্র আছে নাকি কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে? বিকেলবেলায় গলিতে রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করছে নিজের নিজের কাজে। ছোট সরু গলি, দু'পাশে নর্দমা। মশা উড়ছে ভন-ভন করে। দরজার কড়া নাড়তে গিয়েও যেন হাতটা সরিয়ে নিলে ভূতনাথ। জবা যদি বাড়িতে না থাকে? যদি ভূতনাথের দেরি দেখে সে হাসপাতালেই কাজ নিয়ে থাকে এতদিনে? এ ক'দিন এ-বাড়িতে আসেনি ভূতনাথ। কেবল ভেবেছে। ভেবেছে শুধু নিজের কথা! বড়বাড়ির এত গণ্ডগোল, রূপচাঁদবাবুর আপিস, সমস্ত কাজের মধ্যেও একটু ফাঁক পেলেই ভেবেছে। নিজের কথা ভেবেছে আর নিজের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছে সুপবিত্রর কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে জবার কথা।

সেদিনও যখন ভূতনাথ এ-বাড়িতে ঢুকছিল হঠাৎ দেখলে জবার ঝি একটা ঝুড়িতে নানা জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলতে যাচ্ছে। কিন্তু ঝুড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল ভূতনাথ।

ভূতনাথ বললে—ক্ষুদির মা, ঝুড়িতে ও-সব কী গো?

ক্ষুদির মা বললে—দিদিমণি এগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে বললে দাদাবাবু।

—দেখি, দেখি, ওতে কী? বলে ঝুড়িটা নামাতেই ভূতনাথ দেখে অবাক হয়ে গেল। ভালো ভালো দামী দামী সব জিনিস। একটা ফুলদানি, একটা বই, ছোট ঘড়ি একটা, নানারকম কাজের জিনিস। একটা ফটো ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করা। সুপবিত্রর ছবি।

জবা বলেছিল—ওগুলো আর রেখে কি হবে ভূতনাথবাবু, ও-ই আমাকে নানা সময়ে উপহার দিয়েছিল—ও আমার কাছে এখন না রাখাই ভালো।

—কিন্তু রাস্তায় ফেলে দেবে তা বলে?

জবা বলেছিল—রাস্তাতে ফেলাই হোক, আর কাউকে দিয়ে দেওয়াই হোক, আমার কাছে সে একই কথা।

—কিন্তু মন থেকেও কি মুছে ফেলতে পারবে?

—মুছে ফেলাই তো উচিত।

—উচিত-অনুচিতের কথা বলছি না, কিন্তু তা পারবে কি?

—মানুষের অসাধ্য কিছু নেই বলেই তো বাবার কাছে শুনেছি, চেষ্টা করে দেখি।

ভূতনাথ বলেছিল—চেষ্টা করলেই যদি ভোলা যেতো তা হলে তো পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট থাকতো না জবা, সেইজন্যেই তো আমাদের হিন্দুদের এক দেবতারই নাম হলো—ভোলানাথ—ভাঙ খেয়ে সমস্ত বিশ্বসংসার ভুলে আছেন—কিন্তু সেই ভোলানাথও শেষে সতীর মৃতদেহ নিয়ে কী কাণ্ড করলেন জানো তো?

সেদিন যত কথাই বলুক, ভূতনাথ কিন্তু জবার এই ভোলবার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে-চেষ্টায় কোথাও ফাঁকি নেই। কোথাও শিথিলতা নেই।

জবা বলেছিল—হয়তো এ আমার সংস্কার বলতে পারেন আপনি—কিন্তু মন যা চায় তা তো পশুতেও করে, তা হলে মানুষের বৈশিষ্ট্য কোথায়? সংযম, সাধনা, শৃঙ্খলা এ-সব তো মানুষেরই জন্যে।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি দরজার কড়া নাড়লে।

ভেতর থেকে ক্ষুদির মা'র জবাব এল—কে?

—আমি ক্ষুদির মা, আমি।

—ওমা, দাদাবাবু—বলে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়েছে।

—দিদিমণি কোথায়? বাড়িতে আছে?

—দিদিমণির যে ভারি অসুখ দাদাবাবু—আপনি আসেননি, আমি একা মানুষ...

—অসুখ? কী অসুখ?

ক্ষুদির মা বললে—হঠাৎ কাল থেকে এমন জ্বর, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে, সমস্ত রাত্তির জ্ঞান নেই দিদিমণির, কাকে ডাকি, কী করি, ভেবে অস্থির। কেঁপে জ্বর এল, আর তার পর থেকেই কথা বন্ধ।

—তারপর?

—তারপর আজ সকালে ভাবলাম, কাকে ডাকি, কাকেই বা চিনি, তা গেলাম ছোটদাদাবাবুকে ডাকতে।

—ছোটদাদাবাবু কে? সুপবিত্রবাবু?

—হ্যাঁ, তাঁর বাড়িটা চিনতাম, তাঁকেও ডেকে আনলাম, তিনি এসে ডাক্তার ডেকে আনলেন, ওষুধ খাচ্ছেন, তবে জ্ঞান আসেনি এখনও। সেই রকম ঝিম হয়ে আছেন—ভেবে অস্থির হয়ে গিয়েছি—একলা মেয়েমানুষ—

—সুপবিত্রবাবু ওপরে আছেন নাকি?

—আছেন, উনি আছেন বলেই তো এখন এদিকটা দেখতে পারছি, নইলে যা ভাবনা হয়েছিল।

আজও মনে আছে সেদিনের সে-দৃশ্যটা। তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ভূতনাথ দেখেছিল পালঙ-এর ওপর জবা অচৈতন্য হয়ে শুয়ে আছে। গায়ের ওপর চাদর ঢাকা। পাশের টেবিলের ওপর ওষুধের একটা শিশি। আর সুপবিত্র সামনে ঝুঁকে পড়ে পাখার বাতাস করছে। ভূতনাথের পায়ের শব্দ পেয়েই সুপবিত্র যেন চমকে উঠেছে। আজও সে-দৃশ্যটা চোখ বুজলেই ভূতনাথ দেখতে পায়। সুপবিত্রবাবু যেন একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছে এমনি করে চেয়েছিল সেদিন।

ভূতনাথকে দেখেই বাইরে এসে সুপবিত্র বলেছিল—আপনি এসেছেন, আমার বড় ভয় করছিল।

সুপবিত্রব চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। বেচারীকে যেন বড় অসহায় দেখাচ্ছে। বিপদ-আপদের মধ্যে সুপবিত্র একেই দিশেহারা হয়ে যায়। ভারি কাজ করতে তাল ঠিক রাখতে পারে না। ভুলো মানুষ।

সব কাজেই ভুল করে। লেখাপড়া করে-করে বাস্তব প্রত্যক্ষ জগৎটার সঙ্গে বরাবরই তার অপরিচয়ের সম্পর্ক। সে যেন এতক্ষণ কূল পাচ্ছিলো না।

—কোন্ ডাক্তারকে ডেকেছিলেন?

—কী ওষুধ দিয়েছেন তিনি?

—কী হয়েছে বললেন?

অনেক প্রশ্ন করেছিল ভূতনাথ সেদিন একসঙ্গে। ডাক্তার বলেছিল—অনেকদিন অনিয়ম, উপোস, অত্যাচার করাতে শরীর দুর্বল ছিলই। এখন হঠাৎ দেখা দিয়েছে লক্ষণগুলো। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে বহুদিন আগে থেকেই নিশ্চয় এ বিষ ছিল, বাইরে বোঝা যায়নি। ওষুধ পড়েছিল সময়মতো তাই রক্ষা।

—বিকেলবেলা ডাক্তার কি আসবে একবার?

—বলেছিলেন যদি জ্ঞান না হয় তো খবর দিতে। কিন্তু জ্বর বোধ হয় এখন কমেছে, একটু আগে ঘাম হচ্ছিলো খুব, ছট্‌ফট করছিলেন খুব, এখন ঘুমোচ্ছেন... পাছে ঘুম ভেঙে যায় তাই হাওয়া করছিলাম।

ভূতনাথ বললে—তা হলে আমি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি। আপনি জবার কাছে বসুন।

সুপবিত্র বললে—বরং, আমি যাই, আপনি বসুন।

—না, না, আপনি বসুন।

শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সুপবিত্র রাজী হয়নি বসতে। ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কেমন যেন এড়িয়ে চলেছিল সমস্তক্ষণ। ডাক্তার এসে আবার নতুন একরকম ওষুধ লিখে দিয়ে গেলেন। সে-রাত্রিটা যে কেমন করে কেটেছিল আজও মনে আছে ভূতনাথের। বার-শিমলের সে-বাড়িতে সুবিনয়বাবুর অসুখের সময় আরো কয়েকটা রাত কাটাতে হয়েছিল আগে। রাত্রের নির্জন আবহাওয়াতে ট্রেনের সেই বাঁশির শব্দ, আর তারপর বাইরের গভীর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা নিশাচর পাখীর ডেকে আবার থেমে যাওয়া—এ অভিজ্ঞতা আছে ভূতনাথের। কিন্তু এবার যেন অন্যরকম। জবা নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে নিস্তব্ধ ঘরের পরিবেশে। শুধু সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কাজ কী!

সুপবিত্র পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে—আমি চলে যাই—আপনি তো রইলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে গিয়েছিলেন—এখন নাড়ীর অবস্থা ভালো—ভয় কেটে গিয়েছে। সকালবেলার দিকে কিছু দুধ বা চা খেতে দিতে পারেন—আর ওষুধ তো রইলই।

রাত গভীর হয়ে এল। একটা মাকড়সা দেয়ালের কোণে বাসা করেছে। ভূতনাথ সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। ধূসর রঙের বাসাটা! তারই ওপর নিশ্চল হয়ে বসে আছে। নড়ছে না, চড়ছে না। ঘরে যে এত বড় একটা অসুখের ক্রিয়া চলছে, যেন খেয়ালই নেই সেদিকে। ওর চোখ দুটো এখান থেকে দেখা যায় না। যেন ধ্যানে বসে আছে। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ভূতনাথ আবার অন্যদিকে চাইলে। ঘরের দেয়ালের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি যেন দেখবার ইচ্ছে হলো ভূতনাথের। কোথায় একটা কালির অস্পষ্ট দাগ, একটা আলোর পোকা নড়ছে—অন্য সময় হলে হয়তো এ-সব এত নজরে পড়তো না। আজ তার নিজের ছায়াটাকেও যেন অদ্ভুত মনে হলো। বাতির অল্প আলোয় ছায়াটা পড়েছে। খানিকটা দেয়ালে, খানিকটা মেঝের ওপর। বাঁকা-চোরা ভাঙা ছায়া। মানুষের ছায়া কেন এত বীভৎস দেখায়! ভূতনাথও কি এমনি বীভৎস? পাশেই সুপবিত্রর ছায়াটা পড়েছিল, কিন্তু সে-ছায়াটা সোজা পুরোপুরি দেয়ালের ওপর স্পষ্ট। কোথাও ভাঙা-চোরা নয়। পাশাপাশি পড়েছে একেবারে। সুপবিত্রর নাকটা যেন সোজা একটা সাবলীল রেখায় সুন্দর হয়ে উঠেছে। সুপবিত্রকে যেন বড় সুন্দর মনে হলো। সত্যিই বড় সুন্দর দেখতে সুপবিত্রকে। জবার পাশে সুপবিত্রকে যেন মানায় ভালো। আর-একবার দেখলে ছায়াটার দিকে। সুপবিত্র স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় পলকও পড়ছে না চোখের। হয়তো জবার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। এতদিন ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হতো। আজ জবার

অসুখের সুযোগে এ-ঘরে আসতে পেরেছে। ছায়াতে সুপবিত্রর চুলগুলো উড়ছে। মাথাভরা চুল। নিয়ম করে চুল ছাঁটার কথা হয়তো মনে থাকে না তার। কিন্তু বেশ দেখায় ওই চুলগুলো। সুপবিত্র হয়তো সংসারপটু নয়, কিন্তু তাতে কী। সুপবিত্র সুন্দর তো! সমুদ্রের ঢেউ হয় তো নয় সে, কিন্তু রামধনু তো সে। কালো আকাশের কোণে অমন করে সাত রঙের প্রকাশ যে করতে পারে, তারই কি দাম কম! রামধনুর রঙে সমস্ত পৃথিবী যখন রঙীন হয়ে ওঠে, তখন তার চেয়ে সুন্দর আছে কিছু? ভূতনাথের এবার যেন হঠাৎ মনে হলো—দেয়ালের কোণের ওই একনিষ্ঠ মাকড়সা, ওই দেয়ালের ওপর এক ফোঁটা কালির দাগ আর নিশ্চল সুপবিত্রর সুন্দর ছায়াটা, সব যেন হঠাৎ সজীব হয়ে উঠেছে। সব যেন হঠাৎ সচল হয়ে নড়তে শুরু করেছে। সমস্ত দেয়ালটা যেন কালো হয়ে উঠলো এক নিমিষে, মাকড়সাটা হঠাৎ বাসা ছেড়ে ঘুরতে শুরু করেছে পাগলের মতো। আর সুপবিত্রর ছায়াটা যেন আর দেখা যায় না। হঠাৎ সুপবিত্র যেন কথা বললে এবার—আমার আর থাকবার দরকার আছে ভূতনাথবাবু?

—কেন?

সুপবিত্র বললে—না, কিন্তু চোখ মেলে যদি আমায় দেখে জবা... হয়তো রাগ করতে পারে—আমাকে আসতে বারণই করেছিল।

—না, না, রাগ করবে কেন, অসুখের সেবা করতে এসেছেন আপনি—কিন্তু আপনাকে আজ কি জবা দেখেনি?

সুপবিত্র বললে—আমি এসেছি জানতেও পারেনি এখনও—জ্বরের ঘোরে বড় কাতর ছিল কিনা।

—ওষুধ খাওয়ার সময়ও দেখতে পায়নি?

সুপবিত্র বললে—অনেক কষ্টে মুখটা চেপে ধরে ওষুধ খাওয়াতে হয়েছিল—বিকারের ঝোঁক ছিল তখন, জ্ঞান ছিল না ঠিক।

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা, আপনি যাবেন না, তবে পাশের ঘরে গিয়ে একটু বসুন। যদি প্রয়োজন হয় আমি খবর দেবো আপনাকে।

সুপবিত্র চলে গেল।

ভূতনাথ জবার দিকে চেয়ে দেখলে। জবা জানতেও পারেনি সুপবিত্র এসেছে। মনে হলো—জবা যেন অসুখের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। একদৃষ্টে জবাকে দেখতে লাগলো ভূতনাথ। বড় অসহায় মনে হলো যেন তাকে। সমস্ত বিশ্বসংসারে যেন জবার কেউ নেই। আশ্চর্য! ভূতনাথের মতো অসহায় লোকের সঙ্গে যে দু'জনের পরিচয় হয়েছে ঘনিষ্ঠভাবে, তারা দু'জনই অসহায়। এক পটেশ্বরী বৌঠান আর-এক জবা। এমন করে এত ঘনিষ্ঠতা করা হয়তো ভালো হয়নি। তাতে না ভালো হয়েছে বৌঠানের, না জবার, না তার নিজের। কী প্রয়োজন ছিল 'মোহিনী-সিঁদুর' আপিসে চাকরির! অন্য কোনো আপিসেও তো হতে পারতো! হতে পারতো ব্রজরাখালের আপিসে। হতে পারতো প্রথম থেকে রূপচাঁদবাবুর আপিসে। তা হলে এমন করে জড়িয়ে পড়তে হতো না ভূতনাথকে। এমন করে নিজে নায়ক হতে হতো না উপন্যাসের। একবার মনে হলো জবা যেন আপন মনে স্বপ্নের ঘোরে বিড়-বিড় করে কী বলছে। মুখটা জবার মুখের কাছে নিয়ে এল ভূতনাথ। শোনবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বড় অস্পষ্ট। খানিকক্ষণ পরে মনে হলো যেন একটু বুঝতে পারা গেল। যেন অস্পষ্টভাবে বিকারের ঝোঁকে সুপবিত্রর নামটা উচ্চারণ করলো। কান পেতে আবার শুনলে ভূতনাথ। আর ভুল নেই। মনে হলো সুপবিত্রর সঙ্গে যেন কিছু কথা বলছে। আবার কান পেতে শুনতে লাগলো ভূতনাথ। এবার আর কথা বলছে না। আবার অঘোরে ঘুমোচ্ছে জবা। লম্বা নিঃশ্বাস পড়ছে। চেতনার কোনো লক্ষণ নেই।

হঠাৎ সেইভাবে বসে থাকতে থাকতে ভূতনাথের মনে হলো—কেন সে বসে আছে এখানে? সে যেন সুপবিত্রর আর জবা দু'জনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাধা হয়ে আছে এতক্ষণ! সে কেন এখনও তার অস্তিত্বের বোঝা নিয়ে এখানে পীড়া দিচ্ছে এদের? সে তো অনায়াসে নিজেকে লোপ

করে দিতে পারে। জবার জীবনে ভূতনাথ তো একটা আকস্মিকতা। ধরে নেওয়া যাক না, কোনো দিন কোনো অবসরে সে তার হৃদয়-মনকে কারো কাছে বিকিয়ে দেয়নি। কোনো সম্পর্কের গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা হয়নি তাদের জীবন। একথা সত্যি বলে ধরে নিলেই হয়। যা ছিল তার দুরাশা এখন তা আয়ত্তের মধ্যে হলেও দুরাশা মনে করে দূরে চলে গেলেই হয়। কেউ কিছু বলবার নেই। কারো অভিযোগ করার কিছু নেই। কেউ ব্যথা পাবে না। ব্যথা যদি কেউ পায় তো সে নিজে। সে মনে করবে এটা জলের দাগ। জলের দাগকে চিরস্থায়ী বলে যে বিশ্বাস করে সে তো নির্বোধ। ভূতনাথ এ জীবনে অনেক দেখলে—অনেক পথ মাড়িয়ে আজ এখানে এসে সে দাঁড়িয়েছে। ভূতনাথ জানে দুঃখ কাকে বলে, জানে আঘাত কী প্রচণ্ড, আশ্রয়ের প্রয়োজন যখন সব চাইতে বেশি তখন আশ্রয় কী দুর্লভ, কিন্তু এ-ও জানে আসল সুখ পাওয়ার মধ্যে নেই। মানুষের আত্মা সত্যকে জানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে সে।—সে যখন আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের একটা সার্থকতার রূপ দেখতে পায়। তাই সুবিনয়বাবু বলতেন—'আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহাআমিতেই সার্থক। তেমনি আমরা যখন সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি।' আর একবার বলেছিলেন—'খণ্ডের মধ্যে দিয়ে অখণ্ডকে যে উপলব্ধি করতে পেরেছে সে-ই সুখী। তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সে-প্রেম বেঁধে রাখে না। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। সেই মৃত্যুরই সৎকারমন্ত্র হচ্ছে—

'মধুবাতা ঋতায়তে—
মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—

বায়ু মধু বহন করছে, নদী সিন্ধু মধু ক্ষরণ করছে, ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হোক, ঊষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হোক, সূর্য মধুমান হোক। আসক্তিরস বন্ধন যখন ছিঁড়ে গিয়েছে, তখন জল, স্থল, আকাশ, জড়, মানুষ সমস্ত অমৃতে পূর্ণ—তখন বুঝি আর আনন্দের শেষ নেই। সেই আনন্দই হলো প্রেম।

জবার ঘরে বসে সেই শেষ রাত্রে ভূতনাথের মনে হলো—এখন সে সমস্ত ত্যাগ করতে পারে এই মুহূর্তে। কোনো আকর্ষণ আর নেই কোথাও। জবাকে ভালোবাসে বলেই জবাকে এত সহজে হারানো যায়। খণ্ডকে সে অখণ্ডের মধ্যে নতুন করে পাবে। নতুন করে মহাজীবন লাভ করবে।

জবা যেন এবার হঠাৎ জেগে উঠলো। একটু নড়ছে। ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠলো। একবার চোখ খুলতে চেষ্টা করলো। মুখ দেখে মনে হল সে যেন হঠাৎ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

ভূতনাথ আস্তে আস্তে জবার টেবিলে গিয়ে বসলো। একটি কাগজ নিয়ে তার ওপর কলম দিয়ে লিখতে লাগলো একটা চিঠি।

তখন তন্দ্রার ঘোরে জবা একটু যেন এ-পাশ ও-পাশ করছে এখনি চেতনা ফিরবে তার। চোখ চাইছে। অল্প-অল্প করে আরো তার দৃষ্টি যেন ঠিক জায়গাটায় নিবদ্ধ হতে পারছে না!

পাশের ঘরে সুপবিত্র ঘুমোচ্ছিলো। ভূতনাথ তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ডাকলে—সুপবিত্রবাবু—সুপবিত্রবাবু—

সুপবিত্র ধড়ফড় করে উঠলো। বললে—কী হলো? জবা কেমন আছে?

ভূতনাথ বললে—জবা আপনাকে ডাকছে।

—আমাকে ডাকছে? সুপবিত্র ভালো করে চোখ মুছেও যেন ভালো করে জাগেনি। যেন জবাকেই স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। যেন সে ভুল শুনছে? বললে—আমাকে?

—হ্যাঁ, আপনাকে।

—কিন্তু আপনি কি ঠিক শুনেছেন, আমাকে?

—আমি ঠিক শুনেছি।

—কিন্তু তা কেমন করে হয়, আমাকে দেখে হয়তো অসুখ আরো বেড়ে যেতে পারে

ভূতনাথবাবু। আমাকে আসতে নিষেধ করেছিল বার-বার, আমি যে এসেছি তা-ই এখনো জানে না যে।

—তা হোক, আমি বলছি আপনি যান।

সুপবিত্র যেন এতখানি আশা করতে পারেনি। যেন আশার অতিরিক্ত সে পেয়েছে। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার। মুখখানা ছোট শিশুর মতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। নতুন অনুরাগের লজ্জা। সুপবিত্র রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছতে লাগলো আবার। যেতে গিয়েও যেন দ্বিধা করতে লাগলো খানিকক্ষণ। তারপর বললে—আপনি যাবেন না?

—না, আপনাকে একলা ডেকেছে।

—একলা?

—হ্যাঁ, কিন্তু ভয় নেই, জবা সুস্থ হয়ে উঠেছে এখন, যদি পারেন সকালবেলা একটু গরম দুধ খেতে দেবেন। বড় দুর্বল মনে হচ্ছে যেন।

সুপবিত্র যাচ্ছিলো। ভূতনাথ আবার ডাকলে। বললে—শুনুন!

সুপবিত্র ফিরে এসে দাঁড়াতেই ভূতনাথ বললে—জবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলে, এই চিঠিটা ওর হাতে দেবেন তো।

—আপনার চিঠি?

—হ্যাঁ, আমার বিশেষ কাজ আছে, তাই চললুম এখন, কাল আসবো আবার। আপনি ওকে এ ক'দিন একটু চোখে-চোখে রাখবেন, আর জবা বড় অভিমানী, জানেন তো, সব কথার বাইরের মানে নিয়ে বিচার করবেন না ওকে, আপনার হাতেই ওকে দিয়ে গেলাম।

দরজা খুলে দেবার সময় ক্ষুদির মা বলেছিল—আবার কখন আসবেন দাদাবাবু?

—আর আসবো না আমি ক্ষুদির মা। কিন্তু বলতে গিয়েই সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে—কালই আসবো।

ক্ষুদির মা দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে তখন বেশ রাত। ভোর হতে অনেক দেরি। কলকাতার প্রাণসমুদ্র নিঝুম নিস্তরঙ্গ। ভূতনাথ সেই অদৃশ্য অপরূপকে মনে-মনে প্রণাম করে বললে—হে অমৃত, তোমায় প্রণাম করি। তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে সেই অপরূপ অরূপকে প্রণাম করি। তোমাকেই আমি পেলাম। পেলাম তোমার অনন্ত প্রেম। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে লোকে-লোকান্তরে তোমাকে পেলাম। সংসার আমাকে আর পীড়া দিতে পারবে না, ক্লান্তি দিতে পারবে না। এই সৃষ্টি-সংসারই আমার প্রেম। এখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের যোগ, আনন্দের সঙ্গে অমৃতের। এইখানেই বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে পাওয়া-না-পাওয়ার অনেক ব্যবধানের ভেতর দিয়ে নানারকমে তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে পেয়েও পেয়েছি, হারিয়েও পেয়েছি—এ পাওয়া আমার নানা রসে নানা রঙে অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাক। নমস্তেহস্তু...

চাঁদনীর হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে ভূতনাথ নিজের চিন্তাতেই তলিয়ে যায়।

নার্স এসে মাথার ব্যাণ্ডেজ বদলে দিয়ে যায় মাঝে মাঝে। ক'দিন হলো জ্ঞান ফিরেছে। এ ক'দিন কেমন করে যে কেটেছে, কোথা দিয়ে দিন-রাত্রির শোভাযাত্রা একে-একে চলে গিয়েছে। মিলিয়ে গিয়েছে দূরে-দূরান্তরে, খেয়াল নেই। এখন যেন আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা ভাবা যায়। কলকাতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ বৈকি। একটা প্রাচীন বংশের উত্থান না হোক পতন তো দেখেছে স্বচক্ষে। মনে পড়ে যায় আর একটা দিনের কথা। তখন বুঝি মোগল রাজত্বের মাঝামাঝি। সকাল থেকে আকাশটা একেবারে মেঘে-মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। সপ্তগ্রামের পতন পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে তখন। হুগলী তখন বেড়ে উঠেছে হু-হু করে। ক'খানা জাহাজ পাল তুলে চলেছে সাঁকরেলের ঘাট থেকে। সঙ্গে কয়েকটা দেশী ছিপ, বোট আর ভাউলে নৌকো। সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতায় তখন সন্ধ্যেবেলা কার নামবার সাহস আছে! থাকবার মধ্যে

সুতানুটিতে শুধু টিম-টিম করা একটা হাট। শেঠ আর বসাকরা থাকতো সেখানে। হাটে তাদের সুতো আর কাপড়ের ব্যবসা ছিল। সে-সব কিনতে বাইরে থেকে আসতো নানা লোক। ইংরেজ পর্তুগীজ আর দিনেমার। সেদিন সেই বর্ষার রাতে সাঁকরেলের ঘাট থেকে খিদিরপুরের পাশ দিয়ে পাল তুলে জাহাজ ক'খানা এসে দাঁড়ালো সুতানুটির ঘাটে। পানসি দিয়ে ঘাটে এসে নেমে সবাই দেখে—সর্ব্বনাশ! কোথায় তাদের কুঠি, কোথায় তাদের মাটির চালাঘর! সব সমূলে উপড়ে নিয়েছে ঝড়ে! কোনো চিহ্ন নেই কিছুর। জব চার্নক আবার ফিরলো জাহাজে। বললে—না, রাতটুকু জাহাজেই কাটাতে হবে।... সেদিন জব চার্নকের এতটুকু পা রাখবার জায়গা পর্যন্ত ছিল না সুতানুটির মাটিতে। কিন্তু পরদিনই একটা কোঠাবাড়ি ভাড়া হলো—শেঠ-বসাকরা আদর-আপ্যায়ন করে বসালো তাদের। টাকা দিলে, কড়ি দিলে, জমি দিলে, বাড়ি দিলে আর তারপর শুরু হলো ইতিহাসের নতুন অধ্যায়।

সে হলো ১৬৯০ সনের ২৪শে আগস্ট-এর গল্প।

সে-সব দিনের কথা কবে ভুলে গিয়েছে সবাই। আগে এক-একটা বাড়ি খুঁড়লে পুরনো কালের গাছের গুঁড়ি, সুঁদরি কাঠের সার বেরিয়ে পড়তো। কোথাও বেরোয় জল। কোথাও বেরিয়ে আসে নর-কঙ্কাল। কবে বুঝি ডাকাতি করে কারা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল সেগুলো। সে-সব পুরনো কথা ভুলে গিয়েছে সবাই। তারপর হলো শোভা সিং-এর বিদ্রোহ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন প্রতিনিধি এল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে—উইলিয়ম মরিস। তারপর মুর্শিদকুলি খাঁ'র আমল, কোম্পানী বাহাদুরের প্রথম জমিদারী পত্তন, বর্গীর হাঙ্গামা, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, পলাশীর যুদ্ধ, ওয়ারেন হেস্টিংস, তারপর লর্ড কর্নওয়ালিশ আর লর্ড বেন্টিঙ্ক পেরিয়ে এসে গিয়েছে লর্ড কার্জন, আর্লি মিন্টো আর লর্ড হার্ডিঞ্জ। ওদিকে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের জন্যে আলাদা আসনের ব্যবস্থা হলো। দিল্লীর দরবার। বঙ্গভঙ্গ রদ হলো। বোমা পড়লো দিল্লীর বড়লাট হার্ডিঞ্জের গায়ে। সে বুঝি ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। আর ওদিকে ভূমিপতি চৌধুরী থেকে সূর্যমণি চৌধুরী, তারপর বৈদুর্যমণি, হিরণ্যমণি আর কৌস্তুভমণি আর তার শেষ বুঝি চূড়ামণি।

অনেক, অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে ভূতনাথ।

হাসপাতালের খাটিয়ায় শুয়ে সমস্ত ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে ভূতনাথ কেমন যেন তলিয়ে যায়।

জবাদের বাড়ি থেকে সেদিন বড়বাড়িতে আসতেই বংশী বললে—কী ভাবনায় ফেলেছিলেন বলুন তো—কোথায় ছিলেন সারারাত?

ভূতনাথ বলেছিল—বৌঠান কি খুঁজেছিল নাকি?

—তা খুঁজবে না? সারারাত কেবল এপাশ-ওপাশ করেছি, সারা সন্ধ্যে ঘর-বার করেছি—কী যে মানুষ আপনি—বৌমাকে নাকি বলেছিলেন—বউ আনতে যাচ্ছি!

ভূতনাথ বললে—পান সুপুরি এনেছিস তো বংশী?

—সে তো কাল বিকেল থেকে শুকোচ্ছে, আজ্ঞে।

ভূতনাথ বলেছিল—তা হলে একটা ঠিকে গাড়ি ডাকবার বন্দোবস্ত কর বংশী।

বংশী বললে—এখনি যাবেন নাকি?

—হ্যাঁ, সকাল সকাল যাওয়াই তো ভালো।

—তা ঠিক বলেছেন শালাবাবু, বেণীর কথাটা শোনা এস্তোক ভালো লাগছে না যেন, মেজবাবু যা ক্ষেপে গিয়েছেন... তা হলে রান্না হোক, ভাতটা খেয়েই একেবারে যাবেন—এই ধরুন দুটো, তিনটে নাগাদ।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু বৌঠানকে আগে থাকতে তৈরি হয়ে থাকতে বলগে তুই।

ভূতনাথও একবার ভেবেছিল—হঠাৎ যদি বৌঠান কালকের কথা তোলে। যদি

বলে—কোথায় রে, তোর বউ কই? ভূতনাথ তখন কী উত্তর দেবে?

বংশী বললে—ছোটমা আজ যেতে পারে কি না দেখুন আগে, যা অবস্থা!

ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে—কেন?

—বার-বার আনতে হয় বলে আমি কাল আজ্ঞে একেবারে দু'বোতল এনেছিলাম। কিন্তু কাল রাত্তিরে একবারে সবটা খেয়ে বসে আছে, আজকে সকালেও খেয়েছে—দেখে এলুম একটু আগে, শুয়ে পড়ে আছে, কাপড়-চোপড়ের হুঁশ নেই—বেসামাল বেঠিক অবস্থা, সেই বরানগর পর্যন্ত অমন মানুষকে নিয়ে যাবেন কী করে শুনি?

ভূতনাথ যখন সেদিন বৌঠানের ঘরে গিয়েছিল তখনও প্রায় তেমন অবস্থা। তবে একটু ভালো। নিজেই উঠে দাঁড়ালো বৌঠান। কালকের কথা আর কিছু মনে নেই।

বৌঠান বললে—কোন্ শাড়িটা পরবো আমি?

আজ যেন কোনো দিকে খেয়াল নেই বৌঠানের।

চিন্তাই সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলে। গলায় চেন-হার। চুলটা খোঁপা বেঁধে তাতে 'পতি-পরম-গুরু' লেখা সোনার চিরুণী গুঁজে দিলে। কানে তুলোয় করে আতর লাগিয়ে দিলে। কোমরে মীনে-করা সোনার গোট-ছড়া পরিয়ে দিলে।

ভূতনাথ একবার জিজ্ঞেস করেছিল—যেতে পারবে তো ঠিক বৌঠান? যদি বলো না হয় থাক আজকে।

বৌঠান বলেছিল—খুব যেতে পারবো।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়েও কিন্তু অল্প-অল্প টলছিল বৌঠান। বললে—মিয়াজানকে বলিস যেন খুব জোরে গাড়ি চালায়। যাবো আর আসবো—ছোটকর্তা বাড়িতে একা রইল—দেখিস বংশী। তারপর বললে—যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলবি আমি বাড়িতেই আছি।

বংশী কানের কাছে মুখ এনে বললে—শালাবাবু, দোহাই আপনার বেশি রাত করবেন না—এখন তো সন্ধ্যে হয়ে গেল—যদি বলেন তো আমি সঙ্গে যাই।

—না, তুমি গেলে ছোটকর্তাকে কে দেখবে আবার?

পান সুপুরির পুঁটলি গাড়ির কোণে রেখে দিয়েছিল বংশী। খিড়কির গেট-এর ভেতরে ঠিকে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৌঠান গিয়ে উঠলো ভেতরে। বললে—মিয়াজানকে বলে দে বংশী যেন তাড়াতাড়ি চালায়—বাড়িতে ছোটকর্তা একলা রইল...

কোথায় মিঁয়াজান! বংশী শুধু বললে—বলে দিচ্ছি, তুমি কিছু ভেবো না ছোটমা।

বৌঠান আবার বললে—চিন্তাকে বলিস যেন সন্ধ্যেবেলা ধূপধুনো গঙ্গাজল দেয় আমার ঘরে।

বৌঠান তারপর গাড়িতে উঠে বলেছিল—কোনো সাড়াশব্দ নেই বাড়িতে, রাত বুঝি অনেক হয়েছে, না রে, ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি সবাই?

কিন্তু গাড়িটা চলতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিলে। সে-ঝাঁকুনিতে বৌঠান আর একটু হলেই টলে পড়েছিল। ঠিক সময়ে ভূতনাথ ধরে ফেলেছে।

বৌঠান বললে—আজকাল মিয়াজান গাড়ি চালাতে ভুলে গিয়েছে নাকি?

ভূতনাথ কোনো কথা বললে না। বৌঠানকে দেখে যেন ভয় করতে লাগলো আজ তার। চোখ দুটো লাল। সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে গিয়েছে। দু'হাতে ধরে রেখেছে ভূতনাথ। ছেড়ে দিলেই যেন পড়ে যাবে। গাড়ি নানা রাস্তা ধরে চলেছে, কোথায় বউবাজার স্ট্রীট, কোথায় বৈঠকখানা, কোথা দিয়ে চলেছে বোঝা গেল না। গাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ। বাইরে রাত হয়ে এল। বেরোবে-বেরোবে করেও সেই রাত হলো কেবল বৌঠানের জন্যে। কিছুতে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শেষে স্নান করে খানিকটা বরফ মাথায় দিয়ে তবে খাড়া হতে পেরেছে। কিন্তু আজ না গেলে কি আর কখনও যাওয়া হতো? ছোটকর্তার অসুখটা যে-রকম দিন-দিন বাড়ছে! সংসারে দিন-দিন অভাব-অনটনও বাড়ছে। ক'দিন আর টিকিয়ে রাখা যায়! ক'দিন আর পরমায়ু বাড়ানো যায় এর! বৌঠানও অনেকদিন বলে আসছিল। শেষ পর্যন্ত দৈবই তো ভরসা। হঠাৎ বৌঠান টলে পড়লো

ভূতনাথের কোলে। বললে—তোর কোলেই শুলাম রে ভূতনাথ!

বৌঠানকে কোলে নিয়ে ভূতনাথ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। বললে—তা শোও, বরানগর এলে উঠিয়ে দেবো।

বৌঠান আবার বললে—বড় ঘুম আসছে রে আমার।

ভূতনাথ বললে—তা ঘুমোও না।

—যদি আমার ঘুম না ভাঙে—আমায় ডেকে দিস কিন্তু তুই!

আজও মনে পড়লে ভূতনাথ ভাবে সে-ঘুম সেদিন অমনি করে চিরকালের ঘুম হবে কে জানতো! কে জানতো সে-ঘুম ভাঙাবার দায়িত্ব ভূতনাথের ছিল না। ছিল মেজবাবুর গুণ্ডাদের। তারপর যখন গাড়ি অনেকদূর চলে গিয়েছে, হঠাৎ যেন অনেক লোকের চিৎকার শোনা গেল। একটা হা-রে-রে-রে শব্দ। ডাকাত পড়লে যেমন শব্দ হয় তেমনি। গাড়িটা হঠাৎ থেমে গিয়েছে। আর সেই অন্ধকারে কারা যেন দু'পাশ থেকে দরজা খুলে ঢুকলো ভেতরে। ভূতনাথ একবার প্রতিবাদ করতেই বুঝি গিয়েছিল। কিন্তু কোন্‌দিক থেকে যেন একটা অদৃশ্য হাত এসে তাকে এক প্রচণ্ড আঘাতে শুইয়ে দিলো... আর কিছু মনে নেই তারপর।

তারপর কতদিন পরে এই চাঁদনির হাসপাতালে জ্ঞান হয়েছে। আস্তে আস্তে মনে পড়েছে সব কথা। কোথায় গেল বৌঠান! বৌঠান কেমন আছে! কিন্তু বংশী খবর পেয়ে এসেছিল একদিন।

বংশী বললে—শালাবাবু!

বংশীকে দেখে ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—বংশী তুই?

—আজ্ঞে, খবর কী পাই? চৌপর রাত বসে-বসে দেখা নেই আপনার, গাড়িও ফেরে না, কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। এমন তো হয় না। ছোটবাবু তেমনি নিঝুম হয়ে পড়ে আছে! দেখে আবার ফিরে এলাম উঠোনে, রাস্তায় বেরিয়ে চোখ বাড়িয়ে দূর পানে চেয়ে দেখি, কোথাও হদিস নেই গাড়ির। রাস্তা নিরিবিলি হয়ে এল, ওপরে চিন্তা আর নিচেয় আমি, দু'জনে সমস্ত রাত ঠায় বসে। রাত যখন পোয়ালো তখন বুঝি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুমের ঘোরে মনে হচ্ছিলো কোথায় যেন কাছাকাছি কে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, ইঁট ভাঙছে, ঠুং-ঠাং ধুপ-ধাপ শব্দ, মনে হচ্ছিলো কারা বুঝি...

বংশী থামলো। তারপর হঠাৎ দু'হাত দিয়ে চোখ দুটো চাপা দিলে। তারপর আর কথা নেই। একেবারে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো।

কেমন যেন সন্দেহ হলো ভূতনাথের। বললে—বংশী—বংশী—

তবু মুখ তোলে না বংশী।

ভূতনাথ বললে—বৌঠান কেমন আছে বল্‌ বংশী—বল্‌।

কাঁদতে কাঁদতে বংশী বললে—ছোটমা আর নেই হুজুর!

—বৌঠান নেই?

—না শালাবাবু, কোথাও নেই ছোটমা, বেলা দেড়টা নাগাদ খালি গাড়ি আর ঘোড়া দুটোকে টানতে-টানতে পুলিশ এনে তুললে বড়বাড়ির উঠোনে। গাড়োয়ানকে নাকি কোন্‌ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। গাড়ি দেখে ছুটে গেলুম। ভাবলাম—ছোটমা শালাবাবু দু'জনেই বুঝি ভেতরে আছে। গিয়ে দেখি রক্ত লেগে আছে সারা গাড়িতে—দেখে মাথায় বাজ পড়লো যেন! বললাম—আমার ছোটমা কোথায়? শালাবাবু কোথায়?

—তারপর?

—তা চাকর-মানুষকে কি বলে কিছু তারা? বলে—তোমার বাবু কোথায়?

বললাম—আমার ছোটবাবু কি আর মানুষ আছে? আজ্ঞে মানুষ নেই হুজুর। ছোটবাবুকে দেখিয়ে দিলাম ঘরে নিয়ে গিয়ে। তা দেখে বুঝলো তারা সব। মেজবাবুকে খবর দিলাম,

ছুটুকবাবুকে খবর দিলাম। মেজবাবু পুলিশের সঙ্গে কী গুজ-গুজ ফুস-ফুস করলে, আমি কি বুঝি ছাই! পুলিশের দারোগাকে কী বুঝিয়ে দিলে মেজবাবু, দারোগাবাবু সব তো খাতায় লিখে নিলে, তারপর চলে গেল পুলিশের দল নিয়ে।

আমি মেজবাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমার ছোটমা'র কী হলো গো মেজবাবু?

মেজবাবু ধমক দিয়ে উঠলো—যা, পালা এখান থেকে!

তখন কাকেই বা জিজ্ঞেস করি। আর কে-ই বা বলবে! আমি আর চিন্তা দুই ভাই বোনে শুধু মাথা খুঁড়ি ছোটমা'র যশোদাদুলালের কাছে। ঠাকুর না তো পাথর যেন! এমনি করে দিন যায়। শেষে বেণী এসেছিল বাড়িতে মেজবাবুর চিঠি নিয়ে। তার কাছেই শুনলুম আপনি আছেন এই হাসপাতালে।

—আর ছোটবৌঠান?

—ছোটমা কোথায় গেল তা জানতেই তো আপনার কাছে আসা। ভাবলাম, শালাবাবু নিশ্চয়ই জানে ছোটমা'র খবর—কিন্তু আমাকে বলে দিন শালাবাবু, কোথায় গেলে পাবো ছোটমাকে, আমার যে নিজের মা ছিল না শালাবাবু, নিজের মাকে চোখে দেখিনি কখনও, একমাস বয়েসেই মাকে হারিয়েছি, এখন কী হবে শালাবাবু?

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে! নক্ষত্রাকীর্ণ আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়েও অনেকদিন অনেক প্রশ্ন করেছে ভূতনাথ। দিনের বেলার নীল আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়েও প্রশ্ন করেছে। প্রশ্ন করেছে রাত্রের নিবিড় কালো অন্ধকারকে। প্রশ্ন করেছে অদৃশ্য অন্তরাত্মাকে। হাসপাতালের চারটে দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে শুয়ে-শুয়ে প্রার্থনা করেছে যেখানে যত দেবতা আছে সকলকে। প্রার্থনা করেছে—যেখানেই থাক বৌঠান, যেন সুস্থ থাকে, যেন সুখী হয়, যেন কল্যাণ হয়, যেন মঙ্গল হয় তার।

তারপর থেকে বংশী মাঝে-মাঝে এক-একদিন আসতো, এসে খাটিয়ার পায়ার কাছে চুপ-চাপ বসে-বসে শুধু কাঁদতো। কিছু বলতো না মুখে। যেন কোনো অভিযোগ ছিল না কারো ওপর। আবার এক সময় ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গেই নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যেতো।

হাসপাতাল থেকে ভূতনাথ ছাড়া পাবার দিন কতক আগে বংশী আবার হঠাৎ একদিন এসে হাজির। বংশীর চেহারা দেখে ভূতনাথও অবাক হয়ে গিয়েছিল। জামা পরেছে, ধুতিটা কোঁচা করে পরেছে। হাতে একটা টিনের রঙ-চটা বাক্স। হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে এসে ঢুকলো ঘরে। তারপর পায়ের কাছে মেঝেতে মাতা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছিল—চললাম শালাবাবু!

—কোথায় চললে বংশী?

তেমনি কাঁদতে-কাঁদতেই বংশী বললে—দেশে আজ্ঞে!

—দেশে? ভূতনাথ শুনে কম অবাক হয়নি। বললে—তা হলে ছোটকর্তাকে কে দেখবে?

বংশীর গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। বললে—ছোটবাবু নেই আজ্ঞে।

—নেই?

বংশীর কাছেই শোনা সে-ঘটনা। সকাল থেকেই বৃষ্টি সেদিন। শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলটার ওপর একটা কাক বসে-বসে এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে। বংশী হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে এক মুহূর্তে। বলে—থাম্ থাম্ হতচ্ছাড়া, আর জায়গা পেলে না, এখেনে এসেচে ডাকতে!

তখনও জানে না বংশী, জানে না কোন্ অশুভ সংবাদ বয়ে এনেছে ও। তবু দিনের কাজ মুখ বুজে করে যাচ্ছে। চিন্তা দেখছে ছোটমার ঘরের কাজ। ঘরের কাজ আর কী! যশোদাদুলালের নিয়মিত ভোগ দেওয়া। শাড়িগুলো কুঁচিয়ে রাখা। দেরাজের, আলমারির, পালঙ-এর ধুলো ঝাড়া। ছোটমা ধুলো দেখতে পারে না। ছোটমা যদি আসে কখনও তো বলবে—হ্যাঁরে, আমি নেই বলে আমার ঘর এত নোংরা করে রাখবি তোরা—আমি কি মরেছি?

সেজখুড়ি যেমন রান্নায় ব্যস্ত থাকে তেমনি সেদিনও। একটা লোক তো খেতে। তা-ও কিছুতেই মুখে রোচে না তার। একটু মুখে দিয়েই বলে—থুঃ থু—

দুটো হাতই অবশ হয়ে গিয়েছে! বংশী ভাতের থালাটা কাছে নিয়ে গিয়ে ডাকে—ছোটবাবু—ছোটবাবু—

জেগে থাকে তো ভালো। কিন্তু না-জেগে থাকলেই মুশকিল। তন্দ্রা ভাঙতেই এক ঘণ্টা। গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে হয়। তারপর একটু শুধু নিয়মরক্ষা। কিন্তু ওইটুকুর জন্যেই বংশীর আর হেনস্থার শেষ নেই।

ছোটবাবু রেগে যায়। বলে—খাবো না আমি। ক্ষিদে নেই, যা—

বংশী বলে—খেয়ে নিন বাবু, না খেলে শরীর টিকবে কী করে?

সত্যি যেন ছোটবাবুর শরীর টিকে আছে! কিন্তু হাসে না ছোটবাবু। দুটি মুখে দিয়ে আবার বংশী তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসিয়ে দেয় ছোটবাবুকে।

বলে—খেয়ে উঠে ঘুমোবেন না হুজুর, শরীরে বাত হবে।

তা সেদিনও ভাতের থালা নিয়ে বংশী ঘরে গিয়েছে যেমন রোজ যায়।

গিয়ে ডাকলে—ছোটবাবু ভাত এনেছি, উঠুন—

উত্তর নেই কোনো।

আবার ডাকলে—ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, উঠুন হুজুর—

হুজুরের তবু সাড়া নেই। বংশী তখন গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়ে দিতে গিয়েছে। কিন্তু গায়ে হাত লাগতেই যেন দশ পা পেছিয়ে এসেছে। সমস্ত গা-টা যেন বরফ হিম। তারপর হঠাৎ নজরে পড়লো একটা পিঁপড়ে যেন ছোটবাবুর ঠোঁটের ওপর চরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ হাত থেকে ভাতের থালা ঝন-ঝন করে পড়ে গেল বংশীর। সে-শব্দতে ভয় পেয়ে আরো চমকে উঠেছে বংশী। সমস্ত বাড়িটা যেন ভূমিকম্পের মতো তখন কাঁপছে। বংশীর আর জ্ঞান নেই তখন।

কাঁদতে কাঁদতে বংশী যা বললে তা বড় করুণ। বংশী বললে—টেরও পেলাম না শেষটায় আমি শালাবাবু—আমারই কপাল—আর বলতে পারলে না যেন। বংশী বললে—কাল পটলডাঙার বাবুরা এসেছিল—মেজবাবু এসেছিল, ছুটুকবাবুও এসেছিল—সকলকে জিনিসপত্তোর বুঝিয়ে দিয়ে চাবি দিয়ে দিলাম ওদের হাতে। সেজখুড়ি কাজ পেয়েছে দত্তবাড়িতে, সেখানেই চলে গেল—আর আমি চললাম দেশে...

তারপর আর-একবার প্রণাম সেরে উঠে বললে—যাই শালাবাবু, ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছে আবার—চিন্তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি বাইরে—যাই...

বংশী চলেই যাচ্ছিলো। ভূতনাথ আর একবার ডাকলে—বংশী—

—আজ্ঞে।

ফিরে এল আবার বংশী। বললে—আমায় ডাকছিলেন?

ভূতনাথ বললে—আর তোমার ছোটমা'র কোনো খবর পেয়েছো তার পরে?

—কোথায় আর পেলাম শালাবাবু, এতদিন হয়ে গেল, কেউ কিছু জানে না, ছোটবাবুকেও জিজ্ঞেস করে কিছু জানতে পারিনি, ছোটবাবুও আশ্চর্য লোক শালাবাবু। একটু কাঁদলে না পর্যন্ত, একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না কাউকে যে, মানুষটা গেল কোথায়—

তারপর খানিক থেমে আবার বললে—কলকাতায় এসেছিলাম সুখ করতে, কিন্তু সুখ আমার কপালে নেই শালাবাবু, মা-বাপ দুই-ই হারালাম, আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া বই আর কী বলুন—

বংশী চলে গেল।

ভূতনাথ হাসপাতালের বাইরে চোখ মেলে দেখলে—অনেক নীচে রাস্তার ওপর অনেক ভিড়। এলোমেলো মহাকালের মিছিল চলেছে। কে যেন অদৃশ্য হাতে চালনা করছে মহাকালের রথ।

কত কলকারখানা, যুদ্ধবিগ্রহ, কত বিচিত্র কোলাহল আকাশকে মথিত করছে। তাদের ভিড়ে কোথায় বংশী আর চিন্তা হারিয়ে গেল দেখা গেল না। মনে হলো ওদেরই মধ্যে কোথায় যেন এক নিমেষে সবাই হারিয়ে গিয়েছে। অথচ এই তো সেদিনের কথা। একটা ছেলে এসে নেমেছিল নিতান্ত অসহায়ের মতো শেয়ালদা' স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-এ। তারপর মিলনে, বিচ্ছেদে, জীবনে, মৃত্যুতে কতবার আকাশ আলো হয়ে উঠলো। কতবার দুঃসহ হলো জীবন, উচ্ছল হলো প্রাণ, উজ্জ্বল হলো দিন, আবার রাত্রির মতো কখনও ম্লান হয়ে এল প্রাণের দিগন্ত, ক্ষীণ হয়ে এল কণ্ঠের গান। মনে হলো তবু যেন সে মানুষের চরম সত্যকে আবিল হতে দেয়নি। ভূতনাথের সমস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বাসনা-কামনা, অর্জন-বর্জনের মধ্যে সে যেন ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কত ভাষায় সে কথা কইছে। কত দেশে, কত রূপে, কত কালে সে মানুষের আপাতপ্রয়োজনের ওপর জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করছে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করছে। তবু সে আছে। সমস্ত মানুষের মধ্যেই সে বেঁচে আছে। সে বলছে—নিজেকে চেনো, নিজের নিজেকে খোঁজো—আত্মানং বিদ্ধিঃ—

ভূতনাথ অনেকক্ষণ ধরে তেমনি চেয়ে রইল নিচের দিকে—সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। আজ আর নিবারণের কথা মনে পড়লো না তার। ব্রজরাখাল, ননীলাল, ছুটুকবাবু কাউকেই বিশেষ করে আজ তার মনে পড়লো না। মনে পড়লো না মেজবাবু, ছোটবাবু, বেণী, শশী, গিরি, সিন্ধু—কাউকেই। আরো অনেক অসংখ্য লোককেও মনে পড়লো না। শুধু মনে পড়লো দু'জনের কথা। যেদিন তাদের সে মানুষের মহাযাত্রার মিছিলে মিশিয়ে দিতে পারবে সেদিন তার সত্যিকারের সিদ্ধি হবে। সেদিন তার ভূতনাথ নাম সার্থক হবে। ভোলানাথ নাম সার্থক হবে।

দেখতে দেখতে আলো নিবে এল কলকাতার আকাশে।

এক ঝাঁক পায়রা উড়তে-উড়তে একটা বাড়ির ছাদের ওপর দল বেঁধে নামলো। কাদের ছাদে একটা ফণি-মনসার গাছ আকাশে ডালপালা মেলে আছে। একটা ঘুড়ি এসে উড়তে-উড়তে পড়ছে রাস্তার ওপর। তারপর শহরের ওপাশে যেদিকে চাও সেদিকে কেবল সবুজ গাছের সার। সবুজ পাতার বেষ্টনী। শহর বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে ওখানে। নীল আকাশের গায়ে রেল ইঞ্জিনের একমুঠো ধোঁয়া আটকে আছে আলগা হয়ে। আর ওপাশে কয়েকটা তালগাছ সজাগ প্রহরীর মতো মাথা উঁচু করে বুঝি পাহারা দিচ্ছে। কয়েকটা নিশাচর পাখী শহর থেকে অরণ্যের দিকে বুঝি চলেছে দল বেঁধে। আবার দিনেরবেলা তারা বুঝি ফিরে আসবে। তারপর একটা তারা উঠলো আকাশে। তারপর আর একটা। তারপর আর একটা। কোলাহল থেমে আসছে পৃথিবীর। প্রশান্ত আকাশ। এক টুকরো শব্দ। একঝাঁক ঘুম। তারপর আর কিছুই নেই।

উপকাহিনী

ভূতনাথের কাহিনী শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর একটা পরিচ্ছেদের ভগ্নাংশ। শেষ হয়ে গেল অনেক ওঠা-নামা, অনেক ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। কিন্তু তবু সব যেন তখনও শেষ হয়নি। তখনও বনমালী সরকার লেন দিয়ে আপিসের বাবুরা পান চিবোতে-চিবোতে ছোটে। গলিটুকু পেরিয়ে গেলেই একেবারে সোজা রাস্তা। বউবাজার দিয়ে হেঁটে এসে বনমালী সরকার লেন-এ ঢুকে পড়ো—এঁকে-বেঁকে সোজা পশ্চিমে বড় রাস্তা পাবে। বাঁ দিকে বড়বাড়ি আর ডানদিক-বরাবর ছোট-ছোট দোকানের সার। ছোট টিনের চালার নিচে বাঞ্ছার তেলেভাজার দোকান পাবে। বাঞ্ছা এখন নেই। তার ছেলে অধর। অধরের ছেলে অক্রুর এখন দোকানে বসে। অক্রুরের তেলেভাজার নাম-ডাক আছে এ-অঞ্চলে। শীতকালে ভোর থেকে ভিড় জমে অক্রুরেব দোকানে। গরম তেলের ওপর বেগুনীগুলো ফেলতে সময় দেয় না খদ্দেররা। ছেঁকে ধরে চারদিক থে ক। বলে—আমাকে আগে দে রে—চা ফুটছে বাড়িতে...। তারপর—গুরুপদ দে'র দোকান 'স্বদেশী-বাজা র'। বিলিতি জিনিস দোকানের ত্রি-সীমানায় ঢুকতে পারে না—গুরুপদ দে'র এমনি নিয়ম। মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী আর ধুতি পরে গুরুপদ দে নিজের হাতে মাল বেচে। বলে—আপনারা পণ করুন ভাই, আজ থেকে বিলিতি জিনিস কিনবেন না—প্রতিজ্ঞা করুন, বিলিতি জিনিস ছোঁবেন না—এ না হলে স্বাধীনতা আসবে না দেশের।

তারপর ত্রিকালদর্শী রাজজ্যোতিষী শ্রীমৎ অনন্তহরি ভট্টাচার্যির 'শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম।' এমন যে কলিকালের ভেজালের যুগ, এ-যুগেও অমন একটি খাঁটি নবগ্রহ কবচ কী করে যে মাত্র তেরো টাকা পনের আনা দশ পয়সায় দিতে পারেন, তাই-ই এক বিস্ময়! তারপর আছে এ-পাড়ার ছেলেদের 'সবুজ-সঙ্ঘ'। তারপর 'পবিত্র খদ্দর ভাণ্ডার'। খদ্দর তো বাজারে অনেক রকম আছে। কিন্তু যদি পবিত্র খদ্দর চান তো ওখানেই যেতে হবে আপনাকে। তারপর বেণী স্বর্ণকারের সোনা-রুপোর দোকান। আর তারপর মোড়ের মাথায় ভুজাওয়ালাদের মাটির দোতলা বাড়ি। হোলির এক মাস আগে থেকে খঞ্জনী বাজিয়ে পাড়া মাত করে তোলে।

এ-সব তো গেল রাস্তার ডানদিকের কাহিনী।

কিন্তু বাঁ দিকের বড়বাড়িটা তখনও ছিল। ছোট-ছোট খুপরি করে তখন ভাড়াটে বসিয়েছিল পটলডাঙার বাবুরা। দু'খানা করে ঘর আর একখানি রান্নাঘর। ব্যবস্থা ভালোই। রোদ আসে কলতলায়। ভাড়াটেদের কলকোলাহলে পাড়াটা মুখর হয়ে থাকতো দিনরাত। বাইরের দিকেও একটু অদল-বদল করে কয়েকজন ভাড়াটেকে বসানো হয়েছিল। কখনও-কখনও সন্ধ্যেবেলা সেখানে গানের আসর বসতো। ছুটুকবাবুর সে জমকালো আসর নয়। পর্দার আড়ালে সিদ্ধির সরবতেরও ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু মিঞা-কি-মল্লারের মতো কড়া রাগরাগিণীর চর্চা হতো। গানের সঙ্গে বাঁয়া-তবলায় বিলম্বিত লয়ে মধ্যমানের ঠেকা চলতো। সঙ্গে বড় জোর পান-সুপুরি-জর্দা-দোক্তা-কিমাম পর্যন্ত। তার বেশি নয়।

এ তো গেল বনমালী সরকার লেন-এর কাহিনী। এই বার নামের রাস্তা নিয়ে গল্প বলছি।

কিন্তু বাইরে তখন অদল-বদল হয়ে গিয়েছে অনেক। দিল্লীর মসনদে বসবার দিন লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেললে কে একজন। সবাই বললে—এ বাঙালী। বাঙালী ছাড়া আর কার কাজ হবে? কিন্তু মরলো না বড়লাট সাহেব। মরলো তার হাতীর মাহুত। দশ কোটি টাকা খরচ করে নতুন রাজধানী উঠলো দিল্লীতে। নতুন ইন্দ্রপ্রস্থ। কবরের দেশে এক নতুন ইন্দ্রপ্রস্থ উঠলো! কিন্তু লর্ড সিংহ ইতিমধ্যে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। বেহারের লোক, স্যার আলী ইমাম এলেন এগিয়ে। লর্ড সিংহ-এর খালি জুতোয় তিনি পা গলালেন। তাঁর নিজের দেশ বেহার। বেহারকে এবার আলাদা করে নিতে হবে। বেহারের জন্যে আলাদা লাটসাহেব, আলাদা ইউনিভার্সিটি, আলাদা হাইকোর্ট চাই। কিন্তু তা হোক, তবু তো বাঙলা দেশ আবার জোড়া লাগলো। তাইতেই খুশি সবাই।

বিলেতের 'টাইমস' পত্রিকা লিখলে—

'Bengal differs more from most other Indian provinces than they differ from one another. Economic, temperamental and social causes account for this difference. Caste is less powerful; a common literary language unites

over forty million Bengalis. Even the Muslim community, who form a narrow majority of the population are indisputably less divided both socially and politically from their Hindu countrymen than they are in other parts of India. The Bengali temperament, at once calculating and emotional, critical and enthusiastic, baffles other Indians almost as much as it puzzles British administrators.'

তবে বড় ভালো মানুষ এই নতুন লাট কারমাইকেল সাহেব। কিন্তু হলে কি হবে। আসতে-না-আসতে যুদ্ধ গেল বেধে আর চার মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে চব্বিশ হাজার লোক যুদ্ধ করতে গেল এক ফ্রান্সেরই লড়াইতে।

বুড়োরা রোয়াকের ওপর 'হিতবাদী' বিছিয়ে পড়ে আর গল্প করে।

বলে—এবারকার লড়াইতে আট টাকা করে চালের মণ হবে দেখো—এই বলে রাখছি।

বলে—এবার আর টিকতে হবে না দাদা, টাকায় পাঁচ সের দুধ—বলো কি হে, দিনে ডাকাতি!

সত্যি, জিনিসপত্তোরের দাম আগুন তখনও। ছ'টাকা আট টাকা করে চাল, টাকায় পাঁচ সের করে দুধ, দশ আনা সের পাঁঠার মাংস, তিন আনা সের ডাল, সরষের তেল তিন আনা, মানুষ খাবে কী? কী খেয়ে বাঁচবে!

গোয়াবাগানের মেস-এর বাসাতেও আলোচনা চলছে! সে বোধ হয় ১৯১৪ সালের মাঝামাঝি।

এই মেসেতেই পরে ওভারসিয়ার ভূতনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। যে-কাহিনী আমি—এই উপন্যাসের লেখক—লিখছি, তার অনেক পরে আমার জন্ম। আমি ও-সব দেখিনি, জানিও না। আমার জানবার কথাও নয় ও-সব। ভূতনাথবাবু তখন বৃদ্ধ। চাকরি থেকে রিটায়ার করে গিয়েছেন। তেতলার ছোট একটা ঘরে একলা থাকেন। অতি ভোরে ওঠেন। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, ভোরবেলা পায়ে হেঁটে গঙ্গা স্নানে যান। তারপর ফিরে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কী সব জপ-তপ করেন। দুপুরবেলা শিরদাঁড়া সোজা করে গীতা পড়েন, রামায়ণ পড়েন। বিকেলবেলা পাড়ার একটা হরিসভায় গিয়ে কথকতা শোনেন। আমি যতটুকু জানতাম—এই ছিল তখন তাঁর প্রাত্যহিক কাজ।

কী কারণে জানি না, আমাকে তিনি একটু সুনজরে দেখতেন। আমাকে বলেছিলেন—আমার গল্প কি কারো ভালো লাগবে?

বললাম—যদি অনুমতি করেন তো লিখতে পারি।

বললেন—ও গল্প তো ওখানেই শেষ নয়, আরো আছে—শেষটাও তা হলে জুড়ে দেবেন আপনার গল্পে।

শেষটা তার কাছেই শুনেছিলাম। 'কাহিনী'র সঙ্গে শেষ ঘটনাটা খাপ খাবে কিনা বুঝতে পারিনি ; তাই সেটা জুড়ে দিলাম 'উপকাহিনী'তে।

আর তখনকার বনমালী সরকার লেন? ভূতনাথবাবুর কাছে শোনবার পর বউবাজারে একদিন দেখতেও গিয়েছিলাম। সে আর চেনা যায় না। কোথায় দেউড়ি, কোথায় বাগান, কোথায় খাজাঞ্চিখানা, নহবতখানা, তোষাখানা, ভিস্তিখানা, নাচঘর, পূজোবাড়ি! বড়বাড়ির একখানা ইঁটেরও পর্যন্ত সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। রাস্তার দু'পাশে বিরাট প্রাসাদ উঠেছে। একশ' ফুট চওড়া রাস্তা। ইলেকট্রিক লাইটের সার-সার থাম। এলাহি কাণ্ড! কোনোটাতে মোটরের শো-রুম, কোনোটা ইনসিওরেন্সের আপিস। গিসগিস করছে লোক। ব্যস্ত চাল-চলন। মিনিটে লক্ষ-লক্ষ টাকার মাল কেনা-বেচা হচ্ছে। সন্ধ্যে হলে রাস্তায় শাঁ-শাঁ করে মোটর চলে। কেউ কারো মুখ চেনে না, নাম জানে না। অথচ পাশাপাশি বাস করছে দিনরাত। লিফ্‌টে করে উঠছে-নামছে লোকজন। দেখে মনে হলো বড়বাড়ির সেই ঢিমে-তালের জীবন-যাত্রার পর যেন জীবনের অর্কেস্ট্রা হঠাৎ বড় জলদি চলেছে এখন। সময়ের গতি বেড়েছে। দিন যেন ছোট হয়ে এসেছে এখানে। বৈদূর্যমণির নাম বললে কেউ চিনতে পারে না আর। হিরণ্যমণির পরিচয় কেউ আর জানে না। কৌস্তভমণির ছায়াও কেউ দেখেনি। এমনি অবস্থা। পটলডাঙার বাবুদের হাত থেকে দশহাত বদল হয়ে-হয়ে বনমালী সরকার লেন তখন এক অন্য জগতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর বার-শিমলের সে-বাড়িটাও আমি দেখে এসেছি একদিন। দুটো রাস্তার মোড়ের মাথায় মস্ত বড়

বাড়ি করেছেন সুপবিত্রবাবু। সত্যি বড় সুন্দর বাড়িটা। ভেতরের মানুষগুলোও নিশ্চয় ভারি সুন্দর। তখন সন্ধ্যে হয়েছে। দোতলায় অর্গ্যান বাজিয়ে একটি মেয়ের গান শুনেছি—

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো—

একদিন ভূতনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—সে চিঠিতে আপনি সেদিন কি লিখে এসেছিলেন?

ভূতনাথবাবু বললেন—ওই একবার মাত্র মিথ্যাচার করেছি জীবনে। বার-বার ভেবেছি, কিন্তু এ-ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তরও ছিল না। আমি লিখেছিলাম—আমি সমস্ত সূত্র হইতে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, অতুল চক্রবর্তীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের বংশের আর কেহ কোথাও নাই। তুমি সুপবিত্রকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিও না... আরো এমনি সব কী-কী কথা লিখেছিলাম তাড়াতাড়িতে, আজ আর তা মনে নেই—আর তার পরে তো দেখাই করতে পারলাম না। দুর্ঘটনায় পড়ে কতদিন যে হাসপাতালে রইলাম!

জিজ্ঞেস করেছিলাম—পরে আর কখনও জবার সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার?

ভূতনাথবাবু বললেন—হয়েছিল, শুনুন, সে-ঘটনা।

ভূতনাথবাবুর কাছে শোনা ঘটনা আমার নিজের ভাষায় বলি।

হাসপাতাল থেকে একদিন সন্ধ্যেবেলাই ছাড়া পেয়ে গেল ভূতনাথ হঠাৎ। তখন রাস্তায় বেরিয়ে কেমন যেন প্রথমটা আড়ষ্ট লাগলো চলতে। কোথায় যাবে সে? কোথায় গিয়ে উঠবে ভূতনাথ? সমস্ত পৃথিবীটা যেন ফাঁকা মনে হলো। বড়বাড়িতে কোথায় সে যাবে? কেউ নেই! শেষ পর্যন্ত ছিল বংশী আর চিন্তা। তারাও অবশেষে চলে গিয়েছে কলকাতার ত্রি-সীমানা ছেড়ে। একবার মনে হলো বড়বাড়িতে গিয়ে বৌঠানকে সে খুঁজে দেখবে। মনে হলো—বৌঠান যেন কোথাও বড়বাড়ির কোনো ঘরে লুকিয়ে আছে নিশ্চয়। ধরা দিচ্ছে না। নইলে সেদিন ঘোড়ারগাড়ির সে-দুর্ঘটনার পর কোথাও পাওয়া গেল না কেন তাকে—এ কেমন করে হয়! এ কেমন করে সম্ভব!

চাঁদনীর হাসপাতাল থেকে হাঁটতেহাঁটতে ভূতনাথ গিয়ে দাঁড়ালো একবার বড়বাড়ির সামনে। মনে হলো সমস্ত বাড়িটা যেন একটা বিরাট সরীসৃপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সমস্ত শরীরে তার মৃত্যুর অবসন্নতা। অন্ধকারের বিবর্ণতা যেন সমস্ত আবহাওয়ায়।

কেউ কোথাও নেই। ভূতনাথ তালাবন্ধ গেটটা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলো। বেশ ঘাস গজিয়েছে উঠোনের ওপর। ভয় করে পা ফেলতে। কোথাও যেন শব্দ পেয়ে একটা ব্যাঙ আচমকা থপ করে লাফিয়ে ওঠে। সমস্ত ঘরগুলোয় তালা-চাবি দেওয়া। শুধু খিড়কির দিকে বাগানের মুখোমুখি চোরকুঠুরিতে যাবার সিঁড়িটা খোলা। আস্তে আস্তে ওপরে গিয়ে উঠলো ভূতনাথ। চোরকুঠুরির সামনে বারান্দা। বারান্দার উত্তরদিকেই সেই দরজাটা তালাবন্ধ। ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ভেতরে কেবল অন্ধকার। ও-পাশে বউদের মহলে যাবার উপায় নেই। ভূতনাথ কান পেতে রইল অনেকক্ষণ! কিছু শব্দ যদি শোনা যায়। কিছু যদি আভাস পাওয়া যায়! কিন্তু কিছু নেই। সব যেন মৃত্যুর মতো বধির। অন্ধকারের মতো বোবা। ভূতনাথ চুপি-চুপি শুধু একবার ডাকলে—বৌঠান—

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে কান পেতে রইল ভূতনাথ। কেউ সাড়া দিলে না তবু।

আবার একটু জোরে ডাকলে—বৌঠান, আমি ভূতনাথ।

একটা প্রতিধ্বনি শুধু ভেতরের ফাঁকা ঘরগুলোর দেয়ালে আছাড় খেয়ে ফিরে এল। একটা গম-গম করে শব্দ হলো শুধু। ফাঁপা-ফাঁপা নিরর্থক শব্দ।

ভূতনাথ আবার ডাকলে—বৌঠান—

আবার সেই রকম। তারপর সেইভাবে মেঝের ওপরেই একবার বসে পড়লো ভূতনাথ। মাথা যেন ঝিম-ঝিম করছে। এতদিন হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে যেন জড়তা এসেছে সমস্ত শরীরে। মাথা কুটতে লাগলো দেয়ালে। কোথায় গেল বৌঠান! কে বলে দেবে? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বৌঠানকে!

তারপর এক সময়ে উঠলো ভূতনাথ। সমস্ত পৃথিবীর ওপর যেন তার রাগ হতে লাগলো। সমস্ত সংসারের ওপর বিরাগ। আজ কেউ নেই ভূতনাথের। মানুষের পৃথিবীতে আজ যেন ভূতনাথ একলা।

একেবারে নিঃসহায় নিঃসম্বল। মনে হলো নিশ্চয়ই এ মেজবাবুর কাণ্ড। মেজবাবুর গুণ্ডারা নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে গিয়েছে বৌঠানকে। মেজবাবু চৌধুরীবাড়ির বউ-এর এ-আইন-অমান্য সহ্য করবে না। তাই বুঝি ভূতনাথকেই নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বৌঠানই যখন নেই তখন ভূতনাথ বেঁচে থেকেই বা কী করবে!

আবার সেই রাস্তা দিয়ে নেমে এল ভূতনাথ। সেই পরিত্যক্ত বড়বাড়ি। চারদিক নিস্তব্ধ। দেউড়ি পেরিয়ে আবার সেই বনমালী সরকার লেন-এ এসে পড়লো। কোথায় যাবে কোনো ঠিক নেই। কোথায় গিয়ে আশ্রয় মিলবে? কার কাছে গিয়ে আব্দার করবে, আবেগ জানাবে। কা'কে সে বকবে? কাকে অনুরোধ করবে, অনুযোগ, অভিযোগ করবে?

সমস্ত কলকাতা শহর তখন বিষণ্ণ। অন্তত ভূতনাথের মনে হলো যেন বৌঠানের বেদনায় সমস্ত শহর বিষণ্ণ হয়ে আছে সেদিন। কখন আস্তে আস্তে গিয়ে ভূতনাথ বার-শিমলেয় পৌঁছেছে খেয়াল নেই। একবার ফিরে আসতে যাচ্ছিলো ভূতনাথ। কী হবে সেখানে গিয়ে? সে তো চিঠি দিয়ে এসেছে। সে চিঠিতেই তো সে চূড়ান্ত কথা লিখে এসেছে সেদিন। এতদিনে জবা নিশ্চয়ই সুপবিত্রকে গ্রহণ করেছে। তবে কেন আর তার যাওয়া?

তবু যেন বাড়িটার সামনে গিয়ে দরজা না ঠেলে পারলো না।

দরজা খুলে দিয়ে ক্ষুদির মা'ও অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—দাদাবাবু, আপনি?

ভূতনাথ বললে—দিদিমনি কোথায় ক্ষুদির মা?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভূতনাথ সেদিন জবাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল বৈকি। জবা বাবার ছবির সামনে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে ছিল। কোনো পরিবর্তন নেই জবার। ভূতনাথকে দেখে জবাও যেন কম অবাক হয়নি। বললে—ভূতনাথবাবু, আপনি?

ভূতনাথ বললে—সুপবিত্র কোথায়?

জবা সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে—কিন্তু এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি, ভূতনাথবাবু?

মুহূর্তের জন্যে বুঝি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। বললে—আমি তো তোমাকে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলাম জবা, পাওনি সে চিঠি?

—পেয়েছিলাম, কিন্তু...

—আমি সমস্ত জায়গায় খোঁজ নিয়েছিলাম, সেই নদীয়া জেলায় পর্যন্ত গিয়েছিলাম নিজে, তিনি মারা গিয়েছেন, তাঁর বংশের কেউ আর জীবিত নেই—তিনি মৃত—বিশ্বাস করো।

—কিন্তু—

—তোমার কোনো দ্বিধা শুনবো না জবা, ছোটবেলায় সে-বিয়ে সে তো বলতে গেলে বাক্‌দানেরই সামিল, তোমার কথা মতোই 'অন্যপূর্বা' হয়ে তুমি নির্বিঘ্নে বিয়ে করতে পারবে।

জবা একবার বললে—সত্যিই কি তাঁর কোনো সন্ধানই পেলেন না?

ভূতনাথ বললে—তাঁর প্রেতাত্মা হয়তো আছে, কিন্তু তাঁকে নিয়ে তুমি করবে কী? আমি সেই কথা বলতে অনেকদিন আগেই আসতাম, কিন্তু আসতে পারিনি এতদিন শুধু...

জবা সমস্ত শুনলো চুপ করে। বললে—আপনি যে এতদিন হাসপাতালে ছিলেন, আমাকে একটা খবরও দেন নি, আমি কিন্তু অনেক দিন খোঁজ করেছিলাম আপনার—জানেন?

ভূতনাথের কেমন যেন রোমাঞ্চ হলো সমস্ত শরীরে। বললে—সত্যি খোঁজ করেছিলে?

—কেন মানুষ মানুষের খোঁজ করে না?

—না, তা করবে না কেন, তবু তুমি আমার খোঁজ করেছিলে এটা জানতে ভালো লাগে।

জবা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মুখটা যেন তার হঠাৎ বড় লাল হয়ে উঠেছে। তারপর যেন বড় মরীয়া হয়ে বললে—আমার অনুরোধ, আপনি এবার একটা বিয়ে করে ফেলুন, আপনি সুখী হবেন হয়তো।

ভূতনাথ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

হাসতে হাসতে বললে—আমি দুঃখী এ কথা তোমায় কে বললে জবা... আর তা ছাড়া আমার বিয়ে

করা আর চলেও না, একবার করেছি।

—তার মানে? জবাও যেন চমকে উঠলো।

ভূতনাথ হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে—সে কথা যাক, সুপবিত্রকে তুমি গ্রহণ করবে কিনা বলো আগে—তোমার বাবার অন্তিম অনুরোধ।

—কিন্তু সত্যি আপনার বিয়ে হয়ে গিয়েছে!

ভূতনাথ বললে—বলেছি তো হয়েছে।

—কোথায়? কবে?

ভূতনাথ বললে—এ-কথার জবাব আর একদিন দেবো জবা—এখনও সময় হয়নি, এখন বোধ হয় আর সময়ও নেই, এতক্ষণে সুপবিত্র নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েনি, তাকে আমি এখনি ডেকে আনছি, আমার সামনেই তোমাকে কথা দিতে হবে—আর আমিই থাকবো তার সাক্ষী।

জবা যেন কী বলে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো। ভূতনাথ থামিয়ে দিয়ে বললে—তুমি আর 'না' বলো না জবা, তোমার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্তি চাই, তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলে আমি চলে যেতে পারি না, তা ছাড়া তোমার বিয়ে না হলে এখানে আমার আসাটাও তত শোভন নয়।

তারপর সেই রাত্রে সুপবিত্রকে ডেকে এনে কেমন করে সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন ভূতনাথবাবু তা-ও বলেছিলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—আর কখনও যাননি ওখানে, জবাদের বাড়িতে?

ভূতনাথবাবু বলেছিলেন—গিয়েছিলাম, সে জবার বিয়ের দিন—কিন্তু তারপর হয়তো আমাকে প্রয়োজনও হয়নি আর—আমার কোনো আহ্বান আসেনি—যেদিন ডাক আসবে সেদিন যাবো বৈকি আবার।

—আর ছোটবৌঠান? তাঁর আর দেখা পেয়েছিলেন?

ভূতনাথবাবু বলেছিলেন—পেয়েছিলাম, কিন্তু না পেলেই যেন ভালো হতো।

—সেই গল্পটা বলুন।

ভূতনাথবাবু বললেন—যেদিন বনমালী সরকার লেন-এ বড়বাড়ি ভাঙবার অর্ডার দিয়ে চলে এলাম, সে তো আপনাকে বলেছি, এ তার পরের দিনের কথা। সে এক অদ্ভুত দেখা! এমন করে শেষ দেখা হবে ভাবিনি। ছোটবৌঠান বলেছিল—আমার মৃত্যুর পর তুই কাঁদিস ভূতনাথ, আমার জন্যে একটু চোখের জল ফেলিস—আমাকে আমার বিয়ের বেনারসী পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিস, কিন্তু কিছুই করা হলো না।

ভূতনাথবাবু প্রশান্ত হাসি হাসতে লাগলেন। এ উপকাহিনীতে সেই গল্পটাই বলি।

ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট হলো সেই ১৯১১ সালে। প্রথম থেকেই ভূতনাথের চাকরি হয়ে গেল এখানে। রূপচাঁদবাবুর চেষ্টায় প্রথম দিনটি থেকেই ঢুকে পড়লো এ-আপিসে।

ইদ্রিস বললে—খোদা আপনার ভালো করবে ওভারসিয়ারবাবু।

যে-সরকারবাবু অমন হিংসে করতো, সে-ও কেমন যেন নরম হয়ে এল শেষকালে। বললে—ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়—এ আপনাকে দেখেই বুঝতে পারলাম মশাই!

নতুন আপিসে কাজ আরম্ভ হয়েছে। রাস্তা চওড়া করা হয় বাড়ি ভেঙে মাটি সমান করে। এ-সব পুরনো কাজ ভূতনাথের। তবু যেদিন বৌবাজারের বনমালী সরকার লেন ভাঙবার ফরমাশ হলো সে একটা দিন বটে! ভূতনাথের মনে হলো—নিজের পাঁজর ক'খানা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার আদেশ হয়েছে। সে-বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার পর কোনোদিন ও-রাস্তা আর মাড়ায়নি তো ভূতনাথ। ওদিক দিয়ে গেলেই কেমন যেন আকর্ষণ করতো কেউ! কিন্তু চাকরি তো তার! আদেশ মানতেই হবে। প্রথম যেদিন মাপজোক করতে গিয়েছিল ভূতনাথ, সেই দিনই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বারে বারে। মনে হয়েছিল—কোথা থেকে যেন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে বার বার আকর্ষণ করছে। সে-বড়বাড়ি আর চেনা যায় না। সে পুজোর দালানটার তবু কিছু অংশ তখনও রয়েছে। ফালি-ফালি ভাগ হয়ে গিয়েছে সব। এক

ঘর থেকে আসছে চিংড়ি মাছের গন্ধ। আর-এক ঘর থেকে আসছে মাংসের। এক ঘরে হয়তো চেয়ার, টেবিল, পাখা—আর-এক ঘরে মাদুর, চটের পর্দা আর এনামেলের কাপ। কত বিচিত্র লোক বাসা বেঁধেছে বড়বাড়িতে। কোথায় গেল তোষাখানা, ভিস্তিখানা, রান্নাবাড়ি! কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই আজ। সেদিন তেতলায় ওঠেনি ভূতনাথ। ইচ্ছে থাকলেও ওঠবার প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু যেদিন সেই সমস্ত পাড়াটা খালি হয়ে যাবার পর চরিত্র মণ্ডলকে বাড়ি ভাঙবার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসছিল, সেদিন ভূতনাথ ভাঙা বাড়ির ওপরে উঠেছিল সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু না উঠলেই বোধ হয় ভালো হতো। সেই পুরনো পরিত্যক্ত ঘরগুলোর মধ্যে কী যাদু ছিল কে জানে! মনে হয়েছিল কে যেন তাকে তেতলার ভাঙা রেলিং থেকে একেবারে নিচে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে মনে হয়েছিল বৌঠান যেন তাকে হঠাৎ মদ আনবার জন্যে হীরের কানফুলটা খুলে দিলে!

আর তারপর সেই রাস্তার কুকুরটা! বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। কিন্তু সেদিনও ভূতনাথ জানতো না এ কীসের যাদু! এ কীসের আকর্ষণ! জানতে পারলো পরের দিন। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

ছুটুকবাবুকে তখন এক-একদিন দেখতে পাওয়া যেতো। কালো কোট গায়ে দিয়ে ট্রামে চড়ে যান। ভূতনাথের মনে হতো ও কোট যেন অনেক কালি লেগে কালো। সময়ের কালি, কলঙ্কের কালি। ও কালি যেন ধুলেও যাবে না।

আর মেজবাবু? মেজবাবুই শুধু শেষদিন পর্যন্ত গাড়িঘোড়া চড়ে গেলেন। বিকেলবেলা ইডেন গার্ডেন-এর কাছে দাঁড়ালে দেখা যেতো ইব্রাহিম আস্তে আস্তে ঢিমে চালে গাড়ি চালিয়ে আসছে। গাড়ির ভেতর মেজবাবু দু'হাতে দুটো হাতল ধরে চুপ করে বসে আছেন। শূন্য দৃষ্টি চোখের। তবু গিলে করা মলমলের পাঞ্জাবী। হাতে একটা মস্ত হীরের আঙটি। গাড়িটা এসে গঙ্গার ধারের দিকে ইডেন-গার্ডেন-এর গা ঘেঁষে রোজ দাঁড়ায় একবার। মেজবাবু নামেন না। ঘোড়া দুটোকে তখন ঘাস খাওয়াতে নামে ইব্রাহিম। ঘোড়া দুটো কয়েক মুঠো ঘাস খায়, আর মাঝে-মাঝে বিরক্ত হয়ে পা ঠোকে। হয়তো ঠিক পছন্দ হয় না শুকনো ঘাস। কিন্তু মেজবাবু সেই গাড়ির ভেতরে বসে বসেই খানিকক্ষণ হাওয়া খান। আর ইডেন-গার্ডেন-এর গোরা-ব্যাণ্ডের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে মৃদু মৃদু তাল দেন। এ-দৃশ্য সাইকেল-এ যেতে যেতে ভূতনাথ অনেকদিন দেখেছে।

সুপবিত্রও বোধ হয় মোটর কিনেছে। কী চাকরি করে কে জানে! বড় চাকরি নিশ্চয়ই। কোট-প্যান্ট পরা অবস্থায় অনেকদিন সকালবেলা যেতে দেখেছে ভূতনাথ। গাড়ি চালায় ড্রাইভার। ভেতরে হেলান দিয়ে সুপবিত্র খবরের কাজ পড়ে।

তবু এ-সব ঘটনা ভূতনাথের জীবনে কোনোদিন কোনো রেখাপাত করেনি। রেখাপাত করবার মতন ঘটনাও নয়। কিন্তু শেষ ঘটনার জন্যে ভূতনাথ যেন সত্যিই প্রস্তুত ছিল না।

সেদিন রাত্রে বুঝি ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল। বড়বাড়ির শেষ চিহ্নটুকু দেখে সাইকেল-এ চড়ে আসতে আসতে যেন অনেক যুগ পার হয়ে এল ভূতনাথ। কাল ও-বাড়ির আর কোনো কিছু চিহ্ন থাকবে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বড়বাড়ি। আর বড়বাড়ির সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বনমালী সরকার ইতিহাস থেকে। তাতেও কিছু দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এই যে, বাতিল করা তদারক করতে হবে সেই ভূতনাথকেই। একদিন যে আশ্রয় দিয়েছিল, শান্তি দিয়েছিল, সান্ত্বনা দিয়েছিল, তাকেই নিশ্চিহ্ন করতে হবে ভূতনাথকে নিজের হাতে।

সমস্ত রাত অসহ্য এক অনুভূতিতে কাটলো।

ভোরবেলা কিন্তু যথারীতি ঘুম থেকে উঠেছে ভূতনাথ। মেসের তেতলা ঘরটার জানলা দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যায়। গঙ্গাস্নান সেরে এসে সেদিকে চেয়ে যথারীতি প্রণাম করেছে। প্রাতঃকালীন জপ-তপ গায়ত্রী—কোনো কিছুই বাদ যায়নি সেদিনও। আপিসেও গিয়েছে যথাসময়ে। কোনো ব্যতিক্রম হয়নি কোথাও। কিন্তু আপিসের ঘড়িতে তখন বেলা দুটো—

বড়সাহেব ডাকলো। ঘরে যেতেই বড়সাহেব বললে—বনমালী সরকার লেন-এ যে বিল্ডিং ভাঙা হচ্ছে—সেখানে এখনি দৌড়ে যাও—গিয়ে সেখানে কী হয়েছে দেখে এসে আমাকে রিপোর্ট দেবে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিছু য়্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি?

সাহেব বললে—তা ঠিক নয়, তবু কুলীরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে—বলছে আর কাজ করবে না, টুলস্ যন্ত্রপাতি ফেলে দিয়ে বসে আছে।

সেদিনও ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো ভূতনাথ আবার। কিন্তু আজ দুপুরবেলা চেহারা যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে বড়বাড়ির। বড়বাড়ি আর বলা কেন? বড়বাড়ির একখানা ইঁট পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে নেই। মাটি সমান হয়ে গিয়েছে সমস্ত। দূর থেকে কিছুই দেখা যায় না। কাছে এসে বোঝা যায় চারদিকে বড় বড় গর্ত। ইঁট সিমেন্ট ভেঙে মাটি বেরিয়ে গিয়েছে। ভিত্ পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছে সব। সমস্ত বনমালী সরকার লেনটা যেন মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে।

কিন্তু কাছে যেতেই বোঝা গেল বেশ ভিড় জমেছে যেন। কাকে কেন্দ্র করে যেন অনেক জটলা চলছে।

ভূতনাথ হাজির হতেই চরিত্র মণ্ডল এগিয়ে এল। মুখচোখের ভাব তার বদলে গিয়েছে। বললে—আমরা কাজ করবো না হুজুর।

—কেন, কী হলো তোমাদের?

চরিত্র মণ্ডলকে আর বলতে হলো না কী হয়েছে। ভূতনাথ দেখলে পাশেই বৈজু নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। গাঁইতির ঘা লেগে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। বউবাজার থেকে ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। ব্যাণ্ডেজের কাপড়টাও তখন রক্তে ভেসে গিয়েছে।

চরিত্র মণ্ডল আবার বললে—আমরা আর এখানে কাজ করবো না হুজুর।

—কেন, কাজ বন্ধ করবি কেন? তা কাজ না করিস অন্য কুলী ডাকবো কাল থেকে।

চরিত্র বললে—কোনো কুলী এখানে কাজ করবে না—এ কবরখানা আছে হুজুর—ওই দেখুন—সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র মণ্ডল হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে—ওই দেখুন হুজুর—ওই দেখুন।

অনেক লোক উৎসুক হয়ে সেইদিকে তখন দেখছিল। চরিত্র মণ্ডল ভূতনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সেইদিকে। বড়বাড়ির ভিত্ খুঁড়ছে কুলীরা। গর্ত করেছে জায়গায় জায়গায়। একটা গর্তের ভেতর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে ভূতনাথ। কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের সম্পূর্ণ একটা কঙ্কাল। মাথার খুলি থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কত দিনের, কত কাল আগের কে জানে! কিন্তু এতটুকু বিকৃত হয়নি যেন তখনও। খানিকটা মাটির আড়ালে তখনও ঢাকা। তার পাশে যেন কী একটা চিক-চিক করছে। সোনার মতন। যেন মীনে-করা সোনা!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ওটা কী?

এতক্ষণ কেউ দেখতে পায়নি। সবাই ঝুঁকে পড়লো এবার। কিন্তু ভূতনাথ চিনতে পেরেছে ঠিক।

কে যেন এবার বলে উঠলো—ওটা সোনার গয়না মনে হচ্ছে যেন—মেয়েছেলের গয়না—সোনার গোটছড়ার মতন ঠিক।

কিন্তু ভূতনাথ অন্য কথা ভাবছে। তার মনে হলো—ইতিহাসের পটপরিবর্তন যেন সম্পূর্ণ হলো এতদিনে।

তারপর সেই কঙ্কালটার দিকে চেয়ে ভূতনাথ অভিভূতের মতন দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার মনে হলো জীবনের যেন এক মহা অর্থ চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল এক মুহূর্তে। মৃত্যু যেন আর মৃত্যুই রইল না। মনে হলো জীবনেরই আর-এক মহাপ্রকাশ যেন মৃত্যু। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যেন জীবনকে সম্পূর্ণ করে পেতে হয়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যেন সার্থকতার চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। মৃত্যু দিয়েই যেন জীবনের চরম উৎসর্গ সম্পূর্ণ হয়। কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা দিয়ে নয়, কোনো লৌকিক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা দিয়েও নয়—জীবনের চরম সার্থকতা একটি মাত্র যোগে—সে অমৃতের যোগ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাই ভূতনাথ যেন অমৃতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল এক আশ্চর্য উপায়ে।

তারপর ভূতনাথ সেখানে দাঁড়িয়ে সেদিন তার পরম প্রার্থনা জানালো—যে-দেবতা সকল মানুষের দুঃখ গ্রহণ করেছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, যাঁর ভালোবাসারও অন্ত নেই, তাঁর ভালোবাসার বেদনা যেন সমস্ত মানবসন্তান মিলে গ্রহণ করতে পারি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি!